প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোন বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠউপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠউপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোন শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠউপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয় পাঠউপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তাঁর নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠউপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

প্রথম পুনর্মুদ্রণ ঃ এপ্রিল, 2013

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance
of the Distance Education Council, Government of India.

পরিচিতি

বিষয় ঃ সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা পাঠক্রম)

পাঠক্রম ঃ পি. জি. ডি. জে. এম. সি – 6ক

	রচনা	**সম্পাদনা**
পর্যায়–1	অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায়	—
পর্যায়–2	শ্রীমতী তাপসী ঘোষ	অধ্যাপক সৌমেন্দ্র নাথ (অঞ্জন) বেরা

পাঠক্রম ঃ পি. জি. ডি. জে. এম. সি – 6খ

	রচনা	**সম্পাদনা**
পর্যায়–1	শ্রী জয় সরকার	অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায়

পাঠক্রম ঃ পি. জি. ডি. জে. এম. সি – 6খ (2)

	রচনা	**সম্পাদনা**
পর্যায়–2	শ্রী জয় সরকার	অধ্যাপক সৌমেন্দ্র নাথ (অঞ্জন) বেরা

পাঠক্রম ঃ পি. জি. ডি. জে. এম. সি – 6গ

	রচনা	**সম্পাদনা**
পর্যায়–1 ও 2	শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা দত্ত	অধ্যাপক পার্থ রাহা
পর্যায়–3 ও 4	শ্রী মানস ঘোষ	ঐ

ঘোষণা

এই পাঠ সংকলের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) দেবেশ রায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

পি. জি. ডি. জে. এম. সি—6ক, খ, খ(2) & গ
সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন
(স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা পাঠক্রম)

ষষ্ঠ পত্র—ক

পর্যায়
1

একক 1 ❑ কমিউনিটি বা সমাজে তথ্যের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব 9

একক 2 ❑ কমিউনিটি গণমাধ্যম 15

একক 3 ❑ কমিউনিটি সংবাদপত্রের রূপরেখা ও লেখা 22

একক 4 ❑ কমিউনিটি সংবাদপত্র পরিচালনা, পরিচালক-সম্পাদক সার্কুলেশন ও প্রচার 41

পর্যায়
2

একক 5 ❑ কেবল টিভি নেটওয়ার্ক ঃ ভূমিকা ও কার্যাবলি 49

একক 6 ❑ গোষ্ঠীভিত্তিক কেবল টিভির ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি 58

একক 7 ❑ অনুষ্ঠান সম্প্রচার পদ্ধতি 66

একক 8 ❑ গোষ্ঠীভিত্তিক কেবল টিভির বাজারীকরণ নীতি 73

ষষ্ঠ পত্র—খ

পর্যায়

1

একক 1	❑	বিজ্ঞাপনের সংজ্ঞা, বিবর্তন এবং ভূমিকা	83
একক 2	❑	বিজ্ঞাপন সংস্থার কাজকর্ম	118
একক 3	❑	বিজ্ঞাপনে ব্র্যান্ড বা ভাবমূর্তির গুরুত্ব	143
একক 4	❑	বিজ্ঞাপন গবেষণা	158
একক 5	❑	মাধ্যম পরিকল্পনা	169
একক 6	❑	বিজ্ঞাপন রচনা	188
একক 7	❑	রেডিও, টেলিভিশন এবং ইনটারনেট	235
একক 8	❑	বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত নীতি, আইন এবং সংগঠন	249

ষষ্ঠ পত্র—খ (২)

পর্যায়

2

একক 1	❑	জন-সংযোগের সংজ্ঞা, বিবর্তন ও ভূমিকা	263
একক 2	❑	জন-সংযোগ এবং অনুসারী ক্ষেত্র	279
একক 3	❑	নীতি, আচরণবিধি, কর্তব্য ও দায়িত্ব	285
একক 4	❑	জন-সংযোগ কাজকর্ম	299
একক 5	❑	জন-সংযোগের হাতিয়ার	308
একক 6	❑	সরকারের জন-সংযোগ, কেন্দ্র এবং রাজ্য	332
একক 7	❑	প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞাপন	344
একক 8	❑	জন-সংযোগের জন্য লেখা	362

ষষ্ঠ পত্র—গ
চলচ্চিত্র চর্চা

পর্যায় 1

একক 1 ❑ সিনেমার আদিপর্ব 373

একক 2 ❑ হলিউডের আদিযুগ 380

একক 3 ❑ সোভিয়েত মাস্টার্স 408

একক 4 ❑ ভারতীয় সিনেমা 423

একক 5 ❑ নিউ সিনেমা 433

পর্যায় 2

একক 6 ❑ গণজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসাবে সিনেমা 447

একক 7 ❑ সিনেমার ভাষা 458

পর্যায় 3

একক 8 ❑ চলচ্চিত্রের দৃশ্যাংশ, ক্যামেরা, আলো 470

একক 9 ❑ চলচ্চিত্র সম্পাদনা 509

একক 10 ❑ চলচ্চিত্রে শব্দ 539

পর্যায়
4

একক 11	❑	সাংবাদিক চিত্র ও সাময়িকী ও সংবাদদলিল চিত্র	548
একক 12	❑	তথ্যচিত্র-সিনেমা ভেরিতে ডাইরেক্ট সিনেমা	574
একক 13	❑	বিজ্ঞাপন চিত্র	599

একক ১ □ কমিউনিটি বা সমাজে তথ্যের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ সমাজে তথ্যের প্রয়োজনীয়তা

১.২.১ বাক্য গঠনমূলক তথ্য

১.২.২ শব্দার্থমূলক তথ্য

১.২.৩ বাস্তবধর্মী তথ্য

১.৩ ব্যক্তিগত মতামত তথ্য নয়

১.৪ তথ্যের আরও ভূমিকা

১.৫ সারাংশ

১.৬ অনুশীলনী

১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার সময় আপনারা জানতে পারবেন—

- কমিউনিটি সংবাদপত্র বলতে আমরা কী বুঝি?
- বৃহৎ সংবাদপত্রগুলির পাশাপাশি সমান্তরালভাবে প্রকাশিত কমিউনিটি সংবাদপত্রগুলির সমাজে গুরুত্ব কতখানি?
- কমিউনিটি সংবাদপত্রে সাংবাদিকতার বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র
- কমিউনিটি সংবাদপত্রে প্রচার ও বিজ্ঞাপন সংগ্রহ কৌশল
- জীবিকা হিসাবে কমিউনিটি সংবাদপত্র পরিচালনা।

১.১ প্রস্তাবনা

কমিউনিটি শব্দটির অর্থ এক জনসমষ্টি যাঁরা একই এলাকা বা একই শহর অথবা গ্রামে বাস করেন। এই একই সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে ঐক্যবোধ ও পারস্পরিক ভাবের আদানপ্রদানের মাধ্যম হিসাবে কমিউনিটি সংবাদপত্রের জন্ম।

পৃথিবীর সব দেশেই আদিতে ছিল শুধু কমিউনিটি সংবাদপত্র। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সমাজের বা পল্লীর মধ্যেই তার প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল। সংবাদপত্র সমাজের গণ্ডী পেরিয়ে সর্বব্যাপী হয়েছে অনেক পরে।

ভারতের প্রথম সংবাদপত্র দ্য বেঙ্গল গেজেট অর ক্যালকাটা অ্যাডভারটাইজার (সংক্ষেপে হিকির গেজেট, ১৮৮০ সালে প্রথম প্রকাশ) ছিল একটি কমিউনিটি সংবাদপত্র। কলকাতার ইংরেজ সমাজের মধ্যেই তার প্রচার মূলতঃ সীমাবদ্ধ ছিল।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিটি সংবাদপত্রের প্রচার নির্দিষ্ট নগর ও পল্লী সমাজের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। অধুনালুপ্ত শতবর্ষ ধরে প্রচারিত বিখ্যাত অমৃতবাজার পত্রিকা প্রথমে যশোহর জেলার গ্রাম থেকে কমিউনিটি সংবাদপত্র হিসাবে প্রকাশিত হত। পরবর্তীকালে ওই পত্রিকা আরও উন্নততর পরিকাঠামো ও পুঁজি নিয়ে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে ও কিছুকালের মধ্যে তা গণমাধ্যমে পরিণত হয়।

গণমাধ্যম তাকেই বলে যা গ্রাম, জেলা এমনকী রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে এক বৃহত্তর ভৌগোলিক সীমার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। গণমাধ্যমের পাঠকেরা যেহেতু পরস্পর বিচ্ছিন্ন সেহেতু তারা একে অপরের অপরিচিত। গণমাধ্যমের পরিচালকরাও তাঁদের এই শ্রোতাদের চোখে দেখতে পান না। তবে এই শ্রোতাদের মধ্যে একটা জায়গায় মিল। তাঁরা একই উদ্দীপক গ্রহণ করেন অর্থাৎ একই গণমাধ্যম পড়েন বা দেখেন যদিও তাঁদের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন।

অপরদিকে পল্লী-সংবাদপত্র বা কমিউনিটি সংবাদপত্রের পাঠকরা একটি বিশেষ এলাকা বা কোন একটি বিশেষ শহর বা গ্রামের অধিবাসী। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সম্পাদক ও প্রতিবেদকদের সঙ্গে তাঁরা অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত।

অবশ্য কমিউনিটি সংবাদপত্রের প্রচার যত বাড়ে ততই সে সম্পাদকের অপরিচিত পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু তার চরিত্র একই রকম থাকে।

এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য কমিউনিটি সংবাদপত্র সংবাদপত্রের ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা পেয়ে এসেছে। মেইনস্ট্রিম বা মূলপ্রবাহের সংবাদপত্রের পাশাপাশি কমিউনিটি সংবাদপত্র প্রকাশিত ও প্রচারিত হয় বৃহৎ সংবাদপত্রের পরিপূরক হিসাবে। বৃহৎ সংবাদপত্র বা গণমাধ্যম গ্রাম ছোট শহর ও বিভিন্ন সমাজের খুঁটিনাটি সমস্যার দিকে দৃষ্টি দিতে পারে না। কমিউনিটি সংবাদপত্র সেটা দিয়ে থাকে। এ কারণেই, বৃহৎ গণমাধ্যমের যুগেও কমিউনিটি সংবাদপত্রের চাহিদা রয়েই গিয়েছে।

১.২ সমাজে তথ্যের প্রয়োজনীয়তা

তথ্যের প্রয়োজনীয়তা ঃ

তথ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে গেলে প্রথমে জানতে হবে তথ্য কী? Webster-এর অভিধানে তথ্য বা Information-এর সংজ্ঞা দেওয়া আছে—তথ্য হল কোন কিছু সম্পর্কে জ্ঞান যা গবেষণা, পড়াশোনা, অভিজ্ঞতা ও তদন্তের মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়। কিন্তু সাংবাদিকতায় Information বা তথ্য বলতে বোঝায় একমাত্র সেইসব তথ্য যা খবর বলে গণ্য হতে পারে। সব তথ্যই খবর নয়। যেমন কমিউনিটি সংবাদপত্রের প্রচার এলাকার বাইরে ঘটে যাওয়া অবিরত তথ্য কমিউনিটি সংবাদপত্রের কাছে খবর নয়। যা নির্দিষ্ট সমাজের কাজে লাগে সেই সব তথ্যই খবর। এক কথায় যে এলাকার মধ্যে পত্রিকাটির প্রচার সেই এলাকার জনজীবনের পক্ষে আগ্রহ সৃষ্টিকারী সব তথ্যই খবর।

তবে গণজ্ঞাপন তত্ত্ব অনুসারে তথ্য বা Information-এর সংজ্ঞা হল, ব্যক্তিগত উপলব্ধির সঙ্গে সামাজিক বাস্তবতার সমন্বয়ে রচিত ঘটনা ও উপলব্ধি। এই সংজ্ঞাটি একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।

মানুষ তার নিজস্ব বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে অনেক কিছু উপলব্ধি করে। যেমন একটি আদিম উপলব্ধির কথা ধরা যাক ঃ আগুনের সাহায্যে কিছু পুড়িয়ে নিলে তা কাঁচা খাওয়ার চেয়ে সুস্বাদু হয়। এই উপলব্ধি থেকে (যা তার অভিজ্ঞতাজাত) মানুষ কাঁচা মাংস আগুনে ঝলসে খাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

এই সিদ্ধান্ত তখন তথ্যে পরিণত হল আগুনে ঝলসে খাওয়া মাংস সুস্বাদু। সহজেই হজম হয়। এই সিদ্ধান্তে আসার আগে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষেরা নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছে, তবেই সেটি তথ্যের আকারে সমাজ প্রচার করেছে। এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ধীরে ধীরে জ্ঞানের প্রসার ঘটেছে। যেমন মানুষ নানা রান্নার পদ্ধতি শিখেছে ও রন্ধন বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে। যে কোন বিজ্ঞানই বাস্তবসম্মত কতগুলি নিরীক্ষণ, ও পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সর্বজনগৃহীত কতগুলি তথ্য। এই তথ্যই বিশেষ জ্ঞান তথা বিজ্ঞান। বিখ্যাত জ্ঞাপনবিদ কলিন চেরির মতে তথ্য তিন ভাগে বিভক্ত। ১. বাক্য গঠন মূলক তথ্য, ২. শব্দার্থমূলক তথ্য ও বাস্তবধর্মী তথ্য।

১.২.১ বাক্য গঠনমূলক তথ্য

বাক্য গঠনমূলক তথ্যের সংজ্ঞা হল যে বাক্য দ্বারা অনিশ্চয়তা দূর করা যায় সেটাই তথ্য।

এই সংজ্ঞা অনুসারে তথ্যসম্বলিত বাক্য এমনভাবে রচিত হবে যার মধ্যে কোন ধন্ধ থাকবে না, অনিশ্চয়তা থাকবে না। যেমন, ধরা যাক একটি তথ্য ছাপা হল 'কোন একটি সংস্থা কমিউনিটি সংবাদপত্র নিয়ে অতি শীঘ্র এক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করছেন'।

এখানে অসম্পূর্ণ তথ্য দেওয়ার জন্য পাঠকেরা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন। 'প্রশিক্ষণ হচ্ছে' এটি একটি তথ্য। কিন্তু কবে কোথায়? কমিউনিটি সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা কীভাবে যোগ দিতে পারবেন এবং কারা এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছেন? এই বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়নি।

যতক্ষণ না এই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ তথ্য সম্পর্কে নানা অনিশ্চয়তা থেকে যাচ্ছে। তাই বাক্য গঠন এমনভাবে করতে হবে যাতে বাক্য অসম্পূর্ণ না হয়। তার মধ্যে অনিশ্চয়তা যেন না থাকে।

১.২.২ শব্দার্থমূলক তথ্য

এই তত্ত্ব অনুসারে তথ্যটি সর্বসম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য হতে হবে ও বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। সবাই যদি তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে একমত হন, তাহলেই তথ্যটি সত্য বলে প্রমাণিত হয়। যেমন আজকের তারিখ ১৭ এপ্রিল— এটি পঞ্জিকাতে রয়েছে। এটি সর্বস্বীকৃত তথ্য। আপনি ১৮ এপ্রিল লিখলে তা ভুল হয়ে যাবে।

এজন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত যে কোন সংবাদেরই বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণের প্রয়োজন হয়। হয় আপনি তথ্যের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, বিশেষজ্ঞ বা প্রত্যক্ষদর্শীকে কোট করুন বা ফোটোগ্রাফ দিন। অথবা তথ্যের সমর্থনে যত প্রমাণ থাকবে তথ্যটি ততই বিশ্বাস্য হবে।

বিখ্যাত ব্যক্তিদের মতামত তথ্য নয় তবে ব্যক্তিগত মতামতের একটি সংবাদমূল্য আছে কারণ কোন বিতর্কিত বিষয়ে জনগণ অন্যের মতামত জানতে আগ্রহী হয়ে পড়েন। তথ্য সুনির্দিষ্ট হতে হয়। যেমন গাড়ি চাপা

পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু—এই তথ্য সম্পূর্ণ নয়। কারণ লোকটি কে? কী নাম, কোথায় বাড়ি, বয়স কত? যতক্ষণ না এইসব তথ্য জানা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তথ্য সুনির্দিষ্ট হল না। শ্রোতার কৌতূহল নিবৃত্ত হল না। মনে করুন, একটি চিঠির ঠিকানা লেখার কথা। ঠিকানায় নাম যথেষ্ট নয়। ডাকঘর, বাড়ির নম্বর, পিনকোড না উল্লেখ করলে চিঠি পৌঁছবে না। তেমনি খবরের তথ্যও সম্পূর্ণ হওয়া চাই।

১.২.৩ বাস্তবধর্মী তথ্য

বাস্তবধর্মিতা তথ্যের একটি প্রধান গুণ। বাস্তবধর্মিতা অর্থে তথ্যের ব্যবহারের উপযোগিতা ও গুরুত্ব।

উদাহরণ ঃ

মালদহ সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে প্রায় প্রতিদিনই ডাকাতি হচ্ছে।

ডাকাতরা সীমান্তের ওপার থেকে এসে গরু বাছুর টাকা-পয়সা লুঠ করে থাকে।

গত এক মাসের মধ্যে মালদহে দশটি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আগামী ৯ জুন, সীমান্তের আইনশৃঙ্খলা সরেজমিনে দেখতে মালদহে আসছেন।

উপরের তথ্যগুলির মধ্যে প্রথম চারটি তথ্যের কোনও নতুনত্ব নেই মালদহবাসীর কাছে। কারণ এইসব খবর রোজই বেরুচ্ছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং আইনশৃঙ্খলা দেখতে আসছেন এটির মধ্যে নতুনত্ব আছে ও সমগ্র পরিস্থিতির গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। তাছাড়া প্রশাসনের কাছেও খবরটি গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই এই খবরটি বাস্তবধর্মী বলেই গুরুত্বপূর্ণ।

৪. তাহলে তথ্য হল **প্রয়োজনীয়, মূল্যবান, বিশ্বাসযোগ্য ও সুনির্দিষ্ট কোনও ঘটনা যা শ্রোতার যাবতীয় কৌতূহল প্রশমিত করে।**

লোকে তথ্য জানতে চায় নিম্নলিখিত কারণে।

* সাধারণ উদ্বেগ দমনের জন্য।
* কোন সিদ্ধান্তে আসার জন্য।
* অন্যের অথবা নিজের কোনও সুবিধের জন্য।
* নিজেকে বা অন্যকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য।
* নিছক জ্ঞানতৃষ্ণা প্রশমিত করার জন্য।

১.৪ তথ্যের আরও ভূমিকা

এছাড়াও তথ্যের কাজ হল উদ্বেগ দমন করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে মানুষকে সাহায্য করা ও ব্যক্তিগত সুবিধা পাওয়া।

উদ্বেগ দমন ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ তার প্রয়োজনীয় সঠিক তথ্য জানতে পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার উদ্বেগ প্রশমিত হয় না।

যেমন আপনি বাসে করে দুর্গাপুর থেকে দিঘা যাবেন।

আপনার এই তথ্য দরকার বাসটি কখন দুর্গাপুর থেকে ছাড়ে কখন দিঘা পৌঁছয়। বাসের ভাড়া কত? কোন অগ্রিম রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা আছে কি না।

অথবা একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি গুরুতর আহত অবস্থায় বাঁকুড়া সম্মিলনী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তিনি কীরকম আছেন? অথবা আপনি দার্জিলিঙ বেড়াতে যাবেন সেখানে আবহাওয়া কীরকম? রাস্তায় কোথাও ধস নেমেছে কিনা। এই ধরনের অসংখ্য তথ্য আপনার উদ্বেগ দূর করে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য ঃ তথ্য আপনাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। আপনি বিজ্ঞাপন দেখে কোন কোম্পানির টিভি কেনার জন্য আকৃষ্ট হলেন। কিন্তু আপনি টিভি সম্পর্কে আরও তথ্য চান। যেমন ছবি কীরকম আসে। গ্যারাণ্টি পিরিয়ড কত দিনের। টেঁকসই কতখানি। তুলনামূলকভাবে দাম কত? অন্যান্য টিভির সঙ্গে তুলনায় এই টিভি কতটা সুদৃশ্য এবং কতখানি আপনার প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম।

অথবা কোন প্রার্থীকে ভোট দেবার আগে প্রার্থী সম্পর্কে আপনার অনেক তথ্য জানা প্রয়োজন।

সমস্ত তথ্য সংগ্রহ শেষ হলে তবেই আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

অন্যের বা নিজের সুবিধা অর্জনের জন্য ঃ অন্যের বা নিজের সুবিধা ও সুযোগ সদ্ব্যবহার করতে গেলে চাই তথ্য। যেমন আপনি চাকরি খুঁজছেন, বাড়ি ভাড়া খুঁজছেন অথবা একটি সেকেণ্ড হ্যান্ড গাড়ি কিনবেন। এর জন্য যাবতীয় তথ্য আপনার দরকার। কোনো কোর্সে ভর্তি হবেন তার জন্যও চাই তথ্য। এমনকী কোন রেস্তোরাঁয় কী মেনু আছে বা শহরের ছবিঘরে কোন সিনেমা হচ্ছে তা জানার জন্যও তথ্য চাই। তেমনি দেশের উন্নয়নের হাল হকিকৎ জানতে আপনি আগ্রহী। সেজন্যও তথ্য দরকার।

নিজেকে বা অন্যকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করার জন্য ঃ নিজের ইচ্ছামত অপরকে কৌশলে নিয়ন্ত্রিত করাকে ইংরাজিতে বলে manipulation. প্রতিটি ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান দল ও সরকার চায় তাদের অনুকূলে পরিস্থিতি নিয়ে আসতে। সেজন্য কৌশলে অপরকে নিয়ন্ত্রিত করতে চায় তারা। এই manipulative কার্যকলাপের জন্য তথ্যের প্রয়োজন হয়।

ধরা যাক, আপনি চান আপনার সংবাদপত্র যেন প্রতিপক্ষের সংবাদপত্রের চেয়ে বেশি বিক্রি হয়। সেজন্য আপনি কতকগুলি নীতি গ্রহণ করতে চান। তার জন্য দরকার কতকগুলি তথ্য। যেমন প্রতিপক্ষ সংবাদপত্রের বিক্রি কত। কোন শ্রেণীর পাঠক সবচেয়ে বেশী। তাদের বিষয়বস্তু কী কী। সাধারণ পাঠকরা কোন ধরনের লেখা পছন্দ করেন। কোনও বিশেষ লেখকের প্রতি তাদের ঝোঁক আছে কি না।

নিছক জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণের জন্য ঃ জ্ঞান বা Knowledge-এর প্রাথমিক উপাদান তথ্য বা Information. এই তথ্যকে কেন্দ্র করে অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তিদের আরও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রাপ্ত বিশ্লেষণ, তত্ত্ব ও আলোকপাত আত্মস্থ করা ও তাকে নিজের মত করে উপস্থাপন করার ক্ষমতাই জ্ঞান। জ্ঞানী ব্যক্তি প্রচলিত জ্ঞানকে ভুল প্রতিপন্ন করে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নতুন জ্ঞান দিতে পারেন। কিন্তু কোন জ্ঞানই তথ্য ছাড়া হতে পারে না। কিন্তু জ্ঞান শুধু তথ্যপঞ্জী নয়। সংবাদপত্রে প্রচুর তথ্য থাকে কিন্তু সেগুলিকে সম্পূর্ণ জ্ঞান বলা যাবে না। ওই তথ্যগুলির সমন্বয়ে রচিত বিশ্লেষণ জ্ঞান রাজ্যে নতুন আলোকপাত করতে সক্ষম। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক যখন কোন তত্ত্ব রচনা করেন তখন সেই তত্ত্ব কতকগুলি নিরীক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হতে হয়।

১.৫ সারাংশ

কমিউনিটি বা সমাজে তথ্যের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। তথ্য হল কোন কিছু সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান যা পড়াশোনা অভিজ্ঞতা ও তদন্তের মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়।

কিন্তু সাংবাদিকতায় তথ্য বলতে বোঝায় একমাত্র সেই সব তথ্য যা খবর বলে গণ্য হতে পারে।

তথ্য তিন ভাগে বিভক্ত ঃ বাক্য গঠনমূলক তথ্য, শব্দার্থমূলক তথ্য, বাস্তবধর্মী তথ্য। তথ্য উদ্বেগদমনে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। ব্যক্তিগত সুবিধা গ্রহণের জন্যও তথ্যের দরকার হয়।

ব্যক্তিগত মতামত তথ্য নয়।

১.৬ অনুশীলনী

- কমিউনিটি বলতে কী বোঝায়?
- সমাজে তথ্যের প্রয়োজনীয়তা কী?
- সাংবাদিকতায় তথ্য বলতে কী বোঝায়?
- তথ্যের বাস্তবধর্মিতার উপযোগিতা ও গুরুত্ব উদাহরণ সহ অলোচনা করুন?

১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

গণজ্ঞাপন—ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়
Mass communication and Journalism in India-D.S. Mehta.

একক ২ □ কমিউনিটি গণমাধ্যম

২.০ উদ্দেশ্য
২.১ প্রস্তাবনা
২.২ কমিউনিটি কী?
২.৩ কমিউনিটি বনাম গণসমাজ
২.৪ কমিউনিটি মাধ্যম ও সমাজে তার প্রভাব
২.৪.১ কমিউনিটি সংবাদপত্র ও লিটল ম্যাগাজিন
২.৫ পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিটি সংবাদপত্র
২.৬ দৈনিক কমিউনিটি সংবাদপত্র
২.৭ সারাংশ
২.৮ অনুশীলনী
২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার সময় আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন—

- কমিউনিটি কী?
- কমিউনিটি বা সমাজ বলতে যা আমরা বুঝি তার সঙ্গে গণ সমাজের (mass society) তফাৎ কোথায়?
- সমাজমাধ্যম তথা কমিউনিটি সংবাদপত্রের সমাজে প্রভাব কতখানি?
- পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিটি সংবাদপত্রগুলি সম্পর্কে কিছু পরিসংখ্যান।

২.১ প্রস্তাবনা

কমিউনিটি বলতে আমরা বুঝি সমাজ। সমাজ এক কথায় একটি ছোট এলাকা বা পল্লীতে বসবাসকারী এক জনগোষ্ঠী। যাদের সামাজিক স্বার্থ এক। যাদের সামাজিক আকাঙ্ক্ষা মোটামুটি এক। গোষ্ঠীগত স্বার্থ রক্ষার জন্য যারা পরস্পরের প্রতি সাযুজ্য বোধ করে। এই সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা যে মাধ্যমের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় তার একটি মাধ্যম সংবাদপত্র।

একই সামাজিক উদ্দেশ্য নিয়ে কমিউনিটি সংবাদপত্র রচিত হয় যার উদ্দেশ্য পরস্পরের মধ্যে জ্ঞাপনের আদানপ্রদান।

এই জ্ঞাপন এক সামাজিক মিথস্ক্রিয়া। কমিউনিটি সংবাদপত্র এই সামাজিক মিথস্ক্রিয়াকে (Social interaction) কে ত্বরান্বিত করে। এই ভাবে সমাজের সকলের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি হয়।

জ্ঞাপন ছাড়া সমাজ অচল। সমাজ তখন অনড় নির্জীব পদার্থ হয়ে থাকে। জ্ঞাপন তাকে গতিময়তা দান করে।

কমিউনিটি সংবাদপত্র সমাজকে বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন করে তার চলমানতা অক্ষুণ্ণ রাখে।

২.২ কমিউনিটি কী?

কমিউনিটি সংবাদপত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে সর্বপ্রথম আমাদের জানতে হবে কমিউনিটি কী?

আমরা প্রস্তাবনায় বলেছি মূলতঃ কমিউনিটি বলতে আমরা বুঝি একটি নির্দিষ্ট সমাজ যারা একই পল্লী বা শহরে বাস করেন এবং পরস্পরের মধ্যে একটি যোগসূত্র বজায় রাখেন।

সমাজতত্ত্বের ভাষায় কমিউনিটি হল, A local grouping within which people carry out a full round of life activities..... স্থানীয় ভাবে একটি জনসমষ্টির গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যেখানে মানুষ জীবনের পক্ষে উপযোগী যাবতীয় কাজকর্ম নির্বাহ করে থাকে। কমিউনিটির যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দ হয় না। সমাজ, পল্লী, অঞ্চল এই সব শব্দ দিয়ে একটি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত জনসমষ্টিকে বোঝানো হয়। কমিউনিটি আসলে একটি গোষ্ঠী। অনেক সময় একটি পল্লী বা শহরের সীমা অতিক্রম করেও একটি কমিউনিটি তৈরি হতে পারে। যেমন বঙ্গীয় মাহিষ্য সমাজ। এখানে বিভিন্ন জেলা ও শহরের মাহিষ্য সম্প্রদায়ের মানুষ একটি কমিউনিটি তৈরি করেছেন। অথবা রোটারি ক্লাব। এর সদস্যরা বিভিন্ন দেশের মানুষ হলেও সব সদস্যরা মিলে একটি কমিউনিটি।

এইভাবে একটি ধর্ম সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করেও একটি কমিউনিটি গড়ে উঠতে পারে। যেমন রামকৃষ্ণ মিশন। ভারত সেবাশ্রম সংঘ। কোনও একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় একটি রাষ্ট্রেও কমিউনিটি। আবার মোহনবাগান ক্লাব বা ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সদস্যদের নিয়েও গড়ে উঠেছে একটি কমিউনিটি।

সমাজতত্ত্ববিদরা বলেছেন কমিউনিটি হল (১) কিছু মানুষকে নিয়ে একটি গোষ্ঠী (২) তারা সকলে একটি নির্দিষ্ট এলাকার অধিবাসী। (৩) তারা প্রত্যেকে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। (৪) তাঁরা একটি বিশেষ কালচার বা সংস্কৃতির অধিকারী। তাঁরা একটি বিশেষ সামাজিক প্রথা অনুসরণ করেন। (৫) তারা পরস্পরের মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। (৬) তারা সংগঠিত ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোন কিছু করার ক্ষমতা ধরেন।

ওপরের সংজ্ঞাটি মেনে নিয়েও একটি কথা বলা যায় যে কমিউনিটির সদস্যরা সাধারণত একটি ছোট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে বাস করেন। কিন্তু তা বলে অন্য এলাকায় বসবাসকারী ব্যক্তি যদি ওই কমিউনিটির লোক হন তাহলে তিনিও ওই কমিউনিটির একজন বলেই গণ্য হতে পারেন। মোহনবাগানের কোন সদস্য কলকাতার বাইরেও থাকতে পারেন। সারা পৃথিবী জুড়েই রামকৃষ্ণ মিশন বা ভারত সেবাশ্রমের দীক্ষিত শিষ্যরা আছেন। তাঁরা সকলেই একই গুরুর উপাসক। একই ধর্মীয় নিয়ম পালন করেন। এখানে রামকৃষ্ণ মিশন ভক্তরা একই কমিউনিটি।

আবার মালদহ বা বালুরঘাট শহরের জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষই একই কমিউনিটি।

২.৩ কমিউনিটি বনাম গণসমাজ

প্রথমেই বলা হয়েছে কমিউনিটির সব সদস্যরা একই আদর্শ অথবা একই ভাবসূত্রে বাঁধা। কমিউনিটির যৌথ মঙ্গলই তাদের মঙ্গল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কমিউনিটির সদস্যরা পরস্পরকে চেনেন।

বড় শহরেও সবাই অনেককে চেনে। কিন্তু পল্লীগ্রামের পল্লীসমাজে সবাই সবাইকে চেনে। প্রাচীনকালে গ্রীসে নগররাষ্ট্র ছিল। অর্থাৎ এক-একটি নগর ছিল এক-একটি রাষ্ট্র। সে রাষ্ট্রে একটিই সমাজ ছিল যারা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত। এই সমাজে বিভিন্ন উপবিভাগ থাকতে পারে। কিন্তু মোটামুটি একটি শহরের নাম বলতেই বোঝাত সেই শহরের সামাজিক বৈশিষ্ট্যকে।

এখন বৃহত্তর জনসমষ্টি নিয়ে গঠিত একটি মেগাসিটিতে একটি মাত্র সমাজের কল্পনা করা অবাস্তব। এই সব শহরে অনেক ছোট ছোট সমাজ গড়ে ওঠে নাগরিকদের আলাদা আলাদা অভিরুচি ও সাংস্কৃতিমনস্কতাকে কেন্দ্র করে।

আধুনিক বিশাল নগরের সমাজকে এক কথায় বলে গণ সমাজ। এই সমাজে সাধারণত মানুষ পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এখানে যৌথ সমাজ বলে কিছু নেই। যে সব ছোট ছোট গোষ্ঠী-সমাজ আছে সেখানে বেশীর ভাগ নাগরিকই যোগ দেন না।

ধরা যাক এক বহুতল বাড়ি। সেই বাড়ির আবাসিকদের হয়ত একটি আলাদা সমাজ আছে। যেটি পুজোর সময়গুলিতে বেশ বোঝা যায়। কিন্তু বহুলোক হয়তো পুজোর তিন দিনও ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেন না। তাঁরা এই ছোট সমাজ থেকেও বিচ্ছিন্ন থাকতে ভালবাসেন। এই বিচ্ছিন্নতা গণসমাজের অন্যতম লক্ষণ।

গণ সমাজে জনসাধারণ যে যার নিজের ধান্দায় ব্যস্ত। সমাজবোধটাই তাঁদের মধ্যে অনুপস্থিত। সমাজকে তাঁরা জানেন শুধু টিভি ও সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে। সেটাই তাঁদের বাইরের সঙ্গে মিলনের বাতায়ন। এই সমাজ মুখ্যত অবয়বহীন, বিশাল এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এই সমাজকে বলা হয় গণসমাজ। আর এই সমাজকে প্রকাশিত করে গণমাধ্যম। গণমাধ্যম গণ সমাজে বাতায়নের কাজ করে।

এই গণমাধ্যমেরও আবার নিজস্ব চরিত্র আছে।

গণমাধ্যম গ্রাম শহরের সীমা অতিক্রম করে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। তার পাঠকরা নানা মতের। নানা জাতের। তারা পরস্পর ছড়িয়েছিটিয়ে থাকে। কেউ কাউকে চেনে না। শুধু গণমাধ্যমের মধ্যদিয়েই তারা চারপাশের সমাজটাকে দেখে। এই অবয়বহীন বিমূর্ত একটি ধারণাই আসলে গণসমাজ। গণমাধ্যম তার একটা অবয়ব দেয় যতটা পারা যায় একটা অস্পষ্ট ঐক্যসূত্র গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

২.৪ কমিউনিটি মাধ্যম ও সমাজে তার প্রভাব

আমরা এ পর্যন্ত জানতে পারলাম কমিউনিটি কী? জানলাম সমাজে তথ্যের প্রয়োজনীয়তা কত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তথ্য সমাজকে

* চলমান হতে সাহায্য করে। সমাজ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে তা অচলায়তনে পরিণত হয়। তাই সমাজের নিত্য পরিবর্তন প্রয়োজন। এই পরিবর্তন আসে চিন্তার মধ্য দিয়ে। তথ্য চিন্তাকে শক্তিশালী ও সুপরিণত করে। কমিউনিটি সংবাদপত্র কমিউনিটির সদস্যদের মধ্যে প্রচারিত হয় এবং প্রচারিত তথ্য পাঠককে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় করে তোলে।

* কমিউনিটি সংবাদপত্র প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে। ধরা যাক, উন্নত ধরনের চাষবাস, চাষের আধুনিক যন্ত্রপাতি। আধুনিক স্বাস্থ্যবিধি সবই জানতে গেলে প্রয়োজনীয় তথ্যের দরকার হয়।

কমিউনিটি সংবাদপত্র সেই তথ্য জানতে পাঠককে সাহায্য করে।

* কমিউনিটি সংবাদপত্র সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ভাবগত ঐক্য গঠনে সাহায্য করে। এই ঐক্যবোধের ফলে সমাজ সুসংহত হয়।

* কমিউনিটি সংবাদপত্র প্রতিশ্রুতিবান তরুণ লেখক গোষ্ঠী তৈরি করে। বহু প্রতিষ্ঠিত লেখক একদা তাঁদের প্রথম লেখা এই সব কমিউনিটি সংবাদপত্রে শুরু করেন।

২.৪.১ কমিউনিটি সংবাদপত্র ও লিটল ম্যাগাজিন

কমিউনিটি সংবাদপত্র ও লিটল ম্যাগাজিনের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। কমিউনিটি সংবাদপত্র মূলত সংবাদপত্র। সংবাদই তার প্রধান বিষয়। লিটল ম্যাগাজিন মূলতঃ ম্যাগাজিন। উভয়ের মধ্যে মিল হল দুটিরই প্রচার সীমিত এবং নির্দিষ্ট পাঠক গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ।

কমিউনিটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ট্যাবলয়েড আকারে। লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয় ক্রাউন অথবা বি-ফোর সাইজে। তবে অধিকাংশ লিটল ম্যাগাজিনই ক্রাউন সাইজে প্রকাশিত হয়। লিটল ম্যাগাজিনের রচনারীতি সিরিয়াস ধরনের এবং বিদগ্ধজনের উদ্দেশে রচিত। কিন্তু কমিউনিটি সংবাদপত্র গণমাধ্যমের রচনারীতিকেই অনুসরণ করে। সর্বসাধারণের উপযোগী সহজবোধ্য ভাষাই কমিউনিটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

কমিউনিটি সংবাদপত্রকে কী ক্ষুদ্র সংবাদপত্র বলা যায়?

গুণগতভাবে স্বল্প প্রচারের সংবাদপত্র মাত্রই ক্ষুদ্র সংবাদপত্র। কিন্তু প্রেসকমিশনের শ্রেণী বিন্যাস অনুসারে ২৫০০০ প্রচার পর্যন্ত সমস্ত সংবাদপত্রকেই ক্ষুদ্র সংবাদপত্র আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

আমাদের দেশে কোন কমিউনিটি সংবাদপত্রের প্রচার দশহাজারের বেশি নয়। সাধারণত কমিউনিটি সংবাদপত্রের যথার্থ প্রচার সংখ্যা ৫০০ থেকে ৫ হাজারের মধ্যে থাকে।

ক্ষুদ্র সংবাদপত্র বৃহৎ সংবাদপত্রেরই ক্ষুদ্র বা প্রাথমিক সংস্করণ। ক্ষুদ্র সংবাদপত্র প্রধানতঃ দৈনিক প্রকাশিত হয়। প্রচার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র সংবাদপত্র মাঝারি ও মাঝারি সংবাদপত্র বৃহৎ সংবাদপত্রে পরিণত হয়। আনন্দবাজার পত্রিকা, অমৃতবাজার পত্রিকা ক্ষুদ্র সংবাদপত্র হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু কমিউনিটি সংবাদপত্রের চরিত্র তার নিজস্ব। কমিউনিটি সংবাদপত্র কখনও বৃহৎ সংবাদপত্র হবার স্বপ্ন দেখে না।

সে তার প্রচার বাড়াতে চায় তার নিজস্ব চৌহদ্দির মধ্যে থেকেই। কারণ আঞ্চলিকতা বিসর্জন দিলে সে আর কমিউনিটি সংবাদপত্র থাকবে না। দ্বিতীয়ত সে তার গোষ্ঠীর বাইরে যেতে চায় না।

২.৫ পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিটি সংবাদপত্র

পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঠিক কতগুলি কমিউনিটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় তার সঠিক তথ্য পাওয়া মুশকিল, কারণ অর্থাভাবে বা পরিচালনার অভাবে কমিউনিটি সংবাদপত্রের মৃত্যু নৈমিত্তিক ঘটনা। আবার এই ধরনের সংবাদপত্রের নিত্যনতুন প্রকাশও অব্যাহত।

ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো বা পিআইবি-র কাছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত মোট আঞ্চলিক সংবাদপত্রের তালিকা আছে। এই তালিকায় আছে সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক। কিন্তু এই তালিকা অনুসারে তথ্যের জন্য সবাইকে চিঠি পাঠিয়ে দেখা গেছে অনেকগুলি কাগজেরই এখন আর অস্তিত্ব নেই।

দুহাজার সালে ভারত সরকারের রেজিস্ট্রার্ড অব নিউজ পেপারের তালিকায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রকাশিত ১০৬৯৪টি সংবাদপত্রের নাম আছে যেগুলি ছোট শহর থেকে প্রকাশিত। ইংরাজি সহ ১৮টি ভারতীয় ভাষায় এগুলি প্রকাশিত হয়।

১৯৯০ সালে পশ্চিমবঙ্গ গণমাধ্যম কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত সমস্ত সংবাদপত্রের একটি তালিকা প্রকাশ করেন।

এই তালিকা অনুসারে বিভিন্ন জেলাগুলি থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সংখ্যা হল,

দক্ষিণ ২৪ পরগনা	২১
উত্তর ২৪ পরগনা	৫৮
হাওড়া	১৭
হুগলি	২৪
নদীয়া	৪৩
বর্ধমান	৭৬
বাঁকুড়া	৩০
পুরুলিয়া	১৭
মেদিনীপুর	৮৩
বীরভূম	২৫
মুর্শিদাবাদ	৩৫
মালদহ	১৬
পশ্চিম দিনাজপুর	৪১
কুচবিহার	১৯
জলপাইগুড়ি	১৬
দার্জিলিঙ	২২
মোট	৫৪০

ওই তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পরেও আরও গ্রামীণ সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে। আবার অনেক পত্রিকা তালিকাভুক্ত হয়ও নি। তবে তালিকাটি থেকে বলা যেতে পারে এই মুহূর্তে এই রাজ্যে ৬০০ বা তার কাছাকাছি জেলা সংবাদপত্র আছে যাদের কমিউনিটি সংবাদপত্র বলা যায়। এদের প্রচার এক হাজার থেকে পাঁচ হাজারের মধ্যে।

২.৬ দৈনিক কমিউনিটি সংবাদপত্র

কমিউনিটি সংবাদপত্র দৈনিকও হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মফঃস্বল শহর থেকে প্রকাশিত কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাগুলি চরিত্রগত ভাবে কমিউনিটি পত্রিকা। এরা সারা রাজ্যের খবর প্রকাশ করে না। সর্বভারতীয় খবর প্রকাশেও এদের আগ্রহ নেই। কমিউনিটির খবরের মধ্যেই এরা নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে। কাঁথি থেকে প্রকাশিত দৈনিক তীরভূমি এই দৈনিক পত্রিকাগুলির একটি মডেল।

৬ জুন ২০০৩ তারিখের তীরভূমি পত্রিকাটির প্রথম পৃষ্ঠার খবরগুলি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

প্রথম লিড তিন কলম

কাঁথিতে মোবাইল চাহিদা বাড়ছে। বসবে আরো একটি বি টি এস।

৪ ও ৫ কলম জুড়ে ২ কলমের একটি বক্স ঃ পাওয়ার টিলার চালকের মর্মান্তিক মৃত্যু। ৬ ও ৭ কলম জুড়ে দু কলমের আর একটি খবর-পাঁউশী বাজারে সি পি আইর দুটি দোকান লুঠ করলো সি পি এম। প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলমের একটি চাঞ্চল্যকর খবর ঃ

বেলপাহাড়ীতে জনযুদ্ধ গেরিলারা প্রকাশ্য সভায় এম নেতাকে মৃত্যুদণ্ড দিল।

প্রথম পৃষ্ঠার অন্যান্য খবর ঃ

১। কাঁথির বিদ্যুৎ সাব স্টেশনও নড়বড়ে

২। বঙ্গে বর্ষার সম্ভাবনা

৩। বর্ষায় পৌর এলাকায় জল জমতে দেবে না পুরসভা।

৪। একপশলা বৃষ্টিতে ফের স্বস্তির ছোঁয়া।

৫। ভগবানপুরে শান্তি ফেরাতে প্রশাসনের সর্বদলীয় বৈঠক।

৬। ঝাড়গ্রামে স্কুলশিক্ষক গুলিতে নিহত।

৭। এবার রাজ্য কবিতা উৎসব হলদিয়ায় আয়োজনে মন্ত্রীর উদ্যোগ

৮। যানজট মোকাবিলায় কাঁথিতে অভিযান অব্যাহত

৯। বসন্তিয়ায় সি পি এমের গোষ্ঠী সংঘর্ষ, গ্রেপ্তার ৭

১০। পাইপ ফেটে যাওয়ায় গোপীনাথপুরে পানীয় জল সংকট

১১। ৪ বুথের ২২ জন ভোটার পরিচয়পত্রের ছবি তুললেন।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ফিচারধর্মী কয়েকটি লেখা ও সম্পাদকীয়।

ফিচারধর্মী লেখাগুলির মধ্যে একটি সরকারি কর্মীদের নয়া পেনশন প্রকল্প ও আর একটি চুক্তিতে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে। ওপরে একটি ভাল খবর ঃ জেলা ও মহকুমা আদালতে শতাধিক বিচারকপদ শূন্য।

চতুর্থ পৃষ্ঠায় আইন আদালতের খবর অন্তত আটটি। চতুর্থ পাতায় বেশীর ভাগটাই বিজ্ঞাপন। কিন্তু কিছু নির্বাচিত খবর ; যেমন—পাঁশকুড়ায় বিষধর সাপের উপদ্রব/কোন জাতির পৃথক সত্তার দাবি। কাঁথি বিজ্ঞান মঞ্চের পরিবেশ দূষণ বিরোধী প্রচার।

এই পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য এঁরা সংবাদ নির্বাচনে তথ্যভিত্তিক কড়া খবর বা Hard news-কে প্রাধান্য দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত চার পৃষ্ঠার ২৮ কলমের এই পূর্ণ দৈর্ঘ্যের পত্রিকাটিতে পঠিতব্য বিষয় প্রচুর। কোনক্রমে অবান্তর ও অপাঠ্য লেখা দিয়ে পত্রিকা ভরাট করা হয়নি।

২.৭ সারাংশ

কমিউনিটি হল একটি নির্দিষ্ট সমাজ—যারা একই পল্লী শহর বা গ্রামের অধিবাসী অথবা ধর্মগোষ্ঠী ও সংখ্যালঘু ভাষাভাষী হিসাবে পরস্পরের প্রতি ভাবগত ঐক্য অনুভব করে।

কমিউনিটি একটি ছোট সমাজ। অথবা কোথাও এই সমাজ সম্প্রসারিত হলেও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া থেকেই যায়। গণসমাজের মত এখানে সমাজের মানুষ পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়।

কমিউনিটি মাধ্যম হল কমিউনিটি সংবাদপত্রগুলি। সমাজে তার প্রভাব যথেষ্ট।

এই সংবাদপত্রগুলি সমাজকে চলমান হতে সাহায্য করে। তাকে সজীব করে। প্রযুক্তি হস্তান্তরে সাহায্য করে ও মানুষের মধ্যে ভাবগত ঐক্য সাধনে সাহায্য করে।

২.৮ অনুশীলনী

১। গণসমাজে কমিউনিটি তার আত্মপরিচয় হারিয়ে ফেলে এ কারণে বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়—আলোচনা করুন।

২। সমাজে কমিউনিটি মাধ্যমের প্রভাবের মূল্যায়ন করুন।

৩। পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিটি সংবাদপত্র এই পর্যায়ে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন।

২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। পশ্চিমবঙ্গের পত্র-পত্রিকা ঃ গণমাধ্যম কেন্দ্র।

২। বিষয় সাংবাদিকতা ঃ ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ৫ম সংস্করণ লিপিকা

একক ৩ □ কমিউনিটি সংবাদপত্রের রূপরেখা ও লেখা

৩.০ উদ্দেশ্য
৩.১ সংবাদপত্র কী?
৩.২ তথ্য ও সংবাদের প্রভেদ
৩.৪ আগ্রহসৃষ্টিকারী সংবাদের নমুনা
৩.৫ কমিউনিটি সংবাদপত্রের জন্য কীভাবে লিখবেন
৩.৬ খবর কোথায় পাবো?
৩.৭ কমিউনিটি সংবাদপত্রের খসড়া
৩.৮ কমিউনিটি সংবাদপত্রের দায়িত্ব
৩.৯ সারাংশ
৩.১০ অনুশীলনী
৩.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০. উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা বুঝবেন কমিউনিটি সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য হল সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের জন্য চিত্তাকর্ষক খবর পরিবেশন করা।

কমিউনিটি সংবাদপত্র চরিত্রগতভাবে সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ কমিউনিটি সংবাদপত্রের লক্ষ্যশ্রোতা বা target audience একটি বিশেষ সমাজের লোকজন। সেই বিশেষ সমাজের মানুষের বিশেষ রুচি ও প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে কেমন করে কমিউনিটি সংবাদপত্রের খবর নির্বাচন করতে হয় সেটি এই এককে দেখানো হবে।

এই এককে আপনারা আরও দেখবেন শুধু নিছক তথ্য খবর নয়। তথ্যকে নতুন হতে হবে এবং তাকে আকর্ষণীয় করে প্রকাশ করতে হবে।

খবর প্রকাশের আগে তার একটি কাঠামো করে নিতে হবে। তাকে বলে খসড়া ও ডামি। এই এককে আমরা খবরের ডামি করাও শেখাবো।

৩.১ সংবাদপত্র কী?

সংবাদপত্র হল সংবাদ-প্রধান পত্রিকা যা অন্তত মাসে দুবার প্রকাশিত হবে। এই পত্রিকা মুদ্রিত হতে হবে এবং দাম দিয়ে সাধারণ মানুষ তা কিনতে পারবেন অথবা বিনামূল্যে বিতরিত হলেও তা যে কোন ব্যক্তি সহজে পেতে পারবেন।

কমিউনিটি সংবাদপত্র একটি নির্দিষ্ট জনসমাজের মুখপত্র। এই পত্রিকা গ্রাম ও শহর দু জায়গা থেকেই প্রকাশিত হতে পারে। মেট্রোপলিটন শহরের কোন বিশেষ ওয়ার্ড বা পল্লী থেকে কমিউনিটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় আবার জেলা মহকুমা শহর এমনকী গ্রাম থেকেও কমিউনিটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। তাকে গ্রামীণ সংবাদপত্রও বলা হয়ে থাকে। সংবাদপত্র নিউজপ্রিন্টে ছাপা হয় কারণ নিউজ প্রিন্টে ছবি ভাল ছাপা হয়। দামেও তা সাদা কাগজ থেকে শস্তা।

কমিউনিটি সংবাদপত্র আসলে সংবাদপত্র। সংবাদপত্রের প্রধান উপজীব্য সংবাদ। সংবাদ বা সন্দেশ অর্থে তথ্য বা Information. কিন্তু Information মাত্রই সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী সংবাদ নয়।

সংবাদের কতকগুলি নিজস্ব চরিত্র আছে। এই চরিত্র অনুসারেই চিনে নিতে হয় কোনটি সংবাদ আর কোনটি সংবাদ নয়।

নিচের বিবৃতিগুলি তথ্য অথচ সংবাদ নয়।

১. মহাত্মা গান্ধী ১৮৬৯ সালে গুজরাতের পোরবন্দরে জন্মগ্রহণ করেন।

২. পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে।

৩. জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচুর আম পাওয়া যায়।

ওপরের তিনটিই অবিকৃত তথ্য। কিন্তু তা সংবাদ নয়। কারণ তার মধ্যে কোনও নতুনত্ব নেই।

যদি বলা যেত ঃ

১. নতুন গবেষণার ফলে জানা গেছে গান্ধীজী পোরবন্দর নয়, রাজকোটে জন্মেছিলেন।

২. রাশিয়ার বিজ্ঞান আকাদেমির একজন সৌরবিজ্ঞানী প্রমাণ করেছেন টলেমি প্রথম শতাব্দীতে যে তথ্য প্রচার করেছিলেন অর্থাৎ সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী আবর্তিত হচ্ছে সেটাই ঠিক।

৩. এবার জ্যৈষ্ঠ মাসের ঝড়ে সব আম পড়ে গিয়ে আমের বাজারে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে।

ওই খবরগুলি যদি সত্য হত তাহলে খবর হত কারণ তাদের মধ্যে নতুনত্ব আছে।

তাহলে খবর হল ঃ

নতুন কোন তথ্য। NEWS বলতেই তো New কথাটা এসে যায়।

কিন্তু শুধু নতুনত্ব থাকলেই চলে না।

খবর হতে গেলে আরও দরকার হয় ঃ

নৈকট্য ও সাধারণের আগ্রহ।

নৈকট্য মানে খবরটি কোথাকার, কত দূরে ঘটেছে। কমিউনিটি সংবাদপত্রের পক্ষে এই নৈকট্য আরও জরুরী।

কারণ কমিউনিটি সংবাদপত্রের বৈশিষ্ট্য হল তা কমিউনিটি অর্থাৎ পল্লীর খবরাখবর নিয়েই ভর্তি থাকবে। কান্দীবান্ধবে প্রাধান্য পাবে কান্দীর খবর। অথবা আরামবাগ পত্রিকায় প্রাধান্য পাবে আরামবাগ তথা সন্নিহিত অঞ্চলের খবর। উদাহরণ হিসাবে অর্ধসাপ্তাহিক আরামবাগ পত্রিকার ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪১০ তারিখের পত্রিকার খবরাখবরগুলি দেখা যাক।

লিড ১. তারকেশ্বরে যুবক ছুরিকাহত।

২. দিনদুপুরে আরামবাগ গৌরহাটি মোড় রণক্ষেত্র।

৩. আরামবাগের ল্যাবরেটরিতে ভাঙচুর।

৪. ভঞ্জিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমুল বিজেপির জামানত জব্দ।

৫. আরামবাগে অজ্ঞাত পরিচয় লাশ।

ওপরে যে খবরগুলি উল্লেখ করা হল তা শুধু প্রথম পাতার খবর। এই পত্রিকাটি ট্যাবলয়েড সাইজের চারপৃষ্ঠার। খবর চয়নে আরামবাগ তথা হুগলি জেলাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

কমিউনিটি সংবাদপত্রে বিশ্বসংবাদ কেন রাজ্যের সংবাদও কেউ প্রত্যাশা করেন না।

যে যে বিষয়গুলি নিয়ে কমিউনিটি সংবাদপত্রের খবর হতে পারে তার একটি মোটামুটি তালিকা দেওয়া হল।

১. স্থানীয় রাজনীতি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির কাজকর্ম।

২. পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়নের খবর।

৩. এলাকাভিত্তিক সরকারি নানা প্রকল্প ও উন্নয়নের খবর। সূত্র বিডিও অফিস, পঞ্চায়েত অফিস, জেলা পঞ্চায়েত অফিস। যদি পত্রিকাটি জেলা শহর থেকে প্রকাশিত হয় তাহলে খবরের সূত্র আরও বিস্তৃত হয়।

৪. আইন শৃঙ্খলা, থানা সূত্র।

৫. শিক্ষা সংক্রান্ত খবর, সূত্র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

৬. সমাজসেবী সংস্থাগুলির কাজকর্ম।

৭. শিল্প ও কৃষি, সূত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী সমিতি।

বিনোদন ঃ গ্রামের যাত্রা। নাট্যগোষ্ঠী, জলশা, বিনোদন।

খেলাধুলা ঃ জেলা শহরে স্টেডিয়ামে নানাধরনের খেলা হয়। গ্রাম থেকে বহু টিম জেলায় খেলতে যায়। অ্যাথলেটিক্স, প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের খুঁজে বার করা।

বিজ্ঞান ঃ এলাকায় বিজ্ঞান মঞ্চ, বিজ্ঞান ক্লাব থাকলে তাদের কাজকর্ম।

এ ছাড়া নানা শিল্প, প্রদর্শনীর খবর।

হিউম্যান ইন্টারেস্ট বা মানুষের আগ্রহ জাগানো খবর। এই খবরগুলি খুঁজে বার করার মধ্যে সাংবাদিকের দেখার চোখ ও সৃষ্টিশীল মনের দরকার হয়।

আরামবাগ পত্রিকা গতানুগতিকতার বাইরে জনসাধারণের আগ্রহসৃষ্টিকারী কতগুলি খবর প্রকাশ করেছেন।

এই খবরগুলিতে দেখা যাবে ছোট শহরেও হিউম্যান ইন্টারেস্ট স্টোরির কোন অভাব নেই।

কয়েকটি সাধারণের আগ্রহসৃষ্টিকারী প্রকাশিত খবরের নমুনা আরামবাগ পত্রিকা থেকে দেওয়া হল। তবে খবরগুলি আরও ভাল করে লেখা যায়।

৩.৪ আগ্রহ সৃষ্টিকারী সংবাদের নমুনা

প্রেমিকের কাছ থেকে মেয়েকে ফেরাতে পায়ে পড়ল বাবা
সবার উপরে প্রেম সত্য তাহার উপর নাই।

সজল সামন্ত

প্রেম জীবন, প্রেম মরণ, প্রেমে পড়েই পলায়ন। হ্যাঁ প্রেমকে জীবন ও প্রেমকে মরণ হিসাবে আঁকড়ে ধরে প্রেমিকের কাছে চলে এল এক প্রেমিকা। ভিন্ন রাজ্যের ঐ প্রেমিকা আজ গৃহবধূ। সুখ শান্তিতে ঘর করছে এই রাজ্যের গোঘাট থানার রঘুবাটিতে। প্রেমিকার বাপের বাড়ি উড়িষ্যার বড়গড়ের স্টেশন রোডে। সবার উপরে

প্রেম সত্য তাহার উপরে কোন কিছু নয়। এই ধ্যান-ধারণাকে মাথায় রেখে প্রেমিকা প্রতিমা পাণ্ডে বর্তমানে স্বপ্না নাগা তার স্বামী বিশ্বজিৎ নাগাকে জীবন মরণ করে বাঁচতে চাইলেও বাধ সাধল তার বাবা অধিশ পাণ্ডে ও মাতা রাজমতি পাণ্ডে। গত সেপ্টেম্বরে স্বপ্না বাড়ি ছেড়ে প্রেমিকের হাত ধরে পাড়ি দেয় পশ্চিমবঙ্গে। তাঁর বাবা-মা মেনে নেয়নি এই বিয়ে। ফলস্বরূপ উড়িষ্যা থেকে নিজেদের রুজিরোজগার ও ব্যবসা ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে বিশ্বজিৎ ও তার প্রেমিকাকে। এতেও ক্ষান্ত হয়নি তার বাবা-মা। বিভিন্ন সময় তারা মেয়েকে ফিরিয়ে নিতে এসেছে গোঘাটে। কিন্তু কোনবারেই মেয়ে স্বপ্না তার ভালবাসাকে ছোট করেনি। এদিকে উড়িষ্যা থেকে মেয়ের মা-বাবার বার বার আগমন ও সংসারের অভাব অশান্তিতে বিশ্বজিতের মা-বাবা আত্মঘাতী হতে যায়। ঘটনাচক্রে মা রাস্তার সামনে হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়ে গেলেও লরির চাকায় মাথা দিয়ে বাবা দুলাল নাগা আত্মহত্যা করেন গত ২২ নভেম্বর। যে সংবাদ আরামবাগ পত্রিকার ২৬ নভেম্বর ২০০২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই ভাবেই সময় নদীর স্রোতের মতো বয়ে গেলেও মেয়েকে ভুলতে পারেননি অধিশবাবু। মেনে নিতেও পারেননি জামাই বিশ্বজিৎকে। অবশেষে শেষ চেষ্টা করে দেখতে গোঘাট পুলিশের দ্বারস্থ হন গত ৩১ জানুয়ারি শুক্রবার। অধিশবাবু সঙ্গে এনেছিলেন হাওড়া এলাকার এক বিধায়ক লগন দেও সিং-এর চিঠি। যোগাযোগ করেছিলেন জেলা পুলিশ সহ বিভিন্ন স্থানে। এর পর ঐ দিনই গোঘাট ওসি রবিশঙ্কর রায়, এস ডি পি ও দিলীপকুমার আদক সহ দুই পরিবারের মধ্যে রুদ্ধশ্বাস আলোচনা চলে মহকুমা পুলিশ অফিসারের কক্ষে। মেয়ের মা-বাবার কাতর আবেদন ও অসহায় অবস্থা দেখে সবাই মেয়েকে ফিরে যেতে বলে। এরপর আলোচনা স্থল থেকে বেরিয়ে গেটের বাইরে মেয়ের সাথে কথা বলেন তার মা ও বাবা। এক সময় হঠাৎ মেয়ের বাবা, মেয়ের পা ধরে তাকে ফিরে যেতে বলে। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কা বি এ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী তাতেও হার মানেনি। সে তার প্রেমকে রাখে সবার উপরে। স্বভাবতই প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের ভালবাসার কাছে হার মেনে যায় পুলিশ অফিসারেরাও। শেষে মেয়ের সিদ্ধান্ত ও জেদকে মেনে নিতে হয় সবাইকে। মেয়ের বাবা-মাকে শুধু হাতেই ফিরে যেতে হয় উড়িষ্যায়। উড়িষ্যা না লিখে ওড়িষা লেখা উচিত। তবে ছেলের বাড়ির পক্ষ থেকে বলা হয় মেয়ের মা-বাবার জন্য তাদের বাড়ির দরজা খোলা থাকবে।

৪.২.২০০৩

পশ্চিমের ভ্যালেনটাইন আজ গ্রামেগঞ্জেও!

ধর্মনিরপেক্ষ গরীব ভারতবর্ষের কঠিন বাস্তব তার পাথর ছুঁড়ে প্রতিনিয়ত ভাঙ্গছে রূপকথার কাঁচের ঘর। হিংসা, বিদ্বেষ, কাটা-কাটি, হানা-হানি, খুন-ধর্ষণ-এতো নিত্যকার ঘটনা। তবুও পিছিয়ে নেই ভালবাসা। আজকের ভ্যালেনটাইন তার নিদর্শন। পাশ্চাত্যের ভ্যালেনটাইন আজ ছড়িয়ে পড়েছে কৃষ্ণ-রাধার ভারতবর্ষেও। শুধু ক্যালকাটা, মুম্বাই, ডেলহি আর চেন্নাই নয়, আজকের ভ্যালেনটাইন কতটা জায়গা করে নিয়েছে মফস্বল থেকে গ্রামেগঞ্জেও?

—লিখছেন সাংবাদিক সজল সামন্ত ও পল্লব পাল

আজ ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেনটাইনস ডে। যাকে নাকি এক কথায় বলে বিশ্ব প্রেম দিবস। আজকাল বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি ইনিয়ে বিনিয়ে এমন প্রচার শুরু করেছে যে ভ্যালেনটাইনস ডে আজ এক আন্তর্জাতিক উৎসবের চেহারা নিয়েছে। আর এই উৎসবকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন আইটেমে এখন ভ্যালেনটাইনের ছোঁয়া। পশ্চিমী দুনিয়ার ঐ দিনটি আজ গ্রাস করেছে ভারতবর্ষকেও। গ্রাস করেছের বদলে লিখুন : প্রভাব ফেলেছে ভারতবর্ষের মফস্বল শহরেও। জানা গেছে, সেন্ট ভ্যালেনটাইনের এক খণ্ড চিঠিকে কেন্দ্র করে

১৪ ফেব্রুয়ারী প্রেমিক-প্রেমিকা সহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ একে অপরে মন দেওয়া-নেওয়ার নেশায় মেতে ওঠে। ১৪ ফেব্রুয়ারী কি ভাবে মন দেওয়া-নেওয়ার পরব হয়ে উঠল তা সঠিক ভাবে এখন জানা যায় নি। তবে বিভিন্ন গবেষকদের তথ্য থেকে যেটুকু জানা যায় তা হল সপ্তদশ শতকে এই দিনটিতে হাতে লেখা প্রেমপত্র দেওয়ার চল শুরু হয়েছিল। আর ছাপানো গ্রিটিংস কার্ড দেওয়া শুরু হয়েছিল তারও প্রায় দেড়শ বছর পর। ভারতবর্ষের নতুন জেনারেশনকে এই দিনটি আজ গ্রাস করে ফেলেছে*। বিভিন্ন ভাবে নতুন জেনারেশনের মনের দরজায় নিউ ইয়ারের মত এও এক পরব। এক সমীক্ষায় জানা গেছে, কার্ড বিক্রিতে নিউ ইয়ারের পরেই স্থান দখল করে নিয়েছে ভ্যালেনটাইনস ডে। ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র মুম্বাই পশ্চিম দুনিয়ার সাথে কাঁধ মিলিয়ে চললেও দিল্লি, কলকাতা, চেন্নাই প্রভৃতি শহরগুলি কোন অংশে কম যায় না। কলকাতা ছাড়া বিগত ১০-১৫ বছর পূর্বে বিভিন্ন মফস্বল শহরে এই দিনটি সম্বন্ধে বেশীর ভাগ লোকের তেমন একটা ধ্যান-ধারণা ছিল না। বর্তমানে আরামবাগ, তারকেশ্বর, বিষ্ণুপুর, ঘাটাল, বর্ধমান প্রভৃতি শহরের তরুণ-তরুণীরা দিনটি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। আর ঠিক এই জন্যই এই সব শহরে কদিন আগে যে সব শো-কেসগুলোতে নিউ ইয়ার্স এর কার্ড কিম্বা গিফট্ আইটেম শোভা পেত এখন সেখানে শোভা পাচ্ছে ভ্যালেনটাইন স্পেশাল আইটেম। আরামবাগের বেশ কয়েকটি দোকানে তো দেখতে পেলাম লাভ সাইন আঁকা মালা, কার্ড, লাভ সাইনের বিভিন্ন গিফট আইটেমস, লাভ সাইনের ছোট ছোট কাট আউট, পিকচার স্ট্যাণ্ড, লাভ চিহ্ন খোদাই করা আছে বিভিন্ন ফুলদানিতেও। বাজারজুড়ে তাই এখন শুধু ভালবাসার হিড়িক।

[*গ্রাস করেছের বদলে লিখুন ঃ প্রভাব ফেলেছে ভারতবর্ষের মফঃস্বল শহরেও]

১৪.২.২০০৩

গরুকে কেন্দ্র করে ব্রজমোহনপুর বনাম বড়মা

সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ একটি গরুকে কেন্দ্র করে গোঘাট থানার সাওড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্রজমোহনপুর বনাম বড়মা গ্রামের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা দেখা দেয়। স্থানীয় মানুষের বিবরণীতে জানা গেছে, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি রাত্রে ব্রজমোহনপুরের রথতলাতে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলাকালীন বড়মা গ্রামের দুই যুবককে একটি গরু নিয়ে যেতে দেখে ব্রজমোহনপুরে কয়েকজন। যুবক দুটিকে গরু-চোর বলে মারধর করে। অন্যদিকে যুবক দু'টির বক্তব্য ছিল—গরুটি খুলে চলে যাচ্ছিল, আমরা ধরেছি। এই ঘটনার খবর পার্শ্ববর্তী বড়মা গ্রামে পৌঁছে গেলে কিছু লোক এসে ব্রজমোহনপুর দুলে পাড়ায় চড়াও হয়। ওই পাড়ার বাসিন্দাদের বিবরণীতে জানা গেছে, রাত্রেই বড়মার লোকেরা তাদের পাড়ায় ঢুকে মহিলাদের উপর অত্যাচার করে শ্লীলতাহানি করেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু'টি গ্রামের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা দেখা দেয়। মুসলিম-অধ্যুষিত বড়মার সঙ্গে হিন্দু-অধ্যুষিত ব্রজমোহনপুরের বাসিন্দাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ নিতে গেলে স্থানীয় সি পি এম নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে তা সম্ভব হয়নি। এদিকে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতাদের অভিযোগ—ঘটনার দিন সিরাজুল* সংবাদটিতে সিরাজুলের পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল। থাকা সত্ত্বেও খোকনদের মারধর করা হয়েছে এই অভিযোগে ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে বড়মা পার্টি অফিসে ডাকা হয় সিরাজুলকে। সিরাজুল পার্টি অফিসে পৌঁছানো মাত্রই তাকে মারধর করা হয়। আচমকা এ ঘটনায় সিরাজুল গুরুতর আহত হয়ে পড়ে এবং ব্রজমোহনপুরের বাসিন্দাদের সহযোগিতায় তাকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনায় সি পি এমের প্রতি বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে ফরওয়ার্ড ব্লকের দপ্তর থেকে। তাদের বক্তব্য, সি পি এমের মোসলেম বনাম গাজনের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জন্য ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মী-সমর্থকেরা মার খাবে কেন? প্রথম দিকে ফরওয়ার্ড ব্লক বনাম সি পি এমের এই সংঘর্ষের ঘটনা চেপে গেলেও গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ফরওয়ার্ড ব্লকের মন্ত্রী নরেন দে আহত সিরাজুলকে দেখতে আসায় সংঘর্ষের ঘটনা জানাজানি হয়ে যায়। অপরদিকে সি পি এমের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে সাধারণ মানুষকে বেশি হেনস্তা হতে হয়। সাধারণ মানুষ

বিচারের নামে প্রহসন পায়। বর্তমানে ওই দুই এলাকায় চাপা উত্তেজনা আছে। যে কোনো সময়ে বড় ধরনের সংঘর্ষ ঘটতে পারে। দুই শরিকই চাইছে আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের আগে যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে। কিন্তু উভয় দলের কর্মী-সমর্থকেরা এতটাই উত্তেজিত যে, গোটা গোঘাট থানা এলাকা আবার উত্তপ্ত হতে পারে।

[*সংবাদটিতে সিরাজুলের পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল]

রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত ছোট্ট ঐন্দ্রিলার বিশ্বজয়ের স্বপ্ন

বিশ্বরূপ চ্যাটার্জী, হুগলি ঃ ঐন্দ্রিলা নামের অর্থ জাদু। নামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একের পর এক জাদু দেখিয়ে চলেছে ছোট্ট ঐন্দ্রিলা। তার ছোট্ট আঙুলের জাদুতে যে কোনো জিনিস হয়ে উঠতে পারে প্রাণবন্ত। শিল্পী বিশ্বকর্মার অপূর্ব সৃষ্টি এই বিশ্বের এক কোনায় হয়তো মনে মনে বিধাতাকেও টেক্কা দেবার স্বপ্ন দেখছে ঐন্দ্রিলা। হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম ঐন্দ্রিলার। মাত্র ৩ বছর বয়স থেকে সে এগিয়ে চলেছে তার বিশ্বজয়ের স্বপ্নে। তার এই এগিয়ে চলার পথে মাত্র ১০ বছর বয়সেই সে জয় করে নিল রাষ্ট্রপতি পুরস্কার। গত ১৭ জানুয়ারি ২০০৩ দুপুর ১২টায় আঁকার জন্য শঙ্কর ইন্টারন্যাশানাল চিল্‌ড্রেন কম্‌পিটিশান্ ২০০২-এর পুরস্কার রাষ্ট্রপতির হাত থেকে তুলে নেয় ঐন্দ্রিলা। এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে ঐন্দ্রিলা বলে তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর এটা তার প্রথম পদক্ষেপ। এখনও তাকে অনেক পথ এগিয়ে যেতে হবে। ব্যাণ্ডেলের অক্সিলিয়াম কন্‌ভেণ্টের ছাত্রী সে। মাত্র ৩ বছর বয়সেই মা মিতালী দে চন্দননগরের আঁকার শিক্ষক দেবব্রত সেনের কাছে ভর্তি করেন মেয়েকে। মিতালী দে বলেন, আমি এক সময়ে দেবব্রতবাবুর কাছে আঁকা শিখতাম। আমার ইচ্ছা ছিল বড়ো কিছু হবার। কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারে জন্ম তাই এই শখ পূরণ হলো না। তবে তাঁর আশা মেয়ে তাঁর এই শখ পূরণ করবে। ঐন্দ্রিলাও বলে তার আঁকার জন্য তাকে উৎসাহ জুগিয়েছে মা মিতালী দে। তার কাছ থেকে জানা যায়, স্কুলের পড়াশোনার চাপের মধ্যেও সে দৈনিক ৩-৪ ঘণ্টা আঁকা অনুশীলন করে। এছাড়াও কম্পিউটারে আঁকতে সব থেকে বেশী ভালো লাগে বলে জানায় সে। আঁকা ছাড়া তার মাঝেমধ্যে টিভিতে খেলা দেখতে ভালো লাগে। রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়ে তার কেমন লাগছে জানতে চাওয়া হলে সে বলে ভালোই লাগছে তবে আমার লক্ষ্য আরও বড়ো কিছু করা। ঐন্দ্রিলার মা মিতালী দে বলেন, আমার ইচ্ছা আমার মেয়েকে ফ্যাশান ডিজাইনে আর্ট নিয়ে পড়ানোর। জানি না এ ব্যাপারে ও কতটা এগিয়ে যেতে পারবে। ঐন্দ্রিলার বাবা মানস দে বলেন, এব্যাপারে প্রথমে আমার সেরকম উৎসাহ না থাকলেও এখন বিভিন্ন জায়গায় পুরস্কার পাচ্ছে দেখে ভালো লাগছে। বিভিন্ন লোকের সাথে পরিচয়ও হচ্ছে। তাঁর আশা ঐন্দ্রিলা আঁকায় আরও এগিয়ে যাবে। মেয়ের বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখছেন শ্রীরামপুরের এই ছোট্ট পরিবার।

কান্দী থেকে প্রকাশিত কান্দীবান্ধব পত্রিকাটির ৭মে ২০০৩ সংখ্যায় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে প্রচুর টাকা খরচ হলেও অডিট হয়নি খবরটি দেখুন। এটি উন্নয়নমূলক খবরের একটি অঙ্গ। কারণ উন্নয়নমূলক খবর মানে উন্নয়নের ঢাক পেটানো শুধু নয়, উন্নয়নের সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা, অনিয়ম, দুর্নীতির খবরকেও তুলে ধরা।

পঞ্চায়েতের মাধ্যমে প্রচুর টাকা খরচ হলেও খরচের কোন অডিট হয়নি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর ঃ এ জেলার জেলা পরিষদে গত বছর কোন অডিট হয়নি। রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর অডিটের অগ্রগতি রিপোর্ট পাঠানোর জন্য জেলাকে চিঠি দিয়েছে কিন্তু জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে এ চিঠির কোন উত্তর দেওয়া হয়নি।

প্রতি বছরই জেলা পরিষদের মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরাট পরিমাণ টাকা খরচ হয়ে থাকে। সেই খরচের যথাযথ হিসাব না থাকায় ব্যাপক তছরূপও গরমিল হতে পারে এমন আশঙ্কা রয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের খরচের গরমিলকে জেলার বিরোধীরা প্রধান ইস্যু করেছে। কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি পঞ্চায়েতের দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছে। সাম্প্রতিক রাজ্য সরকারের রিপোর্ট থেকে বিরোধীরে অভিযোগ সরাসরি প্রমাণিত না হলেও অডিটের মাধ্যমে খরচের যথাযথ হিসাব না থাকায় ব্যাপক আর্থিক তছরূপ ও গরমিলের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

৭মে, ২০০৩

৩.৫ কমিউনিটি সংবাদপত্রের জন্য কীভাবে লিখবেন

সংবাদপত্রে লেখার যে রীতিনীতি আছে এবং আপনারা এই কোর্সের মাধ্যমে ইতিপূর্বে যা শিখেছেন সেটি কমিউনিটি সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আপনারা শিখেছেন খবরের নাক বা খবরবোধ কী। কোনটা খবর আর কোনটা খবর নয়, তা কীভাবে বুঝতে হয়। এই বোধের সহজ উপায় হল, নিজেকে জিজ্ঞাসা করা, আচ্ছা এই যে খবরটা লিখছি তা আমি পাঠক হলে পড়তাম তো। অর্থাৎ এই সংবাদটির আগ্রহবোধ সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে কি না। কোনও নতুন তথ্য বা অভিনবত্ব আছে কিনা। কারণ সব গণমাধ্যমই চায় তথ্য পরিবেশন করতে। কিছু নতুন শিক্ষা দিতে। অথবা বিনোদন বা আনন্দ দিতে। এর বাইরে তো সংবাদপত্রের কোন উদ্দেশ্য নেই। না আছে। সংবাদপত্রের চরম লক্ষ্য হল পাঠকের মনোজগতে একটা বাঞ্ছিত পরিবর্তন নিয়ে এসে গোটা সমাজটাকে বদলানো। সমাজের মানুষের মধ্যে গণতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক মেজাজ তৈরি করা। তবে কমিউনিটি সংবাদপত্রের আর একটা চ্যালেঞ্জ আছে। সেটি হল কমিউনিটি সংবাদপত্র যেখানে ছোট শহর থেকে প্রকাশিত হয় সেখানে খবর ঘটার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সবাই জেনে যায়। তাই অনেক সময় নতুনত্ব থাকে না। এজন্য খবরটিকে খুব ভালভাবে ও বিস্তৃতভাবে লিখতে হয়। আকর্ষণীয় করে লিখতে হয়। ভালভাবে পাতা সাজাতে হয়। তেমনি খবর হলে ছবিও দিতে হয়।

এছাড়া যতটা সম্ভব এক্সক্লুসিভ অর্থাৎ একান্ত নিজস্ব খবর প্রকাশ করতে হয়। তদন্তধর্মী খবর ও উন্নয়নমূলক খবর লেখার যথেষ্ট সুযোগ আছে কমিউনিটি সংবাদপত্রে। প্রতিটি খবরের বিশ্বস্ততা চাই। এজন্য বিতর্কমূলক খবরে সূত্র উল্লেখ করা ভাল অথবা ডকুমেন্ট হাতে রেখে দেওয়া ভাল। সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ নিয়ে অসংখ্য স্টোরি হতে পারে কমিউনিটি সংবাদপত্রে।

মালদহ সমাচার, ৪ জুন তারিখে সুজাপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের খবরটি দেখুন। এই রকম বহু খবর খুঁজে বার করা যেতে পারে।

শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের ১৭৮ জন সহায়িকা কর্মচ্যুত হচ্ছেন, উঠে যাচ্ছে ৪৯টি কেন্দ্র

জেলার ৪৯টি শিশু শিক্ষাকেন্দ্র উঠে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ১৭৮ জন কম যোগ্যতাসম্পন্ন সহায়িকাকেও চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হচ্ছে। ক্ষমতাসীন বামপন্থী মালদহ জেলা পরিষদ বোর্ড নিয়ম ভেঙে এ জেলায় বেশকিছু শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের অনুমোদন দিয়েছিল। নিয়োগ করা হয়েছিল দলের অনুগত কম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্নদের সহায়িকা পদে। রাজ্যসরকার সম্প্রতি এক সার্কুলার [নং এস পি-২১৩-০৩ (১৮) তাং ২০-৩-০৩] জারি করে এ জেলার ৪৯টি শিক্ষাকেন্দ্র বন্ধ ও ১৭৮ জন সহায়িকাকে বরখাস্তের নির্দেশ দেন। সরকারি ঐ নির্দেশে মহাফাঁপরে পড়ে

জেলা পরিষদ। ৩০মে জেলা পরিষদের শিক্ষা স্থায়ী কমিটির মিটিংয়ে এনিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অবশেষে জেলা শাসক সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ১৭৮ জন সহায়িকাকে মে মাসের বেতন চুকিয়ে দিয়ে বরখাস্তের জন্য জেলা পরিষদকে নির্দেশ দেন। উল্লেখযোগ্য, শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের সহায়িকা পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে স্কুল ফাইনাল বা মাধ্যমিক পাশ। কিন্তু জেলা পরিষদ বেনিয়ম করে যাদের নিয়োগ করে তাদের অধিকাংশই এইট বা নাইন পাশ। ফলে এদের সকলকেই চাকরি খোয়াতে হচ্ছে। এছাড়াও সরকারি নির্দেশ রয়েছে যে ১ কিলোমিটারের মধ্যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলে শিশু শিক্ষাকেন্দ্র খোলা যাবে না। এই ক্ষেত্রেই সরকারি নিয়মকে তোয়াক্কা না করে ঐ ৪৯টি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়। ৩০ তারিখের মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে ১ কিলোমিটারের বেশী দূরত্বে যদি ঐ শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে স্থানান্তর করা না হয় তাহলে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলিও বন্ধ হয়ে যাবে। মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক অশোককুমার বালা, সভাধিপতি শেফালি খাতুন, শিক্ষাস্থায়ী কমিটির কর্মাধ্যক্ষ সুশীল সিংহ সহ পদস্থ আধিকারিকবৃন্দ। গত ২০ মার্চ কলকাতা থেকে পঞ্চায়েত সচিবের ইস্যু করা সহায়িকাদের কর্মচ্যুত্য করার নির্দেশ এলেও, পঞ্চায়েত ভোটের কথা চিন্তা কোরে ভোটের আগে ঐ কড়া দাওয়াই প্রয়োগ করা হয়নি। তাহলে ভোটের ফল আরও খারাপ হত বলে অনেকের অনুমান।

মালদহ সমাচারে ৪ জুন ২০০২ আর একটি অভাব অভিযোগ মূলক খবর।

জরাজীর্ণ সুজাপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রশাসন উদাসীন

স্বাস্থ্য দফতরের উদাসীনতায় মালদা শহর থেকে সতের কিমি দূরত্বে অবস্থিত সুজাপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেহাল দশা। ডাক্তার, নার্সদের থাকার কোয়ার্টার ঘিরে ঘন জঙ্গল, চারিদিক বিষাক্ত পার্থেনিয়াম গাছে ভর্তি। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভিতর রোগী ও আত্মীয়স্বজনদের পিপাসা নিবারণের জন্য আর্সেনিকমুক্ত জলের কল বসানো হয়েছিল। তাও বর্তমানে অকেজো। রোগীদের রান্না করা খাবার তৈরির জন্য বিশাল রন্ধনশালা থাকলেও চুক্তির ভিত্তিতে ঠিকাদার বাইরে থেকে রান্না করা খাবার এনে সরবরাহ করেন। হাসপাতালে চিকিৎসার সবরকম ব্যবস্থা না থাকায় জরুরী প্রয়োজনে মুমূর্ষু রোগীকে নিয়ে আত্মীয়স্বজনদের সদর হাসপাতালে ছুটে আসতে হয়। হাসপাতালে রয়েছেন ডাঃ সুজিত ঘোষ ও একজন কম্পাউন্ডার কাঞ্চন মুখার্জী। দেড় মাস আগে শ্রীমুখার্জীকে বুলবুলচণ্ডী গ্রামীণ হাসপাতালে বদলি করা হলেও গ্রামবাসীদের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে কাঞ্চন মুখার্জীকে স্বাস্থ্য দফতর সুজাপুরেই রাখতে বাধ্য হয়। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, একেই ত এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোন চিকিৎসার সুযোগ নেই। তার উপর ডাঃ সুজিত ঘোষ ও কাঞ্চন মুখার্জী অন্যত্র চলে গেলে এলাকার মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়বে।

কান্দীবান্ধব পত্রিকায় প্রকাশিত একটি উন্নয়নমূলক খবর। আপাতদৃষ্টিতে এটি নেতিবাচক খবর বলে মনে হলেও এটি একটি উন্নয়নমূলক খবর।

উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ ফেরৎ গেল ২২ কোটি টাকা

সংবাদদাতা ঃ গ্রামীণ উন্নয়ন খাতে পাওয়া ২২ কোটি ৮৪ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা সময়মত খরচ করতে না পারায় তা মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে ফেরৎ গেল। কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামীণ রোজগার যোজনা, পরিকাঠামো উন্নয়ন, স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম রোজগার যোজনা প্রভৃতি ৫টি খাতে ২০০২-০৩ সালের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলার জন্য বরাদ্দ করে ৫৪ কোটি ৯৪ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা। কিন্তু এ টাকার মধ্যে মাত্র ৩২ কোটি ৯ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা খরচ করতে পেরেছে এ জেলা। এ ব্যাপারে রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তর বারংবার তাগিদ পাঠিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো টাকার এক

কপর্দকও যেন পড়ে না থাকে তা দেখতে বলে জেলা প্রশাসনকে। কিন্তু তাতেও ৫৮ শতাংশের বেশী টাকা খরচ করতে ব্যর্থ হয়েছে জেলা প্রশাসন। অবশ্য এক সরকারি কর্তা জানান, এটা নতুন কিছু নয়। প্রতি অর্থ বছরেই অর্ধেক টাকা ফেরৎ চলে যায় জেলা থেকে।

কান্দীবান্ধব ৭মে, ২০০৩

এই ধরনের আগ্রহ উদ্রেককারী খবরকে প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে ছাপলে ভাল হয়। আরামবাগ বার্তা এই খবরগুলি ভেতরের পাতায় দু কলমে ছেপেছে।

জি আর পি বনাম প্রেমিক

সংবাদদাতা ঃ বান্ধবীর সাথে বসে গল্প করছিল এক প্রেমিক। এ নিয়ে বচসা বাধলো জি.আর.পি-র এক কনস্টেবলের সাথে। বচসা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে, কনস্টেবল ও প্রেমিকের সাথে হাতাহাতি থেকে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে। এ ঘটনায় আহত হয় উভয়ই। দুজনকেই প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। স্টেশন সূত্র থেকে জানা গেছে, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি দুপুর দু'টো নাগাদ রাকেশ পুরকাইত নামে এক যুবক, তাঁর প্রেমিকার সাথে স্টেশনে বসে গল্প করছিল। অনেকক্ষণ বসে থাকায় জি. আর. পি-র কর্তব্যরত কনস্টেবল তাঁকে স্টেশন পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু রাকেশ সে কথায় কর্ণপাত না করে প্রেমিকার সাথে গল্প করতে থাকে। দু'জনের মধ্যে বচসা বাঁধে। বচসা থেকে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে। এ ঘটনায় রাকেশকে কামারকুণ্ডু জি. আর. পি-তে পাঠানো হয়। *এই খবরটিতে রক্তারক্তি কীভাবে হল তার বিবরণ থাকার দরকার ছিল।

বেগুন থেকে আগুন

সংবাদদাতা ঃ বেগুন থেকে আগুন। এমনই ঘটনা ঘটল রামজীবনপুর পৌর এলাকায়। ১ মার্চ সকালে জনৈক শম্ভুর কাছে বেগুন কিনতে যায় জনৈক সটু মল্লিক। বেগুনের দাম নিয়ে বচসা, বচসা থেকে সটু বাটখারা ছুঁড়ে মারতে যায় শম্ভুকে। শম্ভু সরে গেলে বাটখারাটি আঘাত করে অপর এক আনাজ ব্যবসায়ী নিতাই বাবলির বুকে। নিতাইকে আরামবাগ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অপরদিকে ব্যবসায়ী সটু পলাতক।

চাকায় শিশু

লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে এক শিশুর মৃত্যু হলে এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উত্তেজিত জনতা পথ অবরোধ করতে উদ্যত হলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে অবস্থার সামাল দেন আরামবাগ থানার অফিসার বিজয় বিশ্বাস। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২ মার্চ আরামবাগ থানার বর্ধমান রাস্তার দৌলতপুর পীরতলাতে। পুলিশ লরিটিকে আটক করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বর্ধমান থেকে আসা একটি লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা যায় সুজলপুরের নারায়ণ চরণ মুনিয়ার তিন বছরের ছেলে দেবব্রত মুনিয়া।

ভাই বনাম দাদা

সংবাদদাতা ঃ হরিপাল থানার অনন্তপুরে জমিকে কেন্দ্র করে দুই ভাই-এর দীর্ঘদিনের বিবাদে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ভাই শ্যামসুন্দর হালদারের হাতে জখম হয়ে দাদা সাবিরুদ্দিন হালদার ও আর এক ব্যক্তি শামসের হাসপাতালে ভর্তি হন। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে হরিপাল থানার পুলিশ কায়েম, সাবের, কালাম, কাদের ও কাসেমকে গ্রেপ্তার করেছে।

গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান/সংস্থাগুলির বর্তমান হালহকিকৎ নিয়ে কমিউনিটির স্বার্থে গ্রামীণ সংবাদপত্রগুলি প্রচুর খবর করতে পারে। যেমন মালদহ সমাচার (৭ মে ২০০৩) এই খবরটি করেছে।

বীরস্থলী প্রাথমিক স্কুলের চালচিত্র

সংবাদদাতা ঃ প্রায় সত্তর বছর আগে প্রতিষ্ঠিত বীরস্থলী প্রাথমিক স্কুলের মূল ভবনটি বছর তিরিশ আগে ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে ; তৈরি হওয়া নতুন স্কুল বাড়িটির অবস্থাও শোচনীয় ; তিনটি ঘরের ছাদ যেকোনো সময় ভেঙে গিয়ে ছাত্রদের প্রাণহানির সম্ভাবনা রয়েছে বলেই ঘর তিনটিকে পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করেছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। বাতিল ঘরের প্রায় সমস্ত দরজা জানালা খুলে নিয়ে গেছে চোরেরা। বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিস্তার আলি জানালেন, "সাঞ্জীব, সাঁওতালপাড়া, বীরস্থলী, ধোবিঘাটা, পাঠানপাড়া, গণেশপাড়া, খোসড়াপাড়া, নয়াটোলো গ্রামের প্রধানত ছোট চাষী, দিনমজুর ভ্যানচালক, কুলি পরিবারের প্রায় ৬৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়তে আসে এই স্কুলে। ব্যবহার করা যেতে পারে এমন ঘরের সংখ্যা দুই, শিক্ষক-শিক্ষিকা মাত্র পাঁচজন, সামনের একচিলতে বারান্দায় গাদাগাদি করে বসতে হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের। আবার কখনো খোলা মাঠের মধ্যে রোদ সহ্য করে কিংবা বর্ষার দিনে স্যাঁতসেঁতে মাটিতে বসে পঠনপাঠন চলছে চাঁচল গ্রাম পঞ্চায়েতের সাঞ্জীব মৌজার একমাত্র প্রথমিক স্কুলটির।" স্থানীয় গ্রামবসী মহঃ এনম বলেন, "ঘরের অভাবে স্কুল কর্তৃপক্ষ ভর্তি হতে আসা বহু ছাত্র-ছাত্রীকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। তাদের কোথাও ঠাঁই না হওয়ায় বয়স বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে অনেকে আর পরবর্তীকালে পড়াশোনাই করছে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচাইতে পিছিয়ে পড়া জেলা মালদার উত্তর প্রান্তের এই অঞ্চলে তাই ড্রপ আউটের সংখ্যা অনেক ; এ বিষয়ে মাথাব্যথ্যা নেই মালদা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্ষদ অথবা ডি.পি.ই.পি. কর্তৃপক্ষের।" শিক্ষকদের জন্য দুচারটে চেয়ার টেবিল তৈরী হলেও বসার জায়গা সঙ্গে আনতে হয় কিংবা মেঝেতে বসে বিদ্যালয় জীবন শুরু করে এ স্কুলের খুদে আক্ষরিক অর্থে সর্বহারা পড়ুয়ারা। বেঞ্চ বলে কোন বস্তু নেই এ স্কুলে। প্রয়োজনীয় ব্ল্যাক বোর্ড নেই ; নেই এতগুলো ছেলে-মেয়েদের জন্য কোন পায়খানা বাথরুমের ব্যবস্থা ; চারপাশ খোলা, প্রাচীরের বালাই নেই, স্কুলের মধ্যে দিয়েই যাতায়াতে অভ্যস্ত স্থানীয় মানুষেরা। এই অঞ্চলের প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য আবদুল লতিফ বললেন, "গত বছরে চাঁচলে-১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির উদ্যোগে স্কুল প্রাঙ্গণে মিনি ডিপটিউবয়েল বসেছে বলেই ছাত্র-ছাত্রীদের অন্তত বিশুদ্ধ পানীয় জল খাওয়ার সুযোগ মিলেছে। চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকা, অপুষ্টিতে ভোগা অসচেতন এখানকার অধিকাংশ ছেলে-মেয়ে স্কুলটাকে খেলাধূলা করে সময় কাটানোর আদর্শ জায়গা বলে মনে করে। বয়স একটু বেড়ে গেলেই স্কুল ছাড়িয়ে এদের লাগানো হয় মাঠের কাজে, দরজীর দোকানে, বা রাজমিস্ত্রীদের যোগানদার হিসেবে।

আর একটি উন্নয়নমূলক খবর ঃ হাসপাতালের হাল হকিকৎ।

নেই ডাক্তার, নেই ওষুধ, ভগ্নদশা অবস্থায় রাংতাখালী হাসপাতাল

সংবাদদাতা ঃ ১৩৬৫ সালের ৫ পৌষ রাংতখালী নিবাসী শশীভূষণ কুণ্ডুর বংশধরদের প্রচেষ্টায় রাংতাখালীর বুকে নির্মিত হয়েছিল সালেপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র। তখন ছিল ডাক্তার, ওষুধ, বেড সহ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। পাশাপাশি গ্রাম থেকে ব্যাপক সংখ্যক রোগী আসত এখানে। কিন্তু স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি দক্ষিণ নারায়ণপুর ব্লকের অন্তর্গত হওয়ায় হায়ার অথরিটি-র নজর নেই একেবারেই। বর্তমানে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রত্যেকটি রুম্ ভগ্নদশা অবস্থায় পড়ে আছে। কোন কোন রুমে স্থানীয় গ্রামবাসীরা চাষের ফসল বা জ্বালানী রাখছে স্বচ্ছন্দে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনে নোংরা আবর্জনায় ভর্তি হয়ে গেছে। বর্ষার সময় ছাদ ফেটে জল পড়ে। সাপ সহ বিষাক্ত

পোকামাকড় বাসা বেধে আছে যত্রতত্র। ভেতরে কোন কোন ঘরে চলছে জরির কাজ। নেই বেড, নেই ডাক্তার, নেই ওষুধ, আছে ৬ জন স্টাফ। তার মধ্যে ফার্মাসিস্ট ১ জন, জি ডি এ ২ জন, সুইপার ১ জন, অপথার্মিক অ্যাসিস্ট্যান্ট ১ জন ও নার্সিং স্টাফ্ ১ জন। সুইপার ও অপথার্মিক অ্যাসিস্ট্যান্ট মাসের অর্ধেক দিন আসেন না। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জি ডি এ স্বপন পোড়ে জানালেন "হাসপাতালের অবস্থা বর্তমানে খুবই খারাপ। স্থানীয় মানুষ যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করায় রুমগুলিতে আমরা কোন কাজ করতে পারছি না। পায়খানা ও প্রস্রাবখানা আমরা ব্যবহার করতে পারছি না। স্থানীয় মানুষের সহযোগিতাও আমরা তেমনভাবে পাই না।" স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নবনিযুক্ত ফার্মাসিস্ট জানান—"শুনেছি আগে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অনেক রোগী আসত। কিন্তু এখন এর বেহাল অবস্থার জন্য আর রোগীরা তেমন আস্থা রাখতে পারছেন না। ডাক্তারবাবু নেই, তাই রোগী এলে আমরাই তার ওষুধ দিই। ওষুধও ঠিকমত নেই। স্বাস্থ্যদপ্তরকে বার বার জানিয়েও কোন ফল পাওয়া যায় না। এখানের পঞ্চায়েত এগিয়ে আসবে বলে আশ্বাস দিলেও এখন পর্যন্ত কোন শুভ ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি।" এদিকে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করে বলেন—"স্বাস্থ্যকর্মীরা সবাই নিয়মিত আসেন না। যখন খুশি আসেন এবং যখন খুশি বন্ধ করেন। সব রোগের ঠিকমত চিকিৎসাও হয় না এবং ওষুধও ঠিকমত পাওয়া যায় না।"

সৌজন্য ঃ আরামবাগ পত্রিকা

জনসাধারণের সভার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ভাল ভাল খবর করতে পারে কমিউনিটি সংবাদপত্র। চিত্তরঞ্জন থেকে প্রকাশিত খবর পত্রিকার ১৮মে ২০০৩ সংখ্যা থেকে দুটি এমন খবর প্রকাশিত হল। তবে এ ধরনের খবর লিখতে হলে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত অফিসার বা সংস্থার সঙ্গে কথা বলে তাঁর বক্তব্য দিতে হবে।

প্রতিবেদক আলস্যবশতঃ অভিযুক্তের কাছে যান না ও বিরোধী ইউনিয়ন বা বিক্ষুব্ধ ব্যক্তির অভিযোগ মত তাঁর বক্তব্যই ছেপে দেন। অভিযোগকে কেন্দ্র করে খুব ভাল তদন্তমূলক রিপোর্ট হতে পারে। এই খবর দুটিতে দেখবেন এখানে অভিযুক্তদের বক্তব্য প্রকাশ করা হয়নি। অথচ এদুটি খবরের মধ্যে যথেষ্ট তদন্তের সুযোগ ছিল।

চিত্তরঞ্জনে বিদ্যুৎ লাইন নিয়ে যথেচ্ছাচার চলছে

সংবাদদাতা ঃ সারাদেশে যখন আর্থিক অব্যবস্থা চলছে ঠিক তখনই সরকারি অর্থের মোচ্ছব শুরু হয়েছে সি.এল.ডব্লুর কিছু বিভাগে, এই অভিযোগের যুক্তি হিসাবে খাড়া করা হয়েছে, সি.এল.ডব্লুর বৈদ্যুতিক লাইনে বজ্র নিরোধক ব্যবস্থা একবার তুলে ফেলা আবার লাগানোর কার্যক্রমকে। অভিযোগ সি.এল.ডব্লু শহরের বজ্রপাত আটকানোর জন্য সমগ্র শহরের লাইট পোষ্টগুলিতে বজ্র নিরোধক (lightning arrester) লাগানো হয়েছিল। কিন্তু, সি.এল.ডব্লুর প্রাক্তন চিফ্ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার নির্মল সিং ঐ বজ্র নিরোধক খুলিয়ে দেন। বর্তমানে আবার "হাইটেক কোম্পানিকে" ১২ লাখ টাকায় টেন্ডার পাইয়ে দেওয়া হয় নতুন করে বজ্র নিরোধক লাগানোর জন্য। এদিকে গত বৎসর সমগ্র শহরে নতুন করে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার সাথে আর্থ (ভূমি) সংযোগের জন্য ৫৬ লাখ টাকা খরচ করা হয়। এবারও নতুন টেন্ডার ডাকা হয়েছে বলে খবর। অভিযোগে প্রকাশ, বিদ্যুৎ বিভাগের সরঞ্জাম মেরামতি ও পাল্টাবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হলেও রেল শহরের বেশীর ভাগ কোয়ার্টারই লো ভোল্টেজের শিকার। সূত্রের সংবাদ, সিমজুড়ির ওল্ড টাইপ টু, ফতেপুরের টাইপ ওয়ান্, আমলাদহের ২৫, ২৭, ২৯, ২২ ও ২৩ নম্বর রাস্তা, ৩৫, ৩৭ নম্বর রাস্তায় লো ভোল্টেজের দাপট বেশী। অভিযোগ এসেছে বহু জেনারেটার চলছে বিদ্যুৎ হুকিং করে। সূত্রের আরো আভিযোগ সরকারি উদাসীনতায় যে কোন মুহূর্তে ব্যাপক প্রাণহানির ব্যবস্থাও পাকাপাকিভাবে সি.এল.ডব্লু. কর্তৃপক্ষ করে রেখেছেন। জানা গেছে আইনত কোন জলাধারের ওপর দিয়ে অতি উচ্চ ক্ষমতার (High Tension line) বিদ্যুৎ পরিবহন করা যায় না। এক্ষেত্রে দেখা গেছে,

চিত্তরঞ্জনের জেনারেল ম্যানেজারের অফিসের সামনের জলাধার ও সিমজুড়ি জলাধারের ওপর দিয়ে উচ্চ মাত্রার ডি.ভি.সি-র বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য তার টানা হয়েছে। কোনক্রমে তার ছিঁড়ে গেলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনার বিষয়টি নিয়ে কেউই চিন্তাভাবনা করছেন না বলে অভিযোগ। সূত্রের সংবাদ, বাঁধগুলির জলের মধ্যে থাকা বৈদ্যুতিক পোষ্টগুলিও রয়েছে আলাগা মাটির ওপর। কোন রকম ভাবেই পোষ্টগুলি বাঁধানো হয়নি। এছাড়া জলের ওপর থাকায় পোষ্ট ও তারের রক্ষণাবেক্ষণও ঠিক মতন হচ্ছে না।

সূত্র আরও জানাচ্ছে, ২০০০ সালের প্রাকৃতিক দুর্যোগে, সিমজুড়ি-ফতেপুর বাস রাস্তার ওপর থাকা সব কটি লাইট পোষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দুটি লাইট পোষ্ট উপড়ে পড়ে। ২০০৩ সালেও ঐ ক্ষতিগ্রস্ত লাইট পোষ্টগুলিকে বাঁধানো হয়নি এবং কোন এক অজানা কারণে উপড়ে পড়া লাইট পোষ্টগুলিকে সারানো হয়নি। স্বভাবতই বর্ষায় বাঁধ জলে ভরে উঠলে ঐ লাইট পোষ্টের কারণে প্রাণহানির আশঙ্কা থেকেই যাবে। এ নিয়ে অবশ্য সি. এল. ডব্লু-র মতামত পাওয়া যায়নি।

রূপনারায়ণপুরের টেলিফোন পরিষেবা বন্ধ

কেবলমাত্র আসানসোল টেলিকমের জেনারেল ম্যানেজার এ. কে. কুণ্ডু এবং চিত্তরঞ্জনের এক্সচেঞ্জের এস.ডি.ই., এন.কে.চক্রবর্ত্তীর দীর্ঘসূত্রতা এবং জনসাধারণকে হয়রানির মানসিকতার কারণেই রূপনারায়ণপুর এক্সচেঞ্জভুক্ত এলাকার ৭৫০ জন নাগরিক টেলিফোনের সুবিধে হতে বঞ্চিত হচ্ছেন, অন্যদিকে সরকারের লোকসান বাড়ছে বার্ষিক ৩/৪ লাখ টাকা। প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী, ২০০২-এর জুন মাস হতে রূপনারায়ণপুরের টেলিফোন গ্রহণেচ্ছুকের সাথে বিমাতৃসুলভ আচরণ করা হচ্ছে বলে বহু অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ সূত্রের বক্তব্য, কেবল লাইন খালি না থাকায় দরখাস্তকারীদের টেলিফোন লাইন দেওয়া হচ্ছে না। অন্যদিকে, চিত্তরঞ্জন ও রূপনারায়ণপুর এক্সচেঞ্জ সূত্র জানাচ্ছে বহু গ্রাহক মোবাইল ফোন নেওয়াতে বহু লাইনই খালি পড়ে রয়েছে। মোবাইল বিক্রেতাদের সাথে অনৈতিক সম্পর্কের কারণেই টেলিফোন লাইন দেওয়া হচ্ছে না, এই অভিযোগ বি.এস.এন.এল অফিসারদের বিরুদ্ধেই যায়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তপন সিকদারের ঘোষণা ছিল ৭ দিনেই ফোনের লাইন দেওয়া হবে। কিন্তু অরুণ ভদ্র গত ২৮ ডিসেম্বর টাকা জমা দিয়েও লাইন পাননি। এরকম অজস্র "অরুণের" অভিযোগকে থোড়াই কেয়ার করছেন এন.কে.চক্রবর্ত্তী বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। জি.এম.-কে ফোন করেও কাজ না হওয়ায় টেলিফোন গ্রাহকরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অভিযোগ করেছেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রের খবর।

৩.৬ খবর কোথায় পাবো?

রাজধানী শহরে নানা ধরনের খবর পেতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ সেখানে নিত্য নানা ধরনের ঘটনা-দুর্ঘটনা ঘটছে। রাজ্য সরকারের সদর দফতর সেখানে। প্রতিটি দফতর থেকেই নানা ধরনের খবর হয়। কিন্তু মফঃস্বল শহর থেকে প্রকাশিত কমিউনিটি সংবাদপত্রগুলি খবর কোথা থেকে পাবে। খবরের উৎস কী?

রাজধানী থেকে প্রকাশিত বড় সংবাদপত্রগুলি অনেককাল আগে মফঃস্বল সংবাদদাতা রাখত। আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতী, অমৃতবাজার পত্রিকা প্রভৃতি সংবাদপত্রের মফঃস্বল সংবাদদাতা ছিল। কিন্তু সে সময় সভা সমিতি, অনুষ্ঠান ও দুর্ঘটনা ছাড়া মফঃস্বল থেকে বড় কোন খবর হত না। সাংবাদিকদের উদ্যোগের অভাব ছিল। তখন জেলা মহকুমা শহরে উন্নয়নের হারও সীমাবদ্ধ ছিল। তাই উন্নয়নকে কেন্দ্র করে খবরের বিশাল দরজা তখনও খোলেনি। তাই ষাটের দশক থেকে কলকাতার সংবাদপত্রগুলিতে মফঃস্বল সংবাদ প্রকাশ প্রায় বন্ধই হয়ে

যায়। তদুপরি সাংবাদিকদের জন্য গঠিত বেতন বোর্ড মফঃস্বল সংবাদদাতাদের জন্য নির্দিষ্ট বেতন নির্ধারিত করে দেওয়ায় মালিকপক্ষ মফঃস্বল সাংবাদিকদের পদগুলি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত করে দেন।

আশির দশক থেকে আবার বৃহৎ সংবাদপত্রগুলির নজর পড়ে মফঃস্বলের পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতি। নানা রাজনৈতিক ঘাত প্রতিঘাত, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, কৃষির উন্নতির ফলে সম্পন্ন কৃষক সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের ফলে তেজী বাজার মফঃস্বলের প্রতি আবার বৃহৎ সংবাদপত্রগুলির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তাঁরা মফঃস্বলে সার্কুলেশন বাড়াবার জন্য ও বাজার ছেঁকে বিজ্ঞাপন তোলার জন্য মরীয়া হয়ে এখন জেলা শহরগুলিতে সংবাদদাতা নিয়োগ করেছেন।

প্রতিটি বড় শহরে স্থানীয় কেবল টিভি চালু হওয়ার ফলেও লোকের মধ্যে সংবাদ আগ্রহ বেড়েছে। মফঃস্বল পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে অনেক পত্রিকাই এখন খবর পরিবেশনে পেশাদারিত্বের পরিচয় দিতে শুরু করেছেন। নিত্য নতুন খবরের জন্ম হচ্ছে এখন। কমিউনিটি সংবাদপত্রের খবর পেতে ফোনে খবরের সূত্রগুলির সঙ্গে যোগযোগ বাড়াতে হবে। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পুলিশ, চিকিৎসক, প্রধান শিক্ষক, কলেজ প্রিন্সিপ্যাল প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখা দরকার। এজন্য সাংবাদিককে হাসিখুশী, ওয়াকিবহাল এবং দল নিরপেক্ষ থাকতে হবে। জেলা শহরগুলিতে সংবাদসূত্র অজস্র। সভাধিপতি ও জেলাশসক ও এস পি প্রতিদিনই আপনাকে খবর দিতে পারেন।

বিভিন্ন খবরের সত্যতা যাচাই এর জন্য যোগাযোগ করতে হবে সংশ্লিষ্ট মুখপাত্রের সঙ্গে।

সমস্ত ধরনের খবরের প্রধানসূত্র	ঃ	জেলা শাসক, সভাধিপতি
রাজনৈতিক খবর	ঃ	পার্টির সভাপতি ও সম্পাদক, জেলার বিধায়ক ও মন্ত্রী।
দুর্ঘটনা	ঃ	হাসপাতালের সুপার।
মন্ত্রী বা ভিআইপি-র মুভমেন্ট ও আইন-শৃঙ্খলা, গ্রেফতার	ঃ	জেলার এস পি অথবা অতিরিক্ত এস পি।
শিল্প	ঃ	জেলার ইনডাষ্ট্রি অফিসার।
		চেম্বার অব কমার্স।
শিক্ষা	ঃ	জেলা শিক্ষা অধিকর্তা।
		বিভিন্ন স্কুল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল।
		প্রাথমিক স্কুলের ক্ষেত্রে জেলা পরিষদ।
কৃষি	ঃ	জেলা কৃষি মৎস্য অফিসার/অফিসার।
স্বাস্থ্য	ঃ	বিভিন্ন হাসপাতাল। টিক মেডিকেল অফিসার।

রাজনীতি ও আইনশৃঙ্খলা ঘটিত খবর এখন প্রচুর হচ্ছে। সেজন্য সংবাদদাতারা এখন এই সব খবর নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। এর ফলে অন্যান্য খবর বিশেষ করে উন্নয়নমূলক খবর মার খায়। কমিউনিটি সংবাদপত্রকে সব খবরের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। এক ধরনের খবর বেশী দিলে চলবে না। রাজনৈতিক খবর ও ঘটনা দুর্ঘটনার বাইরেও যে নানা ধরনের খবর করা যায় তার কতকগুলি নমুনা এখানে পরপর দেওয়া হল।

প্রথমে নীচের খবরটি দেখুন। এটি একটি উন্নয়নমূলক খবর। জেলার পি ডব্লু ডির বড় ইঞ্জিনিয়ার, পাবলিক হেল্থ বিভাগের বড় ইঞ্জিনিয়রের কাছে। এসব খবর পাওয়া যায় সাংসদ বিধায়ক, সভাধিপতি, জেলা পরিষদের সদস্যরাও এই ধরনের খবর দিতে পারেন। তাছাড়া প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে (যেমন শিলান্যাস অনুষ্ঠান) গিয়েও অনেক তথ্য যোগাড় করা যায়। এইসব অনুষ্ঠানে নেতাদের সারহীন বক্তৃতা কম ছেপে তথ্যবহুল খবর ছাপুন যাতে জনসাধারণ প্রকল্পটির বিষয় অনেক কিছু জানতে পারেন।

শুরু হল দ্বারকেশ্বরের উপর সেতু নির্মাণের কাজ

অবশেষে আরামবাগ মহকুমার ডোঙ্গলে দ্বারকেশ্বর নদীর ওপর সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হল। উল্লেখ্য, ২৪ ডিসেম্বর এই সেতু নির্মাণের জন্য শিলন্যাস করেন সাংসদ অনিল বসু। কয়েকদিন আগে বিভিন্ন মেসিনপত্র নিয়ে এসে সেতুর প্রাথমিক পর্বের কাজ শুরু হয়েছে। জানা গেছে ১৮৬ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এই সেতুটি নির্মাণ করতে খরচ হবে ৬ কোটি টাকা। সেতু নির্মাণের কাজ শেষ হতে ২ বছর সময় লাগবে। এই সেতুটি নির্মাণ হলে শুধু ডোঙ্গল ও বড়ডোঙ্গলই নয় সালেপুর ২নং পঞ্চায়েতের সেখপুর, বসন্তবাটি, রাংতাখালী, আতাপুর, খানাকুল থানার কিশোরপুর, কুলাট, ঠাকুরাণীচক, মহিষগোট, মদনবাটি, চুয়াডাঙ্গা, বন্দীপুর, নিরঞ্জনবাটি, গুজরাট, বামনখানা, মেদিনীপুরের শ্রীমন্তপুর, কোমড়া, পার্বতীচক প্রভৃতি গ্রামের প্রায় ১ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন। বড়ডোঙ্গল থেকে শ্রীমন্তপুর পর্যন্ত মাটির রাস্তাটি ইতিমধ্যে বালি ফেলে চওড়া করা হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই এর ওপর পিচ দেওয়া হবে। সেতু সংলগ্ন রাস্তাটি ১৫ মিটার চওড়া করা হয়েছে। ৭ কি.মি. রাস্তা পিচ দেওয়া হবে। সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ায় এলাকার বাসিন্দারা খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন।

৩.৭ কমিউনিটি সংবাদপত্রের খসড়া

প্রতি সংখ্যা ছাপার আগে ওই সংখ্যাটি সম্পর্কে আগে থেকে একটি পরিকল্পনা করে নিতে হয়। প্রথমে সংখ্যাটির জন্য আপনি কী কী বিশেষ খবর সম্পাদকীয় ও প্রবন্ধ ভাবছেন তা লিখে ফেলতে হয়। যেমন গোবরডাঙ্গা বার্তা। একটি পক্ষিক পত্রিকা। আপনি একটি সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী সংখ্যায় কী কী ছাপবেন তার একটি খসড়া করে ফেললেন। একে বলে প্রাক প্রকাশনা পরিকল্পনা।

প্রথম পাতা ঃ এই পাতাটি নির্দিষ্ট Hard News-এর জন্য। আপনাকে এজন্য অন্তত প্রকাশ তারিখের তিনদিন আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু অনেক খবর যা আগে থেকে লিখে ফেলা যায় (যাকে নরম খবর বা Soft news বলে) সেগুলি হয় ইতিমধ্যেই আপনার হাতে এসে গেছে, না হয় আপনি এটা কাউকে লিখতে বরাত দিয়েছেন। তাহলে আপনার হাতে এসে গেছে এই খবর ও ফিচারগুলি।

১। মছলন্দপুর স্টেশন দুর্বৃত্তদের দখলে চলে গেছে। এটি ৫০০ শব্দের একটি তদন্তমূলক প্রতিবেদন। এটি প্রথম পাতার নিচে চার কলম জুড়ে প্রকাশিত হবে। সঙ্গে দুকলমের একটি ফোটোও আছে।

২। স্থানীয় মিষ্টির দোকানের মালিক কোটিপতি। এটি এক স্থানীয় ব্যবসায়ীকে নিয়ে যিনি নাকি লটারিতে এক কোটি টাকা পুরস্কার জিতে নিয়েছেন। ২৫০ শব্দের বক্স আইটেম। এটির কপি আপনার হাতে এসে গেছে। কোটিপতির একটি ছবিও এই সঙ্গে যাবে।

৩। শহরের টাউন হলের সংস্কারের জন্য বরাদ্দ ৫০ হাজার টাকা। এটিও উন্নয়নমূলক খবর। আপনার নিজস্ব প্রতিবেদক গত সংখ্যার জন্য লিখেছিলেন। জায়গা হয়নি বলে আগামী সংখ্যায় যাবে। এছাড়া মনোনীত করেছেন একটি প্রবন্ধ। পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে রক্তপাত ঃ গণতন্ত্রের জয় না পরাজয়।

চিঠিপত্র বিভাগের জন্য কম্পোজ হওয়া দুটি চিঠি আছে।

সম্পাদকীয় ঃ রেলের নিত্যযাত্রীদের সমস্যা নিয়ে এবার একটি সম্পাদকীয় লিখতে চান। আপনার পত্রিকায় খেলাধুলা, জনস্বাস্থ্য ও সাহিত্য বিভাগ আছে। এসব বিভাগের মনোনীত লেখা এক সঙ্গে কম্পোজ করিয়ে রাখা আছে।

এবার আপনি সব লেখা কম্পোজ করতে দিয়ে দিন। একমাত্র প্রথম ও শেষপাতা ছাড়া পত্রিকা প্রকাশের এক সপ্তাহ আগে এই সব লেখার সম্পাদনা ও কম্পোজ যেন শেষ হয়ে যায়।

শেষ মুহূর্তে অনেক ঘটনা আপনার এলাকায় ঘটতে পারে—ডাকাতি, ট্রেন অবরোধ, গণধর্ষণ, বিক্ষোভ, গুলিচালনা, দুর্ঘটনা। অথবা আপনার প্রতিবেদক পেয়ে গেলেন এক স্কুপ। চেয়ারম্যান পুরসভা স্বাস্থ্যের খাতিরে পদত্যাগ করেছেন। এর জন্য ছাপার একদিন আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তারপর পত্রিকার ওই সংখ্যার খসড়া বা ডামি করে ফেলতে হবে।

ডামি হল প্রতিটি পাতার খসড়া। ধরা যাক পত্রিকাটি পাঁচ কলমের ট্যাবলয়েড সাইজের। এবার ওই পাঁচ কলম কাগজের লম্বালম্বি কত সেন্টিমিটার হয় সেটা স্কেলের মত করে লিখে কলমের জন্য লম্বালম্বি রুল টেনে ডামিশিট ছাপিয়ে নিতে হবে।

এবার যে যে খবর আপনার হাতে আছে সেগুলির গুরুত্ব অনুসারে কোথায় বসাবেন এবং তার জন্য কত কলম সেন্টিমিটার বরাদ্দ করবেন তা ডামিতে ঠিক করে ফেলুন। বিজ্ঞাপন যা থাকবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিজ্ঞাপনগুলির অবস্থান ঠিক করে নিন।

একটি কল্পিত পাতার ডামির খসড়া নীচে দেওয়া হল।

প্রথম পাতার ডামি

পত্রিকার নাম আরামবাগ সমাচার

(কল্পিত নাম)

প্রকাশ তারিখ ১৫ জুন, ২০০৪

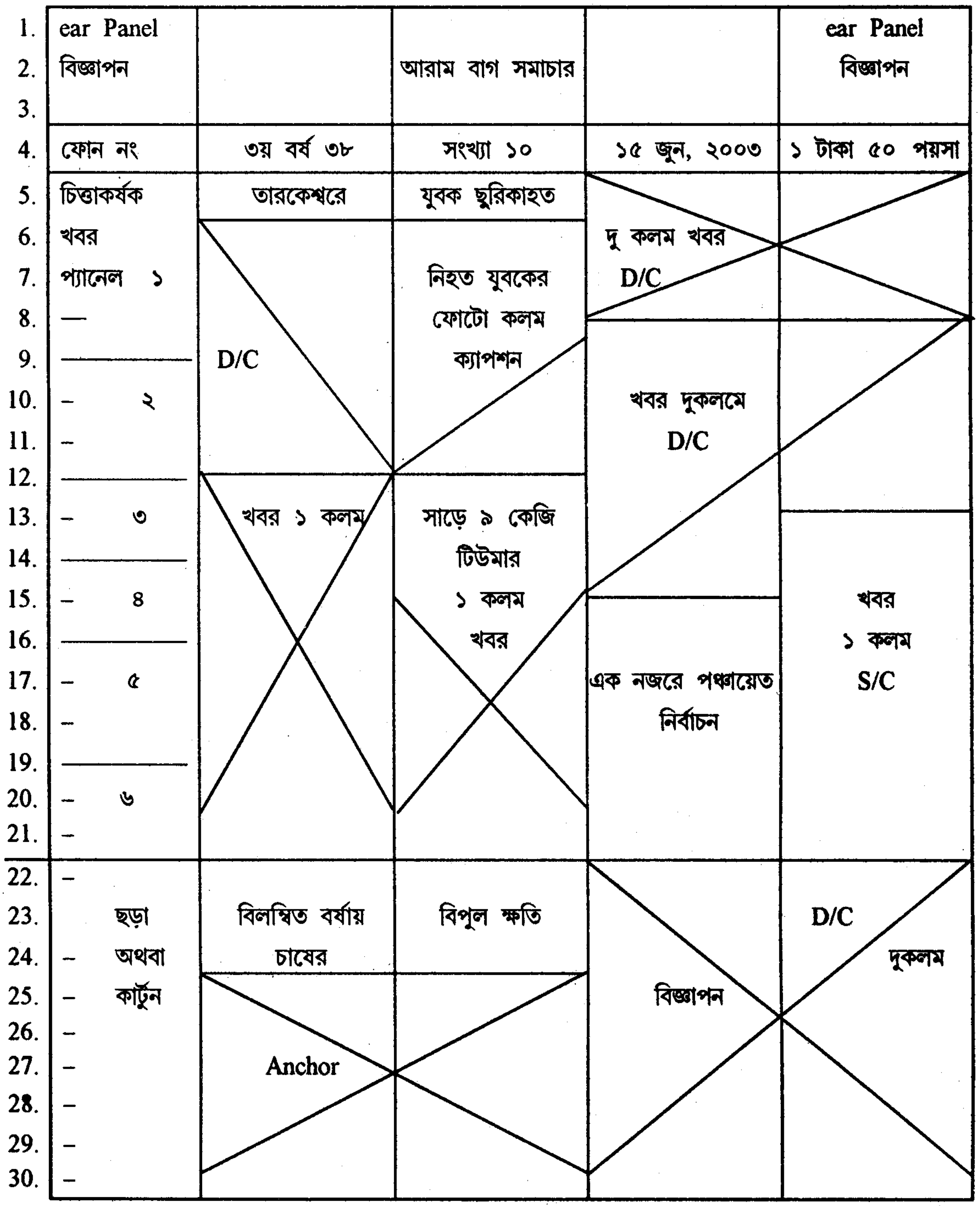

ডামি শিটটিতে দেখুন একটি ট্যাবলয়েড সাইজের পত্রিকায় ৩০ সেন্টিমিটার মুদ্রণের জায়গা আছে। এই পত্রিকার প্রতি কলমের প্রস্থ হল ৪·৫ সেঃ। মোট ৫ কলম করে একটি পাতায়। ডামিশিটে ১, ২, ৩, ৪ করে ৩০ সেঃ লেখা থাকবে। যাতে আপনি কত সেন্টিমিটার খবর ও বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যয় করলেন তা বুঝতে পারলেন। এখানে দেখুন বিজ্ঞাপনের জন্য ৮ সেঃ × ২ কলম জায়গা বরাদ্দ করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনের রেট ধরা হবে ১৬ সেঃ হিসাবে। প্রতি সেন্টিমিটার বিজ্ঞাপনের খরচ যদি ১০০ টাকা হয় তাহলে ১৬০০ টাকা। এর ওপর প্রথম পাতার Solace বিজ্ঞাপনের জন্য দ্বিগুণ সারচার্জ ধরা যেতে পারে।

এই ডামি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশন তারিখের এক সপ্তাহ আগে থেকে শুরু করা যায়। ২, ৩ পাতার ডামি আগে থেকে করে রাখা ভাল। ১ ও ৪ পাতার ডামি সব খবর এসে গেলে করবেন। এবার পেজ মেকআপের সময় ডামি ধরে ধরে মেকআপ করন। এখন পেজমেকার সফটওয়ারের সাহায্যে কম্পিউটারের মধ্যেই পাতাটা করে তার প্রিন্ট আউট বার করে সেটিকে প্লেট করতে পাঠানো যেতে পারে। তবে খবর লেখা ও ছাপতে দেওয়ার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্তর আছে। তাকে বলে সম্পাদনা।

সম্পাদনার সময় প্রতিটি লেখা আদ্যোপান্ত পড়ে নিতে হবে ও প্রয়োজনে নতুন করে লিখতে হবে। সম্পাদনার সময় দেখতে হবে ঃ

১। খবর বা ফিচারের মুখপাত্র বা Intro আকর্ষণীয় হয়েছে কিনা।

২। মুখপত্রটি পড়ে খবরের বাকীটা পড়তে পাঠকের ইচ্ছা হবে কিনা।

৩। ভাষার মধ্যে কোথাও যেন জড়তা বা অস্পষ্টতা না থাকে।

৪। এমন কিছু যেন মন্তব্য না থাকে যাতে করে মানহানি হতে পারে।

৫। লেখাটি যেন আদ্যোপান্ত ঝরঝরে হয়। যেন বানান ভুল বা ব্যাকরণের ভুল না থাকে।

কারও বিরুদ্ধে এক তরফা অভিযোগ যেন না থাকে। অভিযুক্তকে যেন আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়। শিরোনাম, সম্পাদনার পর প্রত্যেক কপির গুরুত্ব অনুসারে কোন পাতায় যাবে, কত টাইপের শিরোনাম হবে এবং কত কলমের শিরোনাম হবে তার উল্লেখ করে দিতে হয়। এইবার এই হেডলাইন ও তার জন্য বরাদ্দ কলম আলাদা শিটে লিখে রাখুন। খবরটির শব্দ সংখ্যাও লিখুন। হার্ড নিউজ যেন ২৫০ শব্দের বেশি না হয়। ফিচার ও প্রবন্ধ ৪৫০ শব্দ হলেই ভাল। সব খবর ধরাবার কথা মাথায় রাখতে হবে। সেজন্য অবান্তর খবর নির্মম ভাবে ছাঁটতে হবে।

শিরোনাম ঃ শিরোনাম দেবার সময় প্রথমে খেয়াল রাখতে হবে শিরোনাম যেন ইনট্রো অনুসারে হয়। পাঠক শিরোনাম পড়ে যদি দেখেন একথা ইনট্রোতে নেই তাহলে তিনি হোঁচট খাবেন। প্রায়শই দেখা যায় কমিউনিটি সংবাদপত্রগুলি এই নিয়মনীতি মেনে চলেন না।

৭ জুন ২০০৩ তীরভূমি থেকে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

যানজট বিরোধী অভিযানে ৮ বাইক সহ দুটি লরী আটক

শুক্রবার কাঁথি থানার পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি শহরে যানজট নিয়ন্ত্রণে অভিযান চালায়। পুলিশের এই অভিযানে বিভিন্ন এলাকা থেকে ৮টি মোটর সাইকেল, বড় রাস্তায় গাড়ী পার্কিং করে মাল ওঠানো-নামানোর জন্য ২টি মালবোঝাই লরী আটক করা হয়। এদিকে বৃহস্পতিবার গভীর রাত্রে কাঁথি মহকুমাশাসকের দপ্তর চত্বরে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করার অপরাধে পুলিশ ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

ওপরের খবরটি এইভাবে ইনট্রো করলে ভাল হত।

কাঁথি শহরে যানজট বিরোধী অভিযানে শুক্রবার পুলিশ আটক করল ৮ বাহক সহ দুটি লরী। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঃ

আবার দেখুন একটি খুবই মজার খবর এবং অত্যন্ত দুর্লভ একটি খবর ভাল শিরোনামের অভাবে জমতে পারেনি। ২৯ এপ্রিল ২০০৩ আরামবাগ পত্রিকার খবর ঃ

পুলিশি হস্তক্ষেপে অভিনব স্বয়ম্বরসভা গোঘাটে

এক অভিনব স্বয়ম্বরসবায় এক মহিলার জন্য হাজির হয়েছিল চার জন বর। এমনই এক অভিনব ঘটনা ঘটেছে গোঘাটের কুলকি গ্রামে। জানা গেছে, কুলকি গ্রামের বঙ্কিম মণ্ডলের একমাত্র কন্যা পম্পা মণ্ডলের গত ২৩ এপ্রিল বুধবার বিবাহ বাসরে হাজির হয় একসঙ্গে চার জন প্রেমিক। ঐ চার জনের বাড়ি যথাক্রমে গোঘাটের বালিবেলা, গোবিন্দপুর, আরামবাগের বাতাসপুর এবং বর্ধমানের আখনা গ্রামে। শেষ পর্যন্ত আখনা গ্রামের সুব্রত মণ্ডলের সঙ্গেই পম্পার বিয়ে হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পম্পা মণ্ডল সুব্রত মণ্ডল ছাড়াও অপর তিন জনের সঙ্গেও যথারীতি প্রেম করে এবং বিয়ের প্রস্তাব দেয়। ঐ প্রস্তাব অনুযায়ী ঐ চার জন একই দিনে এসে হাজির হয় বিয়ে করতে। এ নিয়ে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে। শেষ পর্যন্ত, গোঘাট পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয় এবং ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা গেছে, গোঘাট পুলিশ হাজির হওয়া অপর তিনজনকে বুঝিয়ে পাঠিয়ে দেয় এবং শেষে সুব্রত মণ্ডলের সঙ্গেই বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দেয়। যদিও মেয়ের বাড়ির পক্ষ থেকে এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

এই খবরের শিরোনাম হতে পারত ঃ

চার বর এক কনে

পুলিশের হস্তক্ষেপে অভিনব বিয়ে হল গোঘাটে।

৩.৮ কমিউনিটি সংবাদপত্রের দায়িত্ব

সমাজের কাছে প্রতিটি গণমাধ্যমেরই একটি দায়বদ্ধতা আছে। তবে কমিউনিটি সংবাদপত্রের দায়বদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বশীলতা আরও বেশী। কেননা, এই সংবাদপত্র তৃণমূলে কাজ করে এবং তিনি সমাজের কাছে সহজলভ্য। তাঁর মধ্যে যদি কোন ক্রমে দায়িত্ব বোধের অভাব দেখা দেয় তাহলে তিনি পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবেন। এমনকী তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হতে পারে।

- তিনি যে সংবাদ প্রকাশ করবেন তার সত্যাসত্য বিচার করবেন। মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করবেন না।
- তিনি টাকা নিয়ে কোন খবর ছাপবেন না। ব্ল্যাকমেল করবেন না।
- নির্বাচনের আগে তিনি কোন প্রার্থীর প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখাবেন না।
- তদন্তমূলক খবর পরিবেশনের সময় তিনি খবরের সত্যতার সমর্থনে কাগজপত্র রেখে দেবেন। তিনি নিয়মিত পড়াশোনা করবেন। সমসাময়িক রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকবেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে লোকে যেন তাঁকে শিক্ষিত ব্যক্তি বলে মনে করে।
- শুধু রাজনৈতিক নেতা বা আমলা নয় বিজ্ঞাপনদাতা ও এজেন্সির সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে।
- তিনি সরকার ও রাজনৈতিক নেতাদের কোন ফেভর নেবেন না।

কমিউনিটি সংবাদপত্র যে কমিউনিটির মধ্যে কতখানি গুরুত্ব পেতে পারে লবণ হ্রদ সংবাদ এর একটি বড় প্রমাণ। পত্রিকাটি ইতিমধ্যেই লাভজনক সংস্থায় পরিণত হয়েছে এবং গণমাধ্যম হিসাবে পত্রিকাটি স্বীকৃতি পেয়েছে। এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপনদাতারা নিজেরাই বিজ্ঞাপন পৌঁছে দেন এবং পত্রিকার কোন বিজ্ঞাপন কর্মী নেই। তারা কোথাও বিজ্ঞাপন চাইতে যান না।

এই ধরনের গুরুত্ব অনেক কমিউনিটি সংবাদপত্রই অর্জন করতে পারে অথবা কমবেশি অর্জন করেছে।

৩.৯ সারাংশ

সংবাদপত্র মুদ্রিত সংবাদ মাধ্যম। তার নিজস্ব আকার আয়তন ও চরিত্র আছে। কমিউনিটি সংবাদপত্র সমাজের মুখপত্র।

কমিউনিটি সংবাদপত্র সমাজের বিভিন্ন দিকের খবর প্রকাশ করে। খবরগুলি সাধারণ মানুষের উপযোগী করে ঝরঝরে ভাষায় লিখতে হয়। এই খবর সাজানোরও কতকগুলি নিয়ম আছে। খবর লেখার সময় মুখপাত্র বা ইন্ট্রো এমনভাবে লিখতে হয় যে ইন্ট্রো পড়ে খবরের সারাংশ জানা যায়। খবর সম্পাদনা করে নিতে হয়। খবর সাজানোর সময় একটি খসড়া বা ডামি করতে হয়। ডামি হল পাতার অগ্রিম পরিকল্পনা।

৩.১০ অনুশীলনী

১। সংবাদপত্রের সংজ্ঞা কী? ম্যাগাজিন ও সংবাদপত্রের মধ্যে তফাৎ কোথায়?

২। তথ্য ও সংবাদের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট বিভাজন রেখা আছে। ব্যাখ্যা করুন।

৩। কয়েকটি আগ্রহসৃষ্টিকারী সংবাদ লিখুন। খবরগুলির সংকেতসূত্র দেওয়া হল ঃ

সূত্র এক ঃ জাতীয় সড়কে বরযাত্রী বোঝাই বাস ও মাল বোঝাই লরির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ। বরসহ ১০ জন বরযাত্রী নিহত। লরি চালক পলাতক।

সূত্র দুই ঃ ভয়াবহ বন্যার কবলে আপনার এলাকা।

সূত্র তিন ঃ কৃষি প্রদর্শনী। উদ্বোধন। প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য। প্রদর্শনী সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য।

৪। কীভাবে খবর লিখতে হয়।

৫। একটি কমিউনিটি সংবাদপত্রের ডামি তৈরি করুন।

৩.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। বিষয় সাংবাদিকতা ঃ ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

একক ৪ □ কমিউনিটি সংবাদপত্র পরিচালনা

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ সংবাদপত্র পরিচালনা ও ম্যানেজমেন্ট

৪.৩ সারাংশ

৪.৪ অনুশীলনী

৪.৫ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার সময় আপনারা জানতে পারবেন—

- সংবাদপত্র পরিচালনা ও ম্যানেজমেন্ট বলতে আমরা কী বুঝি?
- অন্যান্য ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে এর তফাৎ কোথায়?
- সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন কীভাবে সংগ্রহ করতে হয়।

৪.১ প্রস্তাবনা

কোন সংবাদপত্র দুদিনেই উঠে যায় আবার কোনও সংবাদপত্র দীর্ঘকাল ধরে চলে—এটি সাধারণত ঘটে পরিচালনার ত্রুটি ও সাফল্যের জন্য। সবার সংবাদপত্র চালানোর মানসিকতা থাকে না। সংবাদপত্রের ব্যবসায়ে চটজলদি টাকা উঠে আসে না। এটি একটি ধৈর্যের ব্যবসা।

তাই সংবাদপত্রের পরিচালনার সাফল্য নির্ভর করে পরিচালকের মানসিকতার ওপর। তিনি যদি ধৈর্য ধরে মাথা ঠাণ্ডা করে এগিয়ে যান তাহলে তার সাফল্য আসবেই।

সংবাদপত্র পরিচালনার দুটি স্তম্ভ। একটি বিজ্ঞাপন, অপরটি সার্কুলেশন। এ দুটি আবার পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। কাজেই বিজ্ঞাপন পড়াবার জন্য প্রচার আগে বাড়িয়ে যেতে হবে। কী ভাবে এই বৃদ্ধি ঘটানো যায় সে সম্পর্কে এই অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

৪.২ সংবাদপত্র পরিচালনা ও ম্যানেজমেন্ট

সংবাদপত্র পরিচালনা ও ম্যানেজমেন্ট কী?

ম্যানেজমেন্ট অর্থে আমরা সাধারণত বুঝি একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যাভিমুখী করে তোলা। সবশেষে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সাধন।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য উৎপাদনের ধারাকে শুধু অব্যাহত রাখা নয়। ক্রমাগত তার গুণগত উৎকর্ষ বাড়িয়ে যাওয়া এবং তার উৎপাদন উর্ধ্বমুখী করে একটি আদর্শ (optimum) স্তরে নিয়ে যাওয়া। পাশাপাশি বিপণন বাড়িয়ে যাওয়া। প্রতিষ্ঠানের মুনাফা ও সুনাম বৃদ্ধি করা।

সংবাদপত্র পরিচালনার আধুনিক ধারণা গ্রহণ করার আগে সংবাদপত্রকে একটি Commodity বা পণ্য বলে ভাবতে হবে এবং সংবাদপত্র যে এটি একটি লাভজনক ব্যবসা সেটিকে মাথায় ঢোকাতে হবে। তবে লাভজনক ব্যবসা হলেও সংবাদপত্র ব্যবসা একটি সেবামূলক ব্যবসা। যেমন নার্সিংহোম বা পরিবহন শিল্প। এগুলির উদ্দেশ্য মুনাফা হলেও তা যে অন্য ব্যবসা থেকে আলাদা এবং মুখ্যত একটি গণ প্রয়োজনমূলক (Public utility) সেবা তা মনে রেখেই জনসাধারণের প্রতি দায়বদ্ধতা মেনে চলতে হয়।

তাই সংবাদপত্রকে শৌখিন উদ্যোগ বলে মনে করলে বৃহৎ বা ক্ষুদ্র কোন সংবাদপত্রই চালানো যায় না। সেজন্য সংবাদপত্র পরিচালনার মধ্যে পেশাদারিত্ব চাই।

পেশাদার উদ্যোগী তাঁর শিল্প গড়ার সময় তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেন। ভূমি (Land), শ্রমিক (labour) ও পুঁজি (Capital)। এছাড়া দরকার হয় দক্ষ পরিচালক সংগঠন যেটি ওই labour বা শ্রমের মধ্যেই পড়ে।

জমি বা land : সর্বপ্রথম সংবাদপত্রের জন্য দরকার একটি জমি বা বাড়ি।

শহরের ঠিক মাঝখানে এই বাড়ি জমি হলে ভাল হয় কারণ জনসাধারণের সঙ্গে তার সম্পর্ক (জন সংযোগ) গড়ে ওঠে।

বর্তমানে বৃহৎ সংবাদপত্রগুলি নিরাপত্তার অজুহাতে তাদের অফিসগুলিকে দুর্গের মত করে তৈরি করেছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ ও সংবাদসূত্রের সঙ্গে সাংবাদিকদের সরাসরি যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু গ্রামীণ সংবাদপত্র বা কমিউনিটি সংবাদপত্র এইভাবে টিকে থাকতে পারে না। তাকে জনসাধারণের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ বজায় রাখতে হয়।

সংবাদপত্রের বাড়িটি (ভাড়া বাড়ির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য) ন্যূনতম কত বড় হবে সে সম্পর্কেও বলা যায়। আজকাল ডিটিপি ও অফসেটের জন্য বড় জায়গা লাগে না। সুতরাং তিনটি বড় ঘরই যথেষ্ট। প্রত্যেকটি ঘর ১২ × ১৪ বা ১২ × ১৫ হলেই যথেষ্ট। একটি ঘর হবে সম্পাদকীয় ও প্রশাসন দফতর। সম্পাদক মশাই ও দুজন সাংবাদিকের বসার টেবল থাকল একদিকে। অন্যদিকে সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ।

দ্বিতীয় ঘরটিতে দু তিনটি ডিটিপি বসতে পারে। তার এক দিকে ছোট্ট লাইব্রেরি থাকতে পারে। লাইব্রেরিতে কিছু প্রয়োজনীয় ক্লিপিং রেফারেন্স বই ও অভিধান থাকবে। জেলা গেজেটিয়ার, জেলা বিষয়ক বইপত্র, সাংবাদিকতার কয়েকটি বই, ইয়ার বুক লাইব্রেরিতে অবশ্যই থাকবে।

ডিটিপি রুমের স্বাভাবিক নির্জনতা যাতে ব্যাহত না হয় তার চেষ্টা করতে হবে। সম্পাদক লেখালেখির জন্য এই ঘরে আর একটি টেবল রাখতে পারেন। হিসাবের কাজ যিনি করবেন তাঁর টেবলটিও এই ঘরে থাকবে। প্রয়োজনে তিনি কম্পিউটর ব্যবহার করতে পারবেন।

আর একটি ঘর থাকবে ওয়েব অফসেট বা মিনি অফসেট বসানোর জন্য। যাঁদের নিজস্ব ছাপাখানা নেই তাঁরা সাধারণ প্রেস থেকে ছাপতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাঁদের একটা ঘর ও বিরাট লগ্নী বেঁচে গেল।

কিন্তু নিজস্ব ছাপাখানা ছাড়া সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগে অনেক বাধা। যেমন ঃ

১. অন্যের প্রেসে ছাপলে নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে থাকে না। সেই প্রেস মালিকের মর্জিমত চলতে হয়। অথচ পত্রিকা নির্দিষ্ট দিনে প্রকাশ করা দরকার।

২. পত্রিকার প্রচার সংখ্যা বাড়লে অন্য প্রেস থেকে ছাপলে তুলনামূলকভাবে খরচ বেশি পড়ে যায়।

নিজস্ব প্রেসের সুবিধা

১. প্রেস থাকলে ব্যাঙ্ক ঋণ পাওয়ার সুবিধা হয়।

২. প্রেসে বাইরের কাজ করে দিয়ে যে মুনাফা হয় তাতে পত্রিকাটি বাই প্রোডাক্ট হিসাবে প্রায় বিনামূল্যে ছাপা হয়ে যায়।

৩. বিজ্ঞাপনদাতাদের কাজে প্রকাশন সংস্থাটির বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ে।

৪. নিজস্ব প্রেস থাকায় ভবিষ্যতে যখন তখন সম্প্রসারণের সুযোগ থাকে। আপনি একাধিক পত্রিকা প্রকাশ করতে পারেন। বই প্রকাশ করতে পারেন। বাইরের কাজ না পেলে নিজস্ব প্রকাশনা যত সম্প্রসারিত হয় ততই ছাপাখানার ইউনিট ব্যয় কমতে থাকে।

৫. নিজস্ব ছাপাখানা থাকলে সবসময় মুদ্রণ ব্যয় মেটাবার জন্য ক্যাশ টাকা নিয়ে বসে থাকতে হয় না।

যাঁরা এখনই বড় লগ্নীর ঝুঁকির মধ্যে যেতে চান না, তাদের পক্ষে মিনি অফসেট প্রেস বসানো ভাল। এতে ট্যাবলয়েড সাইজের কাগজ ছাপা যায়। জায়গা আরও কম লাগে। জবের কাজ ও বই-এর কাজ-এর পক্ষে মিনি অফসেট খুবই ভাল কাজ দেয়।

মূলধন ঃ কমিউনিটি সংবাদপত্র চালাতে গেলে কত মূলধনের দরকার?

অফসেট প্রেস বসালে ও নিজস্ব জমি ও বাড়ি করতে গেলে বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী অন্তত তিনকাঠা জমি লাগবে। তার দাম ৩ লক্ষ। একটি দু কালারের অফসেট মেশিন বসাতে গেলে চায় ২০ লক্ষ টাকা। মিনি অফসেট ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে। এ ছাড়া ক্যামেরা বসানোর জন্য আলাদা খরচ আছে। অন্তত তিনটি কম্পিউটর-স্ক্যানিং-এর যাবতীয় সুবিধা ও প্রিন্টার সহ ১·৫০ লক্ষ টাকা। বাড়ি যদি তৈরি করেন তাহলে দু হাজার বর্গফুটের দোতলা বাড়ির খরচ আট লক্ষ টাকা। আপনাকে এক বছর লোকসান হবে ভেবে নামতে হবে। একজন রিপোর্টার, একজন সাব এডিটর, একজন সার্কুলেশন, একজন বিজ্ঞাপন কর্মী, একজন ম্যানেজার, প্রেসের জন্য তিনজন কর্মী ও ডিটিপির জন্য চারজন কর্মী ও একজন অ্যাকাউন্টেন্ট দরকার। এছাড়া লাগবে জন দুয়েক পিওন। তাহলে মোট কর্মীর সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে মালিককে ধরে ১৫। এঁদের এক বছরের বেতন চার লাখের মত। এক বছরের নিউজপ্রিন্ট লাগবে মাসে ১ টন করে (সাপ্তাহিক পত্রিকা। ৪ হাজার প্রচার) বছরে ১২ টন। আরও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বিদ্যুৎ, টেলিফোন, কর, আসবাবপত্র মিলিয়ে আরও পাঁচ লাখ।

তাহলে প্রথম বছরে লগ্নী করতে হবে ৪২ থেকে ৪৫ লাখের মত। এর মধ্যে আপনার নিজস্ব অ্যাসেট ১১ লাখ টাকা জমিতে বাড়িতে থাকা চাই।

কিন্তু এই প্রজেক্টের সুবিধা বাড়ি জমি আপনার স্থায়ী অ্যাসেট হয়ে থাকছে। বাড়ির দোতলা ভাড়া দিয়ে আপনি বছরে ৬০ হাজার টাকা এবং প্রেস থেকে বাইরের পার্টির কাজ করে বছরে ৩৬ লাখ ও পত্রিকা থেকে প্রথম বছর বিজ্ঞাপন থেকে ৪ লাখ টাকা বিজ্ঞাপন আশা করতে পারেন। ৪৮টি সংখ্যার প্রতি সংখ্যায় ৮।৯ হাজার টাকার বিজ্ঞাপন তুলতেই হবে।

যাঁরা নিজস্ব ছাপাখানা, বাড়ি জমিতে লগ্নি করতে চান না, ভাড়া বাড়িতে অন্যের ছাপাখানা থেকে ছাপাতে চান এবং স্টাফ সংখ্যাও কম রাখতে চান তাঁদের পত্রিকার গুণগত মানের উন্নতি ব্যাহত হবে। কারণ বর্তমান যুগে একাহাতে সম্পাদকের পক্ষে পত্রিকা চালানো সম্ভব নয়। সংবাদপত্রের চেহারার মধ্যেই প্রতিষ্ঠানের স্পন্দন ও অবস্থার ছাপ ফুটে ওঠে। ঝকঝকে ছাপা, ঝকমকে মেশিন, ঝকঝকে অফিস ও দক্ষ কর্মীদের সমন্বয় ছাড়া কোন পত্রপত্রিকার টিকে থাকা সম্ভব নয়। শুধু আদর্শ নিয়ে সাংবাদিক একনিষ্ঠভাবে জীবন কাটিয়ে দিতে পারেন কিন্তু এই পত্রিকাকে মুনাফাজনক করে তোলা মুশকিল। তবে পরীক্ষামূলক ভাবে কোন উদ্যোগী বাড়ি ভাড়া নিয়ে ও বাইরের ছাপাখানা থেকে ছাপিয়ে পত্রিকা প্রকাশ করে দেখাতে পারেন। কিন্তু তাঁকে দু বছরের মূলধন নিয়ে নামতে হবে।

সার্কুলেশন ঃ কোন পত্রিকার সাফল্য নির্ভর করে তার প্রচার সংখ্যার ওপর। কিন্তু কমিউনিটি সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যার একটি সম্ভাব্য উর্ধ্বসীমা আছে। কারণ কমিউনিটি সংবাদপত্র একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে প্রচারিত হয়।

তবে জেলাশহর থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলি সারা জেলায় প্রচারিত হতে পারে। কিন্তু আরামবাগ পত্রিকা কান্দীবান্ধব পত্রিকার প্রচার মহকুমার বাইরে বেশী হওয়া সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গে এখন গ্রাম থেকেও পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকাগুলির পরিকাঠামোর পিছনে অর্থলগ্নী করে পত্রিকার প্রচার বাড়ানো সম্ভব নয়। সেজন্য এই সব পত্রিকার প্রকাশনা ইউনিটকে সমধর্মী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অংশ করে নিতে হবে।

যেমন, একটি কমিউনিটি সংবাদপত্র একটি ডিটিপি কিনল। সেই ডিটিপিতে বাইরের কাজও করল। সেই সঙ্গে একটি জেরক্সের ব্যবসাও তারা চালাতে পারে। ওই পত্রিকা প্রকাশনা সংস্থা কলকাতার বড় ম্যাগাজিন বা সংবাদপত্রের ডিস্ট্রিবিউটর হতে পারে। দুজন সম্পাদকীয় কর্মী ও দুজন ডিটিপি অপারেটর ও একজন সার্কুলেশন কাম বিজ্ঞাপন কর্মী নিয়েও একটি পাক্ষিক পত্রিকা চলতে পারে।

একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে কালনা থেকে প্রকাশিত সোচ্চার পত্রিকাটি প্রতিবার ৫৬১০ কপি ছাপে। এর মধ্যে ৫২৫০ কপিই বিক্রি হয়ে যায়। পত্রিকাটি প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা স্টাফ বেতন দেয়। বছরে ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার মত বিজ্ঞাপন পায় পত্রিকাটি। কর্পোরেট বিজ্ঞাপন পেলে প্রতি বছর ৪ লক্ষ টাকার বিজ্ঞাপন পাওয়া এমন কিছু কঠিন নয় পত্রিকাটির পক্ষে।

সার্কুলেশন বাড়াবার পদ্ধতি ঃ সার্কুলেশন বাড়াবার প্রথম ধাপ হল সম্পাদকীয় বিষয়বস্তুর (editorial content : যেমন সংবাদ, ফিচার) মানের উন্নতি ঘটানো।

এমন সংবাদের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে যা কেউ অবগত নয়। অর্থাৎ exclusive item. এজন্য প্রতিবেদকের সংবাদ জ্ঞান (News Sense) থাকবে প্রখর। এছাড়া দিতে হবে চিত্তাকর্ষক ফিচার। তদন্তমূলক কাহিনী সংবাদপত্রের প্রচার বাড়াবার পক্ষে ভাল উপাদান। সংবাদপত্রে পাঠকের মতামত, অভাব অভিযোগকে প্রাধান্য দিতে হবে। এজন্য নানা ধরনের চুটকি লেখা ছাপতে হবে।

প্রচার বৃদ্ধির জন্য সম্পাদক বা প্রকাশককে উদ্যোগী হয়ে বার্ষিক গ্রাহক সংগ্রহের দিকে নজর দিতে হবে।

একটি পত্রিকা তার নিজস্ব প্রভাব খাটিয়ে এক হাজার গ্রাহকের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা সংগ্রহ করতে পারে। একটি পাক্ষিক পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪৮ টাকা মাত্র। ৫০ টাকা বা ১০০ টাকা পর্যন্ত দেবার অনেক লোক আছে।

বিনামূল্যের পত্রিকা ঃ পত্রিকার প্রচার সংখ্যা দশ হাজার পর্যন্ত বাড়িয়ে সম্পন্ন ব্যক্তিদের বেছে বেছে বিনামূল্যে তাদের পত্রিকা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা চালু করা যায়। এতে যে সুবিধাটা পাওয়া যায় সেটি হল কর্পোরেট বিজ্ঞাপন দাতারা নিশ্চিত হতে পারেন এই পত্রিকাটি দশ হাজার ক্রেতার কাছে গিয়ে পৌছচ্ছে। বিক্রির ওপর নির্ভর করলে এই সংখ্যা শুধু অর্ধেকই হবে না, এই পত্রিকা অনেক আজেবাজে লোকের কাছে পৌঁছতে পারে। আজেবাজে লোক অর্থে যাদের ক্রয়ক্ষমতা নেই। যারা সিরিয়াস পাঠক নয়।

যদি বিনামূল্যে বিতরণ নাও করতে পারেন তাহলে লবণ হ্রদ সংবাদ পত্রিকার মত ৩৬ পাতার পত্রিকা এক টাকায় বিক্রি করতে পারেন। এতেও প্রচার সংখ্যা বাড়ে। পত্রিকাটিকে যদি শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের বাহন করে তুলতে পারেন তাহলে কোথায় কি পাওয়া যায় তা জানবার জন্যই লোকে পত্রিকাটি কিনবে। লবণহ্রদ সংবাদ লোকে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন পড়ার জন্যই কেনে। মনে রাখবেন ভারতের প্রথম সংবাদপত্র হিকির গেজেট প্রধানত শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের কাগজ ছিল। প্রথম পাতাতেই শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন ছাপা হত যার জন্য পত্রিকাটির নাম ছিল, বেঙ্গল গেজেট অর ক্যালক্যাটা আডভার্টাইজার। কমিউনিটির সঙ্গে এই শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

কমিউনিটি সংবাদপত্রের পক্ষে পাঁচ হাজার প্রচার যথেষ্ট ভাল। তবে জেলা থেকে প্রকাশিত পত্রিকার দশ থেকে পনের হাজার প্রচারের সুযোগ আছে। এজন্য এই ধরনের পত্রিকাকে এজেন্ট নিয়োগ করতে হবে। দৈনিক সংবাদপত্রের হকারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পত্রিকা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। স্টল থেকে এই পত্রিকা বেশী বিক্রি হবে না।

এজেন্টদের অন্তত ৫০ শতাংশ কমিশন দিতে হবে যাতেক ২ টাকার কাগজ বিক্রি করে তারা অন্তত ১ টাকা করে পায়। প্রকাশককে ১ টাকা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। পাঁচ হাজার পত্রিকা বিক্রি করে পাঁচ হাজার টাকা পেলে তার ছাপার খরচটা অন্তত উঠে আসবে। কিন্তু অন্যান্য খরচ তাকে তুলতে হবে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে।

বিজ্ঞাপন ঃ কমিউনিটি পত্রিকার বিজ্ঞাপন চারটি সূত্র থেকে আসে। (১) শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন। লবণ হ্রদ সংবাদের এইটাই প্রধান আয়ের সূত্র। এর সুবিধা হচ্ছে বিজ্ঞাপন সরাসরি আসে। এজেন্সিকে কমিশন দিতে হয় না। টাকা সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়। দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয় না। টাকাটা নগদে পাওয়া যায়। সুতরাং এই টাকা ইচ্ছামত খরচ করা যায়।

কমিউনিটি সংবাদপত্রের সম্পদ বৃদ্ধির মূল জায়গাটা হতে পারে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন। একটি ট্যাবলয়েড সাইজের সংবাদপত্রে প্রতি পাতায় দু হাজার শব্দ ধরে। লবণ হ্রদ সংবাদে একটি কলম লাইনের ব্যয় ২০ টাকা। তাতে চারটি শব্দ ধরে। একটি পাতায় দু হাজার শব্দ থেকে দশ হাজার টাকা পাওয়ার কথা। হেডিং-এর জন্য জায়গা ছেড়েও আট ন হাজার টাকা আসে। জেলার সংবাদপত্রগুলি চার পাতার শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন তুলতে পারলে ত্রিশ হাজার থেকে ৩৫ হাজার টাকার বিজ্ঞাপন তুলতে পারে প্রতি সংখ্যায়। চোখের সামনে লবণ হ্রদ সংবাদের মডেল তো রয়েছেই। তাহলে কেন মালদহ সমাচার বা কান্দীবান্ধব এর অর্ধেক বিজ্ঞাপনও তুলতে পারবে না? বিজ্ঞাপনের আর একটি সূত্র হল রিটেল বিক্রির বিজ্ঞাপন, যা দোকানদাররা দেয়। বর্তমানে এই বিজ্ঞাপন বাড়ছে। দৈনিক সংবাদপত্রগুলি জেলার পাতা করে এই রিটেল বিজ্ঞাপন ছেঁকে তুলে নিচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞাপনদাতাদের বোঝাতে হবে। স্থানীয় কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে তাদের মিলি রেট অনেক কম পড়বে। মিলি রেট হল প্রতি মিলিয়ন পাঠকের কাছে পৌঁছতে মাথা পিছু রেট। কালনার একটি কাপড়ের দোকান কলকাতার কাগজে ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে বিজ্ঞাপন দিল। এতে সামগ্রিকভাবে তার মিলি রেট কম পড়ল। কিন্তু আরামবাগ বা

বালুরঘাটের লোকের এই বিজ্ঞাপন পড়ে কী হবে? কালনার পাঁচশ জন বিজ্ঞাপনটি পড়ল। তাতে তার খরচ পড়ল ৩০০০ ÷ ৫০০ = ৬ টাকা। সে জায়গায় স্থানীয় কাগজে বিজ্ঞাপনের রেট হয়তো ২০০০ টাকা। পাঠক ১০০০। তাহলে মিলিরেট ২০০০ ÷ ১০০০ = মাথা পিছু মাত্র ২ টাকা। যদি বিজ্ঞাপনদাতা এক হাজার কাগজ কিনে নিয়ে তাঁর সম্ভাব্য খরিদ্দারকে বিলি করেন তাহলেও তার আর মাত্র ১ হাজার টাকা খরচ। এতে তার মিলি রেট পড়ছে মাত্র তিন টাকা।

এইভাবে বিজ্ঞাপনদাতাদের বোঝাবার দায়িত্ব বিজ্ঞাপন সংগ্রহকারীদের।

তৃতীয় সূত্র হল, সরকারি বিজ্ঞাপন। বর্তমানে বছরে অন্তত দুবার এই সরকারি বিজ্ঞাপন আসে। কিন্তু তার রেট ভাল নয় এবং বিজ্ঞাপনের টাকা পেতে সময় লাগে।

তবে কমিউনিটি সংবাদপত্রগুলির আর একটা বাঁধা আয় টেণ্ডার নোটিশ থেকে। অনেক সংবাদপত্র চিরাচরিতভাবে এই বিজ্ঞাপন থেকে ভাল টাকা আয় করে। কিন্তু পত্রিকাটির উন্নয়নের চেষ্টা করে না। এটি অসাধুতা ও এক ধরনের ব্ল্যাকমেলিং।

বিজ্ঞাপন পেতে গেলে কমিউনিটি সংবাদপত্রকে সুদৃশ্য রেট কার্ড তৈরি করতে হবে।

রেট কার্ডে থাকবে ঃ

সাদা কালো বিজ্ঞাপনের পূর্ণ পৃষ্ঠার রেট

অর্ধ পৃষ্ঠার রেট।

বিশেষ জায়গার জন্য সারচার্জ।

যেমন প্রথম পাতায় মাস্টহেডের দু পাশে ইয়ার প্যানেল। প্রথম পাতায় একমাত্র বিজ্ঞাপন Solace. সাধারণত সংবাদপত্রে কলম সেন্টিমিটার হিসাবে বিজ্ঞাপনের রেট ধরা হয়। প্রতি কলমে ৫.৫ সেন্টিমিটার করে width বা প্রস্থ। সেটিকে ধরে বিজ্ঞাপনের ম্যাটার কলম ও সেন্টিমিটার অনুযায়ী ধার্য হয়। চার কলম × ২০ সেঃ এর অর্থ বিজ্ঞাপনটির প্রস্থ হবে ৫.৫ × ৪ = ২০.২০ সেঃ, (চারটি কলম জুড়ে) আর দৈর্ঘ্য হবে ২০ সেঃ। এই মাপের জায়গা করে নিয়ে তার মধ্যে বিজ্ঞাপনটি কম্পোজ হবে। বিজ্ঞাপন এজেন্সি বিজ্ঞাপন দিলে তাঁরা ওই মাপেরই তৈরি করা ম্যাটার পাঠাবেন, তাকে আটপুল বলে।

বিজ্ঞাপনের রেটকার্ডে পত্রিকার সাইজ, কত কলমের পত্রিকা, কলমের সাইজ সব উল্লেখ করতে হয়। তারপর ওই রেটকার্ডের সঙ্গে বিজ্ঞাপন দেবার অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি দিতে হয়। রেটকার্ডের একটি পৃষ্ঠায় আপনার পত্রিকার একটি প্রোফাইল বা সংক্ষিপ্ত বিবরণী তৈরি করুন। কোথায় আপনার পত্রিকার বৈশিষ্ট্য, কারা কারা/আপনার কাগজ পড়েন, পুরুষ মহিলা পাঠকের অনুপাত, বিভিন্ন আয়ের লোকজনের মধ্যে প্রচারের শতাংশ এই সব তথ্য আপনার নিজস্ব সমীক্ষা থেকে বার করে আনতে হবে।

বিজ্ঞাপনদাতা যেন বুঝতে পারেন তাঁরা যে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন তাতে তাদের সামগ্রীর বিক্রি বাড়বে কিনা।

ক্রোড়পত্র বা বিশেষ সংখ্যা ঃ কমিউনিটি সংবাদপত্র বিজ্ঞাপন তোলার জন্য মাঝে মাঝে ক্রোড়পত্র বা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে পারে। বিশেষ সংখ্যা বিজ্ঞাপনদাতাদের আকৃষ্ট করার জন্যই এ কাজ করা হয়। নিচে কতকগুলি বিশেষ সংখ্যার পরিকল্পনা দেওয়া হল।

জেলা সংস্কৃতি সংখ্যা ঃ এতে থাকবে জেলার সংস্কৃতি সম্পর্কে কয়েকটি লেখা।

জেলার শিল্প ঃ জেলার শিল্প সম্ভাবনা ও বর্তমান শিল্পের হাল হকিকৎ।

জেলাপর্যটন সংখ্যা ঃ এই সংখ্যায় থাকবে জেলার বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রের বিবরণ। পর্যটন শিল্পের নানা সমস্যার কথা। বিজ্ঞাপন দেবেন হোটেলগুলি, পর্যটন দফতর, পরিবহণ সংস্থা। এছাড়া শিল্পভিত্তিক বিশেষ সংখ্যা বা ক্রোড়পত্র হতে পারে। যেমন কুটীর শিল্প, কৃষি, আম, পাট, নতুন উপনগরী, আবাসন। সড়ক পরিবহণ। এসব ক্ষেত্রে স্থানীয় চেম্বার অব কমার্সের সঙ্গে কথা বলে নিলে ভাল।

মরশুমি ক্রোড়পত্র ঃ বিভিন্ন মরশুমে বিশেষ পণ্যের বিক্রি বাড়ে তখন সেই পণ্য বিজ্ঞাপন দেয়। যেমন গ্রীষ্মের সময় ফ্যান, এয়ারকুলার, শীতের সময় শয্যাদ্রব্য, বিয়ের মরশুমে শাড়ি, হল ভাড়া, ডেকরেটর, ক্যাটারিং কোম্পানির বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়।

৪.৩ সারাংশ

সংবাদপত্র ম্যানেজমেন্ট বলতে বোঝায় সংবাদপত্রের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়। কমিউনিটি সংবাদপত্রের পরিবার ছোট পরিবার। কিন্তু ছোট পরিবারেও সুশৃঙ্খল পরিচালনার দরকার আরও বেশি।

এই পরিচালনার প্রথম শর্ত হচ্ছে একটি পেশাদারি ধারণা। সেটি সংবাদপত্র একটি পণ্য। বিক্রি ও বিজ্ঞাপন সংগ্রহ থেকে খরচখরচা বাঁচিয়ে তাকে লাভ করতে হবে। এই চিন্তায় ভাবিত হওয়াই পেশাদারিত্ব।

সংবাদপত্রকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনার জন্য তার পরিকাঠামো গড়ে তোলা দরকার। এজন্য মোটামুটি ভাল লগ্নীর প্রয়োজন। এই লগ্নীর মধ্যে ছাপাখানা ও জমি বাড়ি পড়ে। নিজস্ব ছাপাখানা থাকলে ছাপাখানা থেকে স্থায়ী আয় হতে পারে।

সংবাদপত্রকে অন্যান্য সেবামূলক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত করা যায়।

প্রচার ও বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্য দক্ষ কর্মী ও নানা উদ্ভাবনী চিন্তা চাই।

সংবাদপত্রের দাম কম রেখে অথবা বিদেশের আদলে বিনামুল্যের সংবাদপত্র প্রকাশ করে প্রচার বাড়ানো যায়। শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন সংগ্রহের দিকে বেশি দৃষ্টি দেওয়া দরকার। বিজ্ঞাপন সংগ্রহের স্বার্থেই কমিউনিটি সংবাদপত্রের প্রচার বাড়াতে হয়। বিজ্ঞাপন থেকে আরও আয় বাড়াবার জন্য ক্রোড়পত্র ও বিশেষ সংখ্যা বার করা দরকার।

কমিউনিটি সংবাদপত্র পরিচালনা করতে গেলে চালককে কী কী অত্যাবশ্যক গুণের অধিকারী হতে হবে।

একটি বিশেষ ক্রোড়পত্রের পরিকল্পনা করান।

৪.৪ অনুশীলনী

১। সংবাদপত্র ম্যানেজমেন্ট কী?

২। কমিউনিটি সংবাদপত্র চালাতে গেলে কত মূলধনের দরকার?

৩। সার্কুলেশন বাড়াবার পদ্ধতি কী?

৪। সংবাদপত্রকে কী কী কাজের সঙ্গে যুক্ত করা যায়?

৪.৫ গ্রন্থপঞ্জী

১।	বিষয় সাংবাদিকতা	ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়	লিপিকা। ৩০/১এ, কলেজ রো, কলকাতা-৯
২।	বিষয় বিজ্ঞাপন	ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়	— ঐ —
৩।	সংবাদ লেখা ও সম্পাদনা	সিকান্দার ফয়েজ	বাংলা আকাদামি, ঢাকা
৪।	Hand Book of Editing and production,	P. Kacharoo.	

একক ৫ □ কেবল্ টিভি নেটওয়ার্ক ঃ ভূমিকা ও কার্যাবলী

গঠন

৫.০ উদ্দেশ্য

৫.১ প্রস্তাবনা

৫.২ পরিচয় প্রসঙ্গ

৫.২.১ ভারতীয় প্রেক্ষাপট

৫.৩ বাহক থেকে প্রেরক

৫.৪ কেবল্ টিভি ঃ বিভিন্ন দিকে

৫.৫ সমাজজীবনে কেবল্ টিভির ভূমিকা ঃ ভারতীয় প্রেক্ষাপট

৫.৬ সারাংশ

৫.৭ অনুশীলনী

৫.৮ উত্তর সংকেত

৫.০ উদ্দেশ্য

চাহিদা থেকেই আবিষ্কার—প্রয়োজন বা চাহিদা থেকেই বিজ্ঞান ও প্রাথমিক আবিষ্কার এগিয়ে চলে। একথা কেবল্ টিভির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অবশ্য মানুষের চাহিদা বা প্রয়োজনের কোনো সীমা নেই। নতুন নতুন সৃষ্টি যে এমন নিত্যকার প্রয়োজনে পরিণত হয়েছে, কেবল্ টিভি তাই প্রমাণ করছে। আর নিত্যপ্রয়োজনীয়তার অর্থই হল আমাদের ওপর তার প্রভাব—প্রথমে ব্যক্তিগত পরে গোষ্ঠীগত বা সামাজিক। আজকের জীবনযাত্রার অন্যতম আবশ্যক কেবল্ টিভির সামাজিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করাই হল এই এককের উদ্দেশ্য।

৫.১ প্রস্তাবনা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমাগ্রগতি উন্নত করেছে তথ্য ও সম্প্রচার ব্যবস্থাকে। শিক্ষার সঙ্গে বিনোদনের মেলবন্ধনে তথ্য আজ পণ্য। বিশ্বময় তাকে ছড়িয়ে দিতে মাধ্যমের বিভিন্নতা তাই লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে প্রথম সারির উদাহরণ কেবল্ টিভি। তার বিকাশ, অগ্রগতি এবং সমাজ জীবনে অবশ্যম্ভাবী প্রভাব আলোচনা করা হবে এই এককে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আমেরিকা ও ইউরোপের কয়েকটি দেশে কেবল্ টিভির বিস্তার যেহেতু অনেক আগে ঘটেছে তাই আমাদের আলোচনায় ভারতীয় প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি সেই সব দেশের প্রসঙ্গও গুরুত্ব পাবে।

৫.২ পরিচয় প্রসঙ্গ

কেবল্ টিভির যাত্রা শুরু হয়েছিল আমেরিকার পেনসিলভ্যানিয়ায়, মাহানোয় নামের একটি ছোট্ট শহরে ১৯৪৮ সালে। এখান থেকে মাত্র ৮৬ মাইল দূরে ফিলাডেলফিয়ায় ছিল তিনটি টিভি স্টেশন। কিন্তু পর্বতসঙ্কুল মাহানোয় শহরে সেখান থেকে পাঠানো সিগন্যাল পৌঁছাত না। শহরবাসী বঞ্চিত হত টিভি দেখার থেকে। এমন অবস্থায় পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে এলেন জন ওয়ালসন। পেশায়, কারুর মতে পেনসিলভ্যানিয়া পাওয়ার অ্যান্ড লাইট কোম্পানীর লাইনস্‌ম্যান, কেউ বলেন টিভি সেট বিক্রেতা। ব্যবসায়িক কারণেই এগিয়ে এসেছিলেন অবস্থার উন্নতিকরণে, খ্যাত হয়ে রইলেন কেবল্ টিভির আবিষ্কর্তা হিসাবে।

১৯৪৭ সাল। মাহানোয় শহরের নিকটবর্তী পাহাড়ের মাথায় বসানো হল বড় অ্যান্টেনা। সেখান থেকে তারের সাহায্যে সংযোগস্থাপন করা হল শহরের বিভিন্ন বাড়ির সঙ্গে। ফিলাডেলফিয়া থেকে পাঠানো দুর্বল সিগন্যাল অ্যান্টেনার সাহায্যে ধরে নিয়ে অ্যামপ্লিফায়ারের সহায়তায় তাকে বর্ধিত করা হল। তারের মাধ্যমে সেই বিবর্ধিত ও পরিষ্কার সিগ্‌ন্যাল পৌঁছে গেল শহরের মধ্যে। সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটি বিখ্যাত হয়েছিল কম্যুনিটি অ্যান্টেনা টেলিভিশন বা CATV নামে। কেবল্ টিভি হিসাবে তার উত্তরণের পথ পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত হবে।

• অবশ্য অনেক বিশেষজ্ঞের মতে কেবল্ টিভির প্রথম রূপকার অ্যাস্টোরিয়ার এক উঠতি ব্যবসায়ী। যিনি শহরের এক আটতলা বাড়ির ওপর বড় অ্যান্টেনা বসিয়ে টিভিতে পরিষ্কার ছবি দেখার বন্দোবস্ত করেছিলেন। তবে আবিষ্কর্তার নাম বা শহরের নামে ভিন্নতা থাকলেও সময়টা যে বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক তা নিয়ে মতবিরোধ নেই।

এই হল শুরুর ইতিহাস। এরপর, শুধুই এগিয়ে যাওয়ার কাহিনী। ১৯৪৮-এ ওয়ালসনের গ্রাহকসংখ্যা ছিল ৭২৭। ১৯৫২-তে সারা আমেরিকায় ১০টি কেবল্ সিস্টেম ১৪,০০০ গ্রাহককে নিয়ে পথ চলেছিল। ১৯৬০-এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৬,৫০,০০০, সিস্টেম ৬০০টি। একদশকের মধ্যে ২,৫০০ কেবল্ সিস্টেম ৪·৫ কোটি গ্রাহকের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে এবিসি টেলিভিশন নেটওয়ার্কের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমেরিকার ৮০০০টি কেবল্ সিস্টেম ৫০ কোটি গ্রাহক নিয়ে ২৯টি চ্যানেলের অবিরাম পরিষেবা দিয়ে চলেছে। আর নব্বইয়ের দশক থেকে আজ পর্যন্ত যে পরিবর্তন তাকে শুধু পরিসংখ্যান দিয়ে বোঝানো যথেষ্ট নয়। সেই আমূল পাল্টে যাওয়ার ঘটনা পরে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে।

৫.২.১ ভারতীয় প্রেক্ষাপট

কম্যুনিটি অ্যান্টেনা টেলিভিশন ভারতে প্রথম ডানা মেলেছিল 'স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়া লিমিটেড বা সেইল-এর বদান্যতায়। ১৯৮২ সালে 'সেইল' তার রাউরকেল্লা শিল্পাঞ্চলে প্রথম কেবল্ টিভি চালু করে। অবশ্য তা সীমাবদ্ধ ছিল প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মধ্যেই। পরবর্তীকালে একইভাবে দুর্গাপুর, সালেম ও রাঁচীশহরেও এ ব্যবস্থা চালু হয় নিজস্ব খবর আদানপ্রদানের কাজে।

তবে বৃহত্তর অর্থে ভারতীয় দর্শক এ টিভির স্বাদ পায় আশির দশকে। বিনোদনকে হাতিয়ার করে এক সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে শুরু হয় ভারতীয় কেবল্ টিভির যাত্রা। বড় শহরগুলিতে ভিডিও ক্যাসেটের প্রচলন হয় আশির দশকের শুরুতে। নতুন নতুন সিনেমা বাড়িতে বসে দেখার মানসিকতা ক্যাসেটের ব্যবহার দেয় বাড়িয়ে। কিন্তু ভিসিপি ছাড়া শুধু নিজস্ব টিভি সেটকে কাজে লাগিয়ে ভিডিও ক্যাসেট ব্যবহার করা যায় না।

আবার ভিসিপি-র দামও নেহাৎ কম নয়। সেইসঙ্গে আছে ক্যাসেটের ভাড়া। এইসব কারণে ভিডিও ক্যাসেট পরিবারকেন্দ্রিক বিনোদনের চেয়ে অনেক বেশি গোষ্ঠীকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিল। আর বিনোদনের নতুন এই ব্যবস্থাই সম্ভবত কেবল্ টিভির পথ খুলে দিল।

শুরু হয়েছিল মুম্বাইতে, ১৯৮৪ সালে। যেকোনো একটি বাড়িতে ভিসিপি বা ভিসিআর-এর সাহায্যে ভিডিও ক্যাসেটে জনপ্রিয় কোনো সিনেমা দেখানো হয়। এই সেট-এর সঙ্গে তারের সাহায্যে বিভিন্ন বাড়ির টিভি সেটের সংযোগস্থাপন করলে খুব স্বাভাবিকভাবেই দর্শকরা জনপ্রিয় সিনেমাটি বাড়ি বসেই দেখতে পারবেন। এতে লাভ হচ্ছে দু'পক্ষেরই। দর্শকরা খুব কম টাকাতেই প্রতিদিন নতুন সিনেমা দেখতে পান। আর যিনি সমস্ত ব্যবস্থাটির নিয়ন্ত্রক অর্থাৎ কেবল্ অপারেটর তিনি খুব অল্প টাকা বিনিয়োগ করেই লাভজনক স্থায়ী ব্যবসা করতে পারেন। দর্শক তথা গ্রাহকদের প্রতিমাসে এজন্য কেবল্ অপারেটরকে টাকা দিতে হয়। যত গ্রাহকসংখ্যা বেশি হয় লাভও তত বেশি হয়। অর্থাৎ দর্শককেও আর টাকা খরচ করে ভিসিপি কিনতে হল না কিংবা প্রতিদিন ক্যাসেট ভাড়া করতেও হল না। অন্যদিকে কেবল্ অপারেটর প্রাথমিকভাবে একটা ভিসিপি বা ভিসিআর কিনে নিতে পারলে খরচ বলতে শুধু প্রতিদিনকার ক্যাসেট ভাড়া। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রথম সংযোগ দেওয়ার সময় অবশ্য কিছু অতিরিক্ত চার্জ গ্রাহকদের দিতে হয়। একটা ছোট পরিসংখ্যান থেকে কেবল্ টিভির জনপ্রিয়তা মাপা যেতে পারে। ন্যাশনাল রিডারশিপ সার্ভে তাদের ২০০২ সালের রেকর্ড থেকে জানাচ্ছে যে, ২০০২ সালে ভারতবর্ষে কেবল্ টিভির সুবিধাপ্রাপ্ত বাড়ির সংখ্যা ৪০ কোটি।

৫.৩ বাহক থেকে প্রেরক

প্রাথমিক আলোচনা থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার যে কেবল্ টিভির উদ্ভব হয়েছিল এক বা একাধিক টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য। অর্থাৎ, এ যেন ঠিক পত্রবাহক। চিঠির ভেতর কি আছে সে জানে না, শুধু গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়াই তার কাজ। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতি কেবল্ টিভিকে বাহকের ভূমিকা থেকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় যোগাযোগকারী কৃত্রিম উপগ্রহের কথা।

মহাকাশে যদি এমন কিছু স্থাপন করা যায় যা পৃথিবীকে তার নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ করবে তবে তাকে কৃত্রিম উপগ্রহ বলা হবে। একদিন যা ছিল কল্পনা ১৯৫৭ সালে তাই হল বাস্তব। পুরোনো সোভিয়েত ইউনিয়ন মহাকাশে পাঠাল 'স্পুটনিক' উপগ্রহ। এগিয়ে এল আরও অনেক উন্নত দেশ। প্রাথমিকভাবে এদের কাজ ছিল তিনটি—

(১) আবহাওয়া সম্বন্ধে খবরাখবর প্রদান ও নজরদারি করা

(২) মহাকাশ গবেষণায় সাহায্য করা এবং

(৩) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো। এই তৃতীয় কাজটি সহায়তা করলো সম্প্রচার ব্যবস্থার ভোল পাল্টাতে।

প্রথম যোগাযোগকারী কৃত্রিম উপগ্রহটি পাঠালো আমেরিকার এ-টি. অ্যান্ড টি সংস্থা। নাম 'টেলস্টার'। ১৯৬২ সালে স্থাপিত এই উপগ্রহটি আমেরিকা ও ইউরোপের মধ্যে টেলিফোন বা টিভি সম্প্রচারের এক নতুন দিগন্ত খুলে দিল। এটি অবশ্য সারাদিনের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু সময়ই কাজ করতো। কারণ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যখন উপগ্রহটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ওপর দিয়ে যেতো তখনই সম্প্রচার সম্ভব হত। এ ব্যবস্থাও বদলে গেল ভূ-স্থানিক উপগ্রহ আসার পর। অবশ্য এ প্রসঙ্গে যাবার আগে বিশ্ব কৃত্রিম উপগ্রহ সংস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

অনেক সময় বিভিন্ন দেশ একজোটে কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে স্থাপন করে। এখানে একের বেশি উপগ্রহ একাধিক দেশকে পরিষেবা দিতে পারে। যেমন 'ইনটেলস্যাট'—আমেরিকা, কানাডা, জাপান, হল্যান্ড, স্পেন, বৃটেন ও ভ্যাটিকান; মোট সাতটি দেশের সহায়তায় ১৯৬৪ সালে এ সংস্থা রূপলাভ করে (২০ আগস্ট) কুড়িটিরও বেশি উপগ্রহ এবং ১২০টিরও বেশি দেশের গ্রাহকসংখ্যা এদের হাতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ভারত যোগাযোগ উপগ্রহ প্রথম মহাকাশে পাঠায় ১৯৮২ সালের ৪ অক্টোবর। নাম 'ইনস্যাট-১এ'।

পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে গেলে বলা যায় যে সাময়িক উপগ্রহ সম্প্রচার থেকে সবসময়ের জন্য সম্প্রচার ধরে রাখতে গেলে দরকার ছিল এমন কিছু যাতে উপগ্রহটি নির্দিষ্ট এলাকার ওপর সারাক্ষণ থাকে। কিন্তু পৃথিবী যেখানে ঘূর্ণায়মান সেখানে উপগ্রহ স্থির থাকবে কি করে? প্রয়োজন আপাত স্থিরতার। যদি পৃথিবীর সমান গতিবেগে উপগ্রহটিকে পৃথিবী অভিমুখে চালনা করা যায় তবে পৃথিবী থেকে এটি স্থির মনে হবে।

কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ বেতার তরঙ্গ সম্প্রচার পদ্ধতি

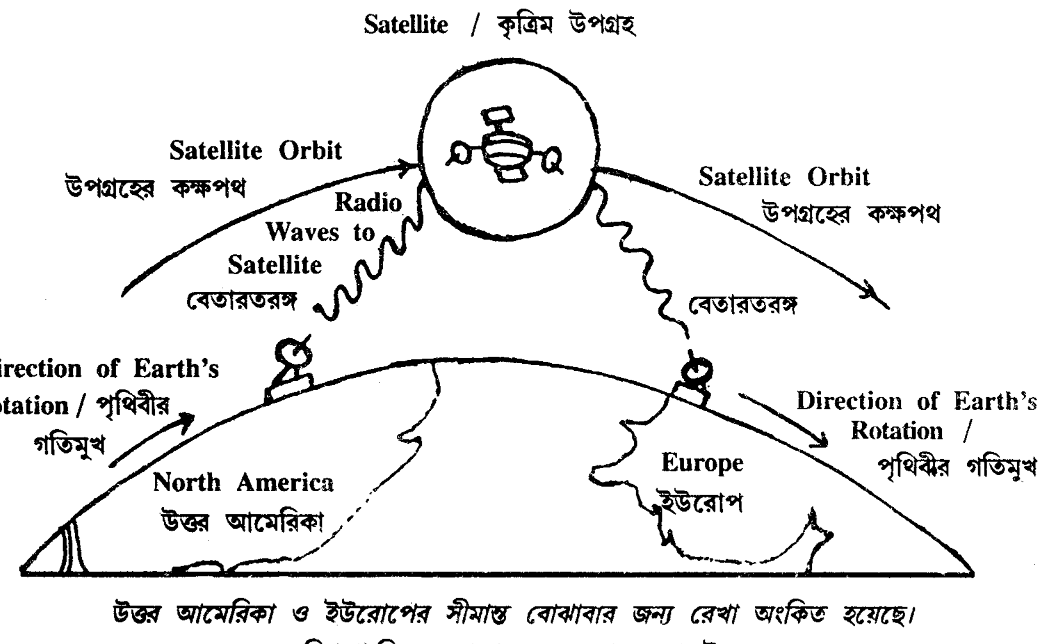

উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের সীমান্ত বোঝাবার জন্য রেখা অংকিত হয়েছে। বিশ্বমানচিত্রের সাথে এর সাদৃশ্য সামান্যই।

একে স্থাপন করতে হবে পৃথিবীর মাঝামাঝি তলে অর্থাৎ নিরক্ষরেখার তল বরাবর। ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা হবে ২২,৩০০ মাইল। আর ৬৮০০ মাইল প্রতি ঘণ্টা হিসাবে (অর্থাৎ পৃথিবীর গতিবেগ) ঘুরবে। এর ফলে ২৪ ঘণ্টা উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা পাওয়া সম্ভব হবে।

প্রথম ভূ-স্থানিক উপগ্রহটির নাম 'আর্লি বার্ড'। আমেরিকা ১৯৬৫ সালে এটি আটলান্টিকের ওপর স্থাপন করে। শুরু হলো এক নতুন অধ্যায়। সম্প্রচার ব্যবস্থার অগ্রগতিকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে গেল কেবল্ টিভি। এতদিন যা ছিল অন্য চ্যানেলের অনুষ্ঠান বাহক তারা নিজেই তৈরি করলো চ্যানেল। কেবল্ অপারেটররা তৈরি করলো চ্যানেলের নেটওয়ার্ক। এক একটি বড় দলের অধীনে দশটি বা তারও বেশি চ্যানেল। উপগ্রহের সাহায্যে পাঠিয়ে দিল সারা বিশ্বে। নাম হল উপগ্রহ টিভি চ্যানেল। পিছিয়ে থাকলো না ভারতবর্ষও। এ টি এন, জী টি ভি, এশিয়ানেট বা সান টিভির মত বেসরকারি সংস্থা দ্বারা পরিচালিত চ্যানেল শুরু হ'ল বিদেশী স্যাটেলাইট বা উপগ্রহের বদান্যতায়। কারণ দূরদর্শন ছাড়া অন্য কেউ ভারতীয় উপগ্রহ 'ইনস্যাট' ব্যবহার করতে পারতো না। বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য দূরদর্শন নিয়ে এলো ডি ডি-৭ বা মুভি ক্লাবের মত চ্যানেল।

অর্থাৎ মাত্র তিনটি চ্যানেলকে দেখার জন্য যে চেষ্টার শুরু হয়েছিল তাই আজ ১০০টি চ্যানেলের অনুষ্ঠানে রূপ পেয়েছে। খুবই দ্রুত অগ্রগতি। তার প্রভাব নিশ্চয় থাকবে ব্যক্তিজীবনে ও সামাজিক জীবনে। কেবল্ টিভি সমাজজীবনে কী প্রভাব ফেলছে তাই হবে এবারের আলোচ্য বিষয়। তার আগে কেবল্ টিভি ঠিক কী কী কাজ করে তার একটা বর্ণানুক্রমিক বিবরণ দেওয়া হবে।

৫.৪ কেবল্ টিভি ঃ বিভিন্ন দিকে

(ক) তথ্য ও বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে কেবল্ টিভি ঃ

আজকে এই যে বলা হয় বিদেশী টিভির অনুষ্ঠান দেশীয় অনুষ্ঠানকে পিছনে ফেলে দিচ্ছে তার মূলে কিন্তু কেবল্ টিভি। যদি কেবল্ টিভি না থাকতো তবে বিদেশী স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলি পা রাখার জায়গা কোথায় পেত? তাই এককথায় কেবল্ টিভি বিনোদনের মাত্রাকে এক ধাক্কায় অনেকটা চড়িয়ে দিয়েছে। বিভিন্ন আঞ্চলিক অনুষ্ঠান, অস্কারপ্রাপ্ত সিনেমা কিংবা ইউরোপীয়ান লীগের ফুটবল-সবই আজ বেডরুমের চার দেওয়ালে বন্দী। সেইসঙ্গে রয়েছে পছন্দসই চ্যানেল দেখার আনন্দ। যারা শুধু খেলা দেখতে চান তাদের জন্য রয়েছে আলাদা চ্যানেল ESPN, STAR SPORTS। যারা বিদেশী সিনেমা পছন্দ করেন তার দেখবেন HBO, স্টার মুভিজ, জি-এম জি এম আবার হিন্দি সিনেমার ভক্তরা দেখবেন জি সিনেমা, বিফোর ইউ প্রভৃতি। ছোটোদের জন্য কার্টুন। খবরসন্ধানীদের জন্য বিবিসি, সিএনএন, আজতক্। অর্থাৎ 'অ্যাজেন্ডা সেট' করবে জনগণ। কিছুটা হলেও এ স্বাধীনতা মুক্ত-জ্ঞাপন ব্যবস্থাকে স্বাগত জানায়।

(খ) শিক্ষাক্ষেত্রে কেবল্ টিভি ঃ

গ্রামীণ শিক্ষাব্যবস্থায় কেবল্ টিভি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে। এ প্রসঙ্গে জগদীশ গান্ধীর নাম বিখ্যাত। গুজরাটের সবরকন্দু জেলার এই কেবল্ অপারেটর ইন্দিরা গান্ধী ওপেন ইউনিভার্সিটির তৈরি শিক্ষাভিত্তিক

ক্যাসেটগুলি এলাকায় চালু করে নজির সৃষ্টি করেছেন। সেই নব্বইয়ের দশক থেকে পুষ্টি বিজ্ঞান ও ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সুযোগ সম্বন্ধে অনুষ্ঠান দেখাচ্ছেন নিজের উদ্যোগে। পরবর্তীকালে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের (ISRO) সহযোগিতায় শিক্ষকসহ শুধু ছাত্রছাত্রীদের জন্য ফোনবুথের (৬টি) ব্যবস্থা হয়েছে। এতে দর্শকরা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারছে। কেবল্ টিভির এ ভূমিকা নিঃসন্দেহে সামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ার। সম্পূর্ণ বিনোদন মাধ্যমকেও কিভাবে অন্য কাজে লাগানো যায় তার অন্যতম উদাহরণ জগদীশ গান্ধীর প্রচেষ্টা।

(গ) বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রয়োজনে কেবল্ টিভি ঃ

অনেক সময় কোনো বড় চ্যানেলে বিজ্ঞাপন দেওয়ার সাধ্য বা প্রয়োজন কোনোটাই থাকে না বিজ্ঞাপনদাতার। যেমন কোনো 'লোকাল হোম সার্ভিস ফুড সেন্টার'। এরা নিশ্চয় কাছাকাছি অঞ্চলের লোকজনকে জানাতেই বেশি আগ্রহী হবে। সেক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো লোকাল কেবল্ চ্যানেল। খরচ কম কিন্তু কাজ হবে অনেক বেশি। আবার ঠিক অন্যভাবে কোনো বহুজাতিক সংস্থা যখন বিজ্ঞাপন দেবে, তার উদ্দেশ্য হবে সারা বিশ্বে বিজ্ঞাপনটি ছড়িয়ে দেওয়া। এখানেও ভরসা কেবল্ টিভি। পৃথিবীব্যাপী জনপ্রিয় চ্যানেলগুলিতে একইসঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশগুলি একই বিজ্ঞাপন দেখবে। আবার অঞ্চলভিত্তিক চ্যানেলগুলিতে সেখানকার নির্দিষ্ট কোনো প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বিজ্ঞাপনও দেওয়া যায়। অর্থাৎ ক্ষমতা ও প্রয়োজন ব্যতিরেকে সব ধরনের বিজ্ঞাপনদাতার ভরসা কেবল্ টিভি।

(ঘ) ইন্টারঅ্যাকটিভ্ কেবল্ ঃ

এতক্ষণ যা আলোচনা হয়েছে তা সবই কেবলের একমুখী কাজের। ইন্টারঅ্যাকটিভ্ কেবলে আছে দুমুখী ব্যবস্থা। যেমন কেবল্ অপারেটরদের পাঠানো সিগন্যাল আমাদের বিনোদন, শিক্ষা ও তথ্যে সমৃদ্ধ করে তেমনই আমরাও ইন্টারঅ্যাক্টিভ কেবলের সাহায্যে টেলিফোনের বিল জমা দেওয়া বা ব্যাঙ্কের টাকার হিসাব দেওয়া-নেওয়া করতে পারব। হয়তো হোমওয়ার্কের কাজে বাচ্চাদের সাহায্য করবে এই কেবল্ পরিষেবা। সম্ভব হবে টেলিশপিং। প্রসঙ্গত এই পরিষেবা প্রথম চালু হয় ওহিও-তে ১৯৭৭ সালে। ভারতে প্রথম শুরু হয় দিল্লীর ওয়েলকাম গ্রুপের হোটেল কর্তৃপক্ষের দ্বারা। অর্থাৎ তথ্যে, বিনোদনে, শিক্ষায় ও প্রয়োজনে কেবল্ টিভি ক্রমশঃ হয়ে উঠেছে নিত্য-সঙ্গী। আজকের মানুষ তার বিপদের কথাও জানাচ্ছে কেবল্ টিভির মাধ্যমে। অন্যের বিপদে শরিক হচ্ছে একইভাবে। গল্পে, গানে, সত্যি ঘটনায় এ যেন এক ২৪ ঘণ্টার রঙ্গমঞ্চ।

৫.৫ সমাজজীবনে কেবল্ টিভির ভূমিকা ঃ ভারতীয় প্রেক্ষাপট

(ক) গণমাধ্যমের প্রত্যক্ষ প্রভাব কী? এককথায় উত্তর হল 'অ্যাটিচিউডিনাল চেঞ্জ' অর্থাৎ 'ব্যবহারিক পরিবর্তন'। কেবল্ টিভিও এর ব্যতিক্রম নয়। যে বিশ্বায়নের ধাক্কায় বিশ্ব আজ টালমাটাল, ভারতবর্ষে কেবল্ টিভি সেই বিশ্বায়নের সময়েরই ফসল। আবার অন্যভাবে বললে কেবল্ টিভির মাধ্যমেই ভারতবাসীর বিশ্বায়ন দর্শন সম্ভব হয়েছে। তাই সবার আগে যে পরিবর্তন আমাদের নজর কাড়ে তা হল 'কালচারাল চেঞ্জ' বা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। খুব সহজভাবে বলতে গেলে, সারা বিশ্বে একটা নতুন সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। যাকে 'গ্লোবাল কালচার' বা 'বিশ্বসংস্কৃতি' বলা হচ্ছে। এখন হয়তো, কোনো দেশ বা জাতিকে তার সংস্কৃতি দিয়ে চেনা যাবে, একথা বলার সময় ফুরিয়েছে। আজ পপগায়িকা ব্রিট্নি স্পিয়ার্সের যে গানে আমেরিকার কিশোরীটি নাচছে, সেই একই গানে

তাল দিচ্ছে ভারতীয় অষ্টাদশী। এ সি মিলানের যে সিদ্ধান্ত ইতালীয় যুবকটিকে ভাবাচ্ছে, সেই একই নীতি চিন্তিত করছে অস্ট্রেলিয়ার প্রৌঢ়কে। সম্ভবত ব্যালে মানে রাশিয়া, ট্যাপ্‌ড্যান্স মানেই স্কট্‌ল্যান্ডে আর ভাটিয়ালী মানে বাংলাদেশ বলার সময় শেষ হয়েছে।

কেবল টিভি এই নতুন বিশ্ব সংস্কৃতির অন্যতম বাহক। সংস্কৃতির এই যে দিবারাত্র নতুন নতুন ভূমিকায় পরিবেশন তার ফলে তৈরি হচ্ছে নতুন প্রজন্মের নতুন মানুষ। এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'ট্রান্স্‌ন্যাশনাল ক্লাস অফ পিপল'। অর্থাৎ যাদের কোনো নির্দিষ্ট দেশীয় পরিমণ্ডলে বেঁধে ফেলা যাবে না। এরা আমেরিকায় না গিয়েও সেখানকার পোশাক পছন্দ করে, ইতালিতে পা না রেখেও নিজেদের পছন্দের খাদ্যতালিকার ওপরেই রাখে ইতালীয় খাবার। অস্ট্রেলিয়ার ছবি দেখেই পছন্দ করে অস্ট্রেলীয় পানীয়। এদের ভাষা এক, পরিচ্ছদ আর এক। শুধুমাত্র বিশ্বের অগুন্তি টিভি চ্যানেলের অহোরাত্র সম্প্রচার পাল্টে দিচ্ছে মানুষকে। অবশ্য পুরো সমাজকে একেবারে বদলে দিচ্ছে তা নয়। পরিবর্তন আসছে শ্রেণী অনুযায়ী। পরিবেশ অনুযায়ী। বিশেজ্ঞরা বলছেন, 'কালচারাল সিনক্রোনাইজেশন'। গণজ্ঞাপনবিদ ডেনিস ম্যাকুইলের ভাষায় এক 'অনিচ্ছাকৃত দীর্ঘকালীন পরিবর্তন'। 'অনিচ্ছাকৃত' এই কারণে যে পরিবর্তন হবে কি হবে না তা কেউ ভেবে দেখেনি আগে। কিংবা পরিবর্তন হলেও তা কোন্‌দিকে যাবে তাও অজানা ছিল। অন্যদিকে দীর্ঘকালীন মেয়াদ বলার কারণ—বর্তমানে যা পরিস্থিতি তাতে এত পরিবর্তনের পরও পদ্ধতি কিন্তু থেমে নেই। সে এগিয়ে চলেছে আরও নতুনের খোঁজে। অবিরাম তথ্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করছে নতুন প্রজন্মকে।

কিন্তু এর বেশিরভাগটাই হচ্ছে চার দেওয়ালে বন্দী অবস্থায়। বাইরে যার প্রকাশ মাত্র দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ একটা ভয় থাকছেই। মানুষ কি ক্রমশ 'Pretribal state of life'-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রসঙ্গত আমেরিকান লেখক এ. জে. লিবলিং-এর মন্তব্য স্মরণীয় "Television if unchecked may carry us back to a pretribal state of social development where the family was the largest conversational group".

(খ) এবার আসা যাক বাণিজ্যিক বিশ্লেষণে। কেবল্‌ টিভি বিশ্বায়নের অন্যতম হাতিয়ার বেসরকারিকরণের ধ্বজাধারণ করে চলেছে। ভারতবর্ষে কেবল্‌ অপারেটররা একশ শতাংশই বেসরকারি মালিকানাধীন। বেসরকারি উপগ্রহ চ্যানেলের সঙ্গে পাল্লা দিতে হয় তথাকথিত সরকারি মাধ্যমকে। রমরম করে এগিয়ে চলা কেবল্‌ ব্যবসা ত্বরান্বিত করছে বেসরকারি পদ্ধতির প্রয়োগকে।

(গ) কেবল্‌ টিভি সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার। আঞ্চলিক বা স্থানীয় চ্যানেলগুলিতে সেখানকার অনুষ্ঠানের সম্প্রচার টিভি থেকে মানুষের আত্মিক দূরত্ব কমাচ্ছে। দর্শক ও শিল্পীর মেলবন্ধন ঘটছে সহজেই। ফলে অনেক জটিল সমস্যার সমাধানও সহজে সম্ভব হচ্ছে। বলা যায় ঠিক যেমন প্রথাসিদ্ধ মাধ্যম (Traditional Media)-এর দ্বারা নিজেদের মানুষের মুখে নিজেদের কথা শুনে জনগণ কন্যাভ্রূণ হত্যা বা বধূহত্যাকে অপরাধ বলে বুঝতো, এখানেও কেবল টিভিতে স্থানীয় চ্যানেলে পরিচিত কারুর কথা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হচ্ছে। বিশেষত গ্রামীণ পরিমণ্ডলে।

অর্থাৎ শুধু তথ্য-বিনোদনের জগৎ নয়, কেবল্‌ টিভি প্রভাব ফেলেছে সামগ্রিক বেঁচে থাকার চাহিদাতে। এক নতুন দুনিয়ার খোঁজ মানুষ আজ তার ছোটো জগতের মধ্যেই পেয়ে গেছে। এখন দেখার বিষয় হল এই নতুন আবিষ্কার তার পরিচয়ের পরিধি বাড়িয়ে তোলে নাকি আরও অন্তর্মুখীনতায় আবিষ্ট করে দেয়।

৫.৬ সারাংশ

(ক)

৫.৭ অনুশীলনী

(ক) বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। কেবল্ টিভি ভারতীয় সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এ পরিবর্তন ভালো না মন্দ? আপনার মতামত যুক্তিসহকারে লিখুন।

২। কেবল্ টিভি যে যে ভিন্ন দিকে একটি সার্থক গণমাধ্যমের ভূমিকা পালন করছে তার বিবরণ দিন।

৩। আপনার প্রিয় কেবল্ চ্যানেল কোনটি? কেন এটি আপনার প্রিয় তার ব্যাখ্যা দিন। আপনার ওপর এ চ্যানেলের কি কোনো প্রভাব আছে?

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। সি এ টিভি কী? এর সুবিধাগুলি কী কী?

২। ভারতে কেবল্ টিভি শুরুর ইতিহাস সংক্ষেপে লিখুন।

৩। ভূ-স্থানিক উপগ্রহ কী?

৪। কেবল্ টিভির ইতিহাসে যোগাযোগকারী উপগ্রহের ভূমিকা সম্বন্ধে লিখুন।

(গ) সঠিক উত্তরটি খুঁজে নিন ঃ

১। কেবল্ টিভি প্রথম চালু হয়েছিলো ১৯৪৬/১৯৪৭/১৯৪৮/১৯৪৯ সালে

২। প্রথম যোগাযোগকারী কৃত্রিম উপগ্রহের নাম টেলসিস্টার/টেলকোস্টার/টেলিস্টার/টেলস্টার

৩। 'ইনটেলস্যাট' ৬/৭/৮/৯ টি দেশের সহায়তায় তৈরি

৪। প্রথম ভারতীয় কৃত্রিম উপগ্রহের নাম ইনস্যাট/ইনস্যাট-১/ইনস্যাট-১এ/ইনস্যাট-এ

৫। ইএসপিএন—স্পোর্টস্ চ্যানেল/নিউজ চ্যানেল/কার্টুন চ্যানেল/ফিল্ম চ্যানেল।

৫.৮ উত্তর সংকেত

(ক) বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তরসূত্র ঃ

১। ৫.৫ অনুচ্ছেদটি পড়ে উত্তর লিখুন

২। ৫.৪ অনুচ্ছেদটি দেখুন

৩। নিজে লিখুন

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তরসূত্র ঃ

১। ৫.২ অনুচ্ছেদটি পড়ুন

২। ৫.২.১ অনুচ্ছেদ অনুসরণ করে লিখুন

৩। ৫.৩ অনুচ্ছেদ থেকে খুঁজে নিন।

৪। ৩নং প্রশ্নের উত্তরসূত্র অনুসরণ করুন।

(গ) সঠিক উত্তরগুলি পুরো এককটি পড়ে খুঁজে নিন।

একক ৬ □ গোষ্ঠীভিত্তিক কেবল্‌ টিভির ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

গঠন

৬.০ উদ্দেশ্য

৬.১ প্রস্তাবনা

৬.২ গোড়ার কথা

৬.২.১ উপগ্রহের (কৃত্রিম) মাধ্যমে যোগাযোগ পদ্ধতি

৬.২.২ সরাসরি সম্প্রচারক্ষম উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ (ডিবিএস পদ্ধতি)

৬.২.৩ কন্ডিশনাল অ্যাকসেস সিস্টেম বা শর্তসাপেক্ষ সম্প্রচার

৬.৩ অনুশীলনী

৬.৪ উত্তর সংকেত

৬.০ উদ্দেশ্য

কেবল্‌ টিভি কী বা কীভাবে এর উৎপত্তি, এসব ইতিহাস জানার পর একটা প্রশ্ন মনে আসা খুব স্বাভাবিক যে কী করে বিশ্বব্যাপী এই ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে কাজ করে চলে। কী তার শিল্প, কী-ই বা তার বিজ্ঞান? আধুনিক বা অতি আধুনিক যুগে কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে কেবল্‌ টিভির ব্যবস্থাপদ্ধতি। একটি ছোট গোষ্ঠীকে উদাহরণ হিসাবে নিয়ে এসব প্রশ্নের সরলীকৃত সমাধানই হল এই এককের উদ্দেশ্য।

৬.১ প্রস্তাবনা

উত্তর আধুনিকতা কেবল্‌ টিভির ব্যবস্থাতেও এনেছে নানা পরিবর্তন। যে তারের ব্যবহার কেবল্‌ টিভির নামকরণকে সার্থক করেছে সেই তারের প্রয়োজন আর থাকছে না। অর্থাৎ তার ছাড়া কেবল্‌ টিভি। অন্যদিকে আর কয়েকদিনের মধ্যেই পছন্দসই চ্যানেল দেখার ও সেই অনুযায়ী টাকা দেওয়ার ক্ষমতাও পেয়ে যাবেন দর্শক। এখনকার মত বাধ্যতামূলক সব চ্যানেল দেখার দরকার হবে না। এইসব পদ্ধতি কীভাবে এল, কী-ই বা এদের সুবিধা অসুবিধা তাই আলোচনা করা হবে এই এককে।

৬.২ গোড়ার কথা

বর্তমানে কেবল্ টিভি যে পদ্ধতিতে কাজ করে তারই অপরিশোধিত রূপ প্রথম দেখা গিয়েছিলো ১৯৫০ সালে ল্যান্সফোর্ডে। পেনসিল্‌ভ্যানিয়ার একটি কয়লাখনি অঞ্চল, নাম প্যান্থার ভ্যালী। বায়ুপথে এখান থেকে ৭৫ মাইল দূরত্বে রয়েছে ফিলাডেলফিয়ার তিনটি টিভি স্টেশন। কিন্তু পর্বতসঙ্কুল অঞ্চল বলে এখানে টিভি সিগন্যাল পৌঁছাত না। ফলে টিভি সেট বিক্রির মত লাভজনক ব্যবসাও শুরু করা সম্ভব ছিল না। উপায়ান্তর না দেখে ল্যান্সফোর্ডের চারজন রেডিও ডিলার ১২,৫০০ ডলার খরচ করে পাহাড়ের মাথায় তৈরি করলেন অ্যান্টেনা টাওয়ার। বর্তমানে একেই বলা হয় হেড এন্ড। এর সাহায্যে সিগন্যাল্ ধরে নিয়ে পরিবেশনা ব্যবস্থার (Distribution system) দ্বারা বিবর্ধিত সিগন্যাল্ পৌঁছে যেত অঞ্চলের ঘরে ঘরে। প্রাথমিক চার্জ ছিল একশো ডলার আর মাসিক তিন ডলারের বিনিময়ে দেখা যেত তিনটি টিভি স্টেশনের অনুষ্ঠান।

এখন প্রশ্ন হল সাধারণ সম্প্রচারের সঙ্গে কেবল টিভি সম্প্রচারের পার্থক্য কী? কেবল্ টিভি পদ্ধতিতে যেকোনো অনুষ্ঠান টিভি সেটে পৌঁছায় তারের মাধ্যমে আর অন্য সম্প্রচারের মাধ্যম হল বায়ুতরঙ্গ। যেখানে বায়ুতরঙ্গ ১৫টির মত চ্যানেল বহন করতে অক্ষম, কোনোরকম বৈদ্যুতিক গোলযোগ ছাড়া সেখানে কেবলের মাধ্যমে ১০০টি চ্যানেল অনায়াসে পাঠানো যায়। কেবল্ সিস্টেমে, টিভি সিগন্যালগুলি একটি কম্প্যুটার চালিত স্নায়ুকেন্দ্র বা হেড এন্ডে এসে জমা হয়। এই হেড এন্ডটি বড় বড় ছাতার মত অ্যান্টেনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই অ্যান্টেনার দ্বারা আটলান্টা থেকে সিএনএন বা নিউইয়র্ক থেকে এমটিভির সিগন্যাল্ সহজেই ধরা যায় ভারতে বসেই। এছাড়াও স্থানীয় যে সম্প্রচার তাও হেড এন্ডের দ্বারা ধরা যায়। এরপর হেড এন্ড থেকে ট্রাঙ্ক ও ফিডার কেবলের সাহায্যে চ্যানেলগুলি পৌঁছে যায় ইউটিলিটি পোলে। কেবল্ কোম্পানীগুলি এ কাজের জন্য টেলিফোন

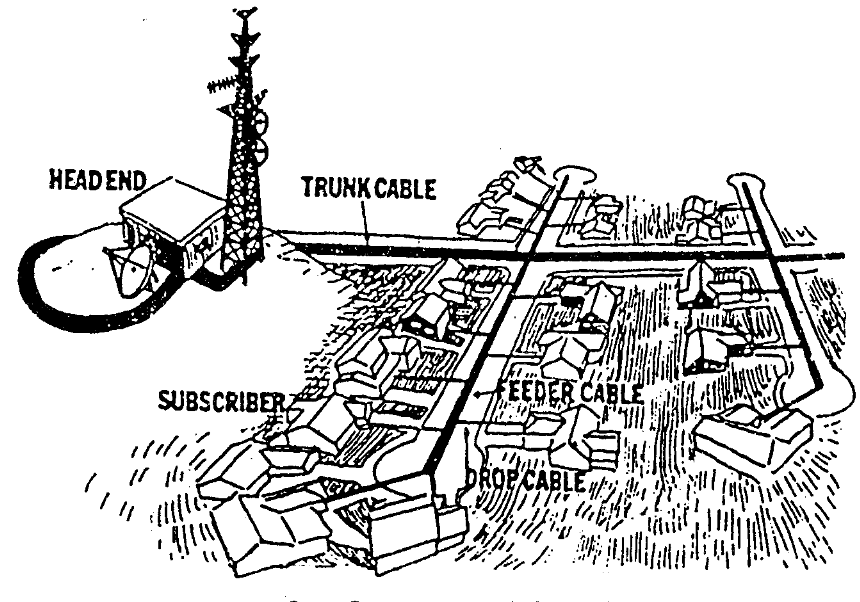

একটি বেসিক কেবল্ টেলিভিশন সিস্টেম

বা বৈদ্যুতিক পোলগুলি ভাড়া নেয়। নিকটবর্তী পোল থেকে ড্রপ বা ট্যাপ লাইনের মাধ্যমে সিগন্যাল পৌঁছে যায় বাড়ির ভিতরের টিভি সেটটিতে।

সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটি যে তারের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তাকে প্রাথমিকভাবে বলা হত 'কো অ্যাক্সিয়াল কেবল্'। এটি তামায় মোড়া অ্যালুমিনিয়ামের তার। আশির দশকে অপটিক্যাল ফাইবারের প্রচলনের আগে পর্যন্ত এই তারই ব্যবহৃত হত।

এবার আসা যাক অপ্‌টিক্যাল ফাইবারের কথায়। এটি খুবই সূক্ষ্ম ও কাঁচ বা প্লাস্টিকের তন্তু, আলোক তরঙ্গের দ্বারা যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম। কোঅ্যাক্সিয়াল কেবল্ থেকে অপ্‌টিক্যাল ফাইবারে উত্তরণের কারণগুলি নীচে বলা হল—

(ক) বেশি চ্যানেল ধারণে সক্ষম

(খ) ওজনে তুলনামূলক হালকা

(গ) কোনোরকম ক্রস কানেকশনের সম্ভাবনা নেই।

(ঘ) আবহাওয়া বা অন্যান্য কারণে কোনো বৈদ্যুতিক গোলোযোগে প্রভাবিত হয় না। কোনো খারাপ সিগন্যাল গ্রহণ করে না।

(ঙ) কপার কেবলের থেকে দামে সস্তা।

(চ) একটিমাত্র তন্তু উভয়দিকে তথ্য চালিত করতে পারে (ডুপ্লেক্স)।

এক কথায় ফাইবার অপটিকস্ যোগাযোগের দুনিয়ায় এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। এর দ্বারা একশটির মত টিভি চ্যানেল, টেলিফোন বা কম্পিউটার পরিষেবা চালানো সম্ভব।

৬.২.১ উপগ্রহের (কৃত্রিম) মাধ্যমে যোগাযোগ পদ্ধতি

আগের এককে দেখেছি কিভাবে ভূপৃষ্ঠের ওপরকার বাধা এড়িয়ে কৃত্রিম উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে মসৃণভাবে সফল করে তুলেছে। কি পদ্ধতিতে এই বাধা এড়ানো যায় তাই হবে বর্তমানের আলোচ্য বিষয়।

কৃত্রিম উপগ্রহ সত্যিই এক বিশ্ব যোগাযোগ চক্র গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে। প্রথম যে ছবি বিশ্বের সব মানুষ কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে একসঙ্গে দেখতে সক্ষম হয়েছে তা হল চন্দ্র বিজয়ের কাহিনী—চাঁদে মানুষের পা। সম্প্রচারের দুনিয়ায় কৃত্রিম উপগ্রহ যেন রিলেসেন্টার। পৃথিবীর একস্থান থেকে পাঠানো তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ প্রথমে পৌঁছায় উপগ্রহে। উপগ্রহ তা গ্রহণ করে আবার পৃথিবীর অন্য কোনো স্থানে পাঠিয়ে দেয়। ফলে পৃথিবীর উপরিতলের কোনো বাধাই আর টিভি সিগন্যালকে গন্তব্যে পৌঁছানোয় বাধা দিতে পারে না।

সাধারণ সম্প্রচারের ক্ষেত্রে 'অনুষ্ঠান প্রেরক কেন্দ্র' থেকে তরঙ্গ কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে গ্রাহক কেন্দ্রে পৌঁছায়। সম্প্রচারের ভাষায় প্রেরক কেন্দ্রকে আপলিঙ্ক এবং গ্রাহক কেন্দ্রকে ডাউনলিঙ্ক বলা হয়। গ্রাহক কেন্দ্রে থাকে আর্থ স্টেশন, যার সাহায্যে সে উপগ্রহ থেকে পাঠানো তরঙ্গ সহজে গ্রহণ করতে পারে। এ ছাড়াও গ্রাহক কেন্দ্রে যে ভূ-তল ট্রান্সমিটার (Terrestrial Transmitter) থাকে তার সাহায্যে নিকটবর্তী নানা জয়গায় টিভি সিগন্যাল্ বায়ুতরঙ্গ বাহিত হয়ে পৌঁছে যায়। দূরত্ব বেশি হলে ভূ-তল ট্রান্সমিটার কার্যকরী হয় না। কারণ

বায়ুতরঙ্গ একসাথে শব্দ ও আলোকতরঙ্গকে বেশি দূর বহন করতে সক্ষম নয়। বিজ্ঞানের চোখে এর কারণ হল শব্দ ও আলোক তরঙ্গের গতিবেগের এক বিশাল পার্থক্য।

কেবল টিভির ক্ষেত্রে ডাউনলিঙ্কের কাজ করে হেড এন্ড। আর হেড এন্ড থেকে সিগ্ন্যাল বায়ুতরঙ্গ বাহিত না হয়ে তারের মাধ্যমে পৌঁছে যায় গন্তব্যে। ফলে একসঙ্গে বেশি চ্যানেলের সুবিধা দেওয়া সম্ভব হয়।

৬.২.২ সরাসরি সম্প্রচারক্ষম উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ (ডি.বি.এস. পদ্ধতি)

কেবল্ টিভির নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে কেবল্ বা তারের কথা। বর্তমানে এই তারের ব্যবস্থাকে প্রায় নস্যাৎ করে দিতে বদ্ধপরিকর কৃত্রিম উপগ্রহের বিশ্বের যোগাযোগ পদ্ধতি। অর্থাৎ তারহীন কেবল্। সম্প্রচারের ভাষায় এ উপগ্রহের নাম ডিরেক্ট ব্রডকাস্ট স্যাটেলাইট বা সরাসরি সম্প্রচারক্ষম উপগ্রহ। ভারতবর্ষে এটি ডিরেক্ট টু হোম সার্ভিস নামে (DTH) পরিচিত।

আমরা আগেই জেনেছি যে, উপগ্রহ মারফৎ পাঠানো সিগ্ন্যাল গ্রহণ করার জন্য দরকার কোনো আর্থ স্টেশন। কিন্তু ডি.বি.এস পদ্ধতিতে ব্যবহৃত উপগ্রহটি এতই শক্তিশালী যে এটি সরাসরি যোগাযোগ করতে সক্ষম গ্রাহকের বাড়িতে। অবশ্য বলাই বাহুল্য যে এক্ষেত্রে কেবল্ গ্রাহকের বাড়িতে একটি ছোট ডিশ অ্যান্টেনা রাখতে হবে। এই ডিস অ্যান্টেনাটি আর্থ স্টেশন বা হেডএন্ডে ব্যবহৃত ডিশ অ্যান্টেনার তুলনায় অনেক ছোট এবং দামও অনেক কম। এছাড়াও এই ছোট ডিশ অ্যান্টেনার একটি ডিকোডার সবক'টি চ্যানেল বহনে সক্ষম। অথচ আগের অ্যান্টেনায় প্রতিটি চ্যানেলের জন্য দরকার ছিলো একটি করে ডিকোডার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ছোট্ট অ্যান্টেনাটিকে তার আয়তনের জন্য যেকোনো জায়গায় রাখা যায়। এমনকি প্রয়োজন হলে জানালা দিয়ে ঝুলিয়েও দেওয়া যায়।

এবার দেখা যাক এই ডিবিএস পদ্ধতি কিভাবে কাজ করে। সর্বপ্রথমে, প্রেরক কেন্দ্রের ভূ-তল ট্রান্সমিটারটি সিগ্ন্যালকে নিয়ন্ত্রণ করে পাঠিয়ে দেয় উপগ্রহে। এই উপগ্রহের মধ্যে থাকে মাইক্রোওয়েভ গ্রাহক এবং প্রেরক। এরা উভয়দিকে ক্রিয়াশীল। পৃথিবী থেকে পাঠানো সিগ্ন্যাল এখানে গ্রহণ করা হয়, তার কম্পাঙ্ক পরিবর্তিত করা হয় এবং অবশেষে অন্য একটি বাহকের দ্বারা সিগ্ন্যালটিকে পুনর্নিয়ন্ত্রিত করে পৃথিবীতে পাঠানো হয়। এই যে উপগ্রহটির সামগ্রিক ব্যবস্থা, একে নিয়ন্ত্রণ করে ট্রান্সপন্ডার। একটি ট্রান্সপন্ডার পৃথিবী থেকে পাঠানো সিগ্ন্যাল গ্রহণ করে, তাকে পরিশোষিত ও বিবর্ধিত করে এবং প্রেরণ করে পৃথিবীর অন্য কোনো স্থানে। লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে ট্রান্সপন্ডার শব্দটিতে 'ট্রান্সমিশন' ও 'রেসপন্ডার' দুটি ভিন্ন শব্দের ঝলক পাওয়া যায়। অর্থাৎ এটি একাধারে প্রেরক ও গ্রাহকের কাজ করে চলে।

ট্রান্সপন্ডার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সিগ্ন্যাল পৃথিবীর যে বিশাল এলাকায় ক্রিয়াশীল হয় তা দেখতে অনেকটা পায়ের পাতার মত। একে বলে 'ফুটপ্রিন্ট এরিয়া'। অর্থাৎ এই নির্দিষ্ট অঞ্চলের যেকোনো বাড়িতে ছোট ডিশ্ অ্যান্টেনা বসালেই নিজস্ব টিভি সেটে ধরা পড়বে ট্রান্সপন্ডার দ্বারা প্রেরিত সব ক'টি সিগ্ন্যাল।

খুব স্বাভাবিকভাবেই কেবল্ অপারেটররা এ ব্যবস্থা চালু করতে আগ্রহী হবে না। সত্তর ও আশির দশকে কেবলের ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমেরিকাতে ডিবিএস কোম্পানীগুলির বাড়বাড়ন্ত রুখে দেওয়া

হয়েছিল। যদিও পরবর্তীকালে এক জাপানী কোম্পানীর উদ্যোগে ১৯৭৮ সালে ফ্লোরিডায় প্রথম চালু হয় এই পদ্ধতি। ১৯৯৪ সাল থেকে অবশ্য পূর্ণউদ্যোগে শুরু হয়ে যায় সারা আমেরিকাতে। প্রথমে থমসন কনজুমার ইলেকট্রনিক্স ডিবিএস ডিশ্ তৈরি করা ও বিক্রির ছাড়পত্র পায়। এরা প্রায় এক কোটি ডিশ বিক্রির পরে সোনি কোম্পানীকেও অনুমোদন দেওয়া হয়।

ডিবিএস পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধা দুই-ই আছে। সুবিধা বলতে সাধারণ কেবল্ সম্প্রচারের চেয়ে এখানে ডিজিটাল প্রযুক্তির উন্নত ব্যবহার গুণগত মানে অনেক ভালো ছবি দেখার সুযোগ করে দিচ্ছে। দর্শকদের পছন্দে যে সব চ্যানেলগুলি চলে (Pay-per-view) তার সংখ্যাও বাড়িয়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে এই পদ্ধতিতে গ্রাহককে প্রাথমিকভাবে কিছু বিনিয়োগ করতে হচ্ছে ডিশঅ্যান্টেনা কেনার জন্য। এছাড়াও সমগ্র ব্যবস্থাটি উপগ্রহচালিত বলে স্থানীয় চ্যানেল দেখাতে সক্ষম হবে না। কারণ স্থানীয় চ্যানেলগুলি ভূ-তল ট্রান্সমিটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এখানে কোনো আপলিঙ্কের ব্যাপার থাকে না। এছাড়াও এই পদ্ধতিতে একসাথে একটিমাত্র উপগ্রহেরই সিগ্‌ন্যাল ধরা যাবে।

বিভিন্ন বড় বড় কেবল্ নেটওয়ার্ক কোম্পানী উপগ্রহের ট্রান্সপন্ডার লিজ নিয়ে সারা বিশ্বে তাদের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। যেমন সিএনএন বা কেবল নিউজ নেটওয়ার্কে গ্যালাক্সী ৫ উপগ্রহের ট্রান্সপন্ডার ৫ লিজ নিয়েছে। অনেকে আবার দুটি পৃথক উপগ্রহের একটি করে মোট দু'টি ট্রান্সপন্ডার লিজ নেয়। এর ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পৃথিবীর দুটি গোলার্ধেই সমানভাবে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা সম্ভব হয়।

বর্তমানে যোগাযোগ উপগ্রহের বাহুল্য এতটাই বেড়েছে যে ভূ-স্থানিক কক্ষে জায়গা কমে আসছে। যারা এখনও নিজস্ব উপগ্রহ পাঠাতে পারেনি সে সব দেশ সত্যিই চিন্তায় পড়েছে। কারণ যখন তারা সমর্থ হবে তখন হয়তো কক্ষপথে আর জায়গা থাকবে না। এখনই 'ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ' পদ্ধতি শুরু হয়ে গেছে। অবশ্য ডিজিটাল টিভি ট্রান্সপন্ডারের দক্ষতা বাড়িয়ে এ সমস্যারও সমাধান করে দেবে বলে মনে হয়।

৬.২.৩ কন্ডিশনাল অ্যাকসেস্ সিস্টেম বা শর্তসাপেক্ষ সম্প্রচার

মাত্র কয়েকমাস বাদেই অর্থাৎ ২০০৩ সালের জুন মাস থেকে দিল্লী, মুম্বাই, কোলকাতা ও চেন্নাইয়ের ৬০ লক্ষ কেবল্ গ্রাহক নিজের পছন্দ অনুযায়ী চ্যানেল দেখবেন এবং সেই অনুযায়ী টাকা দেবেন। নতুন এই পদ্ধতি পরিচিত হবে কন্ডিশনাল অ্যাকসেস্ সিস্টেম হিসাবে। এর ফলে সব ব্রডকাস্টারকেই বাধ্যতামূলকভাবে পে-চ্যানেলগুলিকে একটি সেট টপ বক্সের মাধ্যমে দেখাতে হবে। যে সব চ্যানেলের অনুষ্ঠান দেখতে গেলে কেবল্ অপারেটরকে ঐ চ্যানেলগোষ্ঠীকে টাকা দিতে হয় সেগুলি হল পে-চ্যানেল। যেমন জি-টার্নার, স্টার, ই এস পি এন, সোনি, ডিডি স্পোর্টস প্রভৃতি। আর সেট টপ বক্স হল অনেকটা ভি সি আর এর মত দেখতে ইলেকট্রনিক যন্ত্রবিশেষ যা রাখা হবে টিভি সেটের ওপর। অ্যানালগ পদ্ধতির যন্ত্র হলে দাম হবে ২৫০০ টাকা আর ডিজিটাল হলে ৬০০০ টাকা। অ্যানালগ বক্সটি যেখানে শুধু পে-চ্যানেলগুলি দেখাতে সক্ষম সেখানে ডিজিটাল বক্সটি ইন্টারঅ্যাকটিভ টিভি, নেট টেলিফোনী বা ইন্টারনেট ব্যবস্থা ও টেলিশপিং-এর ক্ষেত্রেও কার্যকরী হবে।

বর্তমানে কেবল্‌গ্রাহকরা অপারেটরদের পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী চ্যানেল দেখতে বাধ্য। না দেখলেও যে ক'টি চ্যানেল তারা দেখায় সব ক'টির জন্য চার্জ দিতে বাধ্য গ্রাহকরা। সি এ এস পদ্ধতিতে গ্রাহকরা কোন্‌ কোন্‌ চ্যানেল দেখবে তা নিজেরাই নির্ণয় করবে আর যেক'টি চ্যানেল দেখবে সেই ক'টির জন্যই তারা ভাড়া দেবে। যেমন কোনো বাঙালী দর্শক হয়তো তামিল সান টিভির অনুষ্ঠান দেখেন না কিন্তু তাকে এরজন্য টাকা দিতে হয়। সি.এ.এস. পদ্ধতিতে ঐ দর্শককে সানটিভির অনুষ্ঠান দেখতেও হবে না। তার জন্য ভাড়াও দিতে হবে না। তিনি নিজের পছন্দমত অনুষ্ঠানই শুধু দেখবেন।

বর্তমানে হেড-এন্ড পদ্ধতির কেবল অপারেটররা যেমন সিটিকেবল্‌, ইনকেবল্‌ বা হ্যাথঅ্যাওয়ে, পে-চ্যানেলগুলিকে ব্রডকাস্টারদের কাছ থেকে ডাউনলোড করে স্থানীয় কেবল্‌ অপারেটরদের দ্বারা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয়। সি এ এস পদ্ধতিতে অপারেটররা পে-চ্যানেলগুলিকে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানোর আগে এনক্রিপ্ট করবে। আগের মতই স্থানীয় কেবল অপারেটরদের দ্বারাই গ্রাহকরা কানেকশন্‌ পাবেন। শুধুমাত্র সিগন্যাল গ্রহণ করা হবে সেট টপ বক্সের দ্বারা। আর ফ্রি-টু-এয়ার চ্যানেল অর্থাৎ যে চ্যানেলের জন্য অপারেটরকে কোনো চার্জ দিতে হয় না সেগুলি এখন যেমন দেখা যাচ্ছে তখনও সেই একইরকমভাবে দেখা যাবে।

ফ্রি-টু এয়ার চ্যানেল	পে-চ্যানেল
১। আমদানীকৃত অর্থ বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রাপ্ত	১। আমদানীকৃত অর্থ বিজ্ঞাপন ছাড়াও গ্রাহক অপারেটরদের দেওয়া ভাড়া থেকে প্রাপ্ত।
২। উদাহরণ ঃ আজতক্‌, ডিডি, এম টিভি	২। জি-টার্নার, স্টার, ই এস পি এন, সোনি, ডিডি স্পোর্টস

সি এ এস পদ্ধতির ফলে ব্রডকাস্টার ও কেবল্‌ অপারেটরদের বহুদিনকার দ্বন্দ্ব ঘুচে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ সেট-টপ-বক্স ব্যবহারের ফলে কোন চ্যানেল ক'জন দর্শক দেখছে এই হিসাবে স্বচ্ছতা আসবে। অথাৎ অপারেটররা সঠিক গ্রাহকসংখ্যা জানায় না বলে ব্রডকাস্টারদের যে অভিযোগ আছে তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। অন্যদিকে গ্রাহকরা এতদিন ধরে উভয়ের দ্বন্দ্বে পিষ্ট হওয়ার থেকে রেহাই পাবেন।

এ ব্যবস্থায় ব্রডকাস্টারকে প্রতিটি পে চ্যানেলের গ্রাহক প্রতি ভাড়া নির্দিষ্ট করতে হবে। স্বল্পমেয়াদী হিসাবে খুবই কঠিনপথ কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পে অনেক বেশি লাভ হবে। কেবল্‌ওয়ালাদের এ প্রতিযোগিতায় টিকতে গেলে নেটওয়ার্কের উন্নতি ঘটাতে হবে। বর্তমানে ভারতবর্ষের ৩০,০০০ কেবল অপারেটর সি এ এস ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট চাপের মধ্যে আছেন।

অপরদিকে বিজ্ঞাপনদাতারাও জানতে পারবেন প্রতিটি চ্যানেলের গ্রাহকসংখ্যা। আর সরকার হয়তো ফ্রি-টু-এয়ার চ্যানেলের দাম ঠিক করবেন কিংবা কেবল্‌ ও উপগ্রহ টিভি শিল্পের নানা শর্তের নির্দেশিকা প্রস্তুত করবেন। এখন প্রশ্ন হল নতুন এ ব্যবস্থার অসুবিধাগুলি কী কী? গ্রাহকদের দিক থেকে বললে সেট-টপ বক্সটি সে কিভাবে ব্যবহার করবে অর্থাৎ এটি কি তাকেই টাকা দিয়ে কিনতে হবে? একটি বক্স কি দেশের যেকোনো জায়গায় কাজ করবে? যেকোনো কেবল্‌ অপারেটরের পরিষেবা কি এতে পাওয়া যাবে? হেড-এন্ড কেবল্‌ অপারেটররা কি ১৫ লাখ টাকা বিনিয়োগ করে কেবলের সাবস্ক্রিপশন্‌ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটাবে?

দর্শকরাই বা মাসিক কত টাকা ভাড়া দেবে? ধরা যাক এখন একজন দর্শক মাসিক ২০০ টাকা করে ভাড়া দেয়। সি এ এস ব্যবস্থায় প্রাথমিক পরিষেবার দরুন ধরা যাক ৮০ টাকা দিতে হবে। আর বাকী টাকায় দর্শককে বেছে নিতে হবে স্টার, সোনি, জি-টার্নার ও অন্যান্যদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে। বাইরের দেশের অভিজ্ঞতা বলছে যে সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে কমপক্ষে তিন বছর সময় লাগবে। তাইওয়ানের ৫ লক্ষ কেবলগ্রাহকের বেশিরভাগই সি এ এস পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা ভোগ করেন। অথচ চীনে এ ব্যবস্থার এখনও প্রচলন হয়নি।

অর্থাৎ হাঁটি হাঁটি পায়ে যে পথ চলা শুরু হয়েছিলো আজ পরিবর্তনের ধাক্কায় তা উড়ে চলছে। এখন শুধু অপেক্ষা করে দেখে যাওয়ার পালা।

৬.৪ অনুশীলনী

(ক) বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। ডিবিএস পদ্ধতির বিবরণ দিন। এই পদ্ধতিতে কারা বেশি লাভবান হবে বলে আপনি মনে করেন?

২। কন্ডিশনাল অ্যাকসেস্ সিস্টেম গ্রাহক, সরকার, বিজ্ঞাপনদাতা ও কেবল্ অপারেটরদের কী সুবিধা বা অসুবিধা করবে? বিস্তারিত বিবরণ দিন।

৩। যোগাযোগকারী উপগ্রহ কীভাবে কেবল্ টিভির সম্প্রচার যারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছে সে পদ্ধতির বিবরণ দিন।

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। অপটিক্যাল ফাইবার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

২। হেডএন্ড্, আপলিংক, ডাউনলিংক ও ফুটপ্রিন্ট এরিয়া কী?

৩। পে-চ্যানেল ও ফ্রি-টু-এয়ার চ্যানেলের পার্থক্য লিখুন।

৪। সেট-টপ-বক্স কী?

(গ) সঠিক উত্তরটি খুঁজে নিন ঃ

১। সি.এন.এনের সম্প্রচার হয় আটলান্ডা/নিউইয়র্ক/ শিকাগো/ওয়াশিংটন থেকে।

২। পে চ্যানেলের উদাহরণ ঃ স্টার/আজতক্/ এমটিভি/ ডিডি।

৩। সি এন এন গ্যালাক্সী ৫/৬/৭/৮ উপগ্রহের মারফৎ কাজ করে।

৪। ট্রান্সপন্ডার সিগ্ন্যাল গ্রহণ করে/প্রেরণ করে/বিবর্ধিত করে/তিনটিই করে।

৫। প্রথম ডি বি এস ডিশ তৈরি করে সোনি/টার্নার ব্রডকাস্টিং/থমসন/টাইমস্।

৬.৫ উত্তর সংকেত

(ক) বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তরসূত্র ঃ

১। ৬.২.২ অনুচ্ছেদটি দেখুন।

২। ৬.২.৩ অনুচ্ছেদটি পড়ে উত্তর লিখুন।

৩। ৬.২ ও ৬.২.১ অনুচ্ছেদ দুটি মিলিয়ে উত্তর দিন।

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তরসূত্র ঃ

১। ৬.২ অনুচ্ছেদটি অনুসরণ করুন।

২। ৬.২, ৬.২.১ ও ৬.২.২ থেকে উত্তর খুঁজে নিন।

৩। ৬.২.৩ অনুচ্ছেদটি পড়ুন

একক ৭ □ অনুষ্ঠান সম্প্রচার পদ্ধতি

গঠন

৭.০ উদ্দেশ্য

৭.১ প্রস্তাবনা

৭.২ কেবল্ টিভির অনুষ্ঠান সম্প্রচার পদ্ধতি

৭.৩ কেবল্ টিভি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

৭.৪ কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য—ন্যারোকাস্টিং—সি.এন.এন.

৭.৫ অনুশীলনী

৭.৬ উত্তর সংকেত

৭.০ উদ্দেশ্য

কেবল্ টিভির দৌলতে এখন বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য আলাদা আলাদা চ্যানেল। যার যা প্রিয় তিনি বোতাম টিপে শুধু সেই চ্যানেলের অনুষ্ঠানই দেখতে পারেন। এমনকি যিনি যে ভাষায় স্বচ্ছন্দ শুধু সেই ভাষার অনুষ্ঠান দেখতে চাইলে তাও হাজির। আপাত দৃষ্টিতে একরকম মনে হলেও প্রতিটি চ্যানেলের ব্যবস্থাপনার ধরন কিন্তু ভিন্নরকম। কেবল্ টিভির এই নানারকমের চ্যানেল, তাদের বৈশিষ্ট্য কিংবা তাদের অনুষ্ঠান প্রচারে সরকারি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা করাই হল এই এককের উদ্দেশ্য।

৭.১ প্রস্তাবনা

কেবল্ টিভি দর্শকের কাছে নিয়ে এসেছে খোলা বাজারের মানসিকতা। আর এই ধরনের ব্যবস্থায় টিকে থাকতে গেলে প্রতিটি চ্যানেলকেই হতে হবে স্বতন্ত্র। নতুনত্ব থাকবে তাদের অনুষ্ঠান সম্প্রচার ব্যবস্থায়। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বলা যায় যে যদি সি এ এস ব্যবস্থা চালু হয়ে যায় তাহলে তো অনুষ্ঠানের যথেষ্ট রদবদল করতে হবে, বিশেষ করে ভারতীয় চ্যানেলগুলিকে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে রকমারি কেবল্ চ্যানেলের অনুষ্ঠান প্রচার পদ্ধতি ও সেই পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণে সরকারি ব্যবস্থার আলোচনা করা হবে এই এককে।

৭.২ কেবল্ টিভির অনুষ্ঠান সম্প্রচার পদ্ধতি

যোগাযোগকারী উপগ্রহের ওপর কেবল্ টিভি একটু বেশিমাত্রায় নির্ভরশীল। তাই উপগ্রহভিত্তিক নানা চ্যানেল যাকে চলতি কথায় স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল বলা হয় তার প্রাধান্যও বেশি। ভারতীয় ব্যবস্থায় তিন ধরনের স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠান দেখা যায়। প্রথমত, বিদেশী উপগ্রহ বাহিত বিদেশী স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল। যেমন—স্টার প্লাস বা বি.বি.সি। দ্বিতীয়ত, বিদেশী উপগ্রহ বাহিত বেসরকারি ভারতীয় স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল। যেমন—জি টিভি, এশিয়ানেট, সান টিভি প্রভৃতি। আর তৃতীয়তঃ দূরদর্শনের স্যাটেলাইট চ্যানেল, যেমন মুভি ক্লাব বা ডিডি-৭। এছাড়াও কেবল্ টিভির মাধ্যমে গোষ্ঠীর নিজস্ব অনুষ্ঠান, খবরাখবর প্রচারিত হয় লোকাল কেবল্ চ্যানেলের দ্বারা। সেইসঙ্গে স্থানীয় ওভার দ্য এয়ার বা বায়ুতরঙ্গ বাহিত চ্যানেলও দেখানো হয় (ডিডি-১, ডিডি-২)। স্থানীয় চ্যানেলের মধ্যে হেডএন্ড কেবল্ অপারেটরের নিজস্ব চ্যানেলও থাকে। যেমন সিটি কেবলের সিটি চ্যানেল। আবার গোষ্ঠীর কেবল অপারেটররাও অঞ্চলভিত্তিকভাবে নিজস্ব পছন্দমাফিক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। এইসব চ্যানেলে গোষ্ঠীভিত্তিক কোনো আনন্দানুষ্ঠান বা বিশেষ সভা ইত্যাদিও সম্প্রচার করা হয়। নামী-দামী নানা চ্যানেলের মধ্যে থেকে অনুষ্ঠানের বাছাইকরণ কেবল্ অপারেটরদের কাছে সত্যিই দুরূহ ব্যাপার। অনেক দর্শকের ধারণা যে কেবল টিভির ক্ষমতার কোনো সীমাপরিসীমা নেই। 'সম্প্রচারিত সব চ্যানেল দেখাতেই সে সক্ষম। যদিও এ ধারণা ঠিক নয়। তবে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমশই চ্যানেল সংখ্যা ধারণের ক্ষমতা বাড়িয়ে চলেছে। কেবল্ অপারেটররা যে যে ধরনের চ্যানেল দেখাতে পারেন তার একটি বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হল।

(ক) স্থানীয় কেবল্ চ্যানেল ঃ অঞ্চলভিত্তিকভাবে যে ছোট ছোট কেবল্ স্টেশনগুলি থাকে এটি তাদের নিজস্ব চ্যানেল। অঞ্চলের নিজস্ব সংস্কৃতি, সভাসমিতি, কিংবা উন্নয়নমূলক প্রকল্পের খবর এখানে সম্প্রচার করা হয়। আইন অনুযায়ী এ চ্যানেলের অনুষ্ঠান জনসাধারণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা সরকারি কাজকর্মের জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া কেবল্ কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত কোনো ব্যক্তি এই সব অনুষ্ঠানের সঙ্গে কোনোভাবে যুক্ত থাকতে পারবেন না।

দিল্লীর লাজপত নগরে 'জাগরণ' নামে একটি ভক্তিমূলক অনুষ্ঠানের সম্প্রচারের দ্বারা এর সূচনা। সময় ১৯৯১ সালের আগস্ট। এইসব চ্যানেলগুলি সবচেয়ে লাভজনক ছোট বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য। যারা অন্য বড় চ্যানেলে বিজ্ঞাপন দিতে সক্ষম নন—এই স্থানীয় চ্যানেলের বিজ্ঞাপন তাদের সাধ ও সাধ্য দুই-ই পূরণে সক্ষম।

(খ) বায়ুতরঙ্গবাহিত সম্প্রচার ঃ আইন অনুযায়ী এই সব স্থানীয় চ্যানেলগুলি কেবল্ অপারেটররা দেখাতে বাধ্য। যদিও আগে অতিরিক্ত লাভের আশায় তারা শুধুমাত্র দর্শকদের চাহিদা অনুযায়ী চ্যানেলের আয়োজন করত। কিন্তু তৎকালীন ভারতে এইসব বায়ুতরঙ্গ বাহিত চ্যানেলগুলি সরকারি হওয়ার দরুণ এর প্রচার বাধ্যতামূলক করা হয়।

(গ) স্বাধীন দূরসঞ্চার ঃ তথাকথিত সুপারস্টেশনগুলি এর আওতায় পড়ে। যেমন আটলান্টার WTBS, শিকাগোর WGN কিংবা নিউইয়র্কের WWOR। বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য এরা খ্যাত। এদের অনুষ্ঠান দেখানোর জন্য একটা নির্দিষ্ট হারে চার্জ দিতে হয় হেড এন্ড অপারেটারকে।

(ঘ) বেসিক কেবল্ ঃ এই ব্যবস্থায় স্থানীয় তারবাহিত ও বায়ুতরঙ্গ বাহিত চ্যানেল, কিছু উপগ্রহ বাহিত চ্যানেল এবং স্বাধীন দূরসঞ্চারের সুপারস্টেশন থেকে সম্প্রচারিত চ্যানেল একসঙ্গে দেখা যায়। আসলে এটি একটি

সিস্টেম। অন্যভাবে বলা যায় যে বেসিক কেবল্ কোনো নির্দিষ্ট চ্যানেল নয় বরং বিভিন্ন পদ্ধতিতে সম্প্রচারিত চ্যানেলের সমষ্টি। কেবল্ অপারেটর তার দর্শকদের চাহিদা অনুযায়ী এই সিস্টেমে চ্যানেলের সমন্বয় ঘটায়। ESPN, CNN বা MTV-র অনুষ্ঠান বেসিক কেবলের আওতায় পড়ে।

(ঙ) প্রিমিয়াম কেবল্ ঃ বেসিক্ কেবলের অনুষ্ঠান ছাড়াও কেবল্ টিভি কিছু বিশেষ পরিষেবা দেয় যা প্রিমিয়াম কেবল্ নামে খ্যাত। এই বিশেষ ব্যবস্থায় আছে HBO-র মত মুভি চ্যানেল যেখানে ২৪ ঘণ্টা ইংরাজি সিনেমা দেখা যায়। আছে ডিজ্নি চ্যানেল যেখানে ছোটোদের জন্য ২৪ ঘণ্টা কার্টুনের অনুষ্ঠান দেখানো হয়। আছে ইন্টারঅ্যাকটিভ পরিষেবা অর্থাৎ যার মাধ্যমে টিভি সেটটিকে ইন্টারনেট পরিষেবা কিংবা ব্যাঙ্ক, দোকান প্রভৃতিতে টাকা লেনদেনের ব্যাপারে কাজে লাগানো যায়। এছাড়াও আছে পে-পার-ভিউ (PPV) অনুষ্ঠান। পিপিভি ব্যবস্থা ১৯৮৫ সালে শুরু হয়েছে। এ ব্যবস্থায় দর্শক তার পছন্দসই কোনো সিনেমা বা কোনো বিশেষ খেলার অনুষ্ঠান অর্থের বিনিময়ে একবার দেখতে পাবেন। পিপিভি পদ্ধতির মাধ্যমে viewer's choice বা দর্শকের পছন্দ কিংবা অনুরোধের অনুষ্ঠান (Request TV) খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

৭.৩ কেবল্ টিভি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

এখন এই যে এত সব চ্যানেল, এত দর্শক তাদের এতরকমের দাবি তো নিশ্চয় যেমন তেমন ভাবে সামলানো যায় না। তাছাড়াও কেবল্ টিভির মত একটা লাভজনক ব্যবসাও নিশ্চয় কোন্ অপারেটরকে দেওয়া হবে, নিয়ন্ত্রণের জন্য কি আইন থাকবে তারও একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। তা না হলে তো যে যেমনভাবে সম্ভব টাকা লুটে নেবে। কেবল্ টিভি নিয়ন্ত্রণে সরকারি যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয় সে সম্বন্ধে এবার আলোচনা করা হবে।

ভারতীয় আইনে সম্প্রচার অর্থাৎ বায়ুতরঙ্গবাহিত টিভি সিগ্ন্যাল নিয়ন্ত্রণের কথা লেখা আছে। কিন্তু কেবল্ টিভি তারবাহিত সিগ্ন্যাল প্রচার করে। তাই একে সম্প্রচার বলা যাবে কিনা তা নিয়েই সংশয় আছে। অবশ্য বেসরকারি ভারতীয় ও বিদেশী স্যাটেলাইট টিভি নিয়ন্ত্রিত অনুষ্ঠানগুলি সম্প্রচার ব্যবস্থার আওতায় পড়ে। কিন্তু এরা ব্যবহার করছে বিদেশী স্যাটেলাইট বা উপগ্রহ, এদের ক্ষেত্রে ভারতীয় আইন বলবৎ নয়। আবার ভারতীয় আইনে ডিশ্ অ্যান্টেনা বসানো ঠিক বেআইনী পর্যায়ভুক্ত নয়। বরং ডিশ্ অ্যান্টেনা মারফৎ বিদেশী স্যাটেলাইট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিদেশী অনুষ্ঠানের 'সম্প্রচারক' বেআইনী বলা হয়।

এতো গেল একদিকের সমস্যা। অন্যদিকে সম্পূর্ণ বেসরকারি মালিকানাধীন কেবল্ টিভি বিদেশী অনুপ্রবেশকে ত্বরান্বিত করছিল। আর এ সব কিছু নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যই ১৯৯৪ সালে সরকার কেবল্ টিভি নিয়ন্ত্রণের অর্ডিন্যান্স জারি করল।

কেবল টেলিভিশন নিয়ন্ত্রণ বিল ঃ

- ⇨ সরকার ১৯৯৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর কেবল্ টিভির নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন। পরবর্তীকালে এটি আইনে পরিণত হয়। এতে কেবল্ ব্যবসাকে বৈধ বলে ঘোষণা সহ কেবল্ গ্রাহকদের আরও বেশি দায়িত্বশীল হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই বিল অনুযায়ী কেবল্ অপারেটরকে বাধ্যতামূলকভাবে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। এছাড়াও কেবল্ ব্যবসায় বিদেশী

বিনিয়োগ ৪৯ শতাংশের বেশি করা যাবে না। অর্থাৎ বেসরকারিকরণের প্রাথমিক দিকগুলি সরকার কিছুটা হলেও বেঁধে দিলেন।

⇨ দূরদর্শনের অন্ততপক্ষে দু'টি স্যাটেলাইট চ্যানেল দেখানোর নির্দেশ দেওয়া হল এই বিলে। জনস্বার্থে কিছু কিছু অনুষ্ঠান দেখানো বন্ধ করার কথাও বলা হল।

⇨ সমস্ত কেবল্ অপারেটরকে নির্দেশ দেওয়া হল ৯০ দিনের মধ্যে নিবন্ধীকরণ (registration) করানোর জন্য। অন্যথায় অ-নিবন্ধীত কেবল্ নেটওয়ার্কের অনুষ্ঠান প্রচারকে অপরাধ বলে গণ্য করা হবে।

উল্লিখিত আইন সাময়িকভাবে হয়ত কেবল্ টিভি জনিত সমস্যা থেকে মুক্তির আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু যে দীর্ঘকালীন প্রভাব জনসমাসে পড়ছে তার থেকে তো পালাবার জন্য কোনো আইন নেই। আসলে কেবল্ অপারেটররা তাদের লাভটুকু দেখেন। সেইজন্য অনুষ্ঠানের তালিকায় শুধু বিনোদন, আরও বেশি বিনোদন। আছে তথ্য, আছে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান তবে পরিমাণে বড় কম। কল্পনার জগতে দর্শককে বিচরণ করিয়ে বিজ্ঞাপনদাতাদের পয়সায় নিজেদের পকেট ভরা এই তো তাদের নীতি। তাই অবারিত দ্বার হিংসা ও যৌনতার। যে সব অল্পবয়সীরা ঘটনা ও ঘটনাবাহুল্যের মধ্যে পার্থক্য বোঝে না তাদের আরও বেশি করে মোহাচ্ছন্ন করা হল। বিদেশী টিভি বাহিত বিদেশী সংস্কৃতিকে তারা সাদরে গ্রহণ করে ছুঁড়ে ফেলে দিলো দেশীয় সভ্যতা। অপ্রাকৃত আর অপার্থিব শক্তির পূজারী হয়ে উঠলো শিশুমন। এমনই যুগসন্ধিক্ষণে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বায়ুতরঙ্গ দ্বারা সম্প্রচার পেল স্বাধীনতার ছাড়পত্র। অর্থাৎ এতদিন উপগ্রহ চ্যানেলের অনুষ্ঠান প্রচারে ব্যবহৃত ভারতীয় আকাশসীমার জন্য অর্থ দিতে হত। এখন থেকে তা মুক্ত হয়ে গেল। টনক নড়লো সরকারের। ১৮৮৫ সালের ভারতীয় টেলিগ্রাফ আইন দিয়ে যে আর নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না তা বুঝতে পেরেই ১৯৯৫ তে শুরু হয় সম্প্রচার বিল তৈরির কাজ।

সম্প্রচার বিল ঃ সম্প্রচার বিল সংসদে এল ১৯৯৭-এর মে মাসে (বিল নং ৭১, ১৯৯৭) হিংসা ও যৌনতার অত্যধিক প্রচার রুখতে, ভারতীয় সংস্কৃতি, সভ্যতা ও সংহতিকে ধরে রাখতেই এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে, কেবল্ টিভি নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৮৩ সালের ওয়ার্কিং কমিটির রিপোর্ট, সেনগুপ্ত কমিটির পর্যবেক্ষণ এবং প্রসার ভারতীর চিন্তা মাথায় রেখে এটি তৈরি করা হয়েছিল। সম্প্রচার ব্যবস্থা যেন অপরাধকে প্রশ্রয় না দেয়, কোনোরকম, অপমানকর মন্তব্য যেন জনগণকে আঘাত না করে কিংবা সংবাদ যেন সবসময়েই পক্ষপাতবিহীন ও যথার্থ হয়—এই ছিল বিলের বক্তব্য। ১২ মে, ১৯৯৭ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী 'স্টেটমেন্ট অফ অবজেক্টস্ অ্যান্ড রিজন্' পাঠ করেন যেখানে সম্প্রচার ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন সম্বন্ধে অবহিত করা হয়েছিল। এই স্টেট্‌মেন্টে বলা হল—

(১) উপগ্রহ সম্প্রচার ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদেশী কোম্পানীগুলি কোনো নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই ভারতের আকাশে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে। অথচ ভারতীয় কোম্পানীগুলি বর্তমানে কোনো নিজস্ব রেডিও বা টিভি স্টেশন স্থাপনের অনুমতি পায় না।

(২) সংসদের বাইরে এবং ভিতরে এই অনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মন্তব্য শোনা যাচ্ছে। শুধু ১৮৮৫-র ভারতীয় টেলিগ্রাফ আইন যে পরিবর্তিত পরিস্থিতি সামলাতে পারবে না তাও পরিষ্কার। এক্ষেত্রে সম্প্রচার বিল নিঃসন্দেহে এক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশগুলিও এ ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করেছে।

(৩) ভারতের মত এত বড় গণতান্ত্রিক দেশে শুধুমাত্র সরকারি ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত সম্প্রচার সব দর্শককে খুশি করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য বেসরকারি পরিষেবা চালু করা প্রয়োজন।

(৪) একটি অটোনোমাস ব্রডকাস্টিং অথরিটি তৈরির কথা বিলে বলা হয়েছে। এই অথরিটি এমনভাবে সম্প্রচার পরিষেবা নিয়ন্ত্রণ করবে যাতে পরিষেবার গুণগত মান নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বজায় থাকে। কোনো কোম্পানীর একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধেও এই অথরিটি সরব হবে।

উল্লিখিত বিশেষত্ব সমন্বিত হয়ে বিলটি পাঠানো হল সংসদের জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটিতে। অনেকেই আশা করেছিলেন যে ১৯৯৭ সালের শীতকালীন অধিবেশনে কমিটি তাদের মতামত ব্যক্ত করবে। কিন্তু বারংবার সরকারের রদবদলে সম্প্রচার বিলের গায়ে আইনী তকমা লাগতে ক্রমশ দেরী হতে লাগলো। ইতিমধ্যে ১৯৯৭-এর ৪ ডিসেম্বর লোকসভা ভেঙে যাওয়ার ফলে বিলটি বাতিল হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেলো ডিটিএইচ পরিষেবা চালু করার সম্ভাবনা। (কারণ ১৯৯৭-এর ১৬ জুলাই কেন্দ্রীয় সরকার এক নির্দেশে বলেছিলেন যে সম্প্রচার বিল চালু না হওয়া পর্যন্ত ডিটিএইচ পরিষেবা শুরু করা যাবে না)। সেইসঙ্গে কেবল্ আইনের পরিবর্তন, ক্রসমিডিয়া ওনারশিপ প্রভৃতি গুরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও ধামাচাপা পড়ে গেল।

অর্থাৎ সম্প্রচার বিল একদিকে যেমন গণমাধ্যমের প্রভাব নিয়ে চিন্তিত তেমনই নতুন প্রযুক্তিকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে বদ্ধপরিকর, এই বিলের আইনে রূপান্তর অবশ্য কাম্য।

৭.৪ কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য—ন্যারোকাস্টিং—সিএনএন

কেবল্ টিভির অনুষ্ঠান সম্প্রচার ব্যবস্থা লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে এই চ্যানেলগুলি বেশিরভাগই একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর দর্শকের কথা মনে রেখে তৈরি হয়। অন্য সম্প্রচারে যেমন একই চ্যানেলে মনোরঞ্জন, তথ্য, শিক্ষা প্রভৃতি নানাধরনের তথা নানারকমের অনুষ্ঠান থাকে। কেবল্ টিভির চ্যানেলে তা প্রায় হয় না বললেই চলে। যেমন ESPN দেখবে ক্রীড়াপ্রেমী দর্শক, ডিজনী চ্যানেল দেখবে ছোটোরা আবার STAR NEWS দেখবে সংবাদ অন্বেষী কোনো ব্যক্তি। এই যে বিশেষ গোষ্ঠীর বিশেষ চ্যানেল সেই নিয়েই এবারের আলোচনা।

ন্যারোকাস্টিং ঃ ব্রডকাস্টিং বা সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের টার্গেট অডিয়েন্স বা লক্ষ্য হল বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন রুচির তথা বিভিন্ন মানসিকতার দর্শক। একটি চ্যানেলে নানাধরনের অনুষ্ঠান দেখানো হয়। প্রত্যেকে তার পছন্দের অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট সময়ে দেখতে পায়। কিন্তু কেবল্ টিভিতে যে সব চ্যানেলের অনুষ্ঠান দেখানো হয় তাদের টার্গেট অডিয়েন্স ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত। কোনো একটি চ্যানেলের দর্শকরা হয় বয়সে কিংবা রুচিতে কিংবা মানসিকতায় কোনো না কোনো ভাবে সমতা রক্ষা করে। এই যে বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ চ্যানেলের সম্প্রচার একে বলা হয় ন্যারোকাস্টিং। যেমন সংবাদপ্রেমী দর্শকদের জন্য আছে ২৪ ঘণ্টার নিউজ চ্যানেল। ক্রীড়ামোদী দর্শকের জন্য শুধুই... স্পোর্টস্ চ্যানেল। এ পদ্ধতিতে দর্শককে তার পছন্দের অনুষ্ঠানের জন্য সময়ের অপেক্ষা করতে হয় না। এই বিভাগীয়করণ অবশ্য ব্রডকাস্টিং ব্যবস্থাকে বেশ বিপদে

ফেলে দিয়েছে। কারণ ন্যারোকাস্টিং ব্যবস্থায় বিজ্ঞাপনদাতারা তাদের উৎপাদিত সামগ্রীটির ঠিক কোথায় বিজ্ঞাপন দেবেন তা সহজেই বুঝতে পারছেন। কারণ তাদের টার্গেট অডিয়েন্স এখানে চ্যানেলের টার্গেট অর্ডিয়েন্সের সঙ্গে সমতা বজায় রাখছে। অথচ ব্রডকাস্টিং ব্যবস্থায় একইসঙ্গে বিভিন্ন সামগ্রীর বিজ্ঞাপন দেখানো হয়, ফলে ক'জন উৎসাহী দর্শক যে সেটা দেখলো তা বোঝা যায় না। এ অনেকটা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মত। কিন্তু নির্দিষ্ট চ্যানেলের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ন্যারোকাস্টিং ব্যবস্থায় যারা ঐ চ্যানেল দেখছেন তারা নিঃসন্দেহে এ ব্যাপারে আগ্রহী। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে কোনো গলফ্ খেলার সামগ্রী বিক্রেতা গলফ্ চ্যানেলে বা নিদেন পক্ষে, স্পোর্টস্ চ্যানেলে বিজ্ঞাপন দিলে তা গলফ্ খেলায় উৎসাহী দর্শকের কাছেই পৌঁছাবে। কিন্তু ব্রডকাস্টিং এর ক্ষেত্রে তা বলা যায় না। তাই বিজ্ঞাপনদাতারা ন্যারোকাস্টিং ব্যবস্থায় অধিক আগ্রহী হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ন্যারোকাস্টিং ব্যবস্থায় দুটি স্তরে (টু-টায়ার সিস্টেম) অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। একটি বেসিক চ্যানেল পদ্ধতি এবং দ্বিতীয়টি প্রিমিয়াম চ্যানেল পদ্ধতি।

সি. এন. এন ঃ

১৯৯৬ সালের ন্যাশানাল কেবল্ টেলিভিশন অ্যাসোশিয়েসনের দেওয়া তথ্য জানায় যে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি গ্রাহকসংখ্যা কেবল্ নিউজ নেটওয়ার্কের (CNN)। সংখ্যাটি ছিল ৬৯ কোটি ৯ লক্ষ ৫০ হাজার। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নেটওয়ার্কের মধ্যে ই এস পি এন-এর গ্রাহকসংখ্যা ৬৯ কোটি ৮ লক্ষ, ডিস্‌কভারি চ্যানেলের ক্ষেত্রে ৬৯ কোটি ৪ লক্ষ ৯৯ হাজার। এম টিভি ও CNBC-এর ক্ষেত্রে সংখ্যা দু'টি যথাক্রমে ৬৫ কোটি ৯ লক্ষ এবং ৬০ কোটি। CNN-এর গ্রাহকসংখ্যা আজও সর্বোচ্চ।

যে কেবল্ নেটওয়ার্কটির এত গ্রাহক সেটি কী অনুষ্ঠান দেখায়? কবেই বা এর যাত্রা শুরু হয়েছিল? খুব স্বাভাবিকভাবেই এ সব প্রশ্ন মনে আসবে।

১৯৮০ সালের জুন মাসে সি এন এনের জন্ম। ১৭ লক্ষ গ্রাহক নিয়ে শুরু হয় তার পথ চলা। টার্নার ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের মালিক টেড টার্নারের মানসপুত্র এই CNN, এক ২৪ ঘণ্টার সংবাদভিত্তিক চ্যানেল। ১৯৮৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর উত্তর আমেরিকার পরিধি ছেড়ে ইউরোপে ব্যবসা ছড়িয়ে দেওয়ার স্বার্থে তৈরি হয় স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল 'সি এন এন ইন্টারন্যাশনাল'। ১৯৯৫ সালের ৩০ জুন ভারতীয় দূরদর্শনের সঙ্গে চুক্তি করে শুরু করে ২৪ ঘণ্টার স্যাটেলাইট চ্যানেল।

১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের ধারাবিবরণী দিয়ে সারা বিশ্বকে থমকে দেয় সিএনএন। যুদ্ধ শুরুর আগে যেখানে নয় লক্ষ তিরিশ হাজার গ্রাহকসংখ্যা ছিল আমেরিকায় সেখানে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরেই গ্রাহকসংখ্যা দাঁড়ায় এক কোটি। এই চ্যানেলের দুর্দান্ত প্রচারব্যবস্থা সংবাদের সংজ্ঞাকেই বদলে দিয়েছিল। লন্ডন থেকে কায়রো কিংবা মস্কো থেকে টোকিও ১৫০টিরও বেশি দেশে সিএনএনের সম্প্রচার পৌঁছে গেছে। অতি সাম্প্রতিককালের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ধ্বংসের ছবি কিংবা আফগান যুদ্ধের বিবরণ এ চ্যানেলের অন্যতম সাফল্য।

সি.এন এন বিশ্ব জনসাধারণকে তথ্যে সমৃদ্ধ করেছে। আর সেইসঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে বিনোদনের মশলা। তৈরি হয়েছে তথ্য বিনোদন বা ইনফোটেইনমেন্টের নতুন সংজ্ঞা। যা আজকের মানুষকে আয়েস করে ঘরে বসে যুদ্ধের সরাসরি সম্প্রচার দেখতে অভ্যস্ত করেছে।

৭.৫ অনুশীলনী

(ক) বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। কেবল্ টিভিতে যে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয় তার বিশদ বিবরণ দিন।

২। কেবল্ টিভির অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন কেন? ভারতে এ ব্যাপারে কী কী আইন চালু আছে?

৩। আপনার কি মনে হয় নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি চ্যানেলগুলিকে ভারতীয় উপগ্রহ ইনস্যাট-১এ ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত? তাতে কি বিদেশী স্যাটেলাইট চ্যানেলের দৌরাত্ম্য কমবে বলে মনে হয়?

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। বেসিক্ কেবল্ ও প্রিমিয়াম কেবলের পার্থক্য কী?

২। সি.এন.এন সম্বন্ধে টীকা লিখুন।

৩। ন্যারোকাস্টিং ও ব্রডকাস্টিং-এর তুলনা করুন।

৪। দূরদর্শনের নিজস্ব স্যাটেলাইট চ্যানেল চালু করার প্রয়োজনীয়তা কী?

(গ) সঠিক উত্তরটি খুঁজে নিন ঃ

১। বিদেশী উপগ্রহবাহিত বেসরকারি ভারতীয় চ্যানেল স্টার প্লাস/মুভিক্লাব/ডি ডি -৭/সানটিভি।

২। সুপারস্টেশন WTBS আমেরিকা/ইউরোপ/এশিয়া/আফ্রিকায় অবস্থিত।

৩। ESPN / CNN / HBO / MTV একটি প্রিমিয়াম কেবল্ চ্যানেল।

৪। CNN-এর জন্ম ১৯৮০/১৯৭৯/১৯৮১/১৯৮২ সালে।

৫। ন্যারোকাস্টিং ব্যবস্থা একস্তর/দ্বিস্তর/ত্রিস্তর/চতুর্স্তর।

৭.৬ উত্তর সংকেত

(ক) বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তরসূত্র ঃ

১। ৭.২ অনুচ্ছেদটি পড়ুন।

২। ৭.৩. অনুচ্ছেদটি অনুসরণ করে উত্তর দিন।

৩। নিজে লিখুন।

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তরসূত্র ঃ

১। ৭.২ অনুচ্ছেদ থেকে খুঁজে নিন।

২। ৭.৪ অনুচ্ছেদটি পড়ুন।

৩। নিজে লিখুন।

(গ) সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য পুরো এককটি পড়তে হবে।

একক ৮ □ গোষ্ঠীভিত্তিক কেবল্ টিভির বাজারীকরণ নীতি

গঠন

৮.০ উদ্দেশ্য

৮.১ প্রস্তাবনা

৮.২ কেবল্ টিভির সাংগঠনিক কাঠামো ঃ বাজারীকরণ

৮.৩ ফ্রান্চাইজিং পদ্ধতি বা বিশেষ সুবিধার অধিকার

৮.৪ কেবল্ টিভির আয়-ব্যয়ের ডায়েরি ঃ বাজারীকরণ নীতির প্রয়োগ

৮.৫ অনুশীলনী

৮.৬ উত্তর সংকেত

৮.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৮.০ উদ্দেশ্য

আজকের বাজারভিত্তিক দুনিয়ায় সব কিছুই বাণিজ্যে পর্যবসিত। শুধুমাত্র শিল্পের পর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকার মধ্যে কোনো গৌরব নেই। বরং প্রয়োজন বেশি বেশি মুনাফার। যদিও কেবল্ টিভির ব্যবসা শুরু হয়েছিল প্রয়োজন মেটাতে কিন্তু সেখানেও ব্যক্তিগত বাণিজ্যিক স্বার্থ ছিল পূর্ণমাত্রায় সচেতন। দীর্ঘ পথ পেরিয়ে কেবল্ টিভি আজ বিশ্বময় তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছে। তার বিশাল সাম্রাজ্য যেমন টার্নার, ওয়ার্নার প্রভৃতি গালভরা নাম আছে তেমনই আছে অগুন্তি ছোট ছোট স্থানীয় কেবল্ অপারেটর। কিভাবে এরা কেবল্ টিভিকে মুনাফা আদায়কারী হিসাবে বাজারীকৃত করছে তা আলোচনা করাই হল এ এককের উদ্দেশ্য।

৮.১ প্রস্তাবনা

গণমাধ্যমের অন্যান্য শাখার মত কেবল্ টিভিও দুভাবে মুনাফা আদায়ের সুযোগ দেয়। প্রথমত নিজেকে প্রচার করে গ্রাহকদের কাছ থেকে। দ্বিতীয়ত টিভির পর্দায় স্থান কিংবা সময়ের সংকুলান করে বিজ্ঞাপন দাতাদের কাছ থেকে। কেবল্ টিভির এই বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তার বিভিন্ন বিভাগ নিয়েও আলোচনা করা হবে এই এককে। সেই সঙ্গে থাকবে কেবল্ অপারেটর হবার নিয়মকানুন।

৮.২ কেবল্ টিভির সাংগঠনিক পরিচয় কাঠামো ঃ বাজারীকরণ

যে কোনো ব্রডকাস্ট স্টেশনের মতই কেবল্ টিভি তার মূল কার্যকলাপ অনুযায়ী সংগঠিত। নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে সমতা থাকলেও কেবলের সাংগঠনিক পরিকল্পনা অন্যরকম। যে সব বিভাগ এ ব্যবস্থায় কাজ করে তার বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

(ক) গ্রাহক ও কর্মী সম্পর্ক ঃ এ বিভাগটি গ্রাহকদের সুযোগ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখে। তাদের অভাব-অভিযোগের ব্যাপার খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেয়। ভাল জনসংযোগের দ্বারা এ বিভাগ নিজেদের কোম্পানীর ভাবমূর্তি তৈরি করে। এছাড়াও কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ ও কর্মীদের লাভলোকসানের দিকটিও এরাই দেখাশোনা করে একজন আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে।

(খ) বিজ্ঞাপন ঃ স্থানীয় চাহিদাগুলি বিজ্ঞাপনের দ্বারা ঠিকমত বিক্রয়যোগ্য করে তোলাই এ বিভাগের প্রধান কাজ। অনেক ব্যবস্থাপদ্ধতিতে আবার স্থানীয় চ্যানেলগুলিতে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন দ্বারা বা স্থানবিক্রয়ের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান চলাকালীন টিভি পর্দার নিচের দিকে সার বেঁধে চলা বিজ্ঞাপনকে স্থান বিক্রি বা শুধু বিজ্ঞাপনের জন সময় বিক্রি করে আয়ের ব্যবস্থা হয়। বিভাগীয় প্রধান মূল তত্ত্বাবধায়ক।

(গ) অপারেশন বা ব্যবস্থাপনা ঃ এ বিভাগটি একজন অপারেশন ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে। হেডএন্ডের রক্ষণাবেক্ষণ, উপগ্রহ গ্রাহক যন্ত্র কিংবা ট্রাঙ্ক ও ফিডার কেবলের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য রাখা, বিদ্যুৎ পরিবহনের সুব্যবস্থা করা, সিগ্ন্যালের মান যাচাই করা, নতুন কেবল কানেকশান দেওয়া কিংবা খারাপ হয়ে গেলে তা সারানোর ব্যবস্থা করা, কেবল্ সিস্টেমের আরও বিস্তারের ব্যবস্থা এবং তৎসহ প্রযুক্তিবিদ্দের ঠিক জায়গায় ঠিক সময় পাঠানো—এসব কাজই হয় অপারেশন বিভাগের দায়িত্বে। এ সব কাজে ম্যানেজারকে সাহায্য করেন মুখ্য প্রযুক্তিবিদ এবং অভিজ্ঞ সুপারভাইজার।

(ঘ) বাজারীকরণ ও বিক্রয় ঃ এই বিভাগের প্রধান একজন ব্যবস্থাপক (Marketing and sales manager)। তিনি সমীক্ষার দ্বারা গ্রাহকদের পছন্দ-অপছন্দ জেনে পরিষেবার সঠিক ছকটি তৈরি করেন। অর্থাৎ এই বিভাগটি গ্রাহককে অনুষ্ঠান পরিষেবা বিক্রি করে। সেইসঙ্গে বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনা বা বিক্রয়ের উন্নতিমূলক প্রচারকার্য (Promotional Campaign) সম্বন্ধেও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পরিষেবার বা অনুষ্ঠানের সঠিক প্যাকেজটি তৈরি করা, তাদের দাম নির্দিষ্ট করা, বাড়ি বাড়ি প্রচার কাজ চালানো এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি টেলিমার্কেটিং বা টেলিভিশন যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে বাজারীকরণ পদ্ধতির প্রচার কাজ করা এই বিভাগের দায়িত্ব।

(ঙ) বাণিজ্য ঃ এই বিভাগটি মূলত আয়ব্যয়ের হিসাব রাখে। গ্রাহক, পরিষেবা, অফিসের কাজকর্ম ইত্যাদির দরুন খরচ কত হল আর গ্রাহক ও বিজ্ঞাপন দ্বারা আয় কত হল তাই হিসাব রাখা এ বিভাগের দায়িত্ব। এ ছাড়াও বিভাগীয় ব্যবস্থাপক বিভাগের অন্য কর্মচারীদের কাজের হিসাবও রাখেন।

অর্থাৎ একটা ব্যাপার পরিষ্কার যে যত বড় সিস্টেম তত তাদের কর্মীসংখ্যা বেশি ও বিভাগ অনুযায়ী

কাজের চাপও বেশি। জেনারেল ম্যানেজার সম্পূর্ণ সিস্টেমটি নিয়ন্ত্রণ করেন আইনানুযায়ী। তার কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

১। প্রত্যক্ষভাবে বা কর্মীদ্বারা বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন।

২। প্রশাসনিক ব্যবস্থা, সরকারি আইনকানুন মেনে চলার নীতি অধীনস্থ কর্মচারীদের সাহায্যে তৈরি করা।

৩। সিস্টেমের উদ্দেশ্য ও ব্যবস্থাপনা পরীক্ষা করা।

৪। পরিষেবার দক্ষতা বাড়ানো, আয়বৃদ্ধি এবং পরিষেবার দাম কমানো।

৫। বাজেট তৈরি ও নিয়ন্ত্রিত করা এবং তাকে কাজে লাগানো বা প্রয়োগ করা।

৬। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনার অনুমতি প্রদান।

৭। সিস্টেমকে স্থানীয় সরকার ও গণমাধ্যমের কাছে উপস্থাপিত করা।

বাজারীকরণ ঃ

ব্রডকাস্ট স্টেশনের সঙ্গে বিভাগীয় পরিকাঠামোয় সাযুজ্য থাকলেও বাজারীকরণ নীতিতে পার্থক্য আছে কেবল্ টিভির। ব্রডকাস্ট স্টেশনগুলির প্রাথমিক লক্ষ্য হল বিজ্ঞাপনদাতা। কিন্তু কেবল্ টিভির ক্ষেত্রে গ্রাহক প্রথম লক্ষ্য। কারণ যত বেশি গ্রাহক তারা পাবে তত বেশি বিজ্ঞাপনদাতাও আকৃষ্ট হবে। ব্রডকাস্ট সিস্টেমে এক বিশাল সংখ্যক গ্রাহক হাতে নিয়েই যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু কেবল সিস্টেমে গ্রাহকসংখ্যা তৈরি করতে হয়। সেজন্য প্রয়োজন উন্নত পরিষেবার। চাই পরিষ্কার সিগ্‌ন্যাল ও প্রযুক্তিগত গুণমানের উত্তরণ।

তাই কেবল্ টিভির ব্যবসায় একশো শতাংশ সাংগঠনিক সমন্বয় কাম্য। বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানরা তাই নির্দিষ্ট সমায়ান্তর মিলিত হয়ে নানা সুবিধা অসুবিধার কথা আলোচনা করে নেন। এতে সব বিভাগের পরিস্থিতি সবাই জানতে পারেন। গ্রাহক যেহেতু এ ব্যবসার প্রধান উপজীব্য তাই তাদের সঙ্গে যোগাযোগকারী কর্মীদের দিকেও যথেষ্ট নজর দিতে হয়। কর্মীরা যথাযথ সুবিধা পেলে তবেই না উন্নত গ্রাহক পরিষেবা দিতে রাজি হবে। অন্যথায় যেমন তেমন করে করা কাজের ফলে কোম্পানীর ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। ক্ষতি হবে ব্যবসার।

অর্থাৎ একজন কেবল্ অপারেটর তার সিস্টেমের বিভিন্ন বিভাগগুলিকে কিভাবে চালিত করে তার একটা ছবি পাওয়া গেল। এখন এই কেবল অপারেটরটি কিভাবে কাজের দায়িত্ব পেল সে প্রশ্নে যাওয়া যাক।

৮.৩ ফ্রান্‌চাইজিং পদ্ধতি বা বিশেষ সুবিধার অধিকার

কোনো ব্রডকাস্টিং স্টেশনের ক্ষেত্রে লাইসেন্স বলতে যা বোঝায় কেবল্ টিভির ক্ষেত্রে তাকেই বলে ফ্রান্‌চাইজ। কেবল্ যখন সরকার নিয়ন্ত্রিত তখন কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় উভয় সরকারকে দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হয়। ভারতে অবশ্য এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বেসরকারি। শুধু কিছু সরকারি আইন আছে যা মেনে চলতে হয়, আর এন্টারটেইনমেন্ট অ্যামিউসমেন্ট ট্যাক্স বা সেন্ট্রাল সার্ভিস চার্জের মত কিছু কর দিতে হয়।

কেবল পরিষেবা যখন প্রথম ভারতে চালু হয় তখন অঞ্চলভিত্তিক বা শহরভিত্তিক ছোট ছোট অপারেটরদের নিয়ে নেটওয়ার্কে তৈরি হত। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন এ ব্যবসা লাভের মুখ দেখতে শুরু করল তখন বড় বড়

সম্প্রচার কোম্পানীগুলি এগিয়ে এল। যেমন জি টিভি, আর পি জি কেবল্, ইনকেবল প্রভৃতি। এরা ছোটো অপারেটরদের কাছ থেকে একটি শহরের দায়িত্ব সম্পূর্ণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে চাইলো। ব্যবসা বাঁচাবার তাগিদে ছোট অপারেটরদের অনেকেই এদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসলো। অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়ালো অনেকটা এরকম যে কোনো শহরে একজন বড় কেবল্ অপারেটর থাকবে। এরা পরিচিত হবে হেড এন্ড কেবল অপারেটর হিসাবে। এদের অধীনে থাকবে বহু ছোট কেবল্ অপারেটর যারা স্থানীয় (লোকাল) কেবল্ অপারেটর বলে চিহ্নিত হবে।

হেড এন্ড কেবল অপারেটর কোন্ শহরে দখল নেবে তা সরকারি ব্যবস্থায় ঠিক হবে। কিন্তু স্থানীয় কেবল্ অপারেটরদের নিয়োগ করবে হেড এন্ড অপারেটর। অর্থাৎ সরকার ফ্রানচাইজি দেবে শুধুমাত্র হেডএন্ড অপারেটরকে। যদিও প্রাথমিক ভাবে এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছোট অপারটেররা যথেষ্ট বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু সরকার নিজেও কেবল্ ব্যবস্থার বেসরকারিকরণে উদ্যোগী ছিলেন। তাই বড় বড় বেসরকারি সম্প্রচার গোষ্ঠীর হাতে চলে গেল শহরগুলির দায়িত্ব। জিটিভির অনুগ্রহপ্রাপ্ত সিটি কেবল্ দিল্লীতে, আর পি জি কেবল কলকাতায় এবং হিন্দুজা গোষ্ঠী মুম্বাইতে; একচেটিয়া মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর হ'ল।

আসলে নব্বই-এর দশকের শুরুতে যে উদারীকরণ তথা বেসরকারিকরণের হাওয়া ভারতীয় অর্থনীতির ভোল পাল্টে দিতে চেয়েছিল কেবল্ টিভি সেই স্রোতেরই অন্যতম ফসল। একদিকে কেবল্ সম্প্রচার ব্যবস্থায় বেসরকারিকরণ রুখতে নানা আইনী ব্যবস্থার বাধা তৈরি হচ্ছে অন্যদিকে দেশীয় বেসরকারি সংস্থাগুলিকে অবিরাম ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে এটিকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং সরকারি মতামত বদলের সঙ্গে এ বৈপরীত্য আজও কেবল্‌টিভিকে স্থায়ী কোনো সিদ্ধান্তের আওতায় আনতে দেয়নি। একদিকে সম্প্রচার বিলের প্রয়োজনীয়তা অন্যদিকে সম্প্রচার বিলের আইনীকরণে ডি টি এইচ ব্যবস্থার সূত্রপাতের ভয়াবহতা সরকার ও বেসরকারি টানাপোড়েনকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এরপরের ব্যবস্থা—ভবিষ্যৎ বলবে।

৮.৪ কেবল টিভির আয়-ব্যয়ের ডায়েরি ঃ বাজারীকরণ নীতির প্রয়োগ

কেবল্ টিভির আয়ের মূল উৎস গ্রাহকসংখ্যা। গ্রাহকদের কাছ থেকে কোম্পানি তার দ্বি-স্তর পরিষেবার জন্য দু'ভাবে টাকা নেয়। প্রথমত বেসিক কেবল্ চ্যানেলের জন্য এবং দ্বিতীয়ত প্রিমিয়াম কেবল্ চ্যানেলের জন্য। বেসিক কেবলের অন্তর্গত পে-চ্যানেলগুলি যখন তাদের চার্জ বাড়িয়ে দেয় তখন কেবল্ অপারেটররাও গ্রাহকদের মাসিক হার বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়। প্রিমিয়াম কেবলের মধ্যে ইন্টারঅ্যাকটিভ্ কেবল্ একধাক্কায় মাসিক হার অনেকটা বাড়িয়ে দিতে পারে। যেমন—ইন্টারনেটের সংযোগ। এতে গ্রাহকেরও ফোনের বিলের সঙ্গে চার্জ মেটানোর দায় থাকে না বা অথরিটির কাছ থেকে ঘণ্টা বা সময় কেনার ঝামেলা পোয়াতে হয় না। সবই করে কেবল্ অপারেটর। শুধু মাসিক ভিত্তিতে তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ দিতে হয় যা পুরনো ব্যবস্থার তুলনায় সস্তা। (সাধারণত কেবল্ টিভির আয়ের নব্বই শতাংশ আমদানী গ্রাহকসংখ্যার ওপর নির্ভরশীল)। ভারতে মোট

কুড়িটি শহরে ডিশনেট এ ব্যবস্থা চালু করেছে। সম্প্রতি কলকাতাতেও এ পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে। কেবল্ টিভির দ্বিতীয় আয়ের পথ হল বিজ্ঞাপন। এখানেও গ্রাহকসংখ্যা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যত বেশি গ্রাহকসংখ্যা হবে বিজ্ঞাপনদাতারা তত বেশি আকৃষ্ট হবে। যদিও স্থানীয় কেবলে বিজ্ঞাপনের মান খুব ভালো হয় না কিন্তু অঞ্চলে কি পাওয়া যাচ্ছে তা জানার জন্য এ ধরনের বিজ্ঞাপন দর্শকদের কাছে খুবই দরকারী। নামকরা কেবল্ কোম্পানীগুলি তাদের চ্যানেলের জন্য নির্দিষ্ট শ্রেণীর দর্শক পায়। আর বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে কোন্ চ্যানেলের কত দর্শকসংখ্যা তা জানা খুবই জরুরী। তাছাড়াও রুচির পার্থক্য থাকে, যার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন চ্যানেলে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনদাতা বিজ্ঞাপন দিতে পারে।

এবার আসা যাক খরচের কথায়। অন্য সম্প্রচার ব্যবস্থায় যেমন কর্মীদের বেতন, যোগাযোগ, যাতায়াত কর দেওয়া কর্মীদের সুযোগসুবিধা, অনুষ্ঠান প্রচার ইত্যাদি কাজে ব্যয় এখানেও সেরকম। অতিরিক্ত বলতে ফ্রানচাইজিং অথরিটিকে মোট আয়ের পাঁচ শতাংশ দিতে হয়। সেই সঙ্গে মাইলব্যাপী কেবলের রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির দেখভাল করতে হয়। এছাড়াও যে ইউটিলিটি পোল ব্যবহার করা হয় তার জন্য ভাড়া দিতে হয় টেলিফোন ও বিদ্যুৎ কোম্পানীকে।

বর্তমানে অবশ্য টেলিমার্কেটিং-এর দ্বারা আয়ের অপর একটি পথ প্রশস্ত হয়েছে। যদিও টেলিমার্কেটিং ব্যবস্থা বিজ্ঞাপনের আওতাতেই পড়ে, তবে এটি অন্যরকম। স্থানীয় কেবল্ চ্যানেলের বেশ কিছুটা সময় এরা মোটা টাকায় কিনে নেয়। ঐ সময়ে কোনো সংস্থা তাদের কাছে পাওয়া যাবে এমন সব প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বিবরণ দেয়। কোনো সামগ্রী পছন্দ হলে ঘরে বসেই ফোন মারফত সেটি কেনার ব্যবস্থা করা যায়। এক্ষেত্রে অন্যান্য বিজ্ঞাপনের চেয়ে সময় অনেক বেশি লাগে বলে টাকার পরিমাণও অনেক বেশি দিতে হয় কেবল্ কোম্পানীকে। এ ধরনের অনুষ্ঠান যেমন আর্থিক সুবিধা দেয় তেমনই গ্রাহকদের উৎসাহ বাড়িয়ে বিক্রয়কারী সংস্থাগুলিকে এ ব্যাপারে উৎসাহী করে। প্রকারান্তরে লাভ হয় কেবল্ কোম্পানীর।

অর্থাৎ একটার পর একটা ধাপ পেরিয়ে চলছে কেবল্ টিভি। কী প্রযুক্তিগত উন্নয়ন কী ব্যবসায়িক উন্নতি সবদিকেই তার চূড়ান্ত সফলতা, এখন দেখার বিষয় হল এ সফলতার সিঁড়ি আর কতদূর উঠবে।

৮.৫ অনুশীলনী

(ক) বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। একটি কেবল্ কোম্পানীর সাংগঠনিক পরিকাঠামো নিয়ে আলোচনা করুন।

২। কেবল্ টিভির ব্যবসা মূলত গ্রাহক নির্ভর। তাই ভালো জনসংযোগ ছাড়া এ ব্যবসায় উন্নতি হয় না—ব্যাখ্যা করুন।

৩। ফ্রান্চাইজিং বলতে কেবল্ টিভির ব্যবসায় কী বোঝানো হয়? ভারতীয় ব্যবস্থার উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করুন।

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। কেবল্ টিভির আয়ের উৎস কী কী?

২। একটি কেবল্ কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজারের কাজ কী কী?

৩। টেলিমার্কেটিং বলতে কী বোঝায়?

৪। ব্রডকাস্ট স্টেশন ও কেবল্ টিভির বাজারীকরণ নীতির তফাৎ কী?

(গ) সঠিক উত্তরটি খুঁজে নিন ঃ

১। সিটি কেবল্—জিটিভি/এমটিভি/সানটিভি/স্টার টিভির অনুগ্রহপ্রাপ্ত।

২। মুম্বাইতে—গোয়েঙ্কাগোষ্ঠী/বিড়লা গোষ্ঠী/হিন্দুজা গোষ্ঠী/আম্বানি গোষ্ঠী কেবলের ব্যবসায় একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রেখেছে।

৩। ডিশনেট ভারতের মোট ২০/২১/২২/২৩ টি শহরে ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করেছে কেবল্ টিভির সাহায্যে।

৪। কেবল্ অপারেটর ফ্রানচাইজিং অথরিটিকে আয়ের ৪/৫/৬/৭ শতাংশ কর হিসাবে দিতে হয়।

৫। হেডএন্ডের রক্ষণাবেক্ষণ করেন—অপারেশন/মার্কেটিং/বিজনেস/অ্যাডভার্টাইজিং বিভাগ।

৮. ৬ উত্তর সংকেত

(ক) বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তরসূত্র ঃ

১। ৮.২ অনুচ্ছেদ থেকে লিখুন।

২। এককটি ভালো করে পড়ে তবেই লিখুন।

৩। ৮.৩ অনুচ্ছেদটি পড়ুন।

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তরসূত্র ঃ

১। ৮.৪ অনুচ্ছেদটি অনুসরণ করুন।

২। ৮.২ অনুচ্ছেদ থেকে খুঁজে নিন।

৩। ৮.৪ অনুচ্ছেদটি পড়ুন।

৪। ৮.২ অনুচ্ছেদ থেকে লিখুন।

(গ) সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য পুরো এককটি পড়তে হবে।

৮.৭ গ্রন্থপঞ্জী

যে সব বই এই একক চারটির সঙ্গে অতিরিক্ত হিসাবে পড়তে পারেন তার তালিকা নীচে দেওয়া হল।

১। টেলিপ্রজন্মে সংস্কৃতি

লেখক—অঞ্জন বেরা

পরিবেশক—দেজ পাবলিশিং/কলকাতা

২। মাস কমিউনিকেশন ইন ইন্ডিয়া

লেখক—কেবল জে. কুমার

পরিবেশক —জয়কো পাবলিশিং হাউস।

৩। মাস কমিউনিকেশন টুডে (ইন দ্য ইন্ডিয়ান কনটেক্স)

লেখক—সুবীর ঘোষ

পরিবেশক—প্রোফাইল পাবলিশার্স

পি. জি. ডি. জে. এম. সি

ষষ্ঠ পত্র—খ

একক ১ ❑ বিজ্ঞাপনের সংজ্ঞা, বিবর্তন এবং ভূমিকা

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য
১.১ প্রস্তাবনা
১.২ বিবর্তন এদেশে ও বিদেশে
১.৩ বিপণন ও গণজ্ঞাপন
১.৪ বিপণনের সংযোগ প্রক্রিয়ার হাতিয়ার
১.৪.১ পাবলিসিটি
১.৪.২ সেলস প্রমোশন
১.৪.৩ পারসোনাল সেলিং
১.৪.৪ বিজ্ঞাপন
১.৫ বিজ্ঞাপন : সংজ্ঞা
১.৬ বিজ্ঞাপনের সুবিধা
১.৭ জন-সংযোগেরও হাতিয়ার
১.৮ বিজ্ঞাপন প্রভাবিত করে
১.৯ বিজ্ঞাপনের প্রকারভেদ
১.৯.১ জাতীয় বিজ্ঞাপন
১.৯.২ স্থানীয় বিজ্ঞাপন
১.৯.৩ আন্তর্জাতিক বিজ্ঞাপন
১.৯.৪ প্রতিষ্ঠানগত বিজ্ঞাপন
১.৯.৫ জনসেবামূলক বিজ্ঞাপন
১.৯.৬ ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন
১.৯.৭ সরাসরি বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপন
১.৯.৮ শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন
১.৯.৯ প্রদর্শনমূলক বিজ্ঞাপন
১.১০ বিজ্ঞাপন - শ্রমশিল্প
১.১০.১ বিজ্ঞাপন বিভাগ
১.১০.২ বিজ্ঞাপন সংস্থা
১.১০.৩ মাধ্যম
১.১০.৪ বিশেষ পরিষেবা গোষ্ঠী
১.১১ বিজ্ঞাপন - পেশা
১.১২ বিজ্ঞাপন - কারুশিল্প
১.১৩ সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট
১.১৪ সারাংশ
১.১৫ অনুশীলনী
১.১৬ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে আলোচনা করা হয়েছে — বিজ্ঞাপন কী? বিজ্ঞাপন আমাদের জীবনে কী কী ভূমিকা পালন করে। আধুনিক বিপণনে বিজ্ঞাপনের কাজ কী? বিজ্ঞাপন কোন্ কোন্ সামাজিক দায়িত্ব পালন করে। এই এককটি পাঠ করলে আপনি বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত এই বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করতে পারবেন—

- বিজ্ঞাপনের ইতিহাস এবং বিবর্তন
- বিপণনের সংযোগ প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞাপনের ভূমিকা কী?
- বিজ্ঞাপনের সংজ্ঞা এবং সুবিধা
- বিজ্ঞাপন কত প্রকারের হয়
- বিজ্ঞাপন শিল্পের বিভিন্ন দিক
- পেশা হিসাবে বিজ্ঞাপন
- বিজ্ঞাপনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবদান

১.১ প্রস্তাবনা

আধুনিক বিপণন ব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে - বিজ্ঞাপন। একটি ভোগ্যপণ্য তৈরি করে, তার মূল্য নির্ধারণ করে, সুন্দর আকর্ষণীয় মোড়কে বিভিন্ন দোকানে পৌঁছে দিলেই বিপণন সম্পূর্ণ বা সফল হয় না। পণ্যটি বর্তমানে যাঁরা ব্যবহার করছেন এবং ভবিষ্যতে যাঁদের ব্যবহার করার সম্ভাবনা আছে, তাঁদের সকলকে ঐ পণ্যটি সম্বন্ধে জানাতে হবে। পণ্যটির বিষয়ে জানার পর তাঁদের যদি বিশ্বাস হয় এই পণ্যটি ব্যবহার করলে তাঁদের বিশেষ কোনো সুবিধা হবে বা কোনো বিশেষ প্রয়োজনীয়তা পূরণ হবে, তবেই তাঁদের মনে আকাঙ্ক্ষা জাগবে ঐ পণ্যটি ব্যবহার করার জন্য। তার পরেই ব্যবহারকারী সাধারণ মানুষ ঐ পণ্যটি কিনবেন এবং ব্যবহার করবেন। প্রস্তুতকারী সংস্থার সঙ্গে ব্যবহারকারীদের যোগসূত্র — বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনই বিপণনের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করে। বিজ্ঞাপন বাদ দিয়ে আধুনিক বিপণন ব্যবস্থার বিষয় চিন্তা করা যায় না।

বিজ্ঞাপন আজ আমাদের জীবনে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। সকাল থেকে রাত্রি আপনারা প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত বিজ্ঞাপন দেখছেন এবং শুনছেন। সংবাদপত্র, বিভিন্ন পত্রিকা, টেলিভিশন, রেডিও সর্বত্রই সংবাদ এবং অন্যান্য রচনা ও অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বারে বারে আপনার দৃষ্টি এবং মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে অসংখ্য বিজ্ঞাপন। আপনি গ্রাহক, আপনি ব্যবহারকারী, আপনার মনোভাব যাতে একটি বিশেষ নামের পণ্যের অনুকূলে পরিবর্তিত করা যায়, সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রচেষ্টা। আধুনিক বিজ্ঞাপন আজ মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে।

সহজে বলতে গেলে, কোনো পণ্যের প্রস্তুতকারী সংস্থা এবং পণ্যটির ব্যবহারকারীদের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তোলে এবং বজায় রাখে—বিজ্ঞাপন। অবশ্যই, বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে।

আপনারা জানেন, যে কোনো জ্ঞাপন ব্যবস্থায় তিনটি মূল উপাদান থাকা আবশ্যিক। এক — প্রেরক, যিনি তাঁর পণ্যের বার্তা সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের জানাতে চান। দুই — বার্তা বা বৃত্তান্ত, পণ্যটির বিষয়ে ব্যবহারকারীদের পক্ষে উপযোগী তথ্য। তিন — গ্রাহক, যে ব্যবহারকারীকে বার্তা পাঠানো হচ্ছে। বলা বাহুল্য, কোনো প্রস্তুতকারীর পক্ষেই লক্ষ লক্ষ ব্যবহারকারীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে পণ্যটির বার্তা জানানো সম্ভব নয়। সেই কারণেই, পণ্যের বার্তা ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁরা গণমাধ্যম ব্যবহার করেন। সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য ব্যবহারকারীদের কাছে বিভিন্ন পণ্য এবং পরিষেবার বার্তা পৌঁছে দেয় — বিজ্ঞাপন, গণমাধ্যম।

১.২ বিজ্ঞাপন-এর বিবর্তন এদেশে ও বিদেশে

আধুনিক বিপণনের শক্তিশালী হাতিয়ার, আধুনিক জীবনযাত্রার অঙ্গ এবং আধুনিক পেশা হিসাবেই বিজ্ঞাপন গণ্য হয়। কিন্তু বিজ্ঞাপনের অস্তিত্ব অতি প্রাচীনকাল থেকেই সুবিদিত। বিজ্ঞাপনের ইতিহাস সুদীর্ঘ হলেও, যথাযথভাবে নথিবদ্ধ না হওয়ায়, বিজ্ঞাপনের ইতিহাসের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না।

বিজ্ঞাপনের সূচনা, যা জানা গিয়েছে, যীশুখ্রিস্টের জন্মের তিন হাজার বছরেরও আগে। বুঝতে পারছেন, আজ আমরা যে পদ্ধতি এবং পেশাকে অতি আধুনিক বলে মনে করি সেই পদ্ধতি এবং পেশা পাঁচ হাজার বছর ধরে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে, পাঁচ হাজার বছরের পুরানো পদ্ধতি ও পেশার অঙ্গে এবং আঙ্গিকে প্রাচীনত্বের কোনো ছাপ নেই। পাঁচ হাজার বছরের বিবর্তনের ইতিহাসে বিজ্ঞাপন বরাবরই সমসাময়িক এবং আধুনিক। সেই কারণেই, একবিংশ শতাব্দীতেও বিজ্ঞাপন আধুনিক বিপণনের হাতিয়ার। কলাকৌশলের প্রয়োগেও আধুনিক এবং পেশা হিসাবেও আধুনিক পেশা হিসাবে গণ্য।

এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, মানুষ মাত্রেই নানা জিনিসের প্রয়োজন হয়। জীবনধারণের এই বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস কেউ ব্যবহার করেন, কেউ জোগান দেন। অর্থাৎ, কেউ কেনেন, কেউ বিক্রি করেন। আর, এই বিনিময় (barter) বা বাণিজ্যিক লেনদেন প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞাপনের একটি অবশ্যম্ভাবী ভূমিকা থাকে।

মানব সভ্যতার আদিযুগে, যে গুহামানব তাঁর গুহার বাইরে এসে, আকারে-ইঙ্গিতে, ভাবে-ভঙ্গিতে তাঁর তৈরি পাথরের অস্ত্রের গুণাবলি অন্যদের জানিয়েছিলেন, তিনিই প্রথম বিজ্ঞাপনের সহায়তা নিয়েছিলেন। এইটিই সম্ভবত মুখের কথায় বিজ্ঞাপনের প্রথম নিদর্শন। মুখের কথাই সবচেয়ে কার্যকরী বিজ্ঞাপন, যা এখনও সারা পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। গুহামানবই নানারকম চিত্রের সাহায্যে পাথরের গায়ে নানা বার্তা খোদাই করে মানুষকে জানাবার ব্যবস্থা করতেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মুখের কথার দ্বারা কোনো জিনিস বা পরিষেবার বিষয় একে অন্যকে জানানোই বিজ্ঞাপনের প্রথম নিদর্শন। বহু শতাব্দী নয়, কয়েক হাজার বছর আগে মানুষ যখন তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য একে অপরের সঙ্গে বিনিময় (barter) করতো, তখন মুখের কথার মাধ্যমেই জিনিসের গুণাগুণ বর্ণনা করা হতো। মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিনিময় প্রথাই বিজ্ঞাপনের সূচনা করে। মনে রাখতে হবে, মুখের কথায় জিনিসের গুণাগুণ বর্ণনা বা বিজ্ঞাপন হলেও, যেহেতু কোনো ভাষাই তখনও নিয়মবদ্ধ হয়নি এবং সম্পূর্ণভাবে গড়ে ওঠেনি, সেই কারণে নানারকম ভাবভঙ্গি এবং আকার ইঙ্গিত মুখের কথার পরিপূরক হিসাবে কাজে লাগানো হতো। অর্থাৎ, সূচনাকাল থেকেই বিজ্ঞাপন-এ চিত্রের বা প্রতীকের ব্যবহার হয়ে আসছে। সেই ধারা আজও অব্যাহত।

ঠিক কবে থেকে লিখিত বিজ্ঞাপন প্রচলিত হয়েছিল সে কথা বলা কঠিন। কেমন করে সেই বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা হতো, তা-ও আজ আর জানার উপায় নেই। বৃটিশ মিউজিয়াম-এ সংরক্ষিত আছে প্রাচীন মিশরের একটি প্যাপিরাস। প্যাপিরাস গাছের ছাল থেকে তৈরি এক ধরনের কাগজ যা প্রাচীন মিশরে ব্যবহার করা হতো। প্যাপিরাসই আমাদের আজকের কাগজের জনক। সংরক্ষিত ঐ প্যাপিরাসে - তিন হাজার বছর আগে, একজন মিশরীয় তাঁর পলাতক ক্রীতদাসের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। লিখিত বিজ্ঞাপনের প্রাচীনতম নিদর্শন।

আরো প্রাচীন, পাঁচ হাজার বছরের পুরানো বিজ্ঞাপনের নিদর্শন পাওয়া গেছে ব্যাবিলনের সভ্যতার ধ্বংসাবশেষে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা খনন করে যে সব উল্লেখযোগ্য সভ্যতার নিদর্শন পেয়েছেন, তার মধ্যে রয়েছে প্রাচীর-লেখন। পাওয়া গেছে দেওয়ালে খোদাই করা নানারকম বিজ্ঞাপন। জুতা নির্মাতা তাঁর জুতার বিজ্ঞাপন খোদাই করেছেন। খোদাই করা হয়েছে ওষুধ-মলমের বিজ্ঞাপন। আর, কী আশ্চর্য! লেখক এবং শিক্ষকের বিজ্ঞাপনও ছিল!

বিজ্ঞাপনের পরবর্তী নিদর্শন খ্রিস্টপূর্ব এক হাজার বছর আগের। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা খনন করে প্রাচীন ইতালির পম্পেই শহর আবিষ্কার করলে দেখা যায় পম্পেই শহরে বিভিন্ন দেওয়ালের গায়ে অনেক ঘোষণা আঁকা ছিল। এইসব ঘোষণার মধ্যে নানারকম বিজ্ঞাপনও ছিল। বিজ্ঞাপন ছিল সাধারণের স্নানঘরের (Bathhouse)। আবার সরাইখানার বিজ্ঞাপনও ছিল।

পথিক !

এখান থেকে আর বারোটি টাওয়ার গেলেই

সারিনাস-এর সরাইখানা

অনুরোধ করি — আসুন

বিদায়

ভেবে দেখুন, তিন হাজার বছর আগেও, ট্যুরিজম বা ভ্রমণকারীদের জন্য বিজ্ঞাপন ছিল!

মনে রাখবেন, সারিনাস-এর সরাইখানার মতো বিজ্ঞাপন বেশি ছিল না। বেশির ভাগ বিজ্ঞাপনের টেকনিক বা আঙ্গিক অন্যরকম ছিল। যেহেতু অনেকেই পড়তে পারতেন না, সেই কারণে বিজ্ঞাপনে নানা রকম সংকেত চিহ্ন বা ছবি ব্যবহার করা হতো। একটি ডেয়ারির বিজ্ঞাপনে ছাগলের ছবি এঁকে বোঝানো হয়েছিল — এখানে দুধ পাওয়া যায়। রুটির দোকান বোঝাতে আঁকা হয়েছিল একটি গাধা যাঁতায় আটা পিষছে। কাঠের কাজের মিস্ত্রি করাতের ছবি এঁকে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। সারভেয়ারের বিজ্ঞাপনে আঁকা হতো মাপের লাঠি। এইভাবেই বিক্রেতা তাঁর সম্ভাব্য গ্রাহককে বার্তা জানাতেন। বিজ্ঞাপন ছিল।

ভেবে দেখুন, বর্তমান যুগেও বিজ্ঞাপনে নানারকম প্রতীক (Symbol) ব্যবহার করা হয়। যাঁরা পড়তে পারেন না তাঁদের কিছু জানাতে হলে প্রতীকের সাহায্য নিতে হয়। আপনারা জানেন, লাল ত্রিভুজের অর্থ — পরিবার পরিকল্পনা। একটি জ্বলন্ত প্রদীপকে দুটি হাত দু'দিক থেকে আগলে রয়েছে — এই প্রতীকের অর্থ জীবনবিমা। যাঁরা পড়তে পারেন, তাঁদেরও বিভিন্ন প্রতীক সহজে, চট-জলদি, কোন বিজ্ঞাপন স্মরণ করিয়ে দেয়। আধুনিক যুগের বিজ্ঞাপনে এই প্রতীকের ব্যবহার আধুনিক রয়েছে — হাজার বছর ধরে। আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে,—বিজ্ঞাপন পাঁচ হাজার বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে। আর, প্রথম থেকেই, ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপনের বার্তা বোঝানোর রীতি প্রচলিত ছিল।

প্রাচীনকালে যে সব দেশে সভ্যতা এবং শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ ঘটেছিল, সেই সব দেশেই বিজ্ঞাপন প্রচলিত ছিল। ব্যাবিলন, মিশর, গ্রীস, রোম, ভারতবর্ষ, চীন সব দেশেই বিজ্ঞাপন ব্যবহার করা হতো। সরকারি ঘোষণা, ধর্মীয় ঘোষণা এবং বিভিন্ন জিনিস ও পরিষেবা বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপন করা হতো। দেওয়াল-চিত্রের সঙ্গে মৌখিক ঘোষণাই ছিল বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপন প্রচার করতেন ঘোষকগণ।

সেই গুহামানবের যুগ থেকে বিজ্ঞাপনের ধারা অব্যাহত রেখে — আধুনিক যুগে পৌঁছে দিয়েছেন এই ঘোষকরাই। শিঙা বাজিয়ে বা ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন বার্তা প্রচার করতেন তাঁরা। আমাদের দেশেও, রাজার ঘোষক যেমন সরকারি ফরমান জানাতেন, তেমনই অন্যান্য ঘোষকগণ বিভিন্ন জিনিসের গুণাবলী প্রচার করতেন। আপনাদের পাড়ায় পাড়ায় যাঁরা নানা বিচিত্র পোশাক পরে, পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নেচে গেয়ে, নানা সুরে বিচিত্র হাঁকডাক করে বিভিন্ন জিনিস ফেরি করেন, তাঁরা ঐ প্রাচীন ঘোষকদেরই উত্তরসূরী। ছা-আ-আ-আ-

তা সারাবে-এ গো - পরিষেবার বিজ্ঞাপন। ঘুঙুর বাজিয়ে, নেচে নেচে, — হোরি-দদাসের - বুল-বুল্-ভা-আ-জা—জিনিসের বিজ্ঞাপন।

খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ সাল থেকে ১৪৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপ, এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং ভারতবর্ষ, সর্বত্রই বিজ্ঞাপনের মূল ধারা বহন করে এসেছেন — এই ঘোষকগণ।

১১৪১ খ্রীস্টাব্দে - সপ্তম লুই, ফ্রান্সের বেরী প্রদেশে একদল ঘোষককে প্রচার কাজের জন্য অনন্য (exclusive) সনদ (charter) দিয়েছিলেন, এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে। ঐ পাঁচজন ঘোষক প্রত্যেকে এক একটি সরাইখানার বিশেষ মদ এর গুণাগুণ প্রচার করতেন। ঘোষক প্রথমে শিঙা বাজিয়ে লোক জড়ো করতেন। জমায়েত হলে, তাঁর সরাইখানার মদ-এর গুণ বর্ণনা করতেন। অবশেষে, তাঁর প্রচারিত সরাইখানার মদের নমুনা বিনামূল্যে বিতরণ করতেন জমায়েতের লোকদের। ঐ সরাইখানায় যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ ও জানাতেন। প্রতিটি জমায়েতের জন্য ঘোষককে টাকা দেওয়া হতো। আধুনিক বিপণনের সেলস প্রমোশনের এটাই সম্ভবত প্রাচীনতম নিদর্শন।

ঘোষকের শিঙা শুনতে পেলে সাধারণ লোক ছুটে আসতেন। কারণ ঘোষকেরা প্রথমে হালফিলের সংবাদ প্রচার করতেন এবং বিভিন্ন সরকারী ঘোষণা জানাতেন। সবার শেষে থাকতো বাণিজ্যিক প্রচার—পণ্যের এবং পরিষেবার।

রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পরে অনেক বিষয়েই মানব সভ্যতার অগ্রগতি ব্যাহত হয়। সভ্যতার বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনের অগ্রগতিও থেমে যায়। বস্তুত পঞ্চম খ্রিস্টাব্দ থেকে চতুর্দশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই সময়কে ঐতিহাসিকরা মধ্যযুগ এবং মানব সভ্যতার অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ বলে বর্ণনা করেছেন। এই সময়ে লেখাপড়ার চর্চা কমে যায়। লেখাপড়াকে তখন নীচু-নজরে দেখা হতো। সেই কারণে, সমাজের বেশির ভাগ লোকই লেখাপড়া থেকে দূরে থাকতেন। খুব অল্প সংখ্যক লোকই লেখাপড়ার চর্চা করতেন। ইউরোপে, ধর্মসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের মঠে লেখাপড়ার চর্চা ছিল। সত্য বলতে কী, এইসব মঠের সন্ন্যাসীরাই পঠন-পাঠনের ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন এবং বিশেষ প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও লেখাপড়ার যথাসম্ভব অগ্রগতিও ঘটিয়েছিলেন।

ইউরোপের নবজাগরণ বা রেনেসাঁস (renaissance) লেখাপড়ার চর্চাকে মঠের চার দেওয়ালের বাইরে নিয়ে এসে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে পৌঁছে দেয়। বিদ্যাচর্চা, যা এ পর্যন্ত মঠের সন্ন্যাসীদের এবং সমাজের বিশেষ শ্রেণীর মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, নবজাগরণের পরে সেই বিদ্যাচর্চায় অধিকার, উৎসাহ এবং আগ্রহ সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসারিত হলো। সূচনা হলো মুক্ত চিন্তার, নতুন যুগের। অন্ধকার রাতের পরে যেমন সকালের আলো ফোটে, অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগের পরেই শুরু হলো নবজাগরণের।

এই সময় আর একটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে। ১৪৪৮ খ্রিষ্টাব্দে, জার্মানিতে মুদ্রণযন্ত্র উদ্ভাবন করলেন য়োহান গুটেনবার্গ। সেই মুদ্রণযন্ত্রে ১৪৫৪ খ্রীস্টাব্দে ছাপা হলো বাইবেল। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ জ্ঞান-ভাণ্ডার সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারিত হওয়ার পথ উন্মুক্ত হলো।

প্রায় তিরিশ বছর পরে উইলিয়াম ক্যাক্সটন ইংল্যাণ্ডে প্রথম মুদ্রণযন্ত্র বসালেন। ইংল্যান্ডের এই প্রথম ছাপাখানায় ক্যাক্সটন কতকগুলি বইও ছাপালেন। কিন্তু বইগুলি তেমন বিক্রি হলো না। ক্যাক্সটন তাঁর বইয়ের প্রচারের জন্য একটি হ্যান্ডবিল ছাপালেন। পাঁচ ইঞ্চি চওড়া, সাত ইঞ্চি লম্বা। ক্যাক্সটনের এই হ্যান্ডবিলই, প্রথম মুদ্রিত বা ছাপা বিজ্ঞাপন।

মুদ্রণযন্ত্র প্রচলিত এবং জনপ্রিয় হওয়ার ফলশ্রুতি— মুদ্রিত পত্রিকা। এজন্য একশো বছরেরও বেশী সময় লেগেছিল। ইউরোপের সব বড় শহরে মুদ্রণযন্ত্র চালু হওয়ার পরে ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিস থেকে প্রকাশিত হলো প্রথম পত্রিকা। "জর্নাল জেনেরাল দ্য অফিসেস", জর্নাল অফ্ পাবলিক নোটিসেস (Journal of Public Notices)। ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে প্রকাশিত হলো - উইকলি নিউজ (Weekly News)।

মনে রাখতে হবে, সংবাদপত্র বা পত্রিকা বলতে বর্তমানে আপনারা যা বোঝেন, এই পত্রিকাগুলি সে রকম ছিল না। এই সব পত্রিকায় ছাপা হতো বিভিন্ন ঘোষণা, সরকারি এবং বেসরকারি।

কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে প্রথম মুদ্রিত বিজ্ঞাপন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল জার্মানিতে, ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দে। এটি ছিল বইয়ের বিজ্ঞাপন। অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মতে প্রথম পত্রিকায় মুদ্রিত বিজ্ঞাপন ছিল একটি বইয়ের। সেটি ১৬২৫ খ্রীস্টাব্দে "মারকিউরিয়াস ব্রিটানিকাস" (Mercurius Britannicas) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মতে প্রথম যথার্থ সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দে, "সেভারেল প্রসিডিংস ইন পার্লামেন্ট" (Several Proceedings in Parliament) পত্রিকায়। এক ব্যক্তি তাঁর চুরি হওয়া বারোটি ঘোড়া ফেরৎ পেলে পুরস্কার দেবেন ঘোষণা করে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।

ইস্তাহার, বই, সংবাদপত্র ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপন প্রচারের পথ সুগম হলো।

আরো একশো বছর পরে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে শিল্প বিপ্লব ঘটে। এর ফলে শিল্প, উৎপাদন এবং পরিবহনের চরিত্র আমূল বদলে যায়। কুটির শিল্পের সীমিত সংখ্যক উৎপাদনকে পিছনে রেখে বৃহৎশিল্প, প্রযুক্তির সাহায্যে বিপুল সংখ্যক পণ্য উৎপাদনের সুযোগ এনে দেয়। সাধারণ মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য নানারকম ভোগ্যপণ্য সহজলভ্য করে দেয় বিপুল উৎপাদন (mass production)। অর্থনীতির সূত্র অনুসারে, বিপুল সংখ্যায় উৎপাদন সম্ভব হলে পণ্যের একক প্রতি (per unit) উৎপাদন খরচ কম রাখা যায়। সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যেই ভোগ্যপণ্যের ব্যবহারের সুযোগ বাড়ে।

শিল্প বিপ্লবের আর একটি সুফল বাষ্পীয় ইঞ্জিন (Steam engine)। সঙ্গে নিয়ে এলো রেলগাড়ি এবং স্টিমার। স্থল এবং জল, দুই পথেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত এবং জিনিস পৌছানো অনেক সহজ হয়ে গেলো। কারখানায় তৈরি বিপুল সংখ্যক ভোগ্যপণ্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, ব্যবহারকারীদের কাছে পৌছে দেওয়া সহজ হলো।

উৎপাদনকারী সংস্থাও পণ্যের চাহিদা বাড়াতে আগ্রহী হলো। কারণ, চাহিদা না বাড়ালে, উৎপাদিত পণ্যের বাজার তৈরি হবে কেমন করে? বিক্রি বাড়বে কেমন করে? বিক্রি না হলে, বিপুল সংখ্যক পণ্য উৎপাদন করে লাভ কি? কাজে কাজেই, গ্রাহকদের চাহিদা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন হয় প্রচারের। পৃথিবীতে বিজ্ঞাপনের বিকাশ, শিল্প বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী অবদান বলা যেতে পারে।

বিজ্ঞাপনের ইতিহাস লেখকদের মতে, ১৫৯১ খ্রীস্টাব্দে জার্মানিতে প্রথম সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। আগেই আলোচনা করা হয়েছে, সে সময় পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপনই থাকতো বেশি। সরকারি-বেসরকারি ঘোষণা একত্র করে পত্রিকা প্রকাশিত হতো।

ইংল্যান্ডের সর্বপ্রথম দৈনিকপত্র প্রকাশিত হয় ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে। নাম ছিল "ডেইলি ক্যুর্যান্ট" (Daily Curant)। এর দুই বছর পরে, ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় আমেরিকার প্রথম সংবাদপত্র। এটি ছিল সাপ্তাহিক। "বোস্টন নিউজলেটার" (Boston Newsletter)। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এইসব সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা এবং মান ক্রমশ উন্নত হতে থাকে। বাড়তে থাকে বিজ্ঞাপনের সংখ্যা এবং উন্নত হতে থাকে বিজ্ঞাপনের মান। তবে সবই সীমিত ভাবে। কারণ, বেশির ভাগ লোকই লেখাপড়া জানতেন না। প্রায় সত্তর বছর পরে, ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে, আমেরিকায় মোট ৩১টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হতো।

আমাদের দেশে, অর্থাৎ অধুনা ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নিয়ে যে ভারতবর্ষ ছিল, সেখানে, ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় — কলকাতা শহর থেকে। এটিও ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। দি বেঙ্গল গেজেট। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জেমস অগাস্টাস হিকি (James Augustus Hicky)। পত্রিকাটির আর একটি নাম ছিল — "ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভার্টাইজার" (Calcutta General Advertiser)। পত্রিকাটির দুটি পৃষ্ঠার বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে থাকতো বিজ্ঞাপন। ইউরোপের পত্রিকাগুলির মতনই। পত্রিকাটি হিকির গেজেট নামে জনপ্রিয় হয়েছিল।

একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ইউরোপের পত্রিকাগুলির থেকে তদানীন্তন ভারতবর্ষের পত্রিকাগুলি পিছিয়ে ছিল না। ইউরোপে পত্রিকা প্রকাশের কিছুকাল পরেই ভারতবর্ষে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এদেশের পত্রিকার কাঠামো এবং গুণগত চরিত্র একেবারেই ইউরোপের পত্রিকার কাঠামো ও গুণগত চরিত্রের অনুরূপ। ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ দিকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের লোকের বাণিজ্য এবং অন্যান্য কারণে এই দেশে আগমনের ফলেই সম্ভবত এমন হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে জানা প্রয়োজন, ভারতবর্ষে বিজ্ঞাপনের প্রচলন অতি প্রাচীন কাল থেকেই। প্রচারের জন্য শিলালিপির ব্যবহার এবং গণ জ্ঞাপনের প্রয়াস শুরু হয়েছিল বৌদ্ধ যুগে। ধর্মপ্রচারকগণ এই মাধ্যম ব্যবহার করতেন সাধারণ মানুষকে অবহিত করার জন্য। সম্রাট অশোকের বিভিন্ন স্তম্ভ এবং শিলালিপি আজও তার সাক্ষ্য বহন করছে।

পরবর্তীকালে, ঘোষকগণই ভারতবর্ষে বিজ্ঞাপনের ধারাকে অব্যাহত রেখেছিলেন। হাতে লেখা ইস্তাহার এবং ঘোষকের ঢ্যাঁড়া, শিঙা এবং কণ্ঠ অবলম্বন করে বিজ্ঞাপন কয়েক শতাব্দী অতিক্রম করে ভারতবর্ষে। ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষে বিজ্ঞাপনের সেরকম প্রসার না হওয়ার কারণ সম্ভবত — ভারতবর্ষের কৃষিভিত্তিক এবং গ্রাম কেন্দ্রিক অর্থনীতি, সমাজ এবং সভ্যতা। ইউরোপীয়দের আগমনের পরে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিল্পের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষ, বিশ্বের বিজ্ঞাপনের মূলস্রোতের সঙ্গে ধীরে ধীরে মিলিত হতে থাকে।

১.৩ বিপণন ও গণ জ্ঞাপন

বিপণন ব্যবস্থায় গণমাধ্যমের ভূমিকা কী তার পর্যালোচনার আগে গণ-জ্ঞাপন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

আগেই বলা হয়েছে, জ্ঞাপন পদ্ধতির মৌলিক উপাদান তিনটি — প্রেরক, বার্তা এবং গ্রাহক। এবারে দেখা যাক জ্ঞাপন ব্যবস্থা কীভাবে কাজ করে। সহজ কথায় জ্ঞাপনের অর্থ — যোগাযোগ স্থাপন। নিগূঢ় অর্থ

একে অপরের সঙ্গে একটি বিশেষ তথ্যের বা জ্ঞানের সমান অংশীদার হওয়া। প্রেরক তাঁর বার্তা মুখের কথায়, লিখিতভাবে, বিভিন্ন ছবি এঁকে বা দেখিয়ে, অথবা বিভিন্ন ভাবভঙ্গির দ্বারাও জানাতে পারেন। প্রেরক — কোনো ব্যক্তিও হতে পারেন, অথবা কোনো সংস্থা। প্রেরক তাঁর বার্তা বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমের সাহায্যে গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। প্রচার মাধ্যম — যেমন সংবাদপত্র, প্রকাশন সংস্থা, রেডিও, টেলিভিশন — এই রকম আরো অনেক গণমাধ্যম। বার্তা — কাগজের উপরে লেখা হতে পারে, শব্দতরঙ্গে প্রচারিত হতে পারে, ছবি এবং ধ্বনি, কিংবা অন্য যে কোনো সংকেত হতে পারে, যা অর্থপূর্ণভাবে গ্রাহকের কাছে পৌঁছয়। যে কোন ব্যক্তিবিশেষ এবং সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ও ফিলমের ক্ষেত্রে একসঙ্গে বহু পাঠক, বহু শ্রোতা ও বহু দর্শক গ্রাহক হিসাবে গণ্য হয়।

এবারে দেখা যাক, প্রেরক কীভাবে তাঁর চিহ্নিত গ্রাহকের সঙ্গে কোনো বিষয়ে তথ্য বা জ্ঞানের সমান অংশীদার হওয়ার চেষ্টা করেন। যে বার্তা বা বিশেষ অনুভূতি তিনি গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দিতে চান, সেটি তিনি একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় স্থাপন করেন।

প্রেরক ⟹ সংকেতবদ্ধ করণ ⟹ বার্তা ⟹ সংকেত মোচন ⟹ গ্রাহক

মনে রাখতে হবে, প্রেরকের বার্তা যেন যথেষ্ট, এবং স্বচ্ছ হয়। বার্তাটি এমন নিশানার দ্বারা সংকেতবদ্ধ করতে হবে যাতে সেটি সম্পূর্ণরূপে, নির্ভুলভাবে এবং যাতে ফলপ্রসূ হয়, এমনভাবে গ্রাহকের কাছে পৌঁছতে পারে। প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য বাধা সত্ত্বেও অভিপ্রেত বার্তাটি যেন মনোনীত গ্রাহকের কাছে পৌঁছতে পারে। যদি বার্তাটির সংকেতমোচন — সেটি সংকেতবদ্ধ করার শৃঙ্খলার অনুসারী না হয় এবং যদি সংকেতমোচনের পরেও গ্রাহকের পক্ষে বার্তাটি যথাযথভাবে বোঝা এবং সেটি কাজে লাগানো সম্ভব না হয়, তাহলে এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা অবশ্যই কমে যাবে।

চিহ্নিত গ্রাহক বা শ্রোতার পক্ষে কোনো বার্তা বুঝতেও অসুবিধে হতে পারে। এই কারণে একই বার্তা বারে বারে জানাতে হবে। কোনো জাহাজ সমুদ্রে বিপদে পড়লে বিপদ সংকেত বারে বারে পাঠাতে থাকে, যতক্ষণ না উদ্ধারকারী জাহাজ বা বিমানের সাড়া পাওয়া যায়। মূল সূত্র — বার্তাটি যতক্ষণ না কার্যকরী বা ফলপ্রসূ হচ্ছে, ততক্ষণ গ্রাহককে বারে বারে জানাতে হবে।

সংকেতবদ্ধ করা এবং সংকেতমোচন করার বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করা যাক। আপনার যে রেডিও সেটটি আছে তার মাধ্যমে আপনি আকাশবাণীর বিভিন্ন কেন্দ্রের এবং বিভিন্ন দেশের বেতারকেন্দ্রের অনুষ্ঠানও শুনতে পান। কিন্তু আপনার পছন্দের অনুষ্ঠান যে বিশেষ শব্দতরঙ্গে প্রচারিত হচ্ছে আপনার রেডিওর শব্দ তরঙ্গ তার সঙ্গে মিলিয়ে নিলে তবেই সেই অনুষ্ঠান শুনতে পান। না হলে, শুনতে পান না। আপনার যদি রাশিয়ান ভাষা জানা থাকে তবেই আপনি ঐ ভাষায় সংকেতবদ্ধ করে কোনো বার্তা পাঠাতে পারবেন এবং রাশিয়ান ভাষায় আপনাকে কোনো বার্তা পাঠানো হলে আপনি সেটি বুঝতে পারবেন। অর্থাৎ, সংকেত এমন হবে যা প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে সংকেতবদ্ধ করা এবং সংকেতমোচন করা সম্ভব হবে। কাজেই প্রেরককে এমনভাবে বার্তাসংকেতবদ্ধ করতে হয়, যাতে গ্রাহক সহজে বার্তাটি বুঝতে পারেন এবং তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন।

আপনারা জানেন, যখন দুজন ব্যক্তি পরস্পরের সঙ্গে কথা বলেন তখন একজনের বক্তব্যের উত্তরে অন্যজন ও তাঁর বক্তব্য রাখেন। সাধারণভাবে — প্রত্যুত্তর। জ্ঞাপন প্রক্রিয়ার ভাষায় — প্রতিবার্তা (feedback)।

জ্ঞাপন পদ্ধতিতে কোনো একটি বিশেষ প্রণালি অনুসরণ করা হয় না। নানা প্রণালির মাধ্যমে জ্ঞাপন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র গণমাধ্যমের অন্যতম একটি প্রণালি। কিন্তু একটি সংবাদপত্রেও নানা প্রণালিতে বার্তাজ্ঞাপন করা সম্ভব। বার্তার শব্দের অর্থ ছাড়াও বার্তার শিরোনাম কত বড় হরফে পরিবেশিত হয়েছে। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় কোন জায়গায় বার্তাটি দেওয়া হয়েছে, অথবা কোন বিশেষ পৃষ্ঠায়। সংবাদটির সঙ্গে ছবি আছে কিনা এবং সংবাদটি ছোটো না বড়ো হরফে মুদ্রিত হয়েছে — এই সবকিছুই পাঠকের কাছে বিশেষ বিশেষ বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে। শুধু শব্দ ও বাক্য নয়। বার্তা পরিবেশন পদ্ধতির ভিন্ন ভিন্ন প্রণালিও সংবাদপত্রে কাজে লাগানো হয়।

জ্ঞাপন প্রক্রিয়া হচ্ছে ভাব, ধারণা বা মতের আদান-প্রদান বা পারস্পরিক বিনিময়। এই বিনিময় মুখের কথা, লিখিত কিছু অথবা কোন প্রতীকের মাধ্যমে দুই বা তার বেশি সংখ্যক মানুষের মধ্যে হতে পারে। ইংরাজিতে একে বলে Communication Process।

বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হল গণমাধ্যম। যিনি কোনো পণ্য বিক্রি করতে চান এবং যাঁর বিভিন্ন পণ্যের আবশ্যকতা বা চাহিদা আছে - এই দুই পক্ষের মধ্যে সেতু রচনা করে এই গণমাধ্যমগুলি।

বিজ্ঞাপনের জন্য যে যোগাযোগ সেটি উভয়তই কাজ করে। অভিজ্ঞ বিজ্ঞাপনদাতা ব্যবহারকারীদের সঙ্গে কথোপকথন করেন, তাঁদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করেন না। জ্ঞাপন প্রক্রিয়া কেবলমাত্র তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন গ্রাহক তাঁর প্রতি প্রেরিত বার্তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন। টেলিভিশনের দর্শকরা এবং পত্রিকার পাঠকেরা যে সব বিজ্ঞাপন দেখেন তার কিছু অগ্রাহ্য করেন এবং কিছু স্মরণে রাখেন। যে বিজ্ঞাপনগুলি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয় কেবলমাত্র সেই বিজ্ঞাপনগুলি সম্পর্কেই তিনি বিভিন্ন সময় নিজের মনে চিন্তা করেন। তিনি কিছু গ্রহণ করেন, কিছু বাতিল করেন, কিছু যাচাই করেন। প্রেরকের বার্তাটির সঙ্গে তিনি একমত হোন অথবা না-ই-হোন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিক্রিয়া বার্তাটির এক নতুন ব্যাখ্যা অনুযায়ী হয়। গ্রাহক তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি ও অনুভূতি অনুসারে মনের মধ্যে এই নতুন ব্যাখ্যা তৈরি করে থাকেন। এই নতুন ব্যাখ্যায় বার্তাটি সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় গ্রাহকের নিজস্ব হৃদয়াবেগজনিত আবশ্যকতা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার অনুসারে।

গণজ্ঞাপন সম্ভব হয় গণমাধ্যম দ্বারা। গণজ্ঞাপনের মূল উৎসের কাজ করে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম। যেমন — সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচার ব্যবস্থা ও কেন্দ্র, ফিলম স্টুডিয়ো, পত্রিকা বা বইয়ের প্রকাশন সংস্থা। প্রতিষ্ঠানিক ব্যক্তিরাও এই ভূমিকা পালন করেন, যেমন সংবাদপত্রের সম্পাদক বা কোনো বিভাগীয় সম্পাদক যিনি তাঁর প্রতিষ্ঠানের দেওয়া ক্ষমতাবলে, সম্পাদকীয় ও অন্যান্য কলামে যে বক্তব্য রাখেন, তার গুরুত্ব এবং প্রভাব তাঁর ব্যক্তিগত মতামতের চেয়ে অনেক বেশি।

সংবাদপত্র, বেতার ও দূরদর্শন লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। এই কাজ সফল করবার জন্য মুদ্রণ ও সম্প্রচারের বিরাট কর্মকাণ্ড চলে। গণমাধ্যম ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন পৌঁছে যায় লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে। কিন্তু, গণমাধ্যম ব্যবহার করলেও যে কোনো বিজ্ঞাপনের আসল লক্ষ্য কোনো একজন ব্যক্তি বা একটি পরিবার, যিনি বা যাঁরা গণমাধ্যমের প্রান্তে গ্রাহক হিসাবে রয়েছেন। ব্যক্তি, যিনি সংবাদপত্র পাঠ করছেন, পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছেন, রেডিওর নব ঘোরাচ্ছেন, টেলিভিশনের চ্যানেল পালটাচ্ছেন অথবা সিনেমা হলে গিয়ে ফিলম দেখছেন। পরিস্থিতিটা মুখোমুখি কথোপকথনের থেকে একেবারেই অন্যরকম।

গণমাধ্যমের সাহায্যে পাঠানো বার্তার প্রতিবার্তা, মুখোমুখি কথোপকথনের প্রতিবার্তার মত অত সহজে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন সংবাদপত্র মাঝে মাঝে সমীক্ষা করেন তাঁদের প্রকাশিত কী ধরনের রচনা পাঠকেরা পছন্দ করছেন। অথবা পছন্দ না করলে কেন করছেন না। বেতার ও টেলিভিশন চ্যানেলগুলিও মাঝে মাঝে সমীক্ষা করে জেনে নেন কী ধরনের কত দর্শক তাঁদের কোন কোন অনুষ্ঠান পছন্দ করছেন। এই সব সমীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করে একটি আনুমানিক প্রতিবার্তা খুঁজে নিতে হয়। অর্থাৎ তাঁরা একটা সিদ্ধান্তে আসেন যে তাঁদের অনুষ্ঠান কতটা পাঠক-দর্শক-শ্রোতারা গ্রহণ করছেন।

গণমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে আর একটি বিষয়ে বিশেষ সজাগ থাকা প্রয়োজন। সংবাদপত্রের লক্ষ লক্ষ পাঠকের পক্ষে ঠিক প্রেরকের দৃষ্টিকোণ থেকেই বার্তাটি গ্রহণ করা বা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক গ্রাহক বা ব্যবহারকারী তাঁর নিজস্ব জ্ঞান, পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধি অনুসারে বার্তাটি নিজের মতো করে গ্রহণ করেন। বার্তাটির এই রূপ, বলাবাহুল্য, প্রেরকের পাঠানো বার্তার থেকে অন্যরকম। অর্থাৎ , লেখক বা প্রতিবেদক যে মন নিয়ে লিখছেন, পাঠক ঠিক সেই মন নিয়ে লেখা বা প্রতিবেদনটি নাও পড়তে পারেন। তিনি নিজের মত করে বার্তাটির ব্যাখ্যা করতে পারেন।

আমাদের প্রচলিত জ্ঞাপন প্রক্রিয়ায় (Communication Process) মোট নয়টি উপাদান রয়েছে। দুটি উপাদান — সংযোগ প্রক্রিয়ায় যার মুখ্য ভূমিকা — প্রেরক এবং গ্রাহক। আরো দুটি উপাদান বার্তা এবং প্রচারমাধ্যম। আর চারটি উপাদান সংযোগের মূল কাজের সঙ্গে জড়িত — সংকেতবদ্ধ করা, সংকেতমোচন করা, প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিবার্তা। এই প্রক্রিয়ার সর্বশেষ উপাদান — "গোলমাল"।

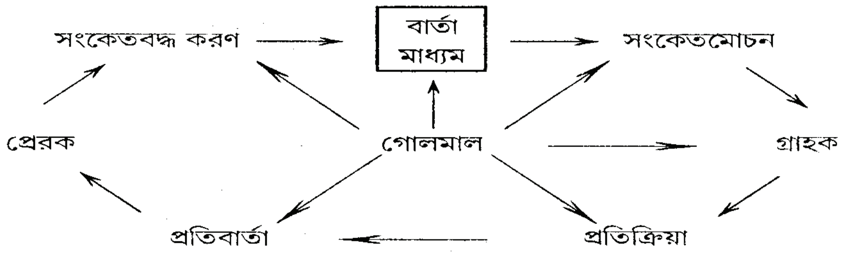

এই নয়টি উপাদানের সংজ্ঞা নীচে দেওয়া হলো।

প্রেরক — যিনি অন্য ব্যক্তির নিকট বার্তা পাঠাচ্ছেন।

সংকেতবদ্ধ করণ — বার্তার বিষয়টি প্রতীকি রূপের সাহায্যে সংকেতে পরিণত করা।

বার্তা — যে বৃত্তান্ত প্রেরক গ্রাহকের উদ্দেশ্যে পাঠাতে চান।

মাধ্যম — সংযোগের যে প্রণালিগুলির মাধ্যমে বার্তা প্রেরকের কাছ থেকে গ্রাহকের কাছে পৌঁছয়।

সংকেতমোচন — যে পদ্ধতির দ্বারা গ্রাহক প্রেরকের পাঠানো প্রতীকগুলির বার্তা বুঝতে পারেন।

গ্রাহক — যিনি অন্য কারো পাঠানো বার্তা গ্রহণ করেন।

প্রতিক্রিয়া — বার্তা পাওয়ার পরে গ্রাহকের মনের যে ইচ্ছা কাজে পরিণত হয়।

প্রতিবার্তা — গ্রাহকের প্রতিক্রিয়ার যে অংশ প্রেরক জানতে পারেন।

গোলমাল — সংযোগ প্রক্রিয়ার মধ্যে পরিকল্পনা বহির্ভূত বিকৃতি যার ফলে গ্রাহকের কাছে যে বার্তাটি পৌঁছয় সেটি প্রেরকের পাঠানো বার্তার থেকে অন্যরকম হয়ে যায়।

গোলমাল-এর ফলে গ্রাহকের মনোযোগ ব্যাহত হয় এবং একটি রূপান্তরিত বার্তা গ্রাহকের মনের উপর ছাপ ফেলে, যার ফলে, গ্রাহক যখন স্মরণ করেন তখন রূপান্তরিত বা খণ্ডিত বার্তাই স্মরণ করেন।

বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত আলোচনায় "গোলমাল"-এর একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। প্রেরক তাঁর পণ্যের বার্তা যে গ্রাহকের কাছে পাঠাচ্ছেন সেই গ্রাহকের কাছে ঐ পণ্যটির প্রতিযোগীদের বার্তাও পৌঁছচ্ছে। তার ফলে, গ্রাহকের মন বিক্ষিপ্ত হচ্ছে এবং প্রেরকের পাঠানো বার্তা যথাযথ বা অভিপ্রেত প্রভাব সৃষ্টি করতে অসুবিধার মধ্যে পড়ছে। বিভিন্ন বার্তার মধ্যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিযোগিতা বিজ্ঞাপন-এর আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পায়।

বিজ্ঞাপন-এর জন্য যে সংযোগ তার বিশেষ গুরুত্ব আছে। যেমন তেমন করে করলে হয় না। সংযোগ সার্থক করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি বিজ্ঞাপন সংস্থার (Agency) পরামর্শ নেন যাতে তাঁদের বিজ্ঞাপনগুলি চিত্তাকর্ষক ও ফলপ্রসূ হয়। বিক্রি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বিশেষ উৎসাহদানের নানারকম পরিকল্পনা করা হয়। জন-সংযোগ বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হয় সংস্থাটির ভাবমূর্তি গ্রহণযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে।

১.৪ বিপণনের সংযোগ প্রক্রিয়ার হাতিয়ার

বর্তমানে সমস্ত প্রস্তুতকারক সংস্থাকেই একটি জটিল সংযোগ ব্যবস্থা চালু রাখতে হয়। পণ্য বাজারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মধ্যবর্তী (middleman) লোকেদের সঙ্গে সংযোগ রাখতে হয়। সংযোগ রাখতে হয় ভোক্তা বা ব্যবহারকারীদের সঙ্গে এবং সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গেও। ব্যবহারকারীরা একে অপরের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে সংযোগ রক্ষা করেন, মত বিনিময় করেন এবং ছোট ছোট গোষ্ঠীও একে অপরের সঙ্গে মত বিনিময় করেন।

বিপণনের সংযোগ প্রক্রিয়ায় সাধারণত চারটি হাতিয়ার (tools) ব্যবহার হয়।

১.৪.১ পাবলিসিটি (Publicity) - প্রচার

সাধারণত আপনারা যে অর্থ বোঝানোর জন্য প্রচার বা পাবলিসিটি শব্দটি ব্যবহার করেন বিপণনের বিজ্ঞানে ঠিক সেই অর্থে এই শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয় না। একটি বিশেষ ধরনের "প্রচার" কেই প্রচার বা পাবলিসিটি বলা হয়। কোনো পণ্য, পরিষেবা বা ব্যবসায়ী সংস্থার চাহিদা বাড়ানোর জন্য বাণিজ্যিক স্বার্থে, সংবাদের আকারে কোনো কিছু প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হলে তাকে প্রচার বা পাবলিসিটি বলে। আপনারা সংবাদপত্রের সংবাদ কলামে মাঝে মাঝে বিভিন্ন পণ্য বা পরিষেবা সম্পর্কিত সংবাদ দেখতে পান। যেমন, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কলামে কখনো কখনো কোন বিশেষ পণ্যের উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। তার ফলে ঐ

পণ্যটির সম্বন্ধে পাঠকদের আগ্রহ জন্মায় এবং পণ্যটির বিক্রি বাড়ে। কোনো কোম্পানির মোট বিক্রি, উৎপাদন এবং লাভ বেড়েছে, এমন সংবাদও আপনারা দেখেন। এর ফলে, পাঠকদের মনে ঐ কোম্পানি সম্পর্কে ভাল ধারণা তৈরি হয় যা ঐ কোম্পানির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে।

সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিজ্ঞাপন বিভাগই এই ধরনের সংবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে, সংবাদে বর্ণিত পণ্যটির বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ে। ব্যবহারকারী মনে করেন — অমুক পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা পণ্যটির গুণাগুণ আলোচনা করেছেন কাজে কাজেই পণ্যটির মান খারাপ হবে না। সংবাদপত্র, টেলিভিশন, বেতার, সব মাধ্যমেই এই ধরনের প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। গণমাধ্যমের দ্বারা পরিবেশিত হওয়ায় পণ্যের বা পরিষেবার বার্তাটি বিশ্বাসযোগ্য এবং সার্বজনিক হয়ে ওঠে। তবে, এই বিশেষ ধরনের প্রচার-এ যে তথ্য যেমন ভাবে প্রকাশ করতে চাওয়া হয়, ঠিক সেইভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। বিভিন্ন মাধ্যম তাঁদের নিজস্ব রীতিনীতি অনুযায়ী এবং কতটা জায়গা বা সময় দেওয়া যাবে সেই হিসাবে, সংস্থার পাঠানো বার্তা অনেক কাট-ছাঁট করেন। এই ধরনের প্রচারের জন্য মাধ্যমকে কোন মূল্য দিতে হয় না কিন্তু বার্তাটি কতখানি এবং কীভাবে প্রকাশিত হবে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মাধ্যম, তার উপরে প্রচারক সংস্থার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বিভিন্ন সংস্থা এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন, কারণ, পণ্যের বা পরিষেবার বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে বা কোম্পানীর ভাবমূর্তি উন্নত করতে এই পদ্ধতি বিশেষ সহায়ক।

১.৪.২ সেলস প্রমোশন (Sales Promotion) — বিক্রি বাড়ানোর জন্য বিশেষ প্রকল্প

কোনো পণ্যের বা পরিষেবার বিক্রি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট এলাকার জন্য স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা। আপনারা দেখেছেন কখনো কখনো কোনো টুথপেস্টের সঙ্গে টুথব্রাশ বিনামূল্যে দেওয়া হয়। লক্ষ্য করবেন, এই রকম পরিকল্পনা একটি নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত চালু থাকবে বলে ঘোষণা করা হয়। অথবা, বলা হয়, যতদিন স্টক থাকবে কেবল ততদিনই দেওয়া হবে। আরো বলা হয়, এই সুযোগ কেবল কলকাতা শহরে বা কলকাতা এবং হাওড়া শহরেই পাওয়া যাবে। অর্থাৎ একটি সীমাবদ্ধ, চিহ্নিত জায়গায়, একটি নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত এই বিশেষ সুযোগ দেওয়া হবে।

সাধারণত কোনো এলাকায় একটি বিশেষ পণ্যের বিক্রি যদি কোনো একটি মাত্রায় স্থির হয়ে যায়, অর্থাৎ আশানুরূপ বা নিয়মিত বৃদ্ধি পেতে না থাকে তখনই এই ধরনের স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা চালু করা হয় ঐ এলাকায় পণ্যটির বিক্রি বাড়ানোর জন্য। কোনো চালু, জনপ্রিয় পণ্যের সঙ্গে নতুন কোনো পণ্য প্রতিযোগিতায় এলে, জনপ্রিয় পণ্যটির বিক্রির হার বজায় রাখার জন্য এই ধরনের পরিকল্পনা করা হয়।

১.৪.৩ পারসোনাল সেলিং (Personal Selling) বিক্রির জন্য ব্যক্তিগত যোগাযোগ

সম্ভাব্য ব্যবহারকারীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে কথোপকথনের মাধ্যমে পণ্য বিক্রির চেষ্টা। এই পদ্ধতি ব্যয়-সাপেক্ষ এবং সময়-সাপেক্ষ। দৈনন্দিন ব্যবহারের স্বল্পমূল্যের পণ্যের জন্য এই পদ্ধতি বিশেষ ব্যয়-সাপেক্ষ। স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থায়, সীমিত এলাকায়, বিশেষ কারণে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

তবে কোনো বিশেষ ধারণা বা ভাবনা (concept) সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের বিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য এই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী। "ভ্যাকুয়াম ক্লিনার" সম্বন্ধে বেশির ভাগ ব্যবহারকারীদের ধারণা স্পষ্ট নয়। কেউ যদি ব্যবহারকারীর বাড়িতে "ভ্যাকুয়াম ক্লিনার" নিয়ে গিয়ে, সেটি চালিয়ে দেখিয়ে দেন, ব্যবহার করা কত সহজ এবং নিরাপদ, তাছাড়া ঘরের যে কোনো ধুলোময়লা কত সহজে বার করে দিয়ে পরিষ্কার করে — তাহলে ব্যবহারকারী আশ্বস্ত হন এবং তাঁর বিশ্বাস গড়ে ওঠে।

১.৪.৪ বিজ্ঞাপন (Advertising)

কোনো পণ্য, ধারণা বা পরিষেবা যখন মূল্যের বিনিময়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয় এবং কে বা কারা এই প্রচার করছেন, কোম্পানী, প্রস্তুতকারক সংস্থা, অথবা সরকারি বিভাগ, সেটি চিহ্নিত করা থাকে — তবে তাকে বিজ্ঞাপন বলে। বিজ্ঞাপনের জন্য প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করা হয়। এর জন্য বিজ্ঞাপনদাতাকে ব্যবহৃত মাধ্যমকে মূল্য দিতে হয়। বিজ্ঞাপনদাতার পরিচয়, উল্লেখ থাকে বিজ্ঞাপনে।

বিজ্ঞাপন - এই পর্যায়ে অনেকগুলি উপায় আছে। মুদ্রিত বা সম্প্রসারিত বিজ্ঞাপন, মোড়ক (প্যাকেজিং) , চিঠি পাঠানো, তালিকা (catalogue), চলচ্চিত্র, সংস্থার নিজস্ব পত্রিকা, পুস্তিকা, প্রাচীরপত্র (Poster), প্রচারপত্র, বিভিন্ন ডাইরেকটরি, হোর্ডিং, দোকানে বিক্রির জায়গায় প্রদর্শন, অডিও-ভিসুয়াল, প্রতীক এবং লোগো।

১.৫ বিজ্ঞাপন ঃ সংজ্ঞা

এখন আপনারা জানেন যে বিভিন্ন গণমাধ্যমে যে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়, তার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য হোলো বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থার পণ্য অথবা পরিষেবার বিক্রি বাড়ানো। আপাত দৃষ্টিতে, বিজ্ঞাপন পণ্যের বা পরিষেবার বার্তা পৌঁছে দেয় কিন্তু আসলে, ব্যবহারকারীদের মনোভাব অনুকূলে পরিবর্তিত করার চেষ্টা করে। বিজ্ঞাপন গণমাধ্যম ব্যবহার করে অর্থাৎ একসঙ্গে অসংখ্য ব্যবহারকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করে। গণমাধ্যমের স্থান বা সময় ব্যবহার করার জন্য মূল্য দিতে হয় এবং বিজ্ঞাপনদাতার পরিচয়ও জানা যায়।

অনেকেই চেষ্টা করেছেন বিজ্ঞাপন-এর সংজ্ঞা নির্ণয়ের। যেমন জে. ওয়ালটার টমসন-এর (J. Walter Thompson) জেরেমি বালমোর (Jeremy Balmore) সংজ্ঞা দিয়েছেন — "বিজ্ঞাপন এমন বার্তা যা এক বা একাধিক ব্যক্তিকে জানানোর জন্য এবং প্রভাবিত করার জন্য মূল্য দিয়ে প্রচার করা হয়।" ডেভিড বার্নস্টাইন (David Bernstein) বলেছেন — "বিজ্ঞাপন বিভিন্ন পণ্যের ধারণার উৎস এবং সংযোগ, যা ব্যবহারকারীকে পণ্যটি ব্যবহার করতে উৎসাহী করে।"

খ্যাতনামা বিজ্ঞাপন লেখক রোসার রিভস্-এর (Rosser Reeves) মতে "একজনের ধ্যানধারণা অন্যব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রবেশ করানোর কলা কৌশলই বিজ্ঞাপন।"

বিজ্ঞাপন-এর সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা এই — "বিজ্ঞাপন এক সার্বজনিক সংযোগ, বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাহায্যে বিভিন্ন পণ্য প্রস্তুতকারক, অব্যবসায়িক সংস্থা, অথবা কোন ব্যক্তি মূল্যের বিনিময়ে প্রচার করেন। যিনি বিজ্ঞাপনের মধ্যে চিহ্নিত থেকে, নির্বাচিত ব্যবহারকারীদের অবগত করে তাঁদের প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেন।"

গ্রাহকদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞাপনের সংজ্ঞা নির্ণয় করলে, একটি ভিন্ন চিত্র পরিস্ফুট হবে।

"ব্যবহারকারীরা তাঁদের প্রয়োজনীয়, প্রাসঙ্গিক এবং ব্যবহারের উপযুক্ত নানারকম বার্তা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংগ্রহ করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সব বার্তা শীঘ্র কাজে লাগান এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বার্তা স্মৃতিতে সঞ্চয় করে রাখেন, ভবিষ্যতে কাজে লাগানোর জন্য।"

১.৬ বিজ্ঞাপন-এর সুবিধা

বিজ্ঞাপন অনেক রকমের হয়। বিজ্ঞাপন-এর প্রতিটি আকারের (forms) নির্দিষ্ট, বিভিন্ন গুণাবলী আছে। বিজ্ঞাপন-এর হাতিয়ার হিসাবে সব আকারের বিজ্ঞাপন-এর গুণাবলী সরলীকরণ সহজসাধ্য নয়। তবুও, বিজ্ঞাপন-এর এই চারটি সুবিধা বিশেষ কার্যকরী এবং অনুধাবনযোগ্য।

ক. সর্বসাধারণের কাছে উপস্থাপন (Public Presentation)

একসঙ্গে অনেক লোকের কাছে বার্তা পৌঁছে দিয়ে বিশেষ সংযোগ সাধন করে বিজ্ঞাপন। সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছানোর ফলে বিজ্ঞাপন-এর বৈধতা স্বীকৃত হয়। ব্যবহারকারীরা বিশ্বাস করেন, যেহেতু সর্বসাধারণের কাছে উপস্থাপন করা হচ্ছে, পণ্যটির অন্তত মোটামুটি একটি মান বজায় থাকবে। তাঁরা আরো মনে করেন, সর্বসাধারণের কাছে প্রচারিত বলে, বিজ্ঞাপিত পণ্য ব্যবহার করলে অন্যেরা মর্যাদা দেবেন।

খ. ব্যাপ্তিশীলতা (Pervasiveness)

বিজ্ঞাপন একটি বিশেষ অনুপ্রবেশ ও ব্যাপ্তিশীল উপায়। বিজ্ঞাপনদাতা তাঁর পণ্যের বিজ্ঞাপন বার বার প্রচার করতে পারেন। ব্যবহারকারীও বিভিন্ন বিজ্ঞাপন-এর বার্তা তুলনামূলকভাবে বিচার করতে পারেন। নিয়মিতভাবে, বড় মাপের বিজ্ঞাপন হলে, সেই পণ্য বা সংস্থার বাজারে অবস্থিতির মাপ, জনপ্রিয়তা এবং সাফল্য সম্বন্ধে ও ব্যবহারকারীদের মনে ধারণা জন্মায়।

গ. সম্প্রসারিত প্রভাবশীলতা (Amplified Impressiveness)

মুদ্রণ, শব্দ এবং বিভিন্ন রঙের ব্যবহারের কলাকৌশলের সাহায্যে বিজ্ঞাপন যে কোনো পণ্য বা সংস্থাকে নাটকীয়ভাবে ভোক্তার মনে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে। বিজ্ঞাপনের নাটকীয় উপস্থাপনার ফলেই গ্রাহকের মনে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি হয়, তাই বিজ্ঞাপন-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ নাটকীয় উপস্থাপনা। এর প্রভাবেই গ্রাহকের বা ব্যবহারকারীর মনে পণ্যটি ব্যবহারের ইচ্ছা জাগে। বিজ্ঞাপনে বর্ণিত পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে গ্রাহক কল্পনায় নিজেকে মিলিয়ে দেখেন। তাঁর মনে যে ভাব জাগে তা হচ্ছে — "এমন একটা উপভোগ্য ব্যাপার আমার জীবনে ঘটলে বেশ হোতো।" উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় — একটি সিগারেটের বিজ্ঞাপনে দেখানো হয় বৃষ্টির মধ্যে একটি ছাতার নিচে দুটি তরুণ-তরুণী খুশিতে উচ্ছ্বল। ঐ বয়সী যে কোন তরুণ নিজেকে ঐরকম একটি দৃশ্যের পাত্র

হিসেবে কল্পনা করে খুশি হবে। আর তারই প্রতিক্রিয়া হিসেবে ঐ পণ্যটির ভাবমূর্তি তার মনে গেঁথে যাবে এবং পণ্যটি কিনতে ও ব্যবহার করতে উৎসাহী হবে।

ঘ. নৈর্ব্যক্তিক (Impersonal)

বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে। অতএব, নৈর্ব্যক্তিক। এর ফলে গ্রাহকের মনে বিজ্ঞাপিত পণ্যটি সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মায়। ব্যবহারকারীর মনোভাব, এক সঙ্গে এত লোককে জানানো হচ্ছে যখন, পণ্যটি নিশ্চয় একটা নির্ভরযোগ্য মানেরই হবে। তবে নৈর্ব্যক্তিক হওয়ার ফলে কোনো বিক্রয় প্রতিনিধি মুখোমুখি কথা বলে গ্রাহককে যেমনভাবে বোঝাতে পারেন, বিজ্ঞাপন-এর পক্ষে সেটা সম্ভব হয় না। মুখোমুখি কথা বলার সময় গ্রাহককে বিক্রয়-প্রতিনিধির প্রতি মনোযোগ দিতেই হয়। কিন্তু বিজ্ঞাপন-এর প্রতি গ্রাহকদের মনোযোগ দেওয়া আবশ্যিক নয়। মনোযোগ দেওয়া বা না দেওয়া গ্রাহকের ইচ্ছাধীন। বিজ্ঞাপন এক ধরনের স্বগতভাষণ, যা ব্যবহারকারীর সঙ্গে কথোপকথন বা বাক্যবিনিময় করতে অসমর্থ।

১.৭ বিজ্ঞাপন জন-সংযোগেরও হাতিয়ার

আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম এই বলে যে, বিজ্ঞাপন বিপণনের হাতিয়ার, কারণ বিপণনের হাতিয়ার হিসেবেই বিজ্ঞাপন-এর ব্যবহার বেশি হয়। কিন্তু জন-সংযোগের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞাপন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিভিন্ন কাজে, বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য কোম্পানিগুলি বিজ্ঞাপন দেন। ঠিকভাবে দেখতে গেলে এক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের কাজ কর্মচারীবিষয়ক হয়ে গেলো। আবার এই বিজ্ঞাপনই জন-সংযোগের কাজও করছে। বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দেখে জনসাধারণ মনে করেন কোম্পানিটির কাজকর্ম ভাল চলছে, তাই লোক নিচ্ছে। এতে কোম্পানির ভাবমূর্তি সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে ভালো ধারণা গড়ে ওঠে। আবার এই নিয়োগের বিজ্ঞাপনেই বেতনক্রম এবং অন্যান্য দেয় সুবিধার উল্লেখ লোকের মনে কোম্পানিটি সম্পর্কে একটি ধারণা গড়তে সাহায্য করে।

জন-সংযোগের জন্য বিজ্ঞাপনকে "প্রতিষ্ঠানের" বিজ্ঞাপন, "জনসেবামূলক" বিজ্ঞাপন এবং অনেক সময় "বিতর্কমূলক" বিজ্ঞাপনও বলা হয়। কোম্পানির সঙ্গে জনসাধারণের বোঝাপড়া যাতে সুস্থ এবং আকাঙ্ক্ষিত হয়, কোম্পানির ভাবমূর্তি যাতে গ্রহণযোগ্য এবং উজ্জ্বল হয়, সেই উদ্দেশ্যেই জন-সংযোগ-এর জন্য বিজ্ঞাপন করা হয়ে থাকে। কোম্পানি সম্বন্ধে গ্রাহকদের মতামত গড়ে তোলাই "জন-সংযোগ" বিজ্ঞাপনের লক্ষ্য।

"প্রচার" এবং "বিজ্ঞাপন" দুটি হাতিয়ারই বিপণন এবং জন-সংযোগ-এর কাজে ব্যবহার হয়। অভিজ্ঞ পরিচালকগণ দুটি হাতিয়ারই একসঙ্গে, নিপুণভাবে ব্যবহার করে একই সঙ্গে পণ্য বিক্রির এবং কোম্পানির ভাবমূর্তি উন্নত করার প্রয়াস করেন। একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। পণ্যের গুণাবলীর বিবরণ কোম্পানির ভাবমূর্তি গড়তে সাহায্য করে—এই রকম উপযোগী পণ্য তৈরি করার জন্য। আবার কোম্পানির

ভাবমূর্তি উন্নত হলে, কোম্পানির পণ্য গ্রাহকের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য হয় এবং তিনি মানসিক সন্তুষ্টি বোধ করেন, একটি ভালো কোম্পানির পণ্য ব্যবহার করছেন বলে।

১.৮ বিজ্ঞাপন প্রভাবিত করে (Persuasive)

বিজ্ঞাপন-এর চরিত্র বিষয়ে নানারকম মত আছে। অনেকে মনে করেন বিজ্ঞাপনের কাজ কেবল বার্তা পৌঁছে দেওয়া। কোনো পণ্য বা পরিষেবার। বিজ্ঞাপন গ্রাহককে জানায়। পণ্যটির গুণাবলী, ব্যবহারের পদ্ধতি, কোথায় পাওয়া যাবে এবং মূল্য কত, ব্যবহারকারীকে এই সব জানানোই বিজ্ঞাপনের কাজ। এঁদের মত, প্রভাবিত করার বিজ্ঞাপন অন্যরকম। সত্যি বলতে কী এই বিভাজন একেবারেই অর্থহীন। বিজ্ঞাপন মাত্রই প্রভাবিত করে। গ্রাহকের মনকে প্রভাবিত করার জন্যই বিজ্ঞাপন। যে বিজ্ঞাপন কেবল বার্তা বা বৃত্তান্ত জানায়, সেই বিজ্ঞাপনও প্রভাবিত করে গ্রাহককে।

উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক একটি কয়েক লাইনের বিজ্ঞাপন — ফ্ল্যাট ভাড়ার। বিজ্ঞাপনে যদি বলা হয় — দোতলার ফ্ল্যাট, দক্ষিণ খোলা, তিন কামরা, দুটি বারান্দা, রান্নাঘর এবং দুটি বাথরুম আছে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে কেবল সংবাদ জানানো হচ্ছে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে "দোতলা", "দক্ষিণখোলা" এবং "দুটি বারান্দা", গ্রাহককে প্রভাবিত করছে। যিনি ফ্ল্যাট খুঁজছেন, তিনি এই ফ্ল্যাটটি সম্বন্ধে আগ্রহী হবেন। বিজ্ঞাপন এইভাবেই গ্রাহককে প্রভাবিত করে।

কোন বিজ্ঞাপনই কেবলমাত্র বার্তা পৌঁছে দেয় না। বিভিন্ন উপায়ে গ্রাহকদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, যাতে কোনো বিশেষ মার্কার পণ্যের অনুকূলে গ্রাহকের মনোভাব গড়ে ওঠে।

১.৯ বিজ্ঞাপনের প্রকারভেদ

এখন আপনারা জানেন, বিজ্ঞাপন হচ্ছে সহমতে আনার বা প্রত্যয় জানানোর প্রয়াসে জ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপনের প্রকারভেদ আছে। বিজ্ঞাপনের প্রকারভেদ নানা ভাবে করা যেতে পারে। সাধারণভাবে, যে মাধ্যমে প্রচারিত হয়, সেই মাধ্যম অনুসারে, এবং সেই মাধ্যমের দ্বারা যে গ্রাহকদের কাছে বার্তা পৌঁছয়, সেই অনুসারে, বিজ্ঞাপনের প্রকারভেদ করা হয়। যেমন, — মুদ্রণমাধ্যম, বৈদ্যুতিন মাধ্যম (বেতার ও টেলিভিশন) বা ঘরের বাইরে, উন্মুক্ত স্থানের মাধ্যম।

তবে সাধারণত দুটি পরিবর্তনীয় বিষয় অনুসারেই বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনা বা সৃষ্টি করা হয়। একটি, বিজ্ঞাপনের কার্যকরী কর্মক্ষেত্র অনুসারে, অন্যটি বিজ্ঞাপনের অভীষ্ট লক্ষ্য অনুসারে।

কর্মক্ষেত্র বলতে বোঝায়, কত বড় ভৌগোলিক এলাকায় বিজ্ঞাপনটি প্রচার বা কার্যকরী করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিজ্ঞাপনটি যদি কেবল দেশের পূর্বাঞ্চলে বা কেবল দক্ষিণ ভারতেই প্রচারিত হয়, তাহলে সেটি চিহ্নিত হবে আঞ্চলিক বিজ্ঞাপন হিসাবে। কিন্তু, বিজ্ঞাপনটি যদি সারা ভারতে প্রচারিত হয়, তাহলে সেটি জাতীয় বিজ্ঞাপন হিসাবে গণ্য হবে। আর, যদি কোনো একটি শহরে, বা নির্ধারিত এলাকায় বিজ্ঞাপনটি প্রচার করা হয়, তাহলে সেটি স্থানীয় বিজ্ঞাপন হিসাবেই গণ্য হবে। যে বিজ্ঞাপন একযোগে বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হয়, যদিও

বিভিন্ন দেশের প্রচলিত ভাষায়, সেটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞাপন হিসাবে গণ্য হবে। উদাহরণ, লিরিল সাবানের বিজ্ঞাপন সারা দেশে প্রচারিত হয়, অতএব, জাতীয় বিজ্ঞাপন।

কোনো বিজ্ঞাপন কেবল পূর্বভারতে প্রচারিত, অতএব - আঞ্চলিক।

বি. সি. সেনের গহনার বিজ্ঞাপন কেবল কলকাতার সংবাদপত্রে এবং পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে, কাজেই এটিকে স্থানীয় বিজ্ঞাপন বলা হবে।

বিজ্ঞাপনের অভীষ্ট লক্ষ্য নির্ভর করে বিজ্ঞাপনদাতার সিদ্ধান্তের উপর।

প্রকার	অভীষ্ট লক্ষ্য
প্রতিষ্ঠানগত	বিজ্ঞাপিত প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে সংবেদনশীল, ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রচার করা
জনসেবামূলক	কোনো বিশেষ বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করা, সচেতন করা
ব্যবসায়িক	পণ্য বা পরিষেবার বিক্রি বাড়ানোর জন্য বিজ্ঞাপন
ডাইরেক্ট রেসপন্স	কোনো সামগ্রী বা পরিষেবার তৎকালীন বিক্রি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন
শ্রেণীবদ্ধ	ব্যক্তিগতভাবে কোনো কিছু জানানোর অভিলাষ, বিক্রির প্রয়াস বা কিনবার ইচ্ছা
ডিসপ্লে (প্রদর্শনমূলক)	বিভিন্ন জিনিস এবং পরিষেবার বিক্রি এবং গ্রাহক বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আকারের ও মাপের প্রদর্শনমূলক দৃষ্টি আকর্ষণকারী বিজ্ঞাপন।

১.৯.১ জাতীয় বিজ্ঞাপন

সারাদেশের ব্যবহারকারীদের উদ্দেশ্যে কোনো জিনিষের বা পরিষেবার যে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়, তাকেই জাতীয় বিজ্ঞাপন বলে। জাতীয় বিজ্ঞাপন যে সব সময় সারা দেশেই প্রচারিত হয়, এমন নয়। কোনো বিজ্ঞাপন একাধিক অঞ্চলে, যেমন পূর্বভারত, উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতে একযোগে প্রচারিত হলেও সেটি জাতীয় বিজ্ঞাপন বলে গণ্য হয়ে থাকে। সাধারণত কোনো জিনিসের বা পরিষেবার চাহিদা বাড়ানোর জন্যই জাতীয় বিজ্ঞাপন করা হয়।

১.৯.২ স্থানীয় বিজ্ঞাপন

স্থানীয় বিজ্ঞাপনের আর একটি নাম — খুচরো বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপন। জাতীয় বিজ্ঞাপনের দ্বারা কোনো জিনিস বা পরিষেবার চাহিদা সৃষ্টি করার পরে স্থানীয় ডিলার, ডিস্ট্রিবিউটর বা দোকানের বিজ্ঞাপন, ব্যবহারকারীদের জানিয়ে দেয় জিনিসটি কোথায় পাওয়া যায়, তার মূল্য কত, ইত্যাদি বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয়। কখনো কখনো কোনো শহরে বা কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় বিশেষ উপহারের ঘোষণা অথবা মূল্য-ছাড়ের ঘোষণা, সবই স্থানীয় বিজ্ঞাপন। ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, যেমন মেট্রো প্লাজা, অথবা ল্যান্ডমার্ক — বই, ক্যাসেট, কার্ড ইত্যাদির দোকান যে বিজ্ঞাপন দেন, সেগুলি স্থানীয় বিজ্ঞাপন। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা জানতে পারেন, কোন জিনিসটি কোথায় পাওয়া যাবে, এবং কোন দোকান থেকে কিনলে কী সুবিধা পাওয়া যাবে।

১.৯.৩ আন্তর্জাতিক বিজ্ঞাপন

অনেক বহুজাতিক কোম্পানি নামি মার্কার জিনিস একসঙ্গে অনেক দেশে বিক্রি করেন। সাধারণত যে দেশে বিপণনের ব্যবস্থা আছে সেই দেশে তাঁরা উৎপাদনের ব্যবস্থাও করেন। কিন্তু, আন্তর্জাতিক, জনপ্রিয় নামের সামগ্রীর প্রতি সাধারণ ব্যবহারকারীদের আগ্রহের গুরুত্ব বিবেচনা করে, বিপণনের সময় তাঁরা পরিচিত আন্তর্জাতিক নাম এবং মোড়ক (packaging) ব্যবহার করেন। এইসব কোম্পানী যখন বিজ্ঞাপনের বিষয় বিবেচনা করেন এবং সিদ্ধান্ত নেন তখন একসঙ্গে একাধিক দেশের উপযোগী বিষয় স্থির করেন। যদিও, যে দেশে বিজ্ঞাপনটি প্রচারিত হচ্ছে সেই দেশের পরিবেশের এবং মানুষের সঙ্গে একাত্মতা বোঝানোর জন্য বিজ্ঞাপনের পরিবেশ এবং পাত্রপাত্রী বদলে দেওয়া হয়, এবং স্থানীয় ভাষায় প্রচার করা হয়, কিন্তু বিজ্ঞাপনের মূল বিষয়, বক্তব্য এবং আবেদন অপরিবর্তিত থাকে। সম্প্রতি আপনারা অনেকগুলি বহুজাতিক জিনিসের বিজ্ঞাপন দেখেছেন বিশ্বকাপ ফুটবলের মাস কয়েক আগে থেকে ফাইনাল খেলা পর্যন্ত। একই বিজ্ঞাপন একসঙ্গে অনেকগুলি দেশে প্রচারিত হয়েছে, কেবল ভাষা পরিবর্তন করে। কিন্তু মূল আবেদনের সূত্র একটাই — বিশ্বকাপ ফুটবল।

১.৯.৪ প্রতিষ্ঠানগত বিজ্ঞাপন

কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান সুনাম বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদর্থক গুণগুলি প্রচারের জন্য যে বিজ্ঞাপন করেন, সেই বিজ্ঞাপনকেই প্রতিষ্ঠানগত বিজ্ঞাপন বলে। এই বিজ্ঞাপনে কোনো বিশেষ জিনিস বা পরিষেবার প্রচার না করে, কোম্পানির বিভিন্ন ভালো দিক, কাজকর্ম, উদ্দেশ্য এবং দেশের শিল্প ও অর্থনীতিতে কোম্পানির অবদান উল্লেখ করা হয়। কোম্পানির নানাবিধ কাজকর্ম, ক্রমাগত অগ্রগতি, লাভ বৃদ্ধি, রাজস্ব খাতে দেয় কর বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন এবং বিভিন্ন সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পে কোম্পানির অংশগ্রহণের বিবরণ দিয়ে, জনসাধারণের মনে কোম্পানির সম্বন্ধে ভালো ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়।

প্রতিষ্ঠানগত বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য তিন রকম হতে পারে। প্রথম উদ্দেশ্য অবশ্যই কোম্পানির ভাবমূর্তি (image) গড়ে তোলা।

সাধারণ পরম্পরাগত ভাবে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানগত বিজ্ঞাপন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যই সাধন করে আসছে। কোম্পানির ভাবমূর্তি গড়ে তোলা। এই পরম্পরাগত আকারের প্রতিষ্ঠানগত বিজ্ঞাপন কোম্পানি সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের সচেতন করে তোলে এবং কোম্পানির সুনাম বাড়াতে চেষ্টা করে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য — অর্থনৈতিক সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। কোম্পানির আর্থিক অবস্থার বিবরণ প্রচার করে শেয়ার বাজারের আস্থা অর্জন করা এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে লগ্নীকারীদের উৎসাহিত করা এবং বিশ্বাস জাগানো, যাতে তাঁরা কোম্পানির শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হন। আরো এক ধরনের প্রতিষ্ঠানগত বিজ্ঞাপন দেখা যায় — যাকে বলে, একটি বিশেষ পক্ষ নিয়ে তার পক্ষে সওয়াল করা। একে বলে অধিজ্ঞাপন (Advocacy) বিজ্ঞাপন। কোনো বিশেষ বিষয় বা সমস্যার ক্ষেত্রে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান বিষয়টির পক্ষে বা বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রচার করে জনসাধারণের অভিমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। সরকারকে বোঝাবার চেষ্টা করেন এবং লোকসভা বা বিধানসভার সদস্যদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন।

মনে আছে তো

আপনার আয়কর রিটার্ন দেওয়ার শেষ তারিখ?

তা এখন পিছিয়ে ৯ অগস্ট, ২০০২ করা হয়েছে

২০০২-২০০৩ কর-নির্ধারণ বছরের ক্ষেত্রে

- আপনি যদি নিম্নোক্তমতো সূত্রে আয়কারী কোন ব্যক্তি (কোম্পানি ব্যতীত) হন
  - বেতন/পেনসন
  - গৃহসম্পত্তি
  - এমন ব্যবসা/পেশা যেখানে কোন সংবিধি অধীনে হিসাব পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না
  - মূলধনী লাভ
  - ব্যাঙ্কে আমানতের উপর সুদ
  - অন্য কোনও সূত্র
- তবে ব্যবসা/পেশা থেকে আয়ের ক্ষেত্রে ফরম নম্বর ২-তে আপনার রিটার্ন দাখিল করুন; অন্যান্য ক্ষেত্রে ফরম নম্বর ৩ ব্যবহার করুন
- ফরম সাইটেও পাওয়া যাবে :
  - www finmin.nic.in
  - www incometaxindia.gov.in
- পুরনো সরল ফরমও ব্যবহার করা যাবে।

প্রাসঙ্গিক কর নির্ধারণ বছর শেষ হওয়ার আগে রিটার্ন দাখিল না-করলে ৫০০০ টাকা জরিমানা হবে

রিটার্ন ও করের চালানে আপনার ১০ সংখ্যাযুক্ত পার্মানেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর (প্যান) উল্লেখ করবেন

প্যান উল্লেখ করার সুবিধা :

- আয়কর দপ্তরে আপনার যাবতীয় যোগাযোগের উত্তর দেওয়া সহজ হয়
- রিফান্ড তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়
- কর-নির্ধারণ দ্রুত চূড়ান্ত করা যায়
- প্রি-পেড কর সহজে জমা পড়ে

আপনার কর আদায় দিয়ে নিশ্চিন্ত হোন

DIT

ডিরেক্টরেট অব ইনকাম ট্যাক্স (আরএসপি অ্যান্ড পিআর) নয়াদিল্লি

দেখুন আমাদের ওয়েবসাইট www incometaxindia.gov.in

davp 2002/161

জনগণকে জানানোর জন্য

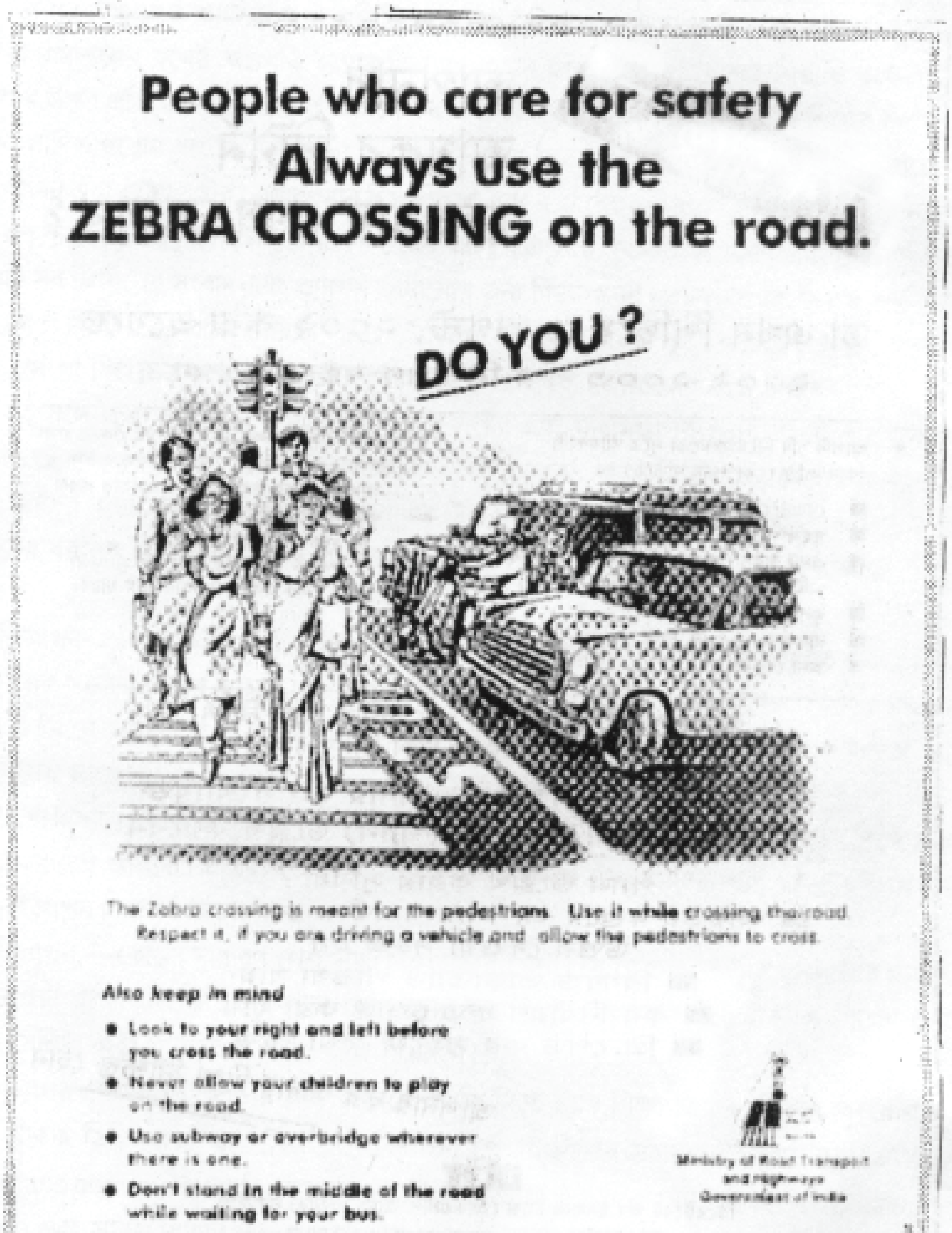

জন সেবামূলক বিজ্ঞাপন

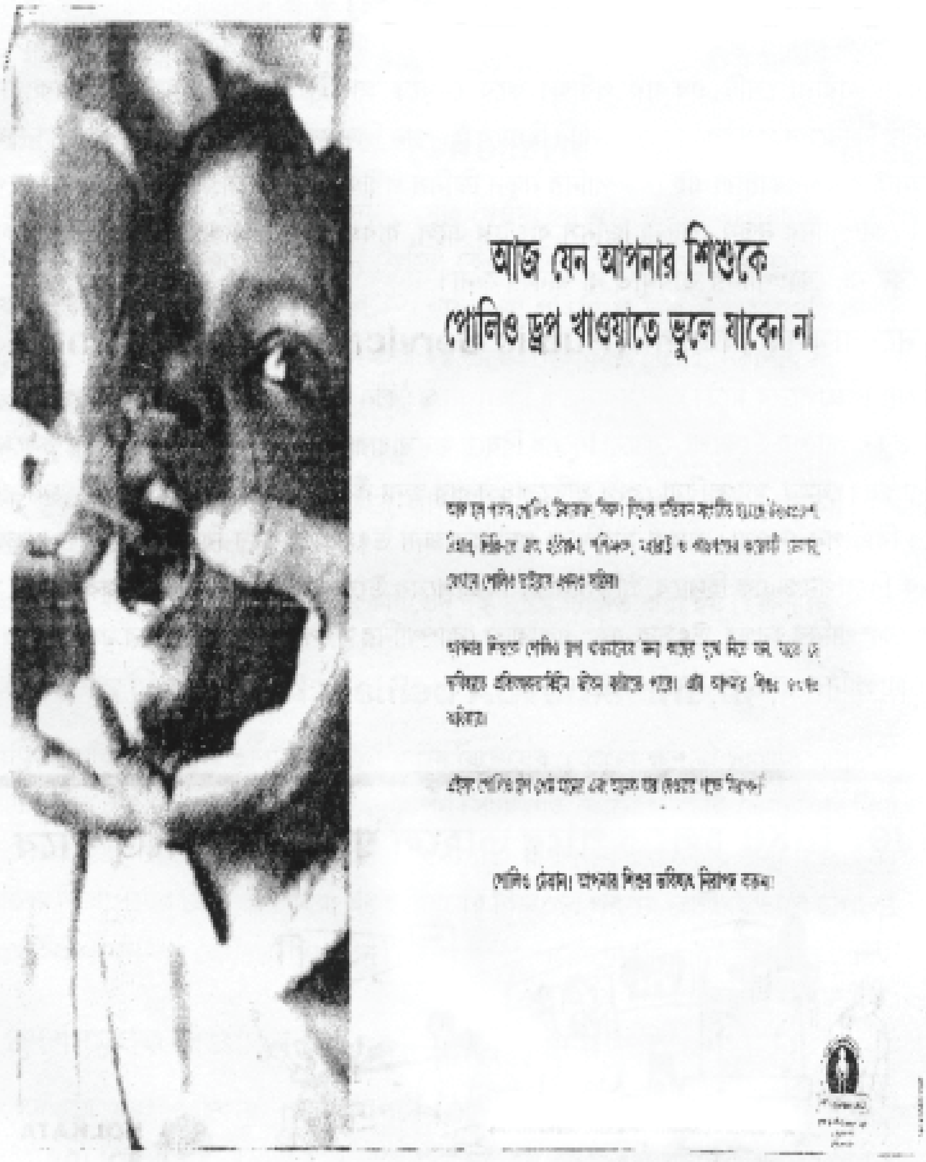

জন সেবামূলক বিজ্ঞাপন

সাধারণত প্রতিষ্ঠানগত বিজ্ঞাপন কোম্পানির ভাবমূর্তির একটি ছত্রছায়া সৃষ্টি (umbrella effect) করে, যাতে কোম্পানির তৈরি সমস্ত জিনিসই ব্যবহারকারীদের কাছে গ্রহণীয় হয়। অর্থাৎ, কোম্পানীর ভাবমূর্তির জোরে কোম্পানির তৈরি বিভিন্ন জিনিসের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল হয়। ব্যবহারকারীদের মনে কোম্পানির তৈরি জিনিসগুলি সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মায়। উদাহরণ - হিন্দুস্থান লিভার কোম্পানি যদি একটি নতুন জিনিস বাজারে আনেন, ব্যবহারকারীরা সেটি একবার পরীক্ষা করে দেখতে আগ্রহী হবেন। কারণ ব্যবহারকারীর মনে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের প্রস্তুতকারক কোম্পানি হিসাবে হিন্দুস্থান লিভারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল। হিন্দুস্থান লিভারের ভাবমূর্তির জন্যই ব্যবহারকারীরা এই কোম্পানির নতুন জিনিস পরীক্ষা করতে আগ্রহী হবেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনামী কোন কোম্পানির নতুন কোনো জিনিস বাজারে এলে, ব্যবহারকারীরা সহজে জিনিসটি পরীক্ষা করতে উৎসাহিত হবেন না, কোম্পানির ভাবমূর্তি না থাকার জন্য।

১.৯.৫ জনসেবামূলক বিজ্ঞাপন (Public Service Advertisement)

প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপনের মতো জনসেবামূলক বিজ্ঞাপনও কোন জিনিস বা পরিষেবা বিক্রির উদ্দেশ্যে করা হয় না। সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে, কোনো বিশেষ বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে জনসেবামূলক বিজ্ঞাপন করা হয়। যেমন, ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধ করার জন্য কী করা প্রয়োজন, সে বিষয়ে, জনসাধারণকে সচেতন করে বিজ্ঞাপন দেওয়া। অথবা সাক্ষরতা প্রচারের জন্য উৎসাহিত করে বিজ্ঞাপন দেওয়া। বলাবাহুল্য, জনসেবামূলক বিজ্ঞাপনও এক হিসাবে, প্রতিষ্ঠানগত বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য সাধন করে। সমাজের বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলায় কোম্পানির আগ্রহ, উৎসাহ এবং একাত্মতা কোম্পানির সম্পর্কে জনসাধারণের মনে ভালো ধারণার সৃষ্টি করে। কোম্পানির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে।

১.৯.৬ ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন (Commercial Advertisement)

আপনারা যত বিজ্ঞাপন দেখেন, তার বেশির ভাগ বিজ্ঞাপনই ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন। বিভিন্ন জিনিস এবং পরিষেবার সংবাদ ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে দেয় এই বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপিত জিনিস বা পরিষেবা সম্বন্ধে গ্রাহকদের মনে আগ্রহ জাগায়। যার ফলে এইগুলি কিনতে ও ব্যবহার করতে তাঁরা উৎসাহী হন।

১.৯.৭ সরাসরি বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপন (Direct Response Advertisement)

এই ধরনের বিজ্ঞাপনে ব্যবহারকারীদের উৎসাহ দেওয়া হয় অবিলম্বে প্রতিক্রিয়া জানাতে অর্থাৎ, জিনিস বা পরিষেবা কিনতে। আপনারা টেলিভিশনে কোনো কোনো বিজ্ঞাপনে দেখেন, ঘোষণা করা হচ্ছে — অমুক নম্বরে এখনই ফোন করে অর্ডার দিন। উদ্দেশ্য — গ্রাহকদের প্রতিক্রিয়া দ্রুত এবং সরাসরি করা। অনেক সময় টেলিফোনের মাধ্যমেও এই ধরনের আবেদন করা হয়, গ্রাহকদের কাছে। তবে, সরাসরি বিক্রির জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত মাধ্যম — প্রত্যক্ষ ডাক (Direct Mail)। ডাক ব্যবস্থার মাধ্যমে আপনারা বিভিন্ন জিনিসের, বইয়ের বা পত্রিকার, অথবা ক্রেডিট কার্ডের বিজ্ঞাপন হাতে পান। এই ধরনের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে কুপন থাকে। সম্ভব হলে, কুপনটি ডাকযোগে ফেরৎ পাঠিয়ে আপনি জিনিস বা পরিষেবা কিনে থাকেন। বিজ্ঞাপনদাতারা সরাসরি আপনার প্রতিক্রিয়া জানতে পারেন।

মুদ্রণ-মাধ্যমের বিজ্ঞাপনের সাধারণ প্রকারভেদ দুই ভাগে চিহ্নিত করা হয়। শ্রেণীবদ্ধ বা প্রদর্শনমূলক।

১.৯.৮ শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন (Classified Advertisement)

সংক্ষিপ্ত আকারে, সরল ভাষায়, কোনো ব্যক্তি বিশেষের, কোনো ক্ষুদ্র বা মাঝারি ব্যবসায়িক সংস্থার বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বার্তা প্রচার করে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন। সাধারণত কোনো সুনির্দিষ্ট লেনদেনের বিষয়েই শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। যেমন বাড়ি ভাড়া, বিক্রয়, পাত্রপাত্রী বা শিক্ষক শিক্ষিকার জন্য বিজ্ঞাপন। সংবাদপত্রে, বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপনের শ্রেণীভাগ করে, একই বিষয়ের বিজ্ঞাপন পরপর শ্রেণীবদ্ধভাবে ছাপা হয়। সেইজন্যই এই ধরনের বিজ্ঞাপনের নাম শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন। বিভিন্ন সংবাদপত্রের নিয়মিত আয়ের উৎস শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন।

১.৯.৯ প্রদর্শনমূলক বিজ্ঞাপন (Display Advertisement)

সংবাদপত্রে এবং পত্রিকায়, যে বিজ্ঞাপনে জিনিস বা পরিষেবার বিবরণ, চিত্র এবং জ্ঞাতব্য তথ্য বিজ্ঞাপনদাতার প্রয়োজন অনুযায়ী আকর্ষণীয়ভাবে প্রকাশিত হয়, সেই বিজ্ঞাপনই প্রদর্শনমূলক বিজ্ঞাপন। সম্ভাব্য গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এবং বিজ্ঞাপিত জিনিস বা পরিষেবার বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ জাগানোর উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞাপনে ছবি ব্যবহার করার এবং নানাভাবে বিজ্ঞাপনটি মনোগ্রাহী করে তোলার সুযোগ থাকে। এই সব সুযোগের জন্যই বিভিন্ন পণ্যের প্রস্তুতকারক এবং পরিষেবার উদ্যোক্তারা প্রদর্শনমূলক বিজ্ঞাপনের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন পত্রিকা নিয়মিত আয়ের জন্য মূলত প্রদর্শনমূলক বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করে থাকেন। মুদ্রণমাধ্যমের আয়ের মূল উৎস প্রদর্শনমূলক বিজ্ঞাপন।

১.১০ বিজ্ঞাপন - শ্রমশিল্প (Industry)

বর্তমানে সারা বিশ্বে বিজ্ঞাপন এক বিশেষ শ্রমশিল্প হিসাবে পরিগণিত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞাপন শ্রমশিল্পে বিপুল সংখ্যক লোক কাজে নিযুক্ত। এই শিল্পে প্রতিবছর হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার কাজ হয়।

আমাদের দেশ, ভারতেও বিজ্ঞাপন শ্রমশিল্পে বহু লোক কাজ করছেন। গত আর্থিক বছরে, (২০০১-২০০২) ভারতের বিজ্ঞাপন শ্রমশিল্পে সাড়ে তেরো হাজার কোটি টাকারও বেশি কাজ হয়েছে। যে শিল্পে বিপুল সংখ্যক লোক কর্মরত এবং যে শিল্পে প্রতিবছর এত কোটি টাকার কাজ হচ্ছে, সেই শ্রমশিল্পের কাঠামো (Structure) বা সংগঠনরীতি কী রকম দেখা যাক।

বিজ্ঞাপন শ্রমশিল্প - চারটি অংশের মিলিত কর্মসূচী।

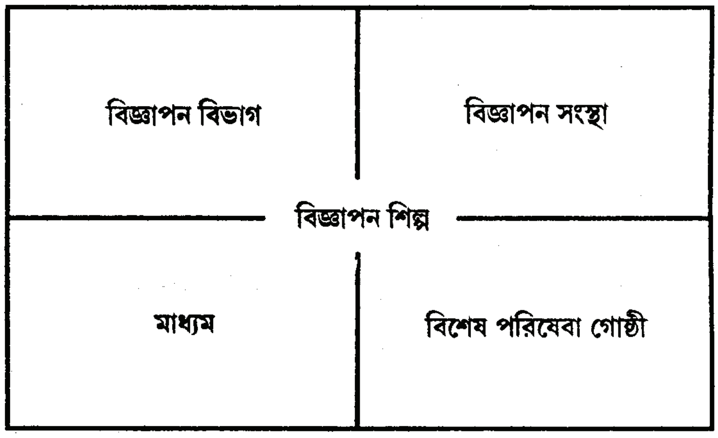

১.১০.১ বিজ্ঞাপন বিভাগ

বিভিন্ন সংস্থার বিজ্ঞাপন বিভাগ নামে একটি বিশেষ বিভাগ থাকে। কোম্পানির বিজ্ঞাপন অভিযান কীরকম হবে, বিপণন এবং অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করে, — সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন কোম্পানির বিজ্ঞাপন বিভাগ। কোনো কোনো কোম্পানি তাঁদের বিজ্ঞাপন নিজেদের বিজ্ঞাপন বিভাগ দ্বারাই তৈরি করান এবং এই বিভাগের দ্বারাই বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তবে বেশিরভাগ কোম্পানিই বিজ্ঞাপন সংস্থা (Advertising Agency) দ্বারা তাঁদের বিজ্ঞাপন তৈরি করেন এবং ঐ সংস্থাকেই দায়িত্ব দেন বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে তাঁদের বিজ্ঞাপনের প্রচারের ব্যবস্থা করতে।

বিজ্ঞাপন বিভাগের শীর্ষে থাকেন বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক (Advertising Manager)। কোম্পানির আয়তন এবং বিজ্ঞাপন অভিযানের পরিমাপের উপর নির্ভর করে, বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপকের অধীনে কী কী পদে কতজন অফিসার এবং কর্মী কাজ করবেন। বেশির ভাগ কোম্পানির বিজ্ঞাপন বিভাগের কাজ — কোম্পানির সঙ্গে

মনোনীত বিজ্ঞাপন সংস্থার নিয়মিত যোগাযোগ, মত বিনিময় অব্যাহত রাখা এবং বিজ্ঞাপন সংস্থাটি অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজকর্ম ঠিকমত করছেন কিনা তার উপরে নজর রাখা।

১.১০.২ বিজ্ঞাপন সংস্থা (Advertising Agency)

বিজ্ঞাপন শ্রমশিল্পে বিজ্ঞাপন সংস্থার ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি এবং গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করেন বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ। মক্কেল পরিষেবা (client servicing), বিষয়লিপি লেখক (copy writer), শিল্প নির্দেশক (art director), শিল্পী (artist), মাধ্যম বিশেষজ্ঞ (media expert), শ্রবণ এবং দৃশ্যমাধ্যম বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত, অভিজ্ঞ কর্মীরা কাজ করেন বিজ্ঞাপন সংস্থায়। মুদ্রণমাধ্যমে, রেডিও, টেলিভিশন-এ যে সব বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়, তার প্রায় সবই বিভিন্ন বিজ্ঞাপন সংস্থা দ্বারা তৈরি এবং তাঁদের দ্বারাই প্রচারিত। একটি সংস্থায় এতরকমের অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের সমাবেশ থাকায়, বিজ্ঞাপনদাতা কোম্পানির পক্ষে এই সংস্থার পরিষেবা গ্রহণ করা এবং কাজে লাগানো বিশেষ সুবিধাজনক।

১.১০.৩ মাধ্যম (Media)

বিভিন্ন মাধ্যম, অর্থাৎ, সংবাদপত্র, পত্রিকা, আকাশবাণী, বিভিন্ন টেলিভিশন প্রণালি, সকলেরই বিজ্ঞাপন বিভাগ নামে একটি বিশেষ বিভাগ থাকে। আয়ের জন্য সব মাধ্যমকেই বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করতে হয়। যে কোনো মাধ্যমের বিজ্ঞাপন বিভাগের কাজ বিভিন্ন বিজ্ঞাপনদাতা এবং বিজ্ঞাপন সংস্থার কাছে মাধ্যম হিসাবে তাঁদের মাধ্যমের কার্যকারিতা বুঝিয়ে, সম্মত করে, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করা। অর্থাৎ, মাধ্যমের আয়ের ব্যবস্থা করা। প্রত্যেক মাধ্যমের বিজ্ঞাপন বিভাগের শীর্ষে থাকেন বিজ্ঞাপন কর্মাধ্যক্ষ। বিভাগের আয়তন, বিভিন্ন পদ এবং বিজ্ঞাপন প্রতিনিধির সংখ্যা নির্ভর করে মাধ্যমের আয়তনের উপর।

১.১০.৪ বিশেষ পরিষেবা গোষ্ঠী (Special Service Groups)

অনেক ছোটো ছোটো গোষ্ঠী বিভিন্ন ভাবে, বিজ্ঞাপনদাতা, বিজ্ঞাপন সংস্থা এবং বিভিন্ন মাধ্যমকে নানাবিধ বিশেষ পরিষেবার জোগান দিয়ে সহায়তা করে। বাজার সম্বন্ধে গবেষণা করা (market research), রেডিওয় প্রচারের জন্য কেবল শ্রবণগ্রাহ্য বিজ্ঞাপন রেকর্ড করা, টেলিভিশনের জন্য শ্রবণ-দৃশ্য, বাণিজ্যিক ফিলম তৈরি করা, বিভিন্ন প্রদর্শনী ও মেলার সংগঠন, ফটোগ্রাফার, প্রয়োজনীয় বিভিন্ন মডেলের সন্ধান জোগান দেওয়া এবং বিভিন্ন মুদ্রণের কাজ করেন এমন সংস্থা। এই সব সংস্থা নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের কাজ করেন। বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলি নিজেদের প্রয়োজন মতো এইসব গোষ্ঠীর বা সংস্থার দ্বারা বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন কাজ করিয়ে থাকেন। বিজ্ঞাপন শিল্পে এই সব গোষ্ঠীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এঁদের পরিষেবা ব্যতীত, পরিকল্পনা অনুযায়ী বিজ্ঞাপন তৈরি করা এবং প্রচার করা সম্ভব নয়।

১.১১ বিজ্ঞাপন - পেশা

ভারতে বিজ্ঞাপন শ্রমশিল্পের গত তিরিশ বছরের ইতিহাস এবং অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় বিজ্ঞাপন শ্রমশিল্পের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে, দেশের শিল্প ও অর্থনীতিকে শক্ত বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ শুরু হয়। বিভিন্ন শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদিত পণ্যের বাজার তৈরি করা, ব্যবহারকারীদের জানানো বিশেষ জরুরি হয়ে পড়ে। প্রয়োজনীয়তা বাড়ে বিপণন এবং বিজ্ঞাপনের। ক্রমবর্ধমান শিল্প বিকাশ এবং বাজারের চাহিদার সঙ্গে তাল রাখার জন্য বিজ্ঞাপন অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। নতুন নতুন ভোগ্যপণ্য যেমন বাজারে এসেছে, তেমনই প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে গ্রাহকদের কাছে এই সব জিনিসের সংবাদ এবং গুণাগুণ জানানোর জন্য বিজ্ঞাপনের। পরবর্তীকালে বাজার অর্থনীতির মুক্ত প্রতিযোগিতা বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়ে, বিজ্ঞাপনের প্রসার আরো সুগম করেছে। ছোটো, বড়ো, মাঝারি মাপের অসংখ্য বিজ্ঞাপন সংস্থা বিভিন্ন বিজ্ঞাপনদাতাকে পরিষেবা জোগানোর কাজ করছে।

এই সঙ্গে লক্ষ্য করতে হবে, বিভিন্ন মাধ্যমের সংখ্যা এবং মাধ্যমগুলির প্রচার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সংবাদপত্র ও পত্রিকার সংখ্যা অনেক বেড়েছে। বেড়েছে টেলিভিশন চ্যানেলের সংখ্যাও। প্রতিটি মাধ্যমই তাদের আয় বাড়ানোর জন্য বিজ্ঞাপন-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া অত্যাবশ্যক মনে করছে। এ ছাড়া, নানা ধরনের বিজ্ঞাপন-সংক্রান্ত পরিষেবার ছোটো ছোটো গোষ্ঠীর সংখ্যা গত বিশ বছরে অনেক গুণ বেড়েছে।

বিজ্ঞাপন-এর প্রয়োজনীয়তা দিনে দিনে আরো বাড়ছে। আগামী দিনেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে। বিজ্ঞাপন শিল্পে কাজের সুযোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন কাজের পেশাদার লোকের চাহিদাও বাড়বে। এই কারণেই বর্তমানে অসংখ্য তরুণ-তরুণী বিজ্ঞাপনকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে, বিজ্ঞাপন শ্রমশিল্পে যোগদান করতে বিশেষ আগ্রহী।

পেশা হিসাবে, বিজ্ঞাপন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এবং উদ্দীপনা ও আনন্দের পেশা। অন্যান্য গতানুগতিক কাজের থেকে একেবারেই আলাদা। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এবং সৃষ্টিশীল কাজে যাঁরা আনন্দ পান, তাঁদের বিশেষ পছন্দের পেশা—বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপন,—কোনো সাধারণ পেশা নয়। বিশেষজ্ঞের পেশা। যে কোনো পেশায় যোগদানের জন্য বিশেষ প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন। প্রতিটি পেশায় যোগদানের জন্য পেশার দক্ষতার জন্য উপযুক্ত বিশেষ গুণাবলি, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং মানসিক প্রবণতা থাকা প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপন পেশায় যোগদানের জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হয়? শিক্ষাগত যোগদানের বিষয়ে বলা যায়, বর্তমানে স্নাতক ডিগ্রি থাকা আবশ্যক। তবে বিজ্ঞাপন পেশায় বিশেষ সহায়ক হয় বিপণন, বিজ্ঞাপন, গণ-জ্ঞাপন, (mass communication) সাংবাদিকতা, ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য, মুদ্রণ ব্যবস্থাপন (printing management) এবং সমাজ বিদ্যায় (social science) স্নাতক স্তরের যোগ্যতা।

বিপণনের (marketing) কাজের অভিজ্ঞতাও বিশেষ সহায়ক। বিজ্ঞাপন আসলে বিক্রির জন্য প্রচার। কাজে কাজেই, আংশিক সময়ের সেলসম্যানের কাজের অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে, গ্রাহকদের সঙ্গে মুখোমুখি মত-বিনিময় এবং আদান-প্রদানের অভিজ্ঞতা এই পেশায় বিশেষ সহায়ক হয়।

তবে, এই পেশায় যোগদানের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, নিজেকে যাচাই করা বিশেষ প্রয়োজন। আপনি কী

প্রবল চাপের মধ্যেও ঠান্ডামাথায়, ঠিকভাবে কাজ করতে পারেন? সমালোচনা সহ্য করতে পারেন? সাফল্যের জন্য দীর্ঘ সময় কাজ করতে ইচ্ছুক? সময়সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট কাজ সম্পূর্ণ করতে পারেন? আপনার ধারণা বা আইডিয়া অন্যকে জানাতে বা বোঝাতে পারেন? বিজ্ঞাপন আপনার শুধুই পছন্দ, না, আপনি বিজ্ঞাপন সত্যিই ভালোবাসেন? যিনি পেশা হিসাবে বিজ্ঞাপনকে গ্রহণ করবেন তাঁকে এই প্রশ্নগুলির উত্তর বারে বারে খুঁজতে হবে — নিজের কাছে। বিজ্ঞাপন পেশা সকলের জন্য নয়। বিশেষজ্ঞের পেশা — বিজ্ঞাপন।

১.১২ বিজ্ঞাপন - কারুশিল্প

বিজ্ঞাপন একটি শ্রমশিল্প হলেও, — বিজ্ঞাপনকে কারুশিল্প হিসাবেও গণ্য করা হয়। বিজ্ঞাপনের বৈশিষ্ট্য হলো সৃজনশীলতা। গ্রাহকদের কাছে উপস্থাপনের জন্য বিজ্ঞাপন বিশেষ আকর্ষণীয় করে তোলা একান্ত প্রয়োজন। গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং গ্রাহকদের মনে রাখার মতো প্রভাব বিস্তার করাই বিজ্ঞাপনের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিজ্ঞাপন সৃজনশীল করা আবশ্যক। এর জন্য প্রয়োজন কারুশিল্পের সহায়তা। মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের চিত্ররেখা (layout), ছবি, বিভিন্ন হরফ দিয়ে সাজানো (illustration) এবং সমগ্র বিজ্ঞাপনটি উপস্থাপনার মধ্যে একটি শিল্পগুণ এবং শৈল্পিক পারদর্শিতা থাকে। রেডিও'র বিজ্ঞাপন বা টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনেও সঙ্গীত, চিত্রনাট্য, অভিনয়, বিভিন্ন রঙের ব্যবহার, উপস্থাপনা, সব কিছু মিলিয়ে এক নান্দনিক আবেদন সৃষ্টি করা হয়। এই নান্দনিক আবেদনই দর্শক এবং শ্রোতাদের স্মরণে থাকে। এই আবেদনই, জিনিস কেনার সময়, গ্রাহককে কোনো বিশেষ নাম বা মার্কা স্মরণ করিয়ে দেয়। কারুশিল্পের এই সব কৌশল বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হয় বলে বিজ্ঞাপন কারুশিল্প হিসাবেও গণ্য হয়।

আধুনিক বিজ্ঞাপন, — বিপণনের কার্যকরী হাতিয়ার, একই সঙ্গে শ্রমশিল্প এবং কারুশিল্প।

১.১৩ বিজ্ঞাপন - সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

গণজ্ঞাপনের এক শক্তিশালী হাতিয়ার - বিজ্ঞাপন। বর্তমান সমাজে বিজ্ঞাপনের প্রসার এবং প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। বিজ্ঞাপনের এই প্রভাবের জন্যই বিজ্ঞাপন — নানা দৃষ্টিকোণ থেকে নানাভাবে সমালোচিত। অনেক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুই — বিজ্ঞাপন। আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বিজ্ঞাপনের অবদান কী? এই অবদান ইতিবাচক না ক্ষতিকারক? বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করে, আলোচনা করে দেখা যাক।

১. শিল্প ও অর্থনীতির বিকাশের সহায়ক

দেশের শিল্পের বিকাশ না হলে, মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো সম্ভব নয়। সম্ভব নয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নতি। বিভিন্ন শিল্পের বিকাশ সম্ভব হবে যদি শিল্পের উৎপাদন বাড়ানো যায়, উৎপাদিত জিনিসের চাহিদা বাড়ে এবং ক্রমবর্ধমান বাজার তৈরি হয়। বাজার বাড়লে, বাজারের চাহিদা মেটানোর জন্য উৎপাদন বাড়বে এবং নতুন শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হবে। বিভিন্ন জিনিসের চাহিদা বাড়িয়ে, বাজার তৈরি করে, দেশের শিল্পের উন্নতি বাস্তবায়িত করার বিশেষ সহায়ক — বিজ্ঞাপন। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিকাশ ত্বরান্বিত করে বিজ্ঞাপন। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা

রয়েছে বিজ্ঞাপনের। বিজ্ঞাপনই ব্যবহারকারীদের জানায় তাঁদের বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য, জীবনযাত্রা আরো সুবিধাজনক করার জন্য, সময় বাঁচানোর জন্য, স্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্য, নিরাপত্তার জন্য এবং সর্বোপরি, নিজেদের মানসিক সন্তোষের জন্য কতরকম জিনিস এবং পরিষেবা রয়েছে। এইগুলির ব্যবহারে, তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নতই হয়।

২. আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি

উন্নয়নশীল দেশে বিভিন্ন জিনিসের বিজ্ঞাপন দেখে সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা বাড়ে। ব্যবহারকারীর মনে বিভিন্ন জিনিস কিনবার এবং ব্যবহার করার আকাঙ্ক্ষা বাড়লে তাঁরা সেগুলি পাওয়ার জন্য নিজেদের কর্মদক্ষতা এবং উপার্জনক্ষমতা বাড়াবার জন্য চেষ্টা করবেন। এর ফলে, কর্মী হিসাবে তাঁদের কর্মনিপুণতার উন্নতি হবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে, পরিবারগত হিসাবে, এবং সামগ্রিকভাবে সমাজেরও উন্নতি সম্ভব হয়। সকলেই কাজ করেন, উপার্জনের চেষ্টা করেন, নিজের জীবনযাত্রা এবং জীবনযাত্রার পরিবেশের উন্নতির জন্য। সভ্যতার আদিকাল থেকেই মানুষ তার জীবনযাপনের প্রণালির এবং উপকরণের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করে আসছে। বিজ্ঞাপন সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করছে। সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের মান উন্নয়নে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা অপরিসীম।

অবশ্য অনেকে বলেন, অনুন্নত দেশে বিভিন্ন জিনিসের বিজ্ঞাপন দেখে সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা বাড়ে। কিন্তু, উপযুক্ত ক্রয়ক্ষমতা না থাকায় তাঁরা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বিজ্ঞাপিত জিনিসগুলি কিনতে পারেন না। এর ফলে, অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার দরুণ তাঁরা মানসিক হতাশায় ভোগেন এবং তাঁদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সমাজের উপরে এই হতাশা এবং ক্ষোভ ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে। এই যুক্তি মেনে নেওয়া কঠিন। আকাঙ্ক্ষা না থাকলে মানুষের কর্মপ্রচেষ্টাই ব্যাহত হবে। শিল্পের এবং সমাজের বিকাশের গতি রুদ্ধ হবে। এরকম সমস্যা যে হচ্ছে না, তা নয়। তবে এই সমস্যার জন্য বিজ্ঞাপনকে অভিযুক্ত না করে, সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির পরিকল্পনা করাই যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা। মানুষের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার মান একসূত্রে বাঁধা। আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট করে, বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করে। আর, অপ্রয়োজনীয় আকাঙ্ক্ষা? কোন আকাঙ্ক্ষা প্রয়োজনীয় এবং কোনটি অপ্রয়োজনীয় সেই সিদ্ধান্ত কেমন করে হবে? অতীতে যেসব আকাঙ্ক্ষা পূরণের জিনিস বিলাসদ্রব্য বলে গণ্য হত, বর্তমান যুগের আকাঙ্ক্ষার হিসাবে সেটি অত্যাবশ্যক বলে গণ্য হতে পারে উদাহরণ — রেফ্রিজারেটর, টেলিফোন ইত্যাদি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আকাঙ্ক্ষারও পরিবর্তন ঘটে। কোনো আকাঙ্ক্ষাকে "অপ্রয়োজনীয়" নাম দেওয়ার আগে ভেবে দেখা দরকার।

৩. সামাজিক সচেতনতা বাড়ায়

বিজ্ঞাপন কেবল জিনিস কেনার এবং ব্যবহার করার জন্য মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয় না। মানুষকে তার সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধেও সচেতন করে — বিজ্ঞাপন। দেশের এবং জাতির প্রয়োজনে, বিভিন্ন

বিষয় এবং সমস্যার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে — বিজ্ঞাপন। বিভিন্ন সামাজিক কুপ্রথা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে ওয়াকিবহাল ক'রে, কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তোলে — বিজ্ঞাপন। আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, এই সব কুপ্রথার বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করেছে — বিজ্ঞাপন। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে বিজ্ঞাপনের এই ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য

৪. প্রলোভিত করে?

বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ — বিজ্ঞাপন মানুষকে প্রলোভিত করে এবং প্ররোচিত করে বিভিন্ন জিনিস কিনবার জন্য এবং ব্যবহার করার জন্য। আরো অভিযোগ, জিনিস বিক্রি করার জন্য গ্রাহকদের মন প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন অকাতর মিথ্যাচার করে এবং অর্ধসত্য পরিবেশন করে।

বিরুদ্ধবাদীরা বলেন — বিজ্ঞাপন গ্রাহকদের সেবা করে। আপনিও ব্যবহারকারী বা গ্রাহক। নানা জিনিস ব্যবহার করেন এবং নানা পরিষেবার সুযোগ নিয়ে থাকেন। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেই আপনি জানতে পারেন আপনার কোন কোন আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য কোন কোন মার্কার জিনিস বাজারে রয়েছে। বিজ্ঞাপিত বিভিন্ন জিনিসের বিভিন্ন গুণাগুণের দাবি আপনি নিজের মনে তুলনামূলক বিচার করে দেখেন — কোন জিনিসটি আপনার

আকাঙ্ক্ষা পূরণে বিশ্বাসযোগ্যভাবে সমর্থ। আপনার বিশ্বাস জন্মালে, তবেই আপনি সেই বিশেষ জিনিসটি কিনবেন এবং ব্যবহার করবেন। অর্থাৎ, ব্যবহারকারীর স্বাধীনতা, নিজের পণ্য নির্বাচনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে বিজ্ঞাপন বিশেষ ভুমিকা পালন করে। বিপণন বিজ্ঞানে বলে — ব্যবহারকারীই রাজা বা রানি। তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। বিজ্ঞাপন ব্যতীত ব্যবহারকারীর এই অধিকার বজায় রাখা সম্ভব নয়। বিজ্ঞাপন না থাকলে আপনাকে দোকানিদের কথাতেই চলতে হবে। তাঁরা যে জিনিসটিকে ভাল বলে বোঝাবেন আপনি সেইটিই কিনবেন বা কিনতে বাধ্য হবেন। আর, দোকানিদের বক্তব্য যথার্থ না-ও হতে পারে। দোকানি তাঁর নিজের বেশি লাভের জন্য যে কোন জিনিসকেই ভাল বলতে পারেন। আর, আপনার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা, — দোকানি জানবেন কেমন করে?

বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগ মেনে নেওয়া কঠিন। গণতান্ত্রিক দেশে, মুক্ত সমাজের মানুষকে মিথ্যা প্রলোভনের দ্বারা কোনো পণ্য বা পরিষেবা বিক্রি করা সহজ কাজ নয়। প্রতারণামূলক এবং অসাধু বিজ্ঞাপনের প্রচার নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সরকারের নানাবিধ আইন রয়েছে। গণমাধ্যমগুলি সরকারের নিয়মনীতি মেনে চলেন। কোনো পণ্যের বিজ্ঞাপনে, পণ্যটিতে যে যে গুণ আছে বলে দাবি করা হয়, বিজ্ঞাপিত পণ্যটিতে সেই গুণগুলি থাকা আইনত আবশ্যিক। পণ্যটি ব্যবহার করে আপনি যদি দেখেন, বিজ্ঞাপনে বর্ণিত গুণগুলি পণ্যটিতে নেই, তাহলে আপনি দ্বিতীয়বার ঐ পণ্যটি কিনবেন না। শুধু তাই নয়, — ঐ কোম্পানির অন্যান্য পণ্যও কিনতে এবং ব্যবহার করতে আপনি দ্বিধাবোধ করবেন এবং অনিচ্ছুক হবেন। উপরন্তু, আপনার পরিচিত লোকেদের ঐ পণ্যটি সম্পর্কে আপনার অসন্তুষ্টি এবং তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানাবেন।

আরো একটি কথা। অনেক বড় বড় কোম্পানি সারা দেশে তাদের জিনিস বিক্রি করছে এবং তার জন্য প্রচারও করছে। এইসব কোম্পানির পক্ষে মিথ্যাচার করা বা গ্রাহকদের বোকা বানিয়ে জিনিস বিক্রি করা সম্ভব নয়। সারা দেশজুড়ে একটি বিশেষ মার্কা বা নামের (brand name) জিনিস বিক্রি করতে হলে, জিনিসটির গুণ বা কর্মদক্ষতা এবং কোম্পানির সুনাম বজায় রাখা একান্তই আবশ্যক। মিথ্যাচারের দ্বারা গ্রাহকদের বোকা বানানোর চেষ্টা করলে, দেশজুড়ে, বছরের পর বছর সাফল্যের সঙ্গে বিপণন সম্ভব নয়।

৫. বিজ্ঞাপন কি রুচি নির্ধারণ করে?

বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ, বিজ্ঞাপনই সাধারণ মানুষের কেনাকাটা এবং বিভিন্ন জিনিস ব্যবহারের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করে। অর্থাৎ, মানুষের রুচি নিয়ন্ত্রণ করে বিজ্ঞাপন। অভিযোগটি তলিয়ে দেখা যাক। আপনিও তো বহু জিনিসের বিজ্ঞাপন দেখছেন। সত্যি করেই কী বিজ্ঞাপনের প্রভাবে আপনার নিজ পছন্দ-অপছন্দ, অর্থাৎ আপনার ব্যক্তিগত রুচি বদলে যাচ্ছে? আপনি যতো জিনিসের বিজ্ঞাপন দেখেন, তার মধ্যে যেগুলি আপনার রুচির সঙ্গে খাপ খায়, এবং আপনার কিনবার সামর্থের মধ্যে হয়, কেবলমাত্র সেই জিনিসগুলিই আপনি ব্যবহার করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যে জিনিসগুলি আপনার রুচির সঙ্গে এবং আপনার সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খায় না, সেগুলি আপনি ব্যবহার করেন না। আসলে, বিজ্ঞাপন কী করে?

ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা এবং চাহিদা সম্পর্কে গবেষণা ক'রে, তাঁদের সেই সব চিহ্নিত আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপযোগী জিনিসের বার্তা গ্রাহকদের জানায়। যে জিনিসের জন্য আপনার আকাঙ্ক্ষা নেই, অথবা যা আপনার কিনবার সামর্থের বাইরে, সেরকম জিনিস আপনি কিনবেন কেন? সাধারণ মানুষের রুচি নানা কারণে, ক্রমাগতই পরিবর্তিত হচ্ছে। সব মানুষই চান যে সময়ে, যে সমাজে বাস করছেন, সেই সমসাময়িক রুচির সঙ্গে নিজের রুচি মেলাতে। কেউই পিছিয়ে থাকতে চান না। বিজ্ঞাপন মানুষের রুচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চায়, রুচি বদলাতে চায় না।

নিচে উদাহরণ দেখুন। ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত একটি হেয়ারঅয়েল-এর বিজ্ঞাপন। একটি পুরুষ ও নারীর হাতে-আঁকা ছবি দেওয়া হয়েছে। দুজনেরই হেয়ার স্টাইল, সেই সময়কার জনপ্রিয় হেয়ার স্টাইল। ঐ একই হেয়ার অয়েলের ১৯৮৩ সালের বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে, জনৈক চিত্রতারকাকে। তাঁর হেয়ার স্টাইল, তাঁর সমসাময়িক। বিজ্ঞাপন মানুষের রুচির পরিবর্তন করে না। রুচির পরিবর্তন এবং সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে - বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন সমসাময়িক জীবনের প্রতিচ্ছবি।

আরো দুটি উদাহরণ দেখুন। একটি ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হেয়ার অয়েল-এর বিজ্ঞাপন। কেশবিন্যাস, স্টাইল সমসাময়িক। অপরটি বর্তমানে প্রকাশিত শ্যাম্পু'র বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপনে মডেলের হেয়ার স্টাইল বর্তমান রুচি অনুযায়ী। বিজ্ঞাপন - সমসাময়িক রুচির প্রতিফলন।

চিরকালের, চিরদিনের…

ঐতিহ্য আর আধুনিকতায়
আজও ঘরে ঘরে সমাদৃত

SUNSILK
SHAMPOO
SUNSILK
Because I oil my hair
Sunsilk Natural Nourishment Shampoo
is the only one for me. I have discovered a shampoo specially made for my oiled hair. Sunsilk Natural Nourishment Shampoo with Green Tea Extracts. It washes away the oil from my hair completely, yet leaves my hair irresistibly soft to touch. Like I have always wanted.

৬. বিজ্ঞাপন কী মূল্যবোধ বদলে দেয়?

অনেকে বলেন, বিজ্ঞাপন আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ বদলে দিচ্ছে। কিন্তু, ভেবে দেখুন তো, বিজ্ঞাপনের পক্ষে কী মূল্যবোধ বদলে দেওয়া সম্ভব? বিজ্ঞাপনের লক্ষ্য — ব্যবহারকারীদের মন জয় করা। ব্যবহারকারীর মূল্যবোধে আঘাত করে কী তাঁর মন জয় করা সম্ভব? বরং, বাস্তবে দেখা যায়, বিজ্ঞাপন সব সময়েই ব্যবহারকারীদের সামাজিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ বজায় রেখে, প্রতিষ্ঠিত রেখেই, বিভিন্ন বার্তার মাধ্যমে ব্যবহারকারীর মনে প্রভাব সৃষ্টি করে। বিজ্ঞাপন আসলে, জীবনের প্রতিবিম্ব। বাস্তব জীবনে যা দেখা যায় বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের খণ্ডচিত্রে আপনারা তারই প্রতিফলন দেখেন। বিজ্ঞাপনের পাত্রপাত্রীদের সঙ্গে, এবং বিজ্ঞাপনে বর্ণিত পরিবেশের সঙ্গে ব্যবহারকারী নিজেকে সনাক্ত করতে চায়, দেখতে চায়। কাজেই, প্রচলিত মূল্যবোধে আঘাত করে বিজ্ঞাপন কখনোই সফল হতে পারে না।

৭. মানুষকে কী বস্তুবাদী করে তোলে?

আরো অভিযোগ, বিজ্ঞাপন সাধারণ মানুষকে বস্তুবাদী (materiatistic) করে তুলছে। কী কী জিনিস পাওয়া যাচ্ছে, তার বার বার প্রচার এবং কিনবার জন্য উত্তেজিত করার ফলে মানুষ আরো নতুন নতুন জিনিস অধিকারের জন্য ব্যাকুল। মানুষ যে সমাজে বাস করে, তার আকাঙ্ক্ষা এবং চাহিদাও সেই সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে। আজকে যে জিনিস অতিপ্রয়োজনীয়, অতীতে সেটি হয়তো বিলাসদ্রব্য বলে গণ্য হতো। সময়, সমাজ, পরিবেশের সঙ্গে রুচি এবং আকাঙ্ক্ষাও বদলে গেছে। আপনারা যে সব জিনিস কেনেন, এবং ব্যবহার করেন। আপনার কাছে তার কার্যকারীতা, প্রয়োজনীয়তা না থাকলে, — ব্যবহার করতেন না। আর, যে কোনো জিনিস কিনবার এবং ব্যবহার করার ফলে আপনার যে মানসিক সন্তুষ্টি বোধ হয়, সেটিও আপনার বড়ো প্রাপ্তি। সেই প্রাপ্তি হিসাব করলে, কী করে বলি বিজ্ঞাপন বস্তুবাদের প্রশ্রয় দিচ্ছে?

৮. বিজ্ঞাপনের খরচ কী অপচয়?

অনেকের ধারণা, ব্যবহারকারী তো তাঁর প্রয়োজনমত জিনিস ব্যবহার করবেনই। অতএব, বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন নেই। তাহলে, বিজ্ঞাপনের খরচ অপচয় বলেই গণ্য হওয়া উচিত। শিল্প বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন জিনিস তৈরি হচ্ছে মানুষের বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা এবং চাহিদা পূরণের জন্য। সারা দেশের অসংখ্য মানুষকে এই সব জিনিসের খবর জানাতে হবে। ব্যবহারকারীরা জিনিসটি সম্বন্ধে জানলে, উৎসাহিত হলে, তবেই সেটি কিনবেন। নচেৎ নয়। আর, ব্যবহারকারীরা যদি না কেনেন, তাহলে জিনিস তৈরি করে লাভ কি? অর্থনীতির সূত্র অনুযায়ী উৎপাদন বজায় রাখতে এবং বাড়াতে হলে, বাজারে জিনিসটির চাহিদা বাড়াতে হবে। চাহিদা বাড়ানোর জন্য বিজ্ঞাপন প্রয়োজন। এই পবিস্থিতিতে বিজ্ঞাপনের খরচকে অপচয় বলা কী সঙ্গত? অর্থনীতির সূত্র অনুযায়ী ব্যাপক উৎপাদন (mass production) ব্যতীত, কোন জিনিসের উৎপাদন খরচ কম রাখা সম্ভব নয়। আবার, জিনিসটি বিক্রি করতে না পারলে, ব্যাপক উৎপাদন অর্থহীন হয়ে পড়ে। চাহিদা বাড়িয়ে, বাজার প্রসারিত করে, প্রতিযোগিতা মূলক বাজারে জিনিসের দাম কম রাখতে সাহায্য করে — বিজ্ঞাপন।

মানব সভ্যতার সূচনাকাল থেকেই মানুষ তার জীবনযাত্রার উন্নতিসাধনের জন্য নিরলস প্রয়াস করে আসছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই প্রয়াস চলছে। মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের এই প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। এই প্রয়াসের সহায়ক এবং অংশীদার — বিজ্ঞাপন।

১.১৪ সারাংশ

আধুনিক বিপণনে বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব অপরিসীম। বিজ্ঞাপনের অস্তিত্ব প্রাচীনকাল থেকেই। বহির্বিশ্বে রেনেশাঁস এবং শিল্পবিপ্লবের পরে বিজ্ঞাপনের ক্রমবিকাশ দ্রুত হয়। ভারতে উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনের সূচনা। বিজ্ঞাপন বর্তমানে বিপণনের সংযোগ প্রক্রিয়ার অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার আবার একই সঙ্গে জন সংযোগের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার হয়। বিপুল সংখ্যক গ্রাহকদের পণ্য বা পরিষেবা সম্বন্ধে অবহিত করতে বিজ্ঞাপনের কর্মক্ষমতা সর্বস্বীকৃত।

বিভিন্ন সংস্থা এবং দেশের সরকার নানা রকম প্রয়োজনে বিজ্ঞাপন ব্যবহার করেন। পণ্য এবং পরিষেবার জন্য গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন করেন বিভিন্ন সংস্থা। আবার বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক অথবা জাতীয় সচেতনতা জাগিয়ে তোলার জন্য দেশের সরকারও বিজ্ঞাপন করে থাকেন। ব্যবহার অনুযায়ী, উদ্দেশ্য অনুযায়ী এবং মাধ্যম অনুযায়ী বিজ্ঞাপনের প্রকারভেদ হয়।

বিজ্ঞাপন পেশা হিসাবে বর্তমানে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞাপন সংস্থা, মাধ্যম এবং বিভিন্ন সংস্থার বিজ্ঞাপন বিভাগে বিজ্ঞাপনের বহু বিশেষজ্ঞ কর্মরত।

বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও জাতীয় জীবনে বিজ্ঞাপনের অবদান তাৎপর্যপূর্ণ। পণ্যের চাহিদা বাড়িয়ে বিজ্ঞাপন বাজার বিস্তৃত করে এবং শিল্পের উৎপাদনশীলতায় গতি সঞ্চার করে। দেশের অর্থনীতি এবং শিল্পের ক্রমোন্নতিতে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সামাজিক সচেতনতা জাগাতেও বিজ্ঞাপনের ভূমিকা নানাভাবে সক্রিয়।

১.১৫ অনুশীলনী

১। বিজ্ঞাপন কী? বিভিন্ন সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করুন।
২। বিপণনের সংযোগের বিভিন্ন উপায়ের তুলনায় বিজ্ঞাপনের সুবিধা কী?
৩। জ্ঞাপন প্রক্রিয়া কী? বিভিন্ন উপাদান ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে দিন।
৪। জ্ঞাপন প্রক্রিয়ায় "গোলমাল" এর ভূমিকা কী?
৫। বিজ্ঞাপন কী জনসংযোগেরও হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়?
৬। বিজ্ঞাপন কত রকমের হয়? পার্থক্য বর্ণনা করে বোঝান।
৭। দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা কী?
৮। বিজ্ঞাপন কী শিল্প ও অর্থনীতির বিকাশের সহায়ক?

টীকা লিখুন ঃ

১। সেলস প্রমোশন	২। পারসোনাল সেলিং
৩। জাতীয় বিজ্ঞাপন	৪। জনসেবামূলক বিজ্ঞাপন
৫। শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন	৬। প্রদর্শনমূলক বিজ্ঞাপন

১.১৬ গ্রন্থপঞ্জী

Advertising – William H. Bolen
Advertising Fundamentals – Philip Wald Burton J. Robert Miller Ph. D.
Advertising in America – Stanley and Minoff Ph.D.
Practice of Advertising – Edited by Norman Hart.

একক ২ ❑ বিজ্ঞাপন সংস্থার কাজকর্ম

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য
২.১ প্রস্তাবনা
২.২ বিজ্ঞাপন সংস্থা
২.৩ বিজ্ঞাপন সংস্থার কাজ
২.৪ বিজ্ঞাপন সংস্থার পরিসম্পৎ
২.৫ বিজ্ঞাপন সংস্থার পরিষেবা
২.৫.১ মক্কেল পরিষেবা
২.৫.২ সৃজনশীল পরিষেবা
২.৫.৩ মাধ্যম পরিকল্পনা
২.৫.৪ বাজার গবেষণা
২.৫.৫ বিজ্ঞাপন প্রস্তুতকরণ
২.৬ বিজ্ঞাপন সংস্থার প্রয়োজনীয়তা
২.৭ নির্বাচনের মাপকাঠি
২.৮ পরিবর্তনের কারণ
২.৯ বিজ্ঞাপন সংস্থা ও বিজ্ঞাপনদাতার সম্পর্ক
২.১০ এ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা
২.১১ সারাংশ
২.১২ অনুশীলনী
২.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে বিজ্ঞাপন সংস্থার কাজকর্ম, বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা ও সৃষ্টিতে বিজ্ঞাপন সংস্থার ভূমিকা এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে বিজ্ঞাপন সংস্থার সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়েছে। এই এককটি অধ্যয়ন করে আপনারা এই বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করতে পারবেন —

- বিজ্ঞাপন সংস্থা কী ধরনের সংস্থা
- বিজ্ঞাপন সংস্থা কী কাজ করে
- বিজ্ঞাপন সংস্থার পরিসম্পৎ
- বিজ্ঞাপন সংস্থার বিভিন্ন পরিষেবা
- বিজ্ঞাপন সংস্থার প্রয়োজনীয়তা
- বিজ্ঞাপন সংস্থা নির্বাচনের উপায়
- বিজ্ঞাপন সংস্থা পরিবর্তনের কারণ
- বিজ্ঞাপনদাতা ও বিজ্ঞাপন সংস্থার সম্পর্ক
- এ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা

২.১ প্রস্তাবনা

শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাজার বাড়ানো ক্রমশ বিশেষ জরুরি হয়ে পড়ে এবং উৎপাদিত সামগ্রী ও পরিষেবার চাহিদা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে তুলতে হয়। শিল্পের উন্নতি এবং ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে তাই বিপণনের

গুরুত্ব বাড়তে থাকে। বাজার সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজন হয় প্রচারের। বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন সামগ্রী ও পরিষেবার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় বিভিন্ন মাধ্যম, যেমন সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনের সাহায্যে। বিপণনের হাতিয়ার, বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয় বিজ্ঞাপনদাতা এবং মাধ্যমের মধ্যে একটি সংযোগস্থাপনকারী সংস্থা। বিজ্ঞাপনদাতা এবং মাধ্যমের মধ্যে যোগসূত্র। বিজ্ঞাপন সংস্থা (Advertising Agency) সেই যোগসূত্র।

পৃথিবীর প্রথম বিজ্ঞাপন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় আমেরিকায়। ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে। তাঁরা কাজ শুরু করেছিলেন কয়েকটি সংবাদপত্রের কমিশন এজেন্ট হিসাবে। বিভিন্ন বিজ্ঞাপনদাতার কাছ থেকে ঐ সংবাদপত্রের জন্য তাঁরা বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতেন। এর জন্য তাঁরা সংবাদপত্রের কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে কমিশন পেতেন। এইভাবে কাজ শুরু করে ক্রমশ তাঁরা বিজ্ঞাপন রচনা, তার মাপ, আকার প্রভৃতি বিষয়ে বিজ্ঞাপনদাতাদের পরামর্শ দিতে শুরু করেন। তাঁদের এই পরিষেবা ফলপ্রসূ হওয়ায়, বিজ্ঞাপনদাতারা এই বিজ্ঞাপন সংস্থার উপরে বেশি করে নির্ভর করতে থাকেন।

সময় যতো এগিয়ে যায় আরো অনেক বিজ্ঞাপন সংস্থা কাজে নামে। সকল সংস্থার পরিষেবার ধরনই একরকম ছিল। সেই বিজ্ঞাপন সংস্থাই কালক্রমে আজকের সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত অসংখ্য বড়ো বড়ো বিজ্ঞাপন সংস্থার রূপ নিয়েছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে আদি বিজ্ঞাপন সংস্থার চরিত্রও। সেকালের কমিশন এজেন্ট বর্তমানে বিশেষজ্ঞের পরিষেবা যোগান দিচ্ছে বিজ্ঞাপনদাতাকে যাতে বিজ্ঞাপন আরো বিজ্ঞান সম্মত, আরো নানন্দিক এবং মনস্তাত্বিক আবেদনে সফল হতে পারে। বিজ্ঞাপন যাতে যথার্থই হাতিয়ার হিসাবে বিপণনকে আরো কার্যকরী করে তোলে। বাজারে চাহিদা বাড়িয়ে, শিল্পের প্রসারে সহায়তা করতে পারে।

ভারতেও ছোটো, বড়ো, মাঝারি মাপের বিভিন্ন বিজ্ঞাপন সংস্থা কাজ করছে। এই সংস্থাগুলির কিছু বহুজাগতিক সংস্থা এবং অন্যান্যগুলি ভারতীয় সংস্থা। কাজের বৈচিত্রে এবং মানের বিচারে ভারতীয় বিজ্ঞাপন সংস্থা কোনো অংশেই বিদেশের, উন্নত, ইউরোপ, আমেরিকার বিজ্ঞাপন সংস্থার থেকে পিছিয়ে নেই। ভারতীয় বিজ্ঞাপনের মান পশ্চিমী দুনিয়ার বিজ্ঞাপন জগতেও প্রশংসিত। ভারতের সকল বড়ো শহরে একাধিক বিজ্ঞাপন সংস্থা আছে। তবে পাঁচ-ছটি প্রধান শহরেই বিজ্ঞাপন সংস্থার সংখ্যা এবং কাজের পরিমাণ বেশি।

২.২ বিজ্ঞাপন সংস্থা

আগেই আলোচনা করা হয়েছে, বিজ্ঞাপন শ্রমশিল্পে, বিজ্ঞাপন সংস্থার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা সংবাদপত্রে, টেলিভিশনে এবং অন্যান্য মাধ্যমে যে সব বিজ্ঞাপন দেখতে এবং শুনতে পান, তার প্রায় সবই

বিভিন্ন বিজ্ঞাপন সংস্থার সৃষ্টি, এবং তাঁদের পরিকল্পনা অনুসারেই প্রচারিত। কিন্তু, বিজ্ঞাপন সংস্থা বলতে কী বোঝায়? আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সির সংজ্ঞা অনুসারে — "ব্যবসায়ী ও সৃজনশীল বিশেষজ্ঞদের একটি সংস্থা, যা কীনা বিজ্ঞাপনকে সফল করার জন্য উৎসর্গীকৃত।"

বিজ্ঞাপন সংস্থায় বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত সব রকম বিশেষজ্ঞের সমাবেশ ঘটে। আর কোনো সংস্থায় বিজ্ঞাপনের এতরকম বিশেষজ্ঞের সমাবেশ সম্ভব নয়। মাধ্যম, বাজার বিষয়ে গবেষণা, মক্কেল পরিষেবা, সৃজনশীল কাজ, সব রকমের বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞকে একটি বিজ্ঞাপন সংস্থায় পাওয়া যায়। যাঁরা নিজের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রশিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ। এমন বিশেষজ্ঞের সমাবেশ এবং সৃজনশীল কাজের জন্যই ব্যবসায়ী এবং শিল্পমহলে বিজ্ঞাপন সংস্থার প্রতি এমন আগ্রহ এবং উৎসাহ। যে কোন সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞাপন সংস্থার কাজকর্ম বিশেষ চিত্তাকর্ষক। যাঁরা নতুন কর্মজীবনে প্রবেশ করছেন সেই সব নবীনদের কাছে বিজ্ঞাপন সংস্থার কাজ মনোমুগ্ধকর। উদ্দীপনাজনক এবং পারিশ্রমিকের পক্ষেও সন্তোষজনক।

২.৩ বিজ্ঞাপন সংস্থার কাজ

আধুনিক বিজ্ঞাপন সংস্থার কাজ বহুমুখী এবং বিশেষ বৈচিত্র পূর্ণ। তবে, বিভিন্ন মক্কেলদের (বিজ্ঞাপনদাতা কোম্পানি) বিজ্ঞাপন সংস্থা যে সকল পরিষেবার যোগান দেন, মোটামুটি ভাবে সেই সব পরিষেবাকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। মক্কেলদের বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনা করা, বিজ্ঞাপন তৈরি করা এবং বিজ্ঞাপন প্রচার করা।

❑ পরিকল্পনা

যে কোন কার্যকরী বিজ্ঞাপনের পিছনে থাকে বিশেষ পরিকল্পনা। বিজ্ঞাপন-সংস্থাই তাঁদের মক্কেল, বিজ্ঞাপনদাতার বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনা করে থাকেন। যদিও, বিভিন্ন পর্যায়ে বিজ্ঞাপনদাতা কোম্পানির বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়; বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনায়, বিজ্ঞাপন সংস্থার ভূমিকাই প্রধান। পরিকল্পনার বিষয়ের মধ্যে থাকে বিপণনের বিভিন্ন দিক, বাজার এবং গ্রাহকদের সম্বন্ধে গবেষণা, বিপণনের কৌশল এবং উপায়। বিজ্ঞাপন কীরকম সৃজনশীল হবে, বিজ্ঞাপনের মূল বার্তা কী হবে, এবং কোন মাধ্যমে, কীভাবে প্রচার করা হবে, সব কিছুই পরিকল্পনার অন্তর্গত।

❑ প্রস্তুতি

বিজ্ঞাপনের মূল সৃজনশীল কৌশল কী হবে, পরিকল্পনার সময়েই সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তারপরেই এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নির্ধারিত সৃজনশীল কৌশলকে কাজে পরিণত ক'রে, বিশেষ রূপ দিতে, বিষয়লিপি

(copy) এবং শিল্পচিত্রের (art) সমন্বয়ে সৃষ্টি করা হয় বিজ্ঞাপন, যা আপনারা পত্রিকায় বা টেলিভিশনে দেখে থাকেন। বুঝতেই পারছেন, বিজ্ঞাপন সংস্থার পক্ষে এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই বিজ্ঞাপনই, বিজ্ঞাপনদাতার জিনিস পরিচিত করবে, এবং তার জন্য চাহিদা সৃষ্টি করবে, বিপণন কৌশলকে সাফল্যমণ্ডিত করবে। এই বিজ্ঞাপনই বিজ্ঞাপনদাতা এবং তাঁদের জিনিসকে গ্রাহকদের কাছে চিহ্নিত এবং পরিচিত করবে।

❑ প্রচার

বিস্তারিত পরিকল্পনার পরে বিজ্ঞাপন সৃষ্টি করা হলে, সেটি প্রচারের ব্যবস্থা করতে হয়। বিজ্ঞাপন সংস্থার কাজ, জিনিসটির বিজ্ঞাপন যতো বেশি সংখ্যায়, জিনিসটির চিহ্নিত গ্রাহকদের কাছে পৌঁছতে পারে, তার ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার মূল সূত্র — যতো কম খরচে সম্ভব, সামগ্রী ও পরিষেবার কথা ব্যবহারকারীদের কাছে বিজ্ঞাপনের আকারে কার্যকরীভাবে পৌঁছে দেওয়া। মাধ্যম নির্বাচন এবং বিজ্ঞাপন বারংবার প্রচারের সংখ্যা নির্ণয় ক'রে তার খরচ হিসাব করে বিজ্ঞাপন সংস্থা। এই বিষয়ে বিজ্ঞাপন সংস্থার ভূমিকা নিরপেক্ষ। তাঁরা দেখেন বিজ্ঞাপনদাতার স্বার্থ কী ভাবে রক্ষা করা যাবে। যার জন্য মাধ্যম নির্বাচনের সময়, কেবল সংখ্যার উপর নির্ভর করা হয় না। বিজ্ঞাপন সংস্থা বিচার করেন, কোন মাধ্যম কী ধরনের গ্রাহকদের কাছে জনপ্রিয় এবং বিজ্ঞাপিত সামগ্রী বা পরিষেবা চিহ্নিত গ্রাহককে কোন কোন মাধ্যমের দ্বারা অবহিত করার সম্ভাবনা বেশি।

একটি বিজ্ঞাপন সংস্থাকে তাঁদের মক্কেল, অর্থাৎ খরিদ্দারের বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত সমস্ত কাজের সকল পরিষেবার যোগান দিতে হয়। এই পরিষেবাগুলি কী ধরনের পরিষেবা? বিজ্ঞাপন সংস্থার পরিষেবার আবশ্যিক মান এই রকম—

১. **যে পণ্য বা পরিষেবার বিজ্ঞাপন করা হবে, সেই জিনিষটি সম্বন্ধে সম্যক গবেষণা করা।** পরীক্ষা করতে হয়, জিনিসটি বা পরিষেবা কীরকম? বিজ্ঞাপনের বার্তা নির্বাচন করার জন্য জানা প্রয়োজন জিনিসটির কী কী সুবিধা এবং অসুবিধা আছে? প্রতিযোগী, অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচার করতে হবে। মুখ্য সূত্র (primary) এবং মাধ্যমিক (secondary) সূত্র থেকে গবেষণা করে সব জ্ঞাতব্য তথ্য বিজ্ঞাপন সংস্থাকে সংগ্রহ করতে হয়, বিজ্ঞাপনদাতার বিজ্ঞাপনের কার্যসূচী নির্ধারিত করার জন্য।

২. **বর্তমানের বাজার এবং ভবিষ্যতের বাজার সম্বন্ধে গবেষণা করা।** যে জিনিসটির বিজ্ঞাপন করা হচ্ছে, সেটি বর্তমানে কারা কিনছেন এবং ব্যবহার করছেন? ভবিষ্যতে কারা একটি ব্যবহার করতে পারেন? এই ব্যবহারকারী বা গ্রাহকরা কারা? কী ধরনের গ্রাহক? ভৌগোলিক অঞ্চল হিসাবে জিনিসটির ব্যবহারের তারতম্য ঘটে কি? অথবা ঋতু বিশেষেও ব্যবহারের পরিবর্তন হয়? এই সব প্রশ্নের উত্তর জানতে হয় বিজ্ঞাপনসংস্থাকে। জানবার জন্য প্রয়োজন গবেষণা, উদ্ভাবনী কৌশল এবং পূর্ব-অভিজ্ঞতা।

৩. **বিজ্ঞাপনদাতার বন্টনব্যবস্থা ভাল করে বোঝা।** কোনো জিনিসের বিজ্ঞাপন করার আগে, বিজ্ঞাপনদাতা জিনিসটি বাজারে বন্টন (distribution) করার জন্য কী কী ব্যবস্থা নিয়েছেন, বিজ্ঞাপন-সংস্থার পক্ষে ভালো করে

জানা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, বন্টন-ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করে জিনিসটির বাজার। ভৌগোলিক বাজার, অর্থাৎ, কোথায় কোথায় পাওয়া যাবে ছাড়াও বন্টনের কৌশলগুলি জানাও বিশেষ প্রয়োজন। এর জন্য বিজ্ঞাপন সংস্থা গ্রাহকদের, দোকানদারের এবং পরিবেশকদের (distribution) সঙ্গে সাক্ষাৎকার করে তথ্য সংগ্রহ করেন।

৪. **মাধ্যম সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান।** বিজ্ঞাপিত জিনিস এবং পরিষেবার সংবাদ, কম খরচে, কার্যকরীভাবে, গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কতরকম মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য বিজ্ঞাপন-সংস্থাকে জানতে হয়। এই তথ্য কেবল সংখ্যার হিসাব, ভৌগোলিক হিসাব, বা বিজ্ঞাপনের মূল্যের হিসাব হলেই হয় না। প্রতিটি মাধ্যমের বিশেষ চরিত্র, আধিপত্য এবং ঐ মাধ্যমের গ্রাহকদের 'মোটামুটি' একটি চিত্র (profile) জানতে হয়। যে গ্রাহককে উদ্দেশ্য করে বিজ্ঞাপন করা হবে, বিজ্ঞাপন-সংস্থা প্রথমে সেই গ্রাহককে চিহ্নিত করেন। তারপরে বিচার করে দেখেন, ঐ চিহ্নিত গ্রাহকদের কাছে কোন কোন মাধ্যমের সাহায্যে, কত কম খরচে, বিজ্ঞাপনটি পৌঁছে দেওয়া যাবে।

৫. **বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনা বিধিবদ্ধ করা।** বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনা আসলে রণ-কৌশল, যা বিজ্ঞাপন সংস্থা বিধিবদ্ধ ক'রে তাঁদের খরিদ্দার বিজ্ঞাপনদাতা বা মক্কেলকে দিয়ে থাকেন। আলোচিত প্রথম চারটি পরিষেবার বিভিন্ন মান যথাযথভাবে অনুসরণ করে উল্লেখ করা হয় এই বিধিবদ্ধ পরিকল্পনার প্রথম অংশে। দ্বিতীয় অংশে থাকে, বিভিন্ন সুপারিশ এইসব বিষয়ে — কোন কোন বাজারে বিজ্ঞাপন পৌঁছতে হবে, বন্টন ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন প্রয়োজন কী না, জিনিসের দাম এবং বিক্রির উপর যে কমিশন দোকানিকে দেওয়া হয়, তার কোনো পরিবর্তন আবশ্যক কী না, কোন কোন মাধ্যম প্রণালি ব্যবহার করা হবে, বিজ্ঞাপনের মূল আবেদন কী হবে, বিজ্ঞাপনের বার্তা কীরকম হবে ইত্যাদি। এই পরিকল্পনা দাখিলের পরে বিজ্ঞাপনদাতা মক্কেলকে পরিকল্পনা অনুমোদন করতে হয়। মক্কেলের অনুমোদন পেলে, বিজ্ঞাপন সংস্থা পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যবস্থা করেন।

৬. **পরিকল্পনা রূপায়ণ।** পরিকল্পনার অনুমোদন পেলে বিজ্ঞাপন-সংস্থা অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী, বিজ্ঞাপন তৈরি করেন। বিভিন্ন মাধ্যমের সঙ্গে প্রয়োজনীয় জায়গা বা সময় ব্যবহার করার জন্য চুক্তি করেন, এবং মাধ্যমের প্রয়োজন অনুসারে বিজ্ঞাপন প্রচারের উপযুক্ত উপকরণ পাঠান। তারপরে, নজর রাখেন, নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী বিজ্ঞাপনটি প্রচারিত হচ্ছে কী না। তারপরে, পরিষেবার জন্য মক্কেলকে বিল দাখিল করা, এবং টাকা আদায় করা। এইভাবে পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়ণ সহজে হয় না। সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর নজর রেখে, সামরিক অভিযানের মতই এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপান্তরিত হয়।

২.৪ বিজ্ঞাপন সংস্থার পরিসম্পৎ

যে কোনো সংস্থার পরিসম্পৎ (assets) হিসাব করা হয় সংস্থার অধিকৃত জমি, কারখানা, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, কাঁচা মাল এবং উৎপাদিত জিনিসের অর্থমূল্যের মোট যোগফল ধরে। বিজ্ঞাপন-সংস্থার পরিসম্পৎ হিসাব করা কঠিন। কারণ বিজ্ঞাপন সংস্থার পরিসম্পৎ বলতে বোঝায়, বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা। বিজ্ঞাপন সংস্থা তাঁদের মক্কেলদের যোগান দেন — দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন সৃষ্টিশীল ধারণা, উৎসাহ-আগ্রহ এবং অভিজ্ঞতা। যে বিশেষজ্ঞের দল বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করেন, তাঁরাই এই সব পরিষেবার যোগান দেন। সেই জন্য, বিজ্ঞাপন সংস্থায় কর্মরত বিশেষজ্ঞদেরই বিজ্ঞাপন সংস্থার পরিসম্পৎ হিসাবে গণনা

করা হয়। বিভিন্ন বিজ্ঞাপন সংস্থার পার্থক্য বিচার করা হয়, কী ধরনের বিশেষজ্ঞ কোন বিজ্ঞাপন-সংস্থার কাজ করেন, — তার উপর। নতুন মক্কেল ধরার জন্য এবং বর্তমান মক্কেলদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য বিজ্ঞাপন-সংস্থা তাঁদের কর্মরত বিশেষজ্ঞদেরই মক্কেলদের কাছে পরিসম্পৎ হিসাবে উপস্থাপন করেন।

বিজ্ঞাপন সংস্থার সংঘটন চিত্র

এবারে দেখা যাক, বিজ্ঞাপন সংস্থার সংঘটন চিত্র (organisation chart) কীরকম। সাধারণত বড় বিজ্ঞাপনসংস্থা, যাদের সবরকম পরিষেবার ব্যবস্থা আছে, তাদের সংঘটন-চিত্র এই রকম।

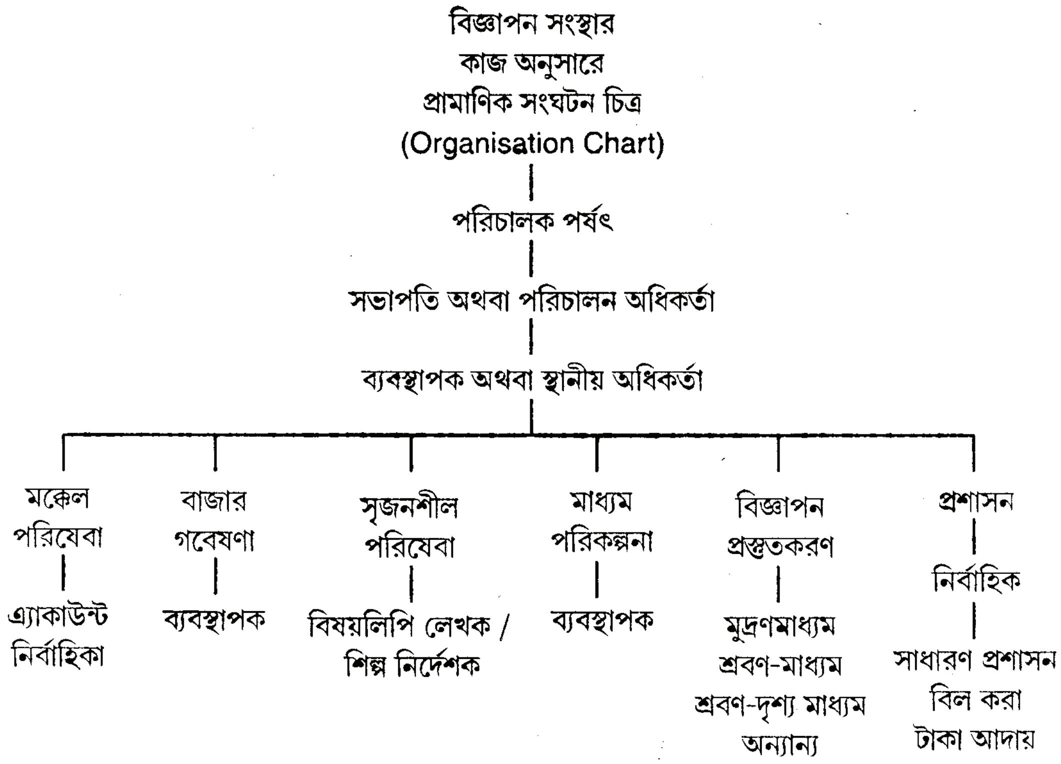

২.৫ বিজ্ঞাপন সংস্থার পরিষেবা

বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্ম আলোচনা করার আগে দুটি বিষয় জানা দরকার।

১। বিজ্ঞাপন-সংস্থা যে সব বিজ্ঞাপনদাতার বিজ্ঞাপন করেন, সেই সব খরিদ্দার, বিজ্ঞাপনদাতা বা মক্কেলকে বলা হয় "অ্যাকাউন্ট"। মনে রাখতে হবে, সমস্ত কোম্পানিতেই হিসাব-নিকাশ দেখার জন্য যে বিভাগ থাকে, সেই বিভাগের নাম হয় —অ্যাকাউন্ট বিভাগ। এই বিভাগে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের অ্যাকাউন্টেন্সির বিভিন্ন জ্ঞান থাকা প্রয়োজন হয়।

কিন্তু বিজ্ঞাপন সংস্থায়, অ্যাকাউন্ট বলতে বোঝায় বিজ্ঞাপনদাতা মক্কেলদের। এই অ্যাকাউন্ট কখনো একটি কোম্পানি বা সংস্থা হতে পারে, আবার কখনো একটি সংস্থার একটি জিনিসও হতে পারে। হিন্দুস্থান লিভার-এর বিভিন্ন সামগ্রীর বিজ্ঞাপনের কাজ ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞাপন সংস্থা করেন। যেমন কোনো সংস্থা লাক্স-এর বিজ্ঞাপন করেন আবার অন্য একটি সংস্থা লিরিল-এর বিজ্ঞাপন করেন। এক্ষেত্রে ঐ বিজ্ঞাপন-সংস্থার কাছে "লাক্স" একটি অ্যাকাউন্ট এবং অপর সংস্থাটির কাছে "লিরিল" একটি অ্যাকাউন্ট।

২। **বিজ্ঞাপন সংস্থার পরিষেবা কী বিনামূল্যে?**

হ্যাঁ। বিজ্ঞাপনদাতাকে বিজ্ঞাপন-সংস্থার পরিষেবার জন্য আলাদা কোনো টাকা দিতে হয় না। ধরা যাক, একটি বিজ্ঞাপন, কোনো সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে, ঐ সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের রেট অনুযায়ী তার খরচ — পঞ্চাশ হাজার টাকা। বিজ্ঞাপনদাতা যদি নিজে সরাসরি সংবাদপত্রে ঐ বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করেন, — তাঁর খরচ হবে — পঞ্চাশ হাজার টাকা। ঐ এক মাপের একই বিজ্ঞাপন যদি বিজ্ঞাপনদাতা তাঁর নিযুক্ত বিজ্ঞাপন সংস্থাকে প্রকাশ করার জন্য বলেন, তাহলেও তাঁর খরচ হবে একই, অর্থাৎ সংবাদপত্রটির বিজ্ঞাপনের রেট হিসাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা। বিজ্ঞাপন সংস্থার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলে, বেশি টাকা লাগে না। অর্থাৎ, বিজ্ঞাপন-সংস্থার পরিষেবা বিজ্ঞাপনদাতা বিনামূল্যে পান। তবে বিজ্ঞাপনটি তৈরির খরচ বিজ্ঞাপনদাতাকে বহন করতে হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিজ্ঞাপন সংস্থার আয়ের উৎস কী? বিজ্ঞাপন সংস্থা বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারিত বিজ্ঞাপনের খরচের শতকরা ১৫% শতাংশ কমিশন পান, মাধ্যমের কাছ থেকে। সংবাদপত্র, পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, আউটডোর, সমস্ত মাধ্যমই বিজ্ঞাপন সংস্থাকে, তাঁদের প্রচারিত বিজ্ঞাপনের মোট খরচের উপর শতকরা ১৫% কমিশন দেন। ভারতের সকল মাধ্যমই এই প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করেন। সারা পৃথিবীর বিজ্ঞাপন-জগতে এই একই প্রথা মেনে চলা হয়।

২.৫.১ অ্যাকাউন্ট পরিষেবা (মক্কেল পরিষেবা)

বিজ্ঞাপন-সংস্থায় যে নির্বাহিক (Executive) বিভিন্ন এ্যাকাউন্ট (বিজ্ঞাপনদাতা মক্কেল বা খরিদ্দার)-এর সঙ্গে সংস্থার যোগাযোগ এবং সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন, তাঁর পদের নাম — এ্যাকাউন্ট নির্বাহিক (Account Executive)। এ্যাকাউন্ট নির্বাহিকের প্রধান কাজ, বিজ্ঞাপনদাতা মক্কেলের তৈরি জিনিস, বাজারের অবস্থা এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বন্ধে তাঁর বিজ্ঞাপন-সংস্থার বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পর্যাপ্ত আলোচনার দ্বারা বিজ্ঞাপন-সংস্থার সকলকে ওয়াকিবহাল রাখা। কার্যকরী সৃজনশীলতা এবং মাধ্যম বিষয়ের সবকিছুর উপর সম্যক দখল থাকা ব্যতিরেকে বিপণন সম্বন্ধে বিশেষ দক্ষতা (expertise) থাকা এ্যাকাউন্ট নির্বাহিকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। আরো প্রয়োজন, বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থার শিল্প, বাজার এবং তৈরি জিনিস সম্বন্ধে গভীরভাবে জানা। এইরকম পটভূমি থাকলে তবেই একজন এ্যাকাউন্ট নির্বাহিক বিজ্ঞাপনদাতার জিনিসের বিপণন পরিকল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে, বাজারের বর্তমান পরিমণ্ডলে এবং প্রতিযোগীদের বিভিন্ন কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞাপন-সংস্থার

কার্যকরী ভূমিকা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে আলোচনা করতে পারবেন। বিজ্ঞাপন সংস্থা যে বিজ্ঞাপন-পরিকল্পনা রচনা করেন, আসলে সেটি নির্ধারণ, পরিকল্পনা এবং কাজে রূপায়িত করেন এ্যাকাউন্ট একসিকিউটিভ।

বিজ্ঞাপন প্রচার অভিযানের লক্ষ্য নির্ধারণে এ্যাকাউন্ট একজিকিউটিভের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে।

বিজ্ঞাপনদাতার কাছে এ্যাকাউন্ট একজিকিউটিভ বিজ্ঞাপন সংস্থার প্রতিনিধি, সংস্থার সৃজনশীলতা এবং অন্যান্য বিষয়ে দক্ষতার সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনদাতাকে ওয়াকিবহাল করেন। আবার তাঁর নিজের বিজ্ঞাপন-সংস্থায় তিনি গণ্য হন বিজ্ঞাপনদাতার প্রতিনিধি হিসাবে। তাঁর মাধ্যমেই সংস্থার বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভাগ বিজ্ঞাপনদাতার তৈরি জিনিস, জিনিসটির বাজার এবং অন্যান্য প্রতিযোগীর সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জানতে পারেন, যাতে বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হয়।

মাঝারি বা ছোটো আকারের বিজ্ঞাপন সংস্থায় এ্যাকাউন্ট নির্বাহিক বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি (copy) রচনার কাজও করেন। কারণ, ছোটো বা মাঝারি বিজ্ঞাপন-সংস্থার পক্ষে পৃথক বিষয়লিপি লেখক (copy writer) রাখা সব সময় সম্ভব না-ও হতে পারে।

এ্যাকাউন্ট নির্বাহিকের বর্তমান মক্কেলদের পরিষেবার যথাযথ ব্যবস্থাপনা ব্যতীত আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকে। সেই কাজ হল — বিজ্ঞাপন সংস্থার জন্য নতুন বিজ্ঞাপনদাতা মক্কেল ধরা। এই হিসাবে দেখতে গেলে, যে কোনো বিজ্ঞাপন সংস্থার পক্ষে তাঁদের বিজ্ঞাপনদাতা মক্কেল সংশ্লিষ্ট সবকিছু, অর্থাৎ সংস্থার ব্যবসায়িক দিকের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে, সংস্থার আকার হিসাবে, এক বা একাধিক এ্যাকাউন্ট নির্বাহিকের উপরে। সেই জন্যই যে কোন বিজ্ঞাপন সংস্থায় এ্যাকাউন্ট নির্বাহিকরাই সর্বোচ্চ বেতন এবং অন্যান্য সুবিধা পেয়ে থাকেন।

যে কোনো বিজ্ঞাপন সংস্থার পক্ষেই নতুন মক্কেল ধরা বা নতুন বিজ্ঞাপনদাতার ব্যবসা জোগাড় করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, প্রতি বছরই, কোনো কোনো বিজ্ঞাপনদাতা তাঁদের বিজ্ঞাপনের কাজ এক সংস্থা থেকে অন্য সংস্থায়, নানা কারণে, সরিয়ে নিয়ে যান। তাছাড়া, বাজার বা শিল্প-সংক্রান্ত নানা কারণে, কোনো বিজ্ঞাপনদাতা তাঁদের বিজ্ঞাপনের খরচ কমিয়ে ফেলতে বাধ্য হতে পারেন। এই সকল কারণে, বিজ্ঞাপন সংস্থার কাজ এবং সেই অনুপাতে আয় কমে যেতে পারে। সেই কারণে, বিজ্ঞাপন সংস্থা সর্বদাই নতুন বিজ্ঞাপনদাতা মক্কেলের সন্ধানে থাকেন।

এ্যাকাউন্ট নির্বাহিকদের বিভিন্ন রকমের পদ হতে পারে, বিজ্ঞাপন সংস্থার আকার এবং কাজের অনুপাতে। কয়েকটি এ্যাকাউন্টের একটি গ্রুপের দায়িত্বে যে নির্বাহিক থাকেন, তাঁকে বলা হয় — গ্রুপ ডাইরেকটর বা গ্রুপ হেড। তাঁর অধীনে থাকেন, এই পর্যায়ে — এ্যাকাউন্ট সুপারভাইজার, সিনিয়র এ্যাকাউন্ট একজিকিউটিভ, এ্যাকাউন্ট একজিকিউটিভ, এ্যাসিস্ট্যান্ট এ্যাকাউন্ট একজিকিউটিভ এবং ট্রেইনী (শিক্ষানবীশ)।

২.৫.২ সৃজনশীল পরিষেবা

কোন বিজ্ঞাপন-সংস্থার সৃজনশীল পরিষেবা বলতে বোঝায় বিজ্ঞাপনের সৃজনশীল কৌশল নির্ধারণ করা। বিজ্ঞাপন অভিযানের মূল নীতি নির্দেশ স্থির করা, যার দ্বারা সাধারণভাবে বিজ্ঞাপনের বার্তা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়। সৃজনশীল বিভাগে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের মূল দায়িত্ব বিজ্ঞাপনটি সৃষ্টি, অর্থাৎ তৈরি করা,

এবং তারপরে, বিজ্ঞাপনটি প্রচারের যেমন মুদ্রণ, রেডিও বা টেলিভিশনের উপযুক্ত উপকরণ তৈরি করার সময় সজাগ দৃষ্টি রাখা।

বিজ্ঞাপন সংস্থার সৃজনশীল বিভাগে থাকেন বিষয়লিপি লেখক (copy writer) এবং শিল্প নির্দেশক। বিজ্ঞাপনদাতা মক্কেল বিজ্ঞাপন-সংস্থার এ্যাকাউন্ট নির্বাহিকের মাধ্যমে যে সব তথ্য সরবরাহ করেন, তার উপর ভিত্তি করেই বিজ্ঞাপন সংস্থার সৃজনশীল বিভাগ বিজ্ঞাপনদাতার বিজ্ঞাপন প্রস্তুত করেন।

বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি লেখকের কাজ বিজ্ঞাপন সৃষ্টি করা। এখানে মনে রাখা দরকার, বিষয়লিপি লেখা যাঁর কাজ তাঁর কাজ শুধুই কেবল লেখা নয়। বিষয়লিপি লেখকই বিজ্ঞাপনের বিষয়, আইডিয়া নির্বাচন করেন, তার সঙ্গে, বিজ্ঞাপনটি কীভাবে উপস্থাপিত করা হবে, অর্থাৎ তার দৃশ্যগ্রাহ্য বা শ্রবণগ্রাহ্য দিকগুলিও নির্বাচিত করেন। পুরো বিজ্ঞাপনটি তাঁর কল্পনাপ্রসূত। সঙ্গে সঙ্গে লেখার কাজটিতো রয়েছেই। বিষয়লিপি লেখকের কাজের জন্য প্রয়োজন ভাষার উপরে দখল, যে কোনো জিনিস বা বিষয়ে লিখতে পারার ক্ষমতা এবং সৃজনশীল মন, যে মন নতুন নতুন ধারণা (idea) এবং বিজ্ঞাপন সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। এই বিভাগেও প্রথমে শিক্ষানবীশ হিসাবে কাজ শুরু করে ধাপে ধাপে উপরে উঠতে হয়। যথার্থ সৃজনশীল বিষয়লিপি লেখকের চাহিদা বিজ্ঞাপন শিল্পে রয়েছে। যার ফলে প্রায়ই দেখা যায় কোনো বিষয়লিপি লেখক একটি বিজ্ঞাপন-সংস্থা ছেড়ে অন্যত্র যোগদান করছেন।

বিজ্ঞাপন-সংস্থার শিল্প বিভাগ-এ (art department) কাজ করেন শিল্পীরা। চারুকলা (Fine arts) অথবা বাণিজ্যিক কলায় (Commercial art) বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীরা বিষয়লিপি লেখকের ধারণা, সূত্র এবং লেখা অনুযায়ী, বিজ্ঞাপনের ধারণা বা কল্পনাকে দৃষ্টিগোচরে (visualize) নিয়ে আসেন। এই জন্যই, অর্থাৎ কল্পনায়, মানশচক্ষে দেখা বিজ্ঞাপনটি কাগজের উপরে অঙ্কন করেন বলেই, তাঁদের আর এক নাম ভিসুয়ালাইজার (visualizer)।

বিষয়লিপি লেখকের কাছে ধারণাটি বুঝে নিয়ে, কীরকম আবেদন ফুটিয়ে তুলতে হবে, কোন কোন আবেগ কে কাজে লাগাতে হবে জেনে নিয়ে, চিত্রশিল্পের নান্দনিক উপস্থাপনার কৌশলের সাহায্যে তাঁরা বিজ্ঞাপনটি সৃষ্টি করেন। প্রকৃতপক্ষে যে কোন বিজ্ঞাপনই বিষয়লিপি লেখক এবং শিল্পীর যুগলবন্দী।

যে শিল্পীরা বিজ্ঞাপন-সংস্থার শিল্প-বিভাগে কাজ করেন, তাঁদের কেবল চিত্রশিল্পের দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা থাকাই যথেষ্ট নয়। তাঁদের বিজ্ঞাপনের চিত্ররেখা (layout) সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান-থাকা অবশ্য প্রয়োজন। সেই সঙ্গে প্রয়োজন মুদ্রাক্ষর-বিদ্যা (typography) সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান। বিভিন্ন মাপের এবং ধরনের অক্ষর বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে এবং বিভিন্ন চরিত্রের অধিকারী। কোন জিনিসের কী ধরনের বিজ্ঞাপনে কীরকম হরফ ব্যবহার করা হবে, তার কতকগুলি বিজ্ঞানসম্মত ধারণা আছে। যে জিনিসের বিজ্ঞাপন হচ্ছে, যে গ্রাহকদের জন্য বিজ্ঞাপন হচ্ছে এবং বিজ্ঞাপিত জিনিসের ব্যবহার, সবকিছুর সঙ্গে চরিত্র এবং ছন্দ মিলিয়ে ঠিক ঠিক চেহারার এবং মাপের হরফ ব্যবহার না করলে, বিজ্ঞাপনের আবেদন দুর্বল বা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে। আবার বিভিন্ন জিনিসের

বিজ্ঞাপনে বিভিন্ন রঙের আবেদনও নিপুণভাবে ব্যবহার করতে হয়। না পারলে, বিজ্ঞাপনের আবেদন বিঘ্নিত হয়। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন আবেদন আছে। রঙের সেই আবেদন যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হয়। শিল্প বিভাগের প্রধান হন শিল্প নির্দেশক (art director)। সংস্থার আকার অনুযায়ী তাঁর অধীনে ভিসুয়ালাইজার শিল্পী এবং শিক্ষানবীশরা কাজ করেন। মনে রাখতে হবে, এই সব শিল্পীদের মূলকাজ বিজ্ঞাপনের চিত্ররেখা (layout) তৈরি করা। এই চিত্ররেখা বিজ্ঞাপনদাতা মক্কেল অনুমোদন করলে তখন বিজ্ঞাপনটির চূড়ান্ত শিল্পরূপ (final artwork) তৈরি করা হয়। এই চূড়ান্ত শিল্পরূপই প্রকাশিতব্য বিজ্ঞাপনের হুবহু প্রতিরূপ। সাধারণত অন্যান্য শিল্পীরা, যাঁরা চূড়ান্ত শিল্প-রূপ তৈরির কাজে দক্ষ, তাঁরাই নির্বাচিত যা অনুমোদিত চিত্ররেখা অনুসারে, বিজ্ঞাপনটিকে চূড়ান্ত রূপ দেন। কোন বিজ্ঞাপনে যদি বিভিন্ন মডেলের ব্যবহার প্রয়োজন হয়, এবং তার জন্য বিশেষ ফটো তোলার ব্যবস্থা করতে হয়, সেই কাজের ব্যবস্থাপনায় থাকেন শিল্প-বিভাগের শিল্পী। এই শিল্পীদের শ্রবণ-দৃশ্য (audio-visual) বিজ্ঞাপনের প্রস্তুতি সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই শিল্পীদের আঁকা কাহিনীক্রমচিত্র (story board) অনুসারেই শর্ট ফিলম বা টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনের চিত্রগ্রহণ (shooting) এবং সম্পাদনা করা (editing) হয়। এই সব বিষয়ে সম্যক জ্ঞান না থাকলে, কাহিনীক্রমচিত্র (story board) তৈরি করা কঠিন। তাছাড়া, চিত্রগ্রহণ বা সম্পাদনার সময়ও সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

২.৫.৩ মাধ্যম পরিকল্পনা

বিজ্ঞাপনের অভীষ্ট লক্ষ্য স্থির হয়ে গেলে এবং সৃজনশীল কৌশল সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হলে, মাধ্যম পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়ে যায়। যাঁরা মাধ্যম পরিকল্পনা করেন তাঁদের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক — বাজেট। বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞাপনের বাজেট স্থির করা হয়, সঙ্গে সঙ্গেই স্থির হয়ে যায় কোন কোন অভীষ্ট গ্রাহকদের (target audience) উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপনটি করা হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, সৃজনশীল কৌশলের সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন মাধ্যমে বিজ্ঞাপনটি প্রচারিত হবে সেই বিষয়েও সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। ফলত যাঁরা মাধ্যম পরিকল্পনা করেন, তাঁদের কাজ আরো কঠিন হয়ে পড়ে। এই সব সীমাবদ্ধতার মধ্যে মাধ্যম কল্পনা করতে হয়, যাতে সবচেয়ে বেশি ফলদায়ক খরচে (cost effective) চিহ্নিত গ্রাহকদের কাছে বিজ্ঞাপন পৌঁছানো যায়। এর জন্য মাধ্যম বিভাগে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের মাধ্যম সংক্রান্ত সব-রকম পরিসংখ্যান জানা প্রয়োজন। মাধ্যমের প্রচার সংখ্যা, ভৌগোলিক প্রচারের সীমা ও বিস্তৃতি, গ্রাহকদের জীবনযাপনের চিত্র এবং বিজ্ঞাপনের হার (rate)। সারা দেশ ব্যাপী বিভিন্ন সংবাদপত্র, পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন চ্যানেল, সিনেমা হল, হোর্ডিং-এর সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্যই মাধ্যমবিভাগের সংগ্রহে থাকে। এবং যেহেতু বিভিন্ন মাধ্যমের তথ্যাবলী এবং বিজ্ঞাপনের হার কিছুদিন অন্তর অবশ্যম্ভাবীভাবে পরিবর্তিত হয়, এই সব পরিবর্তনের সর্বশেষ তথ্যও মাধ্যম বিভাগের সংগ্রহে রাখা প্রয়োজন। তা না হলে, ভুল তথ্যের উপর ভিত্তি করে মাধ্যম পরিকল্পনার ফলে, বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা কার্যকরী হবে না। ত্রুটিযুক্ত হবে '

২.৫.৪ বাজার গবেষণা

বিজ্ঞাপন-সংস্থার বাজার গবেষণা বিভাগ, বিজ্ঞাপনদাতার জন্য, যে জিনিসটির বিজ্ঞাপন করা হবে, সেটির বিষয়ে বাজারে গবেষণা করে বিভিন্ন তথ্য আহরণ করেন। জিনিসটি কেমন, বাজারে, এবং গ্রাহকদের কাছে জিনিসটির অবস্থান কী, জিনিসটির প্রতিযোগী কারা এবং সেই প্রতিযোগীদের বাজারে অবস্থান কোথায়? বিশেষভাবে গবেষণা করা হয় জিনিসটির গ্রাহকদের সম্বন্ধে। কী ধরনের ব্যবহারকারীরা জিনিসটি ব্যবহার করেন। তাঁদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত এবং ভৌগোলিক বৃত্তান্ত। ব্যবহারকারীরা পুরুষ না মহিলা। কোন কোন বয়সের ব্যবহারকারীরা জিনিসটি ব্যবহার করবেন। সর্বোপরি কোন মাধ্যমের সাহায্যে ঐ নির্দিষ্ট গ্রাহকদের কাছে বিজ্ঞাপন পৌঁছে দেওয়া যাবে।

এই বিভাগে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের পরিসংখ্যান এবং সমাজবিদ্যায় বিশেষ প্রশিক্ষণ থাকা একান্ত প্রয়োজন। বিশ্লেষণমূলক কাজে উৎসাহী হওয়া প্রয়োজন। আধুনিক গবেষণা বা রিসার্চের নানা কলাকৌশল জানা না থাকলে এই বিভাগে কাজ করা সম্ভব নয়। আর, সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে কৌতূহল থাকা বিশেষ জরুরি। বড়ো বিজ্ঞাপন সংস্থা ব্যতীত অন্যান্য সংস্থার পক্ষে নিজস্ব গবেষণা বিভাগ রাখা সম্ভব হয় না। তাঁরা বাইরের বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা (research unit) কে দিয়ে নিজেদের প্রয়োজনমত গবেষণা করিয়ে নেন। বহু ছোটো ছোটো গোষ্ঠী এই ধরনের গবেষণার কাজ করেন এবং তাঁদের পরিষেবা বিভিন্ন বিজ্ঞাপন-সংস্থা এবং বিজ্ঞাপনদাতা, প্রয়োজনমত কাজে লাগান।

২.৫.৫ বিজ্ঞাপন প্রস্তুতকরণ ঃ প্রোডাকশন

সৃজনশীল বিভাগ মুদ্রণমাধ্যমের জন্য বিভিন্ন বিজ্ঞাপন তৈরি করেন, মাধ্যম বিভাগ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন মাপ অনুযায়ী। তারপরে সেই বিজ্ঞাপন যাতে বিভিন্ন মাধ্যমে, বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন মাপে প্রকাশ করা সুগম হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরি করেন এই বিভাগ। মাধ্যম বিভাগ বিভিন্ন মাধ্যমের কাছে এই সব উপকরণ পাঠিয়ে দেন প্রকাশের সূচী অনুযায়ী। তবেই বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। বিজ্ঞাপনদাতার জন্য পোস্টার বা অন্যান্য মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনা থাকলে সেগুলিও মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন এই প্রোডাকশন বিভাগ। বিভিন্ন সিনেমা হল-এ যে সব বিজ্ঞাপনের স্লাইড দেখানো হয়, সেগুলিও প্রস্তুত করেন প্রোডাকশন বিভাগ।

এই চারটি বিশেষ পরিষেবার জন্য বিজ্ঞাপন-সংস্থায় চারটি আলাদা আলাদা বিভাগ থাকে। এছাড়া থাকে সাধারণ বিলিং বিভাগ, যাঁরা বিভিন্ন কাজ এবং বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপনদাতার জন্য বিল তৈরি করেন, দাখিল করেন এবং বিলের টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করেন। যে কোনো সংস্থার মতো বিজ্ঞাপন-সংস্থায়ও প্রশাসনিক বিভাগ থাকে।

জনসংযোগ পরিষেবা

বিদেশে বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলি তাঁদের বিজ্ঞাপনদাতাদের জন-সংযোগ বিষয়েও পরামর্শ দেন এবং তাঁদের জন-সংযোগের কাজও করে থাকেন।

ইদানীং ভারতেও কোনো কোনো বড়ো বিজ্ঞাপন সংস্থা জন-সংযোগ পরিষেবারও সংগঠন তৈরি করেছেন। এই বিভাগে সাধারণত জন-সংযোগ বিশেষজ্ঞরাই কাজ করেন। তাঁরা বিভিন্ন বিজ্ঞাপনদাতা মক্কেলের প্রয়োজন অনুসারে জন-সংযোগের কর্মসূচী প্রস্তুত করেন এবং মক্কেলের অনুমোদন পেলে, সেই কর্মসূচী রূপায়ণ করেন।

তবে খুব অল্প-সংখ্যক বিজ্ঞাপন-সংস্থাই জন-সংযোগ পরিষেবার ব্যবস্থা করেছেন। এই কাজের জন্য সাধারণত কাজের গুরুত্ব এবং প্রসার অনুযায়ী পারিশ্রমিক বিজ্ঞাপনদাতা দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য যেমন নির্দিষ্ট কমিশনের ব্যবস্থা আছে; জন-সংযোগের কাজের ক্ষেত্রে সেরকম কোনো নির্দিষ্ট আয়ের ব্যবস্থা নেই। বিভিন্ন সংস্থা তাঁদের সুনাম, কাজের গুরুত্ব, প্রসার এবং সময়সীমার হিসাবে এই পরিষেবার পারিশ্রমিক ধার্য করে থাকেন।

২.৬ বিজ্ঞাপন সংস্থার প্রয়োজন কেন?

কোনো বিজ্ঞাপনদাতা যদি সিদ্ধান্ত করেন যে তাঁদের বিজ্ঞাপন, কোম্পানির নিজের বিজ্ঞাপন বিভাগ দ্বারাই তৈরি করবেন এবং তাঁদের দ্বারাই বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন, তাহলে, আপাতদৃষ্টিতে বলার কিছু নেই। তবে বিষয়টি নিয়ে ভালো করে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে, বিজ্ঞাপনদাতাকে একটি বিজ্ঞাপন বিভাগের ব্যয়ভার বহন করতে হবে। কারণ, বিজ্ঞাপন সংস্থার পরিষেবা গ্রহণ না করলে, বিষয়লিপি, শিল্প, মাধ্যম পরিকল্পনা, প্রোডাকশন এবং গবেষণা সব রকম কাজের ব্যবস্থাই করতে হবে বিজ্ঞাপন বিভাগকে। তার জন্য নানারকম কাজের বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে। বিজ্ঞাপন-বিভাগের অফিসার ও কর্মীসংখ্যা অনেক বাড়াতে হবে। বিজ্ঞাপনদাতাকে এই বিশাল বিজ্ঞাপন বিভাগের বিপুল-সংখ্যক কর্মীর ব্যয়ভার এবং অন্যান্য দায়দায়িত্ব বহন করতে হবে।

বিজ্ঞাপন দাতা তাঁদের নিযুক্ত বিজ্ঞাপন-সংস্থার পরিষেবা বিনামূল্যে পেয়ে থাকেন। অর্থাৎ বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা, বাজার গবেষণা, মাধ্যম নির্বাচন এসবই এজেন্সি বিনামূল্যে মক্কেলকে দিয়ে থাকেন। সরাসরি মাধ্যমের দ্বারা বিজ্ঞাপন প্রচার করলে একই খরচ পড়বে, বরং বিজ্ঞাপনদাতাকে সরাসরি বিজ্ঞাপন দিতে গেলে বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়। কিন্তু বিজ্ঞাপন সংস্থার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে বিজ্ঞাপনদাতা কে ষাট দিনের মধ্যে টাকা দিতে হবে। অর্থাৎ বিজ্ঞাপনদাতা ষাট দিনের জন্য দেয় টাকা বকেয়া রাখতে পারেন। এসব কারণে এজেন্সির মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়াই বিজ্ঞাপনদাতার পক্ষে লাভজনক।

বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলি দীর্ঘদিন বিভিন্ন বিজ্ঞাপন এবং বিপণন সমস্যার মোকাবিলা করেছে এবং সেই বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এছাড়াও নানা বৈচিত্র্যের পণ্য ও পরিষেবার বিজ্ঞাপনের অভিজ্ঞতা এই সব সংস্থার আছে। বিভিন্ন মাধ্যম, গবেষণা এবং বিজ্ঞাপনের অন্যান্য বিষয়েও বিজ্ঞাপন-সংস্থার বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকে। একটি মাঝারি বা বড়ো মাপের বিজ্ঞাপন সংস্থার অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য সংগ্রহ করা কোনো বিজ্ঞাপনদাতার পক্ষেই সম্ভব নয়। কোনো একটি জিনিসের বিপণন এবং বিজ্ঞাপন করার অভিজ্ঞতা অনেক সময়েই আরেকটি জিনিস বা পরিষেবার বিজ্ঞাপন তৈরিতে বিশেষভাবে কাজে লাগে।

কোনো বিজ্ঞাপনদাতা নিজেরাই তাঁদের বিজ্ঞাপনের কাজ করলে, সংস্থার বাইরের জগতের নিরপেক্ষ দৃষ্টি এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার সহায়তা থেকে বঞ্চিত হবেন। বিজ্ঞাপন-সংস্থার নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি যে কোনো বিজ্ঞাপনদাতার যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশেষ সহায়ক হয়। বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থার বাইরের বিশেষজ্ঞদের নিরপেক্ষ মতামতই বিজ্ঞাপন সংস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকরী ভূমিকা।

পঞ্চাশ বছর আগের বিজ্ঞাপন। হাতে আঁকা চিত্রের ব্যবহার

পঞ্চাশ বছর আগের বিজ্ঞাপন। হাতে আঁকা। ফটোগ্রাফ ব্যবহার বিশেষ হতো না

আরো একটি বিষয়। প্রত্যেক সংস্থারই কতকগুলি নিজস্ব চিন্তাধারা বা দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। সংস্থার নিজস্ব বিজ্ঞাপন বিভাগের পক্ষে, সংস্থার নিজস্ব চিন্তাধারার এই নির্দিষ্ট গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসা শক্ত। তার ফলে, নিজস্ব বিভাগের তৈরি বিজ্ঞাপন এবং মাধ্যম পরিকল্পনা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ছকের মধ্যে পড়ে যায়। বিজ্ঞাপনের সৃজনশীলতায় সে রকম বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য আসে না। মাধ্যম পরিকল্পনাও ক্রমশ গতানুগতিক হয়ে পড়ে। এর পরে আছে সংস্থার প্রশাসনগত সীমাবদ্ধতা। যে কোনো সংস্থায়, সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় অবধারিত ভাবে এই ভাবনা এসে পড়ে, — সংস্থার চেয়ারম্যান বা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কী রকম সিদ্ধান্ত পছন্দ করবেন অথবা করবেন না। সংস্থার নিজস্ব বিজ্ঞাপন বিভাগও এই মনস্তাত্বিক বেড়াজালের মধ্যে বদ্ধ। বিজ্ঞানসম্মত, সৃজনশীল বিজ্ঞাপন এই মানসিকতা নিয়ে তৈরি করা যায় না।

২.৭ বিজ্ঞাপন-সংস্থা নির্বাচনের মাপকাঠি

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থা তাঁদের বিজ্ঞাপনের কাজের জন্য বিজ্ঞাপন-সংস্থা নির্বাচন করেন, তাঁদের পূর্বতন বিজ্ঞাপন সংস্থাকে অপসরণ করে আরেকটি সংস্থাকে বহাল করার জন্য। বিজ্ঞাপনদাতা কী করে নিশ্চিত হবেন যে নতুন নির্বাচিত সংস্থা তাঁদের পূর্বসূরীর থেকে উন্নত পরিষেবার যোগান দিতে পারবেন? নিশ্চিত হওয়া খুব শক্ত। তবে বিজ্ঞাপন সংস্থা নির্বাচনের কতকগুলি নির্দেশিকা — নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিতে বিশেষ সহায়ক।

বিজ্ঞাপন-সংস্থার বিষয়ে এই মৌলিক প্রশ্নগুলির উত্তর বিজ্ঞাপনদাতাকে জানার চেষ্টা করতে হবে।

১। বিজ্ঞাপন সংস্থাটির সৃজনশীল কাজের মান কীরকম ঃ

তাঁরা অন্যান্য মক্কেলদের জন্য কীরকম সৃজনশীল বিজ্ঞাপন করেছেন তাঁর নমুনা দেখা দরকার। এই সব সৃজনশীল কাজের নমুনা দেখেই হয়তো কোনো বিশেষ সংস্থাকে ডাকা হয়। আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সৃজনশীল কাজের মান ভালো না হওয়ার জন্যই পূর্বতন সংস্থানকে বিদায় জানানো হচ্ছে। সৃজনশীল কাজের নমুনা এবং অভিজ্ঞতাই বিজ্ঞাপন-সংস্থা নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

২। বিজ্ঞাপন-সংস্থাটির দক্ষকর্মী আছেন কিনা ঃ

বিজ্ঞাপন সংস্থা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের সমাহার। তাঁরা বিজ্ঞাপনদাতা মক্কেলদের নানা সৃজনশীল ধারণা (idea)র যোগান দিয়ে থাকেন। সেই কারণে বিজ্ঞাপন-সংস্থাটিতে কীরকম বিশেষজ্ঞ কাজ করেন, তাঁদের প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা, কর্মদক্ষতা, পারদর্শিতা কীরকম এবং বিজ্ঞাপন-শিল্পে তাঁদের সুনাম কেমন, বিজ্ঞাপনদাতা জানতে চেষ্টা করবেন।

৩। অ্যাকাউন্ট নির্বাহিকের ব্যক্তিগত বিশ্বাসযোগ্যতা ঃ

অনেক সময় দেখা যায় বহু সুপরিচিত নামের বিশেষজ্ঞ রয়েছেন দেখে একটি বিজ্ঞাপন সংস্থাকে নির্বাচিত করা হলো। তার পরে, বিজ্ঞাপন সংস্থাটি কোনো সাধারণ মানের, অপেক্ষাকৃত জুনিয়ার কোনো এ্যাকাউন্ট নির্বাহিককে বিজ্ঞানদাতার কাজ দেখাশোনার ভার দিলেন। সেই জন্য বিজ্ঞাপনদাতার উচিত তাঁদের অ্যাকাউন্টের কাজ কারা দেখবেন, — এ্যাকাউন্ট নির্বাহিক, বিষয়লিপি লেখক, শিল্পী এবং অন্যান্যদের সম্বন্ধে ভাল করে

জানা, এবং নির্ধারিত ব্যক্তিরাই যে বিজ্ঞাপনদাতার কাজ দেখবেন, সে বিষয়ে বিজ্ঞাপন-সংস্থার কাছে প্রতিশ্রুতি আদায় করা।

৪। **বিভিন্ন ধরনের কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা ঃ**

বিজ্ঞাপনদাতা যে জিনিস বা পরিষেবার বিজ্ঞাপন করবেন, সেই ধরনের জিনিস বা পরিষেবার বিজ্ঞাপন করার অভিজ্ঞতা থাকলে, সেই বিজ্ঞাপন সংস্থার পক্ষে বিজ্ঞাপনদাতার বিপণনের সমস্যা এবং গ্রাহকদের আকাঙ্ক্ষা এবং চাহিদা বোঝা সহজ হয়। অনেক সময়, বিজ্ঞাপন-সংস্থার পূর্ব-অভিজ্ঞতা বিশেষ কাজে লাগে। ধরা যাক, কোন বিজ্ঞাপন-সংস্থার ''ফেসক্রিম''এর বিজ্ঞাপন করার অভিজ্ঞতা আছে। তাঁদের পক্ষে কোন গায়ে মাখা সাবান বা ''নেল-পালিশ'' এর বিজ্ঞাপন করা সুবিধাজনক হবে এই কারণে যে, তাঁদের এই ধরনের জিনিসের বাজার এবং ব্যবহারকারীদের আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা রয়েছে।

৫। **প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সমান গুরুত্বদান ঃ**

কোনো বড়ো বিজ্ঞাপন সংস্থায় অনেক নামী বিশেষজ্ঞ আছেন এবং বিজ্ঞাপনদাতার জিনিসের সমগোত্রীয় জিনিসের বিজ্ঞাপন করার অভিজ্ঞতা ও রয়েছে, এই সব বিবেচনা করে বিজ্ঞাপন-সংস্থা নির্বাচন করেও বিজ্ঞাপনদাতা সন্তুষ্ট না হতে পারেন। তাঁর অভিজ্ঞতা — ভালো কাজ করা নামী বিজ্ঞাপন-সংস্থা তাঁর কাজকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। এর ফলে বিজ্ঞাপনদাতার আশা ভঙ্গ হয়। কেবল বিশেষজ্ঞদের কাজ এবং নাম বিবেচনা করলেই হবে না। বিচার করতে হবে বিজ্ঞাপন-সংস্থাটি কত বড়ো বড়ো বিজ্ঞাপনদাতার কাজ করে। তাঁদের মোট বিজ্ঞাপনের খরচ যদি এই বিজ্ঞাপনদাতার বিজ্ঞাপনের খরচের তুলনায় অনেক বেশি হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ঐ সংস্থার পক্ষে এই বিজ্ঞাপনদাতাকে ভালো পরিষেবা দেওয়া সম্ভব নয়। ব্যবসার স্বাভাবিক নিয়মেই, যে কোনো বিজ্ঞাপন-সংস্থায়, বিজ্ঞাপনদাতার খরচের অঙ্ক অনুসারে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বড়ো বিজ্ঞাপন সংস্থার পক্ষে যেমন অল্প অঙ্কের বিজ্ঞাপনদাতাকে গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব নয়, তেমনি কোনো ছোটো বিজ্ঞাপন সংস্থার পক্ষে কোনো বড়ো অঙ্কের বিজ্ঞাপনদাতাকে উপযুক্ত পরিষেবা যোগানো সম্ভব নয়। দেখা প্রয়োজন, বিজ্ঞাপন সংস্থাটি যথেষ্ট গুরুত্ব দেবে কিনা, এবং উপযুক্ত পরিষেবার সামর্থ আছে কিনা।

৬। **সম্পূর্ণ পরিষেবা দেবার মত সঙ্গতি ঃ**

বিজ্ঞাপন সংস্থা নির্বাচনের সময় খোঁজ নেওয়া প্রয়োজন, সবরকম পরিষেবার ব্যবস্থা আছে কিনা। সঙ্গে সঙ্গে জানা দরকার বাজার গবেষণা, ইত্যাদির জন্য সংস্থাটি কীরকম পারিশ্রমিক নিয়ে থাকেন। বিজ্ঞাপন দাতার লক্ষ্য হওয়া উচিত — বিজ্ঞাপন সংস্থাটি যেন সবরকম পরিষেবা যোগান দিতে পারে, অর্থাৎ বিজ্ঞাপন-সংক্রান্ত সব কাজ এক জায়গাতে হওয়াই সুবিধাজনক এবং যুক্তিযুক্ত।

৭। **বিজ্ঞাপন-সংস্থার মক্কেল কারা?**

যে বিজ্ঞাপন-সংস্থাকে নির্বাচন করা হচ্ছে, তাঁদের মক্কেল কোন কোন বিজ্ঞাপনদাতা? বিজ্ঞাপন-সংস্থার মক্কেলদের তালিকাই তাদের অবস্থান জানিয়ে দেয়। মক্কেল তালিকায় যদি দেখা যায়, বাজারের নামী কোম্পানি এবং নামী জিনিষ রয়েছে, যিনি নির্বাচন করছেন তিনি অবশ্যই চিন্তা করবেন, এত নামী কোম্পানি এই বিজ্ঞাপন-সংস্থাকে দিয়ে কাজ করাচ্ছেন যখন, — এঁদের পরিষেবা নিশ্চয় উচ্চমানের। এবার, মক্কেল তালিকায় যদি দেখা যায়, কেবল অল্পপরিচিত, বা অনামী কোম্পানি এবং জিনিস, তাহলে অবশ্যম্ভাবীভাবে বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থার সিদ্ধান্ত অন্যরকম হয়।

৮। **উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞাপনের পূর্ব অভিজ্ঞতা ঃ**

যে বিজ্ঞাপন-সংস্থা বিজ্ঞাপনদাতার কাজ পাওয়ার চেষ্টা করছেন, তাঁরা কী কোনো স্মরণীয়, উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞাপন করেছেন, যা বিজ্ঞাপন এবং বিপণনের ক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়ে আছে? যে কোনো বিজ্ঞাপনদাতা, বিজ্ঞাপন-সংস্থার এই রকম কাজে প্রভাবিত হবেন।

৯। **বিজ্ঞাপন-সংস্থার অন্যান্য তথ্য ঃ**

ক) **বয়স** — কোনো বিজ্ঞাপন সংস্থার বয়স দীর্ঘ হলে ধরে নেওয়া হয়, সংস্থাটি অনেক দিনের অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে, সংস্থাটি তারুণ্যে প্রাণবন্ত কিনা। দীর্ঘবয়স যদি সংস্থাটির উপর বয়সের ছাপ ফেলে থাকে, তাহলে সেটি প্রতিবন্ধক বলে গণ্য হবে। আবার কোনো অপেক্ষাকৃত নতুন বিজ্ঞাপন-সংস্থাকে বাতিল করার আগে দেখে নিতে হবে, এই নতুন সংস্থায় কতজন অভিজ্ঞ, বিজ্ঞাপনের পেশাদার যোগদান করেছেন।

খ) **আকার** — সাধারণত বড়ো বিজ্ঞাপন সংস্থার ভারতের সব বড়ো শহরেই শাখা থাকে। বিজ্ঞাপনদাতার ব্যবসা এবং কাজকর্ম যদি সারা দেশ জুড়ে হয়, তাহলে, ভারতের বিভিন্ন শহরে শাখা আছে এমন বিজ্ঞাপন সংস্থাকে নির্বাচিত করাই উচিত। প্রয়োজনমত, সব জায়গাতেই পরিষেবা যোগাতে সমর্থ হবে বিজ্ঞাপন-সংস্থা।

গ) **আর্থিক বুনিয়াদ** — বিজ্ঞাপন সংস্থাটির বুনিয়াদ কেমন বিচার করে দেখা প্রয়োজন। যদি আর্থিক সামর্থ দুর্বল হয়, তাহলে বিজ্ঞাপন-সংস্থাটি বিজ্ঞাপনদাতার প্রচারের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন মাধ্যমের সঙ্গে আর্থিক-বিবাদে জড়িয়ে পড়বে। এর ফলে বিজ্ঞাপনদাতার সুনাম ব্যাহত হবে এবং ভবিষ্যতে বিভিন্ন মাধ্যমের সঙ্গে সমস্যায় পড়তে হতে পারে।

ঘ - **সুনাম** — যে বিজ্ঞাপন সংস্থাটিকে নির্বাচিত করা হচ্ছে, সেই সংস্থাটির সুনাম কীরকম? বিভিন্ন মাধ্যমের কাছ থেকে, (কারণ মাধ্যমের সঙ্গেই বিজ্ঞাপন-সংস্থার লেন-দেন) এবং অন্যান্য সূত্র থেকে বিজ্ঞাপন-সংস্থাটির সুনাম কীরকম জেনে নিতে হবে, নির্বাচন করার আগেই।

২.৮ বিজ্ঞাপন সংস্থা পরিবর্তনের কারণ

বিজ্ঞাপন সংস্থা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি প্রচারিত তথ্য বিজ্ঞাপনদাতা মক্কেল বা এ্যাকাউন্ট একটি বিজ্ঞাপন সংস্থা ছেড়ে অন্য বিজ্ঞাপন সংস্থায় চলে যান। বিজ্ঞাপন সংস্থায় যোগদানে ইচ্ছুক নবীনেরা বিজ্ঞাপন-সংস্থার ব্যবসার এই দিকটির বিষয়ে বিশেষ চিন্তিত থাকেন। কারণ বিজ্ঞাপনদাতা অন্য বিজ্ঞাপন সংস্থায় সরে যাওয়ার ফলে পূর্বতন বিজ্ঞাপন-সংস্থাটির কাজ বা ব্যবসা কমে যায়। ব্যবসা সেরকম পরিমাণে কমে গেলে, বিজ্ঞাপন-সংস্থায় কর্মীসংখ্যা কমানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখা যায়, তাহলে বলতে হবে বিজ্ঞাপন-সংস্থায় যাঁরা কাজ করেন এই অনিশ্চয়তা তাঁদের সর্বদাই সঙ্গী। এ্যাকাউন্ট পরিষেবার কাজ যাঁরা করেন তাঁদের এই কাজের নিরাপত্তার অনিশ্চয়তা বিশেষ সঙ্গী। কারণ বিজ্ঞাপনদাতা মক্কেল এক বিজ্ঞাপন সংস্থা থেকে অন্য বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ সরিয়ে নিলে, তার দায়িত্বের সিংহভাগ এ্যাকাউন্ট নির্বাহিকের উপরেই বর্তায়।

সব বিজ্ঞাপন সংস্থাই ধরে নেন যে আগামী আর্থিক বছরে তাঁদের কোনো কোনো মক্কেল (বিজ্ঞাপনদাতা) তাঁদের পরিত্যাগ করে অন্য বিজ্ঞাপন সংস্থাকে নিযুক্ত করবেন। বিজ্ঞাপন সংস্থার পরিচালকবর্গ সর্বদাই মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকেন এই অবধারিত ভবিষ্যতের জন্য। এই কারণেই, সকল বিজ্ঞাপন সংস্থাই সর্বদা চেষ্টা করেন নতুন

মক্কেল (বিজ্ঞাপনদাতা) জোগাড় করতে। নিয়মিত কাজের সঙ্গে সঙ্গে এই কাজও সমান্তরালভাবে চলতে থাকে। এবারে দেখা যাক, কী কী কারণে একটি বিজ্ঞাপন-সংস্থা তাঁদের মক্কেল (বিজ্ঞাপনদাতা) বা ব্যবসা হারাতে পারেন।

ক। **ব্যক্তিগত সংঘাত** — বিজ্ঞাপন-সংস্থা পরিবর্তন করার কারণ হিসাবে বিজ্ঞাপনদাতা নানারকম যুক্তি দেখিয়ে থাকেন। সেই সব যুক্তির অনেকটা সত্য হলেও আসলে পিছনে থাকে ব্যক্তিত্বের সংঘাত। বিজ্ঞাপনদাতার যে বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক বিজ্ঞাপন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন, তাঁর সঙ্গে বিজ্ঞাপন-সংস্থার এ্যাকাউন্ট নির্বাহিকের মাঝে মধ্যেই সমস্যার সৃষ্টি হয়। সংঘাতের সূত্রপাত হয়। এঁদের দুজনকে মিলিত হয়ে এত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে হয় যে, নিজেদের মধ্যে পরস্পরনির্ভরতা, বিশ্বাস এবং আস্থা বজায় রাখা বিশেষ জরুরি হয়ে পড়ে। না হলে দুজনের পক্ষেই পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে ওঠে। এ্যাকাউন্ট নির্বাহিক আপ্রাণ চেষ্টা করেন মতানৈক্য দূর করতে, বিজ্ঞাপন-সংস্থার ব্যবসার কথা চিন্তা করে। কিন্তু অপরপক্ষে বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক সেরকম চেষ্টা করেন না। তাঁর কাছে সবচেয়ে সহজ সমাধান—বিজ্ঞাপন সংস্থা পরিবর্তন করা।

খ। **সৃজনশীল কাজে অসন্তুষ্টি** — বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রায়ই বলতে শোনা যায়, — "আমাদের বিজ্ঞাপন এক ঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে।" অথবা "বিজ্ঞাপনে আর তেমন ধার নেই।" "বিজ্ঞাপন-সংস্থা সেরকম নাড়া দেওয়ার মতো নতুন ধারণা (idea) দিতে পারছে না। এই সব বক্তব্য আংশিক সত্য হলেও সর্বৈব সত্য নয়। ভাল করে দেখলে হয়তো জানা যাবে, বিজ্ঞাপনদাতা যে নির্দেশিকা দিয়েছিলেন তার ফলশ্রুতি হিসাবে, যা হয়েছে, তার থেকেও ভালো বিষয় লিপি সম্ভব নয়। অথবা, বিজ্ঞাপন সংস্থা যে চার-পাঁচটি ধারণা (idea) দিয়েছিলেন, বিজ্ঞাপনদাতা তার মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্টটিই নির্বাচন করেছিলেন। বিজ্ঞাপন-সংস্থা বোঝানো সত্বেও মানেন নি। এই রকম ক্ষেত্রে দেখা যায়, পরিবর্তিত, নতুন বিজ্ঞাপন-সংস্থাও অল্পদিনের মধ্যেই একই পরিস্থিতিতে পড়েন। অবশ্যই, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন সংস্থা সেরকম ধারণা (idea) দিতে পারেন না, ফলে বিজ্ঞাপনদাতার বিজ্ঞাপন একঘেয়ে হয়ে যায়, এবং তাঁরা বিজ্ঞাপন সংস্থা পরিবর্তন করেন।

গ। **বিজ্ঞাপনদাতার বিক্রি কমে গেলে** — বাজারে বিজ্ঞাপনদাতার জিনিসের বিক্রির যে পরিমাণ ছিল, তা যদি আর না বাড়ে, বরং কমে যায়, তাহলে বিজ্ঞাপন-সংস্থা পরিবর্তন করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। যতদিন বিজ্ঞাপিত জিনিসের বিক্রি ঠিকমত হয়, ততদিন সব ঠিক থাকে। কিন্তু বিক্রি পড়তে থাকলেই বিজ্ঞাপনকে দায়ী করা হয়। বলা হয়, — বিজ্ঞাপন ভালো হচ্ছে না বলেই বিক্রি পড়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞাপন-সংস্থা পরিবর্তন করা বিশেষ জরুরি।

যে সব সাধারণ ভোগ্যপণ্য প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিপণন করে, সেই সব জিনিসের বিজ্ঞাপন-সংস্থার পরিবর্তন আমরা হামেশাই দেখতে পাই। যেমন, সাবান, টুথপেস্ট, ঠান্ডা পানীয় ইত্যাদি। বাজারের প্রতিযোগিতাই বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয় এবং ব্যবহারকারীদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞাপন যদি মনস্তাত্বিকভাবে তাল মেলাতে না পারে, তাহলে বিক্রির উপর তার প্রতিফলন হয়। বিজ্ঞাপন-সংস্থাও পরিবর্তন করা হয়।

ঘ। **বিজ্ঞাপনদাতা বিজ্ঞাপন-সংস্থার তুলনায় বড় হয়ে গেলে** — কোনো মাঝারি বা ছোটো বিজ্ঞাপন সংস্থা কোনো মাঝারি বা ছোটো বিজ্ঞাপনদাতার কাজ করছে এবং ভালো কাজ করছে। বিজ্ঞাপনদাতা সেই ভালোকাজের সুফলও পাচ্ছেন। তারফলে, বিজ্ঞাপনদাতার ব্যবসা, বিক্রি, বিপণন এবং প্রচার বাড়তে বাড়তে

এমন একটি মাত্রায় পৌঁছে গেল — দেখা গেল ঐ বিজ্ঞাপন-সংস্থার পক্ষে আর যথোপযুক্ত পরিষেবা যোগানো সম্ভব হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে, বিজ্ঞাপনদাতা-বিজ্ঞাপন-সংস্থা পরিবর্তন ক'রে, বর্তমানে তাঁদের কাজ যথাযথভাবে করতে সমর্থ এমন কোনো বড়ো বিজ্ঞাপন-সংস্থাকে নিযুক্ত করেন।

ঙ। **বিজ্ঞাপন সংস্থা — বিজ্ঞাপনদাতার তুলনায় বড় হয়ে গেলে**। উপরে বর্ণিত পরিস্থিতির বিপরীত চিত্র দেখা দিতে পারে। বিজ্ঞাপন-সংস্থা যদি কোনো বিজ্ঞাপনদাতার তুলনায় অনেক বড়ো হয়ে যান, তাহলে তাঁদের পক্ষে ঐ বিজ্ঞাপনদাতাকে উপযুক্ত পরিষেবা যোগানো ব্যবসায়িক দিক থেকে অলাভজনক হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে তাঁরা বিজ্ঞাপনদাতাকে জানিয়ে দেন।

চ। **প্রতিযোগী এ্যাকাউন্ট** — কোনো বিজ্ঞাপন সংস্থা হয়তো একটি গায়ে মাখার সাবানের বিজ্ঞাপন করছেন। এই সাবানটি কেবল পূর্ব ভারতেই বিক্রি হয় এবং প্রচারিত হয়। বিজ্ঞাপনের মোট বাজেটও অল্প। বাজারের একটি সর্বভারতে বিক্রি হয় এমন গায়ে মাখা সাবানের বিজ্ঞাপন করার কাজ যদি ঐ বিজ্ঞাপন সংস্থাটি পান তাহলে, বিজ্ঞাপনের বাজেট এবং কাজের চ্যালেঞ্জের কথা বিবেচনা করে, পূর্বেকার স্বল্প বাজেটের বিজ্ঞাপনের কাজ পরিত্যাগ করবেন। কোন বিজ্ঞাপন সংস্থাই বিভিন্ন মার্কার একই জিনিস (এ ক্ষেত্রে সাবান) বা পরস্পর প্রতিযোগী জিনিসের বিজ্ঞাপন করতে পারেন না।

ছ। **খরচ নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি** — মাধ্যমের খরচ, বিভিন্ন মাধ্যম নিজেরাই নির্দিষ্ট করেন। যে কোনো বিজ্ঞাপন-সংস্থাই একই রেট-এ মাধ্যমের খরচ ধরেন। কিন্তু বিজ্ঞাপন তৈরি, চূড়ান্ত শিল্পকর্ম (final artwork) শ্রবণ-দৃশ্য বিজ্ঞাপন তৈরির খরচ এক একটি কাজের জন্য এক এক রকম হয়। এই সব কাজের কোনো নির্দিষ্ট রেট বা সমান রেট ধরা যায় না। বিজ্ঞাপন-সংস্থা যদিও কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ ধরেন, বিজ্ঞাপনদাতা মনে করতে পারেন, বেশি খরচ হয়ে যাচ্ছে। ক্রমাগত এইভাবে ভুল বোঝাবুঝি চলতে থাকলে, বিজ্ঞাপনদাতা বিজ্ঞাপন-সংস্থা পরিবর্তন করতে পারেন।

জ। **বিজ্ঞাপনদাতার মনোবিকৃতি** — কোনো কোনো বিজ্ঞাপনদাতা যথেচ্ছাচার করেন। বিজ্ঞাপনজগতে কয়েকজন বিজ্ঞাপনদাতা আছেন, যাঁরা কিছুদিন অন্তরই বিজ্ঞাপন সংস্থা পরিবর্তন করেন। এই পরিবর্তনের পিছনে যে যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে তা নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইসব পরিবর্তন হয় খামখেয়ালীপনার জন্য। সে খামখেয়ালী বিজ্ঞাপনদাতার বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপকের হতে পারে, অথবা চেয়ারম্যান বা ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের খামখেয়ালীপনাও হতে পারে। যতক্ষণ, বিজ্ঞাপন-সংস্থার পক্ষে কাজটি লাভজনক হয়, তাঁরা চেষ্টা করেন, সমস্ত খামখেয়ালী মেনে নিতে। অবশেষে, অবশ্যম্ভাবীকে মেনে নেন।

২.৯ বিজ্ঞাপন সংস্থা ও বিজ্ঞাপনদাতার সম্পর্ক

কোনো সংস্থার অন্যান্য বিভাগের থেকে বিজ্ঞান বিভাগের কাজের প্রকৃতি এবং ধারা ভিন্ন ধরনের। বিজ্ঞাপন বিভাগকে তাঁদের কাজের জন্য অর্থাৎ, বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা, প্রস্তুতি এবং প্রচারের জন্য নির্ভর করতে হয় বিজ্ঞাপন সংস্থার উপর। বিজ্ঞাপন সংস্থার পরিষেবার মান এবং দক্ষতা অনেকাংশেই নির্ভর করে বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থার বিজ্ঞাপন বিভাগের ব্যবস্থাপক-এর উপর। তাঁর কর্মদক্ষতার উপরেই নির্ভর করে সংস্থার বিজ্ঞাপনের মান এবং কার্যকারীতা।

বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক চেষ্টা করেন বিজ্ঞাপন সংস্থার কর্মীদের বিশেষ করে এ্যাকাউন্ট নির্বাহিককে তাঁর কোম্পানির কাজে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করতে। তাঁকে বুঝতে হবে যে বিজ্ঞাপনদাতা এবং বিজ্ঞাপন সংস্থার

যৌথ প্রয়াসেই কার্যকরী বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনা এবং প্রচার সম্ভব হয়। বিজ্ঞাপন-সংস্থা যদিও বিজ্ঞাপনদাতা কোম্পানির থেকে পৃথক সংস্থা, সার্থক বিজ্ঞাপন সৃষ্টির জন্য দুটি সংস্থাকেই একাত্মভাবে কাজ করতে হয়।

বিজ্ঞাপন সংস্থার সঙ্গে সমঝোতা গড়ে তোলার জন্য বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপকের কর্তব্য —

ক) সংস্থার বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপন-সংস্থাকে বিস্তৃতভাবে জানানো। বিজ্ঞাপনদাতার বিজ্ঞাপনের লক্ষ্যে যদি কখনো কখনো পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন হয়, তাহলে, বিজ্ঞাপন-সংস্থাকে অবিলম্বে অবহিত করা।

খ) তাঁকে মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞাপন-সংস্থার কাছে, তিনিই বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থার নীতি, দৃষ্টিভঙ্গি, পছন্দ-অপছন্দ জানানোর এবং বোঝানোর দায়িত্ব প্রাপ্ত।

গ) কোনো নতুন পণ্যের পরিকল্পনা হলে, অথবা বিক্রির কার্যসূচীতে কোনো পরিবর্তন হলে, বা বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কোনো তারতম্য ঘটলে, যে বিষয়ে বিজ্ঞাপন সংস্থাকে অবিলম্বে অবহিত করার দায়িত্ব তাঁর।

ঘ) বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক মাঝে মাঝে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিজ্ঞাপন সংস্থার মিটিং-এর ব্যবস্থা করবেন।

ঙ) বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপকই বিজ্ঞাপন সংস্থাতে বিজ্ঞাপন পরিকল্পনার এবং সৃষ্টির উপকরণ যোগান দেন। যে পণ্যের বিজ্ঞাপন হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ, ফটোগ্রাফ, অন্যান্য কারিগরি খুঁটিনাটি, প্রতিযোগী পণ্যের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার, বাজার এবং পণ্যটির সম্বন্ধে গবেষণালব্ধ সমস্ত তথ্য এবং পণ্যটির মূল্য, এই সব তথ্যই বিজ্ঞাপন-সংস্থাকে সরবরাহ করেন, বিজ্ঞাপনদাতার বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক। সত্য বলতে কী এই সব তথ্যের উপরেই নির্ভর করে বিজ্ঞাপনের কার্যকারীতা।

চ) বিজ্ঞাপন-সংস্থার তৈরি বিজ্ঞাপনের চিত্ররেখা এবং বিষয়লিপি তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার করবেন, অনুমোদনের জন্য এবং তাঁর উর্ধতন কর্তৃপক্ষকেও দেখিয়ে নেবেন।

ছ) বিজ্ঞাপনদাতার তরফে তিনিই সব বিজ্ঞাপনের চূড়ান্ত শিল্পরূপ, প্রুফ ইত্যাদি অনুমোদন করবেন।

জ) যে মাধ্যমের দ্বারা তাঁর বিজ্ঞাপন ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছবে, সেই বিষয়ে তাঁর যৌথ জ্ঞান ও দায়িত্ব থাকবে, বিজ্ঞাপন সংস্থার সঙ্গে।

ঝ) বিজ্ঞাপন-সংস্থার সমস্ত বিল ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে টাকা দেওয়ার জন্য অনুমোদন করবেন।

আধুনিক ব্যবসা ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞাপনদাতার বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক এবং বিজ্ঞাপন সংস্থার এ্যাকাউন্ট নির্বাহিকের মধ্যে যে রকম সহযোগিতা, পারস্পরিক বিশ্বাস এবং মর্যাদার সম্পর্ক প্রয়োজন হয়, আর কোনো বিভাগের কাজেই তা হয় না।

বিজ্ঞাপন-সংস্থা এবং বিজ্ঞাপনদাতার মধ্যে সমস্যা বা সংকটের মূলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় বিজ্ঞাপনদাতার অবৈজ্ঞানিক পরিচালনাই দায়ী। দৃষ্টিভঙ্গি এবং নিয়মকানুনের সামান্য পরিবর্তনই অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন-সংস্থার পরিষেবা সন্তোষজনক ক'রে তোলে। অধিকাংশ বিজ্ঞাপন-সংস্থাই বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের পরিষেবা যোগাতে সমর্থ।

নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি কাজে লাগালে বিজ্ঞাপন-সংস্থা এবং বিজ্ঞাপনদাতার মধ্যে কাজের সম্পর্ক ভালো হতে পারে।

- বিজ্ঞাপন-সংস্থা বিজ্ঞাপনদাতার সমকক্ষ, অধীন নয়। অনেক বিজ্ঞাপনদাতাই বিজ্ঞাপন-সংস্থাকে ক্রমাগত তাড়না করেন। তাঁরা ধরে নেন, ব্যবসা চলে যেতে পারে, এই ভয়ে বিজ্ঞাপন-সংস্থা সব মেনে নেবে। এটা ঠিক নয়।

- কেবল পরিবর্তনের জন্যই পরিবর্তন করা ঠিক নয়। কোনো কোনো বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক বিজ্ঞাপন-সংস্থার তৈরি বিজ্ঞাপন, বিষয়লিপি এবং অন্যান্য কাজ বার বার বদল করতে বলেন। কোনো ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন অবশ্যই প্রয়োজনীয় হতে পারে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিনা কারণে পর পর পরিবর্তন বিজ্ঞাপন-সংস্থার বিরক্তির কারণ হয় এবং বিজ্ঞাপনদাতার উপর আস্থা ও সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হয়।

- বিজ্ঞাপন সংস্থার কাজ সন্তোষজনক না হলে, সংস্থাকে সে বিষয়ে পরিষ্কার জানানোই ভালো। সৃজনশীলকাজ, অন্যান্য পরিষেবা বা খরচ, ঠিক কোন কোন বিষয়ের কাজে বিজ্ঞাপনদাতা সন্তুষ্ট নয়, সে কথা জানালে, বিজ্ঞাপন-সংস্থার পরিষেবার উন্নতি হতে পারে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক পরিষেবার ত্রুটির বিষয় বিজ্ঞাপন-সংস্থাকে না জানিয়ে, বিজ্ঞাপন সংস্থা পরিবর্তন করার বিষয়ে চিন্তা শুরু করেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিজ্ঞাপন-সংস্থাকে পরিষেবার ত্রুটির কথা জানানো হয়নি। একেবারে — পরিবর্তনের বিষয় জানানো হয়েছে।

- বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা প্রয়োজন। বিজ্ঞাপনের কোনো বিষয়ে যদি বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক এবং এ্যাকাউন্ট নির্বাহিক একযোগে সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপকের কর্তব্য সেই সিদ্ধান্ত যাতে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পায় সে বিষয়ে দেখা। মিলিত সিদ্ধান্ত যদি বার বার উর্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হয়, বা কর্তৃপক্ষের দ্বারা বারবার পরিবর্তিত হয়, তাহলে বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপকের উপরে বিজ্ঞাপন-সংস্থার আর আস্থা থাকে না। এর ফলে কাজের অসুবিধা হয়ে থাকে।

- বিজ্ঞাপন সংস্থাকে সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করতে হবে। অসম্পূর্ণ বা পরিবর্তিত (twisted) তথ্য সরবরাহ করলে, সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞাপন সংস্থা যে বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা করবেন, সেটি বিশেষ কার্যকরী হবে না।

- বিজ্ঞাপন-সংস্থাকে সমালোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে প্রশংসাও করতে হবে। বেশির ভাগ বিজ্ঞাপনদাতাই বিজ্ঞাপন সংস্থার ভালো কাজ দেখে কিছুই বলেন না কিন্তু কোনো ত্রুটি দেখলে সমালোচনা করেন। ভালোকাজ দেখে — ভালো বললে, প্রশংসা করলে, বিজ্ঞাপন-সংস্থা কাজে বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন।

- বিজ্ঞাপনদাতার সিদ্ধান্ত দ্রুত নেওয়া প্রয়োজন, যাতে বিজ্ঞাপন সংস্থা পরিকল্পনা করার যথেষ্ট সময় পান।

এবারে দেখা যাক, বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে বিজ্ঞাপন সংস্থার ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য বিজ্ঞাপন সংস্থার কী কী করা প্রয়োজন।

১। **নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা** — মাঝারি এবং ছোটো বিজ্ঞাপনদাতাদের চিরন্তন অভিযোগ, বিজ্ঞাপন-সংস্থা তাদের দিকে মনোযোগ দেন না। বড়ো বিজ্ঞাপনদাতার কাজ নিয়ে বিজ্ঞাপন-সংস্থার যেমন আগ্রহ-উদ্বেগ দেখা যায়, অপেক্ষাকৃত ছোটো বিজ্ঞাপনদাতার কাজের ব্যাপারে দেখা যায় না। ব্যবসায়িক দিক থেকে বিচার করলে, সব বিজ্ঞাপনদাতাকেই সমান মনোযোগ দেওয়া সম্ভব না হতে পারে। কিন্তু, টেলিফোনে কথা বলে, ফ্যাক্স পাঠিয়ে, বিভিন্ন ব্যাপারে চিঠি লিখে বিজ্ঞাপনদাতাকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় এবং অনুভব করানো যায় যে তাঁরা অবহেলিত নয়।

২। **একাধিক ব্যক্তিকে যুক্ত করা** — কোনো বিজ্ঞাপনদাতার কাজে এ্যাকাউন্ট নির্বাহিক ব্যতীত বিজ্ঞাপন-সংস্থার অন্যান্যদের ও বিজড়িত করা। যেমন, এ্যাকাউন্ট নির্বাহিকের সঙ্গে মার্কেটিং রিসার্চ-এর বিশেষজ্ঞ বা

মাধ্যম ব্যবস্থাপক, বিজ্ঞাপনদাতার প্রতিনিধি, বিজ্ঞাপন কর্মাধ্যক্ষ এবং অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতে পারেন। কখনো কখনো বিষয়লিপি লেখকও এ্যাকাউন্ট নির্বাহিকের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন, বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে মতামত আদানপ্রদানের জন্য। এর ফলে, বিজ্ঞাপনদাতাকে বোঝানো যায়, বিজ্ঞাপন সংস্থা তাঁদের কত বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। এর ফলে বিজ্ঞাপনদাতা ও বিজ্ঞাপন সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ভালো হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়। অপরদিকে, এ্যাকাউন্ট নির্বাহিক ব্যতীত বিজ্ঞাপন-সংস্থার অন্যান্য বিশেষজ্ঞের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের ফলে বিজ্ঞাপন-কর্মাধ্যক্ষ এবং এ্যাকাউন্ট নির্বাহিকের মধ্যে সম্ভাব্য ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব পরিহার করা সম্ভব হয়।

৩। **বিজ্ঞাপনদাতার ব্যবসায়ের বিশেষজ্ঞ হওয়া** — বিজ্ঞাপন সংস্থার এ্যাকাউন্ট নির্বাহিক এবং বিষয়লিপি লেখক, বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবেন যাতে বিজ্ঞাপনদাতা তাঁদের নিজেদের সংস্থার কর্মী বলে গুরুত্ব দেবেন। বিজ্ঞাপন-সংস্থা, বিশেষ করে এ্যাকাউন্ট নির্বাহিক যদি বিজ্ঞাপনদাতার শিল্প, বিপণন এবং ব্যবসা সম্পর্কে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে অধুনাতম তথ্য এবং অন্যান্য সংবাদ সংগ্রহ করেন এবং বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে আলোচনার সময় সেগুলি ব্যবহার করেন, তাহলে বিজ্ঞাপনদাতার আস্থা এবং নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। বিজ্ঞাপন সংস্থার সম্পর্কে বিজ্ঞাপনদাতার ধারণা ভালো হয় এবং তাঁরা নিশ্চিন্ত বোধ করেন যে বিজ্ঞাপন সংস্থা তাঁদের যথোচিত গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং তাঁদের ব্যবসায়ে সহায়ক, বিশেষজ্ঞের ভূমিকা নিচ্ছেন। এর ফলে বিজ্ঞাপনদাতা এবং বিজ্ঞাপনসংস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪। **বাজারে ঘোরা** — বিজ্ঞাপন-সংস্থার এ্যাকাউন্ট নির্বাহিক তাঁর নিজের দপ্তর এবং বিজ্ঞাপনদাতার দপ্তরের মধ্যে অসংখ্যবার যাতায়াত করেন। পরিষেবা যোগানোর জন্য এটা অপরিহার্য। সেই সঙ্গে, এ্যাকাউন্ট নির্বাহিক যদি বিজ্ঞাপনদাতার পণ্যের বিক্রির খোঁজখবর নিতে মাঝে মাঝে বিভিন্ন বাজারে, খুচরো বিক্রেতাদের কাছে পণ্যটি এবং তার প্রতিযোগী অন্যান্য মার্কার পণ্য সম্বন্ধে সাম্প্রতিককালের সংবাদ সংগ্রহ করে, বিজ্ঞাপিত পণ্যটির অবস্থান পর্যালোচনা করেন, তাহলে বিজ্ঞাপনদাতার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয় এবং বিজ্ঞাপন সংস্থাও তাঁদের বিজ্ঞাপন কৌশলের কার্যকারীতা সম্বন্ধে অবহিত হন। মধ্যে মধ্যে বিজ্ঞাপনদাতার কারখানায় গিয়ে পণ্যটির প্রস্তুত প্রণালি সরেজমিনে দেখাও বিজ্ঞাপন-সংস্থার কাজের সহায়ক হয়। পণ্যটি সম্বন্ধে নতুন নতুন ধারণার উদ্ভব হতে পারে, এবং বিজ্ঞাপনের নতুন কৌশল উদ্ভাবন হতে পারে। বিজ্ঞাপনদাতা উপলব্ধি করেন, তাঁদের কাজে বিজ্ঞাপন-সংস্থা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। আবার এইসব অভিজ্ঞতার ফলে বিজ্ঞাপন-সংস্থার কাজের মানও উন্নত হয়। বিজ্ঞাপনদাতা এবং বিজ্ঞাপন সংস্থার সম্পর্ক দৃঢ় হয়।

৫। **সৃজনশীল কাজে উৎসাহ** — বিজ্ঞাপন সংস্থার সৃজনশীল কাজের সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনদাতার ধারণা অনেকাংশে নির্ভর করে সৃজনশীল কাজ এ্যাকাউন্ট নির্বাহিক এবং অন্যান্যরা কীভাবে বিজ্ঞাপনদাতার কাছে উপস্থাপন করছেন, তার উপর। উপযুক্ত উৎসাহের সঙ্গে, বিজ্ঞাপন কৌশল ব্যাখ্যা ক'রে, সৃজনশীল কাজটির বৈশিষ্ট্য এবং ব্যতিক্রমী প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ ক'রে, এর কার্যকারীতার সম্ভাবনা ব্যাখ্যা ক'রে বিজ্ঞাপনদাতার কাছে উপস্থাপন করলে, বিজ্ঞাপনদাতার পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় সৃজনশীল কাজটি কীরকম মানের। বিজ্ঞাপনদাতার বিশ্বাস জন্মায় যে সৃজনশীল কাজটি উচ্চ মানের। বিজ্ঞাপন কর্মাধ্যক্ষও তাঁদের বিজ্ঞাপনের সৃজনশীলতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হন এবং সুনিশ্চিত হন।

৬। **খরচ সীমিত রাখা** — মাধ্যমের খরচ সব বিজ্ঞাপন-সংস্থাই মাধ্যমের রেট অনুসারে নির্ধারিত করেন। তবে অন্যান্য খরচ, যেমন বিজ্ঞাপনের শিল্পকর্ম তৈরি, ফটোগ্রাফি, মডেলের ফি, এবং রেডিও বা টেলিভিশনের জন্য বিজ্ঞাপন তৈরির বিশেষ খরচ তুলনামূলকভাবে বিচার করে, তবেই বিজ্ঞাপনদাতাকে প্রস্তাব দেওয়া উচিত। বিজ্ঞাপনদাতার যেন ধারণা না হয় যে, বিজ্ঞাপন সংস্থা অতিরিক্ত খরচ করছে। এইসব প্রস্তাব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে, বিচার-বিবেচনা ক'রে, বিজ্ঞাপনদাতাকে জানালে, তাঁদের আস্থা জন্মায়, নিযুক্ত বিজ্ঞাপন সংস্থা, বিজ্ঞাপনদাতার খরচ বাঁচিয়ে দিচ্ছেন।

৭। **মাধ্যম কৌশল অবহিত করা** — বিজ্ঞাপনদাতাদের সাধারণ বিশ্বাস, বিজ্ঞাপন-সংস্থা সব সময়েই মাধ্যমের কাছে প্রাপ্য কমিশনের জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারের সুপারিশ করেন। মাধ্যম-নির্বাচন এবং বিজ্ঞাপনের কার্যক্রম রচনায় নব নব উদ্ভাবনী কৌশলের প্রয়োগে, বিজ্ঞাপনদাতা আশ্বস্ত হন তাঁদের নিযুক্ত বিজ্ঞাপন সংস্থা কেবল কমিশন রোজগার করতেই উৎসাহী নয়, বিজ্ঞাপনদাতার স্বার্থরক্ষাই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য।

২.১০ এ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা

বিজ্ঞাপন-সংস্থাকে তাঁদের মক্কেল বিজ্ঞাপনদাতার পণ্যের বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা এবং প্রচার অভিযানের একটি ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হয়। এই বিজ্ঞাপন-পরিকল্পনা বিজ্ঞাপনদাতার কাছে পেশ করা হয়। বিজ্ঞাপনদতার অনুমোদন এবং বাজেটের অনুমোদন পেলে, বিজ্ঞাপন-সংস্থা, অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী বিজ্ঞাপন অভিযান শুরু করেন। আসুন, আমরা দেখি, বিজ্ঞাপন-সংস্থা কীভাবে বিজ্ঞাপন অভিযানের পরিকল্পনা করেন।

এ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা বা বিজ্ঞাপন অভিযান অত্যন্ত জটিল কর্মকাণ্ড। এ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হলে, সেটি নথিবদ্ধ করা হয় এবং বিজ্ঞাপনদাতা মক্কেলকে প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপন এবং পরিকল্পনা পেশ করা হয়। এই সময়, মক্কেলের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পরিকল্পনাটি বিশদ ব্যাখ্যা করে বোঝানো হয়, এবং প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপনগুলির যৌক্তিযুক্ততা বিশ্লেষণ করা হয়। এই পর্বটিকে বলা হয়, বিজ্ঞাপন সংস্থার উপস্থাপন (Agency Presentation)। বিজ্ঞাপন অভিযানের সর্বশেষ পর্ব বিজ্ঞাপন—যা বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারিত হয়।

এ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা কিন্তু কেবল সৃজনশীল কাজ বা যে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়, সেইটির পরিকল্পনা-ই নয়। বিজ্ঞাপন এমন একটি বিষয় যাকে একই সঙ্গে বিজ্ঞান এবং শিল্প হিসাবে গণ্য করা হয়। পণ্য সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ, বাজারের গতিপ্রকৃতির গবেষণা, ব্যবহারকারীর বিভিন্ন আকাঙ্খা, চাহিদা এবং প্রচার মাধ্যমের ব্যবহার, সবকিছু পরিব্যাপ্ত করে এ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা। অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনার মধ্যে পড়ে।

ক. **গবেষণা** — যে পণ্যটির বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা করা হবে, বিজ্ঞাপন সংস্থাকে সেই পণ্যটি সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। পণ্যটি কী কী উপাদানে তৈরি, বাজারে পণ্যটির বর্তমান অবস্থান কী, অতীতে কীরকম ছিল, এবং ভবিষ্যতে কী হতে পারে, সমস্ত তথ্যই জানতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে জানতে হবে প্রতিযোগী পণ্যগুলির বিস্তৃত তথ্য। বিশেষ করে, সেগুলির উপাদান, বাজারে অবস্থান এবং ব্যবহারকারীদের মনোভাব, পণ্যটির বর্তমান ব্যবহারকারী এবং সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের সম্বন্ধে গবেষণা লব্ধ তথ্য, বিজ্ঞাপন সৃষ্টির জন্য একান্ত আবশ্যক।

সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যম সম্বন্ধেও গবেষণা করতে হয়। লিপিবদ্ধ করা হয় — সৃজন কর্মের নির্দেশিকা হিসাবে।

খ. সৃজনকর্মের মূল ধারণা উপস্থাপন করা, ব্যাখ্যা করা এবং ধারণাটির যৌক্তিকতা বোঝানো — অ্যাকাউন্ট নির্বাহিককে বোঝাতে হয় এই বিশেষ ধারণাটি কেন বেছে নেওয়া হয়েছে? অন্যান্য ধারণার তুলনায় এই নির্দিষ্ট ধারণাটি কেন বেশি যুক্তিসঙ্গত? কোনো বিজ্ঞাপনের একই ধারণা বিভিন্ন চিত্ররেখার সাহায্যে উপস্থাপন করা যায়। বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের আবেদন কোনটির কী রকম, বিশ্লেষণ করা হয়। কোন বিজ্ঞাপনটি, কী কারণে বেশি কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা, ব্যাখ্যা করে বোঝানোর পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, কোন বিজ্ঞাপনটি প্রচারিত হবে।

গ. মাধ্যম পরিকল্পনা — মাধ্যম নির্বাচন সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁরা করেন না ঠিকই তবে তাঁরা বিজ্ঞাপন-সংস্থার মাধ্যম বিভাগের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা করেন। মাধ্যম বিশেষজ্ঞরা যদি স্থির করেন কোনো পণ্যের বিজ্ঞাপন মুদ্রণমাধ্যমের সাহায্যে প্রচার করাই যুক্তিযুক্ত, তাহলে, সৃজনকর্মের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের মুদ্রণ বিজ্ঞাপন সৃষ্টির বিষয়েই চিন্তাভাবনা এবং বিচার বিবেচনা করতে হবে। বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য কোন মাধ্যম ব্যবহার করা হবে? মাধ্যম-বিভাগই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, পণ্যটির ব্যবহারকারী এবং বিজ্ঞাপনের বার্তা বিবেচনা করে। ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞাপন অভিযানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যম পরিকল্পনা করা হয়। কোনো ফেস ক্রিমের বিজ্ঞাপনের জন্য মহিলাদের পত্রিকা নির্বাচন করা হয়। কোনো বিশেষ মেসিনারির বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য, অর্থনৈতিক দৈনিক বা সাধারণ ইংরাজি দৈনিক নির্বাচন করাই যুক্তিযুক্ত। আবার, ফেসক্রিমের বিজ্ঞাপন বা ঠাণ্ডাপানীয়ের বিজ্ঞাপনের জন্য টেলিভিশন মাধ্যম ব্যবহার করা বিশেষ কার্যকরী হয়। মাধ্যম পরিকল্পনায় বিবেচনা করা হয় যে পণ্যটির বিজ্ঞাপন করা হবে, সেটির প্রচার কোন কোন মাধ্যমের সাহায্যে ব্যবহারকারীকে প্রভাবিত করতে সম্ভব হবে। বিজ্ঞাপন পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত সকলকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে গবেষণার দ্বারা তথ্য সংগ্রহ করে, সিদ্ধান্ত নিতে হয়। বিজ্ঞাপন সংস্থার প্রতিটি বিভাগের কাজই গবেষণার উপর নির্ভরশীল।

ঘ. বিশ্লেষণ — গবেষণা লব্ধ সকল তথ্য বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার বিশ্লেষণ করতে হয়। যে পণ্যটির বিজ্ঞাপন করা হবে, সেটির মূল সমস্যা কী এবং পণ্যটির সাফল্যের সুযোগ কতখানি, বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়। পণ্যটির কোন কোন সমস্যার মোকাবিলার জন্য বিজ্ঞাপন অভিযান করা হবে সেটি স্থির করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করতে হবে, পণ্যটির যে সমস্যাগুলি রয়েছে, সেগুলিকেই কী ভাবে সুযোগে পরিবর্তিত করা সম্ভব।

ঙ. কৌশল বা রণনীতি — বিজ্ঞাপন পরিকল্পনার মূল কৌশল বা রণনীতি বলতে বোঝায় — চিহ্নিত পণ্যটির অবস্থান নির্ণয়, উদ্দীষ্ট গ্রাহকদের চিহ্নিতকরা, এবং বিজ্ঞাপন অভিযানের উদ্দেশ্যগুলি নির্ধারণ করা। বুঝতেই পারছেন, এই মূল রণনীতির উপর নির্ভর করেই বিজ্ঞাপন পরিকল্পনার পরবর্তী প্রতিটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়। বিজ্ঞাপনের সৃজনশীলতা এবং মাধ্যম নির্বাচন ও পরিকল্পনাও এই মৌলিক রণনীতির উপর ভিত্তি করেই নির্দিষ্ট হবে।

চ. সৃজন পরিকল্পনা — বিজ্ঞাপন পরিকল্পনার পরবর্তী পর্যায় — সৃজনশীল পরিকল্পনা। সৃজনকর্ম শুরু করা হয় বিজ্ঞাপন অভিযানের নির্ধারিত রণনীতি অনুসারে। বিজ্ঞাপনের বার্তায় পণ্যটির কোন কোন সমস্যার সমাধান-সূত্র দেওয়া হবে, সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বার্তার উদ্দেশ্য, মাধ্যম নির্বাচনের কারণ এবং যুক্তি ব্যাখ্যা করা হয়। মাধ্যম পরিকল্পনায় বিভিন্ন মাধ্যমে কতগুলি করে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হবে, কতদিন ধরে, তার বিস্তৃত যৌক্তিকতা বিবৃত করা হয়। বিজ্ঞাপনের খরচ বলতে বোঝায় মূলত মাধ্যম ব্যবহারের খরচ। সেই কারণে,

যে কোনো মাধ্যম পরিকল্পনার — মাধ্যমের সংখ্যা, বিজ্ঞাপনের সংখ্যা, এবং তার মোট খরচ হিসাব করে পরিকল্পনার মূল রণনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বুঝিয়ে যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা হয়।

সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি, প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপন সহ, বিজ্ঞাপনদাতার কাছে পেশ করা হয়, অনুমোদনের জন্য। বিজ্ঞাপনদাতার কোনো প্রশ্ন থাকলে, আলাপ-আলোচনার দ্বারা তার সন্তুষ্টি বিধান করা হয়। পরে, অনুমোদন পেলে, বিজ্ঞাপন সংস্থা বিজ্ঞাপন অভিযানের কাজ প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুযায়ী শুরু করেন এবং বিভিন্ন মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা করেন।

২.১১ সারাংশ

বিভিন্ন প্রস্তুতকারক সংস্থার পণ্যের এবং পরিষেবা-সংস্থার পরিষেবার বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা, সৃষ্টি ও প্রচার করেন বিভিন্ন বিজ্ঞাপন-সংস্থা। বিজ্ঞাপন-সংস্থায় বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত নানা বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা কাজ করেন। বিজ্ঞাপনদাতা মক্কেলের পণ্য, বাজার, প্রতিযোগী পণ্য এবং ব্যবহারকারীদের সম্পর্কে গবেষণা ক'রে, বিজ্ঞাপন সংস্থা বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা এবং সৃষ্টি করেন। পণ্যটির ব্যবহারকারীদের কাছে পণ্যটির বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত মাধ্যম নির্বাচন করেন এবং বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এই কাজগুলি সঠিকভাবে করার জন্য বিজ্ঞাপন-সংস্থায় বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের বিভাগ আছে। যেমন — এ্যাকাউন্ট পরিষেবা, বাজার গবেষণা, সৃজনশীল পরিষেবা, মাধ্যম পরিকল্পনা এবং বিজ্ঞাপন প্রস্তুতকরণ বিভাগ।

প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সাফল্যের জন্য বিজ্ঞাপনদাতারা বিজ্ঞাপন সংস্থার বিশেষজ্ঞ পরিষেবা গ্রহণ করে থাকেন। কারণ, বিজ্ঞাপন-সংস্থার বিভিন্ন পণ্য এবং পরিষেবার বিপণন ও বিজ্ঞাপন পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই বিশেষজ্ঞ পরিষেবার জন্যই বিজ্ঞাপনদাতারা বিজ্ঞাপন-সংস্থার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা, সৃষ্টি এবং প্রচারের ব্যবস্থা করেন। বিজ্ঞাপন-সংস্থা নির্বাচনের জন্য কতকগুলি সাবধানতা গ্রহণ করা উচিত। বিজ্ঞাপনদাতা কখনও কখনও, বিভিন্ন কারণে বিজ্ঞাপন-সংস্থা পরিবর্তনও করতে পারেন। বিজ্ঞাপনদাতা ও বিজ্ঞাপন সংস্থার মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপন সংস্থাই বিজ্ঞাপন দাতার বিজ্ঞাপন অভিযানের পরিকল্পনা করেন এবং পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কাজ করেন।

২.১২ অনুশীলনী

১। দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন

ক। বিজ্ঞাপনদাতা কেন বিজ্ঞাপন-সংস্থার মাধ্যমে তাঁদের পণ্যের বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা, প্রস্তুতি এবং প্রচার করে থাকেন?

খ। একটি বিজ্ঞাপন সংস্থা কী কী পরিষেবা যোগান দিতে সমর্থ?

গ। বিজ্ঞাপন সংস্থার সংগঠন চিত্র সহ বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্ম আলোচনা করুন।

ঘ। বিজ্ঞাপনদাতা কী ভাবে বিজ্ঞাপন-সংস্থা নির্বাচন করবেন?

ঙ। বিজ্ঞাপনদাতা ও বিজ্ঞাপন-সংস্থার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য কী কী সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন?

চ। বিজ্ঞাপন-সংস্থা কী ভাবে কোনো বিজ্ঞাপনদাতার এ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা করেন?

২। টীকা লিখুন ঃ

(ক) এ্যাকাউন্ট একজিকিউটিভ, (খ) বাজার গবেষণা,
(গ) বিষয়লিপি লেখক, (ঘ) ভিসুয়ালাইজার,
(ঙ) বিজ্ঞাপন সংস্থার উপস্থাপন।

২.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

Advertising as a Career – Subrata Banerjee.

The Advertising Handbook – Sean Briceley

Advertising – William H. Bolen.

Advertising – A decision making approach – Charles H. Patti/Charles F. Frazer.

The Advertising Agency Business – Herburt Gardenr Jr.

একক ৩ □ বিজ্ঞাপনে ব্র্যাণ্ড বা ভাবমূর্তির গুরুত্ব

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য
৩.১ প্রস্তাবনা
৩.২ পৃথক্ করণ
৩.৩ পৃথক পরিচিতি
৩.৪ অনন্য বিক্রির প্রস্তাব
৩.৫ 'নাম' এর ভাবমূর্ত্তি
৩.৬ ডেভিড অগিলভি'র বক্তব্য
৩.৭ পণ্যের ব্যক্তিত্ব
৩.৮ পণ্যের অবস্থান
৩.৯ পণ্যের অবস্থান নির্ণয়ের কৌশল
৩.১০ মূল সূত্র কী কী?
৩.১১ কৌশল নির্ণয়
৩.১২ ভাবমূর্তি সৃষ্টির নির্দেশাবলী
৩.১৩ সারাংশ
৩.১৪ অনুশীলনী
৩.১৫ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য

বিজ্ঞাপনে ব্র্যাণ্ডনাম বা ভাবমূর্তির ব্যবহার সুপরিচিত। এই এককে ব্র্যাণ্ড নাম এবং ইউ. এস. পি. বিজ্ঞাপনে কী ভাবে ব্যবহার করা হয়, এবং এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই এককটি পাঠ করলে আপনি এই বিষয়গুলি নির্দ্দিষ্ট করতে সক্ষম হবেন —

- বিজ্ঞাপিত পণ্যের-পৃথক পরিচিতি প্রয়োজন কেন?
- ইউ-এস. পি. - তত্ত্ব
- ব্র্যাণ্ড নাম বা ভাবমূর্তির তত্ত্ব
- পণ্যের ব্যক্তিত্ব এবং অবস্থান
- পণ্যের অবস্থান নির্ণয়ের সূত্র
- ব্র্যাণ্ড নাম এর, ভাবমূর্তির উদাহরণ ও ব্যাখ্যা
- ভাবমূর্তি সৃষ্টির সূত্র

৩.১ প্রস্তাবনা

যে কোনো বিজ্ঞাপনের মূল উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপনের বার্তার দ্বারা ব্যবহারকারীর মনোভাব বিজ্ঞাপিত পণ্যটির অনুকূলে নিয়ে আসা। ব্যবহারকারী যাতে পণ্যটি ব্যবহার করেন এবং কেনেন। অর্থাৎ, বিজ্ঞাপনে প্রচারিত বার্তাটি যেন কার্যকরী হয়, ব্যবহারকারীর বিজ্ঞাপিত পণ্যটি কেনার এবং ব্যবহারের পরিণতিতে। কিন্তু, কোনো পণ্যের বা পরিষেবার প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপনের কার্যকরীবার্তা উদ্ভাবন (develop) করা সহজ কাজ নয়। বর্তমানের উপভোক্তার (Consumers) সমাজে কার্যকরী বিজ্ঞাপনবার্তা সৃষ্টি বা উদ্ভাবন করা ক্রমশ আরো কঠিন হয়ে উঠছে। আপনারা নিত্য দেখছেন দোকানের শেলফ জুড়ে, শত শত পণ্য সারিবদ্ধভাবে অপেক্ষা করছে

ব্যবহারকারীদের জন্য। এই পণ্যগুলির বেশির ভাগই কেবলমাত্র মোড়কের রং ও চিত্রে এবং প্রস্তুতকারকের নামেই একে অন্যের থেকে পৃথক। আপনাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের অধিকাংশ বহু বিজ্ঞাপিত পণ্যই (টুথপেস্ট, সাবান প্রভৃতি) কার্যকারীতায় একে অন্যের থেকে ভিন্ন নয়। একটি বিশেষ মার্কার জিনিসের পরিবর্তে অন্য একটি মার্কার জিনিস ব্যবহার করলে, ব্যবহারকারীদের পক্ষে কোনো তারতম্য বোঝা যাবে না। এই পরিস্থিতিতে, বিজ্ঞাপন-বিশেষজ্ঞের কাছে, বিজ্ঞাপনের বার্তা সৃষ্টিকরা একটি চ্যালেঞ্জ। (বিক্রির জন্য আবেদন নির্বাচন করা)

৩.২ পৃথক্ করণ

কোনো পণ্যের বিজ্ঞাপনে বিক্রির বিশেষ আবেদন স্থির করার প্রথম কাজই হচ্ছে পৃথককরণের বিষয়গুলি নির্ধারিত করা। যাতে, বিজ্ঞাপিত পণ্য বা পরিষেবাটি বাজারে অন্যান্য প্রতিযোগীদের থেকে পৃথক করা যায়। কিছু কিছু পণ্য আছে, যার বৈশিষ্ট আছে, ফলে বাজারের অন্য প্রতিযোগীদের থেকে পণ্যটিকে পৃথকভাবে চিনে বা বেছে নেওয়া কঠিন নয়। এই ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক বা বাস্তব (physical) পার্থক্য বোঝানোর কৌশল অবলম্বন করে, বিজ্ঞাপনের বিক্রির আবেদন সৃষ্টি করা হয়। পণ্যটিতে বর্তমান কোনো বিশেষ অংশকে মুখ্যভাবে প্রদর্শন করে প্রতিযোগীদের থেকে পণ্যটিকে পৃথক করে উপস্থাপিত করা হয়।

কিন্তু বেশির ভাগ পণ্যেরই একটির অন্যের থেকে কোন প্রাকৃতিক বা বাস্তব পার্থক্য নেই। এই ক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপন-বিশেষজ্ঞদের কাজ কঠিন হয়ে পড়ে। বাস্তব পার্থক্য না থাকলে, বিজ্ঞাপিত পণ্যটির জন্য মানসিক পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়। বাস্তবে পণ্যটির বিশেষ কোনো কার্যকরীতার বিষয় জানানো সম্ভব না হলে, আবেগজনিত (emotional) যুক্তি বা ব্যবহারকারীর আবেগের কোনো বিশেষ মাত্রার (dimension)সঙ্গে সংপৃক্ত করে পণ্যটির বিক্রির আবেদন বা বিজ্ঞাপন বার্তা নির্ধারিত করা হয়।

যে কোনো পণ্যের বা পরিষেবার বিজ্ঞাপনে পৃথক্করণ বা পার্থক্য রচনাই চূড়ান্ত উপকরণ বলে গণ্য হয় অনেকগুলি কারণে। প্রথমত, কিছু পার্থক্য না থাকলে, বিজ্ঞাপিত পণ্যটিকে ব্যবহারকারীরা অন্য প্রতিযোগীদের থেকে আলাদা করে চিনবেন কী করে, আর বেছে নির্বাচন করবেনই বা কী ভাবে? দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞাপিত পণ্যটিকে যদি অন্যান্য প্রতিযোগীদের থেকে পৃথক করে চেনা না যায়, তাহলে ব্যবহারকারীরা অন্য পণ্য ব্যবহার বন্ধ করে, এই বিশেষ পণ্যটি কিনবেন এবং ব্যবহার করবেন কেন? তাঁরা ধরে নেবেন, পৃথক চরিত্র বিহীন বিজ্ঞাপিত পণ্যটি, তাঁদের ব্যবহৃত পণ্যটির মতই আর একটি ভিন্ন নামের পণ্য। এক্ষেত্রে, তাঁরা বিজ্ঞাপিত পণ্যটি সম্বন্ধে উৎসাহিত হবেন না এবং বিজ্ঞাপিত পণ্যটির কদর করবেন না।

বেশির ভাগ পণ্যেরই প্রতিযোগীদের থেকে কোনো বাস্তব পার্থক্য নেই। এই ধরনের পণ্যের বিজ্ঞাপনে, মানসিক পার্থক্যের সৃষ্টি করে, পণ্যটিকে প্রতিযোগী পণ্যগুলির থেকে পৃথক প্রতিপন্ন করা হয়। মানসিক পার্থক্য সৃষ্টির জন্য ব্যবহারকারীর কোনো বিশেষ আবেগ উদ্দেশ্য করে আবেদন করা হয়, যাতে তিনি আবেগের জন্য বিজ্ঞাপিত পণ্যটিকে অন্যান্য প্রতিযোগীদের থেকে পৃথক করে চিহ্নিত করতে পারেন। মানসিক পার্থক্যের আবেদন বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। লক্ষ্য রাখতে হবে, আবেগ আবেদন যেন যথার্থই পণ্যটিকে

প্রতিযোগীদের থেকে পৃথক করে চিহ্নিত করতে পারে এবং ব্যবহারকারী যেন এই আবেগ-আবেদন অর্থবাহী এবং কার্যকরী মনে করেন।

কোনো টুথপেস্ট যখন দাবি করে — লবঙ্গতেল যুক্ত, তখন সেটি প্রাকৃতিক বা বাস্তব পার্থক্যের কৌশল অবলম্বন করেছে বুঝতে হবে। বক্তব্য — এই টুথপেস্টটিতে লবঙ্গ তেল আছে। বাজারের অন্যান্য টুথপেস্টগুলিতে লবঙ্গতেল নেই। অতএব এই টুথপেস্টটি পৃথকভাবে মনে রাখার যোগ্য। আবার কোনো শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপনে দেখানো হচ্ছে, এটি ব্যবহারের ফলে কোনো তরুণীর দিকে সবাই বারবার ফিরে তাকাচ্ছে। এক্ষেত্রে মানসিক পার্থক্যের সৃষ্টি করা হয়েছে। এই শ্যাম্পুটি হয়তো বাজারের অন্যান্য শ্যাম্পুর থেকে বাস্তবে পৃথক নয়, কিন্তু ব্যবহারকারীর একটি বিশেষ মানসিক আবেগের উদ্দেশ্যে আবেদন করা হয়েছে।

৩.৩ পৃথক পরিচিতি

যে কোনো পণ্য বা পরিষেবার বিজ্ঞাপনের মূল উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপিত পণ্য বা পরিষেবার একটি নির্দিষ্ট, পৃথক পরিচিতি (distinct different identity) প্রতিষ্ঠা করা। ব্যবহারকারী যাতে বিজ্ঞাপিত পণ্য বা পরিষেবাটিকে বাজারের অন্যান্য প্রতিযোগীদের থেকে পৃথক করে চিহ্নিত করতে পারে।

বিজ্ঞাপিত পণ্যের স্বতন্ত্র পরিচিতি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন-বিশেষজ্ঞরা দুরকম কৌশল অবলম্বন করেন, সে বিষয়ে আপনারা জেনেছেন। এবারে দুটি কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

বিজ্ঞাপন-বিশেষজ্ঞরা সব সময় চেষ্টা করেন, ব্যবহারকারীদের কোনো বিশেষ কারণ, সুবিধা বা লাভের সুযোগ বিজ্ঞাপনে জানাতে, যাতে তাঁরা ঐ বিজ্ঞাপিত পণ্যটি ব্যবহার করতে উৎসাহিত হন। মনস্তাত্ত্বিকেরা মানুষের বিভিন্ন সঞ্চালনশক্তি (motivation) এবং আকাঙ্খা নিয়ে বিস্তর গবেষণা করে কতকগুলি আকাঙ্খা এবং সঞ্চালকশক্তিকে চিহ্নিত করেছেন। বিজ্ঞাপন-বিশেষজ্ঞরা অনেক ক্ষেত্রেই মনস্তাত্ত্বিকদের চিহ্নিত সাধারণ মানুষের বিভিন্ন আকাঙ্খা এবং সঞ্চালনশক্তি সুকৌশলে ব্যবহার করেন বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে।

৩.৪ অনন্য বিক্রির প্রস্তাব (Unique Sales Proposition)

অনন্য বিক্রির প্রস্তাব (U.S.P.) উপস্থাপন হয়, পণ্যটির কোনো বাস্তব পৃথক্‌করণের উপকরণের উপর ভিত্তি করে। এই পার্থক্য ব্যবহারকারীকে প্রভাবিত করতে পারে এমন অর্থপূর্ণভাবে বিজ্ঞাপনে অবশ্যই জানাতে হবে। পণ্যটি কিনবার এবং ব্যবহার করার নির্দিষ্ট কারণ না জানালে, বিজ্ঞাপন কার্যকরী হয় না। পণ্যটির একটি বিশেষ উপাদান থাকা অবশ্য প্রয়োজন, যা পণ্যটির প্রতিযোগীদের নেই। বিজ্ঞাপনের কৌশল পরিকল্পনা নির্ভর করে পণ্যটিতে যথার্থই কোনো বাস্তব পার্থক্য আছে কিনা তার উপর। এই বাস্তব পার্থক্য এমনই হওয়া প্রয়োজন, যা ব্যবহারকারীদের কাছে কোনো বিশেষ কারণে, সুবিধাজনক মনে হবে।

অনন্য বিক্রির প্রস্তাব তত্ত্বটির (term/concept) প্রবক্তা রোজার রিভস্ (Rosser Reeves), তিনি বিজ্ঞাপন সংস্থায় বিষয়লিপি লেখক ছিলেন। তাঁর মতে —

অনন্য (Unique) — প্রস্তাবটি অনন্য হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। প্রতিযোগী কোনো পণ্য যেন এই বাস্তব উপাদান আছে বলে দাবি করতে না পারে। এই অনন্য পার্থক্য বিশেষ মার্কাযুক্ত পণ্যের হতে পারে অথবা ঐ পণ্যটির সমগোত্রীয় কোনো পণ্যের বিজ্ঞাপনে কখনও দাবি করা হয়নি, — এমনও হতে পারে।

বিক্রি (Sales) — প্রস্তাবটি এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে অসংখ্য ব্যবহারকারী এই পণ্যটি ব্যবহারের জন্য আকৃষ্ট হন।

প্রস্তাব (Proposition) — প্রতিটি বিজ্ঞাপনই ব্যবহারকারীদের কাছে একটি বিশেষ প্রস্তাবের রূপ গ্রহণ করবে। কেবল কতকগুলি শব্দের সমাহার নয়। বিজ্ঞাপন যেন প্রতিটি গ্রাহকের মনে বিশ্বাস জন্মাতে (Convinced) পারে — "এই পণ্যটি কিনলে আপনি এই বিশেষ সুবিধা পাবেন।"

কোনো পণ্যের অনন্য বিক্রির প্রস্তাব (U.S.P.) উদ্ভাবন বা নির্ধারণ করা সহজ কাজ নয়। প্রথমেই বিবেচনা করতে হবে — পণ্যটির ব্যবহারকারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে পণ্যটির অনন্য বাস্তব পার্থক্য কী হতে পারে। বিজ্ঞাপনদাতার দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। ব্যবহারকারীরা প্রয়োজনীয়, সুবিধাজনক এবং আকর্ষণীয় মনে করবেন — এই রকম কোনো বিশেষ বাস্তব পার্থক্যই অনন্য বলে গণ্য হবে। বিষয়লিপি লেখককে মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞাপন করা হয়, পণ্য বা পরিষেবা বিক্রি করার জন্য। ব্যবহারকারীকে বোঝাতে হবে — পণ্যটি ব্যবহার করলে তার কী বিশেষ সুবিধা বা লাভ হবে। ব্যবহারকারীরা অনন্য বাস্তব পার্থক্যটিকে কেবল একটি উপাদান হিসাবে দেখেন না। এই পার্থক্যের দরুণ ব্যবহারকারীর কী সুবিধা হবে, চিন্তা করেন। আগেই উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, একটি টুথপেস্ট দাবি করে — লবঙ্গতেল যুক্ত। যে ব্যবহারকারী এই টুথপেস্ট কেনেন এবং ব্যবহার করেন, তিনি লবঙ্গ তেল যুক্ত বলে টুথপেস্টটি ব্যবহার করেন না। লবঙ্গ তেল দাঁতের সুরক্ষার পক্ষে বিশেষ কার্যকরী এবং মাড়ির রক্ষণাবেক্ষণেও সহায়ক, — এই উপকারগুলি পাওয়া যাবে বলেই তিনি লবঙ্গতেল যুক্ত টুথপেস্ট ব্যবহার করেন।

৩.৫ নাম-এর ভাবমূর্তি

নাম-এর ভাবমূর্তি বা ব্র্যাণ্ড ইমেজ কৌশল পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপিত পণ্যটির সম্বন্ধে একটি বাতাবরণ সৃষ্টি করা অথবা পণ্যটিকে ঘিরে একটি বিশেষ প্রভাবের পরিমণ্ডল রচনা করা। বিভিন্ন প্রতীকের সাহায্যে সৃষ্ট এই পরিমণ্ডল বা বাতাবরণ পণ্যটির সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের নিকট আকর্ষণীয় হওয়া প্রয়োজন। সেই কারণে যে যে প্রতীকের সাহায্যে বাতাবরণ সৃষ্টি করা হবে, সেগুলি নির্বাচনের সময় বিশেষ সতর্কতা নেওয়া প্রয়োজন।

সহজভাবে দেখতে গেলে, নাম-ভাবমূর্তি কৌশল আসলে 'অনন্য বিক্রির প্রস্তাব' কৌশলের বিপরীত বা পরিপূরক। বাস্তব গুণের পৃথক্‌করণের কৌশলের সমান্তরাল — মানসিক পার্থক্যের ভাবনা সৃষ্টি করে পৃথক্‌করণ। প্রকৃতপক্ষে, বাজারে প্রায় একরকমের, অসংখ্য পণ্যের মধ্যে পৃথক্‌করণের সুবিধার জন্যই নাম-ভাবমূর্তি তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। বিজ্ঞাপনের দ্বারা, বিজ্ঞাপিত পণ্যটিকে মানসিকভাবে পৃথক হিসাবে ব্যবহারকারীদের কাছে উপস্থাপন করা বর্তমানে বিজ্ঞাপনদাতাদের মধ্যে বিশেষ আকর্ষণীয় এবং কার্যকরী।

তবে নাম-ভাবমূর্তি-কৌশলের জন্য প্রতীক বা বাতাবরণ নির্ধারণ করার জন্য, পণ্যটির ব্যবহারকারীদের সম্বন্ধে সম্যক তথ্য সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে জানতে হবে, পণ্যটি থেকে, ব্যবহারকারী কী ধরনের মানসিক আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে বলে আশা করেন। পণ্যটির ব্যবহার, ব্যবহারকারীর মানসিক আশাপূরণ বা সন্তুষ্টি এবং পণ্যটির গুণের মেলবন্ধন ঘটিয়ে, বাতাবরণ বা প্রতীক নির্বাচন করা আবশ্যক। নাম-ভাবমূর্তি — পণ্যটির বহির্ভূত, মানসিক পৃথককরণের দ্বারা, পণ্যটির প্রাধান্য বা স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করা।

৩.৬ ডেভিড অগিলভির বক্তব্য

নাম-ভাবমূর্তি তত্ত্বের প্রবক্তা, ডেভিড অগিলভি (David Ogilvy) বলেছেন — "আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনার বিশেষ নামযুক্ত, পণ্যটির জন্য কীরকম ভাবমূর্তি সৃষ্টি করবেন। ভাবমূর্তি আসলে — ব্যক্তিত্ব। পণ্যেরও যে কোনো মানুষের মত ব্যক্তিত্ব আছে। এই ব্যক্তিত্ব বাজারে যেমন সুনাম করতে পারে, তেমনি দুর্নামও করতে পারে। একটি পণ্যের ব্যক্তিত্ব — অনেকগুলি উপকরণের সমাহার — পণ্যটির নাম, মোড়ক, মূল্য, বিজ্ঞাপনের বিশেষ ধারা (style) এবং পণ্যটির প্রকৃতি, কোন আকাঙ্খা পূরণ করে।

প্রতিটি বিজ্ঞাপনই এমনভাবে পরিকল্পিত হবে, যাতে নাম-ভাবমূর্তির সহায়ক হয়। অর্থাৎ, আপনার বিজ্ঞাপন বছরের পর বছর, সামঞ্জস্য বজায় রেখে, একই ভাবমূর্তি প্রকাশ (project) করবে। এই নীতি বজায় রাখা কঠিন, কারণ সব সময়েই বিজ্ঞাপন পরিবর্তন করার নানা প্রস্তাবের চাপ আসে। কখনো নতুন বিজ্ঞাপন সংস্থা, কখনো বা নতুন মার্কেটিং ডাইরেক্টর তাঁদের কাজ দেখানোর উদ্দেশ্যে এই ধরনের প্রস্তাব দেন।

বেশির ভাগ পণ্যের জন্য উৎকর্ষের ভাবমূর্তি সৃষ্টি করা ভাল কাজ দেয় — এটা যেন প্রথম শ্রেণীর টিকিট। যে সব পণ্য আপনি বন্ধুদের সামনেই ব্যবহার করেন, সেই সব পণ্যের ক্ষেত্রে — এই কথা বিশেষভাবে সত্য প্রমাণিত হয়। যেমন - বিভিন্ন পানীয়, সিগারেট, গাড়ি, আপনার জামাকাপড়। আপনার বিজ্ঞাপন যদি সস্তা বা খেলো, নিকৃষ্ট দেখায়, — তাহলেই হয়ে গেল।

কোনো ব্যবহারকারী কী চাইবেন, তিনি সস্তা বা খেলো জিনিস ব্যবহার করছেন, — আর পাঁচজনে দেখুক?

এরপরেও যদি কোনো সোজা-বিক্রির (hard sell) প্রবক্তা নাম-ভাবমূর্তির গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, তাঁকে প্রশ্ন করুন, একটি অখ্যাত সিগারেট—মার্লবরো কেমন করে বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রিত সিগারেটের স্থান অধিকার করল? .....

কোনো প্রস্তুতকারক যদি তাঁর পণ্যের জন্য সুনির্দিষ্ট ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই সমগ্র বিজ্ঞাপন-কৌশল উৎসর্গ করেন, তাহলে তাঁর পণ্য অবশ্যই সর্বাধিক লাভজনক পণ্য হিসাবে বাজারের বৃহত্তর অংশ দখল করতে পারবে।"

৩.৭ পণ্যের ব্যক্তিত্ব

ডেভিড অগিলভি 'মার্লবরো' সিগারেটের উদাহরণ দিয়েছেন। ভারতে 'উইল্‌স্ ফিলটার' সিগারেটের সাফল্য "মেড ফর ইচ আদার" ভাবমূর্তির জন্য।

কোনো চিহ্নিত পণ্যের (brand) "ব্যক্তিত্ব" নির্ভর করে অনেক কিছুর উপরে। ব্যবহারকারীদের মনোভাব (attitudes) অথবা পণ্যটি ব্যবহারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট মানসিক প্রতিচ্ছবি, সম্ভ্রান্তব্যক্তির (heer) মন্তব্য এবং বিজ্ঞাপনের বার্তা, সবকিছুর মিশ্রণেই সৃষ্টি হয় চিহ্নিত পণ্যের ভাবমূর্তি। এই ভাবমূর্তি সদর্থক হতে পারে, নিরপেক্ষ হতে পারে, আবার নেতিবাচকও হতে পারে। ঠিক যেমন আপনার পরিচিত কোনো লোকের সম্বন্ধে আপনি ধারণা পোষণ করেন — ভালো, অথবা মোটামুটি, অথবা মন্দ। চিহ্নিত-পণ্যের ব্যক্তিত্ব বা ভাবমূর্তির সম্বন্ধে ব্যবহারকারীদের মনে এই রকম ধারণাই সৃষ্ট হয়। এই ভাবমূর্তি — বিজ্ঞাপনদাতা যেমন প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা করতে চান ঠিক তেমনই হতে পারে, আবার বিজ্ঞাপনদাতার উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার বিপরীতে অন্যরকমও হতে পারে।

নামভাবমূর্তি

যুক্তি	আবেগ
অনন্য বিক্রির প্রস্তাব	চিহ্নিত পণ্য

যে কোনো চিহ্নিত পণ্যের নাম-ভাবমূর্তি, পণ্যটির অবস্থানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে যায়।

৩.৮ পণ্যের অবস্থান

কোনো পণ্যের ব্যবহারকারীরা, পণ্যটির বিভিন্ন ব্যবহারিক গুণবিচার করে পণ্যটির যে বিশেষ সংজ্ঞা রচনা (definition) করেন, সেইটিই পণ্যটির অবস্থান বলে গণ্য হয়। প্রতিযোগী পণ্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, বিজ্ঞাপিত পণ্যটি ব্যবহারকারীদের মনে যে স্থান অধিকার করে থাকে, সেইটিই পণ্যের অবস্থান বলে চিহ্নিত। যেমন "মারুতি ৮০০ গাড়ি" শুনলেই আপনার মন বলবে - "ছোট পরিবারের জন্য হালকা গাড়ি, পেট্রোল খরচ কম।" কিন্তু "মারুতি এস্টিম" শুনলেই আপনি চিন্তা করেন - "বড় গাড়ি, বিলাস গাড়ি" ইত্যাদি। অর্থাৎ একই কোম্পানির দুটি গাড়ি আপনার মনে, দুটি ভিন্ন অবস্থানে রয়েছে। একটি মধ্যবিত্ত ব্যবহারকারীর জন্য, অপরটি উচ্চবিত্ত ব্যবহারকারীর জন্য। ব্যবহারকারীর মনে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানকেই পণ্যের অবস্থান বলা হয়।

ব্যবহারকারীদের প্রতিদিন অসংখ্য পণ্য এবং পরিষেবার নানারকম তথ্য পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। বলা যেতে পারে, সকল ব্যবহারকারীই পণ্য এবং পরিষেবার তথ্যে ভারাক্রান্ত। প্রতিবার কোনো জিনিস কিনবার সময় তাঁরা বিভিন্ন চিহ্নিত নামের পণ্যের সকলতথ্য তুলনামূলকভাবে বিচার করে জিনিস কিনবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। কারণ সেটা সম্ভব নয়। তাঁদের ক্রয়-সিদ্ধান্ত সহজ করার জন্য তাঁরা বিভিন্ন পণ্য এবং পরিষেবাকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করে তাঁদের মনে বিভিন্ন অংশে স্মরণীয়ভাবে ধরে রাখেন। গ্রাহকদের মনের যে বিশেষ জায়গায় গ্রাহকেরা পণ্যটিকে স্থাপন করেন, সেইটিই ঐ বিশেষ পণ্যটির বা চিহ্নিত নামের পণ্যটির অবস্থান। ব্যবহারকারীর মনে কোনো পণ্যের অবস্থান এক জটিল পদ্ধতির দ্বারা সংঘটিত হয়। এই পদ্ধতি, গ্রাহকদের অভিজ্ঞতালব্ধ বিভিন্ন ধারণা, পণ্যটির প্রতিচ্ছবি, এবং প্রতিযোগী পণ্যগুলির তুলনায়, চিহ্নিত নামের পণ্যটি সম্বন্ধে

ব্যবহারকারীদের অনুভূতি, এবং যে যে আকাঙ্ক্ষার সন্তুষ্টিবিধান পণ্যটি থেকে আশা করা হচ্ছে, — এই সব কিছুর সংমিশ্রণ। ব্যবহারকারীরা তাঁদের ইচ্ছা অনুযায়ী বিভিন্ন চিহ্নিত পণ্যকে বিভিন্ন অবস্থানে স্থাপন করেন। বিপণন এবং বিজ্ঞাপন বিশেষজ্ঞরা চেষ্টা করেন যাতে গ্রাহকদের ধারণা বিপণনকারীদের নির্ধারিত পথে চলে এবং চিহ্নিত পণ্যটির অবস্থান যেন তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুসারেই হয়।

যে কোনো চিহ্নিত পণ্যের অবস্থান বাস্তবে পণ্যটিকে অন্যান্য প্রতিযোগী পণ্যের থেকে পৃথক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে, আর, এই সঙ্গেই, প্রকারান্তরে গ্রাহকদের মনে ধারণার সৃষ্টি করে, তাঁদের আকাঙ্খাপূরণের জন্য চিহ্নিত পণ্যটিকে নির্বাচিত করাই সুবিধাজনক। (প্রতিযোগীদের থেকে)।

৩.৯ পণ্যের অবস্থান নির্ণয়ের কৌশল

আমরা আলোচনা করেছি মারুতি গাড়ির দুটি মডেলের দুই রকম অবস্থান সম্পর্কে। বিপণন এবং বিজ্ঞাপনের সাহায্যে এই দুইরকম অবস্থান ব্যবহারকারীদের মনে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যাতে ব্যবহারকারীরা তাঁদের নিজের নিজের আকাঙ্খার সঙ্গে বিজ্ঞাপিত মডেলের অবস্থান মিলিয়ে নিয়ে, গাড়ি কিনবার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এই অবস্থান, পণ্যটির বিশেষ গুণাবলির উপর নির্ভর করে স্থির করা হয়েছে। কোনো বিশেষ চাহিদা মেটানোর গুণ বা বিশেষ সুবিধার উপর ভিত্তি করেও পণ্যের অবস্থান নির্ণয় করা যেতে পারে। যেমন, কোলগেট ডেন্টাল ক্রিম — নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করে। পামোলিভ শেভিং ল্যাদার, সবচেয়ে শক্ত দাড়িও নমনীয় করে তোলে। বিভিন্ন পণ্যের ব্যবহারের সময়োপযোগিতার উপর ভিত্তি করেও পণ্যের অবস্থান নির্ণয় করা হয়। গ্রীষ্মকালে, ঘামের ফলে আপনারা যখন অবসন্ন বোধ করেন, গ্লুকোন ডি তখন নিমেষে শক্তি যোগায়। আবার কোনো কোনো পণ্যের অবস্থান বিশেষ বয়সের গ্রাহকদের জন্য নির্ধারিত করা হয়। চকোলেটের অবস্থান সাধারণত বাচ্চাদের কথা ভেবেই বিবেচনা করা হয়। এর ফলে বাজার সীমিত হয়ে যাচ্ছে দেখে, আমুল চকোলেটের অবস্থান পরিবর্তন করে, সব বয়সের গ্রাহকদের জন্য নতুন করে অবস্থান নির্ধারণ করা হয়। (You are never too young for Amul Chocolate. You are never too old for Amul Chocolate).

কোনো পণ্যের অবস্থান সরাসরি প্রতিযোগী পণ্যের বিপক্ষেও করা যেতে পারে। 'কমপ্ল্যান' দাবি করে সমগোত্রীয় অন্যান্য পণ্যের থেকে ভিটামিন ও প্রোটিন 'কমপ্ল্যান' - এ অনেক বেশি থাকে। 'এরিয়েল' ডিটারজেন্ট পাউডার দাবি করেছে — সাদা করার জন্য অন্য কিছু ব্যবহার করতে হবে না।

পণ্যের কোনো বিশেষ শ্রেণিকে পরিচিত করেও পণ্যের অবস্থান নির্ধারণ করা যেতে পারে। যেমন — ডেটল সাবান। এই পণ্যটির অবস্থান সাবান নয়, বীজবারক (antiseptic) হিসাবে।

যে কোনো পণ্যের অবস্থান কৌশল নির্ণয়ের জন্য ব্যবহারকারীদের বিষয়ে বিশেষ করে জানতে হবে। ব্যবহারকারীর মনে বিভিন্ন চিহ্নিত পণ্যের কী রকম বিভিন্ন অবস্থান রয়েছে সেটা না জানলে, কোন অবস্থান নির্ধারণ করলে প্রতিযোগিতায় কার্যকরী হবে, বুঝবেন কেমন করে? প্রতিযোগী পণ্যগুলির অবস্থানও বিশেষ ভাবে জানা আবশ্যক।

সহজ করে বলতে গেলে, কোনো চিহ্নিত পণ্যের অবস্থান আসলে পণ্যটির সাধারণ ব্যবহারকারীর মনে — পণ্যটির একটি সরলীকৃত ছবি বা ব্যক্তিত্ব। ব্যবহারকারীরা কোনো পণ্যের সম্পর্কে যে যে বিষয় চিন্তা করেন,

যেমন, পণ্যটির সুনাম, উৎকর্ষ, কী ধরণের ব্যবহারকারী এটি ব্যবহার করেন, পণ্যটির শক্তি এবং দুর্বলতা, অন্য কোনো বিশেষ দিক, এর দাম এবং পণ্যটির মূল্য সম্বন্ধে সচেতনতা, — সব মিলিয়ে একটি সরল ব্যক্তিত্ব।

এই অবস্থান নির্ধারণ করা যায় দুটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে —

পণ্য বা পরিষেবাকে কেন্দ্র করে অবস্থান নির্ধারণ করা যেতে পারে। পণ্যটির বাস্তব অবস্থানকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। পণ্যটি কী কাজে ব্যবহার হয়, কীভাবে তৈরি করা হয়েছে, কী কী উপাদান সহযোগে তৈরি হয়েছে, প্রতিযোগী পণ্যের তুলনায় কী হিসাবে শ্রেষ্ঠ, কীভাবে ব্যবহার করা হয়, ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে পণ্যের অবস্থান নির্ধারণ করা যেতে পারে।

অপরদিকে, পণ্যটির ব্যবহারকারীদের উপর ভিত্তি করেও অবস্থান নির্ধারণ করা যায়। ব্যবহারকারীরা কী ধরনের লোক, তাঁরা সমাজের কোন শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত? তাঁদের জীবনযাত্রা কী রকম? কোনো বিশেষ উপলক্ষ (occasion) এ পণ্যটির ব্যবহার, এই সবের উপর ভিত্তি করেও পণ্যের অবস্থান নির্ণয় করা হয়।

পণ্যের উপর ভিত্তি করে অবস্থান না ব্যবহারকারীর উপর ভিত্তি করে অবস্থান? সিদ্ধান্ত কী ভাবে হবে?

সাধারণত যে সব পণ্যের ব্যবহারিক গুরুত্ব বেশি, কার্যকারিতাই বিশেষ বিবেচ্য, সেই সব পণ্যের ক্ষেত্রে, পণ্যের উপর ভিত্তি করেই অবস্থান নির্ণয় করা হয়।

সাধারণত যে সব পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীরা ফ্যাশান এবং ভাবমূর্তিকে গুরুত্ব দেন, এবং ঐ সব পণ্যের সঙ্গে নিজেকে চিহ্নিত করতে পছন্দ করেন, সেই সব ক্ষেত্রে — ব্যবহারকারীর দৃষ্টিকোণ থেকেই পণ্যের অবস্থান নির্ণয় হয়।

যে সব পণ্যের যথার্থই কোন বিশেষ সুবিধা বা উপকরণ আছে, সেই পণ্যের অবস্থান পণ্যের উপরে ভিত্তি করেই নির্ধারিত হয়। যেমন — লবঙ্গতেল যুক্ত টুথপেস্ট। লেবু যুক্ত সাবান।

যে সব পণ্যের প্রতিযোগীদের থেকে বিশেষ কোনো তারতম্য নেই, এবং মোটামুটি এমন ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে, ব্যবহারকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে পণ্যের অবস্থান নির্ণয় হয়। যেমন - এই সাবানটি আপনাকে সারাদিন ঝরঝরে তাজা রাখবে। অথবা, এই ট্যালকম পাউডার আপনাকে স্নিগ্ধ অনুভূতি দেবে।

এবারে আসুন, সাম্প্রতিক কতকগুলি চিহ্নিত পণ্যের ভাবমূর্তি এবং অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা যাক।

লিরিল নামের সাবানটির বিজ্ঞাপনে সাবানটির পরিকল্পিত ভাবমূর্তি এবং অবস্থান ক্রমাগত আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ব্যবহারকারীদের মনে একটি ঝরঝরে তাজা অনুভূতি সৃষ্টি করে বোঝানো হচ্ছে, লিরিল সাবান সারাদিন ঝরঝরে তাজা রাখে। পন্ডস ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যালকম পাউডারের বিজ্ঞাপনে একটি স্নিগ্ধ অনুভূতির সূক্ষ্ম আবেদন সৃষ্টি করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনে বর্ণিত একটি তরুণীর বিভিন্ন পরিবেশে স্নিগ্ধ অনুভূতির আবেগ এবং উচ্ছলতা বার বার প্রকাশ করে আপনার মনে একটি ভাবমূর্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে, যার প্রভাবে আপনার ধারণা — পন্ডস পাউডারের স্নিগ্ধ অনুভূতি সারাদিন আপনাকে ফুরফুরে রাখে।

ব্র্যান্ড-ইমেজ— মহান শক্তিদাতা। পঁচিশ বছর আগের হরলিক্স-এর বিজ্ঞাপনে একই ভাবমূর্তি গড়ার প্রয়াস

পঞ্চাশ বছর আগের বিজ্ঞাপন—
স্বাস্থ্যকে রক্ষা করে লাইফবয়। ফটোগ্রাফ থেকে বিশেষ ট্রিটমেন্ট
স্ক্র্যাপার বোর্ড ড্রইং।
মুদ্রণ যাতে ভালো হয় সেই উদ্দেশ্যে এই ট্রিটমেন্ট করা হতো।

'লাক্স' সাবানের ভাবমূর্তি পঞ্চাশ বছর আগেও 'চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য সাবান'

আপনারা সকলেই ছোটোবেলা থেকেই হরলিকস্-এর বিজ্ঞাপন দেখে আসছেন। বিভিন্ন সময়ের হরলিকস্-এর বিজ্ঞাপনের মূল বার্তা — শক্তিদাতা। এত বছর ধরে একই আবেদন আপনার মনে হরলিকস্-এর একটি ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছে - সেই ভাবমূর্তি শক্তিদাতার। বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে হরলিকস্-এর শক্তিদাতা ভাবমূর্তিই এত বছর ধরে আপনার সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

বিজ্ঞাপনের পাশাপাশি ব্যবহারিক জীবনে আপনার অভিজ্ঞতাও একই রকম। বিভিন্ন বয়সে, বিভিন্ন সময়ে আপনি দেখেছেন, পরিবারে কেউ অসুস্থতার ফলে বা অন্য কোনো কারণে দুর্বল হয়ে পড়লে, তাকে হরলিকস দেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে একই কারণে ডাক্তারও হরলিকস খেতে বলেছেন। বিজ্ঞাপনে প্রচারিত ভাবমূর্তি এবং আপনার ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতা, সব কিছু মিলিয়ে আপনার মনে হরলিকস্ এর "মহানশক্তিদাতা" ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আপনার মন থেকে এই ভাবমূর্তি নড়িয়ে দেওয়া বা অপসারণ করা দুরূহ কাজ। সেই জন্যই বড় বড় বিপণন-সংস্থা তাঁদের পণ্যের দীর্ঘস্থায়ী, বিশ্বাসযোগ্য ভাবমূর্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেন। ভাবমূর্তিই তাঁদের পণ্যের বিশ্বস্ত গ্রাহকগোষ্ঠী সৃষ্টি করে যাঁরা সহজে প্রতিযোগী পণ্য ব্যবহার করেন না। কোম্পানীর বিপণন লক্ষ্য, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচী শক্ত ভিত্তির উপর নির্ভর করতে পারে।

এই কারণে, দীর্ঘস্থায়ী পণ্য বিপণনের পরিকল্পনায় পণ্যের ভাবমূর্তি সৃষ্টি করা বিশেষ প্রয়োজন। এবং পণ্যের ভাবমূর্তি সৃষ্টিতে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যে কোনো ব্র্যাণ্ডের উত্থান-পতন নির্ভর করে ব্র্যাণ্ডের বিজ্ঞাপনের উপর। অথচ বিপণনকারী সংস্থার একান্ত প্রয়োজন শক্তিশালী ব্র্যাণ্ড বা ভাবমূর্তি। পণ্যের ভাবমূর্তি যদি শক্তিশালী হয় তাহলে গ্রাহকেরা ব্র্যাণ্ডের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন। প্রতিযোগী পণ্যের দামের হ্রাসবৃদ্ধি, বা দামের তুলনা গ্রাহকের মনে বিশেষ রেখাপাত করে না, যদি ব্র্যাণ্ডের ভাবমূর্তির নিজস্ব বল থাকে। ভাবমূর্তিই পণ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রাহকের মন প্রভাবিত করে। পণ্যের ভাবমূর্তি জোরালো হলে, বিপণনের কাজেও সুবিধে হয়।

বলা হয়ে থাকে, বিশ্বের বড় বড় কোম্পানি আজকাল আর পণ্যের বিজ্ঞাপন করেন না। ভাবমূর্তির বিজ্ঞাপন করেন। একটি পণ্য একটি বিশেষ শ্রেণি মাত্র, যেমন, সাবান, টুথপেস্ট, গাড়ি কিংবা কাপড় কাচা সাবান। একটি শ্রেণিতে সব পণ্যই সমান, নাম ব্যতীত পৃথক কোনো চরিত্র নেই। কিন্তু একই কোম্পানি বেশ কয়েকটি সাবান প্রস্তুত এবং বিপণন করতে পারে। যেমন লিরিল, লাক্স, লাইফবয়, তিনটি সাবানই একই কোম্পানির তৈরি। আপনারা জানেন এই তিনটি সাবানের বিজ্ঞাপনের দ্বারা সৃষ্ট ভাবমূর্তি তিনটি ভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছে। লাক্স—চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য সাবান, লিরিল ঝরঝরে তাজা রাখে, আর লাইফবয় আপনাকে বীজাণু থেকে রক্ষা করে। ব্র্যাণ্ডের ভাবমূর্তি আপনাকে পণ্য চিনতে এবং নির্বাচন করতে সহায়তা করে। এই ভাবমূর্তিতে রয়েছে — নাম, পরিচিতির উপায় (সৌন্দর্য ইত্যাদি)। সঙ্গে রয়েছে অতিরিক্ত গুরুত্ব (value) যে সব গুণ গ্রাহকদের কার্যকরী এবং মানসিক সন্তুষ্টি বিধান করে। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, পণ্যটি কেমন কাজের, কত দাম, মোড়কটির কী রকম রং, স্বাদ, গন্ধ, আকার, বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এবং বিজ্ঞাপনের সংমিশ্রণ। এই সব কিছু মিলে ব্র্যাণ্ডের ভাবমূর্তি গড়ে তোলে, যে ভাবমূর্তি গ্রাহকের মনে স্থান করে নেয়।

৩.১০ মূল সূত্র কী কী?

ভাবমূর্তি সৃষ্টি এবং প্রতিষ্ঠার জন্য বিজ্ঞাপনের নানারকম কৌশল অবলম্বন করা হয়।

বিজ্ঞাপন কর্মসূচীর নকশায় বিজ্ঞাপনের কলাকৌশলে একটি বিক্রির প্রস্তাব গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে তাঁদের মনে অনবদ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। সৃজনশীল রণকৌশল অবশ্যই এক একটি পণ্যের ক্ষেত্রে, পরিস্থিতির বিচারে ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করবে, কিন্তু এই মূল সূত্রগুলি অবশ্যই অনুসৃত হবে।

- **লক্ষ্য** কোন বিশেষ সমস্যার সমাধান প্রয়োজন? গ্রাহক কী করবেন, বা ভাববেন?
- **উদ্দীষ্ট গ্রাহক** সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ (important) উদ্দীষ্ট গ্রাহক কে বা কারা? তাঁর বা তাঁদের সম্বন্ধে কী কী জানা প্রয়োজন?
- **গ্রাহকের বিশেষ সুবিধা** গ্রাহকটি আপনার বিজ্ঞাপিত পণ্যটি কিনবেন বা ব্যবহার করবেন কী কারণে?
- **আনুকূল্য** গ্রাহক কেন বিজ্ঞাপিত পণ্যটি কিনবেন তার অনুকূলে যুক্তি দিতে হবে, যাতে বিজ্ঞাপনে পণ্যের যে গুণ দাবি করা হচ্ছে, তার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ হয়।
- **আকার এবং প্রকার** বিজ্ঞাপিত পণ্যটির কোন ভাবমূর্তি প্রচার করা হবে, সে বিষয়ে বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নেওয়া।

৩.১১ কৌশল নির্ণয়

যে পণ্যটির বিজ্ঞাপনের দ্বারা একটি ব্র্যাণ্ড বা বিশেষ ভাবমূর্তি সৃষ্টি এবং প্রতিষ্ঠা করা হবে, সেই পণ্যটি সম্বন্ধে সকল তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তথ্য কেবল পণ্যটি সম্বন্ধে নয়, তথ্য পণ্যটির প্রতিযোগীদের, পণ্যটির বাজারের, এবং ব্যবহারকারীদের। ব্যবহারকারীর কোন বিশেষ আকাঙ্ক্ষা এই পণ্যটি পূরণ করতে সক্ষম হবে?

এরপরে সংগৃহীত সকল তথ্য বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন প্রস্তাব স্থির করে, আলোচনা করা প্রয়োজন।

এই বারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, — ভাবমূর্তির লক্ষ্য কী হবে। বিজ্ঞাপনের ফলশ্রুতি হিসাবে গ্রাহকরা পণ্যটি সম্বন্ধে কী চিন্তা করবেন, ভাবনা করবেন এবং বিশ্বাস করবেন? "ঝরঝরে তাজা", "সৌন্দর্য বর্ধক", না "মহান শক্তিদাতা"? এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বে উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি বিশেষ গুরুত্বসহকারে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

ভাবমূর্তি নির্বাচনের কৌশলের মূল কথা — গ্রাহকরা বর্তমানে পণ্যটি সম্বন্ধে কী ভাবেন, এবং ভাবমূর্তির সাহায্যে পণ্যটি সম্বন্ধে গ্রাহকদের ধারণা পরিবর্তন ক'রে, উদ্দীষ্ট ধারণার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা।

- কোন বার্তা গ্রাহকদের মনোভাব এবং ব্যবহার পরিবর্তন করার সহায়ক হবে?
- পণ্যটির বাস্তব গুণাগুণ নিয়েই কি ভাবমূর্তি গড়ে তোলা হবে না কোনো আবেগ জনিত আবেদন বা অনুভূতি দিয়ে ভাবমূর্তি রচনা হবে?
- পণ্যটির প্রতিশ্রুতি (promise) কী?

৩.১২ ভাবমূর্তি সৃষ্টির নির্দেশাবলী

ভাবমূর্তি নির্মাণের জন্য বিজ্ঞাপনের রণকৌশল স্থির করার সময় এই নির্দেশগুলি মনে রাখা প্রয়োজন।

১। **একাগ্রচিত্ত** — বিজ্ঞাপিত পণ্যটির অনেকগুলি কর্মকুশলতা থাকতে পারে। সেইগুলির মধ্যে একটিকে, যেটি সবচেয়ে কার্যকরী হতে পারে, সেই গুণটিই প্রাধান্য সহকারে উপস্থাপন করা হবে। বাকি গুণগুলি অনুল্লিখিত থাকবে। ভাবমূর্তি একটি মূল বিষয়, ধারণা বা গুণকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি করা প্রয়োজন। গ্রাহক যাতে একটি বিশেষ মূর্তি স্মরণে রাখতে পারেন। পূর্বের উদাহরণগুলি স্মরণ করুন।

২। **ঐক্য** — পণ্যটির নাম, মোড়ক, দাম এবং বিজ্ঞাপন সব যেন এক সুরে বাঁধা হয়।

৩। **নির্দিষ্ট লক্ষ্য** — ভাবমূর্তির লক্ষ্য যেন নির্দিষ্ট থাকে এবং যুক্তিযুক্ত হয়। গ্রাহক তাঁর বহুদিনের অভ্যাস বা আকাঙ্খা পরিবর্তন করবেন না। কোনো গ্রাহক যদি স্নানের সাবান থেকে ঝরঝরে তাজা থাকার অনুভূতি আকাঙ্খা করেন, তাহলে পণ্যটিকে" ঝরঝরে তাজা" ভাবমূর্তি সৃষ্টি করতে হবে। গ্রাহককে বোঝানো যাবে না, "সৌন্দর্য বর্ধক" বা "বীজানুনিষেধক" আকাঙ্খা পূরণ করাই শ্রেয়।

৪। **সংক্ষিপ্ততা** — কৌশল যেন সংক্ষিপ্ত হয়, একমুখী হয়, এবং বিভিন্ন ধারণার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে হারিয়ে না যায়।

৫। **ক্রেতা নির্বাচন** — কোন কোন গ্রাহক পণ্যটি কিনবেন, সেই তথ্য জানতে হবে। নতুন ক্রেতারা এই পণ্যটি ব্যবহার করবেন, না প্রতিযোগী পণ্যের, বর্তমান ক্রেতারা বিজ্ঞাপিত পণ্যটি ব্যবহার করবেন? এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া বিশেষ জরুরি।

৬। **অর্থবহতা বা প্রাসঙ্গিকতা** — পণ্যটির প্রতিশ্রুতি বা আশ্বাস যেন বিশেষ অর্থপূর্ণ হয়। পণ্যের বিভিন্ন গুণের সংক্ষিপ্ত সমাহার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি বা আশ্বাস। এই প্রতিশ্রুতি বস্তুগত অথবা কল্পিত হতে পারে আবার যুক্তিযুক্ত বা ভাবাবেগ জনিতও হতে পারে। মনে রাখতে হবে, যে কোনো বিজ্ঞাপনের প্রাণ-আত্মা এই প্রতিশ্রুতি।

৭। **গুরুত্ব** — পণ্যটির গুরুত্ব বা গুরুত্বহীনতা বুঝতে হবে। সকল পণ্যের ব্যবহারের সঙ্গে গ্রাহকের অহংবোধ বিজড়িত থাকে। কোনো পণ্যের পক্ষে মন এবং কোনো পণ্যের পক্ষে যুক্তি বেশি। যেমন ধরুন বাড়িতে কোন চালের ভাত হবে, সে বিষয়ে গ্রাহকের অহংবোধ কম। কারণ, কোন চালের ভাত হচ্ছে, তাঁর পরিচিত বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজন দেখছেন না বা জানছেন না। কিন্তু কোন গাড়ি চড়ছেন, কোন শার্ট পরছেন, যে পাউডার ব্যবহার করেছেন তার সুবাস জানিয়ে দিচ্ছে ব্র্যাণ্ড নাম। এক্ষেত্রে গ্রাহকের অহং বোধ বিশেষভাবে জড়িত।

৮। **বৈশিষ্ট্য** — আর, এই এককের শুরুতেই আলোচনা করা হয়েছে, পণ্যটি প্রতিযোগী পণ্যগুলির থেকে আলাদাভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেই জন্যই বিজ্ঞাপনের বার্তা এবং বিজ্ঞাপন যেন একটি আলাদা চরিত্র প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়।

৯। **বিকল্প** — কোনো নতুন পণ্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে, গ্রাহকদের জানাতে হবে, কোন পণ্যটির পরিবর্ত হিসাবে এটি ব্যবহৃত হবে, এবং এই পণ্যটি কেন বেশি ভাল বা কার্যকরী।

১০। **পরিবর্তনশীলতা** — গ্রাহকদের মনোভাব, আকাঙ্খা এবং বাজারের চরিত্রও ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। বিপণনকারী এবং বিজ্ঞাপন বিশেষজ্ঞকে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে এবং সকল রকম পরিবর্তনের সমস্ত তথ্য জানতে হবে।

৩.১৩ সারাংশ

যে কোনো পণ্যের বা পরিষেবার বিজ্ঞাপনের সাহায্যে একটি পৃথক পরিচিতি প্রতিষ্ঠা করা বিপণনের দৃষ্টিতে বিশেষ জরুরি। বাজারে বিভিন্ন প্রতিযোগী পণ্যের থেকে বিজ্ঞাপিত পণ্যটি যদি নিজস্ব একটি পরিচিতি প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ না হয়, তাহলে গ্রাহক কেমন করে জানবেন বা চিনবেন যে এ-ই পণ্যটিই তাঁর একটি বা একাধিক বিশেষ আকাঙ্খা পূরণ করতে সক্ষম?

এই বিশেষ পরিচিতি প্রতিষ্ঠার জন্য বিজ্ঞাপনে পণ্যটির কোনো বিশেষ উপাদান বা গুণ-এর (U.S.P.) প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। যে পণ্যের, কোনো বিশেষ গুণ পাওয়া যায় না, তার ক্ষেত্রে একটি মানসিক পৃথককরণ প্রতিষ্ঠা করা হয়, একটি বিশেষ ভাবমূর্তি নির্মাণ করে। কোনো পণ্য বাজারে প্রতিষ্ঠার জন্য ভাবমূর্তি বিশেষ সহায়ক হয়। বস্তুত, গ্রাহকরা পণ্য কেনা এবং ব্যবহার না করে, একটি পণ্যের ভাবমূর্তি কিনে থাকেন এবং ব্যবহার করেন। গ্রাহকদের স্মৃতিতে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রচনা করতে পণ্যের ভাবমূর্তিই সবচেয়ে সক্রিয়।

৩.১৪ অনুশীলনী

১. "পৃথককরণ বা পার্থক্যরচনাই যে কোনো বিজ্ঞাপনের মূল উদ্দেশ্য" — আলোচনা করুন।
২. বিজ্ঞাপন রচনায় ইউ. এস. পি. 'র প্রয়োজনীয়তা কী? উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন।
৩. "ব্র্যাণ্ড ইমেজ" বা নামের ভাবমূর্তি তত্ত্ব বিজ্ঞাপনে কেন ব্যবহার করা হয়? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।
৪. কোনো পণ্যের ভাবমূর্তি নির্মাণের জন্য বিজ্ঞাপন রচনা করতে কী কী কৌশল অবলম্বন করবেন?
৫. পণ্যের অবস্থান বলতে কী বোঝেন? ব্যাখ্যা করুন।

টীকা লিখুন ঃ—

১। ইউ. এস. পি. ২। ব্র্যাণ্ড ইমেজ

৩.১৫ গ্রন্থপঞ্জী

1. Confessions of An Advertising Man/David Ogilvy.
2. Ogilvy on Advertising – David Ogilvy.
3. Brand Positioning – Subroto Sengupta.

একক ৪ ▫ বিজ্ঞাপন গবেষণা

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ বিজ্ঞাপন গবেষণা : সংজ্ঞা

৪.৩ পদ্ধতি

৪.৩.১ সমস্যা নির্ধারণ

৪.৩.২ মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ

৪.৩.৩ প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ

৪.৪ মূল্যায়ন

৪.৫ ড্যাগমার তত্ত্ব

৪.৬ পরীক্ষা

৪.৬.১ আগাম পরীক্ষা

৪.৬.২ পরে পরীক্ষা

৪.৭ অনুসন্ধান প্রয়োগকৌশল

৪.৮ সারাংশ

৪.৯ অনুশীলনী

৪.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে বিজ্ঞাপন গবেষণার প্রয়োজনীয়তা, উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন কৌশলের আলোচনা করা হয়েছে। এই এককটি পাঠ করে এই নির্দিষ্ট বিষয়গুলি চিহ্নিত করতে সক্ষম হবেন —

- বিজ্ঞাপন গবেষণা কী?
- বিজ্ঞাপন গবেষণা কেন প্রয়োজন?
- বিজ্ঞাপনের প্রস্তুতি পর্যায়ের গবেষণা
- বিজ্ঞাপন প্রকাশের পরে গবেষণা
- মাধ্যম বিষয়ে গবেষণা
- গবেষণার কর্মপদ্ধতি
- গবেষণার প্রয়োগ কৌশল

৪.১ প্রস্তাবনা

সাধারণত বলা হয় বিজ্ঞাপন বিজ্ঞানের প্রতি পদক্ষেপেই বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণার বিশেষ ভূমিকা আছে।

কোনো পণ্য প্রস্তুত করা এবং বিপণনের সিদ্ধান্তের পূর্বেই গবেষণা করা প্রয়োজন প্রস্তাবিত পণ্যটির বাজার আছে কিনা। অর্থাৎ পণ্যটি চিহ্নিত ব্যবহারকারীর গ্রহণ করার এবং ব্যবহার করার সম্ভাবনা কতখানি। প্রস্তাবিত পণ্যটি কী ব্যবহারকারীর কোনো বিশেষ আকাঙ্খার সন্তুষ্টিবিধানে সক্ষম হবে? যদি গবেষণার ফলে এই সব প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর পাওয়া যায়, তবেই পণ্যটি উৎপাদনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়।

পণ্যটির বাজার আছে কীনা অন্বেষণ করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ব্যবহারকারী কারা? তাঁরা কোথায় বসবাস করেন? বিপণন এবং বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা প্রস্তুতের পক্ষে এই সব তথ্য জানা অত্যন্ত জরুরি। কারণ, ব্যবহারকারী কে, তার ভৌগোলিক, জনতাত্ত্বিক এবং মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতির বিচার করে তবেই বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু, আবেদন এবং মাধ্যম বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে গবেষণার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন ব্যবহারকারীকে উদ্দেশ্য করে বিজ্ঞাপন করা হবে, তার উপরেই নির্ভর করবে বিজ্ঞাপনের আবেদন, চিত্রদ্বারা উপস্থাপন। আবার এই ব্যবহারকারী যে যে মাধ্যমের সামনে প্রকাশিত (exposed) সেই মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার করলে, তবেই তো উদ্দীষ্ট ব্যবহারকারীর নিকট প্রস্তাবিত পণ্যটির বিজ্ঞাপন পৌঁছবে।

৪.২ বিজ্ঞাপন গবেষণার সংজ্ঞা

বিজ্ঞাপন গবেষণা বলতে কী বোঝায়? বিজ্ঞাপন গবেষণা কেন করা হয়? গবেষণায় কোন কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়? বিজ্ঞাপন গবেষণার বিভিন্ন রকমের প্রয়োগের আলোচনার আগে, এই বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপন গবেষণার বিষয়ে আলোচনার আগে বিপণন গবেষণা (marketing research) সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। কোনো পণ্য বা পরিষেবার বিপণন সম্বন্ধে, বিভিন্ন তথ্য পদ্ধতিগতভাবে সংগ্রহ, নথিবদ্ধ এবং বিশ্লেষণ করাই বিপণন গবেষণা। এই ধরনের গবেষণা উদ্দীষ্ট গ্রাহক বা বাজারের, পণ্যটির মোড়ক এবং বন্টন ব্যবস্থার বিশ্লেষণ হতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞাপন গবেষণা, বিজ্ঞাপনের বার্তা এবং মাধ্যমের উপরই গুরুত্ব দেয়। বলা যেতে পারে, বিজ্ঞাপনের বার্তা, এবং যে মাধ্যমের সাহায্যে বার্তা পাঠানো হয়, তার কার্যকারীতার পদ্ধতিগতভাবে তথ্য সংগ্রহ, নথিবদ্ধ এবং বিশ্লেষণ করাই বিজ্ঞাপন গবেষণা। যদিও কখনো বিষয়লিপি পরীক্ষা (copy testing) বলা হয়, বিজ্ঞাপন গবেষণা আরো অনেক গভীরে অন্বেষণ করে। সবচেয়ে কার্যকরী বিজ্ঞাপনবার্তাও বিফল হতে পারে যদি মাধ্যম নির্বাচন ঠিকমত না হয়।

বিপণন গবেষণা এবং বিজ্ঞাপন গবেষণা, একে অপরের প্রতিযোগী নয়, — পরিপূরক। কোনো পণ্যের অভীষ্ট গ্রাহক এবং বাজার সম্বন্ধে জানার জন্য বিপণন গবেষণা করা যেতে পারে। এর ফলে জানা যায়, কোন এবং কী রকম গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন করা হচ্ছে। বিজ্ঞাপন গবেষণায় নিশ্চিত করা যায়, ঐ উদ্দীষ্ট গ্রাহকদের জন্য কী রকম বিজ্ঞাপন বার্তা এবং কোন কোন মাধ্যম যথাযথ হবে।

বিজ্ঞাপন গবেষণার জন্য অনেক সময় এবং অর্থব্যয় করা হয়। এর ফলে, বিজ্ঞাপনের কার্যকারীতা (effectiveness) কী যথেষ্ট বাড়ে?

- **সুবিধা**

বিজ্ঞাপন পরিকল্পনায় কোনো ভুলভ্রান্তি থাকলে বিজ্ঞাপন গবেষণার ফলে সেই ভুল সংশোধন করা যায়। গবেষণার ফলে জানা যেতে পারে অভীষ্ট গ্রাহক বিজ্ঞাপনটির সঙ্গে নিজেকে চিহ্নিত করতে পারছেন কী না। গবেষণার ফলে এমন কোনো অনন্য সুবিধার (benefit) বিষয় জানা যেতে পারে, যা আগে কেউ ভাবেন নি। এমনও হতে পারে, বিজ্ঞাপনে যে অনন্য বিক্রি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, গ্রাহকেরা সেটি গ্রহণ করছেন না অথবা বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি ঠিক হয়নি। বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য যে যে বিভিন্ন মাধ্যম নির্বাচন করা হয়েছে, সেগুলি বিজ্ঞাপনদাতাকে সর্বাপেক্ষা ভালো (optimum) ফলাফল দিতে সক্ষম নয়। বিজ্ঞাপন গবেষণা বিজ্ঞাপনদাতাকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

- **অসুবিধা**

বিজ্ঞাপন গবেষণা ব্যয় সাপেক্ষ এবং সময় সাপেক্ষ। বিজ্ঞাপন গবেষণা সম্পূর্ণ ক'রে, তথ্য বিশ্লেষণ ক'রে, সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বেশ সময় লাগে। এর ফলে, বিপণন, বিজ্ঞাপন, পণ্যের মোড়ক ইত্যাদির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করতে বিলম্ব ঘটে।

৪.৩ পদ্ধতি

অন্যান্য যে কোনো বিষয়ে গবেষণার মত, বিজ্ঞাপন গবেষণার জন্যও কতকগুলি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এই সব পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য গবেষণার সুবিধাগুলি আরো উন্নত করা এবং বিভিন্ন পদ্ধতিগত সমস্যাগুলি যথাসম্ভব কমিয়ে ফেলা। যে বিষয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন, সেই সমস্যার সংজ্ঞা নির্ধারণ, মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ, প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ, সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ, তথ্যের উপস্থাপন (presentation) এবং অনুসরণ করা। যে কোনো গবেষকের কোনো বিষয়ে গবেষণার কাজের এই পাঁচটি পর্যায় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল এবং সজাগ হতে হবে।

৪.৩.১ সমস্যা নির্ধারণ

মনে করুন, কোনো বিজ্ঞাপিত চিহ্নিত পণ্যের বিক্রি আশানুরূপ হচ্ছে না। অথবা বিক্রি কমে যাচ্ছে। প্রথমে জানতে হবে, সমস্যাটা কি? বিক্রি হচ্ছে না, বা বিক্রি কমে যাচ্ছে, — এইটাই সমস্যা? না আসল সমস্যা অন্য, বিক্রি কমে যাওয়া সেই মূল সমস্যার লক্ষণ মাত্র। গবেষক চেষ্টা করবেন, সমস্ত সমস্যা এবং সমস্যার লক্ষণ বিশ্লেষণ করে, আসল সমস্যাটি নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে। বিজ্ঞাপনের বার্তা ঠিকভাবে কার্যকরী হচ্ছে না? বিষয়লিপি সম্বন্ধে কী আরো গবেষণা প্রয়োজন? বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন মাধ্যম নির্বাচন কী যথাযথ হয়েছে? না কী, পণ্যটিই তেমন গুণমানের নয়? বিজ্ঞাপন গবেষণার থেকে বিপণন গবেষণাই কী বেশি জরুরি? বিপণন এবং বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা বিশেষভাবে পর্যালোচনা ক'রে, আসল সমস্যাটি চিহ্নিত করলে তবেই গবেষণার সার্থক ফল লাভ হবে।

৪.৩.২ মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ

মনে করুন, একটি টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে গবেষণা করতে হবে। প্রথমে দেখা প্রয়োজন বিভিন্ন পত্রিকায়, এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত পত্রিকায় টুথপেস্টের উৎপাদন, বিক্রি এবং বাজার সম্বন্ধে কী কী তথ্য পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। বিপণন এবং বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত পত্রিকায় টুথপেস্টের ব্যবহারকারী এবং তাঁদের পছন্দ-অপছন্দ, আকাঙ্খা ইত্যাদি সম্বন্ধে কী কী তথ্য এবং সমীক্ষা ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। এই সব পূর্ব-প্রকাশিত তথ্য দিক নির্দেশ করতে পারে, গবেষণা কীভাবে কোন বিষয়ে করা প্রয়োজন। অনেক সময়, পূর্ব প্রকাশিত তথ্যেই গবেষণার বিষয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়।

যে কোনো গবেষণায়, মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ অল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশ কয়েক মাস ধরে, বিপুল অর্থব্যয় করে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মাধ্যমিক তথ্য যদি সহায়তা করে, তাহলে এই সময় এবং অর্থব্যয় এড়ানো যেতে পারে, অথবা, অন্তত কমানো যেতে পারে। তবে, মাধ্যমিক তথ্য গ্রহণ করার পূর্বে বিশেষ করে বিচার বিবেচনা করা প্রয়োজন। কারণ, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার তথ্য এবং সমীক্ষা, এমন কী কোনো শিল্পের বা বিশেষ ব্যবসার এ্যাসোসিয়েশন প্রদত্ত তথ্য বা সমীক্ষা নিরপেক্ষ না-ও হতে পারে। সেই কারণে, মাধ্যমিক তথ্য সহজলভ্য হলেও, বিশেষ করে যাচাই ক'রে, তবে ব্যবহার করা, বা ঐ তথ্যের উপর নির্ভর ক'রে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। আর একটি কথা, মাধ্যমিক তথ্য ব্যবহার করার আগে জানতে হবে, প্রকাশিত তথ্যগুলি কত পুরানো? যে পণ্যের বিজ্ঞাপন-বিষয়ক গবেষণা করা হচ্ছে, সেই পণ্যটি, এবং পণ্যটির গ্রাহকদের আকাঙ্খা এবং পণ্যটির বাজার কত দ্রুত পরিবর্তনশীল? এই সব বিষয় বিবেচনা করে, তবেই মাধ্যমিক তথ্য ব্যবহার করা উচিত।

৪.৩.৩ প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ

বিজ্ঞাপনদাতার বিবেচনাধীন সমস্যার উপর প্রাপ্ত মাধ্যমিক তথ্য যদি আলোকপাত করতে অসমর্থ হয়, সেক্ষেত্রে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ আবশ্যিক হয়ে পড়ে। বিজ্ঞাপনদাতাকে পণ্যটির ব্যবহারকারী, খুচরো বিক্রেতা বা বন্টনকারীর নিকট থেকে পণ্যটি এবং তার বিজ্ঞাপন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের কতকগুলি পদ্ধতি আছে।

ক. পর্যবেক্ষণ

খুচরো বিক্রির দোকানে প্রতিনিধি রাখা হয়, পণ্যটির প্রচার বা বিক্রির জন্য নয়। ঐ প্রতিনিধি, দোকানের বিভিন্ন ক্রেতাদের পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁরা কোন কোন চিহ্নিত নামের পণ্য কিনছেন? পণ্যটি সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করছেন? দোকানে প্রদর্শিত বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করছেন কিনা। লক্ষ্য করলে, কোনো মন্তব্য

করছেন কিনা। ক্রেতাদের অজান্তে, তাঁদের পর্যবেক্ষণ ক'রে এই সব তথ্য নথিবদ্ধ করা হয়। তবে এই পদ্ধতি বেশ সময় সাপেক্ষ। কখন কোন ক্রেতা দোকানে আসবেন, তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তবে সুবিধা এই যে ক্রেতাদের প্রতিক্রিয়া একেবারে নিরপেক্ষভাবে, তাঁদের অজান্তে, পর্যবেক্ষণ করা হয়।

খ. সমীক্ষা

কখন কোন গ্রাহক দোকানে আসবেন, তাঁকে পর্যবেক্ষণের জন্য অপেক্ষা না করে, গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করে নেওয়াই সমীক্ষা। সমীক্ষার জন্য গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ নানাভাবে হতে পারে। চিঠি পাঠিয়ে, টেলিফোনে প্রশ্ন করে অথবা ব্যক্তিগত যোগাযোগ করে প্রশ্নের উত্তর জেনে নেওয়া যেতে পারে। আরো একটি বিষয় বিশেষ সহায়ক হয়। গ্রাহকদের মন্তব্য, প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা না করে, গবেষণার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশ্নের দ্বারা জ্ঞাতব্য তথ্য জেনে নেওয়া হয়। সমীক্ষা পদ্ধতির বিশেষ সুবিধা এইটিই।

গ. চিঠি

ডাকযোগে চিঠি পাঠিয়ে প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করা একটি প্রচলিত পদ্ধতি, যাতে খরচ কম হয়। তবে এই পদ্ধতিতে গ্রাহকদের কাছে যে চিঠি পাঠানো হবে, সেটি এমন হবে, যা পড়ে গ্রাহক উত্তর পাঠানোর জন্য উৎসাহিত বোধ করবেন। উত্তর পাঠাতে উৎসাহ-দানের জন্য একটি ছাপানো ফর্ম, পাঠাতে হয়, যাতে গ্রাহককে বেশি লিখতে না হয়। টিক দিয়ে, বা 'হ্যাঁ' অথবা 'না' লিখেই মতামত দেওয়া সম্ভব হয়। সেই সঙ্গে আরো পাঠাতে হবে প্রি-পেইড খাম, যাতে গ্রাহক তাঁর উত্তরটি বিনা খরচায়, প্রশ্নকারীর কাছে পাঠাতে পারেন। এতদসত্ত্বেও অনেক গ্রাহক প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারেন। আবার উত্তর আসতে যথেষ্ট সময়ও লাগে।

ঘ. সরাসরি যোগাযোগ

গ্রাহকদের বিবরণ লেখার জন্য, এবং প্রশ্নমালার উত্তরের জন্য ছাপানো ফর্ম নিয়ে গ্রাহকদের বাড়িতে অথবা কাজের জায়গায় প্রতিনিধি পাঠিয়ে গ্রাহকদের বিবরণ এবং তাঁদের দেওয়া উত্তর সংগ্রহ করা। এই পদ্ধতি, বিজ্ঞাপনদাতা তাঁর নির্ধারিত কার্যসূচী অনুযায়ী এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে পারেন। সরাসরি যোগাযোগের ফলে, গ্রাহক সাধারণত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন, এড়িয়ে যেতে পারেন না।

ঙ. টেলিফোন

টেলিফোনের মাধ্যমেও গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের মতামত জানা যেতে পারে। গ্রাহকরা সব সময় টেলিফোনে প্রশ্নের উত্তর দিতে চান না। তাঁদের মনে নানা রকম সন্দেহ জাগে। তবে মাধ্যমের বিষয়ে গবেষণায় টেলিফোনে অনেক সময় ভালো ফল পাওয়া যায় — "আপনি কী এখন টিভি দেখছেন? কোন চ্যানেল দেখছেন? এই চ্যানেলের কোন কোন অনুষ্ঠান আপনি নিয়মিত দেখে থাকেন? অন্য আর কোনো চ্যানেল দেখেন? কোন কোন অনুষ্ঠান? এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর টেলিফোনে জানাতে, সাধারণত গ্রাহকরা অরাজী হন না।

যে কোন সমীক্ষার তথ্য উপস্থাপনে (presentation) বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। তথ্যের বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করেই বিজ্ঞাপনদাতাকে পরবর্তী সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপ নিতে হবে। সেই জন্য তথ্যের উপস্থাপন এবং বিশ্লেষণ যদি যথাযথ না হয়, তাহলে এই তথ্য এবং বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপ ভ্রান্ত হবে। সে ক্ষেত্রে গবেষণার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। বিজ্ঞাপনদাতা গবেষণা করেন এই উদ্দেশ্যে নিয়ে যে, গবেষণালব্ধ তথ্য তাঁদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক হবে। কাজেই গবেষণালব্ধ তথ্য এবং বিশ্লেষণ সঠিক না হলে, গরেষণার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়।

আর একটি কথা। গবেষণালব্ধ তথ্য এবং বিশ্লেষণ বিজ্ঞাপনদাতাকে তাঁদের বিজ্ঞাপনের উপস্থাপন, বার্তা, চিত্ররেখা এবং প্রচারমাধ্যম সম্বন্ধে যে চিত্র তুলে ধরে, সেটি অনুসরণ করা প্রয়োজন। যদি দেখা যায়, বিজ্ঞাপনের বার্তা সঠিক হয়নি, তাহলে সেটি পরিবর্তন করাই যুক্তিযুক্ত। যদি দেখা যায় বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি এবং চিত্ররেখা, সম্ভাব্য গ্রাহকদের মনে যথেষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছে না, তাহলে বিষয়লিপি এবং চিত্ররেখাও পরিবর্তন করাই বাঞ্ছনীয়। গবেষণার ফলে যদি জানা যায়, মাধ্যম নির্বাচন সঠিক হয়নি, তাহলে মাধ্যম পরিবর্তনের ব্যবস্থা করাই উচিত। গবেষণার ফলাফল কে নির্দেশিকা (guidelines) হিসাবে গ্রহণ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে, গবেষণার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। গবেষণার জন্য সময় এবং অর্থব্যয়ও অপচয়ে পর্যবসিত হয়।

৪.৪ মূল্যায়ন

বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত সকল গবেষণার মূল উদ্দেশ্য—পরিকল্পিত বা প্রচারিত বিজ্ঞাপন এবং ব্যবহৃত মাধ্যমের মূল্যায়ন। বিজ্ঞাপনবার্তা, চিত্ররেখা সম্বন্ধে যেমন গবেষণা করা যেতে পারে, তেমনই প্রচার-মাধ্যমের বিষয়েও গবেষণা করা যেতে পারে। বিজ্ঞাপন গবেষণার সম্বন্ধে একটি তত্ত্ব আছে। যে কোনো বিজ্ঞাপন গবেষণার পূর্বে এই বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এই তত্ত্বটি বিজ্ঞাপন গবেষণার মূল সূত্র নির্ধারণ ক'রে, গবেষণায় সহায়তা করে।

৪.৫ ড্যাগমার (Dagmar) উদ্দেশ্যভিত্তিক বিজ্ঞাপন সাফল্য নির্ণয় তত্ত্ব

এই তত্ত্বটির প্রবক্তা রাসেল কোলি (Russell Colley)। তত্ত্বটির নাম - Defining Advertising goals for Measured Advertising Results, সংক্ষেপে - DAGMAR. বিজ্ঞাপনের ফলাফল মূল্যায়নের জন্য বিজ্ঞাপন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য যথাযথভাবে নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। বিজ্ঞাপন পরিকল্পনার সঠিক উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করা থাকলে, তবেই পরবর্তীকালে জানা সম্ভব হবে, বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে কীনা। যে কোনো বিজ্ঞাপন পরিকল্পনার প্রারম্ভেই বিজ্ঞাপন পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। বিজ্ঞাপন গবেষণা জানাতে পারে, সেই নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণ হয়েছে কিনা এবং কতখানি পূরণ হয়েছে। যদি বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়ে থাকে, তাহলে কী কী কারণে হয়নি, সেই তথ্যও গবেষণার মাধ্যমে জানা যেতে পারে। কাজে কাজেই, বিজ্ঞাপনের যে কোনো রকমের মূল্যায়ন বা গবেষণার জন্য, প্রথমেই প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।

এই তত্ত্বের প্রবক্তাদের মতে, বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি, বাজেট এবং প্রচার অভিযানের উপর পদ্ধতিগত নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকরী হাতিয়ার এই তত্ত্ব। বিজ্ঞাপন পরিকল্পনার সময়, ব্যবহারিক বিজ্ঞান (behavioural

science) গ্রাহকদের মনোভাব সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার পথনির্দেশ করে, আবার মাধ্যম নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সচেতন করে। তবে, বিজ্ঞাপন পরিকল্পনার সকল সমস্যার সমাধান সূত্র কেবল এই তত্ত্বের সাহায্যেই পাওয়া সম্ভব নয়। এটি একটি পথনির্দেশিকা।

৪.৬ পরীক্ষা

গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ আলোচিত এবং বিতর্কিত প্রশ্ন — বিজ্ঞাপন গবেষণা কখন করা উচিত? 'আগাম পরীক্ষা' না 'পরে পরীক্ষা'? যাঁরা 'আগাম পরীক্ষা'র স্বপক্ষে, তাঁরা বলেন কোনো বিজ্ঞাপন অভিযান শুরু করার পূর্বে যদি ব্যবহারকারীদের মনোভাব, আকাঙ্খা, তাঁদের অধিগত অভিজ্ঞতার বিষয়ে ভালভাবে জানা যায়, তাহলে বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা অনেক বেশী বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে। আবার বিজ্ঞাপন অভিযানের ফলাফল যাচাই করার সময়ও এই সব তথ্য সাহায্য করে। আর, বহু অর্থব্যয় করে বিজ্ঞাপন অভিযান শুরু করার পূর্বেই যদি সব তথ্য জানা যায়, তাহলে অর্থের অপব্যয় বাঁচানো সম্ভব হয়। তবে, 'আগাম পরীক্ষা' তো আর বাজারের বাস্তব পরীক্ষা নয়। সম্ভাব্য ব্যবহারকারীর কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য, যথার্থ বাস্তব বাজারের চিত্র থেকে অন্যরকমও হতে পারে। আবার গ্রাহকদের মনোভাব এবং আকাঙ্খা সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য বিজ্ঞাপন রচয়িতাদের সৃষ্টি ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়।

বিজ্ঞাপন অভিযান শুরু করার পরে যে পরীক্ষা করা হয় সেইটিই 'পরে পরীক্ষা'। এই পরীক্ষার সুবিধা, বাজারের প্রকৃত অবস্থা, প্রতিযোগিতার ফল কী, সেই যথার্থ তথ্য জানা সম্ভব হয়। পণ্যের বিক্রির পরিমাণ থেকেও জানা যায়, বিজ্ঞাপন অভিযান সফল বা আশানুরূপ হয়েছে কিনা। আর, বিজ্ঞাপন অভিযানের পরবর্তী সময়ে গ্রাহকদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য, বিজ্ঞাপনদাতার মনোমত না হতে পারে, কিন্তু বাস্তব। 'পরে পরীক্ষা' পদ্ধতি বিজ্ঞাপনদাতাকে তার বিজ্ঞাপন অভিযানের বাস্তব অবস্থা, অবহিত করে।

৪.৬.১ আগাম পরীক্ষা (Pre Test)

কোনো বিজ্ঞাপন অভিযান শুরু করার পূর্ব প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি, চিত্ররেখা, মূল আবেদন-এর কার্যকারীতা সম্বন্ধে সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করাই "আগাম পরীক্ষা"। 'আগাম পরীক্ষা'র সুবিধার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবারে দেখা যাক, 'আগাম পরীক্ষা' কীভাবে এবং কেন করা হয়।

আগাম পরীক্ষার মূলসূত্র — গ্রাহকদের মতামত এবং মনোভাব সম্বন্ধে অনুসন্ধান।

১। **'ডামি' মাধ্যমের ব্যবহার** — কোনো জনপ্রিয় পত্রিকার বিভিন্ন রচনার মধ্যে কোনো পৃষ্ঠায় প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপনটি বা বিজ্ঞাপনগুলি সংযুক্ত ক'রে গ্রাহকদের মধ্যে বিতরণ ক'রে, কয়েকদিন পরে আবার সেগুলি ফিরিয়ে নেওয়া হয়। ফেরৎ নেওয়ার সময় গ্রাহককে প্রশ্ন করা হয়, কোন কোন বিজ্ঞাপন তিনি মনে করতে পারেন। লক্ষ্য রাখতে হয়, প্রস্তাবিত, জুড়ে দেওয়া বিজ্ঞাপনটি উল্লেখ করেন কিনা। তাহলে প্রশ্ন করতে হবে, ঐ বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত পণ্যটি তিনি ব্যবহার করবেন কিনা। যদি করেন, কোন গুণের জন্য করবেন। আর যদি বলেন ঐ পণ্যটি তিনি ব্যবহার করবেন না, তাহলে জানতে হবে, তিনি কেন ব্যবহার করতে ইচ্ছুক নন।

২। **গ্রাহকদের - জুরি**। নির্বাচিত কয়েকজন গ্রাহককে প্রশ্ন করা হয় পরীক্ষামূলক বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে। কোনো পত্রিকার মধ্যে এক বা একাধিক প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপন জুড়ে দিয়ে, সেগুলি সম্বন্ধে সম্মিলিত গ্রাহকদের মতামত চাওয়া হয়। এই সব মতামত গ্রাহকদের কতজন কী বলছেন, সেই হিসাবে গ্রহণ করা হয়। সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপনের বিষয়ে মতামত নেওয়া যায়, আবার কোনো বিজ্ঞাপনের শিরোনাম, বা চিত্র-অংশ, অথবা মূল আবেদন সম্বন্ধেও প্রশ্ন করা যেতে পারে।

৩। **গুণাণুক্রমিক** — এক সঙ্গে চারটি বা ছয়-সাতটি বিভিন্ন প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপন (একই পণ্যের) গ্রাহকদের দেওয়া হয়, তাঁদের মতামতের জন্য। গ্রাহকরা, তাঁদের ধারণামত, কোন বিজ্ঞাপনটি বেশি কার্যকরী হবে, ক্রমানুসারে জানিয়ে দেন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গ্রাহক যে বিজ্ঞাপনটি প্রথম বা দ্বিতীয় স্থানে রাখেন, সেইটিই স্বাভাবিক ভাবে, বেশি কার্যকরী হবে বলে ধরা হয়।

৪। **তুলনামূলক জুড়ি** — গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রস্তাবিত দুটি বিজ্ঞাপন দেখানো হয়। তারপরে, সরাসরি প্রশ্ন করা হয়, দুটির মধ্যে কোন বিজ্ঞাপনটি তাঁকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হবে। নির্বাচিত গ্রাহকদের উত্তরের গড় নির্ণয় ক'রে, স্থির করা হয়, দুটির মধ্যে কোন বিজ্ঞাপনটি গ্রাহকদের উপর প্রভাব ফেলতে বেশি সক্ষম হতে পারে।

৫। **মনোভাব নির্ধারণ (Attitude Rating)** — কোনো ধারণা বা জিনিসের প্রতি গ্রাহকদের মৌলিক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীই তাঁর মনোভাব। সেই জন্য বিজ্ঞাপনদাতার জানা প্রয়োজন, বিজ্ঞাপিত চিহ্নিত পণ্যটির প্রতি গ্রাহকদের মনোভাব কী? প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপনটির বিষয়ে গ্রাহকদের মনোভাব কী? বিজ্ঞাপনটির আবেদন, শিরোনাম এবং বিভিন্ন উপাদান (component) সম্বন্ধে গ্রাহকদের মনোভাব কী?

৬। **বিভিন্ন পরীক্ষার মূল্যায়ন** — গ্রাহকদের মতামত এবং মনোভাব সংগ্রহের সব পরীক্ষাগুলিই বিশেষ যত্ন সহকারে করা প্রয়োজন। প্রশ্নগুলি এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে গ্রাহকদের সন্দিগ্ধ না ক'রে, তাঁদের অনুভূতিতে কোনো আঘাত না করে, বিজ্ঞাপনদাতার জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি জেনে নেওয়া সম্ভব হয়। যাঁরা প্রশ্ন করবেন, সেই প্রতিনিধিদের বিশেষভাবে শিক্ষাদান প্রয়োজন, কীভাবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে, আলাপচারিতার মাধ্যমে তাঁরা গ্রাহকদের কাছ থেকে জ্ঞাতব্য তথ্য জেনে নেবেন। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সংগৃহীত তথ্য যুক্তি সঙ্গতভাবে বিশ্লেষণ করা, যাতে বিজ্ঞাপনদাতা সংগৃহীত তথ্য লাভজনক ভাবে ব্যবহার করতে পারেন।

৪.৬.২ পরে পরীক্ষা (Post Test)

বিজ্ঞাপন অভিযানের পরে বিজ্ঞাপনের কার্যকারীতা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের কতকগুলি উপায় আছে। অভিযানের কার্যকারীতার সাফল্যের মাত্রার উপরে ভিত্তি করেই পরবর্তী অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়। ফলে বর্তমান অভিযানের কোনো দুর্বলতা থাকলে, যদি সেটা জানা যায়, তাহলে পরবর্তী বিজ্ঞাপন পরিকল্পনায় সেগুলি সংশোধন করা সম্ভব হয়। যে সময় এবং অর্থব্যয় করে বিজ্ঞাপন অভিযান করা হয়েছে, তা কতখানি ফলপ্রসূ হয়েছে, সে বিষয়েও জানা প্রয়োজন।

১। পাঠকদের পরীক্ষা (Readership Test)

যে যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপনদাতার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে, সেইগুলি নির্বাচিত গ্রাহকদের মধ্যে বিতরণ ক'রে, এক বা দুই সপ্তাহ পরে তাঁদের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ করা হয়। ঐ পত্রিকাটির প্রকাশিত বিজ্ঞাপনগুলির মধ্যে কোনটি তাঁদের মনে সবচেয়ে বেশি দাগ কাটতে সমর্থ হয়েছে? এবং কী কারণে? প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটির কোন কোন অংশ তাঁকে প্রভাবিত করেছে? চিত্ররেখা, শিল্পরূপ, শিরোনাম, কোনো বিশেষ চিত্র? বিজ্ঞাপিত পণ্যটির কোনো বিশেষ গুণ তাঁর মনে কোনো বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করেছে কিনা, সে বিষয়েও প্রশ্ন করা যেতে পারে। এমনকি, বিজ্ঞাপনটির কোনো অংশ, বক্তব্য বা চিত্র যদি গ্রাহকের অপছন্দ হয় বা আপত্তিকর মনে হয়, সে বিষয়েও জেনে নেওয়া যেতে পারে। বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে, বিজ্ঞাপিত পণ্যটির সম্বন্ধেও গ্রাহকদের মনোভাব এবং পণ্যটির কোন বিশেষ গুণ গ্রাহকদের বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়, সে বিষয়েও জানা যেতে পারে। এইক্ষেত্রেও প্রশ্নমালা বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। প্রশ্নকারীর ভূমিকাও এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

২। স্মরণ পরীক্ষা

পাঠক পরীক্ষার সঙ্গে একটি বিষয়ে স্মরণ পরীক্ষার মিল রয়েছে। দুটি পরীক্ষাই উত্তরদাতার স্মরণ-শক্তির উপর নির্ভরশীল। পাঠক পরীক্ষার ক্ষেত্রে উত্তরদাতার সুবিধার জন্য সহায়ক ব্যবহার করা হয়। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি তাঁকে দেখানো হয়, এমন কী প্রতিযোগী বিজ্ঞাপনও দেখানো হয়। কিন্তু স্মরণ-পরীক্ষায় কোনো সহায়ক ব্যবহার করা হয় না। এই পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য, বিজ্ঞাপনটির প্রভাব গ্রাহকের মনের কতখানি গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে সেটি জানা। সেই কারণেই কোনো রকম সহায়ক বিনাই গ্রাহককে প্রশ্ন করা হয়। বোঝবার চেষ্টা করা হয়, সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপনটি কতটা প্রভাব সৃষ্টি করেছে। অথবা বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত কোন বিশেষ চিত্র গ্রাহকের মনের গভীরে দাগ কাটতে সক্ষম হয়েছে। অথব্য, বিজ্ঞাপনবার্তায় পণ্যটির যে বিশেষ সুবিধার কথা বলা হয়েছে, সেই সুবিধার বার্তাই গ্রাহককে সচেতন করেছে। অথবা, বিজ্ঞাপনের মূল মানবিক আবেদনই গ্রাহকের মনে সক্রিয় হয়েছে।

প্রভাব (Impact)

সকল বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য গ্রাহকদের মনে প্রভাব সৃষ্টি করা। এই 'প্রভাব' বা impact বিষয়টিকে বিজ্ঞাপন পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। আপনারা জানেন বিজ্ঞাপন বিষয়ে যে কোন আলোচনাতেই এই প্রভাব impact প্রসঙ্গ অবধারিতভাবেই এসে পড়ে। এবারে দেখা যাক, বিজ্ঞাপনে এই 'প্রভাব' বলতে কী বোঝায়।

প্রথম দৃষ্টিতে বিচার করলে বিজ্ঞাপন তার সম্ভাব্য ব্যবহারকারীর মনোযোগ আকর্ষণ করবে। কারণ বিজ্ঞাপন যদি সম্ভাব্য ক্রেতার মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তিনি বিজ্ঞাপনটি দেখবেন না। বিজ্ঞাপনটি ব্যর্থ হবে।

ক। বিজ্ঞাপন সেই বিজ্ঞাপিত পণ্যটির সম্ভাব্য ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হবে।

খ। বিজ্ঞাপনের আকর্ষণী ক্ষমতা এমন হবে, যাতে আকর্ষণের সময়ের মধ্যেই বিজ্ঞাপনের বার্তা ব্যবহারকারী গ্রহণ করতে সক্ষম হন।

গ। বিভিন্ন মাধ্যমে, প্রতিযোগী পণ্যের বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে, নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপনটি কীরকম বা কতখানি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম।

ঘ। স্মরণ যোগ্যতা। আমাদের মনে রাখতে হবে, আকর্ষণী ক্ষমতা আর স্মরণযোগ্যতা এক নয়। এমন হতে পারে কোনো বিজ্ঞাপন সম্ভাব্য ব্যবহারকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলো, বিজ্ঞাপনের মূল বার্তাও ব্যবহারকারী জানতে পারলেন, কিন্তু বার্তাটি স্মরণে রইলো না। ব্যবহারকারী বার্তাটি ভুলে গেলেন। ব্যবহারকারীর স্মরণে অবস্থান বা বিরাজ করা, বিজ্ঞাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ, কোনো পণ্য কেনবার সময় ব্যবহারকারী তাঁর স্মরণের উপরেই নির্ভর করে।

ঙ। নাম চিহ্নিত করা (Branding)। বিজ্ঞাপন যেন পণ্যের বিশেষ চিহ্নিত নামটি ব্যবহারকারীর মনে স্থায়ীভাবে অঙ্কন করতে সক্ষম হয়। যাতে বিজ্ঞাপিত পণ্যটিকে একই ধরনের অন্যান্য পণ্য থেকে ব্যবহারকারী আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারেন।

৪.৭ অনুসন্ধান প্রয়োগকৌশল

বিজ্ঞাপনটি কী প্রতিক্রিয়া জানাতে উৎসাহ দিয়েছে? একটি বিজ্ঞাপনের প্রচারের পর কতগুলি পণ্য বিক্রি হয়েছে, সেটিও বিজ্ঞাপনের কার্যকারীতার মাপকাঠি হিসাবে গণ্য হয়। একই বিজ্ঞাপন দু'টি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করা হলো। দুটি বিজ্ঞাপনেই কুপন আছে। ব্যবহারকারীরা ঐ কুপন জমা দিলে পণ্যটির মূল্যে ১ টাকা ছাড় পাবেন। এমন হতে পারে যে পত্রিকা 'ক'র কুপন পত্রিকার 'খ'র কুপনের থেকে অনেক বেশি জমা পড়ল। আবার এমনও হতে পারে, পত্রিকা 'ক'র কুপন বেশি জমা পড়েছে শহরাঞ্চলে আর পত্রিকা 'খ'র কুপন বেশি জমা পড়েছে গ্রামাঞ্চলে। ইদানীং অনেক পত্রিকাই বিজ্ঞাপনদাতাদের সুবিধার জন্য ঐ পত্রিকার কোনো বিশেষ অঞ্চলে (যেমন হাওড়া) প্রচারিত সংখ্যাগুলিতেই বিজ্ঞাপন প্রকাশের প্রস্তাব দিচ্ছেন।

বিক্রি

অনেকের মতেই বিজ্ঞাপন প্রচারিত হওয়ার পরে সবচেয়ে যথার্থ পরীক্ষা — বিজ্ঞাপিত পণ্যটির বিক্রি। বিজ্ঞাপন অভিযানের পরে যদি দেখা যায়, বিজ্ঞাপিত পণ্যটির বিক্রি আশানুরূপ বা আশাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে, বিজ্ঞাপন কার্যকরী হয়েছে। আর, বিজ্ঞাপনের পরেও যদি দেখা যায়, বিজ্ঞাপিত পণ্যের বিক্রি বিশেষ বৃদ্ধি পায়নি, তাহলে বুঝতে হবে, বিজ্ঞাপনটি কার্যকরী হয়নি।

সবার শেষে বলা প্রয়োজন, বিজ্ঞাপনদাতা যে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বিজ্ঞাপন গবেষণায় প্রবৃত্ত হচ্ছেন, সেই বিষয়টির সহায়ক হবে, এমন পদ্ধতি নির্বাচন করাই যুক্তিযুক্ত। বিভিন্ন পদ্ধতি বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনে বিশেষ সহায়ক হতে পারে।

৪.৮ সারাংশ

যে কোনো পণ্য এবং পরিষেবার বিজ্ঞাপন প্রস্তুত এবং প্রচারে বিভিন্ন পর্যায়ে গবেষণার সাহায্য নেওয়া হয়। বিজ্ঞাপিত পণ্যটি সম্বন্ধে গবেষণা, পণ্যটির প্রতিযোগীদের সম্বন্ধে গবেষণা, বাজার এবং ব্যবহারকারীদের

সম্বন্ধে গবেষণা। বিজ্ঞাপন প্রস্তুত করার সময়, সম্ভাব্য কার্যকারীতা বিষয়ে গবেষণা এবং প্রকাশের জন্য কোন কোন মাধ্যম কত কার্যকরী হবে, সে বিষয়েও গবেষণা।

বিভিন্ন গবেষণায় বিভিন্ন রকমের সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে। বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। গবেষণার পদ্ধতির মধ্যে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ প্রধান।

পর্যবেক্ষণ, সমীক্ষা, সরাসরি যোগাযোগ, বিভিন্ন পদ্ধতি ক্ষেত্রবিশেষে অবলম্বন করা হয়।

বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন মাধ্যমের কার্যকারীতা সম্বন্ধেও গবেষণার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। বিজ্ঞাপন প্রকাশের আগে, গ্রাহকদের উপর কীরকম প্রভাব সৃষ্টি হবে সে বিষয়ে যেমন গবেষণা হয়, বিজ্ঞাপন প্রকাশের পরেও কার্যকারীতা হিসাব করার জন্য গবেষণা করা হয়।

৪.৯ অনুশীলনী

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন

১. বিজ্ঞাপন গবেষণা কী? এই গবেষণার প্রয়োজনীয়তা কী?

২. বিজ্ঞাপন প্রচারের মূল্যায়ন "ড্যাগমার" তত্ত্বদ্বারা সম্ভব কী? আলোচনা করে আপনার মতামত জানান।

৩. "পরে পরীক্ষার চেয়ে বিজ্ঞাপনের আগাম পরীক্ষা করাই ভালো"। — আপনার কি মনে হয়?

টীকা লিখুন —

১। ড্যাগমার (DAGMAR), ২। আগাম পরীক্ষা, ৩। পরে পরীক্ষা।

৪.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১. Advertising : Its Role in Modern Marketing.
– S. Watson Dunn/Arnold M Barton.

একক - ৫ ❑ মাধ্যম পরিকল্পনা

গঠন

৫.০ উদ্দেশ্য
৫.১ প্রস্তাবনা
৫.২ মাধ্যম নির্বাচন
৫.৩ মাধ্যম নির্বাচনের সূত্র
৫.৩.১ প্রসারণ
৫.৩.২ পৌণঃপুনিকতা
৫.৩.৩ ধারাবাহিকতা
৫.৩.৪ প্রভাব বিস্তার ক্ষমতা
৫.৪ মুখ্য মাধ্যম
৫.৫ আধিপত্য
৫.৬ রণকৌশল
৫.৬.১ উদ্দীষ্ট বাজার নির্ধারণ
৫.৬.২ মাধ্যম নির্বাচনের উদ্দেশ্য
৫.৭ বিজ্ঞাপনের মাধ্যম
৫.৭.১ মুদ্রণ মাধ্যম
৫.৭.২ রেডিও
৫.৭.৩ টেলিভিশন
৫.৭.৪ প্রত্যক্ষ ডাকযোগ
৫.৭.৫ ঘরের বাইরে
৫.৮ বিজ্ঞাপনের বাজেট
৫.৮.১ সামর্থ অনুযায়ী
৫.৮.২ ইচ্ছা অনুযায়ী
৫.৮.৩ কাজ অনুযায়ী
৫.৯ সময়সূচীর কৌশল
৫.৯.১ স্থিরিকৃত সময়সূচী
৫.৯.২ একান্তর সময়সূচী
৫.৯.৩ ঝাঁকবদ্ধ সময়সূচী
৫.৯.৪ স্পন্দিত সময়সূচী
৫.৯.৫ বিশেষ সময় অনুসারে
৫.৯.৬ ক্রমবর্ধমান অনুসারে
৫.৯.৭ অবচিয়মান অনুসারে
৫.১০ মাধ্যম মূল্যায়ন
৫.১১ সারাংশ
৫.১২ অনুশীলনী
৫.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককে আলোচনা করা হয়েছে, বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন মাধ্যম এবং মাধ্যমগুলি বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহারের বিষয়, বিচার বিবেচনা এবং পরিকল্পনা। এই এককটি পাঠ করে মাধ্যম সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করা সম্ভব —

- বিজ্ঞাপনের মাধ্যম কী?
- কেমন করে মাধ্যম নির্বাচন করা হয়
- মাধ্যম নির্বাচনের সূত্র
- মাধ্যম পরিকল্পনার রণকৌশল
- বিভিন্ন মাধ্যমের সুবিধা-অসুবিধা
- বিজ্ঞাপনের বাজেট
- সময়সূচীর কৌশল

৫.১ প্রস্তাবনা

বিপণনকারীরা গ্রাহকদের যে বার্তা পাঠান, সেই বার্তা গণমাধ্যমের সাহায্যে পাঠানো হয়। আপনারা প্রতিদিন অসংখ্য বিজ্ঞাপন দেখেন, সংবাদপত্র, সাময়িকী, অথবা দূরদর্শনের পর্দায়। যে কোনো পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচারে মাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞাপনের কার্যকরীতার আলোচনায় মাধ্যমের কর্মকুশলতা অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। কারণ, সঠিক মাধ্যম নির্বাচন করতে সক্ষম না হলে, বিজ্ঞাপন উদ্দীষ্ট গ্রাহকের কাছে পণ্য বা পরিষেবার বার্তা পৌঁছতে সক্ষম হবে না। বিজ্ঞাপন অসফল হবে। বিজ্ঞাপনের বার্তা, ব্যবহারকারী, এবং প্রচার মাধ্যম, তিনটিই এক সুরে বাঁধা বলে মনে করা হয়। বিজ্ঞাপনের বার্তা গ্রাহকদের উদ্দেশ্যেই প্রচারিত হয়। প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপনের পণ্য যে গ্রাহক ব্যবহার করেন, তাঁকে চিহ্নিত ক'রে, যে যে মাধ্যমের সাহায্যে সেই গ্রাহকের কাছে বার্তা পৌঁছানো যাবে, সেই সেই মাধ্যমেই বিজ্ঞাপন প্রচার করতে হবে। তবেই বিজ্ঞাপন সফল হবে, গ্রাহকের মনে বিজ্ঞাপিত পণ্য সম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা এবং চাহিদা সৃষ্টি হবে। বিভিন্ন কোম্পানির বিজ্ঞাপনের মোট খরচের যে হিসাব পাওয়া যায় তার শতকরা ৯৫ ভাগই মাধ্যম ব্যবহার করার খরচ। বিজ্ঞাপনের সাফল্য এবং বিজ্ঞাপনের বিপুল খরচের যাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়, তার জন্য মাধ্যম নির্বাচন এবং বিজ্ঞাপন প্রকাশের অন্যান্য কৌশলের প্রয়োগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

৫.২ মাধ্যম নির্বাচন

আপনারা সংবাদপত্র পাঠ করেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকাও পাঠ করেন। রেডিওর অনুষ্ঠান শোনেন এবং টেলিভিশনের বিভিন্ন চ্যানেলের অনুষ্ঠান দেখেন। কারণ, আপনারা বিভিন্ন বিষয়ের সংবাদ সংগ্রহে উৎসাহী এবং এই মাধ্যমগুলি আপনাদের নানারকম বিনোদনের দ্বারা মনোরঞ্জন করে থাকে। এই সব মাধ্যমই তাঁদের আয়ের জন্য মূলত নির্ভর করেন বিজ্ঞাপনের উপর। যে মূল্য দিয়ে আপনারা সংবাদপত্র, পত্রিকা কিনে থাকেন, বা টেলিভিশনের চ্যানেলের অনুষ্ঠান দেখার জন্য যে গ্রাহকমূল্য দিয়ে থাকেন, সেই আয় এই মাধ্যমগুলি পরিচালনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যে মূল্য দিয়ে আপনি সংবাদ-পত্রিকা কেনেন, ঐ পত্র-পত্রিকার প্রকাশনার খরচ, আপনার দেওয়া মূল্যের চারগুণ বেশি। এই ঘাটতি পূরণ করে বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন বাবদ আয়ই সংবাদ-পত্র পত্রিকা এবং অন্যান্য মাধ্যমের আয়ের মূল উৎস। সংবাদ এবং বিনোদন পরিবেশনের জন্য সাধারণ মানুষ বা ব্যবহারকারী বিভিন্ন মাধ্যমের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই সব ব্যবহারকারীদের কাছে, বিভিন্ন পণ্যের এবং পরিষেবার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিজ্ঞাপনদাতারা বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহারে আগ্রহী হন। বিজ্ঞাপনদাতারা চান তাঁদের চিহ্নিত ব্যবহারকারীদের কাছে কতখানি সার্থকভাবে পৌঁছানো যাবে। কাজেই যে কোনো মাধ্যমের কার্যকরিতা পরিমাপ করার জন্য তাঁরা বিচার করেন কোন বিশেষ মাধ্যম তাঁদের চিহ্নিত ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছতে সক্ষম।

বিজ্ঞাপনদাতার বিচার্য বিষয় — এই সব ব্যবহারকারীদের কাছে, মাধ্যমের সাহায্যে প্রচারিত বিজ্ঞাপনই তাঁদের পণ্য বা পরিষেবার সংবাদ পৌঁছানোর একমাত্র উপায় হিসাবে কতটা কার্যকরী হবে বা হতে পারে।

যে কোনো বিজ্ঞাপনদাতার বিজ্ঞাপন - মাধ্যম নির্বাচনের মূল সূত্র — কত কম খরচে কত বেশি সংখ্যক ব্যবহারকারীর কাছে বিজ্ঞাপনটি কার্যকরীভাবে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হতে পারে। মাধ্যম নির্বাচনের এই মূল-সূত্রটি প্রয়োগ করতে হলে, বিজ্ঞাপনদাতাকে প্রথমে নির্ধারণ করতে হবে, যে পণ্যটির বিজ্ঞাপন করা হবে, সেটির ব্যবহারকারী কারা? ব্যবহারকারীদের চিহ্নিত করার কতকগুলি শর্ত আছে। ব্যবহারকারী কোথায় থাকেন, — তার ভৌগোলিক অবস্থান, — শহরে না গ্রামে। তিনি পুরুষ না মহিলা। ব্যবহারকারীর সম্ভাব্য বয়স, শিক্ষার মান, ক্রয়ক্ষমতা এবং জীবনযাত্রার মান। পরবর্তী শর্ত বিশেষ অনুধাবন যোগ্য। ব্যবহারকারীর কাছে কোন কোন মাধ্যমের জ্ঞাপন সম্ভাবনা (exposure) কীরকম। অর্থাৎ, তিনি কী সংবাদপত্র পাঠ করেন? যদি করেন, সেটি ইংরাজী না বাংলা? তিনি কী টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখেন? যদি দেখেন, তাহলে কোন কোন চ্যানেলের কোন কোন অনুষ্ঠান দেখেন? তিনি কী পত্রিকা পাঠ করেন? যদি করেন, তাহলে সেই সম্ভাব্য পত্রিকা কী? ইণ্ডিয়া টুডে, না ফিলমফেয়ার অথবা ফেমিনা? দেশ পত্রিকা, না সানন্দা, অথবা নবকল্লোল? বুঝতেই পারছেন, ব্যবহারকারীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যথেষ্ট ধারণা না থাকলে, এই বিষয়ে মোটামুটি সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এই সব সূত্রের উপর নির্ভর করেই বিজ্ঞাপনদাতকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাঁর বিজ্ঞাপন কোন মাধ্যমের সাহায্যে প্রচারিত হবে।

৫.৩ মাধ্যম নির্বাচনের সূত্র/নির্দেশিকা

বিজ্ঞাপনদাতা মাধ্যম নির্বাচন করেন তাঁর বিজ্ঞাপন ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। বিজ্ঞাপনদাতার বিশেষ বিবেচনার বিষয় (ক) প্রসারণ ক্ষমতা (Reach), পৌনঃপুনিকতা (frequency), ধারাবাহিকতা (continuity) এবং প্রভাব (Impact) (খ) মুখ্যত কোন শ্রেণির মাধ্যম নির্বাচন করা হবে। (গ) নির্ধারিত মুখ্য শ্রেণির মধ্যে কোন কোন নির্দিষ্ট মাধ্যম ব্যবহার করা হবে (ঘ) মাধ্যম পরিকল্পনার সময়সূচী কীরকম হবে।

মাধ্যম নির্বাচনের পূর্বে বিজ্ঞাপনদাতাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাঁর প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপন পরিকল্পনার প্রসারণ ক্ষেত্র কী, বিজ্ঞাপন সূচীর পৌনঃপুনিকতা কী হবে এবং ধারাবাহিকতা কী রকম পরিকল্পনা করলে — প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপনটি কাঙ্ক্ষিত (desired) প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে — গ্রাহকদের মনে।

৫.৩.১ প্রসারণ

বিজ্ঞাপনদাতাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন কোন ভৌগোলিক এলাকায় বিজ্ঞাপনটি প্রসারণ করা প্রয়োজন এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শতকরা কতজন সম্ভাব্য ব্যবহারকারীর কাছে বিজ্ঞাপনটি পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় — হয়তো কোনো বিজ্ঞাপনদাতা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িষা এবং আসাম প্রদেশের শতকরা ৭০ জন সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের মধ্যে তাঁর পণ্যের বার্তা এক বছরের মধ্যে পৌঁছে দিতে ইচ্ছুক।

৫.৩.২ পৌনঃপুনিকতা

বিজ্ঞাপনদাতাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তাঁর চিহ্নিত সাধারণ ব্যবহারকারীদের মধ্যে বিজ্ঞাপনটি একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কতবার প্রকাশ হওয়া যুক্তিযুক্ত হবে। উদাহরণ — নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে গড়ে তিনবার বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করা হলে যুক্তিযুক্ত হবে — বিজ্ঞাপনদাতা এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

৫.৩.৩ ধারাবাহিকতা

সম্ভাব্য চিহ্নিত ব্যবহারকারীদের উদ্দেশ্যে পৌনঃপুনিকভাবে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হলে, গ্রাহকদের মনে ধারাবাহিকতার প্রভাব সৃষ্টি হয়। এই ধারাবাহিকতাই ব্যবহারকারীকে বিজ্ঞাপনের পণ্যের বার্তাটি বহুদিন স্মরণে রাখতে সাহায্য করে।

৫.৩.৪ প্রভাব বিস্তার ক্ষমতা

প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপনটি কীরকম.প্রভাব সৃষ্টি করতে সম্ভব হবে, সে বিষয়েও বিজ্ঞাপনদাতাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। রেডিওয় প্রচারিত একটি বিজ্ঞাপনের প্রভাব টেলিভিশনে প্রচারিত বিজ্ঞাপনের প্রভাবের থেকে ভিন্ন হবে। একই বিজ্ঞাপন, ইণ্ডিয়া টুডে পত্রিকার মাধ্যমে যে ধরণের ব্যবহারকারীদের উপর যে রকম প্রভাব সৃষ্টি করবে, অন্য পত্রিকায় প্রকাশিত হলে, বিজ্ঞাপনটির প্রভাব অন্য রকম হবে।

৫.৪ মুখ্য মাধ্যম

বিজ্ঞাপনের প্রচারের জন্য মুখ্যত যে মাধ্যমগুলি ব্যবহার করা হয়, সেগুলি হলো - সংবাদপত্র, পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, প্রত্যক্ষ ডাকযোগ (ডাইরেক্ট মেল), এবং আউটডোর। এবারে দেখা যাক, বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসাবে, এই বিভিন্ন মাধ্যমগুলির সুযোগসুবিধা এবং অসুবিধা কী।

মাধ্যম	সুবিধা	অসুবিধা
সংবাদপত্র	অল্পসময়ে প্রকাশ করা সম্ভব। সময়োচিত। স্থানীয় জ্ঞাপনের পক্ষে ভালো। বিরাট গ্রহণযোগ্যতা, এবং বিশ্বাসযোগ্যতা।	সংক্ষিপ্ত জীবন। মুদ্রণের মান ভালো হলেও সীমিত। হাতবদল (pass along) পাঠক কম
পত্রিকা	ভৌগোলিক এবং জনতাত্ত্বিক নির্বাচনের বিশেষ সুযোগ। বিশ্বাসযোগ্যতা এবং সম্মান। উচ্চ মানের মুদ্রণ, দীর্ঘ জীবন, হাতবদল (pass along) পাঠক বেশি।	বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে সময় লাগে। কিছু অপচয় (waste)। বিজ্ঞাপন প্রকাশের স্থান নিশ্চিত নয়
রেডিও	ব্যাপক ব্যবহার। ভৌগোলিক ও জনতাত্ত্বিক নির্বাচনের বিশেষ সুযোগ। খরচ কম।	কেবল শ্রবণ মাধ্যম। টেলিভিশনের চেয়ে আকর্ষণ কম। ক্ষণস্থায়ী প্রকাশ।

মাধ্যম	সুবিধা	অসুবিধা
টেলিভিশন	দৃশ্য, শ্রবণ এবং গতির একত্রিত উপস্থাপন। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উপর আবেদন করে। আকর্ষণী ক্ষমতা বেশি। অধিক প্রসারণ ক্ষমতা।	প্রথম খরচ খুব বেশি। একসঙ্গে অনেক বিজ্ঞাপনের মধ্যে হারিয়ে যায়। ক্ষণস্থায়ী। গ্রাহকদের নির্বাচন করার সুযোগ সীমিত।
প্রত্যক্ষ ডাকযোগ	গ্রাহকদের নির্বাচিত করা যায়। এই মাধ্যমে অন্য বিজ্ঞাপনের প্রতিযোগিতা নেই। ব্যক্তিগত আবেদন	তুলনামূলকভাবে খরচ বেশি। ভাবমূর্তি। বাজেডাক। (Junk mail)
ঘরের বাইরে	জ্ঞাপনের পুনরাবৃত্তির সুযোগ অনেক বেশি। খরচ কম। প্রতিযোগিতাও কম।	গ্রাহকদের আলাদা করে নির্বাচিত করা সম্ভব নয়। সৃজনশীল উপস্থাপনের সুযোগ সীমাবদ্ধ।

আপনারা জানলেন প্রতিটি মাধ্যমের যেমন কতকগুলি সুবিধা আছে, তেমনই কতকগুলি অসুবিধাও রয়েছে। যাঁরা মাধ্যম পরিকল্পনা করেন, তাঁরা এই বিভিন্ন মাধ্যমগুলির সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করে মাধ্যম পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনার সময় অনেকগুলি পরিবর্তনশীল (variable) পরিস্থিতি তাঁদের বিবেচনা করতে হয়, যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য —

১। **চিহ্নিত বা উদ্দীষ্ট গ্রাহকদের মাধ্যম-অভ্যাস** — যেমন, তরুণ-তরুণীদের কাছে কোনো বিজ্ঞাপন পৌঁছে দেওয়ার বিশেষ কার্যকরী মাধ্যম টেলিভিশন এবং আকাশবাণীর এফ. এম. তরঙ্গের অনুষ্ঠান। আবার, গ্রামাঞ্চলে, সাধারণ মানুষের কাছে, (যাঁদের মধ্যে শিক্ষিতের, বা স্বাক্ষরের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম) বিজ্ঞাপন পৌঁছানোর বিশেষ কার্যকরী মাধ্যম — রেডিও।

২। **পণ্য** — মহিলাদের পোশাক রঙীন পত্রিকায় বিশেষ করে ভালোভাবে দেখানো যায়। পোলারয়েড ক্যামেরা টেলিভিশনেই কার্যকরীভাবে প্রদর্শন করা সম্ভব। বিভিন্ন মাধ্যমের প্রদর্শন ক্ষমতা, মনশ্চক্ষুতে দেখানোর, ব্যাখ্যা করার, বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টির এবং রঙের প্রভাব সৃষ্টির সম্ভাবনা, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের।

৩। **বার্তা** — আগামীকাল জামাকাপড়ের বিরাট সেল হবে। এই বার্তা সংবাদপত্র মাধ্যমেরই উপযুক্ত। আবার কোনো যন্ত্রের বিশেষ কর্মদক্ষতা ব্যাখ্যা করার জন্য বিশেষ বিষয়ের (specialised) পত্রিকা বিশেষ কার্যকরী হবে।

৪। **খরচ** — টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন দেওয়ার খরচ বেশি। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ার খরচ কম। কিন্তু পরিকল্পনার সময় বিবেচনা করতে হবে প্রতি এক হাজার ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছানোর খরচ কত পড়ছে। মোট খরচ নয়।

৫.৫ আধিপত্য

বিজ্ঞাপনদাতা কী এমন প্রভাব সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক যে অসংখ্য বিজ্ঞাপনের মধ্যেও তাঁর বিজ্ঞাপন ব্যবহারকারীদের স্মরণে থাকবে? বিজ্ঞাপনদাতা দীর্ঘ সময়ের বিজ্ঞাপন টেলিভিশনে বারবার প্রদর্শন ক'রে গ্রাহকদের মনে আধিপত্য সৃষ্টি করতে পারেন। যেমন পেপসি এবং কোকাকোলার বিজ্ঞাপনের সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা। মুদ্রণমাধ্যমে বড়ো বড়ো বিজ্ঞাপন বা পত্রিকায় একাদিক্রমে পূর্ণপৃষ্ঠা রঙীন বিজ্ঞাপন প্রকাশ ক'রেও আধিপত্যের

প্রভাব সৃষ্টি করা যায়। বিজ্ঞাপনে আধিপত্য সৃষ্টি করতে চাইলে অনেক টাকার বাজেট প্রয়োজন। নাহলে, কোনো একটি মাধ্যমে সীমিত সময়ের জন্য আধিপত্য করার চেষ্টায় প্রসারণ, পৌনঃপুনিকতা এবং ধারাবাহিকতা ব্যাহত হবে।

বিভিন্ন মাধ্যমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিচার বিবেচনা করেই মাধ্যম পরিকল্পনায় বিভিন্ন মাধ্যম অন্তর্ভূক্ত করা হয়। কোন মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে, বিজ্ঞাপনের খরচ বিশেষ ফলদায়ক হবে। পরিকল্পনার সময় মাধ্যমের প্রচার-সংখ্যা যেমন বিবেচ্য বিষয় হয়, সেই সঙ্গে মাধ্যমের গুণগত বিষয়গুলি বিশেষ করে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। মাধ্যমের গুণগত বৈশিষ্ট্য — বিশ্বাসযোগ্যতা, প্রতিপত্তি (prestige) ভৌগোলিক প্রসারণ, মুদ্রণের মান, সম্পাদকীয় পরিবেশ, এবং মনস্তাত্বিক প্রভাব। বিবেচনা করতে হবে, মাধ্যমটির প্রচার সংখ্যা এবং গুণগত বৈশিষ্ট্যের হিসাবে, কোন মাধ্যম বিজ্ঞাপনের খরচের তুলনায় সবচেয়ে বেশি প্রসারণ, পৌনঃপুনিকতা এবং প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম। প্রতি হাজার সম্ভাব্য গ্রাহকদের কাছে বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য মাধ্যম নির্বাচন এইভাবে করা হয়ে থাকে।

মাধ্যম পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য বিজ্ঞাপনের বার্তা উদ্দীষ্ট গ্রাহকদের কাছে কার্যকরীভাবে, কম খরচে পৌছে দেওয়া।

৫.৬ রণকৌশল

যে কোনো পরিকল্পনার মতই মাধ্যম পরিকল্পনাতেও একটি রণকৌশল নির্ধারণ করা হয়। রণকৌশল নির্ধারণের জন্য তিনটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়। বিপণন এবং বিজ্ঞাপন পরিস্থিতির বিশ্লেষণ, উদ্দীষ্ট গ্রাহকদের বা বাজার নির্ধারণ করা এবং মাধ্যম নির্বাচনের উদ্দেশ্য স্থির করা।

কোনো সংস্থার বিজ্ঞাপনের মাধ্যম পরিকল্পনা আসলে সংস্থার বিপণন এবং বিজ্ঞাপন পরিকল্পনার প্রসারণ মাত্র। কাজেই, মাধ্যম নির্বাচনের রণকৌশলও বহুলাংশে সংস্থার বিপণন এবং বিজ্ঞাপন পরিকল্পনার উপর নির্ভরশীল।

বিপণন ও বিজ্ঞাপন পরিস্থিতির বিশ্লেষণ

ক. বিপণন গুণনীয়ক

১। প্রতিযোগী কে বা কারা? বাজারে তাদের অবস্থান কীরকম?

২। সংস্থার বিশেষ রণকৌশল কি? বিপণনের লক্ষ্য কি?

৩। সংস্থার পণ্যটি ক্রেতার কোন সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম?

৪। আভ্যন্তরীণ বিপণন উপাদান বিষয়ে, যেমন - পণ্য, মূল্য, প্রচার, এবং বন্টন সম্বন্ধে বিপণনমূলক কোন কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে?

৫। বাইরের (external) কোন কোন বিষয় সংস্থার পণ্যের বিপণনে প্রভাব সৃষ্টি করছে?

খ. বিজ্ঞাপন গুণনীয়ক

১। চিহ্নিত পণ্যটির চাহিদা বৃদ্ধি করার জন্য বিজ্ঞাপনের ভূমিকা কী আশা করা হয়েছে?

২। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য কি?

৩। বিজ্ঞাপনে কত টাকা খরচ করা হবে?

৪। সংস্থার বিজ্ঞাপনের সৃজনশীলতার রণকৌশল কি?

এই পশ্চাদপট বিশ্লেষণ করা মাধ্যম পরিকল্পনার জন্য একান্ত আবশ্যক।

৫.৬.১ উদ্দীষ্ট বাজার নির্ধারণ

মাধ্যম পরিকল্পনার মূল কাজ মাধ্যম নির্বাচন করা, যার দ্বারা নির্দিষ্ট, উদ্দীষ্ট ব্যবহারকারীর কাছে বা বাজারে, বিজ্ঞাপন পৌঁছানো যায়। কাজে কাজেই মাধ্যম নির্বাচনের পূর্বে, ব্যবহারকারী বা উদ্দীষ্ট বাজার সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা আবশ্যক। কারণ, ব্যবহারকারীকে চিহ্নিত করার পরেই, কোন কোন মাধ্যমের সাহায্যে প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপন ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছানো যাবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব। সাধারণত বিপণন পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়েই, ব্যবহারকারী বা উদ্দীষ্ট বাজার চিহ্নিত করা হয়। মাধ্যম পরিকল্পনার জন্য নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীর ভৌগোলিক, জনতাত্ত্বিক এবং মনস্তাত্ত্বিক চিহ্নিতকরণ প্রয়োজন।

৫.৬.২ মাধ্যম নির্বাচনের উদ্দেশ্য

মাধ্যম নির্বাচনের উদ্দেশ্য বিধিবদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। এই নথিবদ্ধ উদ্দেশ্যাবলী দিকদর্শক হিসাবে চালিত করে মাধ্যম পরিকল্পনা। পরবর্তীকালে, মাধ্যম নির্বাচনের সার্থকতা বিচারের সময়েও, এই নথিবদ্ধ উদ্দেশ্যাবলী বিশেষ সহায়ক হয়। মাধ্যম নির্বাচনের উদ্দেশ্য বিধিবদ্ধ এবং পর্যালোচনার জন্য তিনটি বিষয় বিবেচিত হয় — প্রসারণক্ষমতা, পৌনঃপুনিকতা এবং ধারাবাহিকতা। এই বিষয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

৫.৭ বিজ্ঞাপনের মাধ্যম

৫.৭.১ মুদ্রণ মাধ্যম

বিজ্ঞাপনের জন্য যে সকল মাধ্যম রয়েছে, তার মধ্যে মুদ্রণমাধ্যমই অন্যতম প্রাচীন মাধ্যম এবং এখনও জনপ্রিয় মাধ্যম হিসাবে গণ্য। সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন পত্রিকা বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসাবে বিজ্ঞাপনদাতারা পছন্দ করেন। এই পছন্দের অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে অন্যতম — সম্পাদকীয় অবলম্বন বা সমর্থন (support)। প্রতিটি পত্রিকাই সম্পাদকীয় মতামতের জন্য এক বিশেষ শ্রেণির পাঠকদের কাছে জনপ্রিয়। বিজ্ঞাপনদাতার পক্ষেও, তাঁদের ব্যবহারকারীদের চিহ্নিত করতে সহায়তা করে।

ক. সংবাদপত্র

সাধারণ মানুষের জীবনে সংবাদপত্রের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। সংবাদপত্রই সারা বিশ্বের খবর, দেশের খবর, আপনার শহরের বা গ্রামের খবর আপনার কাছে পৌঁছে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে দেয় কতরকম পণ্য এবং পরিষেবার খবর, যে সব খবর বহুবার আপনার কাজে লেগেছে। বিভিন্ন পণ্য এবং পরিষেবা নির্বাচনের সময়।

সংবাদপত্র সাধারণত দুরকম মাপের হয়। এক সাধারণ ব্রডসিট, আপনাদের সকালবেলার সংবাদপত্রের মাপ। দুই - ট্যাবলয়েড, সকালের খবরের কাগজের অর্ধেক মাপ। সাধারণত সান্ধ্য দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা ট্যাবলয়েড মাপে প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্র দৈনিক হতে পারে, সাপ্তাহিক হতে পারে, অর্ধসাপ্তাহিক হতে পারে আবার পাক্ষিকও হতে পারে।

সংবাদপত্রের বিষয়বস্তুর তারতম্য ঘটে। কোনো কোনো সংবাদপত্রে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদ বেশি থাকে। স্থানীয় সংবাদ সেরকম গুরুত্ব পায় না। আবার কোনো কোনো সংবাদপত্রে স্থানীয় সংবাদকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাংলা দৈনিক পত্রিকার কোনো কোনোটিতে গ্রাম-বাংলার সংবাদ বেশি থাকে। দি ইকনমিক টাইমস্ পত্রিকায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদ থাকলেও, ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত সংবাদই এই পত্রিকায় প্রাধান্য প্রায়। প্রতিটি সংবাদপত্রের বিষয়বস্তু বিভিন্ন রকমের।

পাঠকদের চরিত্র বিচার করলে দেখা যায়, বিভিন্ন সংবাদপত্রের পাঠকদের চরিত্র বিভিন্ন প্রকারের। কোনো সংবাদপত্র কলকাতা, মুম্বাই বা দিল্লীর সাধারণ পাঠকদের কাছে জনপ্রিয় হলেও, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কোনো সংবাদপত্র ছাত্রমহলে বিশেষ জনপ্রিয়, আবার কোনো সংবাদপত্র হয়তো বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত পাঠকদের বেশি জনপ্রিয়। দি ইকনমিক টাইমস্, ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত পাঠকদের কাছে জনপ্রিয়। প্রতিটি সংবাদপত্রেরই একটি নির্দিষ্ট পাঠকমণ্ডলী আছে।

ভৌগোলিক দিক থেকে, সংবাদপত্র স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় এলাকার পাঠকদের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম।

বিজ্ঞাপনের জন্য প্রতিটি সংবাদপত্রের মুদ্রিত রেট-কার্ড আছে। এই রেটকার্ডে, সংবাদপত্রের বিভিন্ন পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকে। বিজ্ঞাপনের খরচের কার্যকরীতা বিচারের জন্য বিজ্ঞাপনের হার হিসাবে প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপনের মোট খরচ, পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচার করা হয়। সংবাদপত্র-পত্রিকার প্রচার সংখ্যা, অডিট ব্যুরো অফ সার্কুলেশন দ্বারা প্রত্যয়িত। তাঁরা, সদস্য সংবাদপত্রগুলির প্রচার সংখ্যার নিয়মিত হিসাবনিকাশ করেন এবং প্রতিবছরে দুই বার, সমস্ত সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যার বিস্তারিত বিবরণ সহ পুস্তক প্রকাশ করেন। বিজ্ঞাপনদাতা এবং বিজ্ঞাপন সংস্থা এই তথ্যের উপরে নির্ভর করে মাধ্যম নির্বাচনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

আপনার বাড়িতে যে সংবাদপত্র আসে, সেটি কেবল আপনিই পড়েন না, আপনার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও সেটি নিয়মিত পড়েন। অর্থাৎ কোনো সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা যদি এক লক্ষ হয়, তাহলে সেই

পত্রিকাটির পাঠক সংখ্যা গড়ে সাত লক্ষ। সংবাদপত্রগুলি, বিজ্ঞাপনদাতা এবং বিজ্ঞাপন সংস্থার কাছে পাঠক সংখ্যার উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞাপন প্রকাশের আবেদন করেন।

খ. সাময়িক পত্রিকা

বিজ্ঞাপনের মাধ্যমগুলির মধ্যে পত্রিকা সাধারণতঃ কুলীন বলে গণ্য হয়। পত্রিকাগুলিই সাধারণ মানুষের চিন্তাধারা বেশি প্রভাবিত করে এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকেও মানুষকে সচেতন করে। পত্রিকার বিষয়বস্তু এবং প্রকাশিত বিজ্ঞাপন পত্রিকার একটি বিশিষ্ট চরিত্র প্রস্ফুটিত করে।

সংবাদপত্রের মতো পত্রিকারও বিভিন্ন মাপ আছে। পকেট — রিডার্স ডাইজেস্ট, সরিটা। ফ্ল্যাট — ইণ্ডিয়া টুডে, দেশ, পশ্চিমবঙ্গ।

পত্রিকাগুলি সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, দ্বি-মাসিক এবং ত্রৈমাসিক হতে পারে।

সাধারণত প্রতিটি পত্রিকাই একটি নির্দিষ্ট পাঠকমণ্ডলীকে লক্ষ্য করে প্রকাশিত হয়। সাধারণ চরিত্রের পত্রিকা - সংবাদ ভিত্তিক, — ইণ্ডিয়া টুডে, আউটলুক। সাহিত্যমূলক — দেশ। ছোটদের পত্রিকা — আনন্দমেলা, শুকতারা। সিনেমা সংক্রান্ত — ফিলমফেয়ার, আনন্দলোক। বিশেষ করে মহিলাদের জন্য পত্রিকা — ফেমিনা, সানন্দা। ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত পত্রিকা - বিজনেস ইণ্ডিয়া, বিজনেস ওয়ার্লড। বুঝতেই পারছেন, প্রতিটি পত্রিকাই এক বিশেষ পাঠকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রিকাগুলিও অডিট ব্যুরো অফ সার্কুলেশনের সদস্য। প্রচার সংখ্যা প্রত্যয়িত। বিজ্ঞাপনদাতা তাঁদের উদ্দীষ্ট গ্রাহকদের বৈশিষ্ট্য বিচার ক'রে প্রচার সংখ্যার হিসাবে, বিজ্ঞাপনের ব্যয়ের কার্যকরীতা বিচার করেন।

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার বিশেষ সুবিধা নির্দিষ্ট বা উদ্দীষ্ট গ্রাহককে চিহ্নিত করে মাধ্যম নির্বাচন করা। যেমন, — কোনো ফেস ক্রিমের বিজ্ঞাপন ফেমিনা বা সানন্দা পত্রিকায় প্রকাশিত হলে, নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীদের কাছে বিজ্ঞাপনের বার্তাটি পৌঁছাবে। পত্রিকায় রঙীন বিজ্ঞাপন ভালো কাগজে ছাপা হওয়ার কারণে পাঠকদের মনে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে। একটি পত্রিকা অনেকদিন থাকে। তার ফলে বিজ্ঞাপনটি দেখার সুযোগ অনেকদিন থাকে এবং বার বার পাওয়া যায়। পত্রিকার প্রচার সংখ্যার চেয়ে পাঠক সংখ্যা অনেকগুণ বেশি। একটি পত্রিকা একটি পরিবার থেকে অন্য পরিবারে ভ্রমণ করে এবং বিজ্ঞাপন দেখার সম্ভাবনা বহুগুণ বৃদ্ধি করে।

৫.৭.২ রেডিও

বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসাবে রেডিও'র কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। আপনি যখন সংবাদপত্র বা পত্রিকা পাঠ করেন, তখন আপনার চোখ এবং মন সংবাদপত্র বা পত্রিকার পৃষ্ঠায় নিবদ্ধ থাকে। কিন্তু রেডিও শুনতে শুনতে আপনি অন্যান্যকাজ, যেমন ঘরের কাজ, দাড়িকামানো বা স্নান করা ইত্যাদি করতে পারেন। কিন্তু রেডিও আপনাকে যা কিছু জানায়, সবই কেবল শব্দের মাধ্যমে। আপনার চোখের সামনে কোনো ছবি থাকে না। রেডিওর মাধ্যমে শব্দ শুনে আপনি নিজের মনে একটি ছবি তৈরি করেন। যেহেতু একবার বা দুবার শোনার পরে কোনো

ছবি তৈরি সম্ভব না-ও হতে পারে, সেই কারণে, রেডিওতে একই বিজ্ঞাপন বার বার প্রচার করা হয়। যাতে শ্রোতা, বার বার শুনে, তাঁর মনে একটি ছবি তৈরি করে নিতে পারেন।

বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসাবে রেডিও'র আলোচনা করার সময়, কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, সুদূর গ্রামাঞ্চলে সংবাদপত্র প্রতিদিন পৌঁছায় না। যেখানে পৌঁছায়, সেখানেও আগের দিনের খবর পরিবেশন করে, যার ফলে, সংবাদপত্রের তাৎক্ষণিক মূল্য অনেকটা কমে যায়। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হওয়ায়, টেলিভিশন দেখা সর্বত্র সম্ভব হয় না। এর পরে বিদ্যুৎ সরবরাহের অপ্রতুলতাও আছে। তারপরে রয়েছে, গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিত এবং স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা যা শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও কম। এই রকম পরিস্থিতিতে ট্র্যানজিস্টারের মাধ্যমে সংবাদ, বিনোদন এবং বিজ্ঞাপন অগণিত সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে কোনো পণ্যের বা পরিষেবার প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসাবে রেডিও অদ্বিতীয়। অলস দুপুরে গ্রামের বধূর কাছে পণ্যের বিজ্ঞাপন পৌঁছে দেয় রেডিও। মাঠে কৃষিকাজের সময় একা কৃষকের সঙ্গী রেডিও, তাকে নানা পণ্যের গুণ বোঝায়। ভাষা, স্বাক্ষরতা, দারিদ্র, সব বাধা পার হয়ে, বিজ্ঞাপনের বার্তা আপামর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয় রেডিও।

৫.৭.৩ টেলিভিশন

ভারতের সব বড় শহরে এবং শহরের আশপাশের অঞ্চলে টেলিভিশন বর্তমানে জনপ্রিয় মাধ্যম। টেলিভিশনের জনপ্রিয়তার কারণ এটি শ্রবণ-দৃশ্য মাধ্যম। একই সঙ্গে কানে শোনা যায় এবং চোখেও দেখা যায়। চোখে যে ছবি দেখা যায়, সেটি স্থিরচিত্র নয়। চলচ্চিত্র। এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রঙীন। এই কারণে, এই মাধ্যমের আবেদন এবং প্রভাব অত্যন্ত বেশি। বর্তমানে কেবল দূরদর্শন নয়, আরো অনেক টেলিভিশন চ্যানেল বিভিন্ন বিনোদন ও সংবাদ-আলোচনা পরিবেশনের সম্ভার নিয়ে দর্শকদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে।

মাধ্যম হিসাবে টেলিভিশন অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম এবং দর্শকদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম। এই প্রভাব সৃষ্টির দক্ষতার জন্যই বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসাবে টেলিভিশন বিশেষ কার্যকরী। ডিটারজেন্ট পাউডারের বিজ্ঞাপনে আপনারা দেখেছেন, স্কুলের ছাত্রের জামায় কাদা-ময়লা লেগে রয়েছে। তারপরে, একটি বিশেষ ডিটারজেন্ট পাউডারে জামাটি ধোয়ার দৃশ্য। কাচার পরে, জামাটি কীরকম ঝকঝকে সাদা হয়েছে, আপনি দেখছেন। কোথাও কাদা-ময়লার কোনো দাগ নেই। আপনাকে ঐ বিশেষ ডিটারজেন্ট পাউডারটির কার্যকরীতা দেখিয়ে আপনার বিশ্বাস প্রতিপন্ন করা হয়। বিজ্ঞাপনদাতাদের সুবিধার্থে টেলিভিশন যে সুযোগ করে দেয়, সেরকম সুযোগ আর কোনো মাধ্যম দিতে সক্ষম নয়। আর একটা কথা, আপনি যখন টেলিভিশন দেখেন নিজের বাড়িতে বসে, তখন আপনার মন শান্ত (relaxing) এবং বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের বার্তা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। এই রকম পারিপার্শ্বিক এবং মানসিক পরিবেশে, বিজ্ঞাপনের বার্তা গভীর প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। জীবন্ত প্রতিচ্ছবি এবং প্রাণবন্ত (animation) উপস্থাপনার সাহায্যে যে কোনো পণ্যের গ্রাহকদের যে-কোনো সুবিধা, বিশেষভাবে প্রদর্শন করা সম্ভব। এইকারণেই ভোগ্যপণ্যের বিপণনে টেলিভিশন, বিজ্ঞাপনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে গণ্য হয়।

বিপণনের প্রয়োজনে, বিশেষ নির্বাচিত প্রদেশে বা অঞ্চলে টেলিভিশনের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন সম্প্রচারিত করা সম্ভব। আপনারা দেখছেন, বিভিন্ন শহরের কেবল টিভি চ্যানেলে অনেক স্থানীয় ব্যবসার বা দোকানের বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করা হয়। নির্দিষ্টভাবে স্থান নির্বাচন করে টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন প্রচারের সুযোগ ছোটো ব্যবসায়ী বা স্থানীয় দোকানের পক্ষেও বিশেষ সুবিধাজনক। আবার যে সব বড়ো বড়ো সংস্থা সারা দেশজুড়ে তাঁদের পণ্য বিপণনের ব্যবস্থা করেছেন, তাঁরা দূরদর্শনের মাধ্যমে এবং অন্যান্য চ্যানেলের মাধ্যমে, অপেক্ষাকৃত লাভজনক ভাবে তাঁদের পণ্যের প্রচারের ব্যবস্থা করেন।

তবে, এই বিশেষ শক্তিশালী এবং কার্যকরী মাধ্যম ব্যবহারের কিছু অসুবিধাও আছে। ক্ষণস্থায়ী, বেশি খরচ এবং অনেক বিজ্ঞাপনের মধ্যে হারিয়ে যায়, মূলত টেলিভিশন বিজ্ঞাপনের অসুবিধা এই তিনটি। যে কোনো বিজ্ঞাপন, দশ, কুড়ি, তিরিশ বা ষাট সেকেণ্ডের জন্য দেখানো হয়। বিজ্ঞাপনের উদ্দীষ্ট দর্শক যদি সেটি দেখেন, তাহলে ভালো কথা। একবার, দুবার দেখে বিজ্ঞাপিত পণ্যের চিহ্নমত নাম মনে রাখতে সক্ষম হলে, বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ। আর যদি এই স্বল্প সময়ের বিজ্ঞাপনটি দর্শকদের নজর কাড়তে সক্ষম না হয়, তাহলে সবটাই অপচয়। টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনের দুটি অংশ আছে। একটি — যে শ্রবণ-দৃশ্য বিজ্ঞাপন দেখানো হবে, সেটি প্রস্তুত করা বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ। আবার টেলিভিশনের বিভিন্ন চ্যানেলের (দূরদর্শনেরও) বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের মূল্য-হার ও বেশি। যার ফলে ছোটো ব্যবসায়ীদের পক্ষে সবসময়ে টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্ভব হয় না, যদি না তাদের ব্যবসার পরিমাণ এমন হয় যে, বিজ্ঞাপনের খরচ করা সার্থক হয়। টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের আরো একটি অসুবিধা, সাধারণত একসঙ্গে একাধিক বিজ্ঞাপন দেখানো হয়। অনেক বিজ্ঞাপনের মধ্যে একটি বিশেষ পণ্যের বিজ্ঞাপন হারিয়ে যেতে পারে, উদ্দীষ্ট দর্শক হয়তো সেই বিজ্ঞাপনটি লক্ষ্যই করলেন না, এমন হওয়ার সম্ভাবনাও যথেষ্ট।

৫.৭.৪ প্রত্যক্ষ ডাকযোগ

যে কোনো বিজ্ঞাপন, যা ডাক ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভাব্য গ্রাহকদের কাছে পাঠানো হয়, সেই বিজ্ঞাপনের মাধ্যম প্রত্যক্ষ ডাকযোগ বলে গণ্য হয়। ডাকযোগে পাঠানো বিজ্ঞাপনের মূল উদ্দেশ্য গ্রাহকদের আগ্রহ সৃষ্টি করা, গ্রাহককে কোনো পণ্য কিনতে সাহায্য করা আর, বিজ্ঞাপিত পণ্যটির চিহ্নিত নামটির পরিচিতি ঘটানো। সেই সঙ্গে গ্রাহকদের আরো জানানো হয়, পণ্যটি কোন সংস্থা প্রস্তুত করেছেন, পণ্যটির বিশেষ গুণাবলি কী এবং কোথায় কিনতে পাওয়া যাবে, ইত্যাদি সকল তথ্য। এই সবই করা হয়, গ্রাহকদের পণ্যটি সম্বন্ধে সচেতন করার জন্য, চিহ্নিত নাম পরিচিত করার জন্য এবং পণ্যটি কিনতে উৎসাহিত করার জন্য।

প্রত্যক্ষ ডাকযোগ, বিজ্ঞাপনের প্রাচীনতম মাধ্যমগুলির অন্যতম। এই মাধ্যমের সাহায্যে নির্দিষ্ট এবং উদ্দীষ্ট গ্রাহকদের কাছে, বিজ্ঞাপন সরাসরি পৌঁছায়। যেহেতু নির্বাচিত সম্ভাব্য গ্রাহকদের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করে, প্রত্যক্ষ ডাকযোগে তাঁদের কাছে বিজ্ঞাপন পাঠানো হয়, সেই কারণে, গণ-মাধ্যমের মত উচ্চ-হারে অপচয়ের

সম্ভাবনা নেই। প্রত্যক্ষ-ডাকযোগে যেমন ছোটো শহরের গ্রাহকদের কাছে বিজ্ঞাপন পাঠানো যায়, তেমনি বড়ো শহরে, জেলা স্তরে, প্রদেশ স্তরে, এমনটি সর্বভারতীয় স্তরেও ডাকযোগে বিজ্ঞাপন পাঠানো যেতে পারে, যদি গ্রাহকদের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। প্রত্যক্ষ ডাকযোগ মাধ্যমের কার্যকরীতা হিসাব করা সম্ভব। একশজন উদ্দীষ্ট গ্রাহকদের মধ্যে কতজন সাড়া দিলেন, তার হিসাব থেকেই বোঝা যায়, শতকরা কত হারে সফল হয়েছে। প্রত্যক্ষ ডাকযোগে পাঠানো বিজ্ঞাপনে সৃজনশীলতার সুযোগ অনেক বেশি। নানা রঙে, চিত্তাকর্ষকভাবে বিজ্ঞাপন উপস্থাপন করা সম্ভব। যেহেতু বেশি জায়গা পাওয়া যায়, বিজ্ঞাপিত পণ্যটির বিশদ বিবরণ দেওয়া যেতে পারে। পণ্যটি যদি কোনো রকমের যন্ত্র হয়, তাহলে, সেটির বিভিন্ন কর্মদক্ষতা বিশেষ ড্রয়িং বা স্কেচের সাহায্যে বোঝানো হয়। যেহেতু নির্দিষ্ট গ্রাহকদের বিজ্ঞাপিত পণ্যটি সম্বন্ধে আগ্রহ হবে জেনেই প্রত্যক্ষ ডাকযোগে বিজ্ঞাপনটি পাঠানো হয়, — বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রাপক গ্রাহকগণ সেটি মনোযোগ সহযোগে দেখেন ও পড়েন। সেইজন্য এই মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের কার্যকরীতা, অন্যান্য মাধ্যমের চেয়ে বেশি হয়। তবে প্রত্যক্ষ ডাকযোগ মাধ্যমে বিজ্ঞাপন, ব্যয়সাপেক্ষ। ভালকাগজে, নানা রঙে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের খরচ যথেষ্ট। তারপরে ডাক মাশুল, এবং পাঠানোর ব্যবস্থার খরচ। সঙ্গে রয়েছে নির্দিষ্ট, উদ্দীষ্ট গ্রাহকদের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ এবং তালিকা প্রস্তুত করার খরচ।

৫.৭.৫ ঘরের বাইরে

নিজের ঘর থেকে নানা কারণে বাইরে বেরিয়ে, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, যাতায়াতের পথে গ্রাহকগণ যে সব বিজ্ঞাপন দেখেন, সেগুলি সবই ঘরের বাইরে বিজ্ঞাপন হিসাবে চিহ্নিত। ঘরের বাইরে বিজ্ঞাপন পথের ধারে, বাড়ির ছাদে, বিভিন্ন মাপের বড়ো বড়ো বোর্ড হতে পারে, আবার ল্যাম্পপোষ্টের গায়ে আটকানো ছোটো কিয়স্ক হতে পারে, দেওয়ালে বা অন্যত্র সাঁটা পোস্টার হতে পারে, আবার বিভিন্ন দোকানের ভিতরে বিভিন্ন প্রদর্শনমূলক বিজ্ঞাপনও হতে পারে। ঘরের বাইরে বিজ্ঞাপন যদিও প্রাচীনতম মাধ্যমগুলির অন্যতম, বর্তমানে এই মাধ্যমটি সাধারণতঃ সহযোগী মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ, যে পণ্যের বিজ্ঞাপনের জন্য সংবাদপত্র, বা পত্রিকা বা টেলিভিশন মুখ্য মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেই বিজ্ঞাপনের সহযোগী মাধ্যম হিসাবে 'ঘরের বাইরে' মাধ্যম ব্যবহার করা হয়। সহযোগী, অর্থাৎ অনুস্মারক মাধ্যম। মুখ্য মাধ্যমে প্রচারিত বিজ্ঞাপনটি গ্রাহকদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

ঘরের বাইরে মাধ্যমের বিশেষ সুবিধা, যে অঞ্চলে পণ্যের প্রচার পরিকল্পনা করা হয়েছে, ঠিক সেই অঞ্চলে হোর্ডিং বা পোস্টার ব্যবহার করা যেতে পারে। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমের ভৌগোলিক নির্বাচনের সুযোগ সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়, 'ঘরের বাইরে' মাধ্যমে। কোনো পণ্যের ক্রেতা যদি চিহ্নিত হন, মধ্যবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গ্রাহক, যাঁরা থাকেন কলকাতা শহরের ভবানীপুর অঞ্চলে এবং বেশির ভাগ কেনাকাটা করেন যদুবাবুর বাজারে, তাহলে যদুবাবুর বাজারের আশপাশে হোর্ডিং-এ পণ্যটির বিজ্ঞাপন চিত্রিত করলে, সম্ভাব্য ক্রেতাদের পণ্যটির চিহ্নিত নাম স্মরণ করিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে।

ঘরের বাইরে মাধ্যমের প্রসারণ এবং পৌনঃপুনিকতার সুযোগ অত্যন্ত বেশি। উপরে দেওয়া যদুবাবুর বাজারের পাশের হোর্ডিং-এর হিসাবেই বিবেচনা করা যাক। ঐ এলাকায় যত লোক বসবাস করেন, তাঁরা প্রায় সকলেই দিনের পর দিন ঐ বিজ্ঞাপনটি দেখেন। এমনও হতে পারে, কোনো কোনো গ্রাহক ঐ বিজ্ঞাপনটি প্রতিদিন চারবার বা ছয়বার দেখেন। এই রকম প্রসারণ এবং পৌনঃপুনিকতা আর কোনো মাধ্যমের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। আর, প্রতি হাজার জন গ্রাহকের কাছে বিজ্ঞাপন উপস্থাপনের হিসাবে, ঘরের বাইরে মাধ্যমের খরচ যথার্থই কম। যে সব বিজ্ঞানদাতা এক শহরে একাধিক হোর্ডিং ব্যবহার করেন একটি পণ্যের বিজ্ঞাপনের জন্য অথবা সারা দেশ জুড়ে অসংখ্য হোর্ডিং-এ একটি পণ্যের বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনা করেন, তাঁরা বিশেষ লাভবান হন। উদ্দীষ্ট গ্রাহক যেখানেই যান একই বিজ্ঞাপন দেখেন এবং বারংবার একই বিজ্ঞাপন দেখার ফলে, বিজ্ঞাপিত পণ্যটি গ্রাহকের মনে বিশেষ প্রভাবের সৃষ্টি করে। এই সঙ্গে খরচের বিষয়টি চিন্তা করলে, 'ঘরের বাইরে' মাধ্যম বিশেষ আকর্ষণীয় মাধ্যম। বড়ো বাজেটের বিজ্ঞাপনদাতা এবং স্বল্প বাজেটের বিজ্ঞাপনদাতা, দুইয়ের কাছেই, 'ঘরের বাইরে' মাধ্যম বিশেষ কার্যকরী। হোর্ডিং সাধারণত অনেক ব ড়ো মাপের হয়। তার ফলে, গ্রাহকদের মনে বড়ো প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

তবে, হোর্ডিং-এ বিজ্ঞাপনের বার্তা সংক্ষিপ্ত হয়। যেহেতু পথে ঘাটে গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়, সেই কারণে হোর্ডিং-এ তুলনামূলক বিপরীত রঙ ব্যবহার করা হয়। গ্রাহকদের বার্তা জ্ঞাপনের জন্য বড়ো বড়ো হরফ ব্যবহার করা হয়। পথে ঘাটে তো বেশি কথা পড়া সম্ভব নয়। চড়া রঙের সাহায্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বড়ো বড়ো হরফে পণ্যের বার্তা গ্রাহকদের জানাতে হয়। বেশি কথা লেখার কোনো সুযোগ নেই। হোর্ডিং-এ চিত্রের ব্যবহার ও এমন, যাতে গ্রাহক এক-পলক দেখেই, পণ্যটির সম্যক ধারণা করতে পারেন। আপনারা দেখেছেন, বিরাট হোর্ডিং-এ, সাদা প্রেক্ষাপটে একটি কালো টায়ারের আংশিক চিত্র। তার পাশে লাল বড় বড় হরফে লেখা — সিয়েট। এই হোর্ডিং আপনাকে মনে করিয়ে দেয় — সিয়েট নামের টায়ার। হোর্ডিং নির্বাচনের আরো একটি সমস্যা — একই জায়গায়, পাশাপাশি বা উপর-নীচে অনেকগুলি হোর্ডিং থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রতিটি হোর্ডিং-এর আকর্ষণ ক্ষমতা এবং আবেদন হ্রাস পায়। হোর্ডিং-নির্বাচনের সময় জায়গা বাছা একটি কঠিন কাজ। ঠিক যেখানে প্রয়োজন, সেই জায়গায়, আলাদাভাবে হোর্ডিং নির্বাচন করতে না পারলে, হোর্ডিং-এর বিজ্ঞাপনের সম্পূর্ণ লাভ পাওয়া যায় না। হোর্ডিং এর বিজ্ঞাপনে সৃজনশীলতার যথেষ্ট সুযোগ আছে, চড়া রঙ, কম কথা এবং বড়ো হরফের ধরাবাঁধার ভিতরেও। এয়ার-ইণ্ডিয়া, আমূল মাখন, জেনসন নিকলসন এবং এশিয়ান পেন্টস, হোর্ডিং-এ বিজ্ঞাপনের দ্বারা গ্রাহকদের মধ্যে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছে।

বাস-ট্রেন ইত্যাদি যানবাহনের গায়ে যে সব বিজ্ঞাপন দেখেন, সেগুলি হোর্ডিং-এরই চলন্ত সংস্করণ। বলাবাহুল্য বাস-ট্রেন রুট অনুযায়ী যাত্রাপথের দুধারে অসংখ্য গ্রাহকদের বিজ্ঞাপিত পণ্যটি স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘরের বাইরে মাধ্যম হিসাবে পোস্টার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কোনো দোকানে জিনিস কিনতে গেলে আপনারা দেখেন দোকানের দুপাশের দেওয়ালে বা দরজায়, এবং কখনো দোকানের ভিতরেও বিভিন্ন পণ্যের

পোস্টার মারা থাকে। আপনি যখন দোকানে জিনিস কিনছেন, সেই মুহূর্তেই আপনাকে একটি বিশেষ চিহ্নিত পণ্যের নাম স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। পোস্টার ব্যতিরেকে, নানা আকারের, নানা রঙের মুদ্রিত বিজ্ঞাপন আপনারা বিভিন্ন দোকানে দেখে থাকেন। এগুলি সাধারণত দোকানের ভিতরে র‍্যাকের গায়ে সাঁটা থাকে অথবা উপর থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, যাতে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। এগুলির কাজ, — আপনি যখন দোকানে জিনিস কিনছেন—সেই মুহূর্তে পণ্যটির নাম আপনাকে স্মরণ করানো। এগুলির একটি নাম (point of sale) বিক্রির সময় মনে করানো (বিক্রেতার তরফে), আর একটি নাম — (point of purchase) কেনার সময় মনে করানো — (ক্রেতার তরফে)। বর্তমানে ঘরের বাইরে মাধ্যমের এই রকম প্রয়োগ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে করা হয়, বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের প্রচারের জন্য।

৫.৮ বিজ্ঞাপনের বাজেট

আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য অনেক টাকা খরচ করতে হয়। যে কোনো বিষয়ে খরচের প্রসঙ্গ থাকলেই একটি লিখিত বাজেট তৈরি করা আবশ্যক। বাজেটে উল্লিখিত থাকে একটি আর্থিক বছরে মোট কত টাকা বিজ্ঞাপন বাবদ খরচ করা হবে। বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থার কর্তৃপক্ষ বাজেট অনুমোদন করলে — প্রস্তাবিত বাজেট অনুযায়ী বিজ্ঞাপন অভিযান বাস্তবে রূপায়িত হয়। বাজেটে নথিবদ্ধ করা হয় — কোন কোন মাধ্যমে কী ভাবে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে। বিভিন্ন মাধ্যমের জন্য কত খরচ হবে। বিভিন্ন মাধ্যমে বিজ্ঞাপন কীভাবে, কতদিন অন্তর প্রকাশিত হবে এবং এই কর্মসূচী বাবদ, কীভাবে বাজেটে অনুমোদিত টাকা খরচ করা হবে।

যে কোনো সংস্থার পক্ষেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, বিজ্ঞাপনের জন্য কতটাকা খরচ বরাদ্দ করা হবে। বিভিন্ন শিল্প এবং ব্যবসার বিজ্ঞাপনের সহযোগিতার প্রয়োজন বিভিন্ন রকমের। কোনো প্রসাধন সামগ্রীর বিজ্ঞাপনের খরচ মোট বিক্রির তিরিশ বা পঁয়ত্রিশ শতাংশও হতে পারে। আবার কোনো মেসিনারির বিজ্ঞাপনের খরচ হয়তো মোট বিক্রির দুই বা তিন শতাংশই যথেষ্ট। বিভিন্ন সংস্থা, বিজ্ঞাপনের খরচের বাজেট নির্দিষ্ট করার জন্য কতকগুলি প্রক্রিয়া (method) অনুসরণ করে থাকেন।

৫.৮.১ সামর্থ অনুযায়ী (Affordable)

অনেক সংস্থাই বিজ্ঞাপনের বাজেট নির্ধারণ করেন এই হিসাবে যে — তাঁরা কত টাকা খরচ করতে সমর্থ বলে মনে করেন।

এই প্রক্রিয়া অবৈজ্ঞানিক। কারণ, পণ্যটির বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপন কতখানি প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে, সে বিষয়ে কোনো চিন্তা-ভাবনা করা হয় না। এই বাজেটের চরিত্র এবং ফলাফল অনিশ্চিত। বিজ্ঞাপনের বাজেট এইভাবে স্থির করা হলে দীর্ঘস্থায়ী বিপণনের পরিকল্পনা করতে অসুবিধা হয়।

৫.৮.২ ইচ্ছা অনুযায়ী (Arbitrary Method)

বিজ্ঞাপনের বাজেট যখন সংস্থার পরিচালন কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা অনুযায়ী স্থির করা হয় তখন কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা নিয়মনীতি অনুসরণ করা হয় না। নিতান্তই অনুমান বা আন্দাজের উপর নির্ভর করে টাকার অঙ্ক নির্ধারণ করা হয়, বিজ্ঞাপনের বাজেটের জন্য। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই অঙ্ক নির্ধারিত হয় — 'কত টাকা আছে' অথবা 'গতবছর কতটাকা খরচ হয়েছে' — তার উপর ভিত্তি করে।

এই সব প্রচলিত অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করার ক্ষেত্রেও সংস্থাগুলি মনে করেন, তাঁরা বিশেষ নিয়ম অনুসারেই বাজেট নির্ধারণ করছেন।

অতীত বিক্রির পরিমাণের শতকরা হিসাবে :- সংস্থার গতবছরের মোট বিক্রির অঙ্ক — একটি পূর্বস্থিরিকৃত শতকরার অঙ্ক দ্বারা — যেমন পাঁচ, দশ বা বিশ দ্বারা গুণ করে, চলতি বছরের বিজ্ঞাপনের বাজেট নির্ধারণ করা হয়। যে সংস্থা এই পদ্ধতি অনুসরণ করেন, তাঁদের ধারণা তাঁরা অত্যন্ত বৈজ্ঞানিকভাবে বাজেট নির্ধারণ করছেন। কিন্তু এই পদ্ধতির ভিত্তি অবৈজ্ঞানিক, কারণ, শতকরা হার, যার দ্বারা গতবছরের মোট বিক্রির অঙ্কের হিসাবে বাজেট নির্ধারণ করা হয়, — সেই হার একেবারেই ইচ্ছামত স্থির করা হয়।

ভবিষ্যৎ বিক্রির পরিমাণের শতকরা হিসাবে :- এই পদ্ধতি আগের পদ্ধতিরই সমতুল্য। কেবল, অতীত বিক্রির পরিমাণের পরিবর্তে, ভবিষ্যৎ বা চলতি আর্থিক বছরের অনুমিত বিক্রির অঙ্কের উপর ভিত্তি করে ইচ্ছামত শতকরা হিসাবে বিজ্ঞাপনের বাজেট নির্ধারণ করা হয়। যেহেতু চলতি আর্থিক বছরে পরিকল্পিত বিক্রির অঙ্ক হিসাবে বিজ্ঞাপন বাজেট করা হয়, এই বাজেট আসলে অনুমিত আয়ের উপরে ভিত্তি করেই হয়। অনুমিত বিক্রির অঙ্ক যদি ৭০ কোটি টাকা ধরা হয়, তাহলে ইচ্ছানুযায়ী শতকরা ৮ টাকা বিজ্ঞাপনের জন্য বরাদ্দ হলে - চলতি বছরের বিজ্ঞাপনের বাজেট হবে - ৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা।

প্রতিযোগীর সঙ্গে তাল রেখে :- এই পদ্ধতিও অবৈজ্ঞানিক হিসাবেই গণ্য। অনেক সংস্থা মনে করেন, প্রতিযোগী সংস্থা যে হারে বিজ্ঞাপনের বাজেট বরাদ্দ করেছেন, তাঁরাও সেই হারেই বরাদ্দ করবেন। উদাহরণ হিসাবে ধরুন, একটি সংস্থার প্রতিযোগী সংস্থার মোট বিক্রির পরিমাণ ২০০ কোটি টাকা এবং তাঁদের বিজ্ঞাপনের বাজেট শতকরা ১২% হিসাবে - ২৪ কোটি টাকা। যে সংস্থাটি বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের মোট বিক্রি ৫০ কোটি টাকা। প্রতিযোগীর বাজেটের হারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিজ্ঞাপনের বাজেট নির্ধারণ করলে বাজেটের বরাদ্দ হবে ৬ কোটি টাকা। ৬ কোটি টাকার বাজেটের বিজ্ঞাপন দ্বারা ২৪ কোটি টাকার বাজেটের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, ব্যবহারকারীদের উপর প্রভাব বিস্তার করা কী সম্ভব?

৫.৮.৩ উদ্দেশ্যমূলক কাজ অনুযায়ী (Task Method)

এই পদ্ধতি, উপরে বর্ণিত সকল পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। এই পদ্ধতিতে প্রথমেই টাকার অঙ্ক নির্ধারণের চেষ্টা করা হয় না। এই পদ্ধতির বিবেচ্য বিষয় - বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থার দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা এবং লক্ষ্য কী। সংস্থার বিপণন পরিকল্পনা এবং বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা। বিজ্ঞাপন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। উদ্দীষ্ট গ্রাহকদের দেশের কোন

কোন অঞ্চলে; কতখানি প্রভাবিত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই সব তাৎপর্যপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুধাবন করে নির্ধারণ করা হয়, কোন কোন মাধ্যমে কতবার বিজ্ঞাপন প্রকাশের কর্মসূচী নেওয়া হবে। তার পরে, হিসাব করা হয়, এই কর্মসূচী রূপায়ন করতে কত টাকা খরচ হবে। এইভাবে হিসাব করে যে মোট অঙ্ক নির্ধারিত হবে, সেইটিই বিজ্ঞাপনের বাজেট। বিজ্ঞাপনের বাজেট নির্ধারণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এইটিই। যেমন ধরুন, আপনার যখন কোনো অসুখ হয়, আপনি ডাক্তারের কাছে যান, চিকিৎসার জন্য। আপনার অসুখটি ঠিক কী সেটি নির্ণয় করে ডাক্তারবাবু আপনাকে বিভিন্ন ওষুধের প্রেসক্রিপসন লিখে দেন। আপনার ঐ বিশেষ অসুখ সারানোর জন্য যে যে ওষুধ প্রয়োজনীয়, তিনি সেগুলিরই ব্যবস্থাপত্র (prescribe) দেন। লক্ষ্য রাখবেন — আপনার রোগ নিরাময়ের জন্য যা যা প্রয়োজন, সেই ওষুধমাত্র। আপনি কখনোই ডাক্তারকে বলেন না — "ডাক্তারবাবু, আমার বাজেট ছত্রিশ টাকা, আপনি সেইমত প্রেসক্রিপসন লিখুন।" কারণ আপনি জানেন, এভাবে আপনার রোগ নিরাময় সম্ভব নয়।

৫.৯ সময়সূচীর কৌশল (Scheduling Tactics)

বিজ্ঞাপন পরিকল্পনার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ রণকৌশল বিজ্ঞাপন প্রকাশের কর্মসূচী। প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য কোন কোন মাধ্যমে অর্থাৎ দৈনিক সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকা, রেডিও অথবা টেলিভিশন ব্যবহার করা হবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে বিজ্ঞাপন প্রকাশের কর্মসূচী নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ, দৈনিক সংবাদপত্র হলে, এক মাসে কতবার, কোন দিন ইত্যাদি। সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকার ক্ষেত্রেও একই সূত্র অনুসরণ করা হয়। রেডিও এবং টেলিভিশনের ক্ষেত্রে স্থির করতে হয়, সপ্তাহে বা দিনে কতবার এবং কোন কোন সময়ে। বিজ্ঞাপন প্রকাশের এই বিস্তারিত সময়সূচী নির্ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞাপনের খরচই কেবল নয়, বিজ্ঞাপনের কার্যকরীতা নির্ভর করে এই কর্মসূচীর উপরেই। এই কর্মসূচীরই ফলশ্রুতি — বিজ্ঞাপনের প্রভাব এবং বিজ্ঞাপিত পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি।

৫.৯.১ স্থিরিকৃত সময়সূচী (Steady Schedule)

স্থিরিকৃত সময়সূচীর মূলসূত্র - পুনরাবৃত্তি। একই বিজ্ঞাপন উদ্দীষ্ট গ্রাহকদের সামনে বার বার উপস্থিত না করলে, কোনো বিজ্ঞাপন কার্যকরী হওয়া কঠিন। একটি বিশেষ পৌনঃপুনিকতা নির্ধারণ ক'রে অনুসূচী তৈরি ক'রে, নির্দিষ্ট অনুসূচী অনুযায়ী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হলে তবেই উদ্দীষ্ট গ্রাহকদের মনে বাঞ্ছিত প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব।

৫.৯.২ একান্তর সময়সূচী (Alternate Schedule)

স্থিরিকৃত অনুসূচীর একঘেয়েমি কাটানোর জন্য একান্তর অনুসূচী নির্ধারণ করা যেতে পারে। এক ধরণের অর্থাৎ এক মাপের বিজ্ঞাপন নির্দ্দিষ্ট বিরতিতে (interval) প্রকাশ না করে, অনুসূচীর কিছু পরিবর্তন করা হয়। পরিবর্তন দুইভাবে করা যেতে পারে, নিয়মিত এবং অনিয়মিত ছকে।

নিয়মিত ছক : একই মাপের বিজ্ঞাপন কয়েকদিন অন্তর অন্তর প্রকাশিত হলে, ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সহজসাধ্য হয়, এবং গ্রাহকদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয়।

অনিয়মিত ছক : বিভিন্ন মাপের বিজ্ঞাপন কয়েকদিন অন্তর প্রকাশিত হলে, পরিবর্তনশীল মাপের জন্য গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়, পরিবর্তনের চমকের জন্য। টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন ৩০ সেকেণ্ড থেকে কমিয়ে ১০ সেকেন্ড, ২০ সেকেন্ড করে, আবার ৩০ সেকেন্ডের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। কম সময়ের বিজ্ঞাপনগুলিও গ্রাহকদের বেশি সময়ের বিজ্ঞাপন স্মরণ করায়। বিজ্ঞাপনের খরচ কম রেখে, গ্রাহকদের বারে বারে পণ্যের চিহ্নিত নাম মনে করানোর পক্ষে এই ছক বিশেষ কার্যকরী। মনে করুন, আপনি কোনো মাসিক পত্রিকা নিয়মিত পড়েন। বছরে বারোটি সংখ্যার প্রথম তিনটিতে কোনো পণ্যের রঙীন বিজ্ঞাপন দেখলেন। তার পরের দুটি সংখ্যায়, একই বিজ্ঞাপন সাদা কালো দেখলেন। পরে আবার রঙীন বিজ্ঞাপনের পর, একমাস বা দুমাস বিজ্ঞাপনটি দেখলেন না। এর পরে আবার একটি রঙীন বিজ্ঞাপনের পরে পর পর দুমাস সাদা কালো বিজ্ঞাপন দেখলেন। বছরের শেষে আপনাকে প্রশ্ন করা হলে, আপনি বলবেন, ঐ পত্রিকায় বিশেষ পণ্যটির রঙীন বিজ্ঞাপন দেখেছেন প্রতিটি সংখ্যায়। যাঁরা অনুসূচী তৈরি করেছেন, তাঁরা কিন্তু মধ্যে মধ্যে সাদাকালো বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং কোনো কোনো সংখ্যায় বিজ্ঞাপন না দিয়ে খরচ কমিয়েছেন, — গ্রাহকদের উপর প্রভাব সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাহত না করে।

৫.৯.৩ ঝাঁকবদ্ধ সময়সূচী (Flighting Schedule)

ঝাঁকবদ্ধ — অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ঝাঁকবদ্ধভাবে বিজ্ঞাপন প্রকাশের অনুসূচী নির্ধারণ করা। স্থিরিকৃত অনুসূচী এবং একান্তর অনুসূচীর মিশ্রণেই ঝাঁকবদ্ধ অনুসূচী। মনে করুন, পর পর চার সপ্তাহ, একটি পণ্যের বিজ্ঞাপন দৈনিকপত্রে সপ্তাহে তিনবার করে প্রকাশিত হলো। তার পরে তিন মাস পরে আবার একইভাবে প্রকাশিত হলো। চার সপ্তাহ এক ঝাঁক বিজ্ঞাপনের পরে তিনমাস বাদ রেখে আবার এক ঝাঁক বিজ্ঞাপন। এইভাবে অনুসূচী করা হয় বলেই এই পদ্ধতির নাম ঝাঁকবদ্ধ অনুসূচী। এই পদ্ধতি রেডিও এবং টেলিভিশনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

৫.৯.৪ স্পন্দিত সময়সূচী (Pulsating Schedule)

স্পন্দিত অনুসূচী স্থিরিকৃত অনুসূচী এবং ঝাঁকবদ্ধ অনুসূচীর মিশ্রণ। ঝাঁকবদ্ধ অনুসূচীতে বিজ্ঞাপনের দুটি ঝাঁকের মধ্যে দীর্ঘ বিরতি থাকে। স্পন্দিত অনুসূচীতে কোন বিরতি থাকে না। স্থিরিকৃত অনুসূচী অনুসারে নিয়মিত বিজ্ঞাপনসূচীর মধ্যেই মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপন প্রকাশের সংখ্যা বাড়ানো হলে (ঝাঁকবদ্ধ বিজ্ঞাপনের মত) গ্রাহকদের মনে বেশি প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব। এই পদ্ধতির নাম স্পন্দিত সময়সূচী।

৫.৯.৫ বিশেষ সময় অনুসারে (Seasonal Schedule)

অনেক পণ্য আছে, যেগুলির বিজ্ঞাপন সারা বছর প্রকাশিত হয় না, কেবলমাত্র সময় বিশেষেই প্রকাশিত হয়। যেমন ধরুন, বিভিন্ন জামাকাপড় এবং অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের বিজ্ঞাপন আপনারা খুব বেশি দেখেন, সেপ্টেম্বর,

অক্টোবর, নভেম্বর মাসে, পূজা ও দেওয়ালীর জন্য। বছরের অন্যান্য সময় এই সব পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হলেও এত বিপুল পরিমাণে হয় না। পশমের জামাকাপড় বা শীতবস্ত্রের বিজ্ঞাপন আপনারা দেখেন, নভেম্বর, ডিসেম্বর মাসে। শীত ঋতুর জন্য। এই ধরণের বিজ্ঞাপনের অনুসূচীকে সময়-বিশেষ অনুসূচী বলা হয়।

৫.৯.৬ ক্রমবর্ধমান সময়-সূচী (Step-up Schedule)

কোনো নতুন পণ্য বাজারে উপস্থাপনের সময়, পণ্যটির প্রস্তুতকারক বিজ্ঞাপনদাতা কয়েকদিন আগে থেকেই বিজ্ঞাপন প্রকাশ শুরু করেন। "আসছে, আসছে"। কী ধরণের পণ্য, তার কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হয় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে কিন্তু পণ্যটির বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে জানতে দেওয়া হয় না। তিন চার দিন ধরে গ্রাহকদের কৌতূহল জাগানোর চেষ্টা করা হয়। গ্রাহকরা যখন জানতে ইচ্ছুক হয়ে পড়েন, বিজ্ঞাপনটি কোন পণ্যের, ঠিক তখনই বড়ো আকারে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় — "এসে গেছে" ঘোষণা করে। শেষ বড়ো বিজ্ঞাপনটিতে পণ্যটির বিশদ বিবরণ দেওয়া থাকে। ধীরে ধীরে গ্রাহকদের আগ্রহ বৃদ্ধি করা হয় বলে, এই পদ্ধতির নাম ক্রমবর্ধমান সময়সূচী।

৫.৯.৭ অবচিয়মান সময়সূচী (Step-down Schedule)

বর্ধমান অনুসূচীর ঠিক বিপরীত পদ্ধতি অবচিয়মান অনুসূচী। কোনো নতুন পণ্য, বাজারের কোনো চালু পণ্যের নতুন কোনো মডেল বৈশিষ্ট্য যুক্ত হলে, বড়ো আকারে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় গ্রাহকদের জানাবার জন্য। "এখন .... টি.ভি. ফ্ল্যাট স্ক্রিন হয়ে গেছে। আরো ভালো ছবির জন্য" এই ঘোষণা সংবাদপত্রের অর্ধেক পাতাজুড়ে বিজ্ঞাপনে গ্রাহকদের জানানো হয়। এর পরে, দু'এক দিন অন্তর কয়েকটি ছোটো আকারের বিজ্ঞাপনের সাহায্যে গ্রাহকদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতি — অবচিয়মান সময়সূচী, ক্রমশ কমে যায় বলে।

বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপনের সময়সূচী নির্ধারণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অনুসূচী অনুসরণ করা যেতে পারে। আবার একই পণ্যের বিজ্ঞাপনের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন অনুসূচী অনুসরণ করাও যুক্তিযুক্ত হিসাবে গণ্য হতে পারে। মূল লক্ষ্য গ্রাহকদের অবহিত করা এবং তাঁদের উপর প্রভাব সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পণ্য, প্রতিযোগিতা, বাজার এবং ব্যবহারকারীদের অবস্থান বিবেচনা ক'রে, সময়সূচী নির্ধারণ করলে, মাধ্যম পরিকল্পনার যথোচিত ফল পাওয়া যায়। সেই কারণে, বিজ্ঞাপন পরিকল্পনায় সময়সূচী নির্ধারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৫.১০ মাধ্যম মূল্যায়ন

এই বিষয়ে পূর্ববর্তী পর্যায়-এ গবেষণা আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে আপনারা অবগত আছেন।

৫.১১ সারাংশ

বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য মাধ্যম নির্বাচন এবং বিভিন্ন মাধ্যমের কৌশলী ব্যবহারের পরিকল্পনা ব্যতীত কোনো বিজ্ঞাপন অভিযান সফল হয় না। মাধ্যম নির্বাচনের সময়, বিজ্ঞাপনদাতার প্রচার অভিযানের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে, বিভিন্ন মাধ্যমের উদ্দীষ্ট গ্রাহকের কাছে পৌঁছানোর সম্ভাবনা বিচার ক'রে মাধ্যম নির্বাচন এবং পরিকল্পনা করা হয়।

মাধ্যম নির্বাচনের পরে মূল যে কৌশল অবলম্বন করা হয়, তার লক্ষ্য গ্রাহকদের মনে যাতে বিজ্ঞাপনের বার্তাটি বার বার প্রচারিত হয়ে, প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে, তার উপর। এই উদ্দেশ্যে বিশেষ কয়েকটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করা হয়। মুদ্রণমাধ্যম, সংবাদপত্র এবং সাময়িকী, রেডিও, দূরদর্শন, ঘরের বাইরের মাধ্যম, প্রত্যক্ষ ডাকযোগে ইত্যাদি। বিজ্ঞাপিত পণ্যের ব্যবহারকারী কোন কোন মাধ্যম নিয়মিত দেখেন বা শোনেন, সেই বিষয়ে বিচার বিবেচনা করে মাধ্যম নির্বাচন করা হয়।

বিজ্ঞাপনের জন্য প্রত্যেক কোম্পানিই আর্থিক-বছরের প্রাক্কালে বিজ্ঞাপনের জন্য বাজেট নির্ধারণ করেন। বাজেট নির্ধারণের বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে কাজ-অনুযায়ী বাজেট-ই যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হয়।

বিভিন্ন মাধ্যমে, বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞাপন প্রচারের কতকগুলি বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে, প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বেশি কার্যকরী করার পরিকল্পনা করা হয়। বিভিন্ন রকমের সময়সূচী বা অনুসূচী অনুসরণ ক'রে এই পরিকল্পনা করা হয়।

৫.১২ অনুশীলনী

১। বিজ্ঞাপন অভিযানের মাধ্যম পরিকল্পনার সময়ে কোন কোন সূত্র বা নির্দেশিকা অনুসরণ করবেন, এবং কেন?

২। বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে মুদ্রণ মাধ্যমের সুবিধা এবং অসুবিধা কী কী?

৩। ভারতে জন-সংযোগের সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম হিসাবে রেডিওকেই গণ্য করা হয়। তার কারণ কী?

৪। একটি বিজ্ঞাপন অভিযানের জন্য বাজেট নির্ণয়ের কতগুলি পদ্ধতি আছে? তুলনামূলক বিচার করে সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত বাজেট কোনটি জানান।

টীকা লিখুন :

১। ঘরের বাইরের মাধ্যম, ২। স্থিরিকৃত সময়সূচী, ৩। ঝাঁকবদ্ধ সময়সূচী,
৪। অবচিয়মান সময়সূচী, ৫। প্রসারণ ক্ষমতা, ৬। ধারাবাহিকতা।

৫.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

1. Strategy in Advertising, Leo Bogart.

2. Essentials of Media Planning. – Arnold M. Barlan, Steven Cristol, Frac J. Kopec

একক ৬ ❑ বিজ্ঞাপন রচনা

গঠন

৬.০ উদ্দেশ্য

৬.১ প্রস্তাবনা

৬.২ বিজ্ঞাপন অভিযান

৬.৩ প্রস্তুতি

৬.৩.১ পণ্যটি বুঝতে হবে

৬.৩.২ ব্যবহারকারীকে বুঝতে হবে

৬.৩.৩ ক্রেতার চালচলন

৬.৩.৪ অভ্যন্তরীণ কারণ

৬.৩.৫ বাইরের কারণ

৬.৪ বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য

৬.৫ বিষয়লিপির মডেল

৬.৬ বিষয়লিপি

৬.৭ শিরোনাম

৬.৭.১ আকর্ষণ ক্ষমতা

৬.৭.২ আগ্রহ সৃষ্টি

৬৭.৩ লক্ষ্য চিহ্নিত করা

৬.৭.৪ পণ্য চিহ্নিত করা

৬.৭.৫ বিক্রি করা

৬.৮ শিরোনাম রচনার নির্দেশাবলী

৬.৯ শিরোনাম কত বড় হবে?

৬.১০ বিষয় লেখ

৬.১১ বিভিন্ন বিষয়লিপি

৬.১২ বিজ্ঞাপনের আবেদন

৬.১৩ বিজ্ঞাপন বার্তার আকার

৬.১৪ বিজ্ঞাপন বার্তার উপস্থাপন

৬.১৫ চিহ্নিত করণের প্রতীক

৬.১৫.১ ট্রেডমার্ক

৬.১৫.২ স্লোগান

৬.১৫.৩ প্রতীক

৬.১৬ রূপকল্পের ব্যবহার

৬.১৬.১ চিত্ররেখার কাজ

৬.১৬.২ চিত্ররেখার প্রস্তুতি

৬.১৬.৩ চিত্ররেখার রকমারি

৬.১৬.৪ কী কী গুণ আবশ্যক

৬.১৭ হরফের ব্যবহার

৬.১৮ চিত্র নিদর্শন

৬.১৮.১ শ্রেণীবিভাগ

৬.১৮.২ ফোটোগ্রাফ

৬.১৮.৩ রং-এর ব্যবহার

৬.১৯ সারাংশ

৬.২০ অনুশীলনী

৬.২১ গ্রন্থপঞ্জী

৬.০ উদ্দেশ্য

বিজ্ঞাপন রচনা অর্থাৎ বিজ্ঞাপন সৃষ্টি কেমন করে হয় সেই বিষয়েই এই এককে আলোচনা করা হয়েছে। বিপণনে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলেই বিজ্ঞাপন সৃষ্টি বা রচনা করা অত্যন্ত জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিজ্ঞাপনের আবেদন সফল করার জন্য প্রস্তুতি পর্ব থেকে সৃষ্ট বিজ্ঞাপনের প্রকাশ পর্যন্ত অনেক জটিল এবং সূক্ষ্ম কাজ করা হয়। এই এককটি পাঠ করে আপনি বিজ্ঞাপন সৃষ্টির এই বিষয়গুলি জানতে পারবেন—

- বিজ্ঞাপন অভিযান কী ধরনের অভিযান?
- বিজ্ঞাপন সৃষ্টির জন্য কী কী প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন
- ক্রেতা বা গ্রাহকের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান কত জরুরি
- বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য এবং সার্থক বিজ্ঞাপনের মডেল
- বিজ্ঞাপনে শিরোনামের গুরুত্ব
- শিরোনাম রচনার সময় কী কী সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন
- বিজ্ঞাপনের আবেদন কত রকম হতে পারে
- বিজ্ঞাপনে ভাবাবেগের আবেদন প্রয়োগ করা হয় কেন
- বিজ্ঞাপন বার্তার উপস্থাপন কৌশল
- বিজ্ঞাপনে রূপকল্পের ব্যবহার করা হয় কেন?
- চিত্ররেখা কেমন করে সৃষ্টি করা হয়
- বিভিন্ন হরফ, চিত্র নিদর্শন, ফোটোগ্রাফ ও রং-এ ব্যবহার বিজ্ঞাপনে কেমন করে করতে হয়
- পণ্য চেনবার জন্য বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহার করা হয় কেন।

৬.১ প্রস্তাবনা

আধুনিক বিপণনে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। আপনারা জানেন আধুনিক বিজ্ঞাপন এবং বিজ্ঞাপনের দ্বারা গ্রাহকদের ইতিবাচক বা সহায়ক মনোভাব গড়ে তোলা এবং তাঁদের মনে বিজ্ঞাপিত পণ্যটির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলা একটি জটিল, মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার বৃহৎ অংশ অবশ্যই গবেষণা। গবেষণা হয় পণ্যটিকে নিয়ে, পণ্যটির প্রতিযোগীদের নিয়ে, বাজার নিয়ে এবং পণ্যটির ব্যবহারকারীদের নিয়ে। ব্যবহারকারীদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকলে, বিভিন্ন গ্রাহক ঠিক কোন কোন কারণে বিভিন্ন পণ্য ব্যবহার করেন, সেই গভীর, জটিল তত্ত্ব জানা যাবে কেমন করে? যে বিজ্ঞাপন আপনারা দেখেন, সেগুলির সাফল্যের উপরেই বিপণনের সাফল্য নির্ভর করে। সেই কারণেই বিজ্ঞাপন সৃষ্টির পশ্চাৎপটে থাকে বিশেষ জটিল নানাবিধ কর্ম। সেই সব কর্মের সমাহার বা ফলশ্রুতি—বিজ্ঞাপন। যা আপনারা দেখতে পান। যেহেতু বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেই বিপণনকারী তাঁর পণ্যের চাহিতা সৃষ্টি করেন, গ্রাহকদের মনে পণ্যটির ব্যবহারের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলেন, বিজ্ঞাপনের এই সৃজনশীল কর্মকাণ্ড বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এবারে আমরা আলোচনা করব, বিজ্ঞাপন কীভাবে সৃষ্টি করা হয়।

৬.২ বিজ্ঞাপন অভিযান

যে সব প্রস্তুতকারক বহুদিন ধরে দেশব্যাপী বিপণনের দ্বারা তাঁদের বিভিন্ন পণ্য সাধারণ ব্যবহারকারীদের নিকট উপস্থাপন করছেন এবং তাঁদের পণ্যগুলি জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করছেন, তাঁরা বিপণনের পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা করেন পণ্যের প্রচারের জন্য। বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা আসলে বিপণন পরিকল্পনার অংশ বিশেষ।

বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা সাধারণত বিজ্ঞাপন অভিযান (Campaign) বলেই পরিচিত। কোনো সামরিক অভিযানে যেমন বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ক'রে, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ক'রে, আক্রমণের রণকৌশল নির্ধারণ করা হয়, বিজ্ঞাপন অভিযানের ক্ষেত্রেও পণ্য, প্রতিযোগী পণ্য, বাজার এবং ব্যবহারকারীদের সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে হয়।

৬.৩ প্রস্তুতি

চার নম্বর এককে বিজ্ঞাপন গবেষণা বিষয়ে আলোচনায় আপনারা জেনেছেন, বিজ্ঞাপন পরিকল্পনার প্রতিটি পর্যায়ে গবেষণার সাহায্য নেওয়া হয়। গবেষণার সাহায্যেই নির্ধারণ করা হয় বিজ্ঞাপন অভিযানের রণকৌশল, বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু, ব্যবহারকারীর উদ্দেশ্যে কোন আবেদন করা হবে—এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

যে কোনো পণ্যের বিজ্ঞাপন পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়ে পণ্যটির বিষয়ে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন প্রতিযোগী পণ্যের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ। তবেই তো বোঝা যাবে, যে পণ্যটির বিজ্ঞাপন করা হবে, প্রতিযোগী পণ্যগুলির তুলনায় সেটির কোনো বিশেষ উপাদান আছে কী না। পণ্যটির কোনো অনন্য উপাদান বা বৈশিষ্ট্য থাকলে, প্রতিযোগী পণ্যগুলির তুলনায় সেগুলি বেশি আকর্ষণীয়, উপকারী ও প্রয়োজনীয় হিসাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

এর পরেই জানা প্রয়োজন, পণ্যটির ব্যবহারকারী কারা? কারণ, ব্যবহারকারীরাই অর্থব্যয় করে পণ্যটি কিনবেন এবং ব্যবহার করবেন। ব্যবহারকারীদের উদ্দেশ্যেই বিজ্ঞাপন করা হয়। ব্যবহারকারীদের আকাঙ্ক্ষা মিটানোর আশ্বাস দিয়েই বিজ্ঞাপনের বার্তা নির্দিষ্ট করা হয়। যাঁদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন করা হবে তাঁদের সম্পর্কে সম্যক ভাবে জানা প্রয়োজন। তাঁরা কারা, পুরুষ না নারী? শহরে বসবাস করেন, না গ্রামে? তাঁদের শিক্ষার মান কী রকম? তাঁদের পারিবারিক গড় আয় কত? তাঁদের আনুমানিক বয়স কত? এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাঁদের জীবনযাত্রার প্রণালি (life style) কী রকম? অর্থাৎ ভৌগোলিক, জনতাত্ত্বিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ যতদূর সম্ভব, সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন।

একই পণ্য থেকে বিভিন্ন ব্যবহারকারীর বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়। বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা যাঁরা করেন, তাঁদের জানা প্রয়োজন, যে পণ্যটির বিজ্ঞাপন করা হবে, সেই পণ্যটির দ্বারা, উদ্দীষ্ট ব্যবহারকারীদের শতকরা কত অংশ কোন বিশেষ আকাঙ্ক্ষা পূরণের আশা করছেন। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং বিজ্ঞাপনটি উপস্থাপনের পরিকল্পনা করা হয় উদ্দীষ্ট গ্রাহকদের মনোভাব এবং আকাঙ্ক্ষা পূরণের আশার বিষয় বিবেচনা করে।

বিজ্ঞাপন অভিযানের বিষয়বস্তু স্থির করার আগে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন, কীরকম বিষয়বস্তু নির্বাচন করলে এবং গ্রাহকদের মনের বিভিন্ন ভাব এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরনের জন্য কীভাবে আবেদন করলে, প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপনটি ফলপ্রসূ হবে। উদ্দীষ্ট ব্যবহারকারী পণ্যটি কিনবেন এবং ব্যবহার করবেন।

ব্যবহারকারী হিসাবে আমাদের ব্যবহার, আমাদের সাধারণ, সামাজিক ব্যবহারেরেই অংশবিশেষ মাত্র। আমাদের সামাজিক ব্যবহার অত্যন্ত জটিল এবং অনেক বিভিন্ন কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আপনিও একজন ব্যবহারকারী। আপনি যখন কোনো পণ্য কেনেন, এক বা একাধিক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে পণ্যটি কেনেন। কখনো বা শারীরিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য (খাবার, জামাকাপড়, ওষুধ) কখনো বা আনন্দ অথবা ইন্দ্রিয় সুখের জন্য (বিশেষ খাবার বা পানীয়, ভ্রমণ, গান শোনা) আবার কখনো বা মানসিক আকাঙ্ক্ষা মেটানোর জন্য (দামি পোশাক, সুগন্ধী ইত্যাদি)। বেশির ভাগ সময়ই একটি পণ্য আপনার একাধিক আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে। বিজ্ঞাপনদাতারা জানেন, দৈনন্দিন জীবনে আপনারা অনেক পণ্য ব্যবহার করেন যা আপনার বর্তমান সামাজিক স্থিতির উপরের পর্যায়ে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে। যে স্থিতি আপনার মনোমত। যে স্থিতিতে অবস্থানই আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

সকল বিজ্ঞাপনই পণ্যের কোনো বিশেষ উপাদান, তা সে বাস্তবই হোক বা মনস্তাত্বিকই হোক,—কেন্দ্র করে রচিত হয়। সেই উপাদানটি নির্ধারিত হয় ব্যবহারকারীদের কোন কোন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পণ্যটি সক্ষম হবে, সেই বিবেচনার উপর ভিত্তি করে।

সেই কারণেই, কোনো পণ্যের বিজ্ঞাপন রচনার পূর্বে বিজ্ঞাপনদাতা বা বিজ্ঞাপনদাতার পক্ষে যাঁরা বিজ্ঞাপন তৈরি করবেন, তাঁদের, পণ্যটি এবং পণ্যটির ব্যবহারকারীদের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

৬.৩.১ পণ্যটি বুঝতে হবে

যে পণ্যটির বিজ্ঞাপন করা হবে, সেটিকে সকল সম্ভাব্য দিক থেকে ভালো করে না বুঝে, কার্যকরী বিজ্ঞাপন রচনা সম্ভব নয়। এমনকী যে সব পণ্য গুণগত হিসাবে একেবারেই এক, অর্থাৎ প্রতিযোগী পণ্যগুলির থেকে কোনো গুণগত পার্থক্য নেই, সেই সব পণ্যের ক্ষেত্রেও দেখা যায় পণ্যটি বিভিন্ন ক্রেতার বা ব্যবহারকারীর বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করছে। বিজ্ঞাপনদাতা নিজের পণ্যের একটি বিশেষ ভাবমূর্তি সৃষ্টি করেন। ব্যবহারকারীরা যেমন নানাবিধ বাস্তব কারণের জন্য পণ্য ব্যবহার করেন, তেমনই বিভিন্ন মনস্তাত্বিক কারণেও পণ্য ব্যবহার করেন। পণ্য কেনবার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রাহকরা পণ্যের ভাবমূর্তিও কেনেন। অনেকেই বলেন, সফল বিজ্ঞাপনের মনস্তাত্বিক প্রভাবে ব্যবহারকারীরা পণ্য নয়, আসলে পণ্যের ভাবমূর্তিই কিনে থাকেন।

কাযকরী সফল বিজ্ঞাপন নির্ভর করে পণ্যটির বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের উপর। যে কারখানায় পণ্যটি প্রস্তুত হচ্ছে, সেখান থেকেই তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এই সব তথ্য বিজ্ঞাপনে ব্যবহারকারীদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের আশ্বাস দিতে বিশেষ সহায়ক।

৬.৩.২ ব্যবহারকারীকে বুঝতে হবে

বিপণনকারীরা যদি ব্যবহারকারীদের মনোভাব, আকাঙ্ক্ষা পুরোপুরি বুঝতে পারতেন, তাহলে বিপণন পরিকল্পনার ব্যর্থতা বিরল হতো।

ক্রেতাদের আকাঙ্ক্ষা এবং ব্যবহার বোঝার জন্য নির্ভর করতে হয় মূলত সমাজবিজ্ঞান এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারণা এবং মতবাদের উপর। সমাজবিদ্যা, মনস্তত্ব এবং সামাজিক মনস্তত্বই দিকনির্দেশ হিসাবে সহায়তা করে, ব্যবহারকারীর আকাঙ্ক্ষা এবং চাহিদা চিহ্নিত করতে। ক্রেতার বা গ্রাহকদের ব্যবহার প্রণালি নির্ভর করে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ বা বাহিরের কারণ ও প্রভাবের উপর। ক্রেতা তাঁর আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজন চিহ্নিত করেন। আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বিভিন্ন পণ্য কেনেন, ব্যবহার করেন এবং ব্যবহারের পরে পণ্যটির মূল্যায়ন করেন, আকাঙ্ক্ষা পূরণের আশার পরিপ্রেক্ষিতে। অর্থাৎ কোনো পণ্য কেনা ও ব্যবহার করা একটি জটিল প্রণালি এবং যে কোনো বিপণনকারীর পক্ষে এই প্রণালি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য।

৬.৩.৩ ক্রেতার চালচলন/আচরণ

অনেক জিনিস কেনার সময় আপনি পণ্যের গুণাগুণ বিচার করে কেনেন। এই যে গুণাগুণ বিচার করেন, এগুলির কতকগুলি বাস্তব এবং বেশির ভাগই মনস্তাত্বিক অর্থাৎ আপনার ধারণা, বিশ্বাস। আপনি মনে করেন কোনো বিশেষ নামের শার্ট আপনার ব্যক্তিত্ব উজ্বল করে। কোনো বিশেষ নামের সিগারেট আপনাকে মানসিকভাবে লেখক, কবি, চিত্রকর এবং সিনেমা পরিচালকদের সমগোত্রীয় মনে করতে সহায়তা করে, আপনাকে মানসিক তৃপ্তি দেয়। ক্রেতার বা ব্যবহারকারীর আচরণের এই জটিলতা যতদূর সম্ভব বুঝে নেওয়ার জন্য তার আচরণের বৈশিষ্ট্য জানা প্রয়োজন। ক্রেতা কে? তিনি কেন কিনছেন? এবং বিশেষ করে কোন কোন কারণ তাঁর পণ্য নির্বাচনের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করছে? এই সব তথ্য জানলে, তবেই কার্যকরী বিজ্ঞাপন রচনা করা সম্ভব।

কোনো বিজ্ঞাপনের বার্তা ক্রেতা বা ব্যবহারকারী কীভাবে গ্রহণ করবেন সেটি নির্ভর করে অনেকগুলি কারণের উপর। সেই কারণগুলি, সমাজবিজ্ঞানীরা মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করেছেন। অভ্যন্তরীণ কারণ এবং বাইরের কারণ।

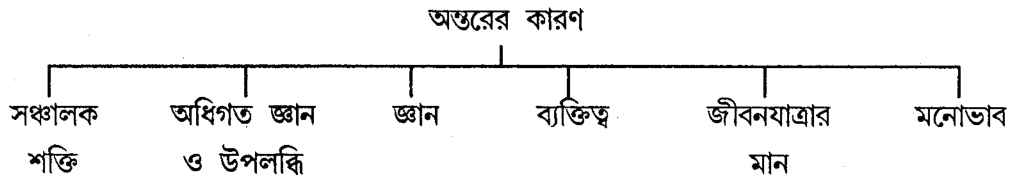

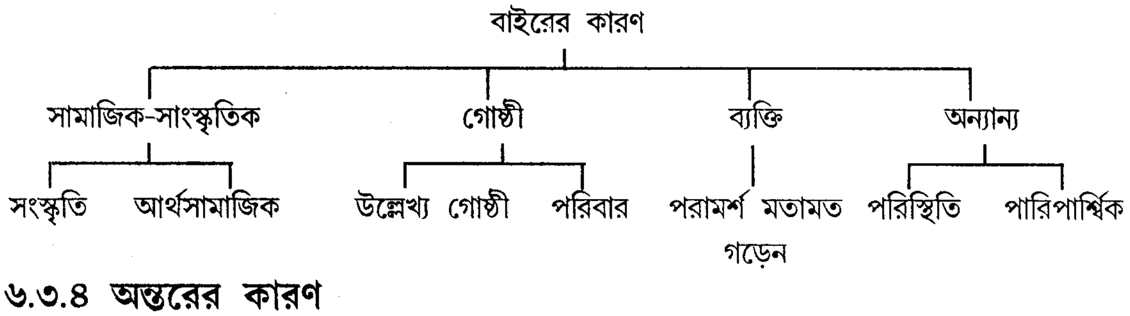

৬.৩.৪ অন্তরের কারণ

প্রথমে আমরা অভ্যন্তরীণ কারণগুলি নিয়ে আলোচনা করি। অভ্যন্তরীণ কারণগুলি অবস্থান করে ক্রেতা

বা ব্যবহারকারী যে ব্যক্তি, তাঁর মনের গভীরে। কোনো পণ্যের বিজ্ঞাপন উদ্দীষ্ট ব্যবহারকারীর মনে কীরকম প্রভাব কীভাবে সৃষ্টি করছে, বিজ্ঞাপনদাতার পক্ষে সেটি বোঝা বেশ কঠিন। ক্রেতার আচরণ অনুমান করার বা বোঝার চেষ্টা করার জন্য মনোবিদ্যার বিজ্ঞান অনুসারে সম্ভাব্য ক্রেতার সঞ্চালক শক্তি, উপলব্ধি, জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব, জীবনযাত্রার মান এবং মনোভাব বিশ্লেষণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

- **সঞ্চালক শক্তি**

মানুষের মনে একই সঙ্গে বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করছে। কতকগুলি আকাঙ্ক্ষা জীবনধারণ সংক্রান্ত, শারীরিক উদ্বেগ, আশঙ্কার অনুভূতি প্রসূত। যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং আশঙ্কা। অন্যান্য আকাঙ্ক্ষাগুলি মানসিক। অন্যের সঙ্গে একাত্মবোধ, পরিচিতি লাভের ইচ্ছা, সম্মান প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষাগুলি বিভিন্ন সময়ে গ্রাহকের মনে তীব্র আকার ধারণ করলে, সঞ্চালক শক্তিতে পরিণত হয়। অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা প্রবল হলে, সঞ্চালক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সঞ্চালক শক্তি যথোপযুক্ত চাপ সৃষ্টি ক'রে গ্রাহককে তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে। আকাঙ্ক্ষা পূরণ হলে গ্রাহকের সন্তুষ্টি।

মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের মনের এই নানাবিধ আকাঙ্ক্ষা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা বোঝার চেষ্টা করেছেন। আব্রাহাম ম্যাসলো (Abraham Maslow) ব্যাখ্যা করেছেন কেন মানুষ বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন আকাঙ্খায় তাড়িত (driven) হয়। কেন একজন মানুষ ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য অনেক সময় ব্যয় করেন, কিম্বা চিন্তা করেন? আর একজন কেন অন্যের সম্মান বা স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য বেশি সচেষ্ট। ম্যাসলোর মত অনুসারে মানুষের আকাঙ্ক্ষাগুলি বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করে। একেবারে প্রথম স্তরে রয়েছে সবচেয়ে বেশি অত্যাবশ্যক আকাঙ্ক্ষা। ক্রমশ ঊর্ধ্বগামী হয়ে শেষ স্তরে রয়েছে সবচেয়ে কম অত্যাবশ্যক আকাঙ্ক্ষা।

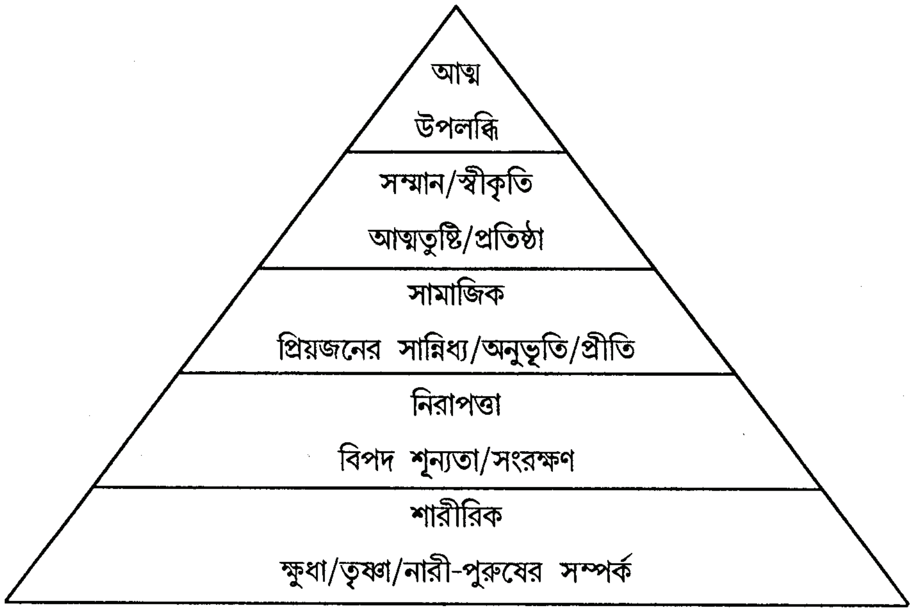

মানুষের আকাঙ্ক্ষার ক্রমপর্যায়

ক্রমঅনুসারে শারীরিক আকাঙ্ক্ষা, নিরাপত্তার আকাঙ্ক্ষা, সামাজিক আকাঙ্ক্ষা, সম্মানের আকাঙ্ক্ষা এবং

আত্মোপলব্ধির (Self actualisation) আকাঙ্ক্ষা। যে কোনো মানুষ সবচেয়ে জরুরি আকাঙ্ক্ষাই সর্বাগ্রে পূরণের চেষ্টা করবেন। সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়ে গেলে, তাঁর মনে সেটি আর সঞ্চালক শক্তি হিসাবে কাজ করে না। তখন তিনি, তাঁর মতে যেটি পরবর্তী জরুরি আকাঙ্ক্ষা, সেটি পূরণের জন্য সচেষ্ট হবেন। উদাহরণ—অভুক্ত ব্যক্তির খাদ্য এবং পানীয়ের প্রয়োজন এবং আকাঙ্ক্ষা প্রবল, কেননা তাঁর অস্তিত্ব (প্রথম স্তর) বিপন্ন, তাঁর কাছে কোনো চিত্রকলার প্রদর্শনী (পঞ্চম স্তর), অথবা তাঁর সম্বন্ধে অন্যেরা কী ভাবছেন বা তাঁকে সম্মান করছেন কী না (তৃতীয় এবং চতুর্থ স্তর), এমন কী তাঁর চারপাশের বাতাস (দ্বিতীয় স্তর) পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর কিনা, সবই গৌণ হয়ে যায়। কিন্তু যেমনই একটি আকাঙ্ক্ষার পূরণ হয়ে সন্তুষ্টি বিধান হয়, সঙ্গে সঙ্গেই পরবর্তী আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য মানুষ সচেষ্ট হয়।

● উপলব্ধি

একই সঞ্চালক শক্তির দ্বারা উদ্দীপিত দুইজন গ্রাহক একই পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজ (act) করেন। কারণ তাঁরা দুইজনে পরিস্থিতিটি দুইভাবে উপলব্ধি করেছেন। আমাদের প্রায় সমস্ত জ্ঞানের উৎস অনুভূতি। অর্থাৎ, আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে সকল বার্তা আমরা গ্রহণ করি—দৃশ্য, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শ এবং স্বাদ। কিন্তু সকলেই নিজের নিজের মত বার্তা গ্রহণ করেন এবং বার্তা স্মৃতিতে সঞ্চিত (store) করেন। যে প্রণালির দ্বারা কোনো ব্যক্তি প্রাপ্ত বার্তার নির্বাচন করেন, সংগঠন (organise) করেন এবং ব্যাখ্যা করেন, সেটিই উপলব্ধি। প্রত্যেকেই তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং পূর্বের জ্ঞান অনুযায়ী বার্তা গ্রহণ করেন, নির্বাচন করেন এবং ব্যাখ্যা করেন। যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন সেই কারণে, প্রত্যেকেই নিজস্ব উপলব্ধি অনুসারে বার্তা গ্রহণ এবং ব্যবহার করেন। একই বার্তার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার কারণ, প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব ব্যক্তিগত উপলব্ধি।

● জ্ঞান

ব্যবহারকারীরা নিয়মিত বিভিন্ন পণ্য এবং পরিষেবা ক্রয় করে থাকেন তাঁদের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর জন্য। তাঁদের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া, বিভিন্ন বার্তা, অভিজ্ঞতা এবং অন্যের সুপারিশ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়। সেই সঙ্গে থাকে পূর্বে ব্যবহৃত পণ্যের সন্তুষ্টি অথবা অসন্তুষ্টির অভিজ্ঞতাও। মনে করুন আপনি একটি নামী কোম্পানির বিশেষ চিহ্নিত নামের (brand name) শার্ট কিনবেন। প্রথম কেনার সময় আপনি বাজারের অন্যান্য শার্টের দাম এবং গুণাগুণের তুলনামূলক বিচার করেন, আপনার পরিচিত যাঁরা ঐ নামের শার্ট পরেছেন—তাঁদের মতামত সংগ্রহ করেন। পরবর্তী সময় পুনরায় কখন শার্ট কেনেন, তখন পূর্ব সংগৃহীত বার্তা এবং অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেই কিনে থাকেন।

বিজ্ঞাপনদাতার বিবেচনার উল্লেখযোগ্য বিষয়—বিজ্ঞাপনের প্রভাবে, তার উদ্দীষ্ট গ্রাহক কীভাবে আচরণ করবেন। বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন চিত্র এবং নানাবিধ বক্তব্য গ্রাহকের বিভিন্ন অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পূরণের আশার সৃষ্টি করে। বিজ্ঞাপনদাতা আশা করেন, গ্রাহক তাঁর বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞাপনের বার্তাটি মিলিয়ে নেবেন।

● ব্যক্তিত্ব

প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে। সেই নিজস্ব ব্যক্তিত্ব অনুযায়ীই কোনো জিনিস কেনার বিষয়ে

তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর পারিপার্শ্বিকের প্রতিক্রিয়া কী রকম, সেই হিসাবেই ব্যক্তিত্ব স্থির করা হয়। কোনো ব্যক্তির নির্দিষ্ট ভিন্ন রকমের মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যই তাঁর ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্বকে বিজ্ঞাপনে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। এক এক ধরনের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এক এক ধরনের পণ্য বা বিশেষ চিহ্নিত নাম (brand name) বিশেষ একাত্ম পরিচয় পড়ে তোলে।

ব্যক্তিত্ব আলোচনার প্রসঙ্গে একটি বিষয় জানা প্রয়োজন। বিজ্ঞাপনদাতারা এই ধারণাটি বিজ্ঞাপনে দুইভাবে ব্যবহার করেন। যেমন, বিজ্ঞাপনে এমন কোনো ব্যক্তিত্ব প্রদর্শন করা হলো, যার ফলে গ্রাহক তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বের মিল দেখতে পাবেন। আর একটি উদ্দেশ্য, বহু গ্রাহক আছেন, যাঁদের মনে নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে অন্য রকমের ধারণা আছে, যা তাঁর বর্তমান বা বাস্তব ব্যক্তিত্বের থেকে পৃথক। তিনি নিজেকে এক বিশেষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হিসাবে কল্পনা করে গর্ব অনুভব করেন। বিজ্ঞাপনদাতা গ্রাহকের এই বাঞ্ছিত ব্যক্তিত্বের প্রদর্শন ক'রে, তাঁর মনে প্রভাব সৃষ্ট করেন।

● **জীবনযাত্রার মান**

একই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর বিভিন্ন মানুষের জীবনযাত্রার মান বিভিন্ন রকম হতে পারে। প্রত্যেক মানুষের আকাঙ্ক্ষা এবং চাহিদা জীবনযাত্রার মান এর উপর অনেকটাই নির্ভর করে। জীবনযাত্রার মান মানুষের রুচি, পছন্দ-অপছন্দ, আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা এবং প্রয়োজন নিয়ন্ত্রণ করে।

জীবনযাত্রার মান কোনো অপরিবর্তনীয় স্থির অবস্থান নয়। জীবনযাত্রার মান সততই পরিবর্তনশীল। ব্যক্তির পক্ষেও যেমন সমাজের ক্ষেত্রেও তেমন পরিবর্তনশীল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বয়স বাড়ে, উপার্জন বৃদ্ধি পায়, পারিপার্শ্বিক বদলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হয় জীবনযাত্রার মান। আবার আর্থিক মন্দার সময় সমাজের বিভিন্ন সদস্য খরচ করার ব্যাপারে সাবধানী হয়ে পড়েন। যে পণ্য আবশ্যিক কোনো আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে না, সেই রকম পণ্যের কেনাকাটা স্থগিত রাখেন। সামাজিক জীবনযাত্রার মান প্রতিফলিত হয়, ব্যক্তির জীবনযাত্রার মানের উপর।

বিজ্ঞাপনদাতারা গ্রাহকদের এই অন্তরের কারণটি বিশেষ ভাবে ব্যবহার করেন, বিশেষ বিশেষ জীবনযাত্রার চিত্র ও বক্তব্যের উপস্থাপন ক'রে। গ্রাহকরা তাঁদের নিজেদের জীবনযাত্রার মানের প্রতিচ্ছবির সঙ্গে একাত্মবোধ করেন। যে জীবনযাত্রার মান তাঁর কাঙ্খিত কিন্তু বর্তমানে নেই, সেই ছবিও তাঁর আকাঙক্ষা প্রবল করে তোলে। বর্তমানে না হলেও ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট পণ্যটি ব্যবহার করার সম্ভাবনা প্রবল হয়।

● **মনোভাব**

বিজ্ঞাপনদাতারা বিশেষভাবে গ্রাহকদের মনোভাব জানতে ইচ্ছুক। কারণ, গ্রাহকদের আচরণের বিভিন্ন কারণের মধ্যে গ্রাহকদের মনোভাবই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য বিভিন্ন কারণের সমস্যাতেই গ্রাহকদের মনোভাব গড়ে ওঠে। কোনো পণ্যের প্রতি গ্রাহকদের মনোভাব কেমন, নেতিবাচক না ইতিবাচক, তার উপরেই নির্ভর করে পণ্যটি কেনবার এবং ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত। বাজারে গ্রাহকদের আচরণ বিশেষভাবে প্রভাবিত করে গ্রাহকদের মনোভাব। তবে শেষ পর্যন্ত বাজারের পরিস্থিতিই মনোভাব নিয়ন্ত্রণ করে। ধরা যাক, কোনো গ্রাহকের মনোভাব 'পিটার ইংল্যান্ড' শার্ট কেনার এবং ব্যবহার করার অনুকূলে। কিন্তু ঐ শার্টের দাম হয়তো গ্রাহকটির পক্ষে বেশি, সেই কারণে তিনি 'পিটার ইংল্যান্ড' শার্ট না কিনে অন্য কোনো শার্ট কিনলেন।

অথবা তিনি যে যে দোকানে খোঁজ করলেন, সেখানে ঐ শার্ট পাওয়া গেল না। এমনও হতে পারে, ঐ শার্ট পাওয়া গেলেও তাঁর মাপ মতো পাওয়া গেল না। অর্থাৎ, অনুকূল মনোভাব সত্ত্বেও গ্রাহকটি 'পিটার ইংল্যান্ড' শার্ট কিনতে সক্ষম হলেন না, বাজারের পরিস্থিতির জন্য।

৬.৩.৫ বাইরের কারণ

যে কোনো মানুষের আচরণ যেমন তাঁর অন্তরের বিভিন্ন কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই রকমই বাইরের অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকের বিভিন্ন কারণও তাঁর ব্যবহার অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করে। এবারে এই বাইরের কারণগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

- **সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণ**

বিজ্ঞাপনের প্রতি গ্রাহকদের প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ। গ্রাহকরা যে সমাজে বসবাস করেন, সেই সমাজের সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল, তাঁদের আচরণ বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। বিজ্ঞাপনদাতা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে অপারগ। কিন্তু আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটই বাজার পরিস্থিতিতে গ্রাহকের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। আর সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলে, সেই বিজ্ঞাপন বিশেষ কার্যকরী হয়।

কোনো সমাজের বিভিন্ন মানুষের বিশেষ ধরনের আচরণই সংস্কৃতি হিসাবে গণ্য হয়। শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্মবোধ, সামাজিক আইন ইত্যাদি। মূল্যবোধ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার সংমিশ্রণে একটি সমাজের সংস্কৃতি একটি বিশেষ আকার গ্রহণ করে। এই সব মূল্যবোধ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি ঐ সমাজের গ্রাহকদের সকল আচরণ প্রভাবিত করে। গ্রাহকদের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক এবং অন্যান্য আকাঙ্ক্ষাও প্রভাবিত করে তাঁদের সমাজের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। বুঝতে পারছেন, কোনো পণ্যের বা পরিষেবার বিজ্ঞাপনের সাফল্য বা ব্যর্থতা অনেকটাই নির্ভর করে সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা বা না রাখার উপর, বিজ্ঞাপনের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে এই সাংস্কৃতিক পার্থক্যের উপর। ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অভ্যাস যেমন বিবাহ, মৃত্যু, খাদ্যাভ্যাস, মাদকদ্রব্য, তামাক বা ধূমপান, নরনারী সম্পর্ক। এছাড়াও রয়েছে জাতিগত মনোভাব, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি।

বিজ্ঞাপনদাতাকে গ্রাহকদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সূক্ষ্ম পরিবর্তনের উপরেও দৃষ্টি রাখতে হয়। কারণ সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, বাজার পরিস্থিতিরও পরিবর্তন ঘটায়। বিজ্ঞাপনদাতাকেও গ্রাহকদের সংস্কৃতিতে গ্রহনীয় হবে, এমনভাবেই পণ্যটিকে বিজ্ঞাপনে উপস্থাপন করতে হবে।

- **গোষ্ঠী**

যে কোনো গ্রাহকের উপর গোষ্ঠীর প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। গোষ্ঠীর প্রভাব সময় সময় সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাবের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়। গোষ্ঠী বলতে বুঝতে হবে গ্রাহকের উল্লেখ্য গোষ্ঠী (reference group) এবং তিনি যে পরিবারের সদস্য সেই পরিবার।

উল্লেখ্য গোষ্ঠী বিধিবদ্ধ এবং রীতি বহির্ভূতও হতে পারে। বিধিবদ্ধ গোষ্ঠী বলতে বুঝতে হবে পেশাগত গোষ্ঠী যেমন ডাক্তার বা উকিল বা কোনো বিশেষ এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য। আর অনিয়মিত গোষ্ঠী আপনার

বন্ধুদের গোষ্ঠী, আপনার প্রতিবেশীদের গোষ্ঠী। আবার উদ্দীষ্ট গ্রাহক যে গোষ্ঠীতে প্রবেশ করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, সেই কাঙ্খিত গোষ্ঠীও প্রভাব বিস্তার করে।

দৈনন্দিন জীবনে যে সব জিনিস ব্যবহার করা হয়, যেমন খাওয়ার জিনিস এবং অন্যান্য ভোগ্যপণ্য, সেই জিনিসগুলি সাধারণত আপনার পরিবারের সকলেই ব্যবহার করেন বা ভোগ করেন। এই সব পণ্য নির্বাচন করা হয় পরিবারের সকল সদস্যের পছন্দ-অপছন্দ বিচার বিবেচনা করে। সাধারণত পরিবারের গৃহিনী পণ্য নির্বাচন ক'রে কেনার সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের রুচি বিবেচনা করেই তিনি সিদ্ধান্ত নেন। যে কোনো বিজ্ঞাপনদাতার পক্ষেই তাঁর উদ্দীষ্ট গ্রাহক কী ধরনের পরিবারের সদস্য সেটি বিশেষ বিবেচনার বিষয়।

- **ব্যক্তি**

বিজ্ঞাপনের দ্বারা কীভাবে প্রভাবিত হন এবং কোন কোন পণ্য ব্যবহার করেন—সেই সিদ্ধান্ত আপনি একজন ব্যক্তি হিসাবেই নিয়ে যাচ্ছেন। আপনি যাঁদের কাছে পরামর্শ নেন তাঁদের মতামতও আপনার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। এবারে দেখা যাক, কোনো জিনিস কেনার সময় আপনি কেন এবং কার পরামর্শ নিয়ে থাকেন। ধরা যাক, আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন একটি টেপ-রেকর্ডার কিনবেন। এখন প্রশ্ন, আপনি কোন চিহ্নিত নামের (brand name) টেপ-রেকর্ডার কিনবেন? আপনার বন্ধুদের মধ্যে হয়তো একজন আছেন যিনি টেপ-রেকর্ডারের বিষয়ে বিশেষ ওয়াকিবহাল। সাধারণ পরিস্থিতিতে আপনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন আপনার পক্ষে কোন টেপরেকর্ডার কেনা ঠিক হবে। আপনার বন্ধু টেপরেকর্ডার থেকে আপনি কী আশা করেন জেনে নিয়ে বিভিন্ন টেপরেকর্ডারের তুলনামূলক বিচার করে একটি বিশেষ টেপরেকর্ডার কেনবার পরামর্শ দেবেন। যেহেতু আপনি বিশ্বাস করেন আপনার ঐ বন্ধু টেপরেকর্ডারের বিভিন্ন বিষয়ে ভাল জানেন, আপনি তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করবেন। এই ক্ষেত্রে আপনার ঐ বন্ধুটি আপনার পরামর্শদাতার (Opinion leader) ভূমিকা নিয়েছেন।

- **অন্যান্য**

বাজারের পরিস্থিতি এবং পরিবেশ ও গ্রাহকদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কখনো কখনো কী পরিস্থিতিতে গ্রাহক পণ্যটি কিনছেন, তার উপরেও গ্রাহকের সিদ্ধান্ত বিশেষ নির্ভরশীল। যেমন, আপনি কারোকে একটি সুগন্ধী (perfume) উপহার দেবেন, এক্ষেত্রে পণ্যটির সুগন্ধের আবেদনই আপনার কাছে মুখ্য। মূল্য গৌণ হয়ে যায়। অনেক সময় তাড়াহুড়ো ক'রে কোনো জিনিস কিনতে হলে আপনার পক্ষে সব কিছু খুঁটিয়ে দেখা বা বিচার-বিবেচনা করা সম্ভব হয় না।

৬.৪ বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য

বিজ্ঞাপন রচনার খুঁটি-নাটির বিশদ আলোচনার পূর্বে দেখা যাক, বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য বা কাজ কী? বিজ্ঞাপনের কাজ তিন রকমের—জানানো বা জ্ঞাপন, প্রভাবিত করা বা মনোভাব গড়ে তোলা এবং স্মরণ করানো।

জানানো বা জ্ঞাপন নতুন কোনো পণ্য এসেছে, কোনো পণ্যের বিশেষ নতুন ব্যবহার, মূল্যের পরিবর্তন বা বিশেষ ছাড়, পণ্যটি কীভাবে কাজ করে ব্যাখ্যা ক'রে বোঝানো।	সেবা কেন্দ্রের সুযোগের খবর, ভুল ধারণা বদলে দেওয়া, ব্যবহারকারীর সংশয় নিরসন, কোম্পানির ভাবমূর্তি গড়ে তোলা।
প্রভাবিত করা অধিকতর বাঞ্ছনীয় ভাবমূর্তি গড়া, ব্র্যান্ড পরিবর্তনে উৎসাহ দেওয়া, পণ্যের উপাদান সম্বন্ধে ব্যবহারকারীর ধারণার পরিবর্তন করা।	ব্যবহারকারীকে এখনই কিনতে উৎসাহিত করা, বিক্রয় প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলতে উৎসাহিত করা।
স্মরণ করানো ব্যবহারকারীদের স্মরণ করানো, পণ্যটি প্রয়োজন হতে পারে। কোথায় কিনতে পাওয়া যাবে মনে করানো।	যখন ব্যবহার করছেন না, তখনও পণ্যটির কথা মনে করিয়ে দেওয়া। গ্রাহকদের মনে সর্বোচ্চ অবস্থান বজায় রাখা।

৬.৫ বিষয়লিপির মডেল

বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি (copy) সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করার আগে ৩ নং এককে আলোচিত বিষয়গুলি আর একবার স্মরণ করা প্রয়োজন। যে কোনো পণ্যের বিজ্ঞাপনের মূল লক্ষ্য বিজ্ঞাপিত পণ্যটির একটি নির্দিষ্ট পৃথক পরিচিতি প্রতিষ্ঠা করা যাতে বিজ্ঞাপিত পণ্যটিকে অন্যান্য প্রতিযোগী পণ্যের থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়। এই উদ্দেশ্যে যাঁরা বিজ্ঞাপন রচনা করেন, তাঁরা মূলত নির্ভর করেন পণ্যটির অনন্য বিক্রির সম্ভাব্য উপস্থাপনে অথবা পণ্যটির একটি বিশেষ ভাবমূর্তি সৃষ্টি করায়।

বাঞ্ছিত ব্যবহারকারীদের যে প্রতিক্রিয়া আশা করে বিজ্ঞাপন রচনা হচ্ছে, তার উপর ভিত্তি ক'রে বিজ্ঞাপনের কার্যকরী বার্তা নির্ধারণ করা হয়। তবে, যে কোনো বিজ্ঞাপনের বার্তার উদ্দেশ্যে গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, আগ্রহ বজায় রাখা, অভিলাষ জাগানো এবং বিজ্ঞাপিত পণ্যটি কিনতে এবং ব্যবহার করতে উৎসাহ জোগানো।

বিজ্ঞাপনের বার্তা রচনার এই মডেলটির নাম এ-আই-ডি-এ (A-I-D-A) অর্থাৎ আকর্ষণ করা (attraction), আগ্রহ বজায় রাখা (interest), অভিলাষ জাগানো (desire) এবং কার্য সম্পাদন (action)। এই মডেলটি বহুবছর ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি লেখকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মডেল হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

এই মডেল অনুযায়ী বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি লেখক আশা করেন—বিজ্ঞাপনের শিরোনাম এবং চিত্র গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এই উপাদানগুলির সাহায্যে বিষয়লিপির প্রারম্ভ গ্রাহকের আগ্রহ বজায় রাখতে সক্ষম হবে। বিষয়লিপিতে পরিস্ফুট পণ্যটির বিশেষ গুণ গ্রাহকের কী সুবিধা করবে জেনে গ্রাহকের মনে অভিলাষ জাগবে, তবেই গ্রাহক কার্য সম্পাদন করবেন, অর্থাৎ পণ্যটি কিনবেন এবং ব্যবহার করবেন।

যে কোনো পণ্য বা পরিষেবার বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি রচনার জন্য এটি একটি আদর্শ মডেল।

বিষয়লিপির রচনার মূল সূত্র

সমস্যা বা আকাঙ্ক্ষা পরিচিতি বা চিহ্নিত করণ

↓

উপযুক্ত সমাধানের অন্বেষণ

↓

বিভিন্ন সমাধানের মূল্যায়ন

↓

কেনবার সিদ্ধান্ত বা ব্র্যান্ড নির্বাচন

↓

কেনবার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

↓

কেনবার পরবর্তী মূল্যায়ন

৬.৬ বিষয়লিপি

বিজ্ঞাপন-রচয়িতার কাজের বৃহদাংশ আপনাদের অগোচরে থাকে। আপনারা দেখেন বা শোনেন—বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন রচয়িতার কাজের একমাত্র এই নিদর্শনই আপনাদের গোচরে আসে। বিজ্ঞাপনে কী বলা হবে এবং কেমনভাবে বলা হবে—এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পণ্য এবং পরিষেবার বিক্রি নির্ভর করে বিজ্ঞাপনের উপর অর্থাৎ বিজ্ঞাপনে কী বলা হয়েছে এবং কেমন করে বলা হয়েছে তার উপরে।

বিষয়লিপি সম্বন্ধে অনেকের ধারণা বিজ্ঞাপনে যে কথাগুলি লেখা থাকে, সেগুলিই বিষয়লিপি। এই প্রাচীন ধারণা কালের আবর্তনে এবং বিজ্ঞাপন বিদ্যায় বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ প্রাধান্য পাওয়ায়, বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি নতুন মাত্রায় উত্তীর্ণ হয়েছে। বিষয়লিপি বলতে বর্তমানে বোঝায় শিরোনাম, চিত্র, বিশদ বিষয়লিপি বা বিষয়লেখ, বিজ্ঞাপনদাতার নাম, লোগো, সবকিছু সমেত সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপন।

বিষয়লিপি লেখক সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপনটি সৃষ্টি বা পরিকল্পনা করেন। তাঁর ধারণা অনুযায়ী, শিল্পীরা বিজ্ঞাপনটি রূপায়িত করেন। বিজ্ঞাপনের সমগ্র আবেদন, উপস্থাপন, গ্রাহকদের প্রভাবিত করার বিভিন্ন উপকরণ সাজানোর সম্পূর্ণ পরিকল্পনা করেন বিষয়লিপি লেখক।

বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপির বিভিন্ন অংশ—শিরোনাম, অন্যান্য লিখিত অংশ, উপ-শিরোনাম, চিত্রকল্প, প্রস্তাবনা, বিষয়লেখ, সমাপ্তি এবং কোম্পানির নাম। এই সমস্ত অংশগুলি একযোগে একটি বার্তা প্রকাশ করে। একটি অর্কেস্ট্রায় যেমন অনেক রকমের যন্ত্র ব্যবহার হয় কিন্তু সুর শুনতে পান একটিই। বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপির বিভিন্ন অংশ একটি বিশেষ বার্তা গ্রাহকদের সামনে উপস্থাপন করে। উদ্দেশ্য—দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং আগ্রহ ও অভিলাষ জাগানো।

৬.৭ শিরোনাম

বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ—বিজ্ঞাপনের শিরোনাম। বিজ্ঞাপনের রূপকল্পের সঙ্গে শিরোনাম একযোগে বিজ্ঞাপনের ধারণা (idea) বা বিষয় সৃষ্টি ক'রে মৌলিক এবং আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপন করে। বিষয়লিপি এবং কারুশিল্প একে অপরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। বলা যায় যুগলবন্দী। শব্দাবলী এবং রূপকল্পের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়া, বিষয়লিপির ধারণার উপস্থাপনের কৃতিত্বে, বিজ্ঞাপন—নজর কাড়ার মত লক্ষণীয় হয়ে ওঠে।

মুদ্রিত বিজ্ঞাপন সাধারণত তিনটি মূল উপাদান নিয়ে গঠিত। শিরোনাম, রূপকল্প এবং বিষয় লেখ। পণ্য বিক্রির মূল বার্তাটি শিরোনাম দ্বারা দক্ষতার সঙ্গে কার্যকরীভাবে জ্ঞাপন করতে সক্ষম হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কারণ, বেশির ভাগ ব্যবহারকারীই বিজ্ঞাপনের শিরোনামই পড়ে থাকেন, বাকি অংশ পড়েন না। বিজ্ঞাপনের রূপকল্প, শিরোনামের বক্তব্যকে নাটকীয়তার সঙ্গে উপস্থাপন ক'রে ব্যবহারকারীর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বিষয়লেখ আরো বিশেষ বিবরণ বিবৃত ক'রে, প্রভাবিত করার চেষ্টা করে এবং পণ্যটি ব্যবহার করার জন্য তাগিদ জানায়। মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের শিরোনাম লেখার জন্য এবং শিরোনামেরর মূল্যায়নের জন্য কতকগুলি সূত্র মেনে চললে, বিজ্ঞাপনের পাঠক সংখ্যা বাড়ে এবং বিজ্ঞাপন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

গ্রাহকদের 'সুবিধা' বা 'লাভ'

৬.৭.১ আকর্ষণ ক্ষমতা

বিজ্ঞাপনের শিরোনামের অনেকগুলি উদ্দেশ্য আছে। মুখ্য উদ্দেশ্য পাঠকের বা উদ্দীষ্ট ব্যবহারকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আপনি যখন সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্র পাঠ করেন, আপনি বিভিন্ন সংবাদ, সম্পাদকীয়, ফিচার, গল্প ইত্যাদি পাঠ করতে ইচ্ছা করেন। আপনার নজর থাকে আপনার পছন্দমত বিষয়ের বিভিন্ন রচনার দিকে। বিজ্ঞাপনের শিরোনাম তার মধ্যেই আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। যে বিজ্ঞাপনের শিরোনাম আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয় আপনি কেবল সেই বিজ্ঞাপনই দেখেন এবং পড়েন। যে বিজ্ঞাপনের শিরোনাম আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অসমর্থ, সেই বিজ্ঞাপন আপনি দেখেন না বা পড়েন না। অর্থাৎ, বিজ্ঞাপনটি ব্যর্থ হয়। শব্দের এবং রূপকল্পের যুগ্ম বিস্ফোরণ সংবাদ ইত্যাদিতে নিবেদিত আপনার মনোযোগ বিজ্ঞাপনের দিকে আকর্ষণ করে।

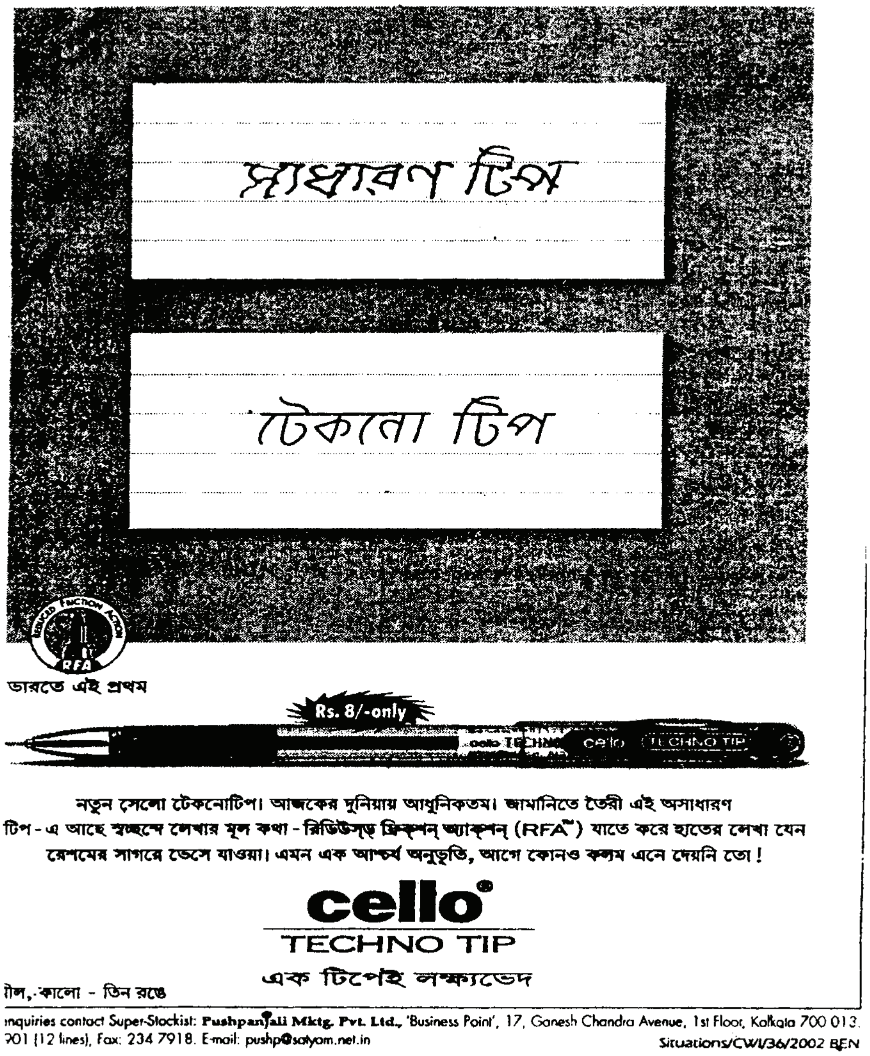

কেমন লেখা হয়, দেখানো হয়েছে

৬.৭.২ গ্রাহকের আগ্রহ

শিরোনামের পরের কাজ পাঠকের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করা। পাঠকের কোন স্বার্থ সিদ্ধির প্রতিশ্রুতি দ্বারা তাঁর ঔদাসিন্য ভেদ করা। পণ্যটি সম্বন্ধে কৌতুহল জাগানোর অথবা অবাক করে দেওয়ার মতো কোনো বার্তা পাঠকের নিজস্ব সন্তুষ্টির আগ্রহ সৃষ্টি করে।

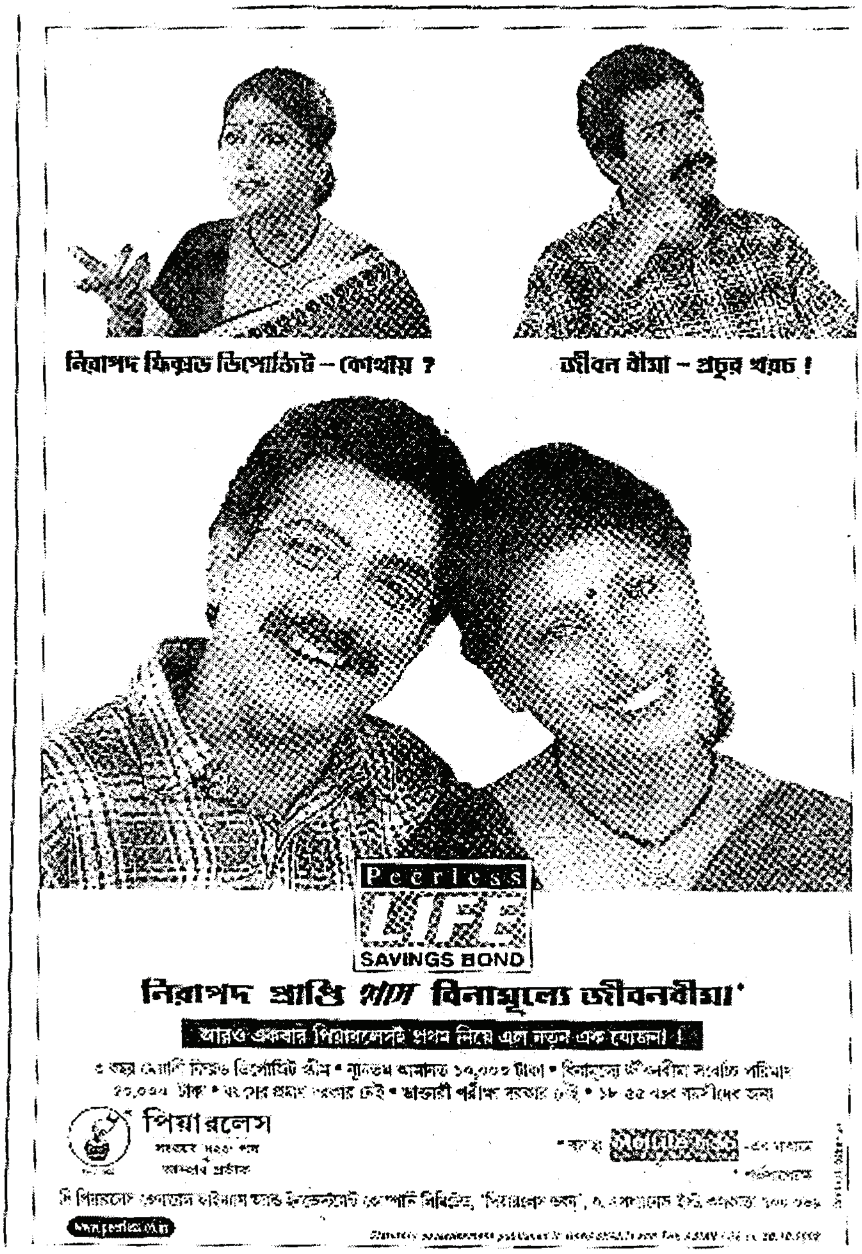

গ্রাহকের আগ্রহ সৃষ্টি, দৃষ্টি আকর্ষণ

৬.৭.৩ লক্ষ্য চিহ্নিত করা

সংবাদপত্র এবং পত্রিকার বিপুল সংখ্যক পাঠকদের মধ্যে বিজ্ঞাপিত পণ্যটির উদ্দীষ্ট ব্যবহারকারীদের পৃথক ভাবে চিহ্নিত করা। শিরোনাম থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়, বিজ্ঞাপনটির কাজের উদ্দেশ্য। "আপনার রান্নাঘরে কী...... আছে?" বিজ্ঞাপনটি সজাগ গৃহিণীদের উদ্দেশ্যে। অথবা, "আপনি কী ছোটো কারখানার মালিক? তাহলে তো....."। ছোটো কারখানার মালিকেরা অবশ্যই এই বিজ্ঞাপনটি দেখবেন, বিশদ বিষয়লেখও পড়বেন, তাঁর কী উপকার আসবে, সেই তথ্য জানবার জন্য।

৬.৭.৪ পণ্য চিহ্নিত করা

শিরোনামের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ পণ্য চিহ্নিত করা। শিরোনাম পড়েই পাঠক যেন বুঝতে পারেন, বিজ্ঞাপনটি কীসের। বর্ষাতির, না, টুথপেস্টের না গাড়ির। বিজ্ঞাপিত পণ্যটিতে পাঠকের আগ্রহ থাকলে তিনি বিজ্ঞাপনটি দেখবেন এবং পড়বেন।

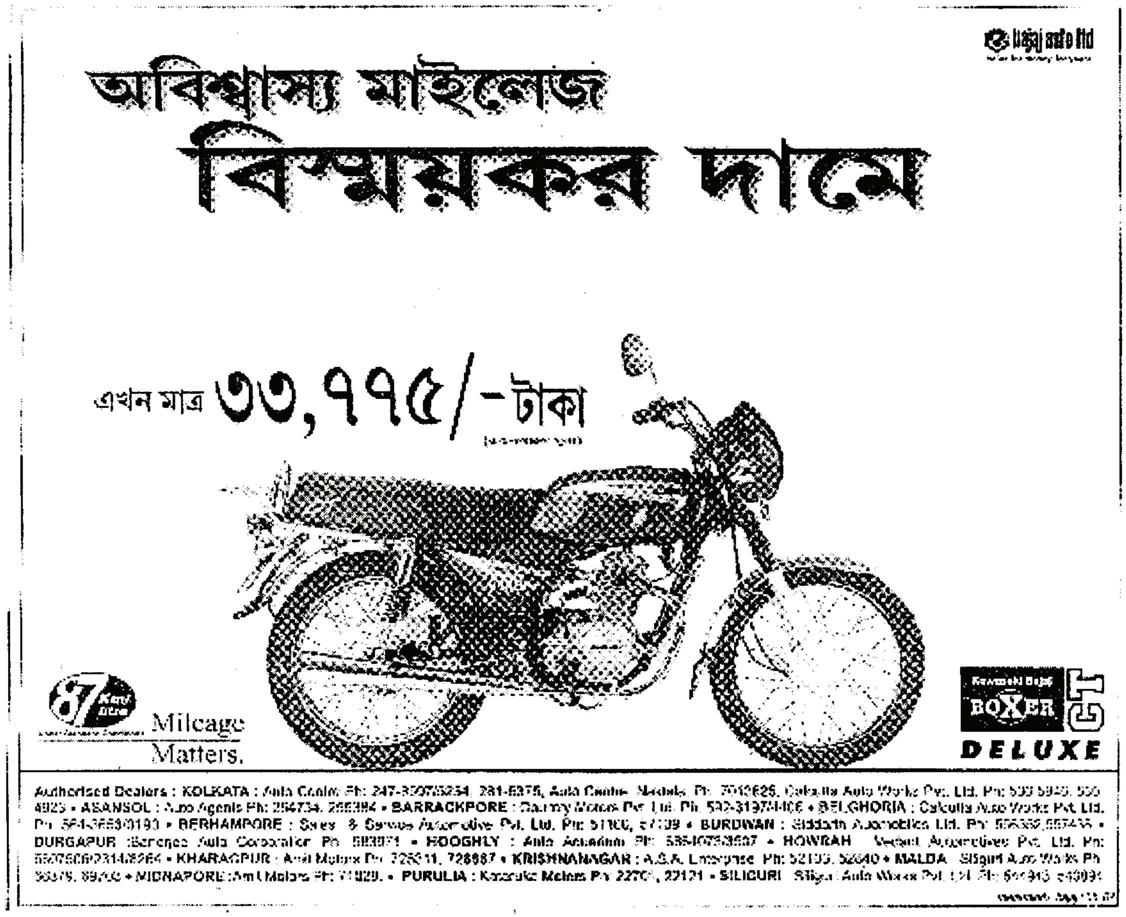

আর্থিক সুবিধা ও লাভের আশ্বাস

৬.৭.৫ বিক্রি করা

যে কোনো বিজ্ঞাপনের মূল উদ্দেশ্য পণ্য বিক্রি করা। বিজ্ঞাপনের শিরোনামের মূল কাজও একই। শিরোনাম যদি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে, আগ্রহ সৃষ্টি ক'রে পণ্যটি ব্যবহারের সুবিধা জানাতে সক্ষম হয়, তাহলে পণ্যটি বিক্রির প্রচেষ্টা সফল হবে।

যেহেতু বিজ্ঞাপনের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে বিজ্ঞাপনের শিরোনামের উপর, শিরোনাম রচনার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। যে কোনো বিজ্ঞাপনের সাফল্য নির্ভর করে শিরোনাম-এর উপর।

৬.৮ শিরোনাম লেখার নির্দেশাবলী

১। শিরোনামে সুবিধা বা লাভের কথা জানান—উদ্দীষ্ট ব্যবহারকারীর কোনো বিশেষ সুবিধা বা লাভের কথা শিরোনামে থাকলে, তিনি বিজ্ঞাপনটি পড়তে উৎসাহিত বোধ করেন।

২। ব্যক্তি পাঠকের সঙ্গে কথা বলুন—কোনো সাধারণ আবেদনে পাঠক সহজে আগ্রহান্বিত হন না।একজন পাঠককে উদ্দেশ্য ক'রে, তাঁর স্বার্থ সম্বন্ধে কোনো প্রতিশ্রুতি শিরোনামে থাকলে পাঠক ব্যক্তি হিসাবে আগ্রহ বোধ করেন। সেই কারণে "আপনি" শব্দটি ব্যবহার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পাঠক মনে করেন, ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে উদ্দেশ্য ক'রেই সুবিধার কথা জানানো হচ্ছে।

৩। রূপকল্প এবং বিষয়লেখর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন—শিরোনাম বিজ্ঞাপনের রূপকল্প এবং বিষয়লেখর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ক'রে, সম্মিলিত প্রভাব সৃষ্টি করবে।

৪। ভিন্ন হওয়া প্রয়োজন কিন্তু কঠিন নয়—যে কোনো বিষয়ে নতুনত্ব বা অভিনবত্ব গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বিজ্ঞাপিত পণ্যটির নির্দিষ্ট পৃথক পরিচিতি উপস্থাপন করতে বিশেষ সহায়তা করে। জটিল শিরোনাম, ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে লেখা শিরোনাম পণ্য বিক্রির মূল বার্তাটি হারিয়ে ফেলতে সাহায্য করে। এই ধরনের নতুনত্ব কার্যকরী হয় না। যে নতুনত্ব পাঠক সহজে বুঝতে পারেন, সেই নতুনত্বই কার্যকরী হয়।

৫। সহজ ক'রে, সোজাসুজি লিখুন—শিরোনামে বড়ো বড়ো কঠিন শব্দ ব্যবহার করলে অনেক সময়েই পাঠক বিভ্রান্ত হন। একটি বিষয়, সহজ শব্দ ব্যবহার করে সোজাসুজি জানিয়ে দিন। পাঠক বুঝতে পারবেন।

৬। হৃদয়ের উত্তাপ—সমমর্মিতা এবং পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করে এমন শব্দ ব্যবহার করলে, বিজ্ঞাপন সহজে কার্যকরী হয়। চিৎকার করে জানালেই হয় না।

৭। একঘেয়ে, কথার ফুলঝুরি নয়—পাঠকেরা বা পণ্যের ব্যবহারকারীরা যথেষ্ট বুদ্ধি রাখেন। ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলা বা বার বার একঘেয়ে শব্দ ব্যবহার করা তাঁরা পছন্দ করেন না। বরং বিজ্ঞাপনের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দীহান হয়ে ওঠেন।

কার্যকরী শিরোনাম রচনার কয়েকটি বিশেষ উপাদান ঃ—

সংবাদ—উদ্দীষ্ট পাঠকের আগ্রহের বিষয় হলে, সংবাদ-রূপে কোনো পণ্যের বিষয় জানানো যেতে পারে। নতুন কোনো পণ্য বাজারে এসেছে, বা কোনো পণ্য এখন নতুন মোড়কে বা কম দামে পাওয়া যাচ্ছে, এগুলি গ্রাহকের কাছে সংবাদ বিশেষ। এই ধরনের সংবাদ শিরোনামে থাকলে, গ্রাহকের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

আবেগ—শিরোনামে বিভিন্ন আবেগের শক্তিশালী ব্যবহার গ্রাহকের মনে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে। অনেক

বিজ্ঞাপনদাতা মানুষের বিভিন্ন আবেগ নিপুণভাবে শিরোনামে ব্যবহার করেন—ভয়, অহংকার, ভালোবাসা, অতীতের মধুর স্মৃতি, ভবিষ্যতের স্বপ্ন ইত্যাদি।

কৌতূহল—শিরোনাম যদি পাঠকের কৌতূহল জাগায় তাহলে পাঠক বিষয়টি জানার বা বোঝার চেষ্টা করেন। প্রশ্নবোধক শিরোনাম পাঠককে কৌতূহলী করে।

পাঁচটি বিভিন্ন সুবিধা বা লাভ ক্রেতার জন্য

৬.৯ শিরোনাম কত বড় হবে?

গ্রাহক যখন সংবাদপত্র পড়ছেন, তখন তিনি সংবাদ জানার জন্যই পড়ছেন, বিজ্ঞাপনের জন্য নয়। যে বিজ্ঞাপন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়, তিনি কেবল সেইটিই দেখেন এবং পড়েন। শিরোনাম রচনার এই মূল সূত্র হিসাবে স্বভাবতই সিদ্ধান্ত হয়, শিরোনাম ছোটো হওয়াই ভালো। কারণ, দীর্ঘ শিরোনাম পড়তে পাঠক উৎসাহিত বোধ করবেন না। শিরোনাম যত ছোটো হবে উদ্দীষ্ট গ্রাহকের পড়ার সম্ভাবনা ততই বেশি হবে।

সমস্যা বিজ্ঞাপনের বার্তা নিয়ে। বার্তাটি যদি এমন হয়, যা কয়েকটি মাত্র শব্দের সাহায্যে জ্ঞাপন করা সম্ভব নয়, তাহলে কী হবে? শিরোনাম ছোটো রাখার জন্য তো অসম্পূর্ণ বার্তা দেওয়া চলে না। অসম্পূর্ণ বার্তা বিজ্ঞাপনটির সাফল্যের সম্ভাবনা কমিয়ে দেবে এবং একেবারে ব্যর্থও ক'রে দিতে পারে।

এ কথা ঠিকই, কয়েকটি ছোটো ছোটো শব্দের শিরোনাম গ্রাহককে সহজে বিজ্ঞাপনের বার্তা জ্ঞাপন করতে সমর্থ হয়। অল্প কয়েকটি শব্দের সমষ্টি গ্রাহকের পক্ষে মনে রাখাও সহজ হয়। সেই জন্য, যাঁরা বিজ্ঞাপন রচনা করেন তাঁরা সব সময় চেষ্টা করেন শিরোনাম যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত রাখতে। ছোটো শিরোনাম-এর স্বপক্ষে আরো বলা হয়, শিরোনাম গ্রাহকের আগ্রহ সৃষ্টি করবে, যাতে তিনি বিজ্ঞাপনটি সম্পূর্ণ পড়েন, ভাল করে খুঁটিয়ে দেখেন। দীর্ঘ শিরোনামে যদি মোটামুটি সম্পূর্ণ বার্তাটি জানিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তিনি বিজ্ঞাপনের বাকি অংশ আর পড়বেন কেন?

আগে আমরা আলোচনা করেছি, বেশির ভাগ পাঠকই বিজ্ঞাপনের কেবল শিরোনামই পড়েন, সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপনটি পড়েন না। বিভিন্ন গবেষণায় পাওয়া তথ্যে জানা যায় প্রতি ১০ জন পাঠকের মধ্যে ৯ জন কেবল শিরোনামই পড়ে থাকেন, বিজ্ঞাপনের বাকি অংশ পড়েন না। সেক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের শিরোনাম যদি সম্পূর্ণ বার্তাটি জ্ঞাপন করতে সমর্থ না হয়, তাহলে বিজ্ঞাপনটি বিফল হবে। আর, বিজ্ঞাপনের শিরোনামে সম্পূর্ণ বার্তাটি জানতে পারলে, উৎসাহী গ্রাহক বিজ্ঞাপনের বাকি অংশ পড়ার আগ্রহ বোধ করবেন। যেহেতু বার্তা জ্ঞাপনের জন্যই বিজ্ঞাপন, শিরোনাম সংক্ষিপ্ত করার জন্য জ্ঞাপন প্রক্রিয়াই বিপর্যস্ত করা কাজের কথা নয়।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, আধুনিক বিজ্ঞাপন বিজ্ঞানের গুরু ডেভিড অগিলভি (David Ogilvy) বলেছেন, শিরোনামে বিজ্ঞাপনের মূল বার্তা আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপন করা একান্ত জরুরি। তাঁর মতে, পাঠকেরা বিজ্ঞাপনের শিরোনামে আঠারোটি শব্দও গ্রহণ করতে পারেন এবং স্মরণে রাখতে পারেন। কাজেই বিজ্ঞাপনের বার্তা সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাপনের জন্য শিরোনামে আঠারোটি শব্দও ব্যবহার করা যেতে পারে। অবশ্য এই শব্দগুলি এমন হওয়া প্রয়োজন, যা পাঠককে আকৃষ্ট করবে, তাঁর আগ্রহ সৃষ্টি করবে এবং বিজ্ঞাপিত পণ্যটি সম্বন্ধেও পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টি করবে। অগিলভির মতে শিরোনাম যেন বার্তাটি সম্পূর্ণ জ্ঞাপনের জন্য যথেষ্ট হয়।

আপনিও প্রতিদিন, অসংখ্য বিজ্ঞাপন দেখেন। সব বিজ্ঞাপন সম্পূর্ণ পড়ার আগ্রহ কতজনের আছে? এত বিজ্ঞাপন পড়ার সময় কোথায়? বেশির ভাগ লোকই কেবল শিরোনামই পড়েন। হয়তো আপনিও কেবল শিরোনামই পড়েন। শিরোনামে সম্পূর্ণ বার্তাটি না জানালে আপনি পণ্যটি সম্বন্ধে উৎসাহিত হবেন না এবং বিজ্ঞাপনের বাকি অংশ পড়তেও উৎসাহী হবেন না।

সংক্ষিপ্ত অথবা দীর্ঘ শিরোনাম, এই বিতর্কের একটি সমাধান সূত্রও আছে। বিষয়লিপি লেখক মূল শিরোনামের উপরে একটি বিশেষ লাইন লিখতে পারেন (overline) আবার মূল শিরোনামের নীচে একটি অনুশীর্ষ বা উপ-শিরোনামও লিখতে পারেন তাঁর বিজ্ঞাপনের বার্তাটিকে সম্পূর্ণতা দেওয়ার জন্য। কখনো কখনো কেবল ওভার লাইন দেওয়া হয়, শিরোনামের উপর, আবার কখনো বা কেবল উপ-শিরোনাম থাকে শিরোনামের নীচে। শিরোনামের মূল উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপনের সম্পূর্ণ বার্তাটি কার্যকরীভাবে জ্ঞাপন করা, যাতে গ্রাহকের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

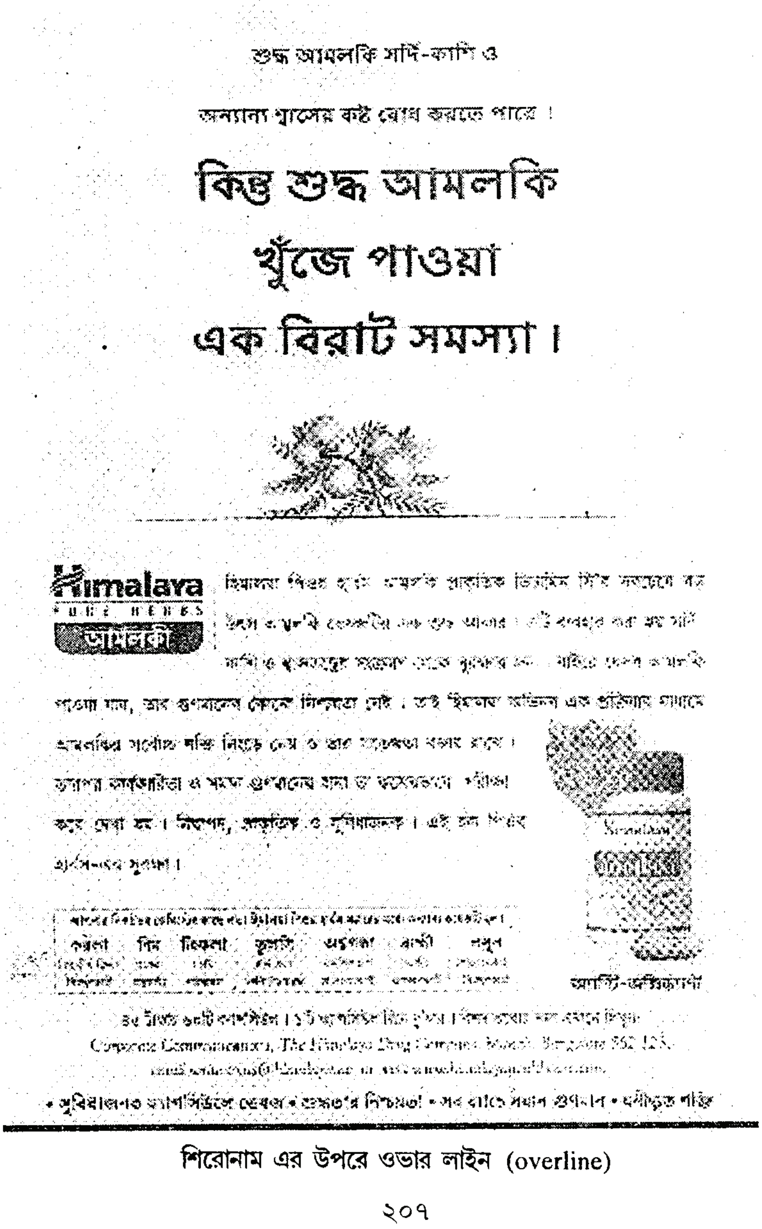

শিরোনাম এর উপরে ওভার লাইন (overline)

৬.১০ বিষয়লেখ

শিরোনামের প্রতিশ্রুতি এবং প্রলোভন সম্পূর্ণ ক'রে বিশদ বিষয়লেখ বা বিশদ বিষয়লিপি পণ্য বিক্রির কাজটি সম্পন্ন করে। যদিও আমরা আগে আলোচনা করেছি, অল্পসংখ্যক পাঠকই বিশদ বিষয়লেখ পড়েন, পণ্যটিতে আগ্রহ আছে এমন পাঠক সাধারণত বিশদ বিষয়লেখটি পড়ে থাকেন। পণ্যটি বিক্রির এবং ব্যবহারের পক্ষে সবরকম যুক্তি মানবিক আবেদনসহ বিশদ বিষয়লিপিতে দেওয়া হয়। যে কোনো বিষয়লিপি লেখক উদ্দীষ্ট গ্রাহকদের পণ্যটি ব্যবহারের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করেন বিশদ বিষয়লিপিতে।

আপনি জানেন, ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করেন বাস্তব আকাঙ্ক্ষার সন্তুষ্টির জন্য এবং একই সঙ্গে মানসিক আকাঙ্ক্ষার সন্তুষ্টির জন্য। প্রতিটি পণ্যই একই সঙ্গে গ্রাহকের বাস্তব আকাঙ্ক্ষা এবং মানসিক আকাঙ্ক্ষার সন্তুষ্টি বিধান করে। বিষয়লিপি লেখককে বিশদ বিষয়লিপিতে এই দুই রকম আকাঙ্ক্ষার সন্তুষ্টির প্রতিশ্রুতি রাখতে হয়। তবেই বিশদ বিষয়লিপি সার্থক এবং কার্যকরী হয়। বিভিন্ন পণ্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা বিভিন্ন রকমের হতে পারে। কোনো পণ্যের জন্য বাস্তব আকাঙ্ক্ষা বেশি এবং মানসিক আকাঙ্ক্ষা কম হতে পারে। আবার আর একটি পণ্যের জন্য বাস্তব আকাঙ্ক্ষা কম এবং মানসিক আকাঙ্ক্ষা বেশি হতে পারে। বেশির ভাগ ভোগ্য পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে মানসিক আকাঙ্ক্ষা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, প্রেসার কুকারের ক্ষেত্রে বাস্তব আকাঙ্ক্ষাই প্রধান। মানসিক আকাঙ্ক্ষাও গ্রাহকের মনকে প্রভাবিত করে, কিন্তু বাস্তব আকাঙ্ক্ষার তুলনায় কম। কিন্তু কোলন (Cologre) বা আফটার শেভ লোসনের ক্ষেত্রে বাস্তব আকাঙ্ক্ষা গৌণ হয়ে যায়, মানসিক আকাঙ্ক্ষাই প্রবল ভাবে কাজ করে। বিষয়লিপি লেখককে, গ্রাহকদের মনের সূক্ষ্ম আকাঙ্ক্ষা এবং প্রতিক্রিয়ার বিষয় বিবেচনা ক'রে বিশদ বিষয়লিপি রচনা করতে হয়। বিজ্ঞাপনের মূল উদ্দেশ্য পণ্য বিক্রি করা। বিশদ বিষয়লিপির প্রতিটি শব্দই যেন পণ্যটি বিক্রি করতে সহায়ক হয়।

বিশ্বাসযোগ্যতা—বিশদ বিষয়লিপির বক্তব্য এবং দাবি যেন গ্রাহকদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়। কোনো ডিটারজেন্ট পাউডারের বিজ্ঞাপনে বলা হয়, এক চামচ পাউডারে এক বালতি কাপড় কাচা হয়। এই রকম দাবি গ্রাহক বিশ্বাস না-ও করতে পারেন। কিন্তু যদি এই বিজ্ঞাপনে এমন কথাও বলা হয়—"পরীক্ষা করে দেখুন" অথবা "না হলে পয়সা ফেরৎ দেওয়া হবে"—তাহলে গ্রাহকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়। বিশদ বিষয়লিপিতে যে বক্তব্যই থাক না কেন, লক্ষ্য রাখতে হবে, গ্রাহক যেন বক্তব্যটি বিশ্বাস করেন।

সরলতা—বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন বিষয়ে অনেক ফর্মুলা আছে। আপনারা ইউ-এস-পি, এ-আই-ডি-এ ইত্যাদি ফর্মুলার বিষয় জেনেছেন। বিশদ বিষয়লিপির বিষয়েও একটি ফর্মুলা আছে। ফর্মুলাটি কিস (Kiss)। এই ফর্মুলার অর্থ—Keep It sweet and simple। সরল এবং মধুর করো। বিজ্ঞাপন সংস্থায় একটু পরিবর্তন করে এটিকে বলা হয় "সহজ ক'রে লেখো বোকা।" (Keep it simple—stupid.)। বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি পড়ার সময় কেউই মাথা ঘামাতে চান না। উদ্দীষ্ট গ্রাহকদের পক্ষে বিষয়লিপিটি পড়া যেন সহজ হয়, সরল হয়।

পাঠোপযোগিতা—বিজ্ঞাপনটি বোঝা যাচ্ছে? উদ্দীষ্ট গ্রাহকবর্গ কী বিজ্ঞাপনটির বার্তা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছেন? বিষয়লিপির পাঠোপযোগিতা বাড়ে যদি উদ্দীষ্ট গ্রাহকদের পরিচিত এবং বহু ব্যবহৃত শব্দ ব্যবহার করা হয়। বিষয়লিপি লেখক কথোপকথনের ভঙ্গিতে যদি বিষয়লিপিতে তাঁর বক্তব্য রাখেন, তাহলে সেটি

কার্যকরী হয়। গ্রাহকের পাঠোপযোগিতা বাড়ানোর জন্য "আপনি", "আপনারা", "আপনার বাড়িতে' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন। এই সব শব্দের ব্যবহার বিষয়লিপিতে অন্তরঙ্গ ভাব নিয়ে আসে এবং গ্রাহকদের পাঠোপযোগী হতে সহায়ক হয়। উদ্দীষ্ট গ্রাহকদের পাঠোপযোগী বিষয়লিপি রচনার জন্য বিষয়লিপি লেখককে উদ্দীষ্ট গ্রাহকদের বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন। মাথায় মাখার তেলের বিজ্ঞাপনের উদ্দীষ্ট গ্রাহকদের পাঠোপযোগিতা কোনো গাড়ির বিজ্ঞাপনের উদ্দীষ্ট গ্রাহকদের পাঠোপযোগিতার মতন হবে না। অন্যরকম হবে। বিষয়লিপি লেখককে এই বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

বিষয়লিপির অবয়বের গঠন

সূচনা (Lead)—বিষয়লিপির অবয়ব-এর প্রথম বাক্যটি সূচনা হিসাবে গণ্য হয়। অন্যান্য যে কোনো রচনা যেমন প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদিতে প্রথম বাক্যের ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, বিজ্ঞাপনের বিশদ বিষয়লিপির ক্ষেত্রেও তেমনই। এই প্রথম বাক্যটি শিরোনাম এবং বিশদ বিষয়লিপির যোগ সেতু। প্রথম বাক্যটি গ্রাহককে স্বচ্ছন্দের সঙ্গে বিশদ বিষয়লিপি পাঠ করতে সাহায্য এবং উৎসাহিত করবে।

অবয়ব (Body)—বিশদ বিবরণ থাকে বিষয়লিপির অবয়ব-এ। বিজ্ঞাপনের শিরোনামে যে দাবি করা হয়েছে, সেই দাবি বিভিন্ন যুক্তির সাহায্যে উপযুক্ত আবেগমণ্ডিত করে বিস্তৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়। উদ্দেশ্য—সম্ভাব্য গ্রাহকদের যুক্তির দ্বারা বোঝানো এবং আবেগের দ্বারা প্রভাবিত করা। যদি একাধিক যুক্তির এবং আবেগের অবতারণা করা প্রয়োজন হয়, তাহলে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি প্রথমে পরিবেশন করে, তাৎপর্যের ক্রমানুসারে অন্যান্য যুক্তি এবং আবেগের প্রসঙ্গ আসবে। সতর্ক থাকা প্রয়োজন, সকল যুক্তি এবং আবেগ যেন স্বচ্ছন্দভাবে একটির পরে আর একটিতে উত্তরণ করে, যাতে গ্রাহকদের পক্ষে সহজে বোধগম্য হয় এবং স্মরণে রাখাও সহজ হয়। শুরু থেকে শেষ অবধি যেন সম্পূর্ণ রূপে, নিটোলভাবে বার্তাটি পরিবেশিত হয়।

সমাপ্তি (closing)

মূল বিষয় বা প্রসঙ্গ সঠিকভাবে শেষ করা। শিরোনাম এবং সূচনায় উপস্থাপিত বিষয়ের যথোচিত পরিসমাপ্তি। সাধারণত সম্পূর্ণ বিষয়লিপি একসঙ্গে সৃষ্টি করা হয়। শিরোনাম বিষয়টি অবতারণা (introduce) করে, সূচনাপর্ব বিষয়টি বিস্তৃত ক'রে পাঠককে আগ্রহী ক'রে তোলে এবং সমাপ্তি, বিষয়টির সারাংশ মনে করিয়ে দেয়।

সক্রিয় হওয়ার আহ্বান—বিষয়লিপির সমাপ্তির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ পাঠককে সক্রিয় হতে আহ্বান করা। "পরীক্ষা করে দেখুন", "দেরি করবেন না", "আপনার নিকটবর্তী ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন"—পাঠককে সক্রিয় হতে বলা।

চিহ্নিতকরণ—বিষয়লিপির সমাপ্তির চূড়ান্ত পর্ব চিহ্নিতকরণ। বিজ্ঞাপনদাতার নাম, লোগো (logo) অর্থাৎ বিশেষ ধরনের হরফে লেখা নাম বা বিজ্ঞাপিত পণ্যটি চিনে নেওয়ার কোনো সহায়ক চিহ্ন। সাধারণত বিষয়লিপির একেবারে শেষে ডানদিকে এই চিহ্নটির অবস্থান নির্দিষ্ট করা হয়। বিজ্ঞাপনদাতার নামের সঙ্গে কোনো বিশেষ স্লোগান বা বিজ্ঞাপন অভিযানের মূল বক্তব্যের সূত্র জ্ঞাপনকারী কোন লাইন। সব কিছুরই উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপিত পণ্য এং পণ্যটির নাম মনে রাখতে পাঠককে সহায়তা করা।

৬. ১১ বিভিন্ন বিষয়লিপি

বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি নানা ধরনের হতে পারে। আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য সরলীকরণ প্রক্রিয়ায় বিষয়লিপির পাঁচটি বিভিন্ন উপস্থাপন কৌশল নির্বাচিত করা যায়।

১. সংবাদ—সোজাসুজি বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকৃত অবস্থার বর্ণনা। সংবাদের ঘোষণা এবং যথার্থতা প্রতিষ্ঠার ভঙ্গিতে বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি রচনা। সংবাদপত্রের সংবাদ যেমন সোজাসুজি বক্তব্যের মাধ্যমে বাস্তব ঘটনা পাঠককে জানায়, ঠিক সেই ভঙ্গিতেই বিজ্ঞাপিত পণ্যের কার্যকরিতা বা গুণাবলী পাঠককে সোজাসুজি জানানো হয়। বাজারে নতুন পণ্যের পরিচয় করানো এবং কোনো চালু পণ্যের বিশেষ কোনো গুণের সংযোজন ব্যবহারকারীদের জানানোর জন্য বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপিতে এই "সংবাদ" কৌশল ব্যবহার করা হয়।

২. যুক্তি—বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলার জন্য বিজ্ঞাপিত পণ্যের স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করা। বিজ্ঞাপিত পণ্য এবং প্রতিযোগী পণ্যগুলির সম্বন্ধে ব্যবহারকারীর মোটামুটি ধারণা থাকলে তবেই এই কৌশল কার্যকরী হয়। ব্যাখ্যা এবং কার্যকরিতার তুলনামূলক উপস্থাপনের দ্বারা ক্রেতাদের মনে প্রভাব সৃষ্টি করা হয়। যে সব পণ্যের বিপণনে প্রতিযোগিতার তীব্রতা বেশি, সেই সব পণ্যের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে এই কৌশল ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৩. ভাবমূর্তি—বিজ্ঞাপন যখন কোনো পণ্যের স্মরণীয় পরিচিতি জ্ঞাপন করে তখন একটি বিশেষ ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। ব্যবহারকারীর অধিগত জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একটি নির্দিষ্ট ধারণা প্রতিষ্ঠা করাই ভাবমূর্তি রচনা করা। ভাবমূর্তির কৌশলের বিশেষ উপাদান ব্যবহারকারীদের জীবনযাত্রার মান বা চালচলন। যেমন, শক্ত-সমর্থ যুবকদের সিগারেট—"চার্মস"। হুল্লোড় প্রিয় কিশোর-কিশোরীদের জন্য তুফানি চুমুক—"থাম্‌স্‌ আপ"।

৪. আবেগ—আবেগঘন বার্তা মানুষের মনে বিভিন্ন অনুভূতির প্রভাব সৃষ্টি করে, যেমন—ভালোবাসা, রাগ, ঘৃণা, আনন্দ, দুঃখ ইত্যাদি। আবেদন করতে হবে, মানুষের হৃদয়ের কাছে। বুদ্ধিমত্তার আবেদনের চেয়ে, আবেগের আবেদন অনেক বেশি কার্যকরী। কোডাক ফিল্ম। ফিল্ম বিক্রি করে না। ব্যবহারকারীর হৃদয়ে জাগায় স্মৃতি, ভালোবাসা। আপনি যাঁদের পছন্দ করেন, ভালোবাসেন তাঁদেরই ফোটোগ্রাপ তোলেন। সমগোত্রীয় পণ্যের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের মনে প্রভাব সৃষ্টির জন্য আবেগঘন আবেদনের কৌশল অবলম্বন করা হয়। একটি পণ্যের সঙ্গে আরেকটি পণ্যের বস্তুত কোনো গুণগত পার্থক্য বা প্রস্তুতকারীর কোনো বিশেষ কারিগরী পার্থক্য না থাকলে, আবেগজনিত আবেদনের সাহায্যে পার্থক্য সৃষ্টি এবং প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৫. চিত্তবিনোদন—সংবাদপত্রে এবং টেলিভিশনে পর পর এত বিজ্ঞাপন থাকে যে পাঠক বা দর্শকের পক্ষে মনোযোগ দেওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে। কোনো বিজ্ঞাপনে যদি, পাঠক বা দর্শকের কোনো রকম বিনোদনের উপকরণ থাকে তাহলে সেই বিজ্ঞাপন পাঠক বা দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে এই বিনোদনের উপাদান বিশেষ কার্যকরী। তবে, লক্ষ্য রাখতে হবে, বিজ্ঞাপন যেন বিনোদন সর্বস্ব না হয়। বিনোদন যেন বিজ্ঞাপনের মূল বার্তাটি চাপা না দিয়ে দেয়।

ভাবাবেগ/অনুভূতি জাগানো

বিজ্ঞাপনের সৃজনশীলতার কৌশলের বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রাহকদের কোন অনুভূতি বা ভাবাবেগ জাগানোর উদ্দেশ্যে কী ধরনের আবেদন করা হবে। বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন আবেদন সরাসরি মনস্তত্বের উপরেই ভিত্তি করে নির্বাচিত। বিজ্ঞাপনের বার্তা মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর আশ্বাস দেয়। মানুষের প্রয়োজন বা আকাঙ্ক্ষা বিশ্লেষণ করার অন্যতম প্রধান সূত্র অ্যাব্রাহাম ম্যাসলো'র "মানুষের প্রয়োজনের ক্রমপর্যায়"। এই ক্রমপর্যায় শুরু হয়েছে, শারীরিক প্রয়োজন থেকে। ক্রমশ উত্তরণের মাধ্যমে স্নেহ-ভালবাসা, সামাজিক সম্মান ইত্যাদি প্রয়োজনের স্তর পার হয়ে আত্মোপলব্ধিতে সমাপ্তি। ম্যাসলোর ক্রমপর্যায় শারীরিক প্রয়োজন থেকে ক্রমশ সূক্ষ্ম অনুভূতির স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে। বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ মনে রাখা প্রয়োজন যে নিচের স্তরের প্রয়োজন মিটলে তবেই মানুষ পরবর্তী প্রয়োজনীয় স্তরের বিষয়ে উৎসাহী হয়। বিজ্ঞাপনে এই উচ্চাভিলাষ (aspiration) এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণত প্রয়োজনের চেয়ে, প্রয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা একাত্মবোধে চিহ্নিত কোনো আবেগ বা অনুভূতি অবলম্বন করেই বিজ্ঞাপনের বার্তার আবেদনের কৌশল স্থির করা হয়। বিজ্ঞাপনের আবেদন এমন এক বার্তা যা মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আবেগ বা অনুভূতি জাগাবে এবং পণ্যটির জন্য বিশেষ আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করবে গ্রাহকের মনে। পূর্ববর্তী উদাহরণ আবার উল্লেখ ক'রে বলা যায়, আপনার প্রয়োজন ফোটোগ্রাফ, এবং তার জন্য ফিলম। বিজ্ঞাপনে আবেদন সৃষ্টি করা হয়েছে, স্মৃতির, স্মরণীয়, মধুর মুহূর্তের সংরক্ষণ। যাতে ভবিষ্যতে বার বার সেই অতীতের ঘটনার আনন্দ অনুভব করা যায়।

৬.১২ বিজ্ঞাপনের আবেদন

বিজ্ঞাপনে অসংখ্য রকমের আবেদন সৃষ্টি করা যায়। তবে কতকগুলি আবেদন মৌলক এবং ভিত্তিমূলক আবেদন হিসাবে গণ্য হয় এবং বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে বার বার ব্যবহার করা হয়।

বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত বিভিন্ন মৌলিক আবেদনের একটি তালিকা—

• অধিকার করার ইচ্ছা ঃ টাকা পয়সা, পদ-মর্যাদা, স্বীকৃতি, সামাজিক দায়বদ্ধতা • উচ্চাকাঙক্ষা ঃ কৃতিত্ব (achievement) গুণার্জন (accomplishment) • স্বাচ্ছন্দ • সুবিধা ঃ সময় বাঁচানো, পরিশ্রম বাঁচানো • সাশ্রয় (economy) ঃ টাকা-পয়সা, সময় বাঁচানো • অহংবোধ ঃ স্বীকৃতি, গর্ববোধ, পদমর্যাদা (status)।

ভাবাবেগ পূর্ণ আবেদন ঃ

• ভয় ঃ নিরাপত্তা (safety and security) ব্যক্তিগত বিব্রত অবস্থা • পরিবার ঃ স্নেহ, সংরক্ষণ • ভালোবাসা এবং যৌন আবেদন • স্মৃতি (nostalgia) • হাস্যরস ঃ সুখ, আনন্দ, হাসি • নিশ্চিন্ততা (relief) • দুঃখ ঃ শোক, কোনো বিষয়ে কষ্ট। • স্বাস্থ্য • সম্মান ঃ সফল নায়ক বা আদর্শ চরিত্র (role model)। • বিলাস • মানসিক সন্তুষ্টি ঃ কৌতূহল, চ্যালেঞ্জ • সুখানুভূতি ঃ বিনোদন, উত্তেজনা • ইন্দ্রিয়জাত সুখ ঃ স্পর্শ, স্বাদ, গন্ধ।

ডাঃ মেলভিন হ্যাট্টিক (Dr. Melvin Hattwick) সাধারণ মানুষের মনস্তাত্বিক আবেদনের আবেগের বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করে মোট আটটি মূল প্রয়োজনের একটি তালিকা নির্বাচিত করেছেন।

১. খাদ্য ও পানীয় ২. স্বাচ্ছন্দ ৩. ভয় এবং বিপদ থেকে মুক্তি ৪. প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ৫. পুরুষের পক্ষে নারীর এবং নারীর পক্ষের পুরুষের সান্নিধ্য ৬. প্রিয়জনের উন্নতি এবং কল্যাণ ৭. সামাজিক স্বীকৃতি ৮. দীর্ঘ জীবনের বাসনা।

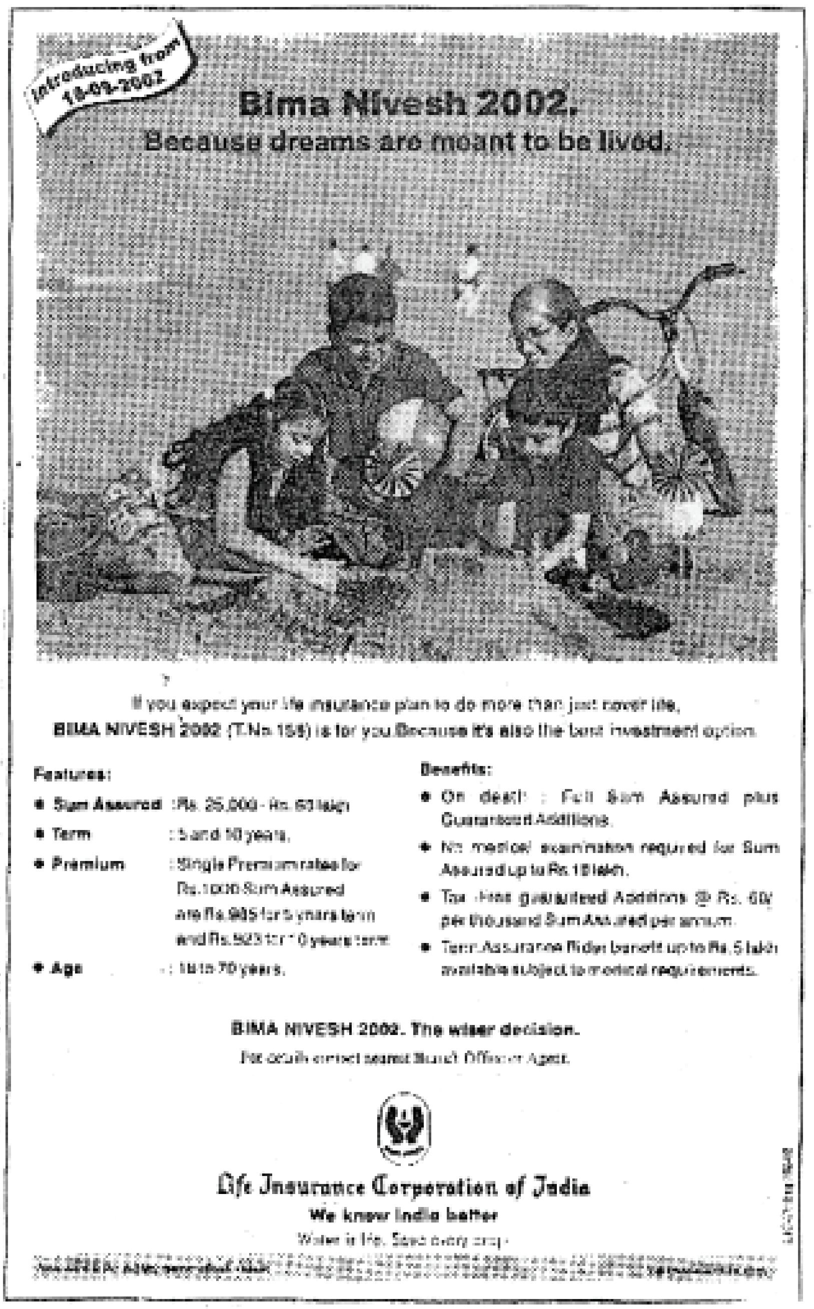

মা-বাবার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশ্বাস

এই আটটি প্রয়োজন সহজেই জাগ্রত করা যায়। এই প্রয়োজনগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং বাস্তবিকভাবে সার্বজনিক। সৃষ্টিশীল আবেদনের লক্ষ্য—যে বিশেষ পণ্যটির বিজ্ঞাপন করা হচ্ছে, সেইটির পক্ষে বিশেষ কার্যকরী হবে, এমন কোনো প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞাপনের বার্তার আবেগ জনিত আবেদন নির্বাচন করা।

৬.১৩ বিজ্ঞাপন বার্তার আকার

যিনি বিজ্ঞাপন সৃষ্টি করছেন, তাঁকে বিজ্ঞাপনের বার্তাটি একটি নির্দিষ্ট আকারে পরিণত করতে হবে। মুদ্রণ মাধ্যমের বিজ্ঞাপনের জন্য একটি চিত্ররেখা প্রস্তুত করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে, শিরোনাম, বিষয়লিপি, চিত্রের ব্যবহার এবং রং-এর ব্যবহারের বিষয়ে। পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চিত্র এবং বিভিন্ন বিপরীত চরিত্রের (contrast) রঙের ব্যবহার করা হয়। রেডিওর বিজ্ঞাপনের জন্য বিশেষ শব্দের ব্যবহার, কণ্ঠস্বরের ওঠানামা, নাটকীয়তা এবং অন্যান্য আনুসাঙ্গিকের (দীর্ঘশ্বাস, হাসি, চীৎকার, উচ্ছ্বাস ইত্যাদির) ব্যবহার করা হয়। টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত উপাদানগুলির সঙ্গে যুক্ত হবে বিভিন্ন চরিত্রের চলাফেরার মাধ্যমে শারীরিক অভিব্যক্তিতে বক্তব্যের প্রকাশ (body language) মুখের ভঙ্গি (বিরক্তি, আনন্দ, কৌতূহল, অবাক হওয়া), পোশাক এবং পারিপার্শ্বিক। সবমিলেই বিজ্ঞাপনের মূল আবেদন সৃষ্টি করে।

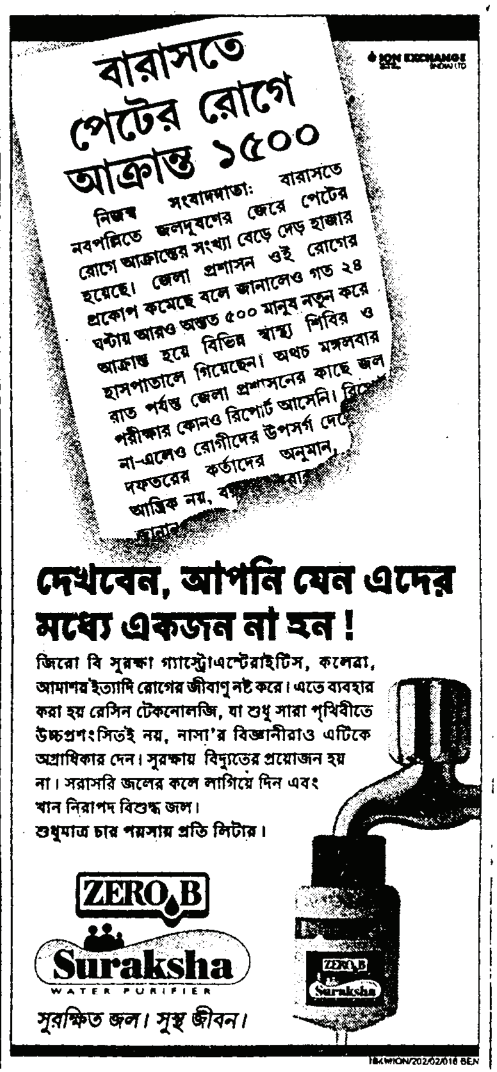

আবেদন 'ভয়'। নিরাপত্তার আশ্বাস

৬.১৪ বিজ্ঞাপন বার্তার উপস্থাপন

বিজ্ঞাপনের কার্যকরিতা কেবল বিজ্ঞাপনের বার্তার উপরেই নির্ভর করে না। বার্তাটি কেমন ভাবে গ্রাহকদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে, তার উপরেও বিজ্ঞাপনের সার্থক হওয়া বা ব্যর্থ হওয়া নির্ভর করে। একই বার্তা বা বিষয় বিভিন্ন পদ্ধতি বা আকারে উপস্থাপন করা যেতে পারে। যে সব পণ্যের একটির সঙ্গে আর একটির বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই, যেমন ডিটারজেন্ট পাউডার, কফি, সিগারেট ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের বার্তা এবং বার্তাটির উপস্থাপনের পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো বিজ্ঞাপনবার্তা বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা যায়।

১. জীবনের (দৈনন্দিন) অংশ (slice of

life)—সাধারণত ব্যবহারকারীর বাড়িতে যে পরিবেশ এবং পরিস্থিতি প্রায়ই দেখা যায়, বিজ্ঞাপনে সেইটিই তুলে ধরা হয়। আপনারা দেখেছেন, বিজ্ঞাপনে একজন লোক সকালে দাড়ি কামাচ্ছেন। হঠাৎ গাল কেটে

গ্রাহকের মনে প্রভাব সৃষ্টি

গেল। তিনি মুখ ফিরিয়ে বলছেন—"ওঃ বোরোলীনটা কোথায়?" সাধারণ মানুষের জীবনে এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে। দৈনন্দিন জীবনের এই রকম অংশ বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতির সুবিধা, গ্রাহক সহজেই নিজেকে এবং নিজের সমস্যাকে বিজ্ঞাপনে বর্ণিত চরিত্রের এবং তার সমস্যার সঙ্গে চিহ্নিত করতে পারেন।

২. জীবনযাত্রার প্রণালী (Life style)—এই পদ্ধতির দ্বারা বোঝানো হয়, কোনো একটি পণ্য কোন বিশেষ জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে খাপ খায়। আপনারা একটি স্যুটিং এর বিজ্ঞাপন দেখেছেন। একটি চমৎকার স্যুট পরে একজন সুদর্শন মধ্যবয়সী লোক বিলির্য়াড খেলছেন। অর্থাৎ রূপকল্পের মাধ্যমে গ্রাহককে জানানো হচ্ছে যাঁরা এই ধরনের জীবন যাপন করেন তাঁরা রেমন্ড সুটিং-এর পোশাক পরেন।

৩. আজগুবি (Fantasy)—বিজ্ঞপিত পণ্য বা সেটির ব্যবহারের বিষয়ে একটি অবিশ্বাস্য, আজগুবি ঘটনা, পারিপার্শ্ব এবং চরিত্রের অবতারণা করা। গ্রাহকদের মনে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যে সব পণ্য ছোটোদের জন্য যেমন বাবলগাম, চকোলেট, চ্যুয়িংগাম ইত্যাদির বিজ্ঞাপনে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় উদ্দীষ্ট গ্রাহকদের কথা চিন্তা করে।

৪. মনোভাব অথবা ভাবমূর্তি (Mood or image)—এই পদ্ধতিতে বিজ্ঞাপিত পণ্যটির একটি বিশেষ ভাবমূর্তি উপস্থাপন করা হয়। পণ্যটির বিষয়ে একটি বিশেষ মনোভাব উপস্থাপিত হয়। যেমন, সৌন্দর্য, প্রেম বা অন্য কোনো অনুভূতি। বিশেষ ইঙ্গিত ব্যবহার করা হয়, পণ্যটির সম্বন্ধে সোজাসুজি কিছু বলা হয় না। আপনারা দেখেছেন উইলস্ ফিলটারের বিজ্ঞাপন "মেড ফর ইচ আদার"। একটি বিশেষ মনোভাব, মুহূর্ত উপস্থাপন করা হয়েছে।

৫. সঙ্গীত মুখর (Musical)—এক বা একাধিক ব্যক্তি অথবা কখনো কখনো কার্টুন চরিত্র একটি বিশেষ পণ্যের বিষয়ে গানের মাধ্যমে বক্তব্য পেশ করে।

৬. প্রতীক ব্যক্তিত্ব (Personality symbol)—বিজ্ঞাপিত পণ্যের সঙ্গে একাত্মভাবে একটি চরিত্রের বা এ্যানিমেটেড চরিত্রের সৃষ্টি করা হয়। ঐ চরিত্রটি গ্রাহকদের কাছে পণ্যটিকে পরিচিত করে।

৭. কারিগরী দক্ষতা (Technical expertise)—বিজ্ঞাপিত পণ্যটির প্রস্তুতিকরণে কোম্পানির কারিগরী দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করা হয়। উদাহরণ টাটা টীর বিজ্ঞাপন।

৮. বৈজ্ঞানিক প্রমাণ (Scientific evidence)—এই পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের দ্বারা উপস্থাপন করা হয়, বিজ্ঞাপিত পণ্যটি প্রতিযোগী পণ্যগুলির থেকে কেন আরো ভালোভাবে গ্রাহকদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম।

৯. প্রশংসাপত্র (Testimonial)—কোনো সুপরিচিত, জনপ্রিয় ব্যক্তির কোনো পণ্য সম্পর্কে স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্র সহ বিজ্ঞাপন। এই উপস্থাপন পদ্ধতিতে বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত ব্যক্তির জনপ্রিয়তার জন্য তাঁকে অনুকরণীয় চরিত্র হিসাবে (role model) ব্যবহার করা হয়, গ্রাহকদের উপর প্রভাব সৃষ্টি করার জন্য। আপনারা দেখেছেন ভিসা কার্ড-এর বিজ্ঞাপনে শচীন তেণ্ডুলকরের প্রশংসাপত্র ব্যবহার করা হয়।

কোনো পণ্যের বিজ্ঞাপনে প্রশংসাপত্র ব্যবহার করার সময় কতকগুলি বিষয় বিশেষ বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। প্রশংসাপত্র তিন রকমের হতে পারে। যিনি প্রশংসাপত্র দিচ্ছেন, তিনি একজন কর্তাব্যক্তি হতে পারেন,

অথবা কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি (যেমন শচীন তেণ্ডুলকর) অথবা পণ্যটি ব্যবহার করে খুশি, সন্তুষ্ট হয়েছেন, এমন কোনো গ্রাহকও হতে পারেন।

বিজ্ঞাপনে কোনো স্বনামধন্য ব্যক্তির প্রশংসাপত্র ব্যবহার করার সময় চিন্তা করতে হবে। এই প্রশংসাপত্র কতখানি বিশ্বাসযোগ্য হবে। যেমন শচীন তেণ্ডুলকর বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়। খেলার জন্য তাঁকে প্রায়ই ভ্রমণ করতে হয়। তিনি যদি ভিসাকার্ড কে প্রশংসাপত্র দেন তাহলে গ্রাহকদের কাছে সেটি বিশ্বাসযোগ্য বলে গণ্য হবে। কিন্তু কোনো কমদামী সাবানের বিজ্ঞাপনে যদি মুম্বাইয়ের কোনো বিখ্যাত চিত্রতারকার প্রশংসাপত্র ব্যবহার করা হয়, গ্রাহকরা সেটি বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ না করার সম্ভাবনাই বেশি।

প্রশংসাপত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ঝুঁকি আছে। যে ব্যক্তির প্রশংসাপত্র বিজ্ঞাপনে পণ্যের প্রচারের জন্য ব্যবহার করা হয়, তাঁর সাফল্য বা ব্যর্থতা বিজ্ঞাপিত পণ্যটিকে প্রভাবিত করে। যেমন, যদি কোনো চিত্রতারকার প্রশংসাপত্র বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হয় এবং ঐ তারকার পর পর কয়েকটি ফিল্ম যদি বক্স অফিস হিট করে তাহলে বিজ্ঞাপিত পণ্যটি লাভবান হয়। অপরদিকে যদি ঐ তারকার পর পর কয়েকটি ফিল্ম ফ্লপ করে তাহলে বিজ্ঞাপিত পণ্যটির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয় না। আপনারা জানেন আমাদের ক্রিকেট তারকা কপিলদেব এর প্রশংসাপত্র নিয়ে অনেকগুলি পণ্যের বিজ্ঞাপন করা হতো। কারণ কপিলদেব ভারতের শ্রেষ্ঠ অলরাউণ্ডার। কিন্তু ক্রিকেট গড়াপেটার কেলেঙ্কারীতে কপিলদেব জড়িত ছিলেন, এই অভিযোগ ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই কপিলদেবের প্রশংসাপত্র দেওয়া বিজ্ঞাপনগুলি প্রচার বন্ধ করা হয়। কারণ সাধারণ মানুষ ঐ বিজ্ঞাপনগুলি ঐ বিশেষ পরিস্থিতিকে সহজভাবে গ্রহণ করতেন না।

১০. সংবাদ—সরাসরি বিষয়টিকে উপস্থাপনের পদ্ধতির আর একটি আকার সংবাদ। বিজ্ঞাপিত পণ্যটির সম্বন্ধে সংবাদের মত কিছু জানানোর থাকলে, সংবাদের ঘোষণার ভঙ্গিতে জানালে কার্যকরী হয়। বেশির ভাগ গ্রাহকই "নতুন", "এখন", "এবারে" ঘোষণা অগ্রাহ্য করতে পারেন না।

১১. কথোপকথন—বিজ্ঞাপনের বার্তা কথোপকথনের আকারেও উপস্থপিত হতে পারে। কথোপকথনেরই একটি বিশেষ রূপ সাক্ষাৎকার বা ইন্টারভিউ। এই পদ্ধতিতে, দুটি চরিত্রের একজন প্রশ্ন করেন, আর একজন সেই প্রশ্নের উত্তর দেন। এই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেই পণ্যের গুণাবলি গ্রাহকদের জানানো হয়।

১২. নাটক—যে কোনো ভালো গল্প দৃষ্টি আকর্ষণ করতে, কৌতূহল জানাতে সমর্থ হয়, গ্রাহকের আগ্রহ বজায় রাখে এবং মনে রাখতে সহায়ক হয়। নাটকের উপস্থাপনায় গ্রাহক কৌতূহলী হয়ে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করেন। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিই পণ্যটির নাম এবং গুণাবলি মনে রাখতে বিশেষ সহায়ক। টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনে এই উপস্থাপন কৌশল বিশেষ কার্যকরী।

১৩. সমস্যা সমাধান—গবেষণার ফল বিশ্লেষণ করে যদি গ্রাহকদের কোনো বিশেষ সমস্যা চিহ্নিত করা যায়, তাহলে সমস্যা সমাধানের আকারে বিজ্ঞাপন উপস্থাপন করাই যুক্তিযুক্ত। গ্রাহকরা সহজেই তাঁদের সমস্যা চিহ্নিত করতে সমর্থ হবেন এবং সমাধানের প্রস্তাব বোঝার চেষ্টা করবেন। এই পদ্ধতিতে বিজ্ঞাপিত পণ্যটিকে নায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। যেহেতু গ্রাহকদের সমস্যার মোকাবিলার সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে পণ্যটির নাম গ্রাহকরা সহজে ভুলে যাবেন না।

১৪. কার্যকরিতা প্রদর্শন—বিজ্ঞাপিত পণ্যের কার্যকরিতা প্রদর্শন একটি বিশেষ উপস্থাপন পদ্ধতি। যাঁরা গুঁড়ো দুধ ব্যবহার করেন, তাঁরা জানেন, গুঁড়ো দুধ ব্যবহারের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা —চা-এ বা জলে গুলবার সময় ডেলা পাকিয়ে যাওয়া। বিজ্ঞাপনে দেখেছেন "গুলবার সময় ডেলা পাকিয়ে যায় না' কথার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দুধ গুলে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ডেলা পাকায় না। বিজ্ঞাপনের বার্তা গ্রাহকদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে।

১৫. তুলনা—এই পদ্ধতিতে বিজ্ঞাপিত পণ্যের কার্যকরিতা, প্রতিযোগী পণ্যের কার্যকরিতার সঙ্গে তুলনা করে উপস্থাপন করা হয়। আপনারা দেখেছেন, একটি সাবান বার বার ঘষেও জামা-কাপড় পরিষ্কার হচ্ছে না। তুলনামূলকভাবে বিজ্ঞাপিত সাবানটি সহজেই জামাকাপড় বেশি পরিষ্কার করতে পারে এই বার্তা প্রতিষ্ঠিত হলো।

দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কার্টুন চিত্রের সার্থক ব্যবহার

১৬. ব্যঙ্গচিত্র—কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্রের সাহায্যে বিজ্ঞাপনের বার্তা বিশেষ কার্যকরীভাবে ব্যবহারকারীদের সামনে উপস্থাপন করা সম্ভব। বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে দেখেছেন ভাল্লুক কথা বলছে। অনেকগুলি হরফ চলাফেরা করে, লাফালাফি করে একটি শব্দ বা নাম সৃষ্টি করছে। কার্টুন এইভাবে ব্যবহারকারীকে বিজ্ঞাপিত পণ্যের নাম মনে রাখতে সহায়তা করে। জীবনবীমার বিজ্ঞাপনে কার্টুনের সাহায্যে বার্তা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

৬.১৫ চিহ্নিত করণের প্রতীক

ট্রেড মার্ক-ব্র্যান্ড নাম ঃ সাধারণত ব্র্যান্ড নাম এবং ট্রেড মার্ক (trade mark) সমার্থক বলে ধরা হলেও দুটির মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। "ট্রেড মার্ক" আসলে পণ্যের পরিচিতির সহায়ক রূপকল্প। "ট্রেডমার্ক" আবার ব্র্যান্ড নাম হিসাবেও ব্যবহার হয়। রূপকল্পের সাহায্য ব্যতিরেকে, কথায় বলেও ব্র্যান্ড-নাম বোঝানো যেতে পারে। যেমন, যদি বলেন "কোকাকোলা"—এটি ব্র্যান্ড নাম।

৬.১৫.১ ট্রেড মার্ক

আর, যে বিশেষ ধরনের অক্ষরে এবং স্টাইলে "কোকাকোলা" ইংরাজীতে লেখা হয় সেটি ট্রেড মার্ক। এই বিশেষ ধরনের অক্ষর ও স্টাইলে লেখা নাম লোগো (logotype)। পণ্যটির ক্ষেত্রে দুটিই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আইনগত বিষয়ে ট্রেডমার্ক-এর গুরুত্ব বেশি। ট্রেডমার্ক ভারত সরকারের রেজিস্ট্রার অফ ট্রেড মার্ক-এর দপ্তরে রেজিস্ট্রি করা হয়। পণ্যের জন্য একটি কোম্পানি কোনো ট্রেডমাক রেজিস্ট্রি করলে, সেই ট্রেডমার্ক বা নাম অন্য কোনো পণ্য বা কোম্পানি ব্যবহার করতে পারে না। ট্রেডমার্ক-ই গ্রাহকদের পণ্য চেনাতে সাহায্য করে। ট্রেড মার্ক কোম্পানির নিজস্ব চিহ্ন।

৬.১৫.২ স্লোগান

ট্রেডমার্ক-এর মতো স্লোগান বহুদিন ধরে প্রচারিত হলে, সংশ্লিষ্ট পণ্যের পরিচিতি হয়। বিজ্ঞাপন যাঁরা সৃষ্টি করেন, তাঁরা চেষ্টা করেন বার বার পুনরাবৃত্তির দ্বারা স্লোগান যেন গ্রাহকদের মনে গাঁথা হয়ে যায়। বিজ্ঞাপন অভিযানের মূল সূত্র বা বক্তব্য সফল করে তুলতে স্লোগান বিশেষ সহায়ক।

আপাত দৃষ্টিতে স্লোগানের গঠন বিজ্ঞাপনের শিরোনামের মতো, কিন্তু শিরোনাম এবং স্লোগানের মধ্যে পার্থক্য আছে। কখনো কখনো বিশেষ সফল কোনো শিরোনাম থেকেই স্লোগান তৈরি করা হয়। কিন্তু বিজ্ঞাপনের শিরোনামের উদ্দেশ্য এবং স্লোগানের উদ্দেশ্য এক নয়। স্লোগানের সবচেয়ে বেশি প্রচলিত (common) উদ্দেশ্য দুটি

ক. বিজ্ঞাপন অভিযানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং মূল বার্তা গ্রাহককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। স্লোগান যদি সার্থক হয়, তাহলে বহুবছর ধরে একই স্লোগান ব্যবহার করা হয়।

খ. যে বিষয় বা ধারণা বিজ্ঞাপিত পণ্যের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সংযুক্ত, সেই বিষয় বা ধারণা কয়েকটি স্মরণীয় শব্দের সাহায্যে সংক্ষিপ্ত, নিটোল আকারে পরিস্ফুট করা।

আপনি যখন কোনো স্লোগান পড়েন বা শোনেন, তখন আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, এই পণ্যটি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, বহুদিন ধরে আপনি ব্যবহার করে আসছেন। এই পণ্যের উপরে আপনার আস্থা আছে,

আপনি এর উপরে নির্ভরশীল। "বঙ্গজীবনের অঙ্গ রোরোলীন"। অথবা "হরলিকস মহান শক্তিদাতা"। ছোটোবেলা থেকেই আপনি জেনে এসেছেন, অসুখ বিসুখ বা অতিরিক্ত পরিশ্রম, কোনো কারণে শরীর দুর্বল হয়ে পড়লে, হরলিকস শক্তি জোগায়। এই ধারণা আপনার স্মৃতিতে গাঁথা আছে। স্লোগানটি আপনাকে সেই কথাই জানাচ্ছে। এত বছরের হরলিকস্ এর বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের বার্তার সারাংশ আপনাকে স্মরণ করাচ্ছে।

বিজ্ঞাপিত পণ্য সম্পর্কে কোনো বিশেষ ধারণা, বহুদিনের জন্য গ্রাহকদের মনে উৎকীর্ণ করার উদ্দেশ্যেই বিজ্ঞাপনদাতারা স্লোগান তৈরি করতে উৎসাহী হন। তার ফলে, স্লোগান এমন ভাবে গঠন করা হয় যাতে স্লোগানের শব্দগুলি গ্রাহকদের মনে চকিতে বিজ্ঞাপনের বার্তা জানিয়ে দেয় এবং বিজ্ঞাপিত পণ্যের সম্বন্ধে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করতে সহায়ক হয়। বিজ্ঞাপনের বার্তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং সহজে স্মরণ করিয়ে দেওয়াই স্লোগানের কাজ। স্লোগান যেন বিজ্ঞাপিত পণ্যের বিশেষ চরিত্র বা কার্যকরিতা প্রতিষ্ঠা করে এবং বিজ্ঞাপনের মূল সুর এবং মেজাজ পরিস্ফুট করে।

যে সমস্ত পণ্যের মূল্য বেশি নয় এবং গ্রাহকদের যে সব জিনিস বার বার কিনতে হয়, সেই সব পণ্যের বিজ্ঞাপনবার্তা গ্রাহকদের স্মরণ করানোর জন্য স্লোগান বিশেষ কার্যকরী। গায়ে মাখার সাবানের বিজ্ঞাপনের স্লোগান "চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য সাবান"। পানীয়ের বিজ্ঞাপনের স্লোগান "তুফানী ঠাণ্ডা"। এবং অবশ্যই "আমুল খেলে মালুম হবে মাখন কারে কয়"। আর, আপনারা সবাই জানেন "বাড়ন্ত বাচ্চাদের জন্য—কমপ্লান"।

এইসব উদাহরণের পরিপ্রেক্ষিতে, দেখা যাক ভালো স্লোগান লেখার জন্য কোন কোন বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন।

১. স্লোগান যেন সহজে মনে রাখা যায়।
২. স্লোগান যেন প্রতিযোগী পণ্যগুলি থেকে বিজ্ঞাপিত পণ্যটি আলাদা ভাবে চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়।
৩. গ্রাহকদের কৌতূহল জাগাতে সক্ষম হয়।
৪. স্লোগান যেন পণ্যের কোনো বিশেষগুণ বা কাজের উপরে জোর দেয়, "সার্ফ এক্সেল আছে তো?"
৫. ছন্দ, সুর, অনুপ্রাস ব্যবহার করুন। গ্রাহকদের মনে রাখতে সুবিধে হবে।
৬. স্লোগান যেন গ্রাহকদের বিভ্রান্ত না করে।

এইবারে উপরের দেওয়া স্লোগানের উদাহরণগুলি এই সূত্রাবলী অনুসারে বিশ্লেষণ করে দেখুন।

৬.১৫.৩. প্রতীক

বিজ্ঞাপিত পণ্যটি চিনে নিতে গ্রাহকদের সুবিধার জন্য ট্রেডমার্ক ও স্লোগানের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় রূপকল্পের প্রতীক। যে কোনো পণ্য বা পরিষেবার বিজ্ঞাপনে রূপকল্পের কার্যকরিতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রূপকল্প গ্রাহককে পণ্যটির বা পরিষেবার নাম মনে করিয়ে দেয় এবং সেগুলি কোথায় পাওয়া যাবে তারও নির্দেশ (introduction) দেয়। যেমন ধরুন, কার্টুন স্টাইলে আঁকা একটি ছোটো ছেলের মুখ। কপালের উপর একগুচ্ছ চুল, হাতে রং করবার ব্রাশ। গাট্টুর (কার্টুনের ছেলেটির নাম) এই ছবি দেখলেই আপনার স্মরণে আসবে

এশিয়ান পেন্টস। কোনো দোকানের সাইনবোর্ডে বা দরজার পাশে এই ছবি দেখেই আপনি বোঝেন ঐ দোকানে এশিয়ান পেন্টস-এর রং পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে বিজ্ঞাপনে এই রূপকল্পর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন এবং শিক্ষিত মানুষের হার আমাদের দেশে কম হওয়ায় বিজ্ঞাপনের বার্তা জানাতে রূপকল্প বিশেষ কার্যকরী। লাল ত্রিভুজ দেখেই লোকে বুঝতে পারে পরিবার পরিকল্পনার বিষয় স্মরণ করানো হচ্ছে। এবং পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র কোন বাড়িতে—তাও জানানো হচ্ছে। একটি জ্বলন্ত প্রদীপকে দুপাশ থেকে দুটি হাত আগলে রয়েছে, যেন নিভে না যায়, এই রূপকল্প দেখেই আপনি চিনতে পারেন জীবন বীমা। পরিষেবার নাম এবং প্রয়োজনীয়তা আপনাকে কত সহজে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো।

৬.১৬ রূপকল্পের ব্যবহার (Visual Presentation)

বিজ্ঞাপনের সৃষ্টিশীল চিত্ররূপকেই সাধারণত কারুশিল্প বা বর্ণনাময় চিত্র হিসাবে গণ্য করা হয়। এই চিত্ররূপ কোনো ফোটো গ্রাফও হতে পারে অথবা কোনো অঙ্কিত চিত্রও হতে পারে। যে ধারণা বা বিষয় বিজ্ঞাপনে উপস্থাপিত হয়, সেটি সাধারণত চিত্ররূপ এবং শব্দের সমন্বয়। বিজ্ঞাপনের জ্ঞাপনের বিষয়টি সফল হওয়ার জন্য চিত্ররূপ এবং শব্দের ব্যবহার একে অন্যের পরিপূরক হওয়া একান্ত আবশ্যক। কোনো কোনো বিজ্ঞাপনে শব্দের ব্যবহারই মুখ্য—বিভিন্ন হরফের বিভিন্ন চরিত্রের বৈচিত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের বার্তা জ্ঞাপন করা হয়। আবার কোনো কোনো বিজ্ঞাপনে চিত্রের ব্যবহারই, সে ফোটোগ্রাফেই হোক বা অঙ্কিত ছবিই হোক, মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বিজ্ঞাপনের সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের একই সঙ্গে চিত্ররূপ এবং শব্দের ব্যবহার বিষয়ে চিন্তা করতে হয়। বিষয়লিপি লেখকই হোন অথবা শিল্পীই হোন, চিত্ররূপ এবং শব্দের সমন্বয়ের নিপুণ ব্যবহারে পরদর্শী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনে রূপকল্পের গুরুত্ব বিষয়ে এই সূত্রগুলি মনে রাখা প্রয়োজন ঃ

- রূপকল্প যে কোনো বিষয় সহজে, তাড়াতাড়ি জ্ঞাপন করে।
- কোনো নতুন পণ্য বা বিশেষ পরিচিত নয় এমন পণ্য চেনাতে সহায়ক হয়।
- পণ্যটির যদি দৃষ্টি নন্দন আবেদন থাকে।
- বিজ্ঞাপনের মূল আবেদন যদি আবেগ নির্ভর হয়।
- বাস্তব বিবরণের চেয়ে, একটি বিশেষ মেজাজের বার্তাই সেখানে প্রধান।
- যখন কোনো বিষয় বা পণ্যের মোড়কের সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন।
- যখন তাৎক্ষণিক আবেগের (impulse) প্রভাবে বিক্রি করাই মূল উদ্দেশ্য।

৬.১৬.১ চিত্ররেখার কাজ (Functions of Layout)

বিজ্ঞাপনের চিত্ররেখার কাজ মূলত দু রকমের। প্রথম কাজটি অবশ্যই যান্ত্রিক। বস্তুত বিজ্ঞাপনের চিত্ররূপ একটি পরিকল্পনা বা নকশা, যাতে দেখানো হয় বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন অংশ, যেমন শিরোনাম, বিষয়লিপি, রূপকল্প, কোম্পানির নাম ইত্যাদি বিজ্ঞাপনের কোন জায়গায় কীভাবে উপস্থাপন করা হবে, যাতে বিজ্ঞাপনটি

সার্থকভাবে বার্তা জ্ঞাপন করতে সক্ষম হবে। বিজ্ঞাপনের শিল্পী, বিষয়লিপি লেখকের সঙ্গে আলোচনা করে একাধিক চিত্ররেখা অঙ্কন করেন। বিভিন্ন চিত্ররেখাগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়, কোন চিত্ররেখাটি বিজ্ঞাপনের মূল বার্তা জ্ঞাপন করতে কার্যকরী হবে। কিছু পরিবর্তন এবং পরিবর্জনের পরে একটি বা দুটি চিত্ররেখা নির্বাচিত করা হয়। চিত্ররেখা অনুসারে শিরোনামের হরফ নির্বাচন করা হয়, ছবি হাতে আঁকা হবে না ফোটোগ্রাফ ব্যবহার করা হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের চিত্ররেখার দ্বিতীয় কাজ প্রতীকি বা মনস্তাত্বিক। চিত্ররেখা অনুসারে বিজ্ঞাপন প্রস্তুত করার পরে প্রকাশিত হলে, পাঠকদের মনে যে প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব সৃষ্টি করে, সেটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোনো বিজ্ঞাপন দেখে আপনার মনে হয় কোম্পানিটি ভালো, কাজও করছে ভালো, রক্ষণশীল কোম্পানি। আবার কোনো বিজ্ঞাপন দেখে আপনি অনুভব করেন কোম্পানিটি আধুনিক বা প্রাণবন্ত (dynamic), কত নতুন পণ্য বাজারে এনেছে। কোনো বিজ্ঞাপনে যদি অনেকখানি সাদা জায়গা ছাড়া থাকে, তাহলে আপনার মধ্যে কোম্পানির আভিজাত্য বিষয়ে বিশ্বাস জন্মায়।

৬.১৬.২ চিত্ররেখার প্রস্তুতি

চিত্ররেখার শিল্পীদের বেশির ভাগ সময়ই বিজ্ঞাপনের আকার এবং মাপের সীমাবদ্ধতার বিষয়ে সজাগ থেকে কাজ করতে হয়। বিজ্ঞাপনের মাপ যত বড়ো হবে, খরচ তত বেশি হবে। আর, বিভিন্ন পত্রিকার মাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপনের মাপ নির্ধারিত হয়। নির্ধারিত মাপে এবং আকারে চিত্ররেখা প্রস্তুত করতে হয়। বিষয়লিপি লেখকও শিল্পীকে সহায়তা করেন, তাঁর নিজের চিত্ররেখার ভাবনা শিল্পীকে জানিয়ে এবং তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে। যদিও শিল্পীই বিজ্ঞাপনের চিত্র রেখা প্রস্তুত করেন, বিষয়লিপি লেখকেরও এতে প্রভূত অবদান থাকে।

এবারে আমরা দেখি, বিজ্ঞাপনের চিত্ররেখা প্রস্তুতির বিভিন্ন পর্যায় কী কী?

ছোট্ট করে স্কেচ (Thumb nail sketch)—কোনো চিত্ররেখা প্রস্তুত করার সময় বেশির ভাগ শিল্পীই তাঁর চিত্ররেখার ভাবনা অনেক ছোটো আকারে খসড়া করেন। সাধারণত এই ছোটো আকারের স্কেচ প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপনের এক-চতুর্থাংশ বা এক-অষ্টমাংশ মাপে করা হয়ে থাকে। শিল্পী তাঁর কল্পনা এবং প্রস্তাব অনুযায়ী অনেকগুলি ছোটো আকারের স্কেচ তৈরি করেন। এতে সুবিধা এই যে, বিভিন্ন স্কেচের মধ্যে যে যে চিত্ররেখার স্কেচ বেশি কার্যকরী হবে বলে মনে হয় সেইগুলিকেই নির্বাচন করা হয় বড়ো করে, সঠিক আকারে এবং মাপে রূপ দেওয়ার জন্য।

খসড়া চিত্ররেখা (Rough layout)—নির্বাচিত কয়েকটি ছোটো স্কেচ অনুসারে বিজ্ঞাপনের খসড়া চিত্ররেখা প্রস্তুত করা হয়। মনে রাখতে হবে খসড়া চিত্ররেখা ছোটো আকারে হয় না। বিজ্ঞাপনের প্রস্তাবিত আকার এবং মাপ অনুসারেই খসড়া চিত্ররেখা প্রস্তুত হয়। বিজ্ঞাপনের শিরোনাম কতটা জায়গা জুড়ে, কীরকম হরফে যাবে এবং চিত্রের ব্যবহার কীরকম হবে, খসড়া চিত্ররেখায় এই সব খুঁটি নাটি বিষয় পেন্সিলের স্কেচের সাহায্যে দেখানো হয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি, বিজ্ঞাপনে কোন প্রতীক, স্লোগান এবং নাম কোন জায়গায় কীভাবে দেওয়া হবে, তারও নমুনা থাকে, অবশ্য পেন্সিলের মোটা দাগে। সাধারণত একটি প্রস্তাবিত

বিজ্ঞাপনের জন্য একাধিক খসড়া চিত্ররেখা তৈরি হয়। তারপর অনেক বিশ্লেষণ এবং আলোচনার পরে স্থির হয়, কোন কোন খসড়া চিত্ররেখা অবলম্বনে বিজ্ঞাপনটির পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া হবে, যাতে বিজ্ঞাপনটি প্রভাব সৃষ্টি করতে সফল হয়।

সম্পূর্ণ রূপ (Comprehensive)—খসড়া চিত্ররেখাগুলির বিকল্প থেকে একটি বা দুটি নির্বাচিত খসড়া চিত্ররেখার সম্পূর্ণ রূপ দেওয়া হয়। এবারে, বিজ্ঞাপনের শিরোনাম ঠিক যে রকম হরফে খসড়া করা হয়েছে, সেই নির্দিষ্ট হরফে সাজানো হয়। চিত্ররূপের খসড়া অনুসারে ছবির পরিপূর্ণ রূপ অথবা ফোটোগ্রাফ জোড়া

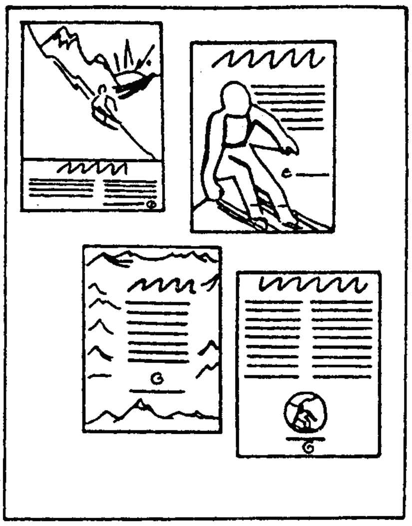

ছোট্ট করে স্কেচ

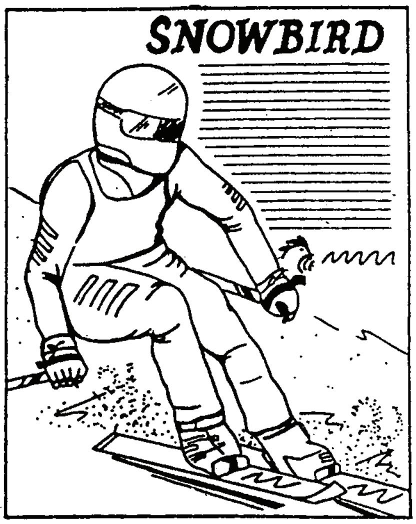

খসড়া চিত্ররেখা

হয়। প্রস্তাবিত চিত্ররেখা অনুসারে পেশাদার ফোটোগ্রাফার ফোটো তোলেন। খসড়ায় যেমন দেখানো আছে, ঠিক সেই রকম পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক, মডেল এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক ব্যবহার করে ফোটোগ্রাফি করা হয়।

৬.১৬.৩ চিত্ররেখার রকমারি

বিজ্ঞাপনে অনেক রকমের চিত্ররেখা ব্যবহার করা হয়। বিজ্ঞাপিত পণ্য, পণ্যের ব্যবহার, ব্যবহারকারী বা গ্রাহক এবং কী ধরনের প্রভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন করা হচ্ছে, সব কিছু বিবেচনা করে চিত্ররেখা প্রস্তুত এবং নির্বাচন করা হয়। চিত্ররেখার বিভিন্ন শ্রেণি বিন্যাস হিসাবে মোট ছয়টি মূল আকারের চিত্ররেখার প্রস্তাব বর্তমান ঃ

১. সাধারণ মানের চিত্ররেখা (standard layout)—এই চিত্ররেখায় শিরোনাম, চিত্ররূপ বিষয়লিপি, বিজ্ঞাপনদাতার নাম সবই সমান প্রাধান্য পায়।

২. সম্পাদকীয় চিত্ররেখা (editorial layout)—বিজ্ঞাপনটি কোনো পত্রিকার সম্পাদকীয় রচনার মতো আকার নেয়।

৩. পোস্টার চিত্ররেখা (poster layout)—বিজ্ঞাপনের সম্পূর্ণ গুরুত্ব রূপকল্পের উপর দেওয়া হয়।

৪. কার্টুন চিত্ররেখা (cartoon layout)—যে বিজ্ঞাপনে গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কোন কার্টুন চিত্র ব্যবহার করা হয়।

৫. ছবি এবং শিরোনাম এর চিত্ররেখা (picture caption layout)—বিজ্ঞাপিত পণ্য এবং পরিষেবা উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন চিত্র এবং শিরোনাম এর ব্যবহার।

৬. একগুচ্ছ ছবির চিত্ররেখা (picture cluster layout) একসঙ্গে অনেকগুলি চিত্র ব্যবহার করে পণ্য বা পরিষেবার বিষয়ে একটি বিশেষ বক্তব্য গ্রাহকদের সামনে তুলে ধরা।

৬.১৬.৪ কার্যকরী চিত্ররেখার কী কী গুণ আবশ্যক

বিজ্ঞাপনের চিত্ররেখার ঠিক কী কী গুণ থাকা আবশ্যক সে বিষয়ে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। তবে বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য এবং কার্যকরীতার বিষয় বিবেচনা করে কতকগুলি নির্দেশিকা মেনে চলা ভালো।

১. বিজ্ঞাপনে কোনো ছবি বা ফোটোগ্রাফ ব্যবহার করলে ছবিটি যেন বিজ্ঞাপনের অর্ধেকের বেশি জায়গা জুড়ে রাখা হয়। অর্থাৎ, এই চিত্ররেখায় ছবিই প্রাধান্য পায়। প্রসাধন, জামা-কাপড় বা কোনো ফ্যাশনেবল পণ্যের বিজ্ঞাপনে এই চিত্ররেখা বিশেষ কার্যকরী হয়।

২. বেশির ভাগ বিজ্ঞাপনেই শিরোনাম সাধারণত বিজ্ঞাপনের শতকরা ১৫ ভাগ জায়গা জুড়ে থাকে। সাধারণত বিজ্ঞাপনের ছবির নিচে এবং বিষয়লিপির উপরে শিরোনাম অবস্থান করে। মূল শিরোনাম যদি ছবির উপরে থাকে, তাহলে ছবির নিচে একটি উপ-শিরোনাম থাকলে, বিষয়লিপির সঙ্গে সংযোগের সুবিধা হয়।

৩. পণ্যের নাম যদি বিজ্ঞাপনের শিরোনামেই স্পষ্টভাবে না দেওয়া থাকে, অথবা ছবির সঙ্গে না দেওয়া হয়, তাহলে নামটি বিজ্ঞাপনে সুস্পষ্টভাবে দিতে হবে। হরফের মাপ, বৈপরিত্যের ব্যবহার অথবা চারধারে সাদা জায়গা ছেড়ে পণ্যটির নাম অথবা নাম সমেত মোড়কটি দেখানো প্রয়োজন।

৪. একই চিত্রকল্প বা প্রতীক বারবার ব্যবহার করলে, গ্রাহকদের পণ্যটি স্মরণ করতে সুবিধা হয়।

৫. বিজ্ঞাপনের চারধারে বর্ডার থাকলে পত্রিকাটির অন্যান্য অংশ থেকে বিজ্ঞাপনটিকে আলাদা করে দেখার সুবিধা হয়।

৬. বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত বিভিন্ন হরফের চারিত্রিক সাদৃশ্য পাঠককে জানিয়ে দেয়, এটি একটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপন।

- **ভারসাম্য**

প্রতিটি বিজ্ঞাপনে ভারসাম্য একটি ভূমিকা পালন করে। আপনি যখন কোনো বিজ্ঞাপন দেখেন, সেই বিজ্ঞাপনটির ভারসাম্য বজায় থাকলে, আপনার চোখের পক্ষে বিজ্ঞাপনের উপর থেকে নীচের অংশে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করা সম্ভব। ভারসাম্য না থাকলে বিজ্ঞাপনটি আপনার চোখে বাঁকা মনে হবে। ভারসাম্যহীন বিজ্ঞাপন দেখলে আপনার মনে হতে পারে, বাঁ দিকটা বেশি ভারী দেখাচ্ছে, তুলনায় ডান দিকটি হালকা মনে হচ্ছে। অথবা এর বিপরীত। পাঠকের চোখে স্বচ্ছন্দ মনে না হলে, বিজ্ঞাপনের পক্ষে যথার্থ আবেদন সৃষ্টি করা কঠিন। চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার আগে, চোখে দেখে পরীক্ষা ক'রে, শিরোনাম বা রূপকল্পের জায়গা পরিবর্তন ক'রে, অথবা হরফের চরিত্র বদল করে চিত্ররেখার ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। ভারসাম্য রক্ষার জন্যই বিজ্ঞাপনের সমস্ত উপাদানগুলি সমান্তরাল হিসাবে অথবা লম্ব হিসাবে সাজানো হয়ে থাকে। বিজ্ঞাপনে ভারসাম্য রক্ষার জন্য সাধারণত দুই ধরনের ভারসাম্য প্রয়োগ করা হয়। একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ভারসাম্য, অপরটি সামঞ্জস্যবিহীন ভারসাম্য।

সামঞ্জস্যপূর্ণ ভারসাম্য সাধারণত নিয়মমাফিক, গতানুগতিক এবং স্থির আর সেই কারণেই অনেকে এই ভারসাম্যকে নীরস বলেন। সামঞ্জস্যহীন ভারসাম্যের চিত্ররেখার বৈচিত্র্য বেশি, ফলে অধিক আকর্ষণীয় এবং গতিশীল বলে পাঠকদের চোখে প্রতিভাত হয়। সামঞ্জস্যহীন ভারসাম্যের চিত্ররেখা প্রস্তুত করা কঠিন। কারণ, আপাতদৃষ্টিতে সামঞ্জস্যহীন মনে হলেও ভারসাম্য রক্ষার জটিল প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। তবে, এই চিত্ররেখার কার্যকারিতা অনেক বেশি।

- **গতি**

চিত্ররেখার ভারসাম্য পাঠকের সামনে একটি বিশেষ প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করে। আর গতি—চিত্ররেখায় পাঠকের চোখ কীভাবে বিচরণ করবে, সেই পথ নির্ধারণ করে। বিজ্ঞাপনের চিত্ররেখা পাঠকের চোখের জন্য পথ-নির্দেশিকা। জানিয়ে দেয়, কোথায় শুরু ক'রে, পর পর কোন কোন বিষয় অতিক্রম করে, কোথায় সমাপ্তি।

বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে চোখের সঞ্চারণ রীতি আপনাদের দৈনন্দিন জীবনে চোখের সঞ্চারণ রীতি অনুসারেই গঠিত। আপনি যখন কিছু পড়েন, তখন সাধারণত উপর থেকে নিচের দিকে অথবা বাঁদিক থেকে ডানদিকে পড়েন। আপনার চোখ ছোটোবেলা থেকেই এই সঞ্চারণ রীতিতে অভ্যস্ত। বিভিন্ন গবেষণা ক'রে জানা গেছে, বেশির ভাগ লোকই উপরে, বাঁদিক থেকে পড়তে শুরু করেন এবং নিচে, ডান দিকে এসে পড়া শেষ করেন।

বিজ্ঞাপনের পাঠকের চোখের সঞ্চারণ রীতিও একই রকম এবং বিজ্ঞাপনের রেখাচিত্রে বিভিন্ন বিষয়ের বিন্যাস এই রীতি অনুসারেই করা হয়। সবচেয়ে সরল সঞ্চারণের রেখাচিত্র ডায়াগোনাল অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের উপরের বাঁ দিক থেকে নিচে ডান দিক পর্যন্ত একটি কোণাকুনি রেখা ধরে রেখাচিত্রের বিন্যাস। গুটেনবার্গ

ডায়াগোনাল। এরই আরো জটিল ব্যবহার জেড (Z) আকার। এই রেখাচিত্রে আপনার চোখ উপরে বাঁদিক থেকে দেখা শুরু করে ডান দিকে সরে যায়। তারপরে আবার নিচে নেমে বাঁদিক থেকে শুরু করে পুনরায় ডানদিকে নিচের দিকে যায়।

কখনো কখনো বিজ্ঞাপনের মুখ্য অংশই পাঠকের চোখের সঞ্চারণনের শুরু হিসাবে গণ্য হয়। মুখ্য অংশ থেকে কুণ্ডলীর আকারে (spiral) উপরে চলে যায়। তারপরে বাঁদিকে নেমে এসে আবার ডান দিকের কোণায় শেষ হয়। আর একটি সরল সঞ্চালন—একটি লম্ব (vertical) রেখা অনুসারে উপর থেকে নিচে।

চিত্ররেখার একাধিক অংশ যাতে একই সঙ্গে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বিভ্রম সৃষ্টি না করে, সেই উদ্দেশ্যেই গতিপথের এই নির্দেশিকা। কখনো-কখনো বিজ্ঞাপনের মধ্যে সুনির্দিষ্ট গতিপথ দেখানো হয়। যদি কোনো ছবি থাকে একজন ফুটবল খেলোয়াড় গোলের দিকে শট করছেন তাহলে আপনার চোখ বলটিকে অনুসরণ করবে। বিজ্ঞাপনের চিত্ররেখায় গতিনির্দেশের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে চিত্ররেখা প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের চিত্ররেখা কীভাবে প্রস্তুত হয়, সে বিষয়ে আপনাদের ধারণা হয়েছে। সাধারণত কতকগুলি নির্দিষ্ট আকার হিসাবে বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনা এবং চিত্ররেখা প্রস্তুত করা হয়।

পিকচার উইনডো (Picture window)—এই চিত্ররেখায় মূলত চিত্র-নিদর্শন (illustration) কেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

কপি হেভি (Copy Heavy)—আর একটি সাধারণ চিত্ররেখা। বড়ো হরফের শিরোনাম, দীর্ঘ বিষয়লিপি, সাধারণত দু কলমে ভাগ করা। বলা হয় সংবাদের ঘোষণার অনুরূপ।

ফ্রেম (Frame)—কপি হেভি চিত্ররেখারই এটি ভিন্ন রূপ। বড়ো বিষয়লিপির চারধারে নকশা বা ছবি সাজিয়ে, বিষয় লিপিটি একটি বর্ডার বা ফ্রেমের মধ্যে স্থাপন করা। ফ্রেমটি পণ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন ছবির সমাহারও হয়।

গ্রিড (Grid)—এই রেখাচিত্রে বিভিন্ন ছবি এবং বিষয়লিপি একটি জ্যামিতিক পদ্ধতিতে বিন্যাস করা হয়। বিষয়লিপিটি ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার ক'রে বিভিন্ন চিত্র উপরের দিকে সারবদ্ধভাবে রাখা হয়। কোনো বিজ্ঞাপনে অনেক বিষয় দেখানোর প্রয়োজন হলে যেমন ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ক্ষেত্রে, এই চিত্ররেখা ব্যবহার করা হয়।

এই গ্রিড চিত্ররেখারই আর একটি বৈচিত্র মনড্রিয়ান চিত্ররেখা। বিশ শতকের চিত্রকর মনিড্রিয়াল নিখুঁত সমানুপাতের বিভিন্ন আকৃতির ব্যবহার করে একটি জ্যামিতিক শিল্প আঙ্গিক ব্যবহার করেন। বিভিন্ন মাপের চতুর্ভূজ ছবির ব্যবহার চিত্ররেখাকে প্রায় ধাঁধার পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে পাঠকের কৌতূহল সৃষ্টি করে। বিজ্ঞাপনে বিভিন্ন উপাদানের প্রদর্শনের প্রয়োজন থাকলে, এই চিত্ররেখা ব্যবহার করা হয়।

প্যানেল (Panel)—গ্রিড চিত্ররেখার আর একটি বৈচিত্র প্যানেল চিত্ররেখা। একই মাপের পর পর কয়েকটি ছবি সারিবদ্ধভাবে অথবা উপর থেকে নিচে সাজানো হয়। পণ্য বা পরিষেবার বিভিন্ন পর্যায়ের ছবি অথবা বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন উপাদানের ছবি ব্যবহার করা হয়। একই পণ্যের বিভিন্ন ব্যবহারও এই চিত্ররেখায় দেখানো যেতে পারে।

সিল্যুট (Silhoute)—এই চিত্ররেখা নিয়মমাফিক চিত্ররেখা নয়। ছবি এবং বিষয়লিপি এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যাতে একটি বিশেষ আকার ধারণ করে। নিয়মের ব্যতিক্রমী, একটি অস্বাভাবিক আকৃতির সৃষ্টি ক'রে পাঠকদের মনে প্রভাব সৃষ্টি করা হয়।

জামবল (Jumble) চিত্ররেখা—এই চিত্ররেখার আর একটি নাম সার্কাস চিত্ররেখা। নামেই বুঝতে পারছেন বিভিন্ন আকারের একাধিক ছবি এবং বিষয়লিপির জটিল অবস্থানের সাহায্যে পাঠকের মনে একটি চটপটে, নিয়ম ব্যতিরেক মেজাজের আবদেন করা হয়। কিন্তু চিত্ররেখার মধ্যে ভারসাম্য এবং সামঞ্জস্য বজায় রাখতেই হয়। এই ধরনের চিত্ররেখা সৃষ্টি করা বেশ কঠিন।

এই সব ছাড়াও আরো অসংখ্য রকমের চিত্ররেখা সৃষ্টি করা সম্ভব, বৈচিত্রের জন্য, পাঠকের মনে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টির জন্য। সব সময়ে ধরা বাঁধা নিয়ম মেনে করা যায় না। কিন্তু চিত্ররেখার মূল সূত্রগুলি যেমন, ভারসাম্য ইত্যাদি মানতেই হয়।

৬.১৭ হরফের ব্যবহার

মুদ্রিত বিজ্ঞাপন বলতে আমরা বুঝি কতকগুলি শব্দ এবং ছবির একত্র উপস্থাপন। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা এমন সরল নয়। আপনারা জানেন, একটি বিজ্ঞাপনের প্রস্তুতির পিছনে কত রকমের ভাবনা চিন্তা এবং পরিকল্পনা থাকে। বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি সংক্রান্ত আলোচনায় বিজ্ঞাপনের শিরোনাম এবং রূপকল্পের যুগলবন্দির বিষয় জানা হয়েছে। বিজ্ঞাপনের শিরোনামের শব্দগুলি কেবলমাত্র শব্দ সমষ্টি নয়। বিজ্ঞাপনের হরফ, চিত্রের সঙ্গে একাত্মভাবে একটি বিশেষ বার্তা, আবেগ ও মেজাজ উপস্থাপন ক'রে গ্রাহকের মনে প্রভাব সৃষ্টি করে। এই কাজে শিরোনাম এবং বিষয়লিপিতে যে সব হরফের ব্যবহার করা হয়, সে হরফগুলিরও একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। বিজ্ঞাপনে প্রচারিত পণ্য বা পরিষেবার চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে হরফ চরিত্র নির্দিষ্ট করা হয়। আপনারা দেখেছেন, কোনো পারফিউম বা সুগন্ধীর বিজ্ঞাপনে সাধারণত কোনো রোমান্টিক অনুভূতি জাগানো ছবি থাকে। এই বিজ্ঞাপনে যে হরফ ব্যবহার করা হয়, সেগুলি ছিমছাম, সৌখিন চরিত্রের অর্থাৎ বিজ্ঞাপিত পণ্য এবং বিজ্ঞাপনের মুল আবেদনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে হরফের চরিত্র নির্বাচন করা হয়। আবার দেখবেন, কোনো টায়ারের বিজ্ঞাপনে সাধারণত মোটা, বড়ো, সূক্ষ্ম নয়, এমন চরিত্রের হরফ ব্যবহার করা হয়। টায়ারের বিজ্ঞাপনে শক্তি এবং নির্ভরতার আবেদন সৃষ্টি করার জন্যই এই ধরনের হরফ চরিত্র ব্যবহার করা হয়। বিজ্ঞাপনে পণ্যের চরিত্র, ব্যবহাকারীর প্রয়োজন, আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে হরফ চরিত্র।

বহুদিন ধরে বিজ্ঞাপনে যে সব হরফ ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলির অনেক নাম আছে। যেমন সেরিফ, গিলস, রোমান, হেলভেটিকা, অপটিমা ইত্যাদি। প্রতিটি হরফেরই ইংরাজী ভাষার রীতি অনুযায়ী বড়ো করে লেখা (Capital) এবং ছোটো করে লেখা (Small) হরফ আছে। প্রতিটি হরফই বিভিন্ন মাপের হয়ে থাকে। হরফের এই মাপ নির্দিষ্ট করা হয় ফন্ট-এর পয়েন্টের হিসাবে। যেমন ৮ পয়েন্ট, তার চেয়ে বড়ো ১০ পয়েন্ট, আরো বড়ো ১২ পয়েন্ট, এইভাবে ১৪, ১৬, ১৮, ২০, ২২ এই মাপের হিসাবে অক্ষর বড়ো

হতে থাকে। বিজ্ঞাপনের চিত্ররেখা এবং বিষয়লিপি অনুসারে, যেখানে যেমন মাপের হরফের প্রয়োগ যথাযথ বলে বিবেচিত হয়, তেমনই ব্যবহার করা হয়। একই হরফের, একই মাপের নানারকম চরিত্র হতে পারে—

Sans Serif :

Futura Bold

Oldstyle Roman :

Administer Book

Transitional Roman :

Century

Square Serif :

Lubalin Graph

Round Serif :

Cooper Black

Inscribed Serif :

Optima

বিজ্ঞাপনে সাধারণত যে সব হরফ ব্যবহার হয়

Serif :

AM

Sans Serif :

AM

সেরিফ - সেরিফ ব্যতিরেকে

x-neight :

cemnorsuvwz

ascenders :

bdfhklt

descenders :

gjpqy

হরফের উচ্চতা সাধারণ অরোহিত - অবনমিত

Helvetica

Helvetica italic

স্বাভাবিক ইটালিকস

This is Triumvirate Light

This is Triumvirate Light

This is Triumvirate Light

This is Triumvirate Light

This is Triumvirate Light

একই হরফের বিস্তার ও গুরুত্ব হিসাবে বৈচিত্র

উপরের ছবিটিতে দেখছেন একই হরফ চরিত্রের কত বিচিত্র আকার হতে পারে।

যেহেতু বর্তমানে কম্পুটারের হরফ ব্যবহার করা হয়, সেই কারণে, এই সব হরফের বিস্তারিত আলোচনা না ক'রে বিজ্ঞাপনে হরফের ব্যবহারের মূলসূত্রগুলি ও নির্দেশিকা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

অক্ষর সাজানো ঃ

প্রতিটি অক্ষরের চারপাশে কতটা মুক্তবাতাস বা সাদা জায়গা থাকলে পাঠক পড়তে আগ্রহ বোধ করবেন এবং স্বচ্ছন্দে পড়তে সক্ষম হবেন। কোন মাপের অক্ষর ব্যবহার করলে কতটা সাদা জায়গা রাখা প্রয়োজন, চিত্ররেখা রচয়িতাকে বিশেষ বিবেচনার সঙ্গে সেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এছাড়া, বিজ্ঞাপনের রেখাচিত্রের ঠিক কোনখানে কতটা জায়গা নিয়ে শব্দ সাজানো হচ্ছে, তার উপরে নির্ভর করে অক্ষরের চারপাশে ফাঁকা জায়গার অবস্থান কতটা প্রয়োজন। যাঁরা চিত্ররেখা প্রস্তুত করেন এবং যাঁরা বিজ্ঞাপন সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের অভিজ্ঞ চোখই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপযুক্ত মাপকাঠি।

সহজপাঠ্য হবে ঃ

বিজ্ঞাপনে যে সব হরফ ব্যবহার করা হবে সেগুলি যেন পাঠকের পক্ষে সহজপাঠ্য হয়। আমরা বার বার আলোচনা করেছি আপনি যখন সংবাদপত্র পড়েন, তখন সংবাদ জানার জন্যই পড়েন। আপনার সংবাদ পড়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে যে যে বিজ্ঞাপন আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়, সেই বিজ্ঞাপনগুলিই আপনি দেখেন। শিরোনাম এবং বিষয়লিপিতে হরফের ব্যবহার যদি এগুলিকে সহজপাঠ্য না করে, তাহলে বিজ্ঞাপনটি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে কেমন করে?

লাইন কতো বড়ো হবে?

আগেই আলোচনা হয়েছে, হরফ চরিত্র এমন হবে এবং এমনভাবে ব্যবহার করা হবে যাতে গ্রাহকদের চোখে বিজ্ঞাপনটি সহজপাঠ্য হয়। শিরোনাম বা বিষয়লিপি যদি বিজ্ঞাপনের এক পাশ থেকে অপর প্রান্ত অবধি দীর্ঘ হয় তাহলে গ্রাহকের চোখ ক্লান্তি বোধ করে। আবার, দুটি লাইনের মধ্যে পার্থক্য বা জায়গা এমন হওয়া প্রয়োজন, যাতে গ্রাহকের পড়তে আগ্রহ হয় এবং অসুবিধা না হয়। বিষয়লিপি এমনভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন যাতে গ্রাহকের পড়তে আগ্রহ হয়। হরফের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য। বিষয়লিপি দীর্ঘ হলে, ছোটো ছোটো প্যারাগ্রাফে ভাগ করে দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়। কিন্তু ভাগের জন্য ছোটো ছোটো শিরোনাম বা চিত্রকল্প ব্যবহার করতে পারলে আরো ভালো।

অল ক্যাপ (All caps) শিরোনামে বা বিষয়লিপিতে কেবল বড়ো হরফ ব্যবহার করলে পড়তে অসুবিধে হয়। অনেকে গুরুত্ব দেওয়ার উদ্দেশ্যে সমস্ত বড়ো হরফ ব্যবহার করেন, কিন্তু তার ফল ভালো নয়। দৈনন্দিন জীবনে আপনি বড়ো হরফ এবং ছোটো হরফ এর মিশ্রিত লেখা পড়তে অভ্যস্ত। সেই কারণে, কেবলমাত্র বড়ো হরফ ব্যবহার করলে, গুরুত্ব দেওয়ার পরিবর্তে, বিজ্ঞাপনের পাঠযোগ্যতা কমে যায়।

বিপরীত (Reverse) সাধারণত সাদা কাগজে কালো অক্ষর পড়তেই আমরা অভ্যস্ত। কাজেই এর বিপরীত অর্থাৎ কালোর উপর বা গাঢ় নীল রঙের উপরে সাদা অক্ষর পড়তে আমরা স্বাচ্ছন্দ বোধ করি না। তার উপরে, মুদ্রণ যদি নিখুঁত না হয়, তাহলে বিপরীত বা সাদা অক্ষর পড়তে আরো বেশি অসুবিধে হয়। সাধারণত বিপরীত অক্ষর ব্যবহার না করাই ভালো। অবশ্য খুব বড়ো মাপের শিরোনামে বিপরীত অক্ষর ব্যবহার করা যেতে পারে।

বিপরীত গোত্রের রং (Contrast) ঃ

কোন রঙের পশ্চাতপটে কোন বিশেষ রঙের শিরোনাম বা বিষয়লিপি আকর্ষণীয় হবে, পড়বার আগ্রহ সৃষ্টি করবে, সে বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করা প্রয়োজন। বিভিন্ন রঙের তুলনামূলক বৈপরিত্য বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। অন্যথায় শিরোনাম এবং বিষয়লিপি পড়তে অসুবিধে হয়। বিজ্ঞাপনের সাফল্যের প্রতিবন্ধক হয়।

ছবির উপরে লেখা (Superprinting) ঃ

কোনো কোনো শিল্প নির্দেশক বিজ্ঞাপনের ছবির উপরেই শিরোনাম বা বিষয়লিপি দিতে চান। এক্ষেত্রেও আগের প্যারাগ্রাফের আলোচনার সূত্র ধরেই বলতে হবে, ছবির বিষয় এবং রং যদি শিরোনাম বা বিষয়লিপির পশ্চাতপট হিসাবে বাধা সৃষ্টি না করে, তবেই এইভাবে শিরোনাম এবং বিষয়লিপি দেওয়া যেতে পারে। নাহলে, গ্রাহকের পক্ষে পড়তেও অসুবিধে হয়, আবার ছবিটির দুরত্বও ব্যাহত হয়।

৬.১৮ চিত্র নিদর্শন (Illustration)

বিজ্ঞাপন প্রক্রিয়া ভাবমূর্তির উপর নির্ভরশীল। ভাবমূর্তি গড়ে পেলে, গ্রাহকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রূপকল্প। রূপকল্প যতো তাৎপর্যপূর্ণ এবং আবেদনমূলক হবে, ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং তার প্রভাব ততো বেশি কার্যকরী হবে। রূপকল্পের সাহায্যে জ্ঞাপন প্রক্রিয়াই বিজ্ঞাপনের জ্ঞাপন প্রক্রিয়ার মূখ্য কর্ম। এমনকী রেডিও শ্রবণমাধ্যমের দ্বারা বিভিন্ন শব্দের সাহায্যে শ্রোতার মনে একটি চিত্রকল্প গড়ে তোলা হয়।

আমাদের উপলব্ধি গড়ে ওঠে মূলত বিভিন্ন ইন্দ্রিয় সঞ্জাত অভিজ্ঞতার সমষ্টি হিসাবে। আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতার মধ্যে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাই বেশি প্রভাবশালি। গবেষকদের মতে আমরা যে সকল বার্তা সংগ্রহ করি, তার শতকরা আশি ভাগই চক্ষু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করি। শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করি শতকরা চোদ্দ ভাগ অভিজ্ঞতা। আর, বাকি তিনটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মোট ছয় শতাংশ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়।

এই কারণে, বিজ্ঞাপনে চিত্র নিদর্শনের ব্যবহারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপন বার্তা গ্রাহকের মনে যাতে সার্থকভাবে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই চিত্র নিদর্শনের ব্যাপক ব্যবহার করা হয়। চিত্র নিদর্শন বিজ্ঞাপনের কার্যকরিতা বৃদ্ধি করে।

ক. উদ্দীষ্ট গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোনো কোনো চিত্র নিদর্শন সহজেই গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চিত্রটিই গ্রাহককে জানায়, 'আপনার এই সুবিধায়' নিশ্চয় আগ্রহ আছে। কোনো কোনো চিত্রনিদর্শন পাঠকের কোনো সমস্যার সমাধান জানিয়ে দেয়। কোনো সৌন্দর্য সচেতন তরুণী একটি বিশেষ ফেস ক্রিমের ব্যবহার বোঝানো চিত্র-নিদর্শন ভালো করে দেখতে আগ্রহী হবেন। আবার কোনো খাদ্যরসিক 'জিভে-জল-আনা' এক প্লেট খাবারের চিত্রনিদর্শনে সহজেই আকৃষ্ট হবেন। অনেকগুলি শব্দের সাহায্যে ব্যাখ্যা না ক'রে একটি চিত্রনিদর্শনের সাহায্যে কোনো বার্তার প্রতি গ্রাহকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং বার্তা জ্ঞাপন করা চিত্র-নিদর্শনের দ্বারা সহজেই সম্পন্ন করা সম্ভব। চিত্র নিদর্শন ব্যবহার করার সময় লক্ষ্য রাখতে হয়, যেন

চেষ্টাকৃতভাবে নয়,, স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে গ্রাহক সেটি দেখতে আগ্রহ বোধ করেন। যে পণ্য বা পরিষেবার বিজ্ঞাপন করা হচ্ছে, তার সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনো চিত্র-নিদর্শন ব্যবহার করা অর্থহীন।

অদ্ভুত কোনো চিত্র-নিদর্শনের দ্বারা সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে কোনো লাভ হয় না। বেবি পাউডারের বিজ্ঞাপনে একটি শিশুর চিত্র-নিদর্শনের সাহায্যে পণ্যটি এবং তার ব্যবহারকারীকে চিহ্নিত করা যায়। এবং এই ক্ষেত্রে উদ্দীষ্ট গ্রাহকদের অর্থাৎ শিশুর মায়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। চিত্র-নিদর্শন সার্থক ভাবে ব্যবহার করার জন্য পণ্য এবং বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপির সঙ্গে একাত্মবোধক হওয়া প্রয়োজন।

খ. কোনো একটি জটিল বিষয়কে গ্রাহকদের কাছে সহজবোধ্য করে তোলে। বিজ্ঞাপনের সুচনাকাল থেকেই চিত্র নিদর্শন জ্ঞাপন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকল্পের ব্যবহার আরো ব্যাপক হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণার ফলে জানা গেছে, চিত্রনিদর্শন যে কোনো বিশেষ ধারণা গ্রাহকদের সহজে জানিয়ে দিতে শব্দের চেয়েও বেশি কার্যকরী। বিশেষ করে, বিজ্ঞাপনে যখন কোনো পণ্যের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করাই মুখ্য উদ্দেশ্য তখন চিত্রনিদর্শন বিজ্ঞাপনদাতার বিশেষ সহায়ক। আপনারা বিজ্ঞাপনে দেখেছেন, বৃষ্টি পড়ছে; একটি ছাতার নিচে তরুণ তরুণী খুশিতে উচ্ছল। 'মেড ফর ইচ আদার।' এই চিত্র নিদর্শন যে ভাবমূর্তি সহজেই গ্রাহকের মনে বার্তা পৌঁছে দেয়, অনেকগুলি শব্দের ব্যবহার করেও এই ফল পাওয়া সম্ভব নয়।

আপনারা দেখেছেন, একটি ফেস ক্রিমের বিজ্ঞাপনে দেখানো হয়, সাধারণ ক্রিম ব্যবহার করলে মুখের কোমল ত্বকের ঠিকমতো পরিচর্যা হয় না। ঐ বিশেষ ক্রিমটি কীরকম কার্যকরী, চিত্রের সাহায্যে উদাহরণ দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়। এই জটিল বক্তব্য কেবলমাত্র কয়েকটি চিত্রের সাহায্যে সহজেই গ্রাহককে বোঝানো সম্ভব।

গ. শিরোনাম এবং বিষয়লিপি পড়ার জন্য গ্রাহকের আগ্রহ সৃষ্টি করে। যথার্থ কার্যকরী চিত্র নিদর্শন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে তাকে প্রায় বাধ্য করে বিজ্ঞাপনের শিরোনাম ও বিষয়লিপি পড়তে। অর্থাৎ, চিত্র-নিদর্শন এমন ভাবে গ্রাহকের আগ্রহের এবং কৌতূহলের বিষয় তুলে ধরবে, যাতে গ্রাহক বিজ্ঞাপনটির শিরোনাম এবং বিষয়লিপি পড়তে উৎসাহিত বোধ করবেন।

ঘ. চিত্র-নিদর্শন বিজ্ঞাপনের বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। অর্থাৎ, চিত্র-নিদর্শন বিশ্বাসযোগ্য হওয়া আবশ্যক। কথায় বলে, চাক্ষুষ দেখলে, বিশ্বাস হয়। কোন শার্ট বা সালোয়ার কামিজের ডিজাইন, রং এবং স্টাইল কত আধুনিক, চিত্র-নিদর্শনে ঠিকমতো দেখাতে পারলে গ্রাহকের মনে বিশ্বাস জাগায়। কিন্তু চিত্র-নিদর্শনে যদি দেখানো হয়, কোনো মহিলা খুব সাজগোজ ক'রে এবং দামী কাপড় পরে রান্না করছেন বা কাপড় কাচছেন, গ্রাহকরা এই চিত্র-নিদর্শনকে অবাস্তব এবং অবিশ্বাস্য বলে অগ্রাহ্য করবেন। যে কোনো চিত্র-নিদর্শনই বিশ্বাসযোগ্যতা হীন হলে, অর্থহীন হয়ে পড়ে।

৬.১৮.১ শ্রেণি বিভাগ

বিজ্ঞাপনে চিত্র-নিদর্শনের শ্রেণিবিভাগ হয় বিষয়বস্তুর নিরিখে অথবা কলাকৌশলের তারতম্যের হিসাবে।

বিষয়বস্তুর নিরিখে চিত্র-নিদর্শন বাস্তবসম্মত বা বিমূর্ত হতে পারে অথবা আরো নির্দিষ্টভাবে পণ্যকেন্দ্রিক হতে পারে।

অভিজ্ঞ বিজ্ঞাপন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বিজ্ঞাপনের চিত্র-নিদর্শন বাস্তবসম্মত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। চিত্র-নিদর্শন ও বিজ্ঞাপনের চিত্ররেখার অনুরূপ একটি বিশেষ আবেগ বা মেজাজ প্রতিষ্ঠা করে। আমাদের ট্যুরিজম বিভাগের দার্জিলিং-এর বিজ্ঞাপনে আপনারা দেখেছেন চারদিকে অসংখ্য সবুজ পাহাড়ের সারি, সবার উপরে তুষার মৌলী, স্বর্ণাভ কাঞ্চনজঙ্ঘা। এই চিত্র-নিদর্শন দেখে আপনার মনে দার্জিলিং ভ্রমণের ইচ্ছা জাগে। এই কারণেই বিজ্ঞাপনের চিত্র-নিদর্শনে বাস্তব-সম্মত চিত্র ব্যবহার করাই ফলপ্রদ। কারণ, বিমূর্ত চিত্র নিদর্শন সাধারণ পাঠক বা গ্রাহকের পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হতে পারে।

চিত্র-নির্দেশকদের অনেক বিচার বিবেচনা ক'রে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, বিজ্ঞাপনের চিত্র নিদর্শনে কী কী উপস্থাপিত হবে।

পণ্য—মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞাপন করা হয় পণ্যের চাহিদা এবং বিক্রি বাড়ানোর জন্য। আর, গ্রাহকদেরও আগ্রহ পণ্যর জন্যই। যে জিনিস তাঁরা কিনবেন এবং ব্যবহার করবেন, সেইটি সম্পর্কেই গ্রাহকদের আগ্রহ সর্বাধিক। সতর্ক থাকা প্রয়োজন, পণ্যের ব্যবহারের বা পণ্যের ব্যবহারের কোনো মানসিক সন্তুষ্টির আশ্বাস যেন চিত্র-নিদর্শনের মাধ্যমে জানানো হয়।

পণ্যের অংশ বিশেষ—চিত্র নিদর্শনে কেবলমাত্র কোনো পণ্য সম্পূর্ণভাবে না দেখিয়ে পণ্যের অংশবিশেষ দেখানো হয়, গ্রাহকদের কাছে চিত্র-নিদর্শন আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য এবং বিজ্ঞাপনের বার্তাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য।

ব্যবহারের পরে—সাধারণত খাবার জিনিসের বিজ্ঞাপনে এই ধরনের চিত্র-নিদর্শন ব্যবহার করা হয়। কোনো রান্নার তেলের এক লিটার প্যাকের চিত্র-নিদর্শনের চেয়ে এক প্লেট ফুলকো লুচির চিত্র-নিদর্শন, ঐ তেলটি ব্যবহারে গ্রাহককে আগ্রহী করে তুলবে।

ব্যবহার—অমুল্য গুঁড়ো দুধ ডেলা পাকিয়ে যায় না, স্বচ্ছন্দে গুলে যায়, চিত্র-নিদর্শনে ঠিকমত দেখাতে পারলে গ্রাহকদের বিশ্বাস জন্মায়। নেসকাফে কফির গাঢ় রং এবং কাপ থেকে ধোঁয়া উঠছে, এই চিত্র-নিদর্শন গ্রাহকের মনে কফির তৃষ্ণা জাগায়।

পরীক্ষা—একটি বিশেষ টায়ার বাজারে ছাড়ার আগে এগারোটি বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয়। চিত্র-নিদর্শনে একটি পরীক্ষা প্রদর্শিত। গ্রাহকদের মনে পণ্যের সম্বন্ধে বিশ্বাস জাগাতে এই চিত্র-নিদর্শন বিশেষ কার্যকরী। এই পরীক্ষা অনেক সময় প্রতিযোগী পণ্যের সঙ্গে তুলনামূলকও হতে পারে।

ব্যবহার না করলে কী হয়—বিজ্ঞাপিত পণ্যটি ব্যবহার না করলে, গ্রাহকের কী ক্ষতি হতে পারে, চিত্র-নিদর্শনের মাধ্যমে গ্রাহককে সে বিষয়ে অবহিত করা বা সচকিত করা।

৬.১৮.২ ফোটোগ্রাফ

হাতে আঁকা চিত্র এবং ফোটোগ্রাফ সম্পূর্ণ ভিন্ন অনুভূতির সৃষ্টি করে। সাধারণভাবে আমরা বিশ্বাস করি অঙ্কিত চিত্র অবাস্তব এবং কাল্পনিক, কিন্তু ফোটোগ্রাফ বাস্তবের বা জীবনের প্রতিচ্ছবি। এই ধারণা আমাদের সকলের মনের গভীরে রয়েছে। আমরা মনে করি অঙ্কিত চিত্র মাত্রেই অতিরঞ্জিত (metaphor) কাল্পনিক এবং উদ্দেশ্যমূলক (manipulated) ভাবে নির্মিত (constructed) চিত্র। যতই বাস্তবের মতো দেখাক না কেন, বাস্তব নয়। একটি বিশেষ বিষয় তুলে ধরার জন্য বিশেষভাবে অঙ্কিত। কাল্পনিক হওয়ায়

অঙ্কিত চিত্র সহজে এবং একটি বিশেষ বিষয়েই গ্রাহককে জানাতে সক্ষম। কোনো বিষয়ের বিশেষ অর্থ বা কোনো বিশেষ মেজাজ গ্রাহককে জানাতে অঙ্কিত চিত্র কার্যকরী।

ফোটোগ্রাফে আছে বাস্তব প্রামাণিকতা (authenticity), সেই কারণে এর আবেদন বিশেষ শক্তিশালী। বেশির ভাগ লোকই চাক্ষুষ দেখা জিনিস বিশ্বাস করেন এবং ফোটোগ্রাফ দেখা চাক্ষুষ দেখার সমান বলে মনে করেন। আমরা আরো বিশ্বাস করি, ফোটোগ্রাফ মিথ্যা কথা বলে না। বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণের জন্য ফোটোগ্রাফ অব্যর্থ। ফোটোগ্রাফও কল্পনার মিশ্রণে বিশেষ নান্দনিক হতে পারে। তবে বিজ্ঞাপনে ফোটোগ্রাফ ব্যবহার করা হয় বিশ্বাসযোগ্যতা এবং বাস্তবতার জন্য।

৬.১৮.৩ রং-এর ব্যবহার

বিজ্ঞাপনের চিত্র-নিদর্শনে রঙের ব্যবহার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাদাকালো বিজ্ঞাপন প্রতিরূপ হওয়ায় এর একটি নাটকীয় আবেদন আছে। কারণ, আমাদের চারপাশের বাস্তব জীবন রঙীন। সংবাদপত্রের কোনো বিজ্ঞাপনে লাল রঙে শিরোনাম দিলে, গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যেমন সমর্থ হবে, রঙীন মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকায় তেমন হবে না। যেহেতু বেশির ভাষা পত্রিকাই রঙীন, কখনো কখনো দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সাদা-কালো বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। আগাগোড়া রঙীন পত্রিকার মধ্যে একটি সাদাকালো বিজ্ঞাপন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বিজ্ঞাপনের চিত্র-নিদর্শনে বিভিন্ন রঙের ব্যবহার করা হয়, একথা সত্য। তবে বিজ্ঞাপনে বিভিন্ন রঙের ব্যবহারের আরো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা আছে। নারী ও পুরুষের বিভিন্ন পোশাক, বাচ্চাদের খেলনা এবং সবরকমের খাবার ও পানীয়র বিজ্ঞাপনে রঙের ব্যবহারে জিনিসগুলিকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ক'রে তোলা হয় গ্রাহকদের চোখে।

মনস্তাত্ত্বিকদের মতে বিভিন্ন রং মানুষের মনে বিভিন্ন রকমের আবেদন সৃষ্টি করে। যেমন লাল রং শক্তি, তেজ, গরম, ক্রোধ ইত্যাদি অনুভূতির দ্যোতক। টর্চলাইট এবং ট্রানজিস্টার-এ ব্যাটারী ব্যবহার করা হয় শক্তি সরবরাহের জন্য। সেই কারণে ব্যাটারীর বিজ্ঞাপনে প্রবলভাবে লাল রং-এর ব্যবহারকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপনের শিল্পনির্দেশকরা অনেক ভাবনা চিন্তা ক'রে নিপুণভাবে রঙের ব্যবহার করেন, যাতে বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত রং বিজ্ঞাপনের বিশেষ বার্তা, আবেগ বা মেজাজ পারদর্শীতার সঙ্গে গ্রাহককে জানাতে সক্ষম হয়।

বিজ্ঞাপনের শিরোনাম এবং বিষয়লিপি আরো প্রভাবশালী করার জন্য পণ্য, তার ব্যবহার এবং বিজ্ঞাপনের বার্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রং ব্যবহার করা হয়। কোনো শার্ট বা সালোয়ার কামিজ প্রকৃত রঙে বিজ্ঞাপনে দেখালে, পণ্যের বার্তা দ্রুত নির্ভুলভাবে পরিস্কার বাস্তব মূর্তিতে গ্রাহকদের মনে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়।

বিজ্ঞাপনের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পাঠকের চোখ যাতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে, সেই বিষয়ে লক্ষ্য রেখেই বিজ্ঞাপনে বিভিন্ন রং ব্যবহার করা হয়।

পাঠকের মনে একটি মুগ্ধতাবোধ এবং বিজ্ঞাপিত পণ্যটির সম্বন্ধে অনুকূল মনোভাব গড়ে তোলার জন্য বিজ্ঞাপনে বিভিন্ন রং ব্যবহার করা হয়।

রঙের ব্যবহারের সময় সতর্ক থাকা প্রয়োজন—ব্যবহার যেন যুক্তিযুক্ত হয় এবং সুরুচির পরিচয় দেয়।

যে সব রং আপনারা দেখেন বা জানেন, মনস্তাত্বিকেরা সেগুলিকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করেন। একটি বিশেষ গোষ্ঠীর কোনো রঙের সঙ্গে অন্য একটি গোষ্ঠীর কোনো রং ব্যবহার করলে, অনেক পাঠকের চোখে সহনীয় হয় না। ফলে বিজ্ঞাপনের বার্তা ঠিক ভাবে জানানো হয় না। নির্বিচারে বিরোধী গোষ্ঠীর রঙের ব্যবহারের ফল অনেক সময় দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিপজ্জনক হয়। বিজ্ঞাপনটি সফল হয় না।

৬.১৯ সারাংশ

বিভিন্ন প্রস্তুতকারী সংস্থার পণ্যের বিপণনের জন্য বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব অনেক। বিজ্ঞাপনের যে রূপটি গ্রাহকদের সামনে উপস্থাপন করা হয়, সেটিই বিজ্ঞাপনের সৃজনশীলতার প্রকাশ। বিজ্ঞাপনের সৃজনশীলতা কার্যকরী না হলে বিজ্ঞাপন এবং বিপণন প্রয়াসও অসফল হবে। এই কারণে বিজ্ঞাপন সৃষ্টির জন্য বিশেষ যত্ন সহকারে বিজ্ঞাপনের বিজ্ঞান. এবং শিল্পগত বিষয় অনুধাবন করা হয়।

কোনো পণ্য বা পরিষেবার বিজ্ঞাপন সৃষ্টি করার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য কী, সেটি নির্ধারণ করা। সঙ্গে সঙ্গে জানতে হবে কোন গ্রাহককে উদ্দেশ্য করে বিজ্ঞাপন করা হবে। গ্রাহককে চিহ্নিত করার পরেই জানতে হবে তিনি কেন বিজ্ঞাপিত পণ্যটি বা তার প্রতিযোগী কোনো পণ্য ব্যবহার করবেন। যে কোনো ব্যবহারকারীই একজন জটিল মানুষ। তাঁর মনোভাব বুঝবার জন্য তাঁর মনোভাব এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত কোন কোন কারণে প্রভাবিত হয় জানতে হবে।

বিজ্ঞাপনের যে বিষয়লিপি স্থির করা হয়, সেটি উদ্দীষ্ট গ্রাহককে প্রভাবিত করতে সক্ষম হবে কী না বিচার করতে হবে। বিজ্ঞাপনে শিরোনাম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ক'রে থাকে। বিজ্ঞাপনের শিরোনাম এবং রূপকল্প গ্রাহকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলে তবেই বিজ্ঞাপনটি কার্যকরী হওয়া সম্ভব হবে। বিভিন্ন পণ্য এবং পরিষেবার জন্য বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন গ্রাহকের জন্য বিভিন্ন আবেদন সম্বলিত বিজ্ঞাপন সৃষ্টি করা হয়। গ্রাহকের মন প্রভাবিত করার জন্য অনেক সূক্ষ্ম আবেদন সৃষ্টি করা হয়।

বিজ্ঞাপন সৃষ্টিতে বিভিন্ন চিত্র, ফোটোগ্রাফ এবং রং-এর বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার, বিজ্ঞাপনকে কার্যকরী করে তোলে। হরফের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হরফের মাপ এবং বিশেষ করে হরফ চরিত্র বিজ্ঞাপনের বার্তাকে বিশেষ অর্থবহ এবং যথার্থই বাঙ্ময় ক'রে তোলে। বিজ্ঞাপনে চিত্ররেখার ব্যবহারের কতকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রণালি অনুসরণ করা হয়।

৬.২০ অনুশীলনী

১. সকল বিজ্ঞাপন সৃষ্টির জন্য পণ্য এবং পণ্যের ব্যবহারকারী সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য জানার প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব কী?

২. বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি রচনা করতে হলে কোনো মডেল অনুসরণ করা হয় কী? ব্যাখ্যা করুন।

৩. বিজ্ঞাপনে শিরোনামের গুরুত্ব কতখানি? শিরোনামের কাজ কী?

৪. বিজ্ঞাপনের শিরোনাম রচনার জন্য কোন কোন নির্দেশাবলী অনুসরণ করা প্রয়োজন?

৫. বিজ্ঞাপনের চিত্ররেখার কাজ কী? চিত্ররেখার কী কী গুণ থাকা আবশ্যক?

৬. বিজ্ঞাপনে চিত্র নিদর্শন ব্যবহার করা হয় কেন?

৭. বিজ্ঞাপন কতরকম আবেদন অনুসারে সৃষ্ট করা যায়?

টীকা লিখুন ঃ ১। ট্রেডমার্ক ২। স্লোগান ৩। প্রতীক ৪। বিজ্ঞাপনে ফোটোগ্রাফি ৫। বিজ্ঞাপনে হরফের ব্যবহার।

৬.২১ গ্রন্থপঞ্জী

1. Advertising that pulls response/Graeme McCorakell
2. Corporate Image, Nicholas Ind.
3. Advertising in America, Slanley M. Ulanoff, Ph. D.
4. Confessions of An advertising Man, David Ogilvy
5. Oglivy on Advertising, David Ogilvy.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ ১৪৫ এবং ১৫০ পৃষ্ঠার উদাহরণ চিত্র Standard E. moriarty রচিত Creative Advertising : Theory and Practice গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

একক ৭ ❑ রেডিও, টেলিভিশন এবং ইনটারনেট

গঠন

৭.০ উদ্দেশ্য

৭.১ প্রস্তাবনা

৭.২ রেডিওর বিজ্ঞাপন

৭.২.১ অন্তরঙ্গ

৭.২.২ কল্পনামূলক

৭.২.৩ ভাবাবেগ

৭.২.৪ সংগীত মুখর

৭.২.৫ কণ্ঠস্বরের ব্যবহার

৭.২.৬ শব্দের ব্যবহার

৭.২.৭ নির্দেশিকা

৭.৩ টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন

৭.৩.১ সোজাসুজি ঘোষণা

৭.৩.২ প্রদর্শন

৭.৩.৩ নাটকীয়তা

৭.৩.৪ সংগীতমুখর

৭.৩.৫ নির্দেশাবলী

৭.৪ স্টোরি বোর্ড

৭.৫ ইনটারনেট এর বিজ্ঞাপন

৭.৫.১ বৈশিষ্ট্য

৭.৫.২ কৌশল

৭.৫.৩ ব্যানার

৭.৫.৪ বিষয়লিপি

৭.৬ সারাংশ

৭.৭ অনুশীলনী

৭.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৭.০ উদ্দেশ্য

তিনটি আধুনিক মাধ্যম রেডিও, টেলিভিশন এবং ইনটারনেট-এর বিজ্ঞাপনের বিষয়ে এই এককে আলোচনা করা হয়েছে। এই এককটি পাঠ করে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করতে সক্ষম হবেন।

- রেডিও'র বিজ্ঞাপনের বৈশিষ্ট্য কী?
- রেডিও'র বিজ্ঞাপন প্রস্তুত করার জন্য কোন কোন বিষয়ে বিশেষ নজর রাখতে হবে?
- টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনের বৈশিষ্ট্য কী?
- টেলিভিশনের এবং রেডিও'র বিজ্ঞাপনের প্রভাব
- স্টোরি বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা
- ইন্টারনেটের বিজ্ঞাপনের বৈশিষ্ট্য এবং কৌশল
- ব্যানার এবং বিষয়লিপি—ইনটারনেটের জন্য

৭.১ প্রস্তাবনা

এবারে আমাদের আলোচনার বিষয় রেডিও'র বিজ্ঞাপন এবং টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন। মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের বিস্তারিত আলোচনায় আপনারা জেনেছেন যে কোনো বিজ্ঞাপনের মূল উদ্দেশ্য গ্রাহকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, বিজ্ঞাপনের বার্তা গ্রাহককে কার্যকরীভাবে জানানো, বিজ্ঞাপিত পণ্যটি সম্বন্ধে গ্রাহকের আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং পণ্যটির ব্রান্ড নাম যাতে গ্রাহকের স্মরণে থাকে তার জন্য প্রভাব সৃষ্টি করা।

রেডিও এবং টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে এই সূত্রগুলি সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু যেহেতু এই মাধ্যম দুটি মুদ্রিত মাধ্যম নয়—একটি রেডিও, কেবল শ্রবণমাধ্যম এবং আরেকটি টেলিভিশন, শ্রবণ-দৃশ্য মাধ্যম, সেই কারণে, এই মূল নির্দেশিকার পরেও দুটি মাধ্যমের জন্য দুই রকমের বিবেচনা এবং প্রস্তুতি প্রয়োজন। প্রথমে রেডিও'র বিজ্ঞাপন।

৭.২ রেডিও'র বিজ্ঞাপন

রেডিও এমন একটি মাধ্যম যা আপনার শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন বার্তা আপনাকে জানিয়ে দেয়। যেহেতু কেবলমাত্র কানে শোনা শব্দের মাধ্যমে আপনাকে বার্তা জানানো হয়, সেইহেতু রেডিও'র বিজ্ঞাপনের কলাকুশলতা মুদ্রিত মাধ্যমের বিজ্ঞাপনের থেকে ভিন্ন।

আপনি চিন্তা করে দেখুন, পড়তে শেখার অনেক আগেই আপনি কথা বলতে শিখেছেন। যে কথা বলতে শিখেছিলেন সেগুলিই পরবর্তীকালে লিখতে এবং পড়তে শিখেছেন। কাজেই শ্রবণ মাধ্যম মুদ্রিত মাধ্যমের চেয়ে দুর্বল, এরকম ভাবনার কোনো অবকাশ নেই। কোনো ঘটনার বা কোনো পণ্যের বিবরণ যখন রেডিওতে শোনেন, তখন আপনি নিজের মনে—ঐ কানে শোনা শব্দগুলির সাহায্যে একটি চিত্রের সৃষ্টি করেন। বিজ্ঞাপনের রূপকল্প আপনার মানস-চোখে যেমন দেখেন, মনের মধ্য সেই রকম চিত্র সৃষ্টি করেন।

আমাদের সকলের মনেই প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সহ অনেক চিত্র সংগ্রহ করা আছে। সেইজন্যই "পাহাড়" শব্দটি শুনলে আপনার মনে আপনার অধিগত জ্ঞান অনুযায়ী একটি পাহাড়ের চিত্র পরিস্ফুট হয়। আবার যদি কেউ বলে "সমুদ্রতীর" তাহলে আপনার অধিগত জ্ঞান অনুসারে একটি সমুদ্রতীরের চিত্র আপনার মনে জাগে। আবার দেখুন, কেউ যদি বলে "গোলাপের সুগন্ধ" আপনি নিজস্ব অনুভূতিতে গোলাপের সুগন্ধ অনুভব করেন। কিন্তু, যদি কেউ বলে "যুঁই ফুল", আপনার অনুভূতির সুগন্ধ বদলে যায়। অর্থাৎ মুদ্রিত বিজ্ঞাপন যেমন শিরোনাম, বিষয়লিপি, চিত্র নিদর্শন ইত্যাদির সমাহারে আপনার মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, রেডিওর বিজ্ঞাপনও বিভিন্ন শব্দ, সঙ্গীতাংশ, কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্যের সাহায্যে আপনার মনে বিভিন্ন রূপকল্প এবং ভাবমূর্তির সৃষ্টি করে।

৭.২.১ অন্তরঙ্গ

কানে শোনা বার্তা মুদ্রিত অক্ষরের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। আপনি যখন কোনো পুরুষ বা মহিলার কণ্ঠ শোনেন তখন সেই বার্তা বিশেষ অন্তরঙ্গ মনে হয়। আপনার নিজের ভাষায়, আপনার সমরুচি সম্পন্ন কেউ, আপনার বন্ধুর মতো, আপনার একটি বিশেষ প্রয়োজনের বিষয়ে কিছু বলছেন। আপনার মানসিক অনুভূতি—এই বার্তা বিশেষভাবে আপনাকেই জানানো হচ্ছে।

৭.২.২ কল্পনামূলক

কানে শুনে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি স্মরণ করার থেকেও অনেক বেশি উল্লেখযোগ্য শ্রোতাকে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী চিত্রকল্প সৃষ্টিতে সাহায্য করা। কানে শুনে নিজের মনে যে চিত্রকল্প বা নাটক আপনি সৃষ্টি করেন, সে তো আপনার রচনা। আপনারই অভিজ্ঞতা অনুসারে, শব্দ শুনে আপনি নিজের মনে রচনা করেছেন। রেডিও মাধ্যমে শ্রোতাও অংশগ্রহণ করেন। কাজে কাজেই শ্রোতাকেও রচয়িতা হিসাবে ধরা যেতে পারে। অন্য কোনো মাধ্যমই শ্রোতার কল্পনাকে এমন করে উন্মেষিত করে না, রূপকল্প নিমার্ণের জন্য।

৭.২.৩ ভাবাবেগ

অন্যান্য মাধ্যম থেকে রেডিও মাধ্যমের আর একটি বৈশিষ্ট্য ভাবাবেগের আবেদন। যেহেতু এই মাধ্যমের চরিত্র অন্তরঙ্গ এবং শ্রোতা তাঁর নিজস্ব কল্পনায় অংশগ্রহণ করেন, এই মাধ্যমের আবেগজনিত আবেদন অত্যন্ত বেশি। কোনো মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে হাস্যমুখি মডেলের ছবি আপনার মনে যে আবেগ সঞ্চার করে তার চেয়ে অনেক বেশি আবেগ সঞ্চার করে রেডিওয় শোনা কোনো নারীকণ্ঠের উচ্ছল হাসি।

৭.২.৪ সংগীত মুখর

এই মাধ্যমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য রেডিওর বিজ্ঞাপন সুর এবং সংগীতের উপর বিশেষ নির্ভরশীল। আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, রেডিওর বেশির ভাগ বিজ্ঞাপনই গানের আকারে পরিবেশিত হয়। সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপনটি একটি সংগীতের আকার নেয়। অথবা বিজ্ঞাপনটি ছড়ার মতো সুর ক'রে বলে, শুরুতে এবং শেষে একটি বিশেষ সুর শোনানো হয়। বিজ্ঞাপনে সুরের ব্যবহার শ্রোতাকে বিজ্ঞাপনটি স্মরণ করতে সাহায্য করে। যে কোনো মানুষের কাছেই সুরের আবেদন সাধারণ কথার আবেদনের থেকে বেশি। সুর এবং ছন্দবদ্ধ

বিজ্ঞাপনের কথা মানুষ গুণ গুণ করে। বিজ্ঞাপন স্মরণ করে। সুর-সংগীত ভাবাবেগ সৃষ্টি করে। আপনাদের পরিচিত সুর মনে করিয়ে দেয় "সুরভিত এ্যান্টিসেপটিক ক্রিম—বোরোলীন"। অথবা, "একটি, শুধু একটি সারিডন।" সুর-সংগীত ব্যতীত অন্যতম সফল রেডিও বিজ্ঞাপনের চরিত্র—ঘোষণা। যেহেতু রেডিও সংবাদ মাধ্যমও বটে, সংবাদ ঘোষণার ভঙ্গিতে বিজ্ঞাপনের প্রচার বিশেষ কার্যকরী হয়।

৭.২.৫ কণ্ঠস্বরের ব্যবহার

রেডিওর বিজ্ঞাপনে সুর-সংগীতের প্রাধান্য আছে। তারপরেই সবেচেয়ে বেশি প্রাধান্য কণ্ঠস্বরের ব্যবহারের। সংগীত ব্যতীত অন্যান্য রেডিও বিজ্ঞাপনে ঘোষণা, প্রশ্নোত্তর, তর্ক, উচ্ছাস, আনন্দ, দুঃখ সবই প্রকাশ করা হয় কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে। রেডিওর বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি অনুসারে, বৃদ্ধ, বাচ্চা ছেলেমেয়ে, কিশোর-কিশোরী, কোম্পানি একজিকিউটিভ, বাড়ির গিন্নি, দোকানদার, চাষীভাই, সব চরিত্রই আপনার কাছে পরিস্ফুট হবে কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে। কণ্ঠস্বরই আপনাকে জানিয়ে দেয়, কে বা কোন চরিত্র কথা বলছে। কোমল, কঠিন, উচ্ছাসময়, বিষণ্ণ, কর্কশ, স্নেহঝরা—কণ্ঠস্বরই আপনাকে বক্তব্য, ভাবাবেগ, মেজাজ ইত্যাদি বুঝিয়ে দেয়। সেই কারণে রেডিওর বিজ্ঞাপনের জন্য অংশগ্রহণকারী নির্বাচনের সময় কণ্ঠস্বরই বিবেচনার বিষয়। এবং অংশগ্রহণকারীর কণ্ঠস্বরের তারতম্য ঘটানোর ক্ষমতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

৭.২.৬ শব্দের ব্যবহার

সংগীত এবং কণ্ঠস্বর ব্যতীত বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার রেডিওর বিজ্ঞাপনকে কার্যকরী করে তুলতে সাহায্য করে। গাড়ি থামার বা ছেড়ে যাওয়ার শব্দ, ট্রেনের আওয়াজ, জলের ছলছল শব্দ, বিভিন্ন রকমের পায়ের শব্দ, যেমন তাড়াতাড়ি হাঁটছেন কোনো একজিকিউটিভ অথবা থেমে-থেমে, রহস্যের সৃষ্টি করে কেউ আসছে, এইরকম বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগে রেডিওর বিজ্ঞাপন বিশেষ আকর্ষণকারী এবং আবেদনময় করে তোলা হয়। এই সব ছাড়াও বিভিন্ন যান্ত্রিক শব্দের ব্যবহার করা হয় রেডিওর বিজ্ঞাপন আকর্ষণীয় এবং কার্যকরী ক'রে তোলার জন্য।

রেডিওর বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি রচনার সময় উপরে আলোচিত বিশেষ উপাদানগুলি ব্যবহার করা প্রয়োজন। রেডিওর বিজ্ঞাপন সংবাদপত্র বা পত্রিকার বিজ্ঞাপনের মতো বিজ্ঞাপনের অধিকৃত স্থানের হিসাবে হয় না। সময়ের হিসাবেই রেডিওর বিজ্ঞাপন প্রস্তুত, প্রচারিত হয় এবং রেডিওতে বিজ্ঞাপন প্রচারের খরচ ও সময়ের মাপকাঠিতে হিসাব করা হয়। আপনারা রেডিওতে যে সব বিজ্ঞাপন শুনতে পান, সেগুলি ১০ সেকেণ্ড, ২০ সেকেণ্ড, ৩০ সেকেণ্ড এবং ৬০ সেকেণ্ডের হিসাবে প্রস্তুত এবং প্রচারিত হয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি লেখককে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই প্রচারিত হতে পারে, এমনভাবেই বিজ্ঞাপনটি পরিকল্পনা করতে হবে। যেহেতু শ্রোতারা কেবল কানে শুনেই বিজ্ঞাপনের বার্তা জানবেন, সেই কারণে, ছোটো ছোটো, সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহার করা প্রয়োজন, যাতে শ্রোতারা সহজেই শব্দগুলি বুঝতে পারেন, কোন অসুবিধা না হয়। মনে রাখতে হবে শ্রোতা হয়তো আর কিছু করছেন।

পাঁচ নম্বর এককে, মাধ্যম আলোচনায় আপনারা জেনেছেন আমাদের দেশে গণজ্ঞাপনে রেডিওর ভূমিকা কী। যেহেতু আমাদের দেশে শতকরা ৭০ ভাগের বেশি মানুষ গ্রামে বাস করেন এবং গণ-জ্ঞাপনের বিভিন্ন মাধ্যম বেশির ভাগ জায়গায় পৌঁছায় না, রেডিওই এই বিপুল সংখ্যক জনগণ বা ব্যবহারকারীর কাছে বিভিন্ন

পণ্য ও পরিষেবার বার্তা পৌঁছে দেয়। এই ব্যবহারকারীদের পক্ষে সহজবোধ্য করার জন্য বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপিতে চলিত ভাষার ব্যবহারই রেডিওর বিজ্ঞাপনকে সার্থক করে তুলতে পারে।

রেডিওর বিজ্ঞাপন—সুর-সংগীত মুখরিত হতে পারে, বর্ণনামূলক হতে পারে এবং ঘোষণামূলকও হতে পারে। যে কোনো ধরনের রেডিওর বিজ্ঞাপন (Radio commercial)-এর বিষয়লিপি রচনার সময় নিচের নির্দেশিকাগুলি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য, কার্যকরী রেডিওর বিজ্ঞাপন প্রস্তুতের জন্য।

১. বিজ্ঞাপনটি যেন আরো অনেক বিজ্ঞাপনের মধ্যেও আলাদা করে চেনা এবং বোঝা যায়। এমন কোনো বিষয় বা চরিত্র সৃষ্টি করা প্রয়োজন যাতে বিজ্ঞাপনটি শ্রোতার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকে।

২. পণ্যের ব্র্যান্ড নাম এবং পণ্যটি ব্যবহার করার সুবিধা প্রথম তিন সেকেণ্ডের মধ্যেই জানিয়ে দিন। সম্ভব হলে, আবার পুনরাবৃত্তি করুন। শুরুতেই পণ্যের নাম এবং গুণ না জানালে শেষ অবধি শ্রোতার আগ্রহ না-ও থাকতে পারে।

৩ পণ্যের নাম পরিষ্কার ভাবে প্রতিটি অক্ষরের উচ্চারণ আলাদা করে বলুন—শ্রোতারা যেন কোনোভাবেই নামটি ভুল না শোনেন।

৪. ছোটো ছোটো সহজ শব্দ এবং বাক্য ব্যবহার করুন।

৫. চিত্রটি ফুটিয়ে তুলুন। যদি সবুজ লেবেল চা হয়, 'সবুজ' কথাটা স্পষ্ট জানান। লাল ব্যাটারি হলে লাল রং বুঝিয়ে দিন। শ্রোতার পক্ষে সহজ হবে আপনার পণ্য চিহ্নিত করা।

৬. পুনরাবৃত্তিই রেডিওর বিজ্ঞাপনের সাফল্যের মূল সূত্র। যতবার সম্ভব, মূল বার্তা এবং পণ্যের নাম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলুন।

৭. বিজ্ঞাপনের বিষয়, সময়সীমা মেনে এবং শ্রোতার কথা বিবেচনা করে নির্বাচন এবং উপস্থাপন করুন।

৮. বার্তা যেন সহজ হয়। মনে রাখবেন, রেডিওর বিজ্ঞাপন শ্রোতাকে সচেতন করার জন্য স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য। বিস্তারিত তথ্য জানবার জন্য নয়।

৯. একই পণ্যের বিজ্ঞাপন টেলিভিশন এবং রেডিওতেও করা হলে, টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনের সুর-সংগীত, শব্দের ব্যবহার এবং বিষয় রেডিওতেও প্রয়োগ করুন। ভালো ফল হবে।

১০. শব্দের ব্যবহার সর্তকতার সঙ্গে করতে হবে। আপনি বৃষ্টির শব্দ শোনাতে চাইলে, খেয়াল রাখতে হবে, সেই শব্দ যেন কড়াইতে মাছ ভাজার শব্দের মতো না শোনায়।

৭.৩ টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন

বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবেই টেলিভিশন গণ্য হয়। টেলিভিশন রেডিওর মত সুর-সংগীত, শব্দ এবং কথা আপনাকে জানায়। সঙ্গে সঙ্গে আরো পৌঁছে দেয় ছবি, রঙীন ছবি, চলমান ছবি। টেলিভিশনের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের জ্ঞাপন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, আপনার ঘরে জীবনের প্রতিচ্ছবি উপহার দেয়। এই প্রাণবন্ত জীবনের চলমান রঙীন চিত্র, সুর-সংগীত, শব্দ এবং কথার সংযোজন আপনার মনে যে আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম আর কোনো মাধ্যমের পক্ষেই সেটা সম্ভব নয়। টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন চিত্তাকর্ষক এবং দর্শকের মনোরঞ্জনের বিশেষ উপাদান। এই শ্রবণ-দৃশ্য মাধ্যম কেবল বিভিন্ন পণ্য এবং পরিষেবার বার্তাই

দর্শককে জানায় না, এই জ্ঞাপন প্রক্রিয়ার দ্বারাই দর্শকের মনোরঞ্জনও হয়। বিভিন্ন সংবাদ এবং মনোরঞ্জনমূলক অনুষ্ঠান যেমন দর্শককে আকৃষ্ট করে এবং দর্শকের স্মৃতিতে স্থান করে নেয়,—এর সঙ্গে প্রচারিত সকল বিজ্ঞাপনও দর্শককে পণ্যের বার্তা জানায় এবং তার মনোরঞ্জনও করে। টেলিভিশনের অসংখ্য বিজ্ঞাপন দর্শক বার বার দেখেন এবং আনন্দ বোধ করেন, মনোরঞ্জনের উপাদান আছে বলে, বিজ্ঞাপনগুলি দেখা তাঁর কাছে আনন্দদায়ক বলে।

সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যমে প্রচারিত বিজ্ঞাপন স্বভাবতই বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে সযত্নে প্রস্তুত করা আবশ্যক। কেবল চলমান রঙীন ছবিই নয়, বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় নৈপুণ্য এবং ক্যামেরার নাটকীয় বিশেষ দৃষ্টিকোণ, শ্রবণ-দৃশ্য বিজ্ঞাপনকে অসাধারণ বিশেষ প্রভাবশালী এবং স্মরণীয় ক'রে তোলে।

এই মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারের আর একটি বিশেষ সুবিধা, নির্বাচিত দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রস্তুত এবং প্রচারিত করা। টেলিভিশনে কতকগুলি নির্দিষ্ট সময়ে, কোনো কোনো নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান, সবশ্রেণির দর্শকই দেখে থাকেন, যেমন, সংবাদ ইত্যাদি। এই অনুষ্ঠানে সর্বসাধারণের ব্যবহারের উপযোগী পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। আবার বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান গৃহিণীদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়। যে সকল পণ্য এবং পরিষেবা গৃহিণীদের জন্য, সেই সব পণ্য এবং পরিষেবার বিজ্ঞাপন গৃহিণীদের জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে প্রচারিত হয়। আপনারা দেখেছেন, একজিকউটিভদের ব্যবহার্য পণ্য এবং পরিষেবা, যেমন শার্ট, স্যুটিং, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদির বিজ্ঞাপন রাত্রে ইংরাজি সংবাদ এবং সংবাদ ভিত্তিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে প্রদর্শিত হয়। আবার চ্যুয়িংগাম বা চকোলেটের বিজ্ঞাপন ছোটোদের অনুষ্ঠানের সঙ্গে প্রদর্শিত হয়। অর্থাৎ, টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন যেমন সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছায়, সেই রকম, নির্দিষ্ট নির্বাচিত দর্শকদের কাছেও বিশেষভাবে পৌঁছায়। আর টেলিভিশনের সবচেয়ে বড়ো সুবিধা, দর্শকের ঘরের মধ্যে প্রাণবন্ত প্রদর্শন। সে-ও আবার, দর্শক যখন প্রশান্ত মনে রয়েছেন, অর্থাৎ তাঁর মন বার্তা গ্রহণ করতে আগ্রহী।

রেডিওর বিজ্ঞাপনের মতো টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনও সময়সীমার হিসাবে, অর্থাৎ ১০ ২০, ৩০ অথবা ৬০ সেকেণ্ডের হিসাবে পরিকল্পিত এবং প্রস্তুত হয়। সময়সীমা হিসাবে টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনের শ্রেণি নির্ণয় না ক'রে, বিজ্ঞাপনটির উপস্থাপনের রকমারি কলাকৌশল বিবেচনা ক'রে শ্রেণিবিভাগ করাই বেশি যুক্তিযুক্ত। সাধারণত যে ধরনের বিজ্ঞাপন আপনারা টেলিভিশনে দেখে থাকেন, সেগুলির উপস্থাপনের কৌশল অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণির বিজ্ঞাপন নিয়ে আলোচনা করা যাক।

৭.৩.১ সোজাসুজি ঘোষণা

বেশির ভাগ বিজ্ঞাপনের মূল গঠন সোজাসুজি ঘোষণা। কোনো ব্যক্তি, স্ত্রী অথবা পুরুষ সোজাসুজি দর্শকের দিকে (ক্যামেরার দিকে) তাকিয়ে, পণ্যের গুণের কথা বলেন এবং পণ্যটি দেখান। বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি জোরালো হলে এবং অভিনেতা বা অভিনেত্রীর কণ্ঠস্বরে কাঙ্খিত আবেদন পরিস্ফুট হলে এই ধরনের বিজ্ঞাপন কার্যকরী হয়। পণ্যটিও ভালোভাবে দেখানোর সুযোগ মেলে। এই বিজ্ঞাপন প্রস্তুত করার খরচও কম। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের মধ্যেও সোজাসুজি ঘোষণার বিজ্ঞাপনটি যেন আলাদা করে চেনা যায়। যেন হারিয়ে না যায়।

৭.৩.২ প্রদর্শন

টেলিভিশনে যে কোনো পণ্যের কার্যকরিতা প্রদর্শনের সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া যায়। যে পণ্যের বিজ্ঞাপন করা হচ্ছে সেটির গ্রাহক জানতে চান পণ্যটি কীভাবে কাজ করে এবং তাঁর কী সুবিধে হবে, পণ্যটি ব্যবহার করলে? পণ্যের কর্মক্ষমতা প্রদর্শন ক'রে দর্শকের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার ফলে বিশ্বাস জাগানো সম্ভব। একটি মিক্সির বিজ্ঞাপনে দেখানো হয় কত তাড়াতাড়ি এবং কত মসৃণ ভাবে মশলা বা অন্য কিছু গুঁড়ো করা সম্ভব। গুঁড়ো দুধ যাঁরা ব্যবহার করেন, তাঁরা জানেন গুঁড়ো দুধ ব্যবহারের মূল সমস্যা জলে গুলবার সময় ডেলা পাকিয়ে যাওয়া। একটি পাউডার মিল্ক-এর বিজ্ঞাপনে আপনারা দেখেছেন—জলে গুলে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ডেলা পাকায় না। অর্থাৎ, আপনি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারেন। যে কোনো পণ্যের গুণ এবং কর্মদক্ষতা প্রদর্শন ক'রে দর্শকদের বিশ্বাস জাগানো এই বিজ্ঞাপনের বিশেষ পারদর্শীতা।

৭.৩.৩ নাটকীয়তা

একটি সংক্ষিপ্ত কাহিনীর সাহায্যে নাটকের উপস্থাপনায়, বিজ্ঞাপনের বার্তা জানানো। ৩০ সেকেণ্ডের মধ্যেও নাটক সৃষ্টি সম্ভব। নাটকের বিশেষ সুবিধা এবং প্রভাব অন্যান্য গঠনের বিজ্ঞাপনের চেয়ে অনেক বেশি। বিজ্ঞাপনে এই সব নাটক সৃষ্টি করা হয়, দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা এবং বিজ্ঞাপিত পণ্যটির সমস্যা সমাধানের কর্মকুশলতার প্রদর্শনে। আপনারা টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনে দেখেছেন—বাচ্চা স্কুল থেকে ফিরছে, জামায় কাদার বড়ো বড়ো ছোপ। মা কপাল চাপড়াচ্ছেন। তারপরেই একটি ডিটারজেন্ট পাউডার নিমেষে কাদার দাগ উধাও করে দিলো। এটি একটি নাটকীয় উপস্থাপন। প্রতি সংসারেই নিত্য এমন ঘটনা ঘটছে। ব্যবহারকারী এক্ষেত্রে মা—এই বিজ্ঞাপনের মায়ের ভূমিকা এবং অভিব্যক্তির মধ্যে নিজের ভূমিকা এবং অভিব্যক্তির মিল দেখতে পাচ্ছেন। বিজ্ঞাপনের মায়ের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করছেন। তাঁর দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান সূত্র বলে, পণ্যটি ব্যবহারও করছেন। স্কুল থেকে ফেরা বাচ্চার কাদামাখা চেহারা এবং মায়ের আক্ষেপ, একটি বিশেষ মানবিক আবেদন সৃষ্টি করে। এই ধরনের নাটকীয় উপস্থাপনার বিজ্ঞাপন বিশেষ কার্যকরী।

৭.৩.৪ সংগীত মুখর

কোনো পণ্যকে ঘিরে একটি সংক্ষিপ্ত সংগীত সৃষ্টি ক'রে, দর্শকের মনে একটি বিশেষ আবেগ সঞ্চারিত করা সহজ। বিভিন্ন কথা বা শব্দের চেয়ে কোনো একটি সুর মনে রাখা মানুষের পক্ষে সহজ। কোনো সুর যদি দর্শনকে মুগ্ধ করে, তাহলে সেই সুর তাঁর স্মরণে বার বার ফিরে আসে। এবং সুর স্মরণে এলে, সেই সুর বিজ্ঞাপিত পণ্যটিও স্মরণ করিয়ে দেবে। তবে, সতর্ক থাকা প্রয়োজন, সুর যেন এমন মনোমুগ্ধকর না হয়, যে পণ্যের নামটি দর্শকের কাছে হারিয়ে যায়। অনেক পণ্য আছে, যেগুলির গুণের বিষয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই। সেই রকম ক্ষেত্রে সংগীতময় বিজ্ঞাপন সফল হয়, পণ্যের নাম দর্শককে স্মরণ করায়।

৭.৩.৫ নির্দেশাবলী

চাক্ষুষ রূপ দিন—টেলিভিশন মূলত দৃশ্য-মাধ্যম। আপনার পণ্যের বার্তাটির একটি চাক্ষুষ রূপ সৃষ্টি করুন। দর্শকের মনে বার্তার চাক্ষুষরূপই প্রভাব সৃষ্টি করে।

প্রদর্শন করুন—সম্ভব হলে আপনার পণ্যের গুণ এবং কর্মক্ষমতা প্রদর্শন করুন। টেলিভিশন প্রদর্শন করার যে সুযোগ দিয়েছে, সেটি কাজে লাগান।

সহজ করুন—আপনার বিজ্ঞাপন সংক্ষিপ্ত করতে হবে। সীমিত সময়ের মধ্যেই দর্শককে আপনার পণ্যের বার্তা জানাতে হবে। সহজভাবে দেখান এবং বলুন। দর্শকের বুঝতে সুবিধে হবে।

প্রাণবন্ত করুন—টেলিভিশন চলমান মাধ্যম, মুদ্রণ মাধ্যমের মত স্থির নয়। চলমান মাধ্যমের সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন। প্রাণবন্ত কিছু দেখান।

মনোরঞ্জন করুন—লোকে টেলিভিশন দেখে, সংবাদ বাদ দিলে, মূলত মনোরঞ্জনের জন্য। আপনার বিজ্ঞাপনে যেন মনোরঞ্জনের উপাদান থাকে। দর্শকের বিরক্তি জাগাবেন না।

বিশ্বাসযোগ্যতা—আপনার বিজ্ঞাপন যেন দর্শকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য প্রতিপন্ন হয়। বিশ্বাসযোগ্য না হলে বিজ্ঞাপন ব্যর্থ হয়।

চিহ্নিত দর্শক—নির্দিষ্ট, চিহ্নিত দর্শককে উদ্দেশ্য করে বিজ্ঞাপন সৃষ্টি করুন। তবেই বিজ্ঞাপন কার্যকরী হবে।

ব্র্যান্ড চিনিয়ে দিন—আপনার বিজ্ঞাপিত পণ্যের ব্র্যান্ড নাম চিনিয়ে দিন। বিজ্ঞাপনের মূল উদ্দেশ্য গ্রাহককে ব্র্যান্ড নাম চিনিয়ে দেওয়া, মনে করিয়ে দেওয়া। টেলিভিশনের সুযোগ নিন। প্রথম ১০ সেকেন্ডের মধ্যেই ব্র্যান্ড নাম দেখান। পরে যতোবার সম্ভব আবার দেখান।

পণ্যটি দেখান—যে বিজ্ঞাপন পণ্যটি যথাযথভাবে, অর্থাৎ, লেবেলসমেত শিশি অথবা মোড়ক অথবা কার্টন দেখিয়ে সমাপ্ত হয়, সেই বিজ্ঞাপনই কার্যকরী হয় বেশি। দোকানে গিয়ে আপনার গ্রাহক পণ্যটি চিনবে লেবেল, মোড়ক বা কার্টন দেখে।

খাবার লোভনীয় করুন—খাবারের বিজ্ঞাপন হলে রান্না, তৈরি খাবার এমনভাবে প্রাণবন্ত (ধোঁয়া উঠছে), বাস্তব ক'রে দেখান, যেন দর্শকের জিভে জল আসে।

ক্লোজআপ—মনে রাখবেন, আপনার বিজ্ঞাপনের নায়ক—আপনার পণ্য। সিনেমায় যেমন নায়কের ক্লোজআপ ছবি দেখানো হয়, আপনার বিজ্ঞাপনেও পণ্যের ক্লোজআপ দিন।

শুরুতেই ঝড় তুলুন—আপনার বিজ্ঞাপনের সময় সীমিত। শুরুতে প্রথম ফ্রেম থেকেই ঝড় তুলুন, দর্শক যাতে শেষ অবধি দেখতে বাধ্য হন।

নেপথ্য কণ্ঠ নয়—অনেক বিজ্ঞাপনে নেপথ্য কণ্ঠ পণ্যের নাম এবং গুণ জানায়। তার চেয়ে কেউ যদি সোজাসুজি আপনার চোখের দিকে তাকিয়ে পণ্যের নাম এবং গুণের বিষয়ে বলেন, আপনার কাছে সেটি বেশি বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে।

ব্যবহার দেখান—আপনার পণ্যের ব্যবহার চাক্ষুষ দেখানোর সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন। জানেন তো, চাক্ষুষ দেখা মানে বিশ্বাস করা।

৭.৪ স্টোরি বোর্ড

মুদ্রণ মাধ্যমের বিজ্ঞাপণের জন্য যেমন বিষয়লিপি রচনা করা হয় এবং বিষয়লিপি অনুসারে প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপনের চিত্ররেখা প্রস্তুত করা হয়, সেইরকমই, টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনের প্রস্তুতির জন্য স্টোরিবোর্ড রচনা

করা হয়। টেলিভিশনের পর্দায় যে বিজ্ঞাপন আপনারা দেখেন সেটি একটি প্রস্তাবিত 'স্টোরিবোর্ড' হিসাবেই হুবহু সৃষ্টি করা হয়।

টেলিভিশন মাধ্যম শ্রবণ-দৃশ্য মাধ্যম হলেও, কী দেখানো হচ্ছে এবং কেমন ভাবে দেখানো হচ্ছে, অর্থাৎ রূপকল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। আবার রেডিওর মতো, টেলিভিশনেও কথা, সুর-সংগীত এবং বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার করা হয় এবং সবই একটি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে করতে হয়। দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে সক্ষম হলে কানে শোনার অভিজ্ঞতার গভীরতার এবং চোখে দেখার অভিজ্ঞতার রূপকল্পের আবেদনের যথাযথ সংমিশ্রণে দর্শকের মনে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব। এর সঙ্গে যুক্ত আছে গতি এবং নাটকীয় চিত্র স্থাপন। এই কারণেই টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন কোনো পণ্যের অনুকূলে গ্রাহকের মনোভাব গঠন করতে বিশেষ পারদর্শী। এই শক্তিশালী মাধ্যমের বিজ্ঞানের জন্য বিশেষ বিচার বিবেচনা করে 'স্টোরিবোর্ড' রচনা একান্ত প্রয়োজন।

যে কোনো সফল টেলিভিশন বিজ্ঞাপনের মূল রহস্য একটি বিশেষ রূপকল্পের উপস্থাপন। যে রূপটি গ্রাহকের স্মরণ প্রক্রিয়ার সহায়তা হবে। এই একটি দৃশ্য সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপনটির মূল বক্তব্য। বিজ্ঞাপনটির সম্পূর্ণ বার্তার সারাৎসার।

টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনা বোঝানো বেশ কঠিন। এতগুলি উপাদানের সমন্বয়ে বিজ্ঞাপন প্রস্তুত হয়, যেমন রূপকল্প, কথা, শব্দ, সুর-সংগীত, দৃশ্যপট, গতি, বিভিন্ন রং, চরিত্র, এবং অভিনয়—সবকিছুর সমন্বয়ে টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনের সৃষ্টি হয়। বিষয়লিপি লেখক বিজ্ঞাপনটি কীভাবে সৃষ্টি করতে চাইছেন, অন্যদের সে বিষয়ে বোঝানো কঠিন। বিজ্ঞাপনের প্রস্তুতির অনুমোদনের জন্য বোঝানো প্রয়োজন এবং যে সব কলাকুশলীরা বিজ্ঞাপনটি প্রস্তুত করবেন, তাঁদেরও বোঝানো প্রয়োজন। না হলে, তাঁরা বিষয়লিপি লেখকের ভাবনা কে রূপ দেবেন কেমন করে? শ্রবণ-দৃশ্য বিজ্ঞাপনের জন্য একটি পাণ্ডুলিপি (script) রচনা করা একান্ত আবশ্যক।

প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপনের মূল বিষয়গুলির রূপরেখা পাণ্ডুলিপিতে বর্ণনা করা হয়। এই পাণ্ডুলিপিতে কয়েকটি ভাগ থাকে। বাঁদিকে একটি আয়তক্ষেত্র (টিভির স্ক্রিনের প্রতিরূপ) যার ভিতরে প্রস্তাবিত দৃশ্যটির স্কেচ থাকে, তার পাশে ডানদিকে কী কী কথা বলা হবে লেখা থাকে। তারও পরের কলামে শব্দ বা সুর-সংগীতের ব্যবহার থাকলে তার বিবরণ দেওয়া থাকবে। সবার শেষে সময় নির্দেশ —এই দৃশ্য কত সেকেণ্ডের হবে এবং হিসাব করে দেখতে হবে এই সময় সীমার মধ্যে প্রস্তাবিত কথাগুলি এবং শব্দ-সংগীতের ব্যবহার সম্ভব কিনা। মনে করুন, দৃশ্য দেখানো হচ্ছে—একটি ফিনাইলের বোতল। সঙ্গে কথা—ল্যাম্প ব্র্যান্ড ফিনিয়ল। কোনো শব্দ প্রয়োগের প্রস্তাব থাকলে, তার বিবরণ। বিভিন্ন দৃশ্যের জন্য যেমন বিস্তারিত নির্দেশ থাকে—কোন চরিত্র কী করবে, দৃশ্যপট কীরকম হবে, দৃশ্যপটের সাজসজ্জা কী রকম হবে, ঠিক সেই রকমই কথার ব্যবহার, গলার স্বরের কীরকম প্রক্ষেপ বা অভিনয় প্রয়োজন, সংগীতের ব্যবহার, সবকিছুরই বিস্তৃত বিবরণ দিতে হবে। না হলে, বিজ্ঞাপনটি যাঁরা তৈরি করবেন তাঁরা চিত্রগ্রহণ, (shooting), শব্দ-সংগীত রেকর্ডিং এবং সম্পাদনা করবেন কী করে?

দৃশ্যের জন্য চারটি বিষয় বলা দরকার। দূরত্ব, ক্যামেরা কী ভাবে দৃশ্য গ্রহণ করবে, ক্যামেরার স্থান

পরিবর্তন এবং বিশেষ কৌশল (effect)। এই পাণ্ডুলিপির উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপনের কাহিনী এবং বক্তব্য এবং সেটি উপস্থাপনের মূল কৌশলগুলি বিবৃত করা। প্রতিটি দৃশ্যের সঙ্গে কথা এবং শব্দ প্রয়োগের সামঞ্জস্য বজায় রাখা। আর কাহিনীর চলমানতা বা ঘটনাবলী (action) বজায় রাখার নির্দেশিকা। কাহিনীর শুরু, অগ্রগতি এবং পরিণতি। আর, আগেই বলা হয়েছে, প্রতিটি দৃশ্যের প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে সময়সীমা দেওয়া থাকে, অর্থাৎ, কত সেকেণ্ডের মধ্যে দৃশ্য এবং আনুসঙ্গিক সব কিছু সম্পূর্ণ করতে হবে।

সাধারণত বড়ো পোস্টার বোর্ড কাগজ জুড়ে স্টোরি বোর্ড তৈরি করা হয়। দৃশ্যপটের জন্য জায়গা দেখানো হয় ৩ : ৪ অনুপাতে এবং চারটি কোণ গোল করে দেখানো হয়—টিভির পর্দার অনুরূপ।

নীচে একটি 'স্টোরি বোর্ডে'র নমুনা দেওয়া হলো।

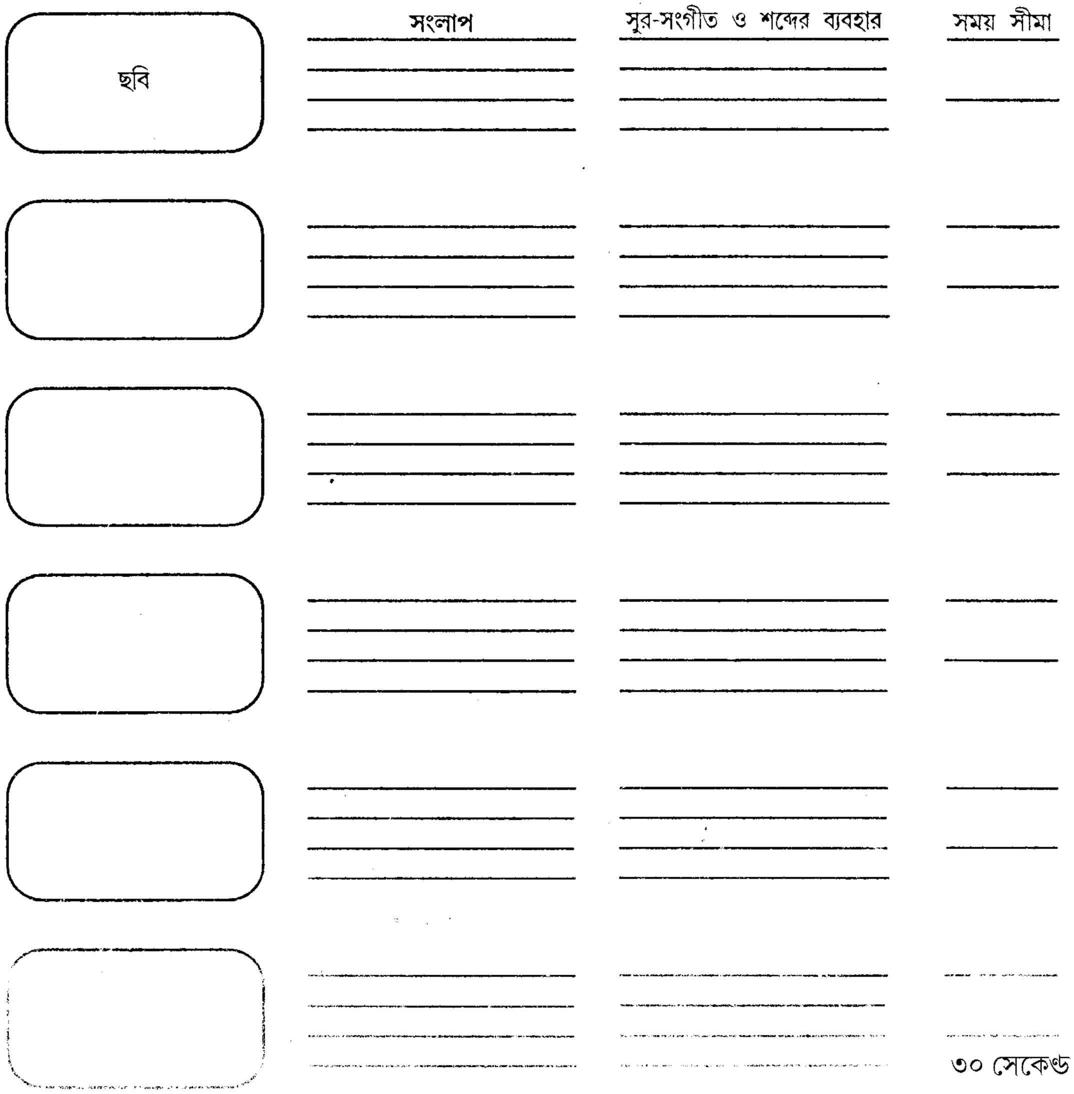

টেলিভিশন বিজ্ঞাপন-এর স্টোরি বোর্ড

৭.৫ ইনটারনেট-এর বিজ্ঞাপন

টেলিভিশনের পরে বিজ্ঞাপনের আধুনিকতম মাধ্যম ওয়েবসাইট....ইনটারনেট, কমপ্যুটার। ইনটারনেট-এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ব্যবহারকারীকে সকল রকমের সংবাদ সরবরাহ করা হয়। এই নতুন মাধ্যম বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহার করতে হলে এই মাধ্যমের বৈশিষ্ট্য জানা প্রয়োজন। সংবাদপত্র, সাময়িকী এবং টেলিভিশনে যে বিজ্ঞাপন আপনারা দেখে থাকেন, ইনটারনেটে প্রচারিত বিজ্ঞাপনের আকার এবং চরিত্র তার থেকে পৃথক। যেমন, সংবাদপত্র, সাময়িকীর থেকে টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনের আকার, চরিত্র মাধ্যম অনুযায়ী ভিন্ন হয়ে যায়, সেইরকম ইনটারনেট-এর বিজ্ঞাপনও মাধ্যম অনুযায়ী আকারে ও চরিত্রে পরিবর্তিত হয়।

ইনটারনেট-এ বিজ্ঞাপনের ভিত্তি "ওয়েবপেজ"। এই ওয়েবপেজ চালুরাখার জন্য বার্ষিক এবং মাসিক হিসাবে টাকা দিতে হয়। এই বিজ্ঞাপনে বিষয়ই মূল আকর্ষণী শক্তির কাজ করে। কারণ ব্যবহারকারীর যদি বিষয়টি মনোমত না হয়, তিনি তৎক্ষণাৎ অন্য 'পেজ' এ চলে যাবেন। বিজ্ঞাপনে মূল বিষয়টি লেখার সঙ্গে সঙ্গে রূপকল্পের ব্যবহারের দ্বারা বক্তব্য বিষয়কে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয়। "ওয়েব-পেজ" এর ভূমিকা পত্রিকার প্রকাশকের মত। তাঁরা বিজ্ঞাপনদাতার অর্থের বিনিময়ে তাঁদের বিজ্ঞাপন 'পেজ' এ রাখেন। সংবাদপত্র বা সাময়িকীতে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় কিন্তু ওয়েব সাইট-এর বিজ্ঞাপন সেই তুলনায় অনেক সক্রিয়। অনলাইন কেনাকাটাও ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, তার ফলে এই বিজ্ঞাপনের গুরুত্বও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিজ্ঞাপনদাতা সাধারণত সংবাদপত্র বা সাময়িকীর বিজ্ঞাপনে এবং টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনেও তাঁদের "ওয়েব সাইট" এ আসার জন্য গ্রাহকদের অনুরোধ করেন। গ্রাহক ও ব্যবহারকারী "ওয়েব সাইট"টি দেখতে উৎসাহ বোধ করলে, তবেই দেখবেন।

৭.৫.১ বৈশিষ্ট্য

ওয়েব (Web) বিজ্ঞাপনের একটি বৈশিষ্ট্য—বিজ্ঞাপনদাতা ও গ্রাহকের মধ্যে এক অনবদ্য যোগাযোগ বা সম্পর্ক। অন্যান্য মাধ্যম বিজ্ঞাপনদাতাকে গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করে। বিজ্ঞাপনদাতাও বিজ্ঞাপিত পণ্যটির কিছু সফল নির্বাচিত বার্তা গ্রাহকদের কাছে পেশ করেন। বিজ্ঞাপনদাতার বিশেষভাবে তৈরি বিজ্ঞাপন, সে সংবাদপত্র বা টেলিভিশন, যে মাধ্যমেই প্রচারিত হোক না কেন, উদ্দীষ্ট গ্রাহক সেটি দেখতে পারেন, আবার একেবারে অগ্রাহ্যও করতে পারেন। ইন্টারনেট (internet) ক্ষমতার এই কেন্দ্র বিন্দু পরিবর্তন ক'রে গ্রাহকদের দিকে সরিয়ে দিয়েছে। সম্ভাব্য গ্রাহকরা অনেক চিন্তা-ভাবনা ক'রে স্থির করেন, তাঁরা কী দেখতে চান। স্বভাবতই, বিজ্ঞাপনদাতার মনে প্রশ্ন, গ্রাহকেরা বিজ্ঞাপন দেখছেন কেন?

অন্যান্য মাধ্যমে, সংবাদপত্রে জায়গা এবং টেলিভিশনে সময় অত্যন্ত সীমিত। পণ্য বা পরিষেবার বিস্তৃত বিবরণ, খুঁটিনাটি জানানো সম্ভব নয়। ওয়েব বিজ্ঞাপনের মূল সূত্র গ্রাহকের কতটা সময় বিজ্ঞাপনদাতা নিতে পারবেন? গ্রাহকরা কিন্তু আশা করেন, ওয়েব-এ তাঁরা প্রয়োজনীয় পণ্য বা পরিষেবা সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য পাবেন। বিজ্ঞাপনদাতার লক্ষ্য সম্ভাব্য সকল তথ্য এমন আকর্ষণীয় ভাবে পরিবেশন করা, যাতে গ্রাহকরা তাঁর ওয়েব পেজ বারবার খুলতে উৎসাহিত বোধ করেন।

মনে রাখতে হবে, ওয়েব বিজ্ঞাপনের সূচনায় বিশেষ গিফট এবং অন্যান্য উপহারের প্রস্তাবই ওয়েব বিজ্ঞাপনকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। ইন্টারনেট সমাজ সাধারণ সংবাদপত্রের পাঠক বা টেলিভিশনের দর্শক

সমাজের থেকে ভিন্ন চরিত্রের। তাঁরা এখনও 'উপহার' এবং 'বিশেষ সুযোগ' এর মায়া থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারেননি। কাজে কাজেই ওয়েব বিজ্ঞাপন রচনার সময় বিষয়লিপি লেখককে চেষ্টা করতে হবে, গ্রাহকদের 'বিশেষ সুযোগ' বা 'উপহার' দেওয়ার। আর, মনে রাখবেন, ইনটারনেট যাঁরা ব্যবহার করেন, তাঁরা জোটবদ্ধ। আপনার বিজ্ঞাপনে যদি এমন কিছু থাকে যা কোনো গ্রাহকের বিরক্তি উদ্রেক করবে বা অসন্তুষ্ট করবে, তাহলে তিনি খুব সহজেই অসংখ্য ইনটারনেট ব্যবহারকারীকে আপনার বিজ্ঞাপন এবং পণ্য বা পরিষেবার অভিজ্ঞতার কথা জানাতে পারেন। অতএব বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

ওয়েব পেজ বিজ্ঞাপনের তিনটি অংশ আছে। শিল্পগত বিষয়, বিপণন সংক্রান্ত এবং কারিগরী। শিল্পগত বিষয়, আপনাকে চিন্তা করতে হবে পণ্যের বা পরিষেবার কীরকম ভাবমূর্তি প্রচার করবেন, বার্তা কতখানি কার্যকরী রূপে প্রয়োগ করবেন এবং কী কী রং ব্যবহার করবেন ইত্যাদি। বিপণনসংক্রান্ত বিষয়, বলাবাহুল্য প্রথাগত বিপণন কৌশল কীভাবে উপস্থাপন করবেন। আর কারিগরী বিষয়—আপনার ওয়েব পেজ কীভাবে অনলাইনে যাবে।

ওয়েবকে বলা যেতে পারে ইনটারনেট-এর মালটিমিডিয়া শাখা। শব্দ, এ্যনিমেশন এবং দৃশ্য (Video) ইনটারনেট-এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। মুদ্রণ মাধ্যমে বলা হয়, একটি চিত্র হাজার শব্দের সমান প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ইনটারনেট-এর ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে হাজার নয়, লক্ষ শব্দের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে চিত্ররূপ। বর্তমানে ইনটারনেট এত বিচিত্র এবং বিভিন্ন রঙের চিত্ররূপ পরিবেশন করে, বিজ্ঞাপনদাতার পক্ষে যা অভাবনীয় সুযোগ বলে গণ্য হয়।

৭.৫.২ কৌশল

ওয়েব বিজ্ঞাপনে প্রথম "পেজ"-এ বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন বক্তব্য আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপন করতে হবে। সেখানে আরো জানাতে হবে (প্রয়োজন অনুসারে) পরবর্তী "পেজ"গুলিতে কী কী আছে। প্রথম "পেজ"-কত আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপন করবেন, তার উপরেই নির্ভর করবে, গ্রাহক আপনার ওয়েব বিজ্ঞাপনের পরবর্তী কোনো "পেজ" "ডাউনলোড" করবেন কী না। কিন্তু, মনে রাখবেন, গ্রাহক আপনার ওয়েব বিজ্ঞাপনের যে কোনো "পেজ"-এ সরাসরি যেতে পারেন। প্রথম "পেজ" হয়েই যেতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই। কাজেই প্রতিটি "পেজ"ই বিশেষ দ্রষ্টব্য হয়ে ওঠা প্রয়োজন।

৭.৫.৩ ব্যানার

ওয়েব পেজ-এ যে সব বিজ্ঞাপন আসে, সেগুলিকে বলা হয় "ব্যানার বিজ্ঞাপন"। ব্যানার বা চিত্ররূপ বিভিন্ন আকার এবং মাপে আসতে পারে। ব্যানারের আকার এবং মাপ যাই হোক না কেন, সেটি যেন গ্রাহকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয় বিজ্ঞাপনের বার্তা কার্যকরীভাবে জানাতে সফল হয়। সাধারণত দেখা গেছে, যে সব বিজ্ঞাপনে কোনো প্রশ্ন থাকে, সেগুলির উত্তর জানার জন্য গ্রাহকেরা উৎসুক হয়ে পড়েন এবং প্রশ্নের উত্তর জানার পরে স্বস্তি বোধ করেন। এই পদ্ধতিতে বিজ্ঞাপনের বার্তা বিশ্বাসযোগ্য (Convincing) রূপে গ্রাহককে জানানো সম্ভব।

যাঁরা ইনটারনেট-এ বিভিন্ন তথ্য অন্বেষণ করেন তাঁরা প্রথমে "বিষয়" বিভাগ দেখেন। কাজেই, "বিষয়" বিভাগে এক দু লাইনে সংক্ষিপ্তভাবে বিজ্ঞাপনের মূল বার্তা জানাতে হবে। গ্রাহক উৎসাহিত বোধ করলে তবেই "পেজ" টি খুলবেন। গ্রাহকের পক্ষে প্রয়োজনীয় বার্তা আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থিত করলে তবেই সফল হবেন।

"অন লাইন"-এ গ্রাহকেরা পড়েন না। চোখ বুলিয়ে দেখেন। কোনো "মেসেজ" খুলে কয়েক লাইন মাত্র পড়েন, তারপরেই অন্যত্র চলে যান। মূল বার্তাটি প্রথম সুযোগেই আকর্ষণীয়ভাবে জানাতে হবে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য গ্রাহকেরা অন্বেষণ করবেন, আপনি যদি কৌতূহল জানাতে, আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারেন, তবেই। ব্যানার বিজ্ঞাপনের জনপ্রিয়তা এবং সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়ছে।

যে "ওয়েব পেজ" বেশি সংখ্যক গ্রাহককে আকর্ষণ করতে সমর্থ, সেই রকম কোনো "পেজ"-এ ব্যানার বিজ্ঞাপন দিলে বেশি সংখ্যক গ্রাহকের কাছে বিজ্ঞাপনের বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায়। তবে, গ্রাহকেরা যেহেতু তাঁদের প্রয়োজনমত সাইট-ই দেখেন, সেই কারণে, বিজ্ঞাপিত পণ্য বা পরিষেবার সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে এমন "ওয়েব পেজ"-এ ব্যানার বিজ্ঞাপন প্রচার হলে ভালো ফল পাওয়া যায়। আগেই আলোচনা হয়েছে যে গ্রাহকের মনোমত না হলে, প্রথম "পেজ" থেকে তিনি অন্যত্র চলে যান। সেই কারণে, প্রথম "পেজ"-এ ব্যানার বিজ্ঞাপনের রেট বেশি, পরবর্তী "পেজ" গুলির রেট-এর তুলনায়। বিজ্ঞাপনদাতারাও সচেষ্ট হন, তাঁদের ব্যানার বিজ্ঞাপন প্রথম "পেজ" এ প্রকাশ করার জন্য।

এইসব ব্যানার বিজ্ঞাপনও সংবাদপত্র এবং সাময়িকীর বিজ্ঞাপনের মতই বিজ্ঞাপন সংস্থার দ্বারা বিশেষভাবে তৈরি, যাতে বিজ্ঞাপনগুলি কার্যকরী হয়। সাধারণ বিজ্ঞাপন সংস্থা ছাড়াও এই বিজ্ঞাপন তৈরি এবং প্রচারের জন্য বিশেষ পরিষেবা গোষ্ঠী ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে।

৭.৫.৪ বিষয়লিপি

বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি—অর্থাৎ শিরোনাম এবং বিশদ বিষয়লিপি। শিরোনাম সাধারণত সংক্ষিপ্ত এবং কয়েকটি মাত্র শব্দের দ্বারা রচিত। বিষয়লিপি বিজ্ঞাপনের শিরোনামের বক্তব্য বিশদভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। মুদ্রণ মাধ্যমের বিজ্ঞাপনে দেখা গেছে ভালো শিরোনাম বিজ্ঞাপনের সাফল্যের মূল কারণ। শিরোনাম কার্যকরী না হলে, খুব ভালো বিষয়লিপিও বিজ্ঞাপনকে সফল করতে সক্ষম হয়না। কারণ, শিরোনাম ভালো না হলে গ্রাহক তো বিষয়লিপি পড়বেনই না, বা পড়তে উৎসাহ বোধ করবেন না।

আর, ব্যানার বিজ্ঞপনে শিরোনামই সব। ব্যানার যদি গ্রাহকের উৎসাহ, আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে, তবেই গ্রাহক "পেজ"-এ বিস্তৃত তথ্য দেখবেন। শিরোনাম-এর উপরেই ব্যানার বিজ্ঞাপনের সাফল্য নির্ভর করে।

মুদ্রণ মাধ্যমের বিজ্ঞাপনে যেমন চিত্রের ব্যবহার করা হয়, ওয়েব বিজ্ঞাপনেও একই উদ্দেশ্যে চিত্রের ব্যবহার করা হয়। যে চিত্রটি ব্যবহার করবেন, সেটি যেন আপনার পণ্যকে এবং পণ্যের কার্যকরিতাকে আকর্ষণীয় ক'রে তোলে। সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপনটি, সমস্ত চিত্ররূপ সহ যেন একসূত্রে বাঁধা হয় এবং একটি মূল বার্তা প্রচার করতে সক্ষম হয়।

ওয়েব পেজ তৈরি করার সময় সতর্ক থাকতে হয় রঙের ব্যবহারে। আড়াইশোর বেশি রং আপনি ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু এই সব রঙের সূক্ষ্ম বিভাজন যিনি ওয়েব পেজ দেখছেন, তাঁর পক্ষে ধরা সম্ভব না-ও হতে পারে। আপনার চিত্ররূপের সক্ষ্ম বিভাগ এবং উপস্থাপন ব্যাহত হতে পারে। সীমিত সংখ্যক, বিপরীতধর্মী রঙের ব্যবহারে ভালো ফল পাওয়া যায়। আর মনে রাখবেন, জটিল চিত্ররূপ ব্যবহার করলে, "ডাউনলোড" করতে সময় বেশি লাগবে। ফলে গ্রাহক অধৈর্য এবং বিরক্ত হতে পারেন।

ব্যানার বিজ্ঞাপনে সাধারণত প্রথমে বক্তব্য জানিয়ে পরে চিত্ররূপ দেখানো হয়। সকল ব্যানার বিজ্ঞাপন গ্রাহককে উৎসাহিত করে পরবর্তী "পেজ" দেখার জন্য। "আরো আছে। এখানে ক্লিক করুন" (More,

click here)। —গ্রাহককে উৎসাহিত করে। "আপনি বা আপনার", "টাকা বাঁচান", "নতুন", "কেমন করে" ইত্যাদি শব্দ গ্রাহককে সহজে সাহায্য করে, উৎসাহিত করে, অনুপ্রাণিত করে।

কয়েকবার দেখার পরে একই ব্যানার বিজ্ঞাপন গ্রাহককে আর আকর্ষণ করতে পারে না, পুনরুক্তি বলে। সেই কারণে ব্যানার কিছুদিন অন্তর পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

৭.৬ সারাংশ

রেডিও শ্রবণ মাধ্যম। রেডিওর বিজ্ঞাপন শব্দ, ধ্বনি এবং সংগীতের মাধ্যমে গ্রাহকদের মনে রূপকল্পের সৃষ্টি করে। বার বার শোনার ফলে এই রূপকল্প গ্রাহকের মনে একটি স্থান অধিকার করে। ভারতের জনসংখ্যার বিপুল অংশ গ্রামবাসী। এই বিপুল সংখ্যক গ্রাহকদের কাছে পণ্য এবং পরিষেবার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য রেডিও অত্যন্ত কার্যকরী মাধ্যম। বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য এবং কৃষিকার্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপন রেডিওতে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়।

টেলিভিশন শ্রবণ-দৃশ্য মাধ্যম। এই মাধ্যমের বিজ্ঞাপনে রূপকল্পের ব্যবহার বিশেষ কার্যকরী। সেই কারণেই বিভিন্ন কলাকৌশলের সাহায্যে বিজ্ঞাপন সৃষ্টি করা হয় যাতে গ্রাহকদের মনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়। ভোগ্যপণ্যের প্রচারে পণ্যটিকে লোভনীয় করে উপস্থাপনের সুযোগ করে দেয় টেলিভিশন। বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন প্রস্তুত এবং প্রচারের বিষয়ে।

ইনটারনেট বিজ্ঞাপন বর্তমানে ক্রমে ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তবে, ইনটারনেট-এর বিজ্ঞাপনের সুবিধা যেমন আছে, তেমনই সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। গ্রাহক তাঁর প্রয়োজনমত বার্তা সংগ্রহ করেন। কাজেই ইনটারনেট-এর বিজ্ঞাপন কৌশল উদ্দীষ্ট গ্রাহকের প্রয়োজন চিন্তা করেই নির্ধারণ করা হয়।

৭.৭ অনুশীলনী

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন

১) কী ধরনের পণ্য এবং পরিষেবার প্রচারের জন্য রেডিও-র মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত? আলোচনা করুন।

২) টেলিভিশন কোন কোন পণ্যের বিজ্ঞাপনের জন্য আদর্শ মাধ্যম হিসাবে গণ্য হয়? বিশদ ব্যাখ্যা করুন, উদাহরণ সহ।

টীকা লিখুন

১) নাটকীয়তা ২) ব্যানার

৭.৮ গ্রন্থপঞ্জী

1. Advertising : Its Role in Modern Marketing—S. Watson Dunn / Arnold N. Barban
2. Confessions of An Advertising Man : David Ogilvy.
3. Ogilvy on Advertising : David Ogilvy.
4. Publicity on Internet : Steve O'Keepe

একক ৮ ❑ বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত নীতি, আইন এবং সংগঠন

গঠন

৮.০ উদ্দেশ্য

৮.১ প্রস্তাবনা

৮.২ ডি. এ. ভি. পি.

৮.৩ আই. এন. এস.

৮.৪ এ. বি. সি.

৮.৫ এ. এস. সি. আই

৮.৬ এন. আর. এস.

৮.৭ এ. এ. এ. আই

৮.৮ সারাংশ

৮.৯ অনুশীলনী

৮.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৮.০ উদ্দেশ্য

বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত নীতি, আইন এবং বিভিন্ন সংগঠন সম্বন্ধে এই এককে আলোচনা করা হয়েছে। এই এককটি পাঠ করে আপনারা এই সংগঠনগুলির কার্যাবলী এবং বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত পালনীয় নীতি সম্বন্ধে জানতে পারবেন

- ডি. এ. ভি. পি. (D.A.V.P.)
- আই. এন. এস. (I.N.S.)
- এ. বি. সি. (A.B.C.)
- এ. এস. সি. আই. (A.S.C.I.)
- এন. আর. এস. (N.R.S.)
- এ. এ. এ. আই. (A.A.A.I.)

৮.১ প্রস্তাবনা

বর্তমান সমাজে বিজ্ঞাপন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিজ্ঞাপন যাতে মানুষের জীবনযাত্রার এবং সামাজিক উন্নতির সহায়ক হয়, সাধারণ নাগরিকদের বিভ্রান্ত করতে না পারে, বা সমাজের বা জাতির পক্ষে ক্ষতিকারক কোনো প্রচার করতে সমর্থ না হয়, তার জন্য সরকারের কতকগুলি আইন কার্যকরী আছে। বিজ্ঞাপন সংস্থা এবং বিভিন্ন মাধ্যমের কয়েকটি সংগঠন তাদের নিজ নিজ সংগঠনের নিয়মাবলী দ্বারা জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্য সদস্যদের সজাগ রাখেন। সংস্থাগুলির সদস্যদের জন্যও আচরণবিধি আছে। পেশাগত ভাবে বিজ্ঞাপনের মান রক্ষা এবং উন্নত করার নির্দেশাবলীর সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়িক বিষয়েও আচরণবিধি আছে। সদস্য সংস্থাগুলির প্রতিযোগিতা যাতে মাত্রাহীন হয়ে না পড়ে, তার প্রতিও নজর রাখা হয়, এই সব সংগঠনগুলির বিভিন্ন বিধিনিষেধের দ্বারা। একটি সংস্থা বিভিন্ন মুদ্রণমাধ্যমের প্রচার সংখ্যা পরীক্ষা করে প্রমাণিত করেন ; আর একটি সংগঠন বিভিন্ন মাধ্যমের পাঠকদের, শ্রোতাদের এবং দর্শকদের বিষয়ে সমীক্ষা করে, প্রতিবেদন প্রকাশ করেন, মাধ্যম নির্বাচনে বিজ্ঞাপনদাতাদের সহায়তা করার জন্য। নীতি বহির্ভূত এবং কুরুচীপূর্ণ বিজ্ঞাপনের অভিযোগ হলে, বিজ্ঞাপনদাতা এবং সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন সংস্থার সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন অপর একটি সংস্থা।

৮.২ ডি. এ. ভি. পি

ডাইরেকটরেট অফ এ্যাডভার্টাইজিং এ্যান্ড ভিসুয়াল পাবলিসিটি (Directorate of Advertising and Visual Publicity) ভারত সরকারের কেন্দ্রিয় বিজ্ঞাপন সংস্থা। ভারত সরকারের তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রক (Ministry of Information and Broadcasting)-এর একটি শাখা। ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক এবং মন্ত্রকের বিভিন্ন সংস্থার বিজ্ঞাপন এবং অন্যান্য প্রচার অভিযানের ব্যবস্থা করে ডি. এ. ভি. পি.। পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ ব্যতীত বিভিন্ন মুদ্রিত প্রচার, যেমন পোস্টার, ফোল্ডার, লিফলেট, পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশ এবং বিতরণ করে ডি. এ. ভি. পি.। হোর্ডিং, রেডিও এবং দূরদর্শনের মাধ্যমে ভারত সরকারের নানাবিধ প্রচারের ব্যবস্থাও ডি. এ. ভি. পি. করে। ডি. এ. ভি. পি.-র কেন্দ্র সারা ভারতে ছড়িয়ে আছে। এই সব কেন্দ্রের মাধ্যমে নিয়মিত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও আছে। ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের নীতি এবং পরিকল্পনা প্রচার করাই ডি. এ. ভি. পি.-র মূল কাজ।

সাময়িক এবং দীর্ঘস্থায়ী লক্ষ্য পূরণের জন্য জাতীয় প্রচার অভিযান পরিকল্পনা এবং কার্যকরী করে এই সংস্থা। পরিবার পরিকল্পনা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, জাতীয় ঐক্য ইত্যাদি বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রচার অভিযান এই সংস্থা করেছে। ডি. এ. ভি. পি-র অন্যান্য প্রচার অভিযানের মধ্যে রয়েছে স্বল্প সঞ্চয়ে উৎসাহদান, তাঁত ও হস্তশিল্প (Handloom and Handicraft) জনপ্রিয় করার জন্য প্রচার অভিযান।

রেলওয়ে ব্যতীত, বিভিন্ন মন্ত্রক এবং বিভাগের বিজ্ঞাপন বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং পত্রিকায় প্রকাশ করে ডি. এ. ভি. পি.। ভারত সরকারের বিজ্ঞাপন প্রচারের নীতি, প্রচারের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা এবং বাজেটের অনুমোদন অনুসারে বিভিন্ন মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত ভাবে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করাই ডি. এ. ভি. পি.-র লক্ষ্য। সরকারের

সাধারণ সামাজিক লক্ষ্য অনুসারে ডি. এ. ভি. পি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে,—ছোটো এবং মাঝারি, সংবাদপত্র ও সাময়িকী, বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ পত্রিকা এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সংক্রান্ত বিভিন্ন পত্রিকা। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা এবং দেশের বিভিন্ন পিছিয়ে থাকা অঞ্চল থেকে প্রকাশিত সাময়িকীও ডি. এ. ভি. পি. বিশেষ ভাবে বিবেচনা করে, সরকারী বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য।

৮.৩ আই. এন. এস.

ইণ্ডিয়ান নিউজপেপার সোসাইটি (Indian Newspaper Society) নামক সংস্থাকে সংক্ষেপে আই. এন. এস. (I.N.S) বলা হয়। সংবাদপত্র-পত্রিকা প্রকাশনা এবং বিজ্ঞাপন জগতে এটি একটি সর্বজন-পরিচিত এবং বহু ব্যবহৃত নাম।

এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠাকালে সংস্থাটির নাম ছিল 'ইণ্ডিয়ান এ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজপেপার সোসাইটি'। পরবর্তীকালে নাম পরিবর্তন ক'রে ইণ্ডিয়ান নিউজপেপার সোসাইটি হয়। আই. এন. এস. প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সংবাদপত্র-পত্রিকার সংস্থা। আই. এন. এস.-কে ভারতের সমস্ত মুদ্রিত পত্র-পত্রিকার, দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, দ্বৈমাসিক ও অন্যান্য সাময়িকীর প্রতিনিধিমূলক সংগঠন হিসাবে গণ্য করা হয়। সকল সদস্য পত্র-পত্রিকার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য আই. এন. এস নথিভুক্ত রাখে। যেমন, পত্রিকার মালিকানা, সম্পাদক, কোথা থেকে প্রকাশিত হয়, কতদিন অন্তর (দৈনিক মা সাপ্তাহিক) প্রকাশিত হয়, পত্রিকার প্রচার সংখ্যা কত এবং বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের হার কী। আই. এন. এস.-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় নতুন দিল্লীতে। বিভিন্ন প্রদেশের রাজধানীতে অবস্থিত মোট তেরোটি আঞ্চলিক কমিটির মাধ্যমে আই-.এন. এস্. কার্য পরিচালনা করে।

ভারতের সংবাদপত্র শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা আই. এন. এস. পর্যালোচনা করে এবং নির্দিষ্ট সমস্যার বিষয়ে সংবাদপত্র শিল্পের বক্তব্য তুলে ধরে। ভারত সরকারও সংবাদপত্র শিল্পের প্রতিনিধি হিসাবে আই. এন. এস.-এর বক্তব্য যথাযোগ্য গুরুত্ব সহকারে শোনেন এবং বিবেচনা করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, নিউজপ্রিন্ট সংক্রান্ত সরকারি নীতি এবং সংবাদপত্র শিল্পের অন্যান্য বিষয় নিয়ে, সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হিসাবে আই. এন. এস. সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেন।

সংবাদপত্র-পত্রিকার স্বার্থ-রক্ষার জন্য গঠিত সংস্থা আই. এন. এস। কোনো বিজ্ঞাপনদাতা বা বিজ্ঞাপন সংস্থা কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের টাকা যথাসময়ে না দিলে আই. এন. এস. ঐ কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। আই. এন. এস.-এর নির্দেশ অনুসারে কোনো পত্রিকা ঐ ঋণখেলাপি (defaulter) কোম্পানির বা বিজ্ঞাপন সংস্থার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করবে না, যতক্ষণ না পূর্বের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়।

সংবাদপত্র-পত্রিকার প্রতিনিধিমূলক এই সংগঠনের সদস্য মুখ্যত বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রিকা। এই সংস্থা বিভিন্ন বিজ্ঞাপন সংস্থাকে সদস্যপদ দেয়। সংবাদপত্র পত্রিকার আয়ের মূল উৎস বিজ্ঞাপন। আর, বিভিন্ন বিজ্ঞাপনদাতার বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় বিজ্ঞাপন সংস্থার মাধ্যমে। সাধারণ মানুষের নানা রকম প্রয়োজন মেটাতে শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপনদাতা সরাসরি সংবাদপত্রে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রদর্শনমূলক বিজ্ঞাপন বেশির ভাগই আসে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন সংস্থার মাধ্যমে। পত্রপত্রিকার

স্বার্থে, বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলির আচরণবিধি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যই বিজ্ঞাপন সংস্থাকে আই. এন. এস.এ সদস্যপদ দেওয়া হয়।

আই. এন. এস.-এর সদস্যপদের জন্য এই সংগঠনের বিজ্ঞাপন সংস্থা সংক্রান্ত এবং অন্যান্য সমস্ত নিয়মাবলী মেনে চলার অঙ্গীকার করতে হয় বিজ্ঞাপন সংস্থাকে। নিয়ম অনুযায়ী সদস্য হলে তবেই কোনো বিজ্ঞাপন সংস্থাকে আই. এন. এস. দ্বারা "স্বীকৃত" বিজ্ঞাপন সংস্থা হিসাবে গণ্য করা হয়। এই সংগঠন দ্বারা "স্বীকৃত" বিজ্ঞাপন সংস্থা তাঁদের মাধ্যমে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সকল বিজ্ঞাপনের মোট মূল্যের শতকরা ১৫% ভাগ কমিশন পত্র-পত্রিকার কাছ থেকে পাওয়ার অধিকারী হন। সেই সঙ্গে সদস্য বিজ্ঞাপন সংস্থা সংবাদপত্রকে মূল্য দেওয়ার জন্য ধার পাওয়ারও অধিকারী হন। বর্তমানে এই ধারের মেয়াদ ষাট দিন অর্থাৎ, কোনো পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের ষাট দিনের মধ্যে বিজ্ঞাপন সংস্থাকে সংশ্লিষ্ট পত্রিকাকে, প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মূল্য দিতে হবে। ধারের মেয়াদ অবস্থা অনুসারে, সময় সময় পরিবর্তিত হয়। কেবলমাত্র "স্বীকৃত" বিজ্ঞাপন সংস্থাই এই সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন। এই কারণেই বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলি আই. এন. এস.-এর সদস্যপদ গ্রহণ করে।

সদস্যপদের জন্য আই. এন. এস. এর স্বীকৃতিদান সংক্রান্ত নিয়ম অনুযায়ী, বিজ্ঞাপন সংস্থাকে আবেদন করতে হয়। নিচের শর্তগুলি পূরণ করলে তবেই কোনো বিজ্ঞাপন সংস্থার সদস্যপদের জন্য আবেদন বিবেচিত হবে।

১. সদস্য সংবাদপত্র পত্রিকায় একটানা ১২ মাসের মধ্যে কমপক্ষে ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের বিজ্ঞাপন, আবেদনকারী বিজ্ঞাপন সংস্থা প্রকাশিত করেছে। এই সব বিজ্ঞাপন অন্তত পাঁচটি বিভিন্ন বিজ্ঞাপনদাতার মোট বিজ্ঞাপন হওয়া প্রয়োজন। এই পাঁচটি বিজ্ঞাপনদাতার অন্তত একটি বিজ্ঞাপনদাতাকে অবশ্যই জাতীয় বিজ্ঞাপনদাতা হিসাবে গণ্য হতে হবে। যে বিজ্ঞাপনদাতার ব্যবসা এবং পণ্যের বন্টন ব্যবস্থা বিজ্ঞাপনদাতার মূল কার্যালয় যে প্রদেশে অবস্থিত সেই প্রদেশ ব্যতীত অন্তত আরো দুটি প্রদেশে বিস্তৃত, এমন বিজ্ঞাপনদাতাই জাতীয় বিজ্ঞাপনতাদা হিসাবে গণ্য হবেন।

আবেদনকারী বিজ্ঞাপন সংস্থাকে সাময়িক বা "অস্থায়ী স্বীকৃতি" বা সদস্যপদ দেওয়ার বিধি অনুযায়ী কমপক্ষে ২৫ লক্ষ টাকা মূল্যের বিজ্ঞাপন একটানা বারো মাস বা তার কম সময়ের মধ্যে সদস্য সংবাদপত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হলে, তবেই বিবেচনা করা হয়।

● মূলধন — পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির পক্ষে ২ লক্ষ টাকা এবং সমবায় বা অন্যান্য মালিকানার ক্ষেত্রে ১ লক্ষ টাকা কার্যকরী মূলধন থাকা প্রয়োজন।

● জামিন জমা — আবেদনকারী কোনো নতুন বিজ্ঞাপন সংস্থা হলে, সংস্থাকে তিন বছরের জন্য জামিন জমা রাখতে হবে অথবা ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি দিতে হবে। জামিন-জমার টাকার অঙ্ক আই. এন. এস. স্থির করে।

● ব্যক্তিগত প্রত্যাভূতি (Personal guarantee)—ধারের মেয়াদ সীমার মধ্যে বিজ্ঞাপনের মূল্য দিতে অসমর্থ বিজ্ঞাপন সংস্থার পরিচালকদের কাছে আই. এন. এস. ব্যক্তিগত প্রত্যাভূতি দাবি করতে পারে।

● আবেদনকারীর ব্যবসার নির্দিষ্ট ঠিকানা এবং উপযুক্ত অফিস থাকা আবশ্যক।

● আবেদনকারীর বিজ্ঞাপন সংস্থাটি আইন সংগঠিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হওয়া আবশ্যক।

● আবেদনকারী বিজ্ঞাপন সংস্থার উপর কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ বা মালিকানা থাকবে না। কোনো সংবাদপত্র বা প্রচার মাধ্যমেরও আবেদনকারী বিজ্ঞাপন সংস্থার উপর কোনো রকম নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।

বিজ্ঞাপনের নীতি নির্দেশ ঃ

সদস্য বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলির জন্য আই. এন. এস. নীতি নির্দেশাবলী নির্ধারিত করেছে। সদস্য বা "স্বীকৃত" বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলি বিভিন্ন বিজ্ঞাপনদাতার বিজ্ঞাপন প্রস্তুত এবং প্রচার করার সময় এই নীতি নির্দেশাবলী মেনে চলতে বাধ্য।

১. সোসাইটির সদস্য কোনো পত্র-পত্রিকা কোনো প্রত্যক্ষ বিজ্ঞাপনদাতাকে, বিজ্ঞাপনের কম রেট, ধারের দীর্ঘতর মেয়াদ, বিশেষ জায়গায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের আশ্বাস, কমিশন, ডিসকাউন্ট, নামমাত্র মূল্যে বা বিনামূল্যে আর্টওয়ার্ক তৈরি ক'রে দেওয়া ইত্যাদি কোনো বাড়তি সুবিধার সুযোগ দিয়ে সরাসরি বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য প্রলোভিত করবে না।

২ সোসাইটির সদস্য কোনো পত্রিকা কোনো প্রত্যক্ষ বা সরাসরি (বিজ্ঞাপন সংস্থার মাধ্যমে নয়) বিজ্ঞাপনদাতাকে কোনোরকম কমিশন বা রিবেট দেবে না।

৩ সদস্য পত্রিকা কোনো বিজ্ঞাপন প্রকাশ করার জন্য গ্রহণ করার সময় সম্ভাব্য সাবধানতার সঙ্গে যাচাই করবে—প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপনটি আইন সম্মত, পরিচ্ছন্ন, অকপট, সত্য কী না এবং বিজ্ঞাপনটি কোনো প্রতিষ্ঠিত পণ্য বা পরিষেবার বিজ্ঞাপন কী না।

৪. সোসাইটি তার সদস্য পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকাশনার গুণগত এবং সংখ্যাগত মান বজায় রাখা এবং উন্নতির জন্য সম্ভাব্য সকল রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। উদ্দেশ্য, সম্ভাব্য পাঠক এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের সেরা পরিষেবা দেওয়া।

৫. স্বীকৃত বিজ্ঞাপন সংস্থা সংক্রান্ত সোসাইটির অনুমোদিত নিয়মাবলী, বার্ষিক হ্যান্ডবুক এ প্রকাশিত হয়। সোসাইটির সদস্য সকল পত্রপত্রিকার পক্ষে এই নিয়মাবলী মেনে চলা বাধ্যতামূলক।

৬. সোসাইটির সদস্য কোনো পত্রপত্রিকা এমন কোনো বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য গ্রহণ করবে না, যাতে নিম্নলিখিত আপত্তিকর বিষয় আছে—

ক. আইনানুগ, সরকার অনুমোদিত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা, মহিলাদের মাসিক নিয়ন্ত্রণ করা এবং গর্ভস্রাব ঘটানোর কোনো উপায়ের বিজ্ঞাপন।

খ. যৌন যথেচ্ছাচার সংশ্লিষ্ট কোনো অভ্যাস অথবা এই সংক্রান্ত কোনো অসুখের নিরাময়ের উপায়ের বিজ্ঞাপন।

গ. সুরুচিকে আঘাত করে, এমন কোনো শব্দ, যথা—যৌন অক্ষমতা, যৌনবলবর্ধক, পুরুষত্বহীনতা, অনিয়মিত স্রাব এবং এই রকম অন্য কোনো শব্দ বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হবে না।

ঘ. কোনো দৈব উপায়, কবচ-মাদুলি বা দৈবশক্তির দ্বারা বিভিন্ন অসুখ সারানোর বিজ্ঞাপন।

৭. ব্যবহারকারীর যথার্থ প্রশংসাপত্র ব্যতীত অন্য কোনো প্রশংসাপত্র বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা যাবে না। পাশ করা, স্বীকৃত ডাক্তার ব্যতীত অন্য কোনো ডাক্তারের প্রশংসাপত্র ব্যবহার করা যাবে না। সেক্ষেত্রে লিখে দিতে হবে—ইনি ডাক্তার নন।

৮. এমন কোনো চিত্র বা দাবি সমন্বিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যাবে না, যা অতিরঞ্জিত বা বিকৃত রূপের দ্বারা মিথ্যা বাতাবরণ সৃষ্টি ক'রে কোনো প্রতিযোগী পণ্যকে সরাসরি আক্রমণ করে।

৯. এমন কোনো বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যাবে না, যেটি পড়ে পাঠকদের মনে ধারণা হতে পারে কোনো বিশেষ হাসপাতাল থেকে ওষুধটির প্রচার করা হচ্ছে। সে রকম ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনদাতাকে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে।

১০. আই. এন. এস.-এর সদস্য কোনো পত্রিকা এমন কোনো বিজ্ঞাপন গ্রহণ বা প্রকাশ করবেন না যা নিম্নলিখিত আইনগুলি কোনোভাবে লঙ্ঘন করে—

- ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস (অবজেকশনেবল এ্যাডভার্টিসমেন্টস) অ্যাকট, ১৯৫৪
- দি এমব্লেমস অ্যান্ড নেমস (প্রিভেনসন অফ ইমপ্রোপার ইউজ) অ্যাকট, ১৯৫০
- বিভিন্ন রাজ্যের দি ওয়েটস অ্যান্ড মেজারস (এনফোর্সমেন্ট) অ্যাকট
- দি প্রাইজ কমপিটিশন অ্যাকট, ১৯৫৫
- বিভিন্ন রাজ্যের দি প্রহিবিশন অ্যাকট
- রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস
- দি লটারিস (কন্ট্রোল অ্যান্ড ট্যাক্স) এবং প্রাইজ কমপিটিশনস (ট্যাক্স) অ্যাকট এবং বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন।

সোসাইটির সদস্য বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলির পরিষেবার মান নির্ধারণ ক'রে আই. এন. এস. কতকগুলি নিয়ম রচনা করেছেন। সদস্য বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলির জন্য এই নিয়মনীতি মেনে চলা বাধ্যতামূলক।

সদস্য বিজ্ঞাপন সংস্থা বিজ্ঞাপনদাতা মক্কেলদের পরিষেবার জন্য কতকগুলি মানদণ্ড বজায় রাখবে।

১. পণ্য বা পরিষেবার বিজ্ঞাপনের কাজ শুরু করার আগে, বাজারে প্রতিযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যটির বা পরিষেবার কী কী বিশেষ গুণ আছে, তার বিবরণ জানা প্রয়োজন।

২ পণ্য বা পরিষেবার বর্তমান এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ বাজার বিশ্লেষণ।

৩. বিজ্ঞাপনের জন্য প্রস্তাবিত পণ্য বা পরিষেবার বন্টন এবং বিক্রয় ব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান।

৪. সকল সম্ভাব্য ব্যবহারোপযোগী (available) মাধ্যম সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান। যার ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগের দ্বারা বিজ্ঞাপিত পণ্যের বিষয়ে গ্রাহকদের অবহিত করা সম্ভব।

৫. পূর্ববর্তী প্যারাগ্রাফে বর্ণিত তথ্য, পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রচার অভিযানের বাস্তব পরিকল্পনা রচনার সামর্থ।

৬ নিম্নলিখিত পরিষেবার সাহায্যে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার সামর্থ এবং সুযোগ—

ক. রচনা, অনুবাদ, বিজ্ঞাপন চিত্র প্রস্তুত করা এবং বিজ্ঞাপন বার্তার প্রস্তুতি ও প্রকাশের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা।

খ. সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের জন্য স্থান ব্যবহারের এবং অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহারের জন্য চুক্তি করা।

গ. বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ (materials) প্রস্তুত এবং যথোচিত নির্দেশ প্রেরণ, যাতে চুক্তি অনুযায়ী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়।

ঘ. বিজ্ঞাপন ঠিকমত প্রকাশিত হয়েছে কী না, সে বিষয়ে খবর রাখা এবং খতিয়ে দেখা।

ঙ. পরীক্ষা করা, বিল করা, এবং বিজ্ঞাপনের মূল্য মিটিয়ে দেওয়া।

সদস্য বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলির কাছে কী ধরনের পরিষেবা আশা করা হয়, সোসাইটির এই নীতি নির্দেশগুলি তারই উদাহরণ।

৮.৪ এ. বি. সি.

অডিট ব্যুরো অফ সার্কুলেশন লিমিটেড (Audit Bureau of Circulation Ltd.) ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। এই সংস্থা নথিভুক্ত "লিমিটেড" সংস্থা হলেও লাভ করার জন্য গঠিত হয়নি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এই সংগঠনের সদস্য। প্রকাশনা ব্যতীত, বিজ্ঞাপন সংস্থা এবং বিজ্ঞাপনদাতাও এই সংগঠনের সদস্য হতে পারেন। এই তিনশ্রেণীর সদস্যদের আনুপাতিক প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত পরিচালন পরিষদ (Council of Management) এই সংগঠনের কাজ পরিচালনা করেন। প্রতি বছর নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কাউনসিল ক্ষমতায় আসেন।

এই সংস্থার কাজ সদস্য পত্র-পত্রিকার বিক্রিত প্রচার সংখ্যা প্রত্যয়িত করা। বিজ্ঞাপনদাতা বা বিজ্ঞাপন সংস্থার পক্ষে, মাধ্যম পরিকল্পনার সময় জানা প্রয়োজন, কোনো সংবাদপত্র বা পত্রিকার প্রচার সংখ্যা সঠিক কত? বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং পত্রিকার মুদ্রণ সংখ্যার সমস্ত হিসাব পরীক্ষা ক'রে, প্রকাশনাটির গড় বিক্রির সংখ্যা কত, সেই বিষয়ে এ. বি. সি. রিপোর্ট দেন। এই রিপোর্টই বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা তাঁদের পত্রিকার প্রচার সংখ্যার সার্টফিকেট হিসাবে ব্যবহার করেন, বিজ্ঞাপনদাতা এবং বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলিকে জানান। বিভিন্ন পত্রিকা যে প্রচার সংখ্যা দাবি করেন, সেই সংখ্যার যথার্থতা পরীক্ষা ক'রে রিপোর্ট দেন এ. বি. সি.।

প্রতি বছর দু'বার এ. বি. সি. অডিট রিপোর্ট প্রকাশ করেন। একটিতে জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত এবং অপরটিতে জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিমাসের গড় প্রচার সংখ্যার হিসাব থাকে। এই রিপোর্টে, প্রকাশনার প্রচার সংখ্যা এবং প্রচারের ভৌগোলিক তথ্য থাকে, যার উপর ভিত্তি ক'রে বিজ্ঞাপনদাতা হিসাব করতে পারেন তাঁর পণ্যের কোন কোন বাজারে প্রকাশনাটির প্রচার সংখ্যা, অর্থাৎ বিজ্ঞাপন প্রচার ক্ষমতা কেমন।

এই অডিট রিপোর্টে প্রকাশনাটির মোট প্রচার সংখ্যা যেমন থাকে, তেমনই আরো অনেক তথ্য থাকে। ধরা যাক, কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকা। মোট প্রচার সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে থাকে পশ্চিমবঙ্গের কোনো জেলায় পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা কত। এই জেলাওয়ারি হিসাবের মধ্যে জেলার মূখ্য শহরগুলির প্রচার সংখ্যা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকে। ধরা যাক, বর্ধমান জেলা। এই জেলায় সংশ্লিষ্ট পত্রিকাটির মোট প্রচার সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে আসানসোল, দুর্গাপুর, বর্ধমান প্রভৃতি মুখ্য শহরের প্রচার সংখ্যাও উল্লেখ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কলকাতা থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা কত এবং কোন কোন প্রদেশে প্রচারিত তার হদিশও এই রিপোর্টে থাকে। এ. বি. সি.-র এই রিপোর্টের পর পর কয়েকটি সংখ্যা পাঠ করলে কোনো প্রকাশনার প্রচার সংখ্যা বাড়ছে অথবা কমছে এবং প্রচার সংখ্যার কোনো ভৌগোলিক

পরিবর্তন ঘটছে কী না, এই সব তথ্য জানা যায়। বিজ্ঞাপনদাতা এবং বিজ্ঞাপন সংস্থার পক্ষে এ. বি. সি.-র এই রিপোর্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রত্যয়িত প্রচার সংখ্যার উপর ভিত্তি ক'রেই বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচন করা হয়। এ. বি. সি.-র রিপোর্ট ব্যতীত, পত্রিকা যে প্রচার সংখ্যা দাবি করবেন, বিজ্ঞাপনদাতাকে সেই প্রচার সংখ্যাই মেনে নিতে হবে।

বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলি এ. বি. সি.-র সদস্যপদ নিয়ে থাকেন এবং এ. বি. সি.-র রিপোর্টের নিয়মিত গ্রাহক। অনেক বিজ্ঞাপনদাতাও এ. বি. সি.-র রিপোর্টের গ্রাহক।

৮.৫ এ. এস. সি. আই.

সম্পূর্ণ নাম অ্যাডভারটাইজিং স্ট্যান্ডার্ড কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া (Advertising Standard Council of India)। বিভিন্ন বিজ্ঞাপন সংস্থা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং বিভিন্ন মাধ্যমের পেশাদার প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত এই সংগঠন ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞাপন শিল্পের স্বেচ্ছাকৃত আত্মনিয়ন্ত্রণকারী সংগঠন এ. এস. সি. আই। কিছুদিন পূর্বে এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ছিল ২৬০ এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিজ্ঞাপন শিল্পের প্রতিনিধিরাই এই সংগঠনের সদস্য।

এই সংগঠনের উদ্দেশ্য, ভারতে প্রচারিত বিজ্ঞাপনের মান যাতে বজায় থাকে তার উপর নজর রাখা।

প্রকাশিত বিভিন্ন বিজ্ঞাপন সম্পর্কে এ. এস. সি. আই.-এর কাছে যে সব অভিযোগ আসে তার শতকরা সত্তর ভাগই বিভিন্ন পণ্য বা পরিষেবার গ্রাহকদের কাছ থেকে। বাকি তিরিশ শতাংশ অভিযোগ আসে বিভিন্ন কোম্পানির কাছ থেকে, একে অপরের বিরুদ্ধে। বর্তমানের উদারীকরণ নীতির ফলে প্রতিযোগিতা এবং তুলনামূলক বিজ্ঞাপন বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন কোম্পানির বিজ্ঞাপনের সম্পর্কে অভিযোগের সংখ্যা বাড়ছে। গ্রাহকদের অভিযোগ এবং কোম্পানির অভিযোগের অনুপাত এখন ৫০ ঃ ৫০।

গ্রাহকদের জানা প্রয়োজন, আপত্তিকর বিজ্ঞাপন সম্পর্কে অভিযোগ কোথায় পাঠাতে হবে। বিজ্ঞাপন শিল্পে, বর্তমানে এ. এস. সি. আই.-এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত গণ্য হয়।

কোনো আপত্তিকর বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করার বা সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার বিরুদ্ধে কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা এ. এস. সি. আই. এর নেই। কিন্তু শতকরা ৯০ ভাগ বিজ্ঞাপনদাতাই এ. এস. সি. আই.এর পরামর্শ (recommendation) মেনে নিয়ে থাকেন।

এ. এস. সি. আই.-এর কাছে কোনো বিজ্ঞাপন সম্পর্কে অভিযোগ এলে, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সেটি খুঁটিয়ে দেখেন। তাঁর বিবেচনায় যদি মনে হয়, অভিযুক্ত বিজ্ঞাপনটি নীতির নির্দেশাবলী (code of ettics) লঙ্ঘন করেছে, তাহলে এ. এস. সি. আই. বিজ্ঞাপনদাতা অথবা সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন সংস্থাকে অভিযোগটি লিখিতভাবে জানান এবং ১৫ দিনের মধ্যে জবাবদিহি করতে বলেন।

তারপর, অভিযুক্ত বিজ্ঞাপনটি এ. এস. সি. আই.-এর কনজিউমার কমপ্লেন্টস কাউন্সিল (Consumer Complaints council-C.C.C)-এর কাছে পাঠানো হয়। কনজিউমার কমপ্লেন্টস কাউন্সিল প্রতি মাসে

একবার করে মিটিং-এ বসেন। এই কাউন্সিল এর সদস্য বিভিন্ন পেশাদার ব্যক্তি, যেমন ডাক্তার, উকিল ইত্যাদি। এই কাউন্সিলে বিজ্ঞাপন পেশার লোকের সংখ্যা খুব কম রাখা হয়। কাউন্সিল এইভাবে গঠন করার উদ্দেশ্য পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা দূরে রাখা। কাউন্সিলের মতে অভিযোগ প্রমাণিত হলে, সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতা এবং বিজ্ঞাপন সংস্থাকে ১৫ দিনের মধ্যে অভিযুক্ত বিজ্ঞাপনটি পরিবর্তন করতে অথবা সেটির প্রচার বন্ধ করতে বলা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপনদাতা এবং বিজ্ঞাপন সংস্থা এই নির্দেশ মেনে চলেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনদাতা এবং বিজ্ঞাপন সংস্থার কাছে ইতিবাচক সাড়া না পেলে, এ. এস. সি. আই. বিভিন্ন মাধ্যমকে অনুরোধ করেন, অভিযুক্ত বিজ্ঞাপনটি প্রচার না করার জন্য। বেশির ভাগ মাধ্যমই এ. এস. সি. আই. এর অনুরোধ রক্ষা করেন।

কোনো বিজ্ঞাপন সম্পর্কে অভিযোগ পেলে, কনজিউমার কমপ্লেন্টস কাউন্সিল-এ আলোচনা ক'রে এ. এস. সি. আই. দু-মাসের মধ্যেই অভিযুক্ত বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এ. এস. সি. আই.-এর প্রতিক্রিয়া (response) তাড়াতাড়ি হয়তো বটেই, এতে কোনো খরচও লাগে না। মোনোপলিস অ্যান্ড রেসট্রিকটিভ ট্রেড কন্ট্রোল অথবা কোনো আদালতে অভিযোগ দায়ের করলে অনেক খরচ পড়ে এবং দীর্ঘ সময় লাগে।

অভিযুক্ত বিজ্ঞাপনদাতা বা বিজ্ঞাপন সংস্থাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আইনের কোনো ক্ষমতা এ. এস. সি. আই.-এর নেই। এই সংগঠনের কাজ বিজ্ঞাপনদাতা বা বিজ্ঞাপন সংস্থার ছিদ্রান্বেষণ করা নয়। বিজ্ঞাপন শিল্পকে সুস্থ পথে চালনা করার জন্য পথনির্দেশ করা। সংগঠনটি আত্মনিয়ন্ত্রণকারী। বিজ্ঞাপন শিল্প যদি আত্মনিয়ন্ত্রণ না করে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে সরকারই নানা আইন প্রণয়ন ক'রে বিজ্ঞাপনের মান, রুচি নিয়ন্ত্রণ করবেন। তার চেয়ে, নিজেরাই সচেষ্ট হয়ে বিজ্ঞাপনের মান বজায় রাখাই ভালো।

৮.৬ এন. আর. এস.

ন্যাশনাল রিডারশিপ সারভে (National Readership Survey) অর্থাৎ, জাতীয় পাঠক সমীক্ষা।

বিজ্ঞাপনের মাধ্যম পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনার সময় পাঁচ নম্বর এককে বলা হয়েছে, মাধ্যম নির্বাচনের সময় মাধ্যমের প্রচার সংখ্যা বিশেষ করে বিবেচনা করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে আরো আলোচনা করা হয়েছে, কেবলমাত্র প্রচার সংখ্যাই কোনো মাধ্যম নির্বাচনের একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে না। মাধ্যমটি কী ধরনের পাঠকদের মধ্যে প্রচারিত সে বিষয়েও বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন। কোনো মাধ্যমের পাঠকদের ভৌগোলিক, জনতাত্ত্বিক এবং মনস্তাত্ত্বিক তথ্য জানলে তবেই বোঝা যাবে বিজ্ঞাপিত পণ্যটি তাঁদের ব্যবহার করার সম্ভাবনা কতখানি। প্রচার সংখ্যার সঙ্গে মাধ্যমের পাঠকচরিত্র বিশ্লেষণ ক'রে, বিজ্ঞাপিত পণ্যের ব্যবহারের সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যম নির্বাচন করাই যুক্তিযুক্ত এবং বিজ্ঞানসম্মত।

মুদ্রণ মাধ্যমের প্রচার সংখ্যা পরীক্ষা এবং প্রমাণিত করার জন্য অডিট ব্যুরো অফ সার্কুলেশন নামে একটি সংস্থা কাজ করে। তেমনই, পাঠকদের বিষয়ে সমীক্ষা করে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন কয়েকটি সংস্থা এবং এই প্রতিবেদনগুলিই জাতীয় পাঠক সমীক্ষা হিসাবে গণ্য হয়।

প্রথম জাতীয় পাঠক সমীক্ষা হয় ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে। এই সমীক্ষায় ভারতের বিভিন্ন শহরে সংবাদপত্র পাঠকদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সমীক্ষা হয় আট বছর পরে, ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে। ইণ্ডিয়ান মার্কেট রিসার্চ ব্যুরো (IMRB) এবং অরগানাইজেশন অ্যান্ড রিসার্চ গ্রুপ (ORG) যৌথভাবে এই সমীক্ষা করে। এই দ্বিতীয় সমীক্ষায় মুদ্রণ মাধ্যমের সঙ্গে রেডিও, সিনেমা এবং টেলিভিশনও সমীক্ষার পরিধির মধ্যে আসে। তবে, এই সমীক্ষা শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল।

তৃতীয় জাতীয় পাঠক সমীক্ষা (NRS II) হয় ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে, ইণ্ডিয়ান মার্কেট রিসার্চ ব্যুরো দ্বারা।

চতুর্থ জাতীয় পাঠক সমীক্ষা (NRS IV) বিভিন্ন কারণে বিলম্বিত হওয়ায় অরগানাইজেশন অ্যান্ড রিসার্চ গ্রুপ এককভাবে একটি সমীক্ষা করেন ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে। এই সমীক্ষা প্রকাশনা সংস্থাগুলির সঙ্গে যৌথভাবে হয়নি। শহরের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলও এই সমীক্ষার পরিধির মধ্যে আসে এবং মুদ্রণ মাধ্যমের সঙ্গে অন্যান্য মাধ্যমের বিষয়েও সমীক্ষা হয়।

আই. এম. আর. বি. (IMRB) এবং এম. এ. আর. জি. (MARG) যৌথভাবে চতুর্থ জাতীয় পাঠক সমীক্ষা প্রকাশ করেন ১৯৯১ সালে। এই প্রথম ভিডিও এবং কেবল টিভি-ও সমীক্ষার আওতায় আসে। আয় ব্যতীত বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণি হিসাব বিভিন্ন পরিবারের সমীক্ষা করা হয়।

জাতীয় পাঠক গবেষণা সংসদ (National Readership Studies Council : NRSC) গঠিত হয় ১৯৯৪ সালে। ইণ্ডিয়ান নিউজপেপার সোসাইটি, অডিট ব্যুরো অফ সার্কুলেশন এবং অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সিস এ্যাসোসিয়েসন অফ ইণ্ডিয়া এই তিনটি সংস্থা যৌথভাবে ন্যাশনাল রিডারশিপ স্টাডিস কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করেন। NRS-1995 সমীক্ষাটি এই জাতীয় পাঠক গবেষণা সংসদ-এর তত্ত্বাবধানেই হয়। প্রকৃত সমীক্ষা করেন ভারতের চারটি প্রধান মার্কেট রিসার্চ সংগঠন—আই. এম. আর. বি., এম. এ. আর. জি., এম. ও. ডি. ই. এবং এম. আর. এ. এস. যৌথভাবে।

এই সমীক্ষায়, মুদ্রণ মাধ্যমের সঙ্গে অন্যান্য মাধ্যমের সম্বন্ধেও একযোগে সমীক্ষা করা হয়। শহরাঞ্চলে শতকরা কতগুলি পরিবারে টেলিভিশন সেট আছে এবং এই পরিবারগুলির আর্থসামাজিক অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য এই সমীক্ষায় রয়েছে। সাধারণ শহরবাসী প্রতি সপ্তাহে গড়ে কত ঘণ্টা বিভিন্ন মাধ্যম দেখে থাকেন? তার মধ্যে মুদ্রণ মাধ্যমের পাঠকের অনুপাত কত? টেলিভিশনের দর্শকের অনুপাত কত এবং অন্যান্য মাধ্যমের দর্শক, শ্রোতার অনুপাতই বা কত? এই সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে।

কোন সংবাদপত্র কী ধরনের পরিবারে জনপ্রিয় এবং প্রচার সংখ্যার আনুপাতিক হার কত? শহরের শতকরা কতগুলি পরিবারে কেবল টিভির সংযোগ আছে? এই সব পরিবারের গড় আয় কত? পরিবারের সদস্যদের শিক্ষার মান কী রকম? সমীক্ষার বিবরণে এই সব তথ্য জানা যায়।

বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য মাধ্যম পরিকল্পনা এবং মাধ্যম নির্বাচনের সময় এই সব তথ্যের ভিত্তিতেই নির্ধারণ করা হয় কোন পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য কোন কোন মাধ্যম কার্যকরী হবে। বিজ্ঞাপনের জন্য মাধ্যম পরিকল্পনায় এইসব সমীক্ষা বিশেষ সহায়ক।

৮.৭ এ. এ. এ. আই.

অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সিস এ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া (Advertising Agencies Association of India) ভারতের বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলির প্রতিনিধি মূলক সংস্থা। প্রতিষ্ঠা ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে। বিজ্ঞাপন এবং মাধ্যম মহলে "থ্রি এ-স অফ আই" নামেই পরিচিত। বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ে নিযুক্ত যে কোনো বিজ্ঞাপন সংস্থা, ভারতে স্থায়ী ঠিকানা থাকলে এই সংগঠনের সদস্য হতে পারে। বিজ্ঞাপনের মান বজায় রাখার উদ্দেশ্যে, বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্য বিজ্ঞাপন পেশার আদর্শের মাপকাটি বা নিয়মাবলী (Code of Standards) প্রর্বতন করেছে এই সংস্থা। বিজ্ঞাপনদাতা এবং সাধারণ গ্রাহক, সকলের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে বিজ্ঞাপনের পালনীয় নীতি (ethics) প্রচলিত করেছে থ্রি. এস. অফ আই.।

৮.৮ সারাংশ

বিজ্ঞাপন যেহেতু জনসাধারণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে, সেই কারণে, বিজ্ঞাপনের মান, রুচি, শালীনতা, স্বচ্ছতা বজায় রাখার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞাপন যাতে বিভ্রান্ত না করে তার জন্য বিভিন্ন সংগঠন বিশেষ নিয়মাবলী এবং নীতিমালা রচনা করেছেন। এই সব নীতি যথাযথ পালিত হচ্ছে কী না, সে বিষয়ে নজরদারীর জন্য আই. এন. এস. এবং এ. এস. সি. আই প্রভৃতি সংস্থা গঠিত হয়েছে।

ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের বিজ্ঞাপন তৈরি এবং প্রচারের জন্য ভারত সরকারের বিশেষ সংস্থা ডি. এ. ভি. পি.।

বিভিন্ন মুদ্রণমাধ্যম এবং বিজ্ঞাপন সংস্থার যৌথ সংগঠন আই. এন. এস.। সদস্য সংস্থাগুলির স্বার্থরক্ষা এবং আচরণ বিধির উপর নজরদারী এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য।

এ. বি. সি. সদস্য মুদ্রণ মাধ্যমগুলির প্রচার সংখ্যা প্রত্যয়িত করেন।

এন. আর. এস. পাঠক সমীক্ষা এবং দর্শক সমীক্ষা বিজ্ঞাপনের প্রচারের জন্য মাধ্যম পরিকল্পনার বিশেষ সহায়ক।

৮.৯ অনুশীলনী

১. ডি. এ. ভি. পি. সংস্থার কাজ কী, আলোচনা করুন।

২ আই. এন. এস. সংস্থার উদ্দেশ্য এবং কাজকর্মের বিশদ আলোচনা করুন।

৩ এ. বি. সি. সংস্থার কাজের গুরুত্ব কী?

৪. বিজ্ঞাপনের মান বজায় রাখা এবং রক্ষার বিষয়ে এ. এস. সি. আই.-এর ভূমিকা কী?

৫. বিজ্ঞাপনের মাধ্যম পরিকল্পনায় পাঠক সমীক্ষার গুরুত্ব কতখানি?

টীকা লিখুন

১. এ. এ. এ. আই, ২. এন. আর. এস.

৮.১০ গ্রন্থপঞ্জী

1. INS Handbook
2. Reports of Audit Bureau of Circulation.

পি. জি. ডি. জে. এম. সি

ষষ্ঠ পত্র—খ(২)

একক ১ ❑ জন-সংযোগের সংজ্ঞা, বিবর্তন ও ভূমিকা

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য
১.১ প্রস্তাবনা
১.২ জন-সংযোগ বোঝাপড়া সৃষ্টি করে
১.৩ "পাবলিক" কারা?
১.৪ জন-সংযোগের সংজ্ঞা
১.৫ জন-সংযোগ কী কাজ করে
১.৬ বিবর্তন ও ইতিহাস
১.৭ ভারতে জন-সংযোগের বিবর্তন
১.৮ বর্তমান প্রবণতা ও গতি-প্রকৃতি
১.৯ সারাংশ
১.১০ অনুশীলনী
১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে আলোচনা করা হয়েছে—জন-সংযোগ বলতে কী বোঝায়। আধুনিক পরিচালন-ব্যবস্থায় জন-সংযোগের ভূমিকা কী? জন-সংযোগের অবদান, বহির্বিশ্বে এবং ভারতে জন-সংযোগ বিজ্ঞানের প্রয়োগ এবং বিবর্তন। এই এককটি পাঠ ক'রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করতে পারবেন—

- জন-সংযোগের সংজ্ঞা এবং প্রয়োজনীয়তা
- জন-সংযোগের ইতিহাস ও বিবর্তন
- জন-সংযোগের কার্যকারীতার বিভিন্ন দিক
- জন-সংযোগ পেশার প্রয়োজনীয়তা

১.১ প্রস্তাবনা

জন-সংযোগ সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করার আগে একটি বিষয় জানা প্রয়োজন। 'জন-সংযোগ' এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করা হয়, ইংরাজি Public Relations-এর বাংলা অনুবাদ হিসাবে। প্রকৃতপক্ষে, ইংরাজি Public Relations বলতে যে ধরনের কাজকর্ম এবং বিশেষ করে যে উদ্দেশ্যে এই কাজকর্ম, তার বিবেচনায় এই ইংরাজি শব্দ দুটির বাংলা অনুবাদ "জন-সম্পর্ক" হলেই যথাযথ হতো। "জন-সম্পর্ক"-ই এই বিষয়টির যথার্থ পরিচয় বোধক এবং এই বিষয়ের কাজকর্মের ইঙ্গিতবাহী। কিন্তু বহু বছর ধরে এই পেশা, যথার্থ অর্থে জন-সম্পর্ক হলেও, জন-সংযোগ নামেই অভিহিত

এবং পরিচিত। সেই কারণে, আমরাও এই বিষয়টিকে এবং পেশাকে, "জন-সংযোগ" বলেই আলোচনা করব।

আধুনিক পরিচালন ব্যবস্থায় জন-সংযোগের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যে কোনো পরিচালন ব্যবস্থায়, সে কোনো বেসরকারি সংস্থা হোক বা সরকারি প্রতিষ্ঠান হোক, অথবা কোনো সরকারি বিভাগই হোক— জনসংযোগ একটি অপরিহার্য, গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসাবে স্বীকৃত। পরিচালন ব্যবস্থায় উৎপাদন, অর্থ, মানবসম্পদ, বিপণন এবং ব্যবস্থাপনের মতো জন-সংযোগের বিশেষ ভূমিকা বর্তমানে অনস্বীকার্য।

যে কোনো সংস্থা, ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী সংস্থা, অথবা কোনো ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, বা কোনো পরিষেবার প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ব্যাঙ্ক বা বিমা কোম্পানি—সকল সংস্থার পরিচালন ব্যবস্থায় জন-সংযোগ অন্যতম বিবেচনার বিষয়। কারণ, সংস্থামাত্রই সর্বসাধারণের আস্থা এবং গ্রহণযোগ্যতার উপর নির্ভরশীল।

অতীতের শিল্প-বাণিজ্যের বাতাবরণ আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। একচেটিয়া (monopoly) ব্যবসায়ের পরিবেশে পণ্য প্রস্তুতকারক বা পরিষেবা যোগানদার সংস্থা ক্রেতাসাধারণের মনোভাবের উপর নির্ভরশীল না হয়েও ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান চালাতে পারতেন। পরিস্থিতির বিচারে, বাজারে লভ্য পণ্য ব্যতীত ক্রেতা সাধারণের অন্য উপায় ছিল না, যেহেতু, বাজারে প্রতিযোগী ছিল না।

প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিতে প্রতিটি সংস্থাই চান জনসাধারণের আস্থাভাজন সংস্থা হিসাবে চিহ্নিত হতে। সর্বসাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্যতা বজায় থাকলে এবং ক্রমাগত বৃদ্ধি হলে তবেই সংস্থার পক্ষে কার্যনির্বাহ করা সহজ এবং সফল হয়। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হলেও, যে দেশে, যে সমাজে এবং যে আর্থ সামাজিক ব্যবস্থায় সংস্থাটির কাজকর্ম পরিচালিত হচ্ছে, সেই সমাজের প্রতি সংস্থাটি দায়বদ্ধ। আর, দায়বদ্ধ বলেই, সর্বসাধারণের আস্থাভাজন এবং গ্রহণযোগ্য হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন উপায়ে সর্বসাধারণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের দ্বারা সংস্থার আস্থাভাজন এবং গ্রহণযোগ্য ভাবমূর্তি প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা করাই জন-সংযোগ-এর লক্ষ্য।

যে কোনো সংস্থার সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করে জনমানসে সংস্থাটির গ্রহণযোগ্যতা এবং সংস্থার প্রতি সাধারণের আস্থার উপর। আস্থা এবং বিশ্বাসযোগ্যতার উপর নির্ভর করেই বিভিন্ন সংস্থা কাজকর্ম করে। বিভিন্ন পণ্য এবং পরিষেবার বাজার নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট সংস্থাটির গ্রহণযোগ্যতা, আস্থা এবং সুনামের উপর।

বিভিন্ন সংস্থা সম্পর্কে আপনাদের মনে বিভিন্ন ধারণা রয়েছে। আপনারা মনে করেন "ক" সংস্থা বেশ ভালো কাজ করছে, ক্রমান্বয়ে উন্নতি ক'রে চলেছে। আবার মনে করেন, "খ" সংস্থা ভালোভাবে কাজ করতে পারছে না, ওদের হয়তো কোনো সমস্যা আছে। আরো মনে করেন, সংস্থা "গ" কী ভাবে কাজকর্ম করছে, সে বিষয়ে আপনাদের কোনো ধারণা নেই। আপনাদের মনে এই সব ধারণার সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন সংস্থার জন সংযোগ।

যে সংস্থা সম্বন্ধে আপনার জানকারি আছে, যে সংস্থা, আপনি মনে করেন সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে এবং ক্রমশ আরো বড়ো হয়ে উঠছে, আপনি চাইবেন আপনার পরিবারের ছেলেমেয়েরা ঐ সংস্থায় কাজের সুযোগ পায়। যে সংস্থার কাজকর্ম সম্বন্ধে আপনি অবহিত, সেই সংস্থার শেয়ারেই আপনি টাকা লগ্নী করেন। যে সংস্থার তৈরি জিনিসের উপর আপনার আস্থা আছে, সেই সংস্থার জিনিষই আপনি ব্যবহার করেন। অর্থাৎ, আপনার মনে কোনো সংস্থা সম্পর্কে যে ধারণা রয়েছে, সেই ধারণা অনুযায়ী সংস্থার প্রতি আপনার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন।

বিভিন্ন সংস্থা সম্বন্ধে আপনার মনে এই বিভিন্ন ধারণা (perception) সৃষ্টিতে বিশেষ সহায়তা করেছে এই সংস্থাগুলির জন-সংযোগ সম্পর্কিত কাজকর্ম। বিভিন্ন সংস্থার নানাবিধ কাজকর্মের বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত ক'রে সংস্থার সম্বন্ধে সমঝোতা গড়ে তোলে জন-সংযোগ। সংস্থার গ্রহণযোগ্যতা প্রতিপন্ন ক'রে সংস্থাকে জনসাধারণের কাছে আস্থাভাজন ক'রে তোলে জন-সংযোগ।

অনেকের ধারণা, সংস্থার সম্বন্ধে কেবল ভালো ভালো কথা প্রচার করাই জন সংযোগ-এর কাজ। বলা বাহুল্য,

এই ধারণাটি ভুল। কেবল ভালো ভালো কথা বলেই জনসংযোগ সম্পন্ন অথবা সম্পূর্ণ হয় না। তাহলে, সংস্থাকে সর্বসাধারণের আস্থাভাজন ক'রে তোলার জন্য জন-সংযোগ কী করে?

১.২ জন-সংযোগ বোঝাপড়া সৃষ্টি করে

জন-সংযোগের মূল উদ্দেশ্য জনসাধারণের সঙ্গে সংস্থার একটি যুক্তিসঙ্গত বোঝাপড়ার সৃষ্টি করা, যে বোঝাপড়া জনসাধারণের মনে সংস্থা সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্টি করতে সহায়তা করে। বুঝতেই পারছেন, কেবল ভালো ভালো কথা সাজিয়ে সংস্থার গুণগান করা আর সংস্থা সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত "বোঝাপড়া" সৃষ্টি করা এক নয়।

এবারে দেখা যাক, এই "বোঝাপড়া" কী?

কোনো সংস্থার জন-সংযোগ পরিকল্পনার আগে চিহ্নিত করা প্রয়োজন, সেই সংস্থার নেতিবাচক পরিস্থিতি কী কী? প্রত্যেক সংস্থাকেই নানারকম নেতিবাচক পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে হয়। এই নেতিবাচক পরিস্থিতির মোকাবিলা করা সহজ কাজ নয়। কেবলমাত্র ভালো ভালো কথা সাজিয়ে, বা কৃত্রিম ইতিবাচক পরিস্থিতি প্রচার ক'রে নেতিবাচক পরিস্থিতির মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। অনেকের ধারণা, যে কোনো উপায়েই হোক, সংস্থার একটি অনুকূল বা বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবমূর্তি গড়ে তোলাই জন-সংযোগের উদ্দেশ্য। বহুদিন, জন-সংযোগ বলতে সকলের ধারণা ছিল, সংস্থার বন্ধুত্বপূর্ণ এবং অনুকূল ভাবমূর্তি সৃষ্টি করা এবং প্রচার করা। জন-সংযোগ সম্বন্ধে এই ধারণা অবাস্তব এবং অতি সরলীকরণের ধারণা প্রসূত।

জন-সংযোগ সম্পর্কে এই ধারণা বহুদিনের প্রচলিত বিশ্বাসজাত হলেও, বর্তমানে জন-সংযোগ বিষয়টিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচার করা হয়। সর্বসাধারণের সঙ্গে বোঝাপড়া সৃষ্টি করা সরল ব্যাপার নয়। একেবারেই ভিন্ন। কঠিন, বাস্তব সম্মত এবং বিশ্বাসযোগ্য।

আপনি চিন্তা ক'রে দেখুন, আপনার মনে বহু সংস্থা সম্বন্ধে নেতিবাচক মনোভাব রয়েছে। নেতিবাচক, অর্থাৎ, ঐ সংস্থাগুলি সম্বন্ধে আপনার মনে ইতিবাচক ধারণা নেই। এই নেতিবাচক মনোভাবের জন্য আপনি ঐ সংস্থাগুলির কার্যকলাপ সম্বন্ধে সন্দিহান হবেন। ঐ সব সংস্থার তৈরি জিনিস ব্যবহার করতে আগ্রহ বোধ করবেন না, উৎসাহিত হবেন না। ঐ সংস্থাগুলির শেয়ারে আপনার টাকা লগ্নী করতেও রাজি হবেন না।

আপনার মনের এই নেতিবাচক ধারণাগুলি চিহ্নিত করা যায় এই ভাবে : বিরুদ্ধতা—কোনো কারণে আপনি একটি বিশেষ সংস্থার বিরোধী। পক্ষপাত—পূর্বের কোনো অভিজ্ঞতা বা ধারণা অনুসারে আপনি কোনো বিশেষ সংস্থাকে পছন্দ করেন না। ঔদাসীন্য—কোনো বিশেষ সংস্থা সম্বন্ধে আপনার কোনো আগ্রহ নেই। অজ্ঞতা—কোনো বিশেষ সংস্থা সম্বন্ধে আপনার কিছু জানা নেই।

বিরুদ্ধতা (hostility) — সহানুভূতি (sympathy)

পক্ষপাত (prejudice) — স্বীকৃতি (acceptance)

ঔদাসীন্য (apathy) — আগ্রহ (interest)

অজ্ঞতা (ignorance) — জ্ঞান (knowledge)

জন-সংযোগের কাজ কোনো একটি বিশেষ সংস্থা সম্বন্ধে আপনার মনের এই নেতিবাচক ধারণাগুলিকে ইতিবাচক ধারণায় রূপান্তরিত করা। এই প্রচেষ্টা পুরোপুরি সফল হওয়া কঠিন। কারণ, নতুন পরিস্থিতিতে মানুষের ধারণা বারে বারে পরিবর্তিত হয় এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সংস্থা সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা অহরহই পরিবর্তনশীল।

তবে, নেতিবাচক মনোভাবকে ইতিবাচক মনোভাবে রূপান্তরকরণ প্রয়াসে মূলত নির্ভর করা প্রয়োজন বাস্তব ঘটনা এবং তথ্যের উপর। মনভোলানো, দোকানদারী কথায় মনোভাব পরিবর্তন সম্ভব হয় না।

বিরুদ্ধতা ঃ যে কোনো সংস্থাকেই বেশ কিছু বিরুদ্ধতা মানিয়ে চলতে হয়। কোনো পরিষেবা প্রতিষ্ঠান, যেমন রান্নার গ্যাস, ইলেকট্রিক সাপ্লাই, ডাকবিভাগ ইত্যাদির পক্ষে সকল গ্রাহককে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হয় না। অনেক গ্রাহকই বিরোধীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানও ব্যতিক্রম নয়। কোনো সময়ে কোনো গ্রাহক একটি সংস্থার তৈরি জিনিস ব্যবহার ক'রে অসন্তুষ্ট হলে বা সংস্থার পরিষেবায় অসুবিধায় পড়লে, তিনি ঐ সংস্থার বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করেন।

জন-সংযোগের কাজ তথ্য উপস্থাপনের দ্বারা বোঝাপড়া তৈরি করা। নীরব থাকা নয়। সাধারণ মানুষ যদি তথ্য জানতে পারেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট সংস্থাটির প্রতি সহনশীল হতে পারেন। আর, সহনশীল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধতার মাত্রাও কমতে থাকে। বিরুদ্ধতা যদি অযৌক্তিক হয়, তাহলে সঠিক তথ্য পরিবেশনের দ্বারা বিরুদ্ধ মনোভাব পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। তথ্যের অভাব, ভুল তথ্য অথবা প্রতিযোগী সংস্থার প্রচারিত বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচারই বিরুদ্ধতার কারণ হতে পারে।

পক্ষপাত ঃ পক্ষপাতের মোকাবিলা করা কঠিন কাজ। কারণ, পক্ষপাতের উৎস মানুষের মনের অনেক গভীরে। পারিবারিক পরিবেশ, ছোটোবেলা থেকে পরিবারের প্রভাব, শিক্ষা, রাজনৈতিক ধারণা ও বিশ্বাস এবং জাতি ও ধর্মের প্রভাবেই মানুষের মনে পক্ষপাতমূলক মনোভাব গড়ে ওঠে। যার ফলে কোনো নাম, কোনো রং বা কোনো বিশেষ আকারের জিনিসের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব গড়ে ওঠে।

ঔদাসীন্য ঃ কঠিন নেতিবাচক পরিস্থিতি। ঔদাসীন্য কিন্তু যুক্তিসঙ্গত এবং বাস্তব। সকলেই নিজের পরিধির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যস্ত থাকেন। নতুন কোনো বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশের উৎসাহ বোধ করেন না এবং সময়ও পান না। ঔদাসীন্য এক ধরণের রক্ষণশীল মনোভাব। নতুন কোনো বিষয়ে জানার আগ্রহের অভাব। অথচ ঐ বিষয়টি জানা হয়তো তাঁর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন এবং উপকারী। পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে জীবনযাত্রার পদ্ধতি এবং বয়স, মানুষকে পরিবর্তনের প্রতি উদাসীন ক'রে তোলে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে এই ঔদাসীন্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

অজ্ঞতা ঃ বর্তমানের জটিল জীবনে আমার সকলেই অনেক বিষয়ে অজ্ঞ। সকলের পক্ষে সব কিছু জানা সম্ভব নয়। যখন নতুন কোনো ভোগ্যপণ্য বাজারে আসে কেবল বিজ্ঞাপনের দ্বারাই সবকিছু জানিয়ে গ্রাহকদের পণ্যটি সম্বন্ধে অবহিত করা সব সময় সম্ভব হয় না। তথ্যমূলক, শিক্ষামূলক জন-সংযোগ সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার এই প্রাচীর লংঘন করতে সহায়তা করে। জন-সংযোগের দ্বারা সর্বসাধারণের আগ্রহ এবং কৌতূহল সৃষ্টি ক'রে যে কোনো পণ্য সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করা সম্ভব।

জন-সংযোগের লক্ষ্য বিরুদ্ধ মতাবলম্বীর সহানুভূতি জাগানো। পক্ষপাতমূলক মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে স্বীকৃতি অর্জন করা। ঔদাসীন্যের প্রাচীর লংঘন ক'রে আগ্রহ জাগানো এবং অজ্ঞতা দূর করার জন্য তথ্য সরবরাহ ক'রে জ্ঞান সঞ্চার করা।

জন-সংযোগের সম্ভাবনা অপরিসীম। কিন্তু বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন, জন-সংযোগ যদিও গণমাধ্যম ব্যবহার করে, জন-সংযোগ বিজ্ঞাপন নয়। বিজ্ঞাপনের পরিবর্তও (substitute) নয়। স্বচ্ছতার সঙ্গে, বিশ্বাসযোগ্য ভাবে তথ্য পরিবেশন করাই জন-সংযোগ। বিশ্বাস যোগ্যতার অভাবে, জন-সংযোগ প্রচেষ্টা বিপদ এবং বিপর্যয়ও আনতে পারে।

১.৩ "পাবলিক" কারা?

কোনো সংস্থার জন-সংযোগ কর্মসূচীর লক্ষ্য অবশ্যই জনগণ বা সর্বসাধারণ। এই জনসাধারণ কারা? কোনো সরকারি ঘোষণা বা রাজনৈতিক দলের ঘোষণার লক্ষ্য সর্বসাধারণ। যে কোনো পর্যায়ের, যে কোনো শ্রেণির, যে কোনো বৃত্তের, যে কোনো শিক্ষামানের এবং যে কোনো আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটের সাধারণ মানুষ। কিন্তু কোনো সংস্থার জনগণ বা জনসাধারণ বিশেষভাবে চিহ্নিত।

জন সংযোগ বিজ্ঞানে এই চিহ্নিত জনগণকে "পাবলিক" (Public) নামে অভিহিত করা হয়। যেহেতু 'পাবলিক' শব্দটি জন-সংযোগ বিজ্ঞানে বহু প্রযুক্ত, বহু প্রচলিত এবং স্বীকৃত, সেইহেতু আমরা 'পাবলিক' শব্দটিই আমাদের আলোচনায় ব্যবহার করব।

প্রত্যেক সংস্থারই নির্দিষ্ট পাবলিক থাকে। এই নির্দিষ্ট পাবলিককে সাধারণত দুটি ভাগে পৃথক ক'রে চিহ্নিত করা হয়। একটি আভ্যন্তরিণ (internal) পাবলিক এবং অপরটি বহিস্থ (external) পাবলিক বা সংস্থার বাইরের পাবলিক। বুঝতে পারছেন, সংস্থায় যে সব শ্রমিক কর্মচারী কাজ করেন, তাঁরা আভ্যন্তরীণ পাবলিক হিসাবে গণ্য হন।

সংস্থায় কাজ করেন না, অথচ নানা ভাবে সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাঁরা তাঁরাই বহিস্থ পাবলিক হিসাবে গণ্য। যেমন, সরকারের শিল্প দপ্তর, শ্রমদপ্তর, বিদ্যুৎ দপ্তর, বাণিজ্য দপ্তর, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক এবং অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান, সংস্থার শেয়ারের মালিক, বিভিন্ন কাঁচামাল সরবরাহকারী এবং বিধায়ক ও সাংসদগণ, যাঁরা সরকারের বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা সকলেই বহিস্থ পাবলিক বা বাইরের পাবলিক হিসাবে গণ্য হন। এই বহিস্থ পাবলিক-এর তালিকায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকে সংস্থার পণ্যের বা পরিষেবার ক্রেতা সাধারণ।

বলা বাহুল্য, এই দুই গোষ্ঠীর পাবলিক-এর উদ্দেশ্যে সংস্থার নীতি, প্রয়োগ কৌশল দুই রকমের হবে। কারণ, এই দুই পাবলিক-এর উদ্দেশ্যে জন-সংযোগের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য দুই রকমের। অবশ্য আভ্যন্তরীণ পাবলিকও সংস্থার পণ্য বা পরিষেবার ক্রেতা হতে পারেন, সংস্থার শেয়ারে টাকা লগ্নীও করতে পারেন। আভ্যন্তরীণ পাবলিক এবং বহিস্থ পাবলিক-এর জন্য জন-সংযোগ কর্মসূচীর নীতি এবং কৌশল নির্ধারণের সময় এই বিষয়ে বিশেষ সচেতন থাকা প্রয়োজন।

১.৪ জনসংযোগের সংজ্ঞা

আধুনিক জন-সংযোগের সূচনা উনিশ শতকে। জন-সংযোগের প্রয়োগ এবং প্রচলন অবশ্য প্রাচীন কাল থেকেই। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে। আধুনিক জন-সংযোগের সূত্রপাত গণ্য করা হয় উনিশ শতক থেকেই। আমেরিকায় সংবাদপত্রগুলি ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন সংস্থা সম্বন্ধে সত্যমিথ্যা মিশ্রিত কুৎসামূলক রিপোর্ট প্রকাশ করতে থাকলে, সংস্থাগুলি বাধ্য হয়ে সংস্থার তরফের বক্তব্য প্রকাশের তাগিদ অনুভব করে। বিভিন্ন সংস্থার তরফের বক্তব্য সংবাদপত্রে বা গণমাধ্যমে প্রকাশের মধ্য দিয়েই সূচনা হয় এক নতুন কর্মপদ্ধতির এবং নতুন পেশার। এই কর্মপদ্ধতি এবং পেশাই কালক্রমে জন-সংযোগ হিসাবে পরিগণিত। বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংস্থা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য এবং নানাবিধ সরকারি নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে জন-সংযোগ প্রক্রিয়ার ব্যবহার এবং প্রয়োগ শুরু করে।

সূচনাকালে, কিছু কিছু এজেন্ট বিভিন্ন সংবাদপত্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ক'রে বিভিন্ন অভিযোগ, সমস্যা এবং পরিস্থিতি সম্বন্ধে সংস্থার বক্তব্য প্রকাশের ব্যবস্থা করতেন। উদ্দেশ্য ছিল, সত্যাসত্য মিশ্রিত সংবাদের উপর ভিত্তি করেই

জনসাধারণ যেন সংস্থাটি সম্পর্কে ধারণা না গড়ে তোলেন। সংস্থার বক্তব্য জনসাধারণকে জানিয়ে সংস্থার যথার্থ অবস্থান সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করা হতো। অর্থাৎ জনসাধারণ যেন অসত্য প্রচারে বিভ্রান্ত না হন। সংস্থার বক্তব্য জেনে তবেই সংস্থার সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলেন। লক্ষ্য করার বিষয়, এই প্রচেষ্টা একেবারেই আত্মরক্ষা মূলক। কোনো সংস্থায় কোনো বিশেষ ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটলে অথবা কোনো সংস্থার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ প্রকাশিত হলে সংস্থা কোনো এজেন্ট-এর মাধ্যমে সংবাদপত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। সংস্থার নিজস্ব বক্তব্য প্রকাশের ব্যবস্থা করতেন। এই প্রচেষ্টাও আত্মরক্ষামূলক প্রচেষ্টা। সাধারণ প্রচারের নামান্তর।

ক্রমে ক্রমে জন-সংযোগের সংজ্ঞা হয়ে দাঁড়ালো সংস্থার সঙ্গে সংস্থার পাবলিক-এর সমঝোতা গড়ে তোলা। সংস্থার ব্যবসার প্রসারের জন্য সুনাম বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে প্রভাবিত করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে জন-সংযোগ বিষয়ে এই ধারণা ক্রমশ পরিবর্তিত হতে শুরু করে। বৃটিশ ইনসটিট্যুট অফ পাবলিক রিলেশনস নিরূপণ করলেন—কোনো সংস্থার সঙ্গে জনসাধারণের বোঝাপড়া সচেতনভাবে সৃষ্টি করা এবং বজায় রাখার প্রচেষ্টাই জন-সংযোগ। আরো আধুনিক ভাষ্য—কোনো সংস্থা এবং তার জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগের ব্যবস্থাপনাই জন-সংযোগ।

আরো একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—জন-সংযোগ একটি পরিচালন কর্ম (management function)। সংস্থার 'পাবলিক'-এর মনোভাব মূল্যায়ন ক'রে, জনস্বার্থ বজায় রেখে, সংস্থার নীতি এবং কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা। বিভিন্ন কর্মসূচী পরিকল্পনা এবং বাস্তবে রূপায়িত করা যার ফলে সংস্থার পাবলিকের সঙ্গে সমঝোতা সম্ভব হয় এবং সংস্থার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

পাবলিকের মনোভাব বিশ্লেষণ করা এবং প্রয়োজন অনুসারে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা জন-সংযোগের প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে গণ্য হলো। জন-সংযোগ বিষয়ে বিদগ্ধ ব্যক্তি ডঃ রেক্স এফ হারলো (Dr. Rex F. Harlow) জন-সংযোগের প্রায় পাঁচশো বিভিন্ন সংজ্ঞা সংগ্রহ করেছিলেন। এই সব সংজ্ঞার বিভিন্ন উপাদান তিনি বিশ্লেষণ করেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং মৌলিক ধারণাগুলি একত্র ক'রে তিনি একটি নতুন সংজ্ঞা নির্ণয় করেন, যা একাধারে, তত্ত্বগত এবং প্রয়োগগত।

জন-সংযোগ একটি বিশিষ্ট পরিচালন কর্ম যার সাহায্যে কোনো সংস্থা এবং সংস্থার পাবলিকের মধ্যে যোগাযোগের সূত্র গড়ে তোলা এবং বজায় রাখা যায়। যার ফলে পারস্পরিক যোগাযোগ, সমঝোতা, গ্রহণযোগ্যতা এবং সহযোগিতার পথ প্রশস্ত হয়। জন-সংযোগ বিভিন্ন সমস্যা এবং বিশেষ প্রাসঙ্গিক বিষয়ের মোকাবিলা করতে সাহায্য করে। জনমত সম্পর্কে পরিচালন কর্তৃপক্ষকে অবহিত রেখে কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে সহায়তা করে। জনস্বার্থ বজায় রাখার জন্য কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ব্যাখ্যা ক'রে, কর্তব্য পালনের গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয়। পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষকে সচেতন ক'রে পরিবর্তনের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে সহায়তা করে। আর, জন-সংযোগের মূল অস্ত্র গবেষণা এবং নির্ভরশীল, নীতিসম্মত যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার।"

"Public relations is a distinctive management function which helps establish and maintain mutual lines of communication, understanding, acceptance and cooperation between an organisation and its publics; involves the management of problems and issues; helps management to keep informed on and responsive to public opinion; defines and emphasizes the responsibility of management to serve the public interest; helps management keep abreast of and effectively utilize change, serving as an early warning system to help anticipate trends, and uses research and sound and ethical communication as its principal tools."

জন-সংযোগের বিভিন্ন ধারণা আরো সরল ক'রে বলা হয়েছে—"জন-সংযোগ এক পরিচালন কর্ম যা কোনো

সংস্থার সঙ্গে সংস্থার বিভিন্ন পাবলিকের পারস্পরিক সুবিধাজনক সম্পর্ক স্থাপন চিহ্নিত করে, স্থাপন করে এবং বজায় রাখে, কারণ সংস্থার পাবলিকের মনোভাব এবং আচরণের উপরই সংস্থার সাফল্য এবং ব্যর্থতা নির্ভর করে।"

"Public relations is the management function that identifies, establishes and maintains mutually benefitial relationships between an organisation and the various publics on whom its success or failure depends."

তবে, জন-সংযোগের সবচেয়ে বিশদ সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন—"ইনসটিট্যুশন অফ পাবলিক রিলেশনস"। তার সঙ্গে রয়েছে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে মেক্সিকো শহরে—ওয়ার্লড এসেমব্লি অফ পাবলিক রিলেশনস অ্যাসোসিয়েশন-এর সমাবেশে গৃহীত মেক্সিকান স্টেটমেন্ট (Mexican Statement)।

ইন্সটিট্যুশন অফ পাবলিক রিলেশনস-এর নির্ধারিত জন-সংযোগের সংজ্ঞা—"কোনো সংস্থা এবং তার জন-সাধারণের মধ্যে, সংস্থার ব্যবসার সুনাম এবং সমঝোতা গড়ে তোলার এবং বজায় রাখার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত, অবিচ্ছিন্ন এবং নিরন্তর প্রচেষ্টাই জন-সংযোগ।"

"Public relations practice is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and mutual understanding between an organisation and its publics."

এই সংজ্ঞার বিশেষত্ব পারস্পরিক বোঝাপড়া বা সমঝোতার উপর গুরুত্ব। সংস্থার বক্তব্য জনসমক্ষে পেশ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। জন সাধারণের মনোভাব এবং বক্তব্য জানা এবং বোঝাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো সংস্থার জন-সংযোগের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা করা অবশ্যই জরুরি। কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী জনসংযোগের কর্মসূচী নির্ধারণ করা না হলে, জন সংযোগের ফল পাওয়া শক্ত। আর একটি কথা, জন-সংযোগ প্রচেষ্টা নিয়মিতভাবে করতে হয়। নিরন্তর তথ্যমূলক এবং শিক্ষামূলক জন-সংযোগের পরিকল্পনা সাফল্যমন্ডিত হয়। জন-সংযোগ কর্মপ্রচেষ্টা সফল হলে সংস্থার সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের মনে প্রভাব বিস্তার করে। সংস্থার কাজকর্মের গুরুত্ব সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত ক'রে তোলে।

এবারে দেখা যাক, মেক্সিকান স্টেটমেন্ট হিসাবে জন-সংযোগের সংজ্ঞা কী। "জন-সংযোগ কর্ম একাধারে শিল্প ও সমাজবিজ্ঞান, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ ক'রে তার পরিণতি অনুমান ক'রে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ-স্থানীয় ব্যক্তিদের পরামর্শ দেয় এবং পরিকল্পিত কর্মসূচী কার্যকরী করে, যা সংস্থা এবং জনসাধারণ, দু তরফের পক্ষেই লাভজনক হয়।"

"Public Relations Practice is the art and social science of analysing trends, predicting their consequences, counselling organisation leaders, and implementing planned programmes of action which will serve both the organisation's and the public interest." (The Mexican Statement).

মেক্সিকান স্টেটমেন্টে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে গবেষণার উপর। পরিস্থিতি বা সমস্যা সর্বতোভাবে বিশ্লেষণ ক'রে, তবেই জন-সংযোগের উদ্দেশ্য এবং কর্মপদ্ধতি নির্দিষ্ট করা যাবে। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, জন-সংযোগের দায়িত্ব কেবল সংস্থার স্বার্থরক্ষাই নয়, জনসাধারণের স্বার্থরক্ষাও জন-সংযোগের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

১.৫ জন-সংযোগ কী কাজ করে?

ক ঃ কোনো সংস্থার পরিচালন কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট জনসাধারণের সঙ্গে সমঝোতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত নিরন্তর কর্মসূচীই জন-সংযোগ।

খ ঃ সংস্থা এবং তার জনসাধারণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা করে।

গ ঃ সংস্থার আভ্যন্তরীণ এবং বহিস্থ পাবলিক-এর অবগতির মাত্রা, মতামত, মনোভাব এবং ব্যবহারিক অভিব্যক্তি সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য এবং বিশ্লেষণ করে।

ঘ ঃ বিভিন্ন পাবলিক-এর উপর সংস্থার কাজকর্মের, নীতি-প্রণালির এবং সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচীর প্রভাব বিশ্লেষণ করে।

ঙ ঃ সংস্থা এবং পাবলিক, উভয়ের স্বার্থরক্ষায় সমান ফলপ্রসূ নতুন নীতি এবং কর্মপদ্ধতি অনুসরণের জন্য কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেয়।

চ ঃ সংস্থা এবং বিভিন্ন পাবলিক-এর মধ্যে উভয়মুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করে এবং বজায় রাখে।

ছ ঃ সংস্থা সম্বন্ধে অবগত ক'রে, সংস্থার পাবলিক-এর মতামত, মনোভাব এবং ব্যবহারিক প্রতিক্রিয়ার নির্দিষ্ট পরিবর্তন সাধন করে।

১.৬ বিবর্তন ও ইতিহাস

জন-সংযোগ আধুনিক পেশা হিসাবে গণ্য হলেও এই কর্মপদ্ধতি এবং পেশার শিকড় অনেক শতাব্দী পিছনে বিস্তৃত। প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সমাজ এবং প্রশাসন ব্যবস্থায় একইরকম কর্মসূচীর প্রচলন ছিল। প্রাচীন গ্রীস এবং রোম-এও বর্তমানের জন-সংযোগের অনুরূপ কর্মসূচীর প্রচলন ছিল। আসলে, মানব সমাজে একে অপরের সঙ্গে মতামত বিনিময়ের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই জন-সংযোগের সূচনা হয়েছিল। সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে বিভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কাজকর্মের অনুকূলে জন সাধারণের অনুকূল মনোভাব গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সবদেশেই, বিভিন্ন সময়ে অনুভূত হয়েছিল। সেই প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন উপায়ে, জনমত অনুকূলে নিয়ে আসার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করা হয়েছে। সেই সব কাজকর্মই কালক্রমে আধুনিক জন-সংযোগ-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

জন-সংযোগ বর্তমানে একটি আধুনিক পেশা হিসাবে গণ্য। সমাজের প্রয়োজন ও বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পেশার চরিত্রের এবং কর্মকুশলতার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত সামাল দিয়ে অন্যান্য পেশা যেমন বর্তমানের স্বীকৃত আকার ধারণ করেছে, জন-সংযোগ সেই জাগতিক প্রক্রিয়ার ব্যতিক্রম নয়। সংবাদপত্রকে প্রভাবিত করার এজেন্ট-এর ভূমিকা থেকে বহু সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নানারকম কর্মকুশলতা এবং সূক্ষ্ম পারদর্শিতা অর্জন ক'রে জন-সংযোগ বর্তমানের আবশ্যিক, কার্যকরী, আধুনিক পেশার রূপ গ্রহণ করেছে।

উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের শুরুতে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির চাপে জন-সংযোগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি লাভ করে। আমেরিকায়, বিভিন্ন সংবাদপত্র মাঝে মাঝেই কোনো কোনো সংস্থা সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা মিশ্রিত নানা রকম সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন কুৎসামূলক রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি সম্বন্ধে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত ক'রে সংস্থাগুলির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে থাকে। অনন্যোপায় হয়ে কোনো কোনো সংস্থা এজেন্ট নিয়োগ করলেন। এই এজেন্টের কাজ ছিল সংস্থার তরফে সংবাদপত্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং সংস্থার নিজস্ব বক্তব্যও প্রকাশের ব্যবস্থা করা। এই এজেন্টরাই বর্তমানের আধুনিক জন-সংযোগ বিশেষজ্ঞের পূর্বসূরী।

বিশ শতকের সূচনায় বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কাজে জন-সংযোগ স্বীকৃতি পেল। কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির সাংবাদিকতার আক্রমণ থেকে বিভিন্ন ব্যবসায় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান সুনাম এবং ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য জন-সংযোগের পেশাগত নৈপুণ্যের সহায়তা গ্রহণ করলেন। প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য জনসাধারণের কাছে পেশ করাই ছিল মূল লক্ষ্য।

সংবাদপত্রের নিন্দা এবং কুৎসার উত্তরে প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য জানিয়ে জনসাধারণের মনে প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে ধারণা স্বচ্ছ এবং গ্রহণীয় করার প্রয়াস। ব্যবসার পরিপন্থী কোনো কোনো সরকারি সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে জনমত গঠনেও জন-সংযোগের বিশেষ ভূমিকা ক্রমশই প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এই সব কাজের মধ্যেই ধীরে ধীরে পেশাদারী দক্ষতা এবং বিভিন্ন কলাকৌশলের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

পেশা হিসাবে জন-সংযোগের যথার্থ স্বীকৃতি লাভ ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। আমেরিকায় সরকারের পক্ষ থেকে একটি কমিটি গঠন করা হয়—"কমিটি অফ পাবলিক রিলেশন"। জর্জ ক্রিল-এর (George Creel) নেতৃত্বে এই কমিটি দেশজুড়ে পরিকল্পিতভাবে প্রচার কাজ করে, সরকারের স্বপক্ষে এবং যুদ্ধের স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য। এতদিন কেবল ব্যবসায় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন মেটাতেই জন-সংযোগের প্রয়োগ হতো। এবারে পাওয়া গেল সরকারি স্বীকৃতি। সম্মানের পেশা হিসাবে গণ্য হওয়ার সূচনা। তবে, জন-সংযোগ এখনও—"জনমত প্রভাবিত করার হাতিয়ার" এই ধারণার বা পরিচয়ের সঙ্কীর্ণ গন্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হয়নি। জন-সংযোগ বিষয়ে সর্বজনস্বীকৃত এডওয়ার্ড এল বার্নেস-এর প্রভাবশালী বইয়ের শিরোনাম—"দি ইঞ্জিনিয়ারিং অফ কনসেন্ট" (The Engineering of Consent)। বইটির নামেই জন-সংযোগের একটি বিশেষ চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে জন-সংযোগ একটি জটিল, কৌশলী আধুনিক পেশায় উন্নত হয়। ক্রমশ গুরুত্ব অর্জন করে—"পারস্পরিক বোঝাপড়া"। জন-সংযোগের উদ্দেশ্যের মধ্যে এবং লক্ষ্যে পৌঁছানোর বিভিন্ন প্রয়োগ কৌশলের মধ্যেও।

জন-সংযোগের ক্রমবিকাশ সরল পথে সম্ভব হয়নি। তথ্য এবং সংবাদের আদান প্রদান মানব সভ্যতার সূচনাকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। তথ্যের পরিবেশনের দ্বারা অন্যের মতামত অনুকূলে আনার প্রয়াস সেই আদিকাল থেকেই। কেবল প্রয়াসের কলাকৌশল, মাত্রা এবং বিশেষ প্রয়োগের বিভিন্ন উপায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, পরিমার্জিত এবং উন্নত হয়েছে।

প্রাচীন গ্রিসের বিভিন্ন মতবাদের প্রবক্তারা জনসাধারণের ইচ্ছার কথা বার বার বলেছেন। অবশ্য তাঁরা 'জন-সংযোগ' এর কথা বলেন নি। কিন্তু, জন-সংযোগ ব্যতীত জনসাধারণের ইচ্ছাকে নিজের স্বপক্ষে এবং অন্যের বিপক্ষে চালনা করা সম্ভব নয়। প্রাচীন রোমের এবং মধ্য যুগের বিভিন্ন রচনায় এমন সব শব্দ পাওয়া গেছে, যেগুলির প্রতিশব্দ আসলে 'জনমত'। রোমানদের সেই বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করুন—"জনসাধারণের কণ্ঠস্বরই ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর"। (Vox populi, Vox Die) পরবর্তীকালে ম্যাকিয়াভেলি (Machiavelli) তাঁর "ডিসকোর্সি" (Discoursi) গ্রন্থে লিখেছেন—"বিনা কারণে জনসাধারণের কণ্ঠস্বরকে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তুলনা করা হয়নি।" এই জনসাধারণের কণ্ঠস্বর প্রভাবিত করে জন-সংযোগ।

যোগাযোগের মাধ্যমে মতামত এবং কর্মপদ্ধতি প্রভাবিত করার উদাহরণ অনেক প্রাচীন নিদর্শনেও পাওয়া গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা খনন ক'রে মধ্যপ্রাচ্যের ইরাকে খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ সালের যে নিদর্শন পেয়েছেন—সেটি কৃষকদের উদ্দেশ্যে সংবাদ। সেই বুলেটিনে শেখানো হয়েছে কী ভাবে বীজ বপন করতে হবে, কেমনভাবে জলসেচন করা প্রয়োজন, মাঠের ইঁদুরের দৌরাত্ম কী ভাবে মোকাবিলা করতে হবে এবং ফসল তোলার সময় অবশ্য কর্তব্য কী কী। ভেবে দেখুন, আমাদের "আকাশবাণীর", "চাষী ভাইদের জন্য" অনুষ্ঠানের সঙ্গে পার্থক্য আছে কি? পুরাতন বিভিন্ন রচনায় অসংখ্য উদাহরণ আছে, রাজারা গুপ্তচর নিয়োগ করতেন তাঁদের এবং রাজ্যের বিরুদ্ধে কেউ চক্রান্ত করছে কী না, জানার জন্য। সেই গুপ্তচরদের আরো দায়িত্ব ছিল, রাজা এবং তাঁর রাজকার্য সম্বন্ধে প্রজাদের মনোভাব রাজাকে জানানো এবং প্রজাদের কাছে রাজা এবং রাজ্যের গুণগান করা।

ইংল্যান্ড-এও নানাবিধ জন-সংযোগ সম্পর্কিত কাজ প্রচলিত ছিল। "প্রোপাগান্ডা" (propaganda)—যার অর্থ

"সমর্থন লাভের জন্য প্রচার"—এই শব্দটির জন্ম হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। যখন ক্যাথলিক চার্চ ধর্মসভা ডাকেন—"বিশ্বাস প্রচারের জন্য"।

আমেরিকায় জন-সংযোগ-এর সূচনাকাল ধরা হয় আমেরিকান বিপ্লবের সময় থেকে। বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী এবং ভূসম্পত্তির মালিকদের সঙ্গে সাধারণ দেশপ্রেমিকদের দ্বন্দ্বের সময়। দুই পক্ষই জনমত সংগ্রহের জন্য নানাবিধ প্রচারে লিপ্ত হয়। পরে এর পরিণতি গৃহযুদ্ধ।

যদিও বিশ শতকেই জন-সংযোগের আধুনিক রূপ বিকশিত হয় এবং এই শতকেই জন-সংযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা হিসাবে কার্যকরী হয় এবং স্বীকৃতি পায়,—জন-সংযোগের এই বিকাশের সূচনা কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। ইউরোপ এবং আমেরিকায়। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী যুগে এবং আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ব্যবসা বাণিজ্য, বিভিন্ন শিল্প এবং রেলপথ দ্রুত প্রসার লাভ করে। বিপুল সংখ্যক লোক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রতিষ্ঠান এবং সরকার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে সংশ্লিষ্ট জনগণের সঙ্গে বোঝাপড়া। আর, বোঝাপড়া গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন হয় জন-সংযোগ।

আজকের যুগের জন-সংযোগ-এর ধ্যানধারণার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বলা যেতে পারে, আধুনিক অর্থে বিশ্বের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক জন-সংযোগ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জর্জ ওয়েসটিং হাউস ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে। "অলটারনেট কারেন্ট সিস্টেম" (alternate current system) সরবরাহ করার জন্য ওয়েসটিং হাউস ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে একটি কোম্পানি স্থাপন করেন। টমাস আলভা এডিসন-এর জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। এডিসন "ডাইরেক্ট কারেন্ট সিস্টেম" পরিষেবা জোগান দিতেন। ওয়েস্টিং হাউস বাজারে আসায়, এডিসন তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন স্যামুয়েল ইনসুলকে নিযুক্ত করলেন ওয়েসটিং হাউসের সরবরাহ করা বিদ্যুৎ সম্পর্কে ভীতি প্রচারের জন্য। ওয়েসটিং হাউসকে নিবৃত্ত করার জন্য এডিসন বিভিন্ন সরকারি মহলে এবং জনসাধারণের কাছে অলটারনেট কারেন্টের ক্ষতিকর দিকগুলি প্রচার করলেন; এমন কী এই কারেন্ট ব্যবহারে প্রাণহানির আশঙ্কা আছে বলেও জানালেন।

ওয়েসটিং হাউস উপলব্ধি করলেন, জনসাধারণকে তাঁর বক্তব্য জানানো বিশেষ প্রয়োজন। তিনি পিটসবার্গ-এর এক সংবাদপত্রের সাংবাদিক ই. এইচ. হাইনরিখ্স্-কে (E. H. Heinrichs) নিযুক্ত করলেন তাঁর কোম্পানির বক্তব্য প্রচার ক'রে সরকারি মনোভাব এবং জনমত স্বপক্ষে আনার জন্য। হাইনরিখ্স্ ১৮৮৯ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত কাজ করেছিলেন। পরে তিনি বলেছিলেন, ওয়েসটিং হাউসের সময় ছিল না নিজে বিভিন্ন সংবাদপত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করার। তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে হাইনরিখ্স্ বিভিন্ন সংবাদপত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। হাইনরিখ্স্-এর মাধ্যমেই কোম্পানির সমস্ত খবর সংবাদপত্রের কাছে পৌঁছাতো। তখনকার দিনেও সংবাদপত্র মহলে সংবাদ প্রচারের জন্য বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হতো। ওয়েসটিং হাউস সম্ভবত প্রথম কোনো পরিচালন কর্তা, যিনি জন-সংযোগের গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন।

"জন-সংযোগ"—এই বিষয় বা নাম ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে বেশি এবং ঘন ঘন ব্যবহার করা শুরু হয়। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে "রেইলওয়ে এজ গেজেট" (Railway Age gazette) সম্পাদকীয় প্রবন্ধে উন্নত "জন-সংযোগ"-এর জন্য আবেদন করেন।

এই সব দেখার ফলে অন্যান্য শিল্পকর্তারাও উৎসাহিত হন। প্রথম পাবলিক রিলেশন্স্ ডাইরেক্টর নিযুক্ত হয়েছিলেন ডবলিউ টি মোস্‌মান (W.T. Mossman)। নিয়োগকর্তা, জোনস এ্যান্ড লাফলিন স্টিল কোম্পানি (Jones & Laughlin Steel Company)।

কোম্পানির নিজস্ব জন-সংযোগ বিভাগের উপযোগিতা বিবেচনা ক'রে কোম্পানির "পাবলিক রিলেশন্স্ ব্যুরো" বিভাগ খোলেন আমেরিকান টেলিফোন এ্যান্ড টেলিগ্রাফ কোম্পানি (AT & T) ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে।

ইতিপূর্বে জার্মানিতেও জন-সংযোগের প্রচলন হয়েছে। শিল্প বিপ্লবের ফলশ্রুতি হিসাবে ইউরোপে ও আমেরিকায় দ্রুত শিল্পায়ন এবং রেলপথের যোগাযোগের ফলে জন-সংযোগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। উনিশ শতকে জার্মানির অগ্রপণ্য শিল্প সংস্থা "ক্রুপ" কোম্পানি'র প্রতিষ্ঠাতা আলফ্রেড ক্রুপ জনসংযোগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার ক'রে বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। ক্রুপ-এর জন-সংযোগ কর্মসূচী ক্রমশ সারা বিশ্বে প্রসারিত এবং কার্যকরী হওয়ায় অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানও ক্রুপ-এর পথ অনুসরণ করা শুরু করেন।

গ্রেট ব্রিটেনে, প্রধানমন্ত্রী ডেভিড লয়েড জর্জ-এর পরামর্শে ইনসিউরেন্স কমিশন, ন্যাশনাল ইনসিউরেন্স এ্যাক্ট-এর প্রয়োজনীয়তা জনসাধারণের কাছে প্রচার করেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনের বায়ু মন্ত্রক (Air Ministry) প্রথম সরকারি প্রেস অফিসার নিয়োগ করেন। আর, ঠিক এক বছর পরেই, স্বাস্থ্য মন্ত্রক রয়টারের প্রাক্তন সংবাদদাতা সার বসিল ক্লার্ককে (Basil Clarke) "ডাইরেক্টর, অফ ইনফরমেশন" পদে নিযুক্ত করেন। ব্রিটেনের প্রথম জন-সংযোগ আধিকারিক সার জন এলিয়ট (Sir John Elliot) ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে নিযুক্ত হয়েছিলেন সাদার্ন রেলওয়ে কোম্পানিতে।

জন-সংযোগ-এর ইতিহাস এবং বিবর্তন আলোচনায় আইভি লি'র (Ivy Lee) নাম বাদ দেওয়া যায় না। বর্তমানে আমরা আধুনিক জনসংযোগ-এর যে প্রয়োগ কৌশল এবং পদ্ধতি আলোচনা করি এবং প্রয়োগ করি, তার প্রবর্তক আইভি লি।

আগের অনুচ্ছেদে আপনারা জেনেছেন সাংবাদিকদেরই নিয়োগ করা হতো, সে যুগের জন-সংযোগের সংকীর্ণ বৃত্তের পরিপ্রেক্ষিতে জন-সংযোগের দায়িত্ব পালনের জন্য। আরো যথার্থ হবে, যদি বলি, তাঁদের দায়িত্ব ছিল সংবাদপত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। এই ব্যবস্থায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করেন আই ভি লি। আধুনিক জন-সংযোগের সূত্রপাত তাঁরই হাতে।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে "নিউ ইয়র্ক ওয়ার্লড"-এর প্রাক্তন রিপোর্টার আইভি লি জন-সংযোগ উপদেষ্টা হিসাবে যোগ দিলেন আমেরিকার আনথ্রাসাইট কোল কোম্পানিতে। আনথ্রাসাইট তখন শ্রমিক বিক্ষোভ এবং ধর্মঘটে জর্জরিত।

কোম্পানিতে যোগ দিয়েই আইভি লি জানলেন, কোম্পানির শ্রমিক নেতা নিয়মিত নানারকম সংবাদ পাঠাচ্ছেন বিভিন্ন সংবাদপত্রে। সংবাদপত্র যে ধরণের সংবাদ পছন্দ করেন, বিতর্কমূলক এবং কিছুটা উত্তেজনা এবং প্ররোচনামূলকও। বলা বাহুল্য, শ্রমিক নেতার পাঠানো এই সব সংবাদ শ্রমিকদের স্বপক্ষে এবং কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। কিন্তু কোম্পানির কর্তৃপক্ষ সংবাদপত্রের সঙ্গে কথা বলতে রাজি নন, এমন কী সরকারের সঙ্গেও আলোচনা করতে রাজি নন। আইভি লি কোম্পানির মালিকদের বুঝিয়ে রাজি করালেন। কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর করা একটি বিবৃতি বিভিন্ন সংবাদপত্রে পাঠালেন। বিবৃতিতে বলা হলো, "খনি অঞ্চলের মানুষদের স্বার্থের বিষয় বিবেচনা ক'রে, আনথ্রাসাইট কোল কোম্পানির পরিচালকবর্গ সংবাদপত্রকে খনি সংক্রান্ত সকল সংবাদ সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন"।

আইভি লি প্রচারিত কর্তৃপক্ষের এই নিয়মনীতির ঘোষণা জন-সংযোগ-এর নতুন যুগের সূচনা। "জনগণ মরুক গে" নীতি পরিবর্তিত হয়ে এখন থেকে নতুন নীতি হলো "জনগণকে জানাতে হবে"। এখন থেকে সংবাদপত্রের সংবাদের অন্যতম নির্ভরযোগ্য সূত্র হয়ে উঠলো—জন-সংযোগ।

আমেরিকার বিভিন্ন রেলপথ সংবাদপত্রকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। কিছু কিছু সংবাদের আদান প্রদান হতো, তবে গোপনে। একটি বড়ো রেল দুর্ঘটনার পরে পেনসিলভ্যানিয়া রেল রোড কোম্পানি আইভি লি কে উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। আইভি লি কোম্পানির প্রেসিডেন্টকে বুঝিয়ে তাঁর নীতি পরিবর্তন করতে রাজি করালেন। আইভি লি, সংবাদপত্রের সঙ্গে সব রকম সহযোগিতার হাত বাড়ালেন। সংবাদপত্রগুলিকে সমস্ত সংবাদ এবং সত্য ঘটনার বিবরণ দিলেন। এমন কী, সাংবাদিকদের দুর্ঘটনা স্থলে নিয়ে গিয়ে সরেজমিনে সবকিছু দেখার ব্যবস্থা করে দিলেন। এর ফলে, সংবাদপত্রে যে সব রিপোর্ট বেরলো, সেগুলি আগের রিপোর্টের মতো ক্ষতিকর হলো না।

রকফেলার পরিবারের কলোরাডো ফুয়েল এ্যান্ড আয়রন কোম্পানির কারখানায় ধর্মঘটের মোকাবিলায় এক সাংঘাতিক ঘটনার পরে রকফেলার জুনিয়র আইভি লি'র পরামর্শ চান। লি প্রথমে দু'পক্ষের সঙ্গেই বিস্তারিত আলোচনা করলেন। তারপর রকফেলারকে রাজি করালেন শ্রমিকদের বাড়িতে গিয়ে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে এবং শ্রমিকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত কথাবার্তা বলতে। রকফেলার শ্রমিকদের বাড়ি গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। খাবার ঘরে শ্রমিকদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করলেন। বিয়ারের গ্লাস হাতে, হাসিমুখে কথা বললেন, আইভি লি'র পরামর্শ মতো। লি সংবাদপত্রের ফোটোগ্রাফারদের সঙ্গে রেখেছিলেন। রকফেলার-এর শ্রমিকদরদী কার্যকলাপের ফোটোগ্রাফ বিভিন্ন সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল। আইভি লি'র কৃতিত্ব, শ্রমিক বিক্ষোভকে ইতিবাচক পরিস্থিতিতে পরিণত ক'রে তিনি রকফেলার পরিবারের এবং তাঁদের পরিচালিত কোম্পানির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আইভি লি আধুনিক জন-সংযোগের প্রবক্তা এবং পথ প্রদর্শক।

বিশ শতক, জন-সংযোগ-এর পূর্ণ প্রস্ফুটিত হওয়ার শতক। প্রথম মহাযুদ্ধ এবং অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে জন-সংযোগ সম্বন্ধে শিল্প বাণিজ্যের পরিচালকদের এবং সরকার পরিচালকদের সচেতনতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সারা বিশ্বে জনসাধারণের সচেতনতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিচালকদের জন-সংযোগ পেশা সম্পর্কে সচেতনতা এবং আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। জনসাধারণকে বাদ দিয়ে নয়, জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি। এর পরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়। সারা বিশ্বে শিল্প বাণিজ্যের প্রসারণের সুবর্ণ যুগ। বিভিন্ন দেশে শিল্পায়ন এবং বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক পরিচালন ব্যবস্থার আরো বেশি প্রয়োগ। আর বিশ শতক পূর্ণ হওয়ার পূর্বের শেষ পচিশ বছর তথ্য আদান প্রদানের এবং যোগাযোগের যুগ বলে সারা বিশ্বে স্বীকৃত। আর এক অর্থে, জনসংযোগ-এর যুগ।

আধুনিক জন-সংযোগ-এর বিকাশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। জন-সংযোগ-এর বিভিন্ন পথিকৃৎ-এর দ্বারা সূচনার পরবর্তী অধ্যায়ে জন-সংযোগ-এর কর্মপদ্ধতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য জন-সংযোগের কর্মকৌশল অনেক মার্জিত ও বৈজ্ঞানিক হয়েছে। জন-সংযোগের কলাকৌশলও দিনে দিনে অনেক সূক্ষ্ম এবং জটিল রূপ নিয়েছে। বর্তমানে, জন-সংযোগ এক আধুনিক, জটিল পেশা, জনসাধারণের মনোভাব অনুকূলে আনার জন্য যে কোনো সংস্থার পক্ষে একান্তই আবশ্যিক। বিভিন্ন মাধ্যমের চাহিদা অনুসারে এবং বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আর্থসামাজিক পরিবেশে কার্যকরী করার জন্য জন-সংযোগের আঙ্গিক এবং কৌশলের বহুবিধ পরিবর্তন ঘটেছে।

১.৭ ভারতে জন-সংযোগের বিবর্তন

বিশ শতকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই পেশা হিসাবে জন-সংযোগ স্বীকৃত হতে এবং প্রযুক্ত হতে দেখা গেল ব্রিটেন সহ ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং জাপানে। এই সময় থেকেই তৃতীয় বিশ্বের, অর্থাৎ এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার বহু দেশে জন-সংযোগের ব্যাপক প্রয়োগের সূচনা।

অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও জন-সংযোগ বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে। প্রথম পর্যায়—উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত: জন-সংযোগ বলতে বর্তমানে যে পেশা বা বৃত্তির ধারণা হয়, এই রূপ ভারতে তখনো প্রস্ফুটিত হয় নি। এই পর্যায়ে কেবল সংবাদ আদান-প্রদান এবং জনহিতৈষামূলক (philanthropic) কাজকর্মই "জন-সংযোগ" হিসাবে গণ্য হতো। এই পর্যায়ের সূচনা ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে। হাউস অফ টাটা প্রতিষ্ঠা করলেন—জে. এন. টাটা এনডোমেন্ট। বিশেষ কৃতী স্নাতকদের বিদেশে লেখাপড়ার সুযোগ ক'রে দেওয়ার জন্য। টাটা আয়রন এ্যান্ড স্টিল কোম্পানির উৎপাদন শুরু হলো ১৯১১-১২ খ্রিস্টাব্দে। পরিকল্পিত গোষ্ঠী সামাজিক সম্পর্কের

ভিত গড়া হলো সাকর্চি'র নতুন রূপ—জামশেদপুরে। শ্রমিক-কর্মচারী সম্পর্ক বা আভ্যন্তরীণ জন-সংযোগের সূচনা এখানেই।

প্রথম যুগে, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে জন-সংযোগের উদাহরণও আছে। ভারতীয় রেলওয়ে, রেলপথে ভ্রমণে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ইংল্যান্ডে পরিকল্পিত প্রচার করেছিলেন। এই প্রচার কর্মে বিভিন্ন গণমাধ্যম এবং মুদ্রিত পুস্তিকাও ব্যবহার করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, ভ্রমণকারীদের ভারতদর্শনে উৎসাহিত করা। দেশের সাধারণ মানুষকে রেলপথে ভ্রমণে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন মেলায়, উৎসবে রেলওয়ের প্রচার কর্মসূচী ছিল নিয়মিত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তদানীন্তন ভারত সরকার আর এক ধরণের জন-সংযোগ কর্মসূচী গ্রহণ করেন। বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং জনসাধারণকে যুদ্ধ সংক্রান্ত সংবাদ জ্ঞাপনের ব্যবস্থা হলো। এই উদ্দেশ্যে একটি "সেন্ট্রাল পাবলিসিটি বোর্ড" গঠন করা হয়েছিল। বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন স্টানলি স্মিথ, টাইমস অফ ইন্ডিয়া সংবাদপত্রের তৎকালীন বোম্বাই সংস্করণের সম্পাদক। যুদ্ধ শেষ হলে, এই বোর্ডের কাজকর্ম দেখার জন্য প্রতিষ্ঠা হলো "সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনফরমেশন" ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রাসব্রুক উইলিয়াম (Prof. Rushbrook William) এই ব্যুরোর প্রথম ডাইরেক্টর। পরে এই ব্যুরোর নাম পরিবর্তিত হয়—ডাইরেকটরেট অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে আবার নাম পরিবর্তন হলো—ডাইরেকটরেট অফ ইনফরমেশন এ্যান্ড ব্রডকাস্টিং।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই ভারতে সচেতনভাবে জন-সংযোগ বিদ্যা প্রয়োগের সূচনা। নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্যই জন-সংযোগের নতুন আকার এবং প্রয়োগ। সরব জনমতের আবির্ভাব, সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি, এই পরিস্থিতিতে জনমত গঠন করা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ভারতের জনসাধারণের বেশির ভাগই নানা কারণে যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিল। ইনফরমেশন এ্যান্ড ব্রডকাস্টিং বিভাগ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল—পরিকল্পিতভাবে জনসাধারণকে সচেতন ক'রে পরিস্থিতির অনুকূলে জনমত গড়ে তোলার জন্য। পরিকল্পিত কর্মসূচীর মধ্যে ছিল—প্রতিরক্ষা দপ্তরে লোক নিয়োগ, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং ব্যবস্থা ইত্যাদি।

একই সময়ে, বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানও, যাঁরা পূর্বে বিভিন্ন উপায়ে জন-সংযোগ করতেন, ক্রমশ সচেতনভাবে, পরিকল্পিত উপায়ে জন-সংযোগ কর্মসূচী গ্রহণ করা শুরু করেন। হাউস অফ টাটা বোম্বাই হেড অফিসে "পাবলিক রিলেশনস বিভাগ" গঠন করেন ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাঁদের কাজকর্মের অনুকূলে জনমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানগত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা শুরু করেন। ভারতে জন সংযোগের সচেতন যুগের সূচনা।

ভারতে জন-সংযোগের দ্বিতীয় পর্যায় স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে দেশের পরিস্থিতির আমুল পরিবর্তন ঘটে। রাজনৈতিক পটভূমিতে বিদেশি শাসকদের জায়গায় সংসদ এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা। সদস্যরা প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রয়োগের দ্বারা নির্বাচিত। সমাজবাদী সরকার গঠনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন সরকারি নীতি এবং নিয়মকানুনের ব্যাখ্যা জনসাধারণকে বোঝানো জরুরি হয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গেই জরুরি হয়ে পড়ে উদ্দেশ্যমূলক, পরিকল্পিত জন-সংযোগ।

সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও একই সঙ্গে আধুনিক জন-সংযোগের উপর ক্রমশ নির্ভরশীল হতে থাকেন। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি তাঁদের বিদেশের জন-সংযোগের দক্ষতা এবং নৈপুণ্য ভারতের কোম্পানির জন-সংযোগ বিভাগের মাধ্যমে প্রয়োগ করা শুরু করলেন। ভারতীয় কোম্পানিগুলিও ক্রমশই জন-সংযোগের গুরুত্ব বিবেচনা ক'রে জন-সংযোগের নৈপুণ্য প্রয়োগ করা শুরু করেন।

পরবর্তী পর্যায়—পেশাদারিত্বের বিকাশ। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জনসংযোগ কর্মসূচীর প্রয়োজন এবং গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান হওয়ায় জনসংযোগে পেশাদারী নৈপুণ্যের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে ওঠে। অনেক তরুণ-তরুণী এই পেশায় যোগ দিতে উৎসাহী এবং আগ্রহী। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা এবং গণজ্ঞাপনের পাঠক্রমে জন-সংযোগ অন্তর্ভুক্ত আছে।

অন্য দু-একটি প্রতিষ্ঠানেও জন-সংযোগ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে, বাজার অর্থনীতিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জন-সংযোগ কর্মসূচী অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে। প্রয়োজন—পেশাদার। বিজ্ঞান সম্মত জন-সংযোগের কাজে দক্ষ পেশাদার। ভারতে এই পেশায় দক্ষতা সম্পন্ন লোকের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে।

১.৮ বর্তমান প্রবণতা ও পরিস্থিতি

ভারতে জন-সংযোগের বর্তমান প্রবণতা এবং গতিপ্রকৃতি বিষয়ে আলোচনার শুরুতে দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি অনুধাবন করা বিশেষ প্রয়োজন। জন-সংযোগ এক পরিচালন কর্ম। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সে ভোগ্যপণ্য প্রস্তুতকারী হোক বা পরিষেবা জোগানদার হোক, সব সময়েই একটি বিশেষ আর্থ সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই কাজ করে। দেশের সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারও এই বিশেষ পরিবেশ অথবা পরিস্থিতির মধ্যেই কার্যশীল।

গত পঞ্চাশ বছরে ভারতের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। গ্রামকেন্দ্রিক সমাজ ক্রমশ শহরকেন্দ্রিক সমাজে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। তা সে ছোটো, বড়ো, বা মাঝারি যে কোনো ধরনের শহরই হোক না কেন। আর, গ্রামের জীবনেও শহরের জীবনের প্রভাব ক্রমবর্ধমান। বর্তমানে প্রত্যেক মানুষই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র বিষয়ে অনেক বেশি সচেতন। সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, অর্থাৎ মতামত সম্বন্ধেও অনেক বেশি সচেতন। শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ব্যক্তি চেতনারও প্রসার হয়। সমাজের সকল স্তরে, সকল মানুষেরই বিভিন্ন বিষয়ে নিজস্ব মতামত আছে। সেই মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা সম্পর্কেও মানুষ আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। ব্যক্তির চিন্তাধারা, মতামত এবং মনোভাবের গুরুত্ব ক্রমশই আরো মূল্যবান হয়ে উঠেছে। সচেতন জনমানসকে অবহিত রাখার জন্য পরিকল্পিত জন-সংযোগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বহু পরিবর্তনের নিদর্শন। ভারত স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরে যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি গৃহীত হয় এবং বাস্তবায়িত হয় সেগুলির মূল লক্ষ্য ছিল পরিকল্পিত এবং নিয়ন্ত্রিত শিল্পায়ন ও ব্যবসাবাণিজ্য। পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে নানাবিধ আভ্যন্তরীণ চাপে এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার প্রয়োজনীয়তায় ভারতের শিল্প ও অর্থনীতির বহুবিধ পরিবর্তন ঘটে গেছে। আগেকার নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির পরিবর্তে চালু হয়েছে বাজার অর্থনীতি। নিয়ন্ত্রিত শিল্পায়নের বাধানিষেধের গন্ডী আর নেই। নানারকম ভোগ্যপণ্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দ, বিলাসের সামগ্রী অবাধে তৈরি এবং বিক্রি করাই বর্তমান শিল্প নীতি।

যে কোনো প্রতিষ্ঠানকে এই পরিস্থিতির মধ্যে কাজ ক'রে, গ্রাহকদের সন্তুষ্ট ক'রে, বাজারে আধিপত্য বিস্তার করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব, স্বতন্ত্র পরিচিতি প্রতিষ্ঠা করা, এবং গ্রাহকদের মনোভাব প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নিয়ে আসার জন্য প্রয়োজন প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি। জন-সংযোগই প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

গ্রাহকদের মতামতের উপরেই সংস্থার সাফল্য নির্ভর করে। সেই কারণে সব প্রতিষ্ঠানই উপলব্ধি করছেন গ্রাহকদের মনোভাব অনুকূলে আনার প্রয়াস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গত দুই দশকের কিছু বেশি সময় ধরে বিভিন্ন সংস্থার জন-সংযোগের বিশেষ তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অস্তিত্ব বজায় রাখার এবং সাফল্যের জন্য জন-সংযোগের প্রয়োজনীয়তা শিল্প-বাণিজ্য মহল উপলব্ধি করেছেন। তারই ফল জন-সংযোগ কর্মসূচীর তৎপরতা। জন-সংযোগ কর্মসূচীর প্রসারে বিশেষ সহায়ক হয়েছে বিভিন্ন মাধ্যমের প্রচার সংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। এবং রয়েছে রেডিও ও বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের তথ্য সরবরাহের অসীম সুযোগ ও সম্ভাবনা। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির চাপে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও জন-সংযোগ বিশেষজ্ঞের উপর নির্ভর করা প্রয়োজন মনে করছেন। গত নির্বাচনের সময় দেখা গেছে কোনো কোনো রাজনৈতিক

দল পেশাদার জন-সংযোগ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী নির্বাচনী প্রচার করেছেন এবং জনগণের অনুকূল মনোভাব গড়তে সফল হয়েছেন।

ভারতে সাম্প্রতিক জন-সংযোগের যে সব নিদর্শন দেখা যাচ্ছে, তাতে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়েছে। জন-সংযোগের ব্যবহার এবং গুরুত্ব বাড়ছে। কিন্তু, কেবল পেশাদারী জন-সংযোগেরই গুরুত্ব বাড়ছে। অতীত দিনের জন-সংযোগ বা সৌখিন জন-সংযোগের দিন এখন সত্যই অতীত। যুগের এবং পরিস্থিতির প্রয়োজন পেশাদার জন-সংযোগের। প্রয়োজন, জনসংযোগের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহারের পেশাদারী কলাকৌশল এবং হালফিলের আধুনিক মাধ্যম ব্যবহারের কারিগরী নৈপুণ্য।

আরো একটি বিষয় বিশেষ অনুধাবন যোগ্য। বহু সংস্থা জন-সংযোগের পেশাদারী পরিষেবার জন্য সংস্থার বাইরের কোনো উপদেষ্টা (Consultant) বা জন-সংযোগ এজেন্সি নিয়োগ করছেন, পেশাদারী পরামর্শ লাভ এবং কর্মকুশলতা প্রয়োগের জন্য। এই সিদ্ধান্তে জনসংযোগের আবশ্যকতা, গুরুত্ব এবং পরিচালন কর্তৃপক্ষের এই বিষয়ে সচেতনতাই প্রমাণিত হচ্ছে।

১.৯ সারাংশ

আধুনিক পরিচালন ব্যবস্থায় পরিচালন কর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্ম জন-সংযোগ। যে কোনো প্রতিষ্ঠানই, সে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হোক বা সরকারি প্রতিষ্ঠান হোক, দেশের সমাজ এবং জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ। যে কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই জনসাধারণের আস্থাভাজন এবং বিশ্বাসযোগ্য হওয়া একান্ত প্রয়োজন। জন-সংযোগ এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ ক'রে সংস্থার অনুকূলে জনমত গড়ে তোলে এবং প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্য ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে।

প্রাচীনকাল থেকেই জন-সংযোগ বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন নামে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। আধুনিক জন-সংযোগের সূচনা উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের শুরুতে। শিল্পায়ন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জন-সংযোগের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগ ও ব্যবসার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জন-সংযোগের প্রয়োগের সুযোগ এবং গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

জন-সংযোগ ক্রমশ সমাজবিজ্ঞান নির্ভর এবং বিভিন্ন কলাকৌশল ও প্রয়োগ কৌশলের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে।

পেশা হিসাবে জন-সংযোগের গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে। প্রয়োগ কৌশল এবং পেশাদারী দক্ষতার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তাও বাড়ছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সরকার জন-সংযোগ বিষয়ে বর্তমানে অনেক বেশি সচেতন। জন-সংযোগের সম্ভাবনা অনেক।

জনসংযোগ পেশা বর্তমানে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জন-সংযোগের প্রয়োজনীয়তাও আছে। তবে, এই পেশায়, পুরোপুরি পেশাদারীত্বের বিশেষ প্রয়োজন।

১.১০ অনুশীলনী

১। জন-সংযোগের বিভিন্ন সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করুন।

২। পরিচালন ব্যবস্থায় জন-সংযোগের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব কী?

৩। জন-সংযোগের "পাবলিক" কারা? আলোচনা করুন।

৪। ভারতে জন-সংযোগের বিবর্তন পর্যালোচনা করুন।

টীকা লিখুন ঃ

ক. আভ্যন্তরীণ পাবলিক   খ. আইভি লি   গ. বহিস্থ পাবলিক

১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

(1) Public Relations : Principles, Cases ● H. Frazier Moore, Frank B. Kalpua .

(2) Practical Public Relations ● Sam Black

(3) Public Relations in India ● Sanat Lahiri

(4) জনসংযোগ ● সমর বসু

একক ২ ❑ জন-সংযোগ এবং অনুসারী ক্ষেত্র

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য
২.১ প্রস্তাবনা
২.২ প্রচার
২.৩ সমর্থন লাভের জন্য প্রচার
২.৪ জনসাধারণ বিষয়ক
২.৫ তদ্বির
২.৬ সারাংশ
২.৭ অনুশীলনী
২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

২.০ উদ্দেশ্য

জন-সংযোগ একটি পরিচালন কর্ম। পরিচালন কর্তৃপক্ষের অন্য কয়েকটি কাজকর্মের সঙ্গে জনসংযোগের কিছু কিছু সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু এই কাজগুলি জন-সংযোগ নয়। জন-সংযোগ নয়, অথচ জন-সংযোগের কাজের সঙ্গে সমগোত্রীয় এই সব বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে। এই এককটি পাঠ ক'রে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বুঝতে পারবেন ঃ

- প্রচার
- সমর্থন লাভের জন্য প্রচার
- জনসাধারণ বিষয়ক
- তদ্বির

২.১ প্রস্তাবনা

এক নম্বর এককে জন-সংযোগ পেশার বিষয়ে আপনারা জেনেছেন। জন-সংযোগের সংজ্ঞা এবং জন-সংযোগ কী কাজ করে সে বিষয়ে আপনাদের স্পষ্ট ধারণা হয়েছে।

যে কোনো সংস্থায়, জন-সংযোগ একটি পরিচালন কর্ম হিসাবেই সর্বজনস্বীকৃত। পরিচালন ব্যবস্থায় জন-সংযোগের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

জন-সংযোগের কাজের সঙ্গে সমগোত্রীয় আরো কিছু কিছু কাজকর্ম বা পেশা আছে, যে গুলিকে অনেকেই জন-সংযোগ হিসাবে অভিহিত করেন। যেহেতু এই সব কাজকর্মের সঙ্গে জন-সংযোগের কিছু সামঞ্জস্য আছে, অনেকেরই ধারণা এইগুলিও জন-সংযোগের বিভিন্ন কাজের অংশবিশেষ বা প্রকারভেদ মাত্র। বস্তুতঃ জনসংযোগ পেশা একটি সমাজবিজ্ঞান সম্মত পেশা। যে কোনো সংস্থার পরিচালন ব্যবস্থায় জন-সংযোগের একটি দায়িত্বশীল এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

অন্যান্য যে সব কাজকর্মের সঙ্গে জনসংযোগকে গুলিয়ে ফেলা হয়, সেগুলি—প্রচার (Publicity), সমর্থন লাভের জন্য প্রচার কার্য (Propaganda), জনসাধারণ বিষয়ক (Public Affairs) এবং তদ্বির (Lobbying)।

এই প্রসঙ্গে জেনে রাখা প্রয়োজন, জন-সংযোগ পেশাকে অনেক সময় অন্য নামেও অভিহিত করা হয়। নামের পরিবর্তনে অবশ্য কাজের তারতম্য ঘটে না। একই কাজের অনেক ক্ষেত্রেই তো একাধিক নাম থাকে।

বিদেশে বেশির ভাগ সংস্থাই "জন-সংযোগ" কাজকর্ম এবং পেশাকে "প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ" (Corporate Communication) বলে অভিহিত করা পছন্দ করেন।

বিভিন্ন সংস্থার পরিচালন কর্তৃপক্ষের পছন্দের তালিকায় "জন-সংযোগ" এই নাম এখন দ্বিতীয় স্থানে। এই পেশার অন্যান্য জনপ্রিয় নাম—"জনসাধারণ বিষয়ক" (Public Affairs), "যোগাযোগ" বা "সংযোগ" (Communication) "প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক" (Corporate Relations) এবং "প্রাতিষ্ঠানিক জনসাধারণ বিষয়ক" (Corporate Public Affairs)।

বিভিন্ন সরকারি দপ্তর এবং সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান সাধারণত জন-সংযোগ কাজকর্মকে "জন তথ্য" (Public Information) হিসাবে গণ্য করতে অভ্যস্ত। এই নামের তাৎপর্য—কেবল তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে। জন-সংযোগেও তথ্য পরিবেশন করা হয় কিন্তু সেক্ষেত্রে জনসাধারণকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্য থাকে একথা সকলেই জানেন। প্রভাবিত করার উদ্দেশ্য নেই, কেবল তথ্যই পরিবেশন করা হচ্ছে—এই রকম বাতাবরণ সৃষ্টি করার জন্যই ক্ষেত্রবিশেষে "জন-সংযোগ" শব্দটি ব্যবহার করা হয় না। সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলি "জন-সংযোগ" কে সাধারণত "জনসাধারণ বিষয়ক" (Public Affairs) নামে অভিহিত করেন।

এবারে আসুন, সংযোগের সমগোত্রীয় অন্যান্য কাজকর্ম এবং পেশার বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

২.২ প্রচার

বাইরের কোনো সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য যখন কোনো সংবাদমাধ্যম প্রাপ্ত তথ্যটির গুরুত্ব এবং ঐ বিষয়ে পাঠক, শ্রোতা অথবা দর্শকদের আগ্রহের কথা বিবেচনা ক'রে প্রকাশ করেন তখন সেটি "প্রচার" হিসাবে গণ্য হয়। বুঝতে পারছেন, বিভিন্ন সংস্থার জন-সংযোগ বিভাগ বিভিন্ন তথ্য সংবাদ মাধ্যমকে পাঠিয়ে থাকেন। এই সব তথ্য সংস্থার কাজকর্ম সম্বন্ধে হতে পারে, অথবা, কোনো বিশেষ ঘটনা, কোনো পরিকল্পনা, কোনো পণ্য বা পরিষেবা সম্বন্ধেও হতে পারে। এই সব তথ্য বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম তাঁদের পাঠক, শ্রোতা বা দর্শকের আগ্রহের বিষয়ে বিবেচনা ক'রে, সংবাদ হিসাবে প্রাপ্ত তথ্যটি পরিবেশন করেন। মনে রাখতে হবে, কোনো বিশেষ সংস্থা প্রেরিত সংবাদ, মাধ্যম পরিচালকরা সংবাদটির গুরুত্ব এবং পাঠক, দর্শক ও শ্রোতার সংবাদটিতে আগ্রহের বিষয় বিবেচনা করেই সংবাদটি প্রকাশ করে থাকেন। এক্ষেত্রে, পাঠক, দর্শক অথবা শ্রোতা ধারনা করেন, মাধ্যমটিই এই সংবাদ সংগ্রহ করেছেন এবং প্রকাশ করেছেন। এই কারণে, পাঠক, দর্শক, শ্রোতার কাছে প্রকাশিত সংবাদটির বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। যে সংস্থা মাধ্যমকে ঐ তথ্য পরিবেশন করেছেন, তাঁরা লাভবান হন। অথচ, এর জন্য সংস্থার পক্ষে সংবাদ মাধ্যমকে কোনো মূল্য দিতে হয় না, যা বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে দিতে হয়। সেই হিসাবে "প্রচার" যে কোনো সংস্থার পক্ষে দ্বিগুণ লাভজনক।

প্রচার-এর মূল সূত্র—যে মাধ্যম প্রাপ্ত সংবাদটি প্রচার করবেন, সেই মাধ্যমের বিচারে তাঁদের পাঠক, দর্শক, বা শ্রোতার কাছে, সংবাদটির সংবাদ-মূল্য থাকা প্রয়োজন। তার ফলে, সংস্থা প্রেরিত সংবাদটির অনেক সময়েই রূপ পরিবর্তন ঘটে, মাধ্যমটির নীতি অনুযায়ী এবং পাঠক, দর্শক, শ্রোতার চাহিদা অনুযায়ী। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সংস্থা প্রেরিত সংবাদ পরিবর্তিত আকারেই প্রকাশিত হয়। আবার, অনেকক্ষেত্রেই, সংস্থা প্রেরিত সংবাদটি বিভিন্ন মাধ্যম

বিভিন্ন দিনে বা সময়ে তাঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকাশ করেন। যে সংস্থাটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সংবাদটি বিভিন্ন মাধ্যমকে পাঠিয়েছেন, সেই সংস্থার, সংবাদটি প্রকাশের রূপ বা সময়ের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে, যদি সংস্থা প্রেরিত সংবাদ পরিবর্তিত রূপে প্রকাশিত হয় এবং কবে, কখন, কী ভাবে প্রচারিত হবে, তাঁর উপরে সংস্থার কোনো নিয়ন্ত্রণ না-ই থাকে, তাহলে বিভিন্ন সংস্থা এই প্রচারে উৎসাহী হন কেন?

মূল এবং উল্লেখযোগ্য কারণ—বিশ্বাসযোগ্যতা (credibility)। পাঠক, দর্শক এবং শ্রোতার কাছে সংবাদটি এমনভাবে উপস্থাপিত হয়, তাঁরা বিশ্বাস করেন সংশ্লিষ্ট মাধ্যমই সংবাদটি সংগ্রহ করেছেন এবং সংবাদটির গুরুত্ব বিবেচনা ক'রে প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন। এর ফলে, তাঁরা সংবাদটিকে গুরুত্ব দেন। কোনো সংস্থার প্রচারিত সংবাদ বলে হালকাভাবে দেখেন না বা সাধারণ প্রচারের বিষয় হিসাবে দ্বিধার সঙ্গে দেখেন না। এই কারণেই, বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। যে সংস্থা সংবাদটি প্রচার করতে অভিলাষী, তাঁদের কাছে সাধারণ মানুষের এই বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রচারের উদ্দেশ্য সাধনের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। এই ভাবে প্রচারিত সংবাদ যে কোনো সংস্থার স্বপক্ষে, অনুকূল জনমত গড়ে তুলতে বিশেষ সহায়ক হয়। এই কারণেই, পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও বিভিন্ন সংস্থা এই উপায় অবলম্বন করেন, প্রচারিত সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টির জন্য।

জনসংযোগের সঙ্গে একাঙ্গীকরে দেখলেও, প্রচার আসলে জন-সংযোগের একটি অংশমাত্র। অবশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

বিভিন্ন মাধ্যমে আপনারা প্রায়ই এরকম সংবাদ দেখেন। কোনো কোম্পানি একটি বিশেষ ওষুধ প্রস্তুত ক'রে বাজারে আনছে, যা জনসাধারণের বিশেষ উপকারে আসবে। অথবা, কোনো কোম্পানি তাঁদের পণ্যের রপ্তানির মাত্রা দ্বিগুণ ক'রে, বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। এই সব সংবাদের জন্ম হয়েছে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির জন-সংযোগ বিভাগে। সেখান থেকে এই সব সংবাদের রিপোর্ট, ফোটোগ্রাফসহ ফিচার, ইনটারভিউ-এর টেপ বিভিন্ন মাধ্যমে পাঠিয়ে তাঁদের সংবাদটির গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। তার পরেই, আপনারা সংবাদগুলি বিভিন্ন মাধ্যমে দেখতে পেয়েছেন।

জন-সংযোগ বিভাগ থেকে বিভিন্ন মাধ্যমকে সংবাদলিপি (Press release) সরবরাহ করা হয়। এই সংবাদগুলি একেবারে সংবাদের আকারেই পাঠানো হয়। প্রেরিত সংবাদের আকর্ষণীয় শিরোনামও দেওয়া হয়, পাঠক, দর্শক ও শ্রোতার আগ্রহ সৃষ্টির জন্য, তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য। সংবাদটি উপযুক্ত লিড (lead) সমেত যে মাধ্যমকে পাঠানো হচ্ছে, সেই মাধ্যমের উপযুক্ত করে রচনা করা হয়।

প্রচার লাভের আর একটি উপায় সংবাদ হওয়ার উপযুক্ত অনুষ্ঠানের (event) আয়োজন করা। কোনো সংস্থার একটি নতুন কারখানার উদ্বোধন। অথবা, কোনো বিশেষ সমাজসেবামূলক কাজে কোম্পানির অনুদান ঘোষণা এবং সেই অনুদান বিশেষ কোনো ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়ার অনুষ্ঠান। এই ধরণের অনুষ্ঠান বিভিন্ন মাধ্যমের আগ্রহ সৃষ্টি করে। কোম্পানির জন-সংযোগ বিভাগ পরিকল্পনা করেন, কী ভাবে কোম্পানির প্রচারের জন্য সংবাদ সৃষ্টি করা যায়, এবং বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা যায়।

জন-সংযোগ এবং প্রচার, একের সঙ্গে অপরকে মিলিয়ে দেখার কারণ সম্ভবত—দুটিই অঙ্গাঙ্গীভাবে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। প্রচার আসলে জন-সংযোগের একটি অঙ্গ। তবে, মনে রাখতে হবে, প্রচার থেকেই জন-সংযোগের সূচনা। বিশ শতকের শুরুতে "প্রচার"ই আধুনিক জনসংযোগের সূত্রপাত ঘটায়।

২.৩ সমর্থন লাভের জন্য প্রচার

প্রোপাগান্ডা, এই শব্দটি পড়লে বা শুনলেই আপনাদের কী মনে হয়? অতিরঞ্জিত, সত্যমিথ্যা মিশ্রিত সংবাদ পরিবেশনের দ্বারা কোনো বিষয়ের বা কোনো ব্যক্তির অথবা সংস্থার অনুকূলে সমর্থন লাভের জন্য অমার্জিত, স্থূল প্রচেষ্টা।

জন সংযোগের সূক্ষ্ম কলাকৌশল, বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা এবং সুদূর প্রসারি ফলাফলের লক্ষ্য প্রোপাগান্ডায় নেই।

প্রোপাগান্ডা সাধারণত পক্ষপাতমূলক তথ্য হিসাবে গণ্য হয়। কোনো বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা বিশ্বাসের সমর্থন লাভের জন্য সত্যমিথ্যামিশ্রিত বা অতিরঞ্জিত তথ্য ব্যবহার ক'রে কার্যসিদ্ধি করাকে প্রোপাগান্ডা বলা হয়। জন-সংযোগের তত্ত্ব এবং প্রয়োগের মধ্যে যে ইতিবাচক এবং বৈজ্ঞানিক প্রস্তুতি আছে, প্রোপাগান্ডায় তার ব্যতিক্রমই দেখা যায়। প্রোপাগান্ডার স্থূল উদ্দেশ্য যে কোনো উপায়ে সমর্থন আদায় করা বা জনমত সৃষ্টি করা।

যদিও কেউ কেউ জনসংযোগ এবং প্রোপাগান্ডাকে একই কাজ বলে বর্ণনা করেন, দুইয়ের মধ্যে অনেক গুণগত পার্থক্য রয়েছে। জন-সংযোগের উদ্দেশ্য বিভিন্ন তথ্য আদান প্রদানের দ্বারা জন সাধারণের সঙ্গে বোঝাপড়া বা সমঝোতা সৃষ্টি করা। এই ক্ষেত্রে, উদ্দীষ্ট জনসাধারণেরও একটি ভূমিকা আছে। তথ্য যাচাই এবং বাছাই করার সুযোগও আছে। কারণ লক্ষ্য—দুই পক্ষের বোঝাপড়া বা সমঝোতা।

প্রোপাগান্ডার উদ্দেশ্য বোঝাপড়া নয়, যে কোনো উপায়ে জনসাধারণের মতামত একটি বিশেষ লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়া। একটি নির্দিষ্ট, বিশেষ গোষ্ঠীকে বিশেষ লক্ষ্যে নিয়ে আসার আন্দোলনও বলা যায়। কোনো বিশেষ মত বা বিশ্বাস বা গোষ্ঠীর অনুকূলে অথবা বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে, যে কোনো রকম প্রচারের অর্থই প্রোপাগান্ডা। কোনো বিশেষ ব্যক্তির ভাবমূর্তি বা প্রতিষ্ঠায় বিঘ্ন ঘটাবার উদ্দেশ্যে সত্য মিথ্যা প্রচারই প্রোপাগান্ডা। সম্প্রতি ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ার জন্য এবং তাঁকে অত্যাচারী শাসক ও ইরাকের সাধারণ মানুষের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য প্রোপাগান্ডা করা হয়েছে। যেহেতু লক্ষ্য, যে কোনো উপায়ে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মত কোনো বিশেষ দিকে পরিচালিত করা, সেই কারণে, প্রোপাগান্ডায় ব্যবহৃত তথ্য বেশির ভাগ সময়েই অতিরঞ্জিত এবং কখনো কখনো মিথ্যা নির্ভর।

এই কারণে, জন-সংযোগ এবং প্রোপাগান্ডা একই মনে করবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। জন-সংযোগের যে বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসযোগ্যতা আছে, প্রোপাগান্ডায় সেটি নেই। জন-সংযোগের উদ্দেশ্য বোঝাপড়া, প্রোপাগান্ডার উদ্দেশ্য বিশেষ লক্ষ্যে চালিত করা।

"প্রোপাগান্ডা একটি উদ্দেশ্যমূলক, নিয়মবদ্ধ প্রয়াস। যার দ্বারা সাধারণের উপলব্ধি বিশেষ আকৃতি পায়, সাধারণের জ্ঞান সুবিধাজনক ভাবে পরিবর্তন করা যায় এবং ব্যবহার এমনভাবে নির্দিষ্ট করে যার ফলে প্রচারের উদ্দেশ্য সাধন হয়।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দুইপক্ষই নিজেদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য এবং অপর পক্ষের মনোবল ভেঙে দিয়ে নৈরাশ্য সৃষ্টির জন্য প্রোপাগান্ডার আশ্রয় নিয়েছিল। ইদানীংকালে পর পর দুইবার ইরাক আক্রমণের পূর্বে, আক্রমণের সময়ে এবং পরে প্রোপাগান্ডার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে ইরাকের বিরুদ্ধে এবং আক্রমণকারীর স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে।

প্রোপাগান্ডার অপর অর্থ মিথ্যা প্রচার, ছলনা, চতুরালি, ভুল তথ্য এবং তঞ্চকতা (duplicity)।

২.৪ জনসাধারণ বিষয়ক

জন-সংযোগেরই অপর একটি নাম পাবলিক এ্যাফেয়ার্স।

কোনো কোনো সংস্থায়, বিশেষ করে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে, প্রতিরক্ষা বিভাগে এবং মিউনিসিপ্যালিটিতে জন-সংযোগকে পাবলিক এ্যাফেয়ার্স নামে অভিহিত করা হয়। এর ফলে অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়. কিন্তু জন-সংযোগ এবং পাবলিক এ্যাফেয়ার্স কার্যত একই।

বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, প্রতিরক্ষা দপ্তর এবং বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি নিজ নিজ নির্দিষ্ট পাবলিক-এর সঙ্গে জন-সংযোগের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করেন। সম্ভবত সেই কারণেই জন-সংযোগের পরিবর্তে "জন-সংযোগ বিষয়ক" নামই বেশি যুক্তিযুক্ত বলে অনেকে মনে করেন। এখানে নিহিত অর্থ, এই সব বিভাগের নির্দিষ্ট বিশেষ ধরণের কাজকর্মের জন্য নির্দিষ্ট পাবলিকের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতে হয়। এই সব সংস্থার কাজকর্ম জনসেবা এবং পরিষেবামূলক। সেই কারণেই, "জনসাধারণ বিষয়ক" নামটি উপযুক্ত, যদিও কাজ আসলে জন-সংযোগ।

"জনসাধারণ বিষয়ক—এক বিশেষ ধরণের জন-সংযোগ প্রচেষ্টা যার উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট এবং সরকারের পক্ষে জন-সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা এবং বজায় রাখা।"

২.৫ তদ্বির

সরকারি জন-সংযোগের আর এক বিশেষ রূপ তদ্বির করা। জন-সংযোগের মতো তদ্বির করাতেও বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। তদ্বির করার উদ্দেশ্য আইন প্রণয়নকারী বিধায়ক এবং সাংসদদের প্রভাবিত করা। বিভিন্ন সংস্থার কাজকর্ম অসংখ্য আইন এবং নিয়মকানুন দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সমস্ত আইন এবং নিয়মকানুন যাতে সংস্থার পক্ষে সুবিধাজনক হয়, তার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা তদ্বিরের ব্যবস্থা করেন। সংস্থার তরফে যাঁরা এই কাজ করেন, তাঁদের তদ্বিরকারী (Lobbyist) বলা হয়।

অনেকেই, বিশেষ ক'রে যাঁরা জন-সংযোগের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা তদ্বির করাকে ভালো চোখে দেখেন না। তাঁদের বক্তব্য, তদ্বিরের দ্বারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য নানা উপায়ে সরকারি সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করা হয়। কিন্তু সরকারি সিদ্ধান্ত বা নিয়ম অনুকূলে আনার জন্য বিভিন্ন সংগঠন, নাগরিক গোষ্ঠী, কর্পোরেশন, শ্রমিক ইউনিয়ন, সকলেই তদ্বিরের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেন।

তদ্বিরকারীকে সরকারি নিয়মকানুন, কর্মপদ্ধতি, সরকারের বিভিন্ন স্তরের কর্মপদ্ধতি, এবং বিধানসভা ও সংসদের কার্যপ্রণালি গভীরভাবে জানতে হয়। তদ্বিরকারীর পক্ষে এগুলি জানা অবশ্য প্রয়োজনীয়। অনেক ক্ষেত্রেই জন-সংযোগ বিভাগের বিশেষজ্ঞের এই দক্ষতা থাকে না বলে তদ্বিরকারী আইনজ্ঞের পরামর্শ ও সহায়তা নিয়ে থাকেন। তদ্বির করাও একপ্রকার সংযোগ, সরকারের সঙ্গে। কাজেই, তত্ত্বগতভাবে জন-সংযোগেরই অঙ্গ। সরকারের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করার জন্য তদ্বিরের সঙ্গে সঙ্গে অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করার জন্য সাধারণ মানুষের জনমত তৈরি করা প্রয়োজন, জন-সংযোগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে। এর ফলে, তদ্বিরের পথ সুগম হয়। যাঁরা আইন প্রণয়নকারী, তাঁরা সাধারণত জনমত উপেক্ষা করতে পারেন না।

তদ্বিরকারী একজন বিশ্বাসযোগ্য প্রবক্তা এবং তথ্যের নির্ভরযোগ্য সূত্র। জন-সংযোগের মূল কর্মপ্রবাহ থেকে তদ্বিরকারীর প্রয়োগ নৈপুণ্য সামান্যই পৃথক। তদ্বিরকারী একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে, বা লক্ষ্য নিয়ে কাজ করেন। তাঁর উদ্দিষ্ট শ্রোতা মুষ্টিমেয় কয়েকজন, যাঁদের নির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা যায়।

তদ্বিরকারীকে বিশদ তথ্য সরবরাহ করতে হয়, সংস্থার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। তদ্বিরকারীকে তাঁর বক্তব্যের যৌক্তিকতা বোঝাতে হয় তথ্য প্রমাণের দ্বারা। এবং আরো নানাবিধ উপায় অবলম্বন করতে হয় মনোভাব এবং মত অনুকূলে আনার জন্য। তদ্বির কেবল দেশের বা কোনো রাজ্যের রাজধানীতে কার্যকরী নয়, সকল রকম ক্ষমতার কেন্দ্রেই, যেমন, মিউনিসিপ্যালিটি বা জেলা সদর, এমনকী পঞ্চায়েতেও তদ্বিরের কার্যকারীতা অনস্বীকার্য।

২.৬ সারাংশ

জন-সংযোগের সঙ্গে আরো কয়েকটি পরিচালন কর্মের সামঞ্জস্য আছে। সাধারণ প্রবণতা—সবগুলিকেই জন-সংযোগ বলে অভিহিত করা।

কিন্তু, জন-সংযোগের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকলেও, এই অন্যান্য কাজকর্মগুলির পৃথক পরিচয় আছে। জন-সংযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ—প্রচার। প্রচারকে জন-সংযোগ বলা যেতে পারে, কিন্তু আংশিকভাবে। জন-সংযোগ বিভাগ, সংস্থার অনুকূলে মনোভাব গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে নানারকম সংবাদ প্রকাশের যে ব্যবস্থা করেন, সেইটিই প্রচার, জনসংযোগের সম্পূর্ণ কার্যাবলীর অংশবিশেষ।

প্রোপাগান্ডা জন-সংযোগ নয়। কারণ, প্রোপাগান্ডার পদ্ধতি জন-সংযোগের মতো বৈজ্ঞানিক এবং সূক্ষ্ম নয়। অতিরঞ্জিত, সত্যমিথ্যা মিশ্রিত সংবাদ প্রচারের দ্বারা কোনো বিষয়ের বা কারো বিরুদ্ধে বা স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলাই প্রোপাগান্ডা। জন-সংযোগের উদ্দেশ্য বোঝাপড়া সৃষ্টি করা।

সরকারি দপ্তর এবং জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রেই জন-সংযোগকে "জনসাধারণ বিষয়ক" বলে অভিহিত করেন। বিশেষ, নির্দিষ্ট পাবলিকের সঙ্গে সংযোগের পরিচয় এই নামকরণ। কাজ কিন্তু জনসংযোগ।

তদ্বির একটি বহুপ্রচলিত প্রথা। আইন প্রণেতাদের এবং সরকারের পরিচালনায় যাঁরা আছেন তাঁদের কোনো বিশেষ বিষয়ে ওয়াকিবহাল করা এবং প্রভাবিত করার কাজই তদ্বির।

২.৭ অনুশীলনী

১। "প্রচার" বলতে কী বোঝায়? বিভিন্ন সংস্থা কেন "প্রচার" করেন?

২। "প্রচার", "তদ্বির", "প্রোপাগান্ডা" কী জনসংযোগ বলে বিবেচিত হবে? আলোচনা করুন।

টীকা লিখুন ঃ

ক. প্রোপাগান্ডা, খ. পাবলিক এ্যাফেয়ার্স, গ. তদ্বির

২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

(1) Public Relations ● Frank Jefkins

একক ৩ ❑ নীতি, আচরণ বিধি, কর্তব্য ও দায়িত্ব

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ নীতি নির্দেশাবলী

৩.৩ মানহানি

৩.৪ ব্যক্তিগত গোপনীয়তা

৩.৫ কপিরাইট

৩.৬ জন-সংযোগ কর্মীর আবশ্যিক গুণ

৩.৭ জন-সংযোগের কর্তব্য ও দায়িত্ব

৩.৮ জন-সংযোগ কনসালটেন্সি

৩.৯ সারাংশ

৩.১০ অনুশীলনী

৩.১১ গ্রন্থপঞ্জি

৩.০ উদ্দেশ্য

জন-সংযোগ পেশা সংক্রান্ত নীতি নিয়মাবলী, আচরণবিধি এবং সংশ্লিষ্ট তিনটি বিষয়ে আইনকানুন এই এককের আলোচনার বিষয়। সব পেশারই নিজস্ব কিছু আচরণবিধি থাকে। জন-সংযোগ পেশারও আচরণবিধি আছে। পেশাদারি কাজকর্ম যাতে সংস্থার এবং সমাজের মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই হয়, সেই জন্য পেশাদারি আচরণবিধি মেনে চলাই বাঞ্ছনীয়। আরো প্রয়োজন, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা। এই এককটি পাঠ ক'রে এই বিষয়গুলি জানতে পারবেন।

- জন-সংযোগের নীতি নির্দেশাবলী
- মানহানি
- ব্যক্তিগত গোপনীয়তা
- কপিরাইট
- জন-সংযোগ কর্মীর আবশ্যিক গুণ
- কর্তব্য ও দায়িত্ব
- জন-সংযোগ কনসালটেন্সি

৩.১ প্রস্তাবনা

জন-সংযোগ পেশা এবং প্রয়োগ পদ্ধতি বিশ শতকে বহুধা বিস্তৃতি লাভ করে। জন-সংযোগের প্রভাব এবং প্রয়োগ সমাজের সকল ক্ষেত্রে এবং সর্বস্তরেই বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয় বর্তমানে। জন-সংযোগ মানুষের মন, মতামত এবং দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবিত ক'রে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত করে। এই সর্বপরিব্যাপ্ত প্রভাব যাতে সংকীর্ণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর না হয় তার জন্য জন-সংযোগ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়।

বিশ শতকের শেষ দশকে তথ্য প্রযুক্তির অভাবনীয় বিকাশ এবং সাফল্য মানুষের কাছে বিভিন্ন সংবাদ পৌঁছানো অনেক সহজ ক'রে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে সংবাদের জন্য আকাঙক্ষাও সকল সীমা লঙ্ঘন করেছে। জন-সংযোগ পেশায় যাঁরা নিযুক্ত, তাঁদের সামনে বিভিন্ন বার্তা পৌঁছানো, আর, শুধু বার্তা পৌঁছানো নয়, জন-সংযোগের নানামুখী প্রভাব বিস্তার করার সীমাহীন সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। এই নবলব্ধ অসীম সুযোগ তাঁরা কাজেও লাগাচ্ছেন। কর্মতৎপরতা অনেক বেড়েছে। প্রয়োগ কৌশলেরও নানা রকম পরিবর্তন ঘটছে।

জন-সংযোগের শক্তি এবং প্রভাব সম্বন্ধে সর্বস্তরে সচেতনতা বেড়েছে। জন-সংযোগের এই বিপুল শক্তি এবং প্রভাব যাতে সমাজের উন্নতিকল্পেই প্রয়োগ করা হয়, ক্ষতিকারক না হয়, সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নীতি নির্দেশ এবং আইন প্রণয়ন হয়েছে। লক্ষ্য—জন-সংযোগ যেন সমাজের সর্বাঙ্গীন চেতনার উন্মেষ ঘটায়; পরিচালন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সচেতন রাখে এবং সাধারণ মানুষকে সজাগ রাখতে সহায়তা করে। জন-সংযোগের কাজে নিযুক্ত সকলেরই এই সব নীতি নির্দেশ, আচরণ বিধি এবং আইনকানুন জেনে রাখা প্রয়োজন। তাঁদের কাজে যাতে কোনো জটিলতার সৃষ্টি না হয়, সেই জন্য।

৩.২ নীতি নির্দেশাবলী

একেবারে সাধারণ ভাবে দেখলেও মানুষের সব কাজেরই দু'টি দিক বা ফল আছে। একটি ভালো ফল এবং অবশ্যই, অপরটি মন্দ ফল। আবার এই সব ভালো-মন্দ ফলের মধ্যেও জটিলতা আছে। কোনো একজন ব্যক্তির পক্ষে বা কোনো সংস্থার পক্ষে যে কাজ সুবিধাজনক, অর্থাৎ ভালো, অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, অথবা সমাজের পক্ষে সেই কাজটিই অসুবিধাজনক, ক্ষতিকারক বা মন্দ হতে পারে। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের সুবিধা-অসুবিধা, ভালো-মন্দ বিবেচনা ক'রে, ভারসাম্য বজায় রেখে যে মূল্যবোধের মাত্রা নির্ধারিত হয় সেইটিই নীতি হিসাবে চিহ্নিত হয়।

জন-সংযোগ এমন একটি পেশা যা জনমত প্রভাবিত করে। সমাজকে প্রভাবিত করে। মানুষের আচরণ, প্রতিক্রিয়া প্রভাবিত করে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নির্মাণ এবং প্রতিষ্ঠা করে। জন-সংযোগের কাজে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তির পক্ষে কোনো বিশেষ কাজ সুবিধাজনক হতে পারে। কিন্তু ঐ একই কাজ তাঁর প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সুবিধাজনক না-ও হতে পারে। আবার, এমনও হতে পারে, যে বিশেষ কাজটি তিনি করলেন, তার ফলে তাঁর সংস্থা লাভবান হলো কিন্তু সমাজের বহু মানুষের পক্ষে সেটি ক্ষতিকর হলো। বেশির ভাগ কাজেই এই ধরণের ভারসাম্য বা মূল্যবোধ জড়িয়ে থাকে। ভারসাম্য বজায় রেখে মূল্যবোধ রক্ষা করাই "নীতি"। এই নীতি পালনের জন্য দেশে-বিদেশে নানা নির্দেশাবলী রচিত হয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকায় জন-সংযোগ পেশা সংক্রান্ত বিভিন্ন সংগঠন নীতিনির্দেশ নির্ধারণ করেন। আবার সেই সব নীতিনির্দেশ পালিত হচ্ছে কিনা সে বিষয়েও নজরদারী করেন। জনসংযোগ পেশায় নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা কোনো সংস্থা নির্ধারিত নীতি নির্দেশ লঙ্ঘন করলে এই সব প্রতিনিধিমূলক সংগঠনের কাছে অভিযোগ দায়ের করা যায়। সংগঠনের বিশেষজ্ঞ কমিটি অভিযোগের বিচার-বিবেচনা করেন।

ভারতে এখনও ঠিক এই ধরণের ব্যবস্থা চালু হয়নি। ইন্সটিটিউট অফ পাবলিক রিলেশনস, আমেরিকা (Institute of Public Relations, America) একটি বিস্তারিত নীতিনির্দেশাবলী রচনা করেছেন। এই নীতিনির্দেশাবলী প্রত্যেক সদস্যের পক্ষে মেনে চলা বাধ্যতামূলক। প্রতি বছর এ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং-এ এই নির্দেশাবলী প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়।

ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক রিলেশনস এ্যাসোসিয়েশন (International Public Relations Associations) যে নীতি নির্দেশ রচনা করেছেন, সাধারণত সেই নির্দেশগুলিই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুসৃত হয়। তবে, প্রতিটি দেশের পরিস্থিতি এবং পরিবেশ ভিন্ন হওয়ার কারণে, এই সব নীতি নির্দেশ কঠোরভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হয় না।

রাষ্ট্রসংঘের সনদ অনুযায়ী, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক রিলেশনস এ্যাসোসিয়েশন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কুড়িটি ভাষায় যে নীতি নির্দেশাবলী প্রকাশ করেছেন, সেইটিই বর্তমানে সর্বজনস্বীকৃত এবং বিভিন্ন দেশে অনুসৃত জন-সংযোগের নীতি নিয়মাবলী।

রাষ্ট্র সংঘের মানবিক অধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণা অনুযায়ী নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য নিয়ে জন-সংযোগের কাজ করার জন্য "আন্তর্জাতিক নীতিনির্দেশাবলী" (International Code of Ethics) রচিত হয়। এই নিয়মাবলীই "এথেন্সের নিয়মাবলী" নামে পরিচিত। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ১২ ই মার্চ ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক রিলেশনস এ্যাসোসিয়েশন-এর সাধারণ সভায় এই নীতি নির্দেশাবলী প্রথম গৃহীত হয়। এই অধিবেশন গ্রীসের এথেন্স শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই কারণেই এই নির্দেশাবলী "এথেন্স-এর নির্দেশাবলী" নামে পরিচিত। পরে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ইরানের তেহেরান শহরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে এই নির্দেশাবলীর কিছু সংশোধন হয়। সেই সংশোধিত নীতি নির্দেশাবলীই বর্তমানে সারা বিশ্বে এথেন্স-এর নির্দেশাবলী নামে পরিচিত এবং অনুসৃত। ফ্রান্স-এর লুসিয়েন মাতরাত (Lucien Matrat) এই নির্দেশাবলীর রচয়িতা।

এথেন্স-এর নির্দেশাবলী

● রাষ্ট্রসংঘের (United Nations Organisation) সকল সদস্য দেশই রাষ্ট্রসংঘের সনদ মেনে চলার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। এই সনদ "মৌলিক মানবিক অধিকার", মানুষের সম্মান (dignity) এবং মানুষের যথার্থ মূল্যায়ন (worth) এর উপর বিশ্বাস আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করেছে। জন-সংযোগ পেশার বিশেষ প্রকৃতির কথা বিবেচনা করে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য দেশগুলির জনসংযোগ বিশেষজ্ঞরা রাষ্ট্রসংঘের সনদের মূল নির্দেশাবলী প্রতিষ্ঠার এবং অনুসরণের জন্য সচেষ্ট হবেন।

● কেবল "অধিকার"ই নয়, সকল মানুষেরই শারীরিক এবং বিভিন্ন পার্থিব আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, জ্ঞান-বুদ্ধি, নৈতিক এবং বিভিন্ন সামাজিক আকাঙ্ক্ষাও আছে। এই সমস্ত আকাঙ্ক্ষাগুলি অপরিহার্যভাবে পূরণ হলে তবেই তাঁরা মানুষের "অধিকার"-এর যথার্থ সুবিধা লাভ করবেন।

● জন-সংযোগ পেশায় নিযুক্ত বিশেষজ্ঞরা তাঁদের পেশাগত কর্তব্য পালনের সূত্রে এবং কর্তব্যপালনের বিভিন্ন পদ্ধতির দ্বারা এই সব জ্ঞান-বুদ্ধি, নৈতিক এবং সামাজিক আকাঙ্ক্ষা পূরণে পর্যাপ্ত সহায়তা করতে সক্ষম।

● এবং সর্বশেষে, যেহেতু জন-সংযোগ বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন কলাকৌশলের প্রয়োগে নিরবচ্ছিন্নভাবে এবং একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় সমর্থ যেহেতু জন-সংযোগ পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের এই ক্ষমতা কঠোর নীতি নির্দেশাবলীর দ্বারা সংযত করা প্রয়োজন।

এই সকল কারণে ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক রিলেশনস এ্যাসোসিয়েশনের সকল সদস্য এই "আন্তর্জাতিক নীতি নির্দেশাবলী" পালন করতে একমত পোষণ করেন। দাখিল করা সাক্ষ্য প্রমাণাদির দ্বারা যদি প্রতিপন্ন হয়—কোনো সদস্য তাঁর পেশাগত কর্তব্য পালনের সময় এই নির্দেশমালা লংঘন করেছেন, সেই সদস্যকে গুরুতর অন্যায় (serious misconduct) কাজের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হবে এবং উপযুক্ত শাস্তি বিধান করা হবে।

এই মূল নীতি অনুসারে প্রত্যেক সদস্য অবশ্যই সচেষ্ট হবেন—

১. নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বাতাবরণ সৃষ্টি সাফল্যমন্ডিত করতে সহায়তা করবেন। যাতে মানুষ তার পূর্ণ গুরুত্ব (status) অর্জন করতে সমর্থ হয়, এবং রাষ্ট্রসংঘের "আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের ঘোষণা"র (Universal Declaration of Human Rights) বলে প্রাপ্ত অপরাজেয় অধিকার ভোগ করতে (enjoy) পারে।

২. জ্ঞাপন পদ্ধতি এবং প্রণালি স্থাপনের দ্বারা আবশ্যিক তথ্যের অবাধ প্রবাহ (flow) এবং বিনিময় যাতে সকল সদস্যকে অবহিত রাখতে সক্ষম হয়। প্রত্যেক সদস্যই তাঁর ব্যক্তিগত সংস্রব (involvement) এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ থাকবেন। অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে একাত্মবোধ বিষয়েও সজাগ হবেন।

৩. সর্বদা এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে, সকল কাজে এমন ব্যবহার করবেন যাতে তাঁর সংস্পর্শে যাঁরাই আসবেন তাঁদের বিশ্বাস অর্জনের উপযুক্ত হবেন এবং তাঁদের নিশ্চিত করার পথও সুগম হবে।

৪. স্মরণ রাখতে হবে যে তাঁর পেশা এবং জনসাধারণের মধ্যে যে সম্পর্ক তার জন্য তাঁর ব্যবহার ও আচরণ, এমনকী ব্যক্তিগত জীবনের আচরণও, এই পেশায় নিযুক্ত সকল ব্যক্তির মূল্যায়ন (appraisal) প্রভাবিত করবে।

দায়িত্ব গ্রহণ করবেন—

৫. দৈনন্দিন পেশাগত কাজে নৈতিক মান রক্ষা করবেন এবং "আন্তর্জাতিক মানব অধিকার ঘোষণা"র নির্দেশাবলী মেনে চলবেন।

৬. মানুষের মর্যাদার যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করবেন এবং সমর্থন করবেন। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগের অধিকার স্বীকার করবেন।

৭. যথার্থ আলোচনা এবং মত বিনিময়ের উপযুক্ত নৈতিক, মানসিক এবং জ্ঞানবুদ্ধির পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। অংশগ্রহণকারী সকলেরই নিজের বক্তব্য পেশ করার এবং মতামত জানানোর অধিকার স্বীকার করবেন।

৮. সকল রকম পরিস্থিতিতেই এমনভাবে কাজ করবেন যাতে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থই সংরক্ষিত হয়। তিনি যে সংস্থার সঙ্গে যুক্ত সেই সংস্থার এবং জনসাধারণের, সকলের স্বার্থই যেন সংরক্ষিত হয়।

৯. নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য এবং সংকল্প রক্ষার জন্য যা কিছু রচনা করবেন তার রচনাশৈলী এবং শব্দপ্রয়োগ এমন ভাবে করতে হবে যেন কারো মনে কোনো ভাবে আঘাত না করে। সকল রকম পরিস্থিতিতেই আনুগত্য এবং সাধুতা যেন প্রমাণিত হয়, যাতে নিয়োগকর্তার তাঁর উপরে আস্থা বজায় থাকে। এই আস্থা, অতীত নিয়োগকর্তা ও বর্তমান নিয়োগকর্তা এবং তাঁর কাজ যে জনসাধারণকে প্রভাবিত করেছে, তাঁদের সকলের আস্থা।

অবশ্যই করবেন না

১০. অন্যান্য প্রয়োজনে সত্যের অবদমন করবেন না।

১১. প্রতিষ্ঠিত এবং পরীক্ষিত কোনো বাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি না থাকলে কোনো তথ্য প্রচার করবেন না।

১২. এমন কোনো উদ্যোগ বা কাজে অংশগ্রহণ করবেন না, যা অনৈতিক, অসাধু এবং মানুষের মর্যাদার এবং সাধুতার পক্ষে ক্ষতিকর।

১৩. পদ্ধতি এবং কৌশলে এমন কোনো কারসাজি করবেন না, যার ফলে মানুষের অবচেতন মনে এমন কোনো সঞ্চালক শক্তি জাগ্রত হয় যা তাঁর ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় এবং এই প্রভাবে গৃহীত কর্মের জন্য তাঁকে দায়ী করা সম্ভব না হয়।

৩.৩ মানহানি

জন-সংযোগ পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের সর্বদাই সচেতন থাকা প্রয়োজন মানহানি বিষয়ে। অর্থাৎ, জন-সংযোগের উদ্দেশ্যে প্রচারিত কোনো বার্তা যেন কারো 'মানহানি'র কারণ না হয়। এবারে দেখা যাক, আইনের চোখে 'মানহানি' কী?

কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্মান বা ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন কোনো সংবাদ বা তথ্য প্রচারিত হলে মানহানি হিসাবে গণ্য হয়। "সম্মান" এবং "ভাবমূর্তি" নিশ্চিত এবং বাস্তব রূপে নির্দিষ্ট করা কঠিন। বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে সম্মান শব্দটির অর্থ বিভিন্ন রকমের হতে পারে। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও তাই। সকলের সম্মানের সংজ্ঞা এক হয় না। আবার দেখুন, বিভিন্ন রচনায় বহু শব্দই নিত্য ব্যবহার করা হচ্ছে, যেগুলি ক্ষেত্র বিশেষে মানহানির কারণ হতে পারে। সম্মানের যেমন সূক্ষ্ম বিভাজন সম্ভব হয় না, সেই রকমই, বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ বা ব্যবহার কোন বিশেষ ক্ষেত্রে মানহানিকর বলে গণ্য হবে, সে বিষয়েও নির্দিষ্ট করে কিছু বলা সম্ভব নয়। কিন্তু যিনি বা যে প্রতিষ্ঠান প্রচারিত কোনো সংবাদের কারণে মানহানি ঘটেছে বলে মনে করবেন, সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মানহানির জন্য বিপুল অঙ্কের টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন। বুঝতেই পারছেন, যাঁদের বিভিন্ন রচনা, জন-সংযোগের উদ্দেশ্যে রচনাই, বিভিন্ন মাধ্যমে নিয়মিত প্রচারিত হচ্ছে, তাঁদের বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগের সুযোগ এবং কারণ অন্তহীন। সেই কারণে, জন-সংযোগ বিশেষজ্ঞদের সর্বদাই সজাগ থাকা প্রয়োজন।

কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে প্রচারিত কোনো সংবাদের ফলে যদি সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সামাজিক প্রতিষ্ঠা, ভাবমূর্তি, বা ব্যবসা এবং কাজকর্ম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে মানহানির অভিযোগ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় প্রকাশিত সংবাদ অভিযোগকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে কিনা। ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হলে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি এবং ধার্য হতে পারে। প্রতিষ্ঠানের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হয় সুনাম নষ্ট হওয়ার ফলে ব্যবসার ক্ষতি বা কোনো বিশেষ পণ্যের বাজারে চাহিদা এবং বিক্রি কমে যাওয়া। ব্যবসার ক্ষতির জন্য অনেক সময়ে বিপুল অর্থ দাবি করা হয় ক্ষতিপূরণ হিসাবে। জন-সংযোগের কাজে যাঁরা নিযুক্ত তাঁদের মানহানি সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কোনো সাধারণ বক্তব্যও ক্ষেত্রবিশেষে মানহানির বিশেষ কারণ হয়ে নানা সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

জন-সংযোগের সকল মাধ্যমই আইনত মানহানির কারণ ঘটাতে পারে। যে কোনো প্রচারিত সংবাদ, হাউস জার্নাল, পোস্টার, ব্রোশিওর, বক্তৃতার বিভিন্ন টেপ, রেডিওর প্রচারিত অনুষ্ঠান মানহানির অভিযোগের কারণ হতে পারে। কোনো সংবাদের শিরোনাম, বা কার্টুনচিত্রও মানহানির কারণ হতে পারে। এক কথায়, যে কোনো প্রচারই মানহানির অভিযোগের কারণ হতে পারে।

আইন অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মৌখিক প্রচার দ্বারা সম্মানহানির কারণ ঘটানো স্ল্যান্ডার (slander) হিসাবে বিবেচিত। এই প্রচার "মৌখিক", অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের লোকেদের মুখের কথায় প্রচারিত। লিখিত নয়। এই প্রচার যদি মিথ্যা হয় এবং যাঁর সম্পর্কে প্রচারিত হয়েছে তাঁর কোনো রকম ক্ষতিকারক হয়, তাহলে আইনত দন্ডনীয়। এই ক্ষতি সাধারণত সম্মান এবং ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ ক'রে স্বাভাবিক কাজকর্মের অসুবিধা ঘটানো এবং ক্ষতিসাধন হিসাবেই বিবেচিত হয়।

কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কোনো মানহানিকর সংবাদ কোনো মুদ্রিত মাধ্যমে প্রচারিত হলে "লাইবেল" (Libel) হিসাবে গণ্য হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে, মুখের কথায় প্রচার ক'রে ক্ষতি সাধন এবং মুদ্রণ মাধ্যমের সাহায্যে প্রচারের দ্বারা ক্ষতিসাধন, এই দুইয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম বিভাজন করা হয়েছে।

এই দুই রকম উপায়েই কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে কোনো সংবাদ বা মন্তব্য প্রচারের দ্বারা সামাজিক সম্মান ও ভাবমূর্তির ক্ষতির চেষ্টাই আইনের চোখে 'মানহানি' হিসাবে গণ্য হয়। মানহানির অভিযোগের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কারো বিরুদ্ধে কোনো রকম মিথ্যা অভিযোগ বা দোষ আরোপ করা সংবাদ যেন মৌখিক ভাবে, মুদ্রিত রূপে অথবা রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত না হয়। প্রচারিত সংবাদে যেন অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করা সম্ভব না হয়। প্রচারিত সংবাদ যদি অভিযুক্তের অর্থক্ষতি, সম্মানহানি এবং মানসিক উৎকণ্ঠার কারণ হয়, তবেই মানহানিকারক বলে গণ্য হবে। যিনি প্রচার করছেন, তিনি অসাবধানবশতও করতে পারেন আবার মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে ইচ্ছাপূর্বকও করতে পারেন। যে কারণেই হোক না কেন, আইনের চোখে 'মানহানি' হিসাবে গণ্য হবে।

মনে রাখতে হবে, কেবল সাধারণ মানুষ বা কোনো ব্যক্তিই নন, যে কোনো প্রতিষ্ঠানই মানহানির অভিযোগ করতে পারেন। কোনো প্রতিষ্ঠান যদি ভোগ্যপণ্য তৈরি এবং বিক্রির ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকেন, তাঁরা দাবি করতে পারেন যে মিথ্যা অভিযোগ বা অপবাদ প্রচারিত হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে, জনমানসে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। তার ফলে গ্রাহকরা প্রতিষ্ঠানটির পণ্য ব্যবহার করতে দ্বিধা বোধ করছে। প্রতিষ্ঠানের ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে। বাজারে প্রতিষ্ঠানটির সুনাম, ব্যবসার অঙ্ক এবং আনুমানিক ক্ষতি হিসাব ক'রে ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়। আদালত বিচার বিবেচনা করে ক্ষতিপূরণের দাবি মঞ্জুর অথবা না-মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে মানহানির অভিযোগ দুই ধরনের হতে পারে। এক, সাধারণ মানুষ, যে কোনো ব্যক্তি মানহানির অভিযোগ করতে পারেন। দুই, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কোনো আধিকারিক যে, কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মকর্তা বা কোনো সর্বজনপরিচিত ব্যক্তি। সাধারণ মানুষের মানহানির অভিযোগের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো যুক্তি, প্রকাশিত সংবাদের সত্যতা। তার সঙ্গে আছে গণমাধ্যমের বিশেষাধিকার এবং ন্যায্য সমালোচনার অধিকার। সরকারি পদাধিকারী মানহানির অভিযোগের সঙ্গে ইচ্ছাকৃত, উদ্দেশ্যমূলক কুৎসা রটনার অভিযোগও আনতে পারেন।

অনেকের মতে, প্রকাশিত সংবাদের সত্যতাই মানহানির অভিযোগের প্রতিবাদীর আত্মপক্ষ সমর্থনের সবচেয়ে বড়ো যুক্তি। কিন্তু, সত্য প্রকাশ করা এবং আইনের বিচারে সত্য প্রমাণ করা এবং প্রতিষ্ঠা করা এক নয়। প্রকাশিত সংবাদ আইনত সত্য, আদালতে এই বিষয় প্রমাণ করা বেশ কঠিন।

জনসাধারণের স্বার্থে সত্য প্রকাশের বিশেষ অধিকার গণমাধ্যমের আছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও সত্যের মতো জনসাধারণের স্বার্থ কী এবং কতটা, সে বিষয়ে আইনত প্রমাণ দাখিল করা বেশ কঠিন। মানহানির অভিযোগের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য "গণমাধ্যমের ন্যায্য সমালোচনার অধিকার" দাবি করা হয়। কিন্তু "ন্যায্য সমালোচনা" ও আইনত প্রমাণ করা প্রয়োজন। সেই কাজও সহজ নয়।

জন-সংযোগ কর্মীদের বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন কোনো প্রচারেই যেন কারো মানহানির অভিযোগ করার সুযোগ না থাকে। যুক্তিপূর্ণ সুস্থ সমালোচনার অধিকার অবশ্যই আছে। কিন্তু অবমাননামূলক বা ক্ষতিকারক মন্তব্য করার অধিকার কারো নেই।

৩.৪ ব্যক্তিগত গোপনীয়তা

প্রত্যেক নাগরিকেরই ব্যক্তিগত বা পরিবারগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার আছে। যে কোনো ব্যক্তিই প্রথমে একজন নাগরিক এবং একটি পরিবারের সদস্য। তার পরেই তিনি কোনো সংস্থার সদস্য বা প্রতিনিধি। মনে রাখতে হবে, কোনো সংস্থার সদস্য বা প্রতিনিধি হলেও, কারো ব্যক্তিগত অধিকার চলে যায় না।

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার কেবল ব্যক্তিরই আছে, কোনো প্রতিষ্ঠানের নেই। ব্যক্তিগত গোপনীয়তার

অধিকার ভঙ্গ বা এই অধিকারের উপর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ বা অন্যায়দখলের অভিযোগ কেবল কোনো ব্যক্তিই আনতে পারেন।

এই অধিকার ভঙ্গ চার রকমের হতে পারে। ব্যক্তিগত একাকীত্ব বা পারিবারিক নির্জনতার মধ্যে অনুপ্রবেশ এবং ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কোনো সংবাদ প্রকাশ বা ফোটোগ্রাফ প্রকাশ করা, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অভিপ্রেত নয়। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা তাঁর অজান্তে তাঁর ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবনের কোনো ঘটনা বা ফোটোগ্রাফ প্রকাশ করা। দুই, কোনো ব্যক্তির এমন কোনো পরিচয় প্রকাশ করা, যা সত্য নয়। অন্যের দোষ কোনো ব্যক্তির উপর আরোপ করা অর্থাৎ, ব্যক্তিটি যা করেননি, সেইগুলিই করেছেন বলে প্রচার করা। অর্থাৎ, বাস্তবে তিনি যা নন সেই রকম কোনো মিথ্যা পরিচিতি প্রচার করা। তিন, ব্যক্তিগত বা একেবারেই কারো পারিবারিক কোনো সংবাদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুমতি না নিয়েই প্রকাশ করা। আর চার, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে আত্মসাৎ করা। কোনো ব্যক্তিকে না জানিয়ে, তাঁর চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্য যুক্ত কোনো চেহারা, বা নামের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এমন কোনো নাম, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা।

সংস্থার প্রচারের জন্য যদি কোনো কর্মীর বিষয়ে কোনো সংবাদ প্রচার করা প্রয়োজন হয়, তাহলে তাঁর অনুমতি নেওয়া অবশ্য প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, যে কোনো ব্যক্তির পারিবারিক জীবন এবং কর্মজীবন বাস্তবে দুটি পৃথক জীবনধারা। ব্যক্তিগত জীবন, যে কোনো নাগরিকেরই একান্ত ব্যক্তিগত জীবন।

সংস্থার হাউস জার্নালে কোনো কর্মীর কর্মসংক্রান্ত কোনো সংবাদ প্রকাশ করার অধিকার সংস্থার আছে। যেমন, কোনো কর্মী এক মাসে রেকর্ড সংখ্যক উৎপাদন করেছেন। অথবা, উৎপাদন পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন ক'রে উৎপাদনের দক্ষতা বাড়িয়েছেন, এই সংবাদ সংস্থার জার্নালে প্রকাশ করার অধিকার সংস্থার আছে।

ধরা যাক, কোনো কর্মীর সন্তান, পুত্র অথবা কন্যা, ছবি আঁকায় বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে অথবা কোনো পুরস্কার পেয়েছে। এই সংবাদ সংস্থার জার্নালে প্রকাশ করার আগে, কর্মীটির অনুমতি নিতে হবে। কারণ, ঐ কর্মী এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা হয়তো এখনই সন্তানকে প্রচারের আলোয় আনার পক্ষপাতী নন। সন্তানের ভবিষ্যৎ বিবেচনা ক'রে, প্রচার যাতে তার পক্ষে ক্ষতিকর না হয়, সেই বিবেচনায় তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নাগরিক হিসাবে, ব্যক্তিগত ভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তাঁর আছে। তাঁর অনুমতি বিনা, সংস্থার জার্নালে এই সংবাদ প্রকাশ করা যাবে না।

সংস্থার জার্নালে কোনো কর্মী সম্পর্কে কোনো সংবাদ প্রকাশ করার আগে, তাঁকেই সংবাদটি লিখে জানাতে বলা উচিত। সংশ্লিষ্ট কর্মীর কাছ থেকে লিখিত সংবাদ প্রাপ্তির পরে, সেটিকে সংবাদ হিসাবে পুনর্বার লিখে প্রকাশ করাই বাঞ্ছনীয়। কোনো ফোটোগ্রাফ প্রয়োজন হলে সেটি সংশ্লিষ্ট কর্মীর কাছেই চাইতে হবে। অন্য সূত্রে পাওয়া খবর প্রকাশ করলে বা ফোটোগ্রাফ মুদ্রিত করলে তিনি অসন্তুষ্ট হতে পারেন। এমনও বলতে পারেন, ফোটো ভালো হয়নি, বিকৃত হয়েছে। এই ধরণের বিতর্ক এড়িয়ে চলার সহজ উপায় কর্মীকেই ফোটোগ্রাফ দিতে বলা। কর্মীদের যে কোনো সংবাদ তাঁদেরই লিখিত ভাবে জানাতে অনুরোধ করলে, কোনো সমস্যা থাকে না। তবে, প্রাপ্ত সকল সংবাদই ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখা প্রয়োজন। সংবাদে যেন কোনো অতিরঞ্জন বা বিকৃতি না থাকে। কোনো সংবাদেই যেন কারো জাতি, ধর্ম, ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখ না থাকে। যে কোনো নাগরিকের কাছেই, এই ধরণের বিষয় একেবারে ব্যক্তিগত বিষয় হিসাবে গণ্য। সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, এমন কোনো সংবাদ, সংশ্লিষ্ট কর্মীর বা তাঁর পরিবারের কোনো সদস্য সম্পর্কিত ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কোনো সংবাদ তাঁর অনুমতি বিনা প্রকাশ করা অনুচিত।

৩.৫ কপিরাইট

জন-সংযোগ কর্মীদের কপিরাইট (Copyright) বা গ্রন্থস্বত্ব আইনের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সংস্থার বিভিন্ন

প্রকাশনায় অনেক সময়ই গণমাধ্যমে প্রকাশিত চিত্র, গ্রাফ বা বিশেষ রিপোর্টের পুনর্মুদ্রণ করা হয়। জন-সংযোগ আধিকারিকের জানা প্রয়োজন, কী ধরনের এবং কোন কোন রিপোর্ট, চিত্র ইত্যাদির পুনর্মুদ্রণ নিষিদ্ধ নয় কপিরাইট আইন অনুসারে।

এবারে কপিরাইট বা গ্রন্থস্বত্ব আইনটি বোঝা দরকার। কপিরাইট আইন, লেখকের তাঁর নিজের, মৌলিক সৃষ্টি, অর্থাৎ নকল নয়, এমন রচনার উপর রচনাকারের কর্তৃত্বের অধিকারের স্বীকৃতি। রচনা যে সৃজনশীল হতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যে কোনো মৌলিক রচনার উপরে স্রষ্টার অধিকার নিশ্চিত করে কপিরাইট আইন। এই আইনের বিধি অনুসারে কোনো লেখক বা চিত্রকরের স্বত্বের উপর স্রষ্টার অধিকার বজায় থাকবে তাঁর মৃত্যুর পরে ষাট বছর পর্যন্ত। বলা বাহুল্য, স্রষ্টার মৃত্যুর পরে তাঁর আইনসম্মত উত্তরাধিকারী এই স্বত্ব ভোগ করবেন। যে কোনো রচনাকারীর নিজের রচনার বাণিজ্যিক ব্যবহারের অধিকার আছে। অন্যের এই অধিকার নেই। রচনাকারের অনুমতি বিনা অন্য কেউ রচনার বাণিজ্যিক ব্যবহার করলে কপিরাইট আইন অনুসারে নিবারণ করা যেতে পারে।

কপিরাইটের আওতায় পড়ে যে কোনো রকমের রচনা—যেমন সাহিত্য বা প্রবন্ধ অথবা নাটক এবং রিপোর্ট, ফিচার ইত্যাদি। চিত্রকলা, মূর্তি নির্মাণ এবং যে কোনো চিত্রাঙ্কন—যেমন ডায়াগ্রাম, মানচিত্র, চার্ট নকশা ইত্যাদি। ফোটোগ্রাফ এবং এনগ্রেভিং। যে কোনো মৌলিক রচনা বা সৃষ্টি, তার মধ্যে নান্দনিক মূল্য থাক অথবা না-ই থাক, কপিরাইট আইনের আওতায় আসবে।

রচনার বৈচিত্র অনুসারে স্রষ্টার সংজ্ঞাও পরিবর্তিত হয়। লিখিত সৃষ্টির স্রষ্টা অবশ্যই লেখক এবং নাট্যকার। শিল্পকলার ক্ষেত্রে স্রষ্টা চিত্রকর। সঙ্গীত রচনায়—সুরস্রষ্টা। ফোটোগ্রাফের ক্ষেত্রে, যিনি ফোটোগ্রাফ তুলেছেন, তিনিই স্রষ্টা হিসাবে গণ্য হবেন। চলচ্চিত্র বা সাউন্ড রেকর্ডিং-এর ক্ষেত্রে—প্রযোজক। আর, কমপ্যুটারে ফুটিয়ে তোলা যে কোনো মৌলিক কাজের স্রষ্টা তিনিই, যিনি কমপ্যুটারে বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন।

এখানে মনে রাখতে হবে, কোনো সংবাদপত্র, পত্রিকা ইত্যাদি গণমাধ্যমে কর্মরত কোনো রচনাকারীর সৃষ্টির স্বত্ব বা মালিকানা ঐ লেখকের নয়, প্রকাশনা সংস্থার। অবশ্য বিশেষ কনট্রাক্ট অনুযায়ী, লেখক এবং প্রকাশনা সংস্থা নিজেদের মধ্যে অন্যরকম চুক্তিও করতে পারেন। সেক্ষেত্রে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী স্বত্ব নির্ধারিত হবে।

গ্রন্থস্বত্ব বলতে কী বোঝায়? সাহিত্য, নাটক, চিত্রকলা এবং অন্যান্য যে কোনো রচনার স্রষ্টাকে অবাধ প্রচার এবং বাণিজ্যের অধিকার দেয়। একই অধিকার ভোগ করেন ফিল্মের প্রযোজক। নিজেদের সৃষ্টিকর্ম যে কোনো ভাষায় অনুবাদ ক'রে বাণিজ্যিক ব্যবহারের অধিকার। জনসমাগমে উপস্থাপন এবং বার বার উপস্থাপনের অধিকার। কমপ্যুটারে সৃষ্ট কর্মের অবাধ প্রচার এবং বাণিজ্যিক ব্যবহারের অধিকার।

কারো কোনো মৌলিক রচনা ব্যবহারের প্রয়োজন হলে, সম্পূর্ণ অথবা অংশত, রচনাকারীর অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। পুনঃপ্রচার, পুনর্মুদ্রণ এবং পুনর্ব্যবহারের জন্য মূল স্রষ্টার কাছ থেকে লিখিত অনুমতি নিতে হবে। গ্রন্থস্বত্ব আইনের আওতায় আসে এমন কোনো কাজ স্রষ্টার বিনা অনুমতিতে ব্যবহার এবং প্রচার করা আইনবিরুদ্ধ। রচয়িতার গ্রন্থস্বত্ব রক্ষার জন্য ভারত সরকার "কপিরাইট এ্যাক্ট ১৯৫৭" (Copyright Act 1957) প্রণয়ন করেছেন।

গ্রন্থস্বত্বের আন্তর্জাতিক সংরক্ষণ স্বীকৃত হয়, ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে, বার্ন কপিরাইট ইউনিয়নের (Berne Copyright Union) অধিবেশনে। সারা বিশ্বে, গ্রন্থস্বত্বের বার্ন কনভেনশনের বিধি নামে পরিচিত এবং স্বীকৃত। ভারতের ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের গ্রন্থস্বত্ব আইন বার্ন কনভেনশনের সূত্র অনুসারে রচিত।

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের গ্রন্থস্বত্ব আইন কয়েকবার সংশোধিত হয়। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের সংশোধনে গ্রন্থস্বত্বের মেয়াদ রচয়িতার বা স্বত্বাধিকারীর মৃত্যুর পরে, ৫০ বছর থেকে বাড়িয়ে ৬০ বছর করা হয়।

পরে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার ইন্টারন্যাশনাল কপিরাইট অর্ডার ১৯৯৯ (International Copyright

order 1999) জারি ক'রে বার্ন কনভেনশনে গৃহীত গ্রন্থস্বত্ব সংক্রান্ত আন্তর্দেশীয় বোঝাপড়া অনুযায়ী আন্তর্জাতিক গ্রন্থস্বত্ব অধিকারের মূল সূত্রগুলি ভারতে প্রযোজ্য বলে ঘোষণা করেন। একশো কুড়িটি দেশ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বার্ন কনভেনশনে গৃহীত মূল প্রস্তাবগুলিতে আস্থা প্রকাশ ক'রে গ্রহণযোগ্য হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং প্রয়োগ করতে সম্মত হয়েছিল।

কপিরাইট বা গ্রন্থস্বত্ব আইনের সংরক্ষণ (protection) লাভের জন্য যে কোনো মৌলিক সৃষ্টি রেজিস্ট্রি বা নথিবদ্ধ ক'রে রাখা প্রয়োজন। রেজিস্ট্রার অফ কপিরাইট-এর (Registrar of Copyright) দপ্তরে মৌলিক কাজের রেজিস্ট্রেশন-এর ব্যবস্থা আছে।

কোনো মৌলিক কাজের অংশবিশেষের উদ্ধৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে, যথোপযুক্ত স্বীকৃতি দিয়ে। অর্থাৎ রচনার শিরোনাম এবং রচনাটির নাম উল্লেখ ক'রে স্বীকৃতি ঘোষণা।

তবে, গবেষণার জন্য এবং ব্যক্তিগত অধ্যয়নের জন্য বিনা অনুমতিতেও ব্যবহার করা যায়। কোনো শিক্ষালয়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানের প্রক্রিয়ায় এবং আলোচনায়, বিনা অনুমতিতে প্রচার, বিতরণ এবং উল্লেখ করা যায়। এই সব ক্ষেত্রে গ্রন্থস্বত্ব আইন প্রযোজ্য হয় না।

৩.৬ জন-সংযোগ কর্মীর আবশ্যক গুণ

জন-সংযোগ কোনো সাধারণ পেশা নয়। বিশেষজ্ঞের পেশা। যে কোনো বিশেষজ্ঞের পেশার কাজের জন্য কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা আবশ্যক বলে গণ্য হয়।

অনেক সংস্থায় দেখা যায় প্রশাসনিক বা বিপণনের কোনো অফিসার তাঁর নির্দিষ্ট কাজের সঙ্গে জন-সংযোগের দায়িত্বও পালন করছেন। এই রকম পরিস্থিতিতে কেউই আশা করেন না, যিনি জন-সংযোগের দায়িত্বে রয়েছেন তিনি বিশেষজ্ঞের মতো কর্তব্য পালন করবেন। কিন্তু এই প্রথা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। বর্তমানের জটিল পরিচালন ব্যবস্থায় জন-সংযোগ বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন ভীষণভাবে অনুভূত হচ্ছে। পরিচালন কর্তৃপক্ষ চাইছেন, সংস্থার জনসংযোগের দায়িত্বে যিনি কাজ করবেন তিনি জন-সংযোগ পেশার উপযুক্ত হবেন এবং জনসংযোগের আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন। জন-সংযোগের কলাকৌশল সম্বন্ধে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

এবার দেখা যাক, জন-সংযোগের কাজের জন্য ব্যক্তি হিসাবে কী কী গুণ থাকা আবশ্যক।

জন-সংযোগ বর্তমানে একটি স্বীকৃত পেশা। এই পেশায় যাঁরা যোগ দিতে ইচ্ছুক, তাঁদের নিজেদের আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন। বিচার করতে হবে, নিজেকে এই পেশার উপযুক্ত বলে আস্থা পোষণ করেন কিনা।

কী রকম সহজাত প্রবণতা থাকলে কোনো ব্যক্তি নিজেকে জন-সংযোগ পেশার উপযুক্ত বলে বিবেচনা করতে পারেন? আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পেশাদারি জন-সংযোগের সূচনা পর্বে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন এডওয়ার্ড এল. বার্নেস (Edward L. Bernays)। বার্নেসের বক্তব্য এই রকম।—"আমার মতে, আদর্শ জন-সংযোগ কর্মীকে সর্বাগ্রে চরিত্রবান এবং সৎ হতে হবে। যুক্তি সঙ্গত চিন্তার ক্ষমতা এবং বিচার বুদ্ধি থাকা নিশ্চিত আবশ্যক কিন্তু উদ্ভাবনী শক্তি এবং সৃজনশীল চিন্তা করার ক্ষমতা বিসর্জন দিয়ে নয়। সত্যনিষ্ঠ হতে হবে, বিচক্ষণ এবং বাস্তববাদী হতে হবে কিন্তু সমস্যা সমাধানের বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ থাকবে। বিস্তৃত সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের ফলে যথেষ্ট মানসিক কৌতূহল থাকবে। আরো থাকবে বিশ্লেষণ করার এবং মিশ্রণ করার কার্যকরী ক্ষমতা। সেই সঙ্গে প্রয়োজন বিরল বিশেষ অনুভূতির (intuition) ক্ষমতা। এই সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে প্রয়োজন সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষা এবং আরো প্রয়োজন—জন-সংযোগ বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ"।

লক্ষ্য করেছেন, বার্নেস সর্বাগ্রে উল্লেখ করেছেন, চরিত্র এবং সততার গুণ। জন-সংযোগের কাজে এই দুটি গুণের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। এই দুটি গুণ না থাকলে, পরিচালন কর্তৃপক্ষ এবং সংস্থার পাবলিক, উভয়ের কাছেই গ্রহণীয় হওয়া সম্ভব নয়। যিনি কোনো সুনাম বৃদ্ধি বা ভাবমূর্তি সৃষ্টির মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বে থাকবেন তাঁর নিজের ভাবমূর্তি সকলের কাছে বিশেষ ক'রে বিভিন্ন গণমাধ্যমের কাছে গ্রহণীয় হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

জনসংযোগের বিভিন্ন দায়িত্বের বিষয় বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে জন-সংযোগ কর্মীর বিভিন্ন বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানবুদ্ধি থাকা অবশ্য প্রয়োজন। কারণ তাঁকে প্রতিনিয়তই পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে হবে তাঁর সংস্থার কাজকর্মের সুবিধার জন্য। আবার পারিপার্শ্বিক কখনই স্থির থাকে না। ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। মানুষের মনও ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। এই ক্রমাগত পরিবর্তনশীল পরিবেশকে সতর্ক ভাবে, সজাগ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে হবে এবং বিশ্লেষণ করতে হবে। এই কাজ সাফল্যের সঙ্গে করতে হলে, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান এবং মানুষের মনস্তত্ত্ব বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। জন-সংযোগের কাজের মূল অংশ দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ বিশ্লেষণ ক'রে যথোচিত সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং পরিচালন কর্তৃপক্ষকে বিশ্লেষণ ক'রে বুঝিয়ে অবগত করা।

আর, এই সবের সঙ্গে প্রয়োজন বিভিন্ন গণমাধ্যম ব্যবহারের দক্ষতা।

অনেকের ধারণা, মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করা যাঁদের ভালো লাগে তাঁরা সফল জন-সংযোগ কর্মী হতে সক্ষম। জন-সংযোগ কর্মীকে সব রকম মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয় ঠিকই। কিন্তু, এখানে মনে রাখা ভালো মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সঙ্গে আরো বেশি কিছু প্রয়োজন। মানুষকে বোঝার ক্ষমতা। মানুষকে ব্যক্তি হিসাবে এবং ক্ষেত্র বিশেষে গোষ্ঠী হিসাবে জানা এবং বোঝা, জন-সংযোগ কর্মীর পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়।

এই সব গুণাবলীর সঙ্গে আরো প্রয়োজন—

ক. সংবাদ আদান প্রদানের ক্ষমতা। লিখিত, মুদ্রিত, কথিত, বেতারে প্রচারিত বা ফিল্ম অথবা টেলিভিশনে প্রচারিত, যে কোনো মাধ্যমের সাহায্যে বার্তা প্রচারে দক্ষতা।

খ. প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে মনোযোগ দিয়ে গুছিয়ে কাজ করার দক্ষতা। বিশেষ ক'রে, খরচের উপর লক্ষ্য রেখে।

গ. জন-সংযোগের প্রতিটি কাজেই কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। প্রচার অভিযানের পরিকল্পনা, কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা, ফোটোগ্রাফারদের বোঝানো, অথবা হাউস জার্নাল সম্পাদনা, সব কাজেই সৃজনশীলতার প্রয়োজন।

ঘ. যে কোনো পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ক'রে মুল সমস্যা চিহ্নিত করার ক্ষমতা।

ঙ. মানুষকে প্রভাবিত করার সহজাত প্রবৃত্তি।

চ. ঝকঝকে, নিখুঁত, মনোমুগ্ধকর উপস্থাপন ক্ষমতা।

ছ. আর, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—সব সময় নতুন ক'রে শেখার এবং জানার ইচ্ছা। এবং স্বীকার করা, এই পেশায় কখনোই সব কিছু জানা হয় না।

তালিকা বেশ দীর্ঘ। এর সঙ্গে আরো প্রয়োজন দেশের এবং বহির্বিশ্বের ব্যবসাবাণিজ্য এবং শিল্প বিষয়ে সম্যক ধারণা। দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতনতা। সর্বোপরি, যে কোনো পরিস্থিতিতে যে কোনো মানুষের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলার ক্ষমতা।

জন-সংযোগের প্রায় সব কাজই যেহেতু কোনো না কোনো ভাবে আর্থিক লেনদেন বা কোম্পানির আর্থিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত, তাই অর্থনীতির জ্ঞান থাকাও প্রয়োজন।

শেষ কথা, জন-সংযোগ কর্মীর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন। দূরদৃষ্টির সঙ্গে কল্পনাশক্তির এবং সৃজনশীলতার মেলবন্ধন।

৩.৭ জনসংযোগের কর্তব্য ও দায়িত্ব

জন-সংযোগের কাজ সংস্থার ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং সংশ্লিষ্ট পাবলিকদের সংস্থার অনুকূলে মনোভাব সৃষ্টি করা। এই কাজ সন্তোষজনক ভাবে করার জন্য প্রয়োজন পরিচালন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা ক'রে জানা, সংস্থার কীরকম ভাবমূর্তি গড়ে তোলা পরিচালন কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কর্মসূচী নির্ধারণের আগে জানা প্রয়োজন, সংস্থা সম্বন্ধে আভ্যন্তরীণ পাবলিক এবং বাইরের পাবলিকের বর্তমান মনোভাব কী? এর জন্য গবেষণা বা সার্ভে করাও দরকার হতে পারে। কিন্তু জন-সংযোগের কর্মসূচী গ্রহণের আগে অবশ্যই জানা প্রয়োজন, সংস্থা সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট পাবলিকদের বর্তমান মনোভাব কী। নাহলে, জনসংযোগের কর্মসূচী নির্ধারণ সম্ভব নয়। কর্মসূচী প্রণয়নের আগে পরিচালন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা প্রয়োজন সংস্থার ভাবমূর্তি পাবলিকদের কাছে কীরকম। এই বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে, পরিচালন কর্তৃপক্ষের কাঙ্ক্ষিত ভাবমূর্তি গড়ার জন্য জন-সংযোগ কর্মসূচী নির্ধারণ করতে হবে। পরিচালন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচীর বিষয়ে, বিশেষ করে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী বিষয়ে আলোচনা ক'রে স্থির করা হবে সংস্থার কী রকম ভাবমূর্তি এই কর্মসূচী রূপায়নে সহায়ক হবে।

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা ক'রে সংস্থার জনসংযোগের উদ্দেশ্য নির্ধারিত হলে, এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কী কী করণীয়, সে বিষয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংস্থার বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা, মত বিনিময় এবং প্রয়োজনমতো পরামর্শদান।

জন-সংযোগের কর্মসূচী বাস্তব রূপায়নের বিভিন্ন খরচের হিসাব করা এবং বাজেট তৈরি করা।

তারপরে, নির্ধারিত কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়িত করা।

জন-সংযোগের কর্মসূচী রূপায়নের পরে, পাবলিকের প্রতিক্রিয়া কী জানতে হবে। জন-সংযোগ কর্মসূচী রূপায়নের ফলে সংস্থা সম্বন্ধে পাবলিকের মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি? যদি মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয়ে থাকে, তাহলে কীরকম পরিবর্তন এবং কতখানি পরিবর্তন, সে বিষয়েও জানা প্রয়োজন।

অর্থাৎ, জন-সংযোগ কর্মসূচী রূপায়নের ফলাফল মূল্যায়ন করা।

মূল্যায়নের ফলাফল কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা।

আভ্যন্তরীণ পাবলিকের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা করা। বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা এবং চালু রাখা। এই সব কাজের জন্য নিয়মিত যোগাযোগের সূত্র বহাল রাখা।

আবার, বাইরের পাবলিকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য বিভিন্ন বণিক সভা, অন্যান্য বাণিজ্যিক সংগঠন এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং বজায় রাখা। বিশেষ ক'রে, বিভিন্ন গণমাধ্যমের বিভিন্ন স্তরে যোগাযোগের সেতু বা সূত্র গড়ে তোলা এবং তাঁদের সঙ্গে নির্ভরযোগ্য, অস্থায় সম্পর্ক বজায় রাখা। বিভিন্ন গণমাধ্যমের কাছে গ্রহণযোগ্য হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। কেবল বিশেষ কারণ বা ঘটনার উপলক্ষ্যেই নয়, নিয়মিত গণমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা, পারস্পরিক বিশ্বাস ও হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে তোলা।

৩.৮ জনসংযোগ কনসালটেন্সি

কনসালটেন্সি বা পরামর্শদাতা সংস্থা। জন-সংযোগের পরামর্শদাতা সংস্থা বা এজেন্সি পশ্চিম দুনিয়ায় অনেকদিন ধরেই কাজ করছে। ভারতেও ইদানীং অনেক কনসালটেন্সি এজেন্সি জন-সংযোগের পরামর্শদাতার কাজ করছে।

জন-সংযোগ কনসালটেন্সি সম্বন্ধে দুই রকমের মতামত আছে। একটি মত, যে সংস্থার জন-সংযোগের কাজের

জন্য কনসালটেন্সি এজেন্সি নিযুক্ত করা হচ্ছে, এজেন্সিটি ঐ সংস্থার অংশ নয়। বাইরের অন্য একটি সংস্থা। তার ফলে, যে সংস্থার জন-সংযোগের দায়িত্ব পালন করছে, সেই সংস্থাকে গভীর ভাবে জানা, বিভিন্ন কর্মপ্রণালি এবং সমস্যার খুঁটিনাটি জানা সম্ভব হয় না। তার ফলে, কনসালটেন্সি এজেন্সির জন-সংযোগের কাজকর্ম বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উপর উপর বা ভাসা ভাসা হয়ে থাকে। এদের কাজকর্ম মূলত হয়ে দাঁড়ায় বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংস্থার সংবাদ প্রচার করা। কিন্তু সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বা সংস্থার অবস্থান থেকে পর্যবেক্ষণের দূরদৃষ্টির অভাবে এবং সংস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত না থাকায়, এই প্রচারের মধ্যেও গভীরতার অভাব লক্ষ্য করা যায়।

তবে ভারতের ব্যবসাবাণিজ্যের পরিচালন মহলের বর্তমান প্রবণতা জন-সংযোগ কনসালটেন্সির পক্ষে। বর্তমানে আমাদের দেশে অনেকগুলি জন-সংযোগ কনসালটেন্সি এজেন্সি কাজ করছে। এই এজেন্সিগুলির কাজের পরিমাণ এবং ব্যবসার অঙ্কের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। এই সব কনসালটেন্সি এজেন্সিতে অনেক পেশাদার জন-সংযোগ বিশেষজ্ঞ কাজ করছেন। তাঁরা তাঁদের মক্কেলদের শিল্প বাণিজ্য ভালোভাবে, মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা ক'রে জন-সংযোগ বিষয়ে পরামর্শ দেন এবং কর্মপদ্ধতি স্থির করেন।

যে সব সংস্থার নিজস্ব জন-সংযোগ বিভাগ নেই, তাঁদের অনেকেই কনসালটেন্সি এজেন্সির পরিষেবা গ্রহণ করছেন। কিন্তু, বহু সংস্থা, যাঁদের নিজস্ব জন-সংযোগ বিভাগ রয়েছে, তাঁদেরও অনেকেই কনসালটেন্সি এজেন্সির পরিষেবা গ্রহণ করছেন।

অবশ্য এই পরিস্থিতি একটি বিষয় প্রমাণিত করেছে। পেশা হিসাবে জন-সংযোগের আবশ্যকতা এবং গুরুত্ব বর্তমানে আরো বেশি স্বীকৃতি লাভ করছে। সঙ্গে সঙ্গে, জন-সংযোগ পেশাদারদের কাজের সুযোগ এবং পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে।

বিভিন্ন সংস্থার জন-সংযোগ আধিকারিকের কাজও ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। প্রথমে তাঁরা কনসালটেন্সি এজেন্সিকে নিজেদের প্রতিযোগী মনে করতেন। সেই ধারনা ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। কনসালটেন্সি এজেন্সি যে পরামর্শ দিচ্ছেন, সংস্থার জন-সংযোগ আধিকারিক সেই পরামর্শ যাচাই করছেন। পরামর্শগুলি সংস্থার পক্ষে কতখানি উপযোগী হবে বিবেচনা ক'রে পরিচালন মন্ডলীকে সহায়তা করছেন সিদ্ধান্ত নিতে। কনসালটেন্সি এজেন্সির পরামর্শ জন-সংযোগ আধিকারিককে বিচার বিবেচনা ক'রে গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, তাঁরা সংস্থার বাইরের এজেন্সি। জন-সংযোগ বিষয়ে সংস্থার স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব জন-সংযোগ আধিকারিকেরই।

সংস্থার নিজস্ব জনসংযোগ বিভাগ অথবা জন-সংযোগ কনসালটেন্সি, দুইয়েরই স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক যুক্তি আছে।

সংস্থার নিজস্ব জনসংযোগ বিভাগের স্বপক্ষে যুক্তি—সংস্থার নিজস্ব বিভাগ হওয়ার ফলে সংস্থারই অংশবিশেষ। তার ফলে, সংস্থার কাজকর্ম এবং কাজের ধারার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। সংস্থার নীতি, ঠিক কোন বিষয়ে কী সমস্যা আছে, এবং সংস্থার মূল লক্ষ্য কী এইসব বিষয়ে সংস্থার নিজস্ব বিভাগ যত ওয়াকিবহাল, বাইরের কনসালটেন্সি এজেন্সির পক্ষে ঠিক ততটা গভীরভাবে জানা বা একাত্মবোধ করা সম্ভব হয় না। সংস্থার অংশবিশেষ হওয়ার ফলে অনেক সময় অপ্রিয় সত্য কর্তৃপক্ষকে জানানো সম্ভব হয় না। ফলে, জন-সংযোগের কাজে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়াও সম্ভব হয় না। আবার, নিজস্ব বিভাগ, সংস্থার চিন্তাধারার সঙ্গে একাত্ম হওয়ায়, জন-সংযোগ পরিকল্পনাগুলি গতানুগতিক হয়ে পড়ে। নতুন চিন্তার অভাবে নতুন পদক্ষেপ সম্ভব হয় না।

নিজস্ব জনসংযোগ বিভাগের একটি বিশেষ সুবিধা সংস্থারই বিভাগ হওয়ার দরুণ অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ এবং একাত্মবোধ। বিপণন, প্রশাসন, প্রভৃতি বিভাগের কর্মপদ্ধতি, শক্তি, দুর্বলতা এবং বিশেষ সমস্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকায়, সংস্থার সার্বিক প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা ক'রে জন-সংযোগের কর্মসূচী পরিকল্পনা এবং

রূপায়ন অনেক সহজ হয়। সংস্থার অংশবিশেষ হওয়ার কারণে নিজস্ব জনসংযোগ বিভাগের দায়িত্ব অনেক বেশি।

যে কোনো জন-সংযোগ কনসালটেন্সি এজেন্সির কাছে যে কোনো সংস্থারই পরিচয়—একজন মক্কেল। প্রচার কাজে দক্ষতা এবং দক্ষ বিশেষজ্ঞ থাকলেও কনসালটেন্সি এজেন্সির পক্ষে কোনো একটি মক্কেলের সঙ্গে একাত্মবোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। আর কনসালটেন্সি এজেন্সি মাত্রই চুক্তি হিসাবে কাজ করে। বর্তমান চুক্তির সময়সীমা পার হয়ে গেলে, মক্কেল সংস্থা অন্য কোনো এজেন্সির সঙ্গে নতুন চুক্তিও করতে পারেন। এই সব কারণেই কোনো জন-সংযোগ কনসালটেন্সি এজেন্সির পক্ষে কোনো একটি সংস্থার সঙ্গে একাত্ম বোধ করা সম্ভব হয় না।

কিন্তু, বহু সংস্থা আছে যাঁরা দীর্ঘস্থায়ী জন-সংযোগের পরিকল্পনা করেন না। এই সব সংস্থার পক্ষে কয়েকমাস বা এক বছরের সময় সীমার, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, কনসালটেন্সি এজেন্সির সঙ্গে চুক্তি করা সুবিধাজনক। এতে খরচ কম হয়। সাময়িক প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয়। সংস্থার নিজস্ব জন-সংযোগ বিভাগ গঠন করলে সংস্থার আর্থিক দায়িত্ব দীর্ঘমেয়াদী হয়।

সংস্থার নিজস্ব জন-সংযোগ বিভাগ নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে। পরিচালন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অনায়াসে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা ক'রে চলে। কোনো কনসালটেন্সি এজেন্সির পক্ষেই পরিচালন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত অনায়াস যোগাযোগ রক্ষা ক'রে চলা সম্ভব নয়। নিজস্ব জন-সংযোগ বিভাগ বিভিন্ন গণমাধ্যমের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা ক'রে চলে। ফলে, মাধ্যমগুলির সঙ্গে সংস্থার একটি সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং সংস্থার একটি পৃথক, বিশেষ পরিচিতি গণমাধ্যমগুলির কাছে প্রতিষ্ঠিত হয়। গণমাধ্যমের সঙ্গে এই সুসম্পর্ক যে কোনো সংস্থার পক্ষেই বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। গণমাধ্যমগুলির কাছে সংস্থার দীর্ঘমেয়াদী ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কনসালটেন্সি এজেন্সি গণমাধ্যমের সঙ্গে সংস্থার এই সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয় না, এবং এ বিষয়ে আগ্রহীও নয়।

আলোচনার উপসংহারে বলা যেতে পারে সংস্থার নিজস্ব জন-সংযোগ বিভাগ এবং জন-সংযোগ কনসালটেন্সি এজেন্সি, উভয়ের যুগ্ম প্রচেষ্টায় সুষ্ঠু, কার্যকরী জন-সংযোগ কর্মসূচী পরিকল্পনা ও রূপায়ন সম্ভব হতে পারে।

৩.৯ সারাংশ

জন-সংযোগের দ্বারা জনমত গঠন করা হয়। জনসাধারণ, সমাজ এবং বিভিন্ন সংস্থার উপর জন-সংযোগের প্রভাব অপরিসীম। সেই জন্য, কেবলমাত্র কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই নয়, জন-সংযোগের কাজের সময় জন-সংযোগকর্মীরা যাতে সামাজিক কর্তব্য এবং দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকেন, তার জন্য জন-সংযোগ কর্মীদের পালনীয় কিছু নীতিনির্দেশ আছে। বিশ্বের জন-সংযোগ পেশার মূল ধারা অনুসারেই ভারতের জন-সংযোগের নীতি নির্দেশ নির্ধারিত এবং বিধিবদ্ধ হয়েছে। তবে, এই নীতি নির্দেশ আত্মনিয়ন্ত্রণ মূলক।

জন-সংযোগের নির্দিষ্ট নীতি নির্দেশ ব্যতীত কয়েকটি বিষয়ে দেশের আইন বলবৎ আছে। অবশ্যই এই আইনগুলি মেনে চলা বাধ্যতামূলক। জন-সংযোগ কর্মীদের মানহানি আইন বিষয়ে জানা দরকার। বিভিন্ন রচনা এবং প্রচারে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মানহানি ঘটে থাকলে, তাঁরা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারেন, ক্ষতিপূরণও দাবি করতে পারেন।

প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার আছে। জন-সংযোগ কর্মীর এই বিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন। কিন্তু, ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার কেবল ব্যক্তিরই আছে। প্রতিষ্ঠানের নেই। সংস্থার কর্মীরাও ব্যক্তি হিসাবে এই অধিকার ভোগ করে থাকেন।

যে কোনো মৌলিক রচনার মালিকানা বা প্রচার এবং বাণিজ্যিক ব্যবহারের রচয়িতার অধিকার বা স্বত্ব স্বীকৃত

হয়েছে গ্রন্থস্বত্ব আইনে। ভারতের কপিরাইট আইন বার্ন কনভেনশনের সূত্র হিসাবে প্রণিত এবং আন্তর্জাতিক কপিরাইট আইনের ধারা সম্বলিত।

জন-সংযোগ বিশেষজ্ঞের পেশা। এই পেশায় যোগদানের জন্য কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকা অবশ্য প্রয়োজন। এই গুণগুলির, বিস্তারিত বিবরণ প্রণিধানযোগ্য। আবার, যে কোনো সংস্থার জন-সংযোগ বিভাগের কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। এই সব দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনের জন্যই বিভিন্ন সংস্থা জন-সংযোগ বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করেন।

বর্তমানে জন-সংযোগ কনসালটেন্সি এজেন্সিও কাজ করছে। সংস্থার নিজস্ব জন-সংযোগ বিভাগ এবং কনসালটেন্সি এজেন্সি, উভয়েরই কিছু কিছু সুবিধা এবং অসুবিধা আছে। দুইয়ের সমন্বয়ে জন-সংযোগের কাজ পূর্ণ মাত্রা অর্জন করতে পারে।

৩.১০ অনুশীলনী

১। জন-সংযোগের নীতি নির্দেশগুলি আলোচনা করুন।

২। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মানহানির দাবি করার কারণ কী? আইন অনুসারে প্রতীকারের ব্যবস্থা কী?

৩। জন-সংযোগ কর্মীর কী কী গুণ থাকা আবশ্যক এবং কী কারণে?

৪। নিজস্ব জন-সংযোগ বিভাগ না কনসালটেন্সি এজেন্সি? আলোচনা করুন।

টীকা লিখুন ঃ

ক. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, খ. কপিরাইট আইন গ. জন-সংযোগের কর্তব্য

৩.১১ গ্রন্থপঞ্জি

(1) Public Relations in India ● Sanat Lahiri

(2) Copyright Act

(3) Public Relations in India ● J. M. Kaul

একক ৪ ❑ জনসংযোগ কাজকর্ম

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য
৪.১ প্রস্তাবনা
৪.২ জন-সংযোগ-পরিচালন কর্ম
৪.৩ জন-সংযোগ বিভাগ
৪.৪ অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে সম্পর্ক
৪.৫ জনসম্পর্কের "পাবলিক" কারা?
৪.৬ মুক্ত রীতি, বদ্ধ রীতি
৪.৭ সারাংশ
৪.৮ অনুশীলনী
৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৪.০ উদ্দেশ্য

জন-সংযোগ কাজকর্ম বিষয়ে এই এককে আলোচনা করা হয়েছে। পরিচালন ব্যবস্থায় জন-সংযোগের অবস্থান কী। জন-সংযোগ বিভাগ এবং সংস্থার অন্যান্য বিভাগের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয়। জন-সংযোগের মূলরীতি কী হবে? মুক্ত রীতি না বদ্ধ রীতি? জন-সংযোগ কাজকর্ম কী ভাবে হয়? কেমন করে কাজ করে জন-সংযোগ বিভাগ। এই এককটি পাঠ ক'রে আপনারা এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে ধারণা করতে সক্ষম হবেন।

- জন-সংযোগ—পরিচালন কর্ম
- জন-সংযোগ বিভাগ
- অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে সম্পর্ক
- "পাবলিক" বলতে কী বোঝায়?
- মুক্ত রীতি এবং বদ্ধ রীতি

৪.১ প্রস্তাবনা

আধুনিক পরিচালন ব্যবস্থায় জন-সংযোগ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পরিচালন ব্যবস্থার সাংগঠনিক কাঠামোয় জন-সংযোগের একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে জনসংযোগ বিভাগ অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করে। জন-সংযোগ কাদের সঙ্গে এবং কী উদ্দেশ্যে, সে বিষয়েও জানা প্রয়োজন। পুরানো ধারনা অনুযায়ী জন-সংযোগ কী একমুখী যোগাযোগ প্রক্রিয়ার নিয়ম অনুসারে কেবল তথ্য সরবরাহ করবে, প্রতিক্রিয়ার খোঁজ খবর না করেই? অথবা, দ্বিমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থার সূত্র

অনুসারে উদ্দিষ্ট পাবলিকের প্রতিক্রিয়া জানার চেষ্টা করবে এবং প্রয়োজনমত জন-সংযোগের বার্তা এবং পদ্ধতি পরিবর্তন করবে, জন-সংযোগ কার্যকরী ক'রে তোলার জন্য? জন-সংযোগ সফল এবং সার্থক করার জন্য এই সব বিষয় অবগত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আরো প্রয়োজন আছে, জন-সংযোগ কাদের উদ্দেশ্যে, বা কাদের সঙ্গে 'বোঝাপড়া' সৃষ্টির জন্য জন-সংযোগের উদ্যোগ, তাঁদের, অর্থাৎ পাবলিক কে জানা। এই সব বিষয়ে পরিষ্কার ধারনা না থাকলে জন-সংযোগের পরিকল্পনা, প্রস্তুতি এবং প্রয়োগকৌশল নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।

৪.২ জন-সংযোগ—পরিচালন কর্ম

এবারে দেখা যাক, কোনো সংস্থার পরিচালন ব্যবস্থায় জন-সংযোগের অবস্থান কী?

কোনো সংস্থার পরিচালন কর্তৃপক্ষ যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সংস্থা সম্পর্কিত সংবাদের আদান-প্রদান বিশেষ প্রয়োজন এবং সেই কাজ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে হওয়াই বাঞ্ছনীয়, জন-সংযোগ বিভাগ নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগের কাজকর্ম শুরু হয়। এই জন-সংযোগ বিভাগ সাধারণত সংস্থার প্রশাসক বা পরিচালকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কাজ করে। উদ্দেশ্য, সংস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন সংবাদ প্রচার ক'রে সংশ্লিষ্ট জনগণের মনোভাব বা মতামত সংস্থার অনুকূলে প্রভাবিত করা। আপাতদৃষ্টিতে কাজটি সহজ মনে হলেও এই কাজের অনেক জটিলতা আছে। প্রথমত, জন-সংযোগ বিভাগের পরিচালককে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা ক'রে প্রচারের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু এবং দৃষ্টিকোণ স্থির করতে হবে। প্রচারের বিষয় সংস্থার পক্ষে সহায়ক হবে কিনা এবং প্রচারের দৃষ্টিকোণ উদ্দিষ্ট ফললাভে সহায়ক হবে কিনা, জন-সংযোগ বিভাগই বিবেচনা ক'রে দেখবেন। যদি দেখা যায়, নির্বাচিত সংবাদ এবং প্রচারের দৃষ্টিকোণের মধ্যে এমন কিছু আছে যার ফলে সংস্থার অসুবিধা ঘটার সম্ভাবনা, জন-সংযোগ বিভাগ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন এবং প্রয়োজনমতো সংবাদের বিষয় ও দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন করবেন।

পরের কাজ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারের জন্য উপযুক্ত আঙ্গিকে সংবাদটি লিপিবদ্ধ ক'রে নির্দিষ্ট মাধ্যমে পাঠানো এবং প্রচারের ব্যবস্থা করা।

সংস্থার বিভিন্ন পাবলিকের সঙ্গে বোঝাপড়া গড়ে তোলার কাজ শুরু করার আগে সংস্থার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জনসংযোগ বিভাগের বোঝাপড়া গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। পরিচালন কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন এবং জন-সংযোগ বিভাগের আয়োজন একই লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া একান্ত জরুরি। জন-সংযোগ বিভাগের সাফল্যের প্রথম সোপান এইটিই। মনে রাখতে হবে, সকল সংস্থার জন-সংযোগ বিভাগ সংস্থার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই কাজ করে। সেই উদ্দেশ্য, কতৃপক্ষের ইচ্ছানুসারে এবং জন-সংযোগ বিভাগের পরামর্শ অনুসারে নির্ধারিত হয়। অনেক সময়েই জন-সংযোগ বিশেষজ্ঞের মত পরিচালন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত থেকে ভিন্ন হতে পারে। সেক্ষেত্রে, হয় পরিচালন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি বোঝাতে সক্ষম হতে হবে নাহলে নিজের মত পরিবর্তন করে পরিচালন কর্তৃপক্ষের মতামত বা সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, শুরুতে যদিও জন-সংযোগ বিশেষজ্ঞ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন, সংস্থার তরফে একবার কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে জন-সংযোগ বিশেষজ্ঞ সেই সিদ্ধান্তই নিজের সিদ্ধান্ত বিবেচনা ক'রে সর্বান্তকরণে কাজে পরিণত করার চেষ্টা করবেন।

মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক সংস্থারই আভ্যন্তরীণ পাবলিকের সঙ্গে একটা সম্পর্ক বা বোঝাপড়া ইতিমধ্যেই রয়েছে, সেই সম্পর্ক যেমনই হোক না কেন। জন-সংযোগ বিভাগ কে সর্বপ্রথম ইতিমধ্যেই চালু সম্পর্ক বা বোঝাপড়া অনুধাবন করতে হবে। বিশেষ পরিস্থিতির প্রয়োজন বিশ্লেষণ করতে হবে। তারপরে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা ক'রে সংস্থার জন-সংযোগ-এর উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচী নির্ধারণ করতে হবে। যে পরিস্থিতি এবং পরিবেশ ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে সেই পরিস্থিতি এবং পরিবেশকে স্বীকার করেই জন-সংযোগ কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে, অস্বীকার করে নয়।

পরিচালন বিদ্যার (management) নিরিখে জন-সংযোগ কাজকর্ম সংস্থার কর্মীদের (staff function) কাজ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পরামর্শদান এবং সমর্থন যোগানোর জন্য।

প্রথমে সৈন্য বাহিনীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও এই কর্মীদের কাজ এবং ধারা অনুসারে কাজের (staff function and line function) পরিচালন ব্যবস্থার তত্ত্ব বর্তমানে শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। যে কোনো শিল্পে লাভজনক ভাবে পণ্য উৎপাদন এবং বাজারে বিক্রি করার বিভিন্ন কর্মধারাকে "ধারা অনুসারে কাজ" হিসাবে গণ্য করা হয়। কারিগরী, উৎপাদন এবং বিপণন "ধারা অনুসারে কাজ"। যাঁরা পরিচালন কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেন এবং সহায়তা করেন, যেমন, অর্থ, আইন, প্রশাসন এবং জন সংযোগ "কর্মীদের কাজ" হিসাবে গণ্য হয়। ধারা অনুযায়ী কাজে যাঁরা নিযুক্ত তাঁদের দায়িত্ব তাঁদের উপর যে যে কাজের ভার দেওয়া আছে সেগুলি সুষ্ঠুভাবে করা। আর, কর্মীদের কাজে যাঁরা নিযুক্ত তাঁদের দায়িত্ব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেওয়া এবং ধারা অনুযায়ী কাজে নিযুক্ত সকলকে সমর্থন যোগানো, যাতে তাঁদের কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন হয়।

কর্তৃপক্ষ এবং জন-সংযোগ কর্মী, দুই পক্ষেরই পরস্পরের নিকট প্রত্যাশা থাকে।

জন-সংযোগ কর্মীর নিকট কর্তৃপক্ষের প্রত্যাশা—

১. আনুগত্য

২. জন-সংযোগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে সহায়তা

৩. যে কোনো বিষয় সুস্পষ্ট এবং সুবিন্যস্ত ভাবে উপস্থাপনের দক্ষতা

৪. প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বোঝাপড়া তৈরির পারদর্শিতা

৫. আনন্দের সঙ্গে সবচেয়ে ভালো কাজ করার জন্য সকলকে উৎসাহ দান।

৬. শ্রমিক-কর্মচারীরা যাতে প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে ক্ষতিকর কোনো উক্তি বা কাজ না করেন, তার জন্য প্রভাব বিস্তার করা

আর, জন-সংযোগ কর্মী কর্তৃপক্ষের কাছে আশা করেন—

১. জন-সংযোগ বিষয়ে ইতিবাচক নেতৃত্ব

২. সংযোগ বিষয়ে গৃহীত নীতির সমর্থন

৩. সফল নীতি এবং কর্মসূচীর নির্দিষ্ট পরিকল্পনা

৪. কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের বরাদ্দ

৫. পাবলিক-এর মতামত জানার জন্য সমীক্ষা এবং গবেষণার জন্য অর্থবরাদ্দ।

৬. পরামর্শের জন্য এবং জনসমক্ষে উপস্থিত হওয়ার জন্য সময় দেওয়া।

যে কোনো সংস্থার জন-সংযোগ সফল করার জন্য জন-সংযোগ বিভাগ এবং সংস্থার ধারা অনুযায়ী কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের এক উদ্দেশ্যে এক সঙ্গে কর্ম সম্পাদন করা প্রয়োজন।

৪.৩ জন-সংযোগ বিভাগ

সংস্থার জন-সংযোগ বিষয়ক কাজকর্ম বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য সংস্থার অন্যান্য কাজের বিভাগের মতো জন-সংযোগ বিভাগ নামে একটি বিভাগ সংগঠন করা হয়। এই বিভাগের দায়িত্বে থাকেন জন-সংযোগ আধিকারিক। সংস্থার কাজের গুরুত্ব এবং পরিমাণ অনুযায়ী জন-সংযোগ বিভাগের কর্মী সংখ্যা নির্ধারিত হয়। প্রয়োজন

অনুসারে বিভিন্ন স্তরের একাধিক অফিসারও থাকতে পারেন।

সংস্থার নিজস্ব জন-সংযোগ বিভাগ প্রায় সব ক্ষেত্রেই সংস্থার পক্ষে সুবিধাজনক। সংস্থার সার্বিক কাঠামোর অঙ্গ হওয়ায়, সংস্থার আভ্যন্তরীণ কর্মপদ্ধতি, পরিস্থিতি এবং কোনো বিশেষ সমস্যা থাকলে, সেই সমস্যাও জন-সংযোগ বিভাগের গোচরে থাকে। সহকর্মী এবং সহযোগীদের সমর্থন, বিশ্বাস এবং আস্থা অর্জন ক'রে জন-সংযোগ বিষয়ে সকলের আনুকূল্য লাভ করা সম্ভব হয়। সংস্থার মুখ্য পরিচালকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কাজ করার সুবাদে সকলের সমর্থন এবং সম্মান লাভ করা সম্ভব হয়। তবে, প্রথম শর্ত আনুগত্য, সংস্থার প্রতি এবং মুখ্য পরিচালকের প্রতি।

সংস্থার নিজস্ব বিভাগ হওয়ার সুবাদে সংস্থা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা সম্ভব হয়। অন্যান্য বিভাগের কর্মপদ্ধতি, সমস্যা এবং আধিকারিক ও কর্মীদের সম্পর্কে ভালো ভাবে জানা থাকে। এর ফলে, জনসংযোগের দায়িত্ব পালন করা সহজ হয়। সব সংস্থাতেই কর্মপদ্ধতি নিয়ে বাক বিতণ্ডা, ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খার সংঘাত ঘটে। বিভিন্ন আধিকারিক এবং কর্মীদের মধ্যে বা কর্মীগোষ্ঠীদের মধ্যে নানা কারণে সমস্যা এবং কখনো কখনো সংঘাত সৃষ্টি হয়। সংস্থার নিজস্ব জন-সংযোগ বিভাগ ভিতর থেকে যে ভাবে লক্ষ্য রাখেন, বাইরের পরামর্শদাতার পক্ষে সেই ভাবে নজর রাখা সম্ভব হয় না। এই রকম পরিস্থিতিতে সংস্থার নিজস্ব জন-সংযোগ বিভাগের সাফল্যের সুযোগ এবং সম্ভাবনা বেশি।

মিতব্যয়িতা বজায় রাখাও সম্ভব হয়, সংস্থার নিজস্ব জন-সংযোগ বিভাগ থাকলে। কারণ, জন-সংযোগ বিভাগ চালানোর কতকগুলি মূল খরচ সংস্থার সার্বিক দপ্তর চালানোর খরচের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয়। বাইরের পরামর্শদাতা সব রকম খরচ এবং সংস্থার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার খরচও সংস্থার কাছে বিল করে উশুল করে। যে সংস্থার নিয়মিত, পরিকল্পিত ভাবে জন-সংযোগ-এর প্রয়োজন, সেই সংস্থার পক্ষে নিজস্ব জন-সংযোগ বিভাগ গঠন করাই বেশি সুবিধাজনক।

সংস্থার নিজস্ব জন-সংযোগ বিভাগ থাকলে যে কোনো প্রয়োজনে, তৎক্ষণাৎ বিভাগের সহায়তা পাওয়া যায় এবং কাজে লাগানো যায়। বাইরের পরামর্শদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করা সময় সাপেক্ষ। অনেক সময় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা না নিলে সমস্যা বৃদ্ধি পায়।

৪.৪ অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে সম্পর্ক

জন-সংযোগ বিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ সংস্থার সকল বিভাগের সঙ্গে নিয়মিত, ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করা। বিশেষ ক'রে, বিপণন, কর্মচারী বিষয়ক বিভাগ, উৎপাদন এবং অর্থবিভাগের সঙ্গে। কাজকর্মের বিচারে এই সব বিভাগগুলি একে অন্যের সঙ্গে জড়িত। সংস্থার বিভিন্ন সমস্যা এবং সংঘাতের উৎপত্তি এই সব বিভাগে, সেই কারণেই জন-সংযোগ বিভাগের অন্যান্য সকল বিভাগের সঙ্গে নিয়মিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করা জরুরি।

ক. **বিপণন বিভাগ ঃ** জন-সংযোগ বিভাগের সঙ্গে বিপণন বিভাগের সম্পর্ক একই সঙ্গে বন্ধুত্বের এবং সংঘর্ষের সম্পর্ক। কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণাই এর কারণ। সংস্থার বিজ্ঞাপন বিভাগ সাধারণত বিপণন বিভাগের অংশ হিসাবে কাজ করে। বিজ্ঞাপন বিভাগ সময় সময় জন-সংযোগ বিভাগের প্রয়োজন মত, সংস্থার জন-সংযোগ বিজ্ঞাপন প্রস্তুত এবং প্রচার করে। ফলে, অনেক সময় তাঁদের ধারণা হয়, জন-সংযোগের কাজকর্মও তাঁদের দেখার কথা। কিন্তু, জন-সংযোগের বিজ্ঞাপন যে জন-সংযোগের কর্মসূচীর একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, এই বাস্তব অবস্থা তাঁরা অনুধাবন করতে সমর্থ হন না। আবার, কোনো কোনো সংস্থায় জন-সংযোগ বিপণন বিভাগের অংশ বলেই গণ্য হয়। সেক্ষেত্রে সমস্যা আরো বাড়ে। তবে, বেশির ভাগ সংস্থায়ই জন-সংযোগ বিভাগ মুখ্য পরিচালকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কাজ করে।

খ. **আইন বিভাগ ঃ** সংস্থার স্বার্থে জন-সংযোগ ও আইন বিভাগকে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সঙ্গে কাজ করতে হয়। কাজের বিষয়ে মতপার্থক্য যে হয় না, তা নয়। তবে দুটি বিভাগেরই লক্ষ্য সংস্থার স্বার্থ রক্ষা করা। যেমন, শ্রমিক-

কর্মচারীদের সঙ্গে চুক্তির আলোচনা এবং সেই বিষয়ে, সংস্থার স্বার্থরক্ষা ক'রে প্রচারের ব্যবস্থা করা। আইনগত কোনো সমস্যা, যেমন সংস্থার বিরুদ্ধে কোনো মামলা, সংস্থার কারখানার ভিতরে কোনো ঘটনা, সংস্থার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ বা সংস্থার তৈরি জিনিস বয়কট করার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানানো হলে, আইন বিভাগ এবং জন-সংযোগ বিভাগকে একযোগে কাজ করতে হয়। এছাড়া, সংস্থার আর্থিক ব্যাপারে, সংবাদ প্রচারেও সহযোগিতা প্রয়োজন।

বর্তমানে সব সংস্থাকেই বিশেষ জটিল পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে হয়। সেই কারণে, আইন বিভাগ এবং জন-সংযোগ বিভাগের একযোগে কাজ করা আরো বেশি আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

গ। **কর্মচারী বিষয়ক এবং শিল্প সম্পর্ক বিভাগ** ঃ যে কোনো সংস্থার পক্ষেই জন-সংযোগ বিভাগ এবং কর্মচারী বিষয়ক বিভাগ বা শিল্প-সম্পর্ক বিভাগের একযোগে কাজ করা বিশেষ প্রয়োজন। সংস্থার শ্রমিক কর্মচারীদের সঙ্গে সংস্থার সুসম্পর্ক গড়ে তোলাই জন-সংযোগের কাজ। এর মধ্যেও মতপার্থক্যের ক্ষেত্র থাকতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে কর্মচারী বিষয়ক বিভাগের আধিকারিকদের ধারনা থাকে, বেশি তথ্য সকলকে জানানো ভালো নয়। যত কম তথ্য বা সংবাদ না দিলে চলে না, ততটুকুই দেওয়া হবে, তার বেশি নয়। যেহেতু জন-সংযোগ বিভাগের লক্ষ্য জনমত গড়ে তোলা বা মনোভাব স্বপক্ষে নিয়ে আসা, সেই কারণে, সংস্থার বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার জন্যই অনেক সময় বেশি তথ্য জানানো জরুরি হয়ে পড়ে। জন-সংযোগ বিভাগের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি সব সময় বোধগম্য হয় না কর্মচারী বিষয়ক বিভাগের। আইনগত উপস্থাপনা নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফলে তাঁরা আশঙ্কা করেন, বেশি তথ্য প্রকাশ করলে সংস্থার ক্ষতি হবে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে ঠিক সময়ে সঠিক তথ্য পরিবেশন না করার ফলেই সংস্থার অসুবিধা হয়েছে।

৪.৫ জন সম্পর্কের "পাবলিক" কারা?

জন-সংযোগ বা জন সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা শুরু করার জন্য জন-সংযোগের "পাবলিক" সম্বন্ধে যে সাধারণ ধারনা থাকা প্রয়োজন এক নম্বর এককে সে বিষয়ে কিছু চর্চা করা হয়েছে। এবারে "পাবলিক" বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

বিজ্ঞাপন প্রচারের পরিকল্পনার সময় বিজ্ঞাপনের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করা হয়। এই উদ্দিষ্ট লক্ষ্য—সম্ভাব্য ক্রেতা বা গ্রাহক। যে পণ্য বা পরিষেবার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হচ্ছে সেটির ক্রেতা বা গ্রাহক। গোটা বাজারের তুলনায় এই নির্দিষ্ট গ্রাহক বা ক্রেতাগোষ্ঠী অনেক ছোটো। জনসংযোগ-এর ক্ষেত্রে সমাজের বা জনসাধারণের একটি নির্দিষ্ট অংশবিশেষকে উদ্দেশ্য করে প্রচার কাজ সীমিত রাখা সম্ভব হয় না। জনসংযোগের প্রচার কাজ একই সঙ্গে অনেক গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য ক'রে করা হয়।

বিজ্ঞাপন এবং জন-সংযোগের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য এইটি। বিজ্ঞাপন কেবল নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীর উদ্দেশ্যে। কিন্তু জন-সংযোগ সমাজের বিভিন্ন অংশ এবং গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে একযোগে প্রচার করে, সংস্থার বিভিন্ন কাজের সার্বিক পরিচয় দিয়ে সংস্থার ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং বজায় রাখার জন্য। জনসংযোগ, সংস্থার বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং সংশ্লিষ্ট সকলকেই উদ্দেশ্য ক'রে। সেই অর্থে বিচার করলে বিজ্ঞাপনের উদ্দীষ্ট গ্রাহকদের তুলনায় অনেক ব্যাপক পরিধির "পাবলিক"কে উদ্দেশ্য ক'রে জন-সংযোগের প্রচার কাজ করা হয়।

জন-সংযোগ বিষয়ে আলোচনায় "পাবলিক" শব্দটি বারে বারে উল্লেখ করা হয়। আক্ষরিক অর্থে এবং তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে "পাবলিক" বলতে কী বোঝায়?

ইংরাজি "পাবলিক" (public) শব্দটির আক্ষরিক অর্থ একাধিক মানুষের সমষ্টি বা গোষ্ঠী। এই সমষ্টি অল্প সংখ্যক মানুষের হতে পারে, আবার বিপুল সংখ্যক মানুষের সমষ্টিও হতে পারে। এই সমষ্টি কোনো বিশেষ স্থানে অবস্থানকারী হতে পারে, আবার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত স্থানে অবস্থানকারীও হতে পারে।

"পাবলিক" এর সংজ্ঞা। "একই বন্ধনে যুক্ত, একই আগ্রহে সংপৃক্ত এবং কোনো কারণ বা বিষয়ে অভিন্ন ভাবনার অংশীদার মানুষদের সমষ্টি বা গোষ্ঠীর নাম—পাবলিক"। এই পাবলিক নিতান্ত ক্ষুদ্র হতে পারে, সংখ্যালঘিষ্ট হতে পারে আবার সংখ্যাগরিষ্ঠও হতে পারে। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এবং আগ্রহে বিভক্ত অনেক ছোটো ছোটো পাবলিক-এর গোষ্ঠী একটি বড়ো পাবলিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। পাবলিক-এর আর একটি সংজ্ঞা—"কোনো সিদ্ধান্ত বা ঘটনার দ্বারা এক সঙ্গে প্রভাবিত মানুষের গোষ্ঠী।" প্রতিটি বিষয়, সমস্যা, আগ্রহ এবং ঘটনা বা সিদ্ধান্ত ভিন্ন ভিন্ন পাবলিক বা মানুষের গোষ্ঠী গঠন করে।

জনসংযোগের পাবলিককে সাধারণত আটটি মৌলিক বিভাগে নির্দিষ্ট করা হয়। বিভিন্ন সংস্থার কাজকর্ম এবং জনসংযোগের উদ্দেশ্য অনুসারে এই মৌলিক বিভাজনের তারতম্য হবে।

১. প্রতিবেশী গোষ্ঠী—সংস্থার কারখানার আশপাশে বসবাসকারী জনগণ

২. সম্ভাব্য কর্মী—যাঁরা আশপাশে বসবাস করেন, অথবা অন্যত্র বসবাস করেন।

৩. কর্মচারী—সংস্থায় কর্মরত। নানাবিধ শ্রেণিতে বিভক্ত।

৪. উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন জিনিস এবং পরিষেবা সরবরাহকারী

৫. আর্থিক জগৎ—সংস্থার শেয়ারের মালিক, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, বিমা কোম্পানি, দালাল, লগ্নীকারী সংস্থা

৬. ডিস্ট্রিবিউটর, হোলসেলার, খুচরো বিক্রেতা

৭. সংস্থার জিনিস বা পরিষেবার গ্রাহক—অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ গ্রাহক

৮. মতামত গঠনকারী—যাঁদের মতামত সংস্থার পক্ষে সুবিধাজনক অথবা ক্ষতিকারক হতে পারে।

গণমাধ্যমকে এখানে পাবলিক হিসাবে গণ্য করা হয়নি। অনেক প্রবক্তা "গণমাধ্যম"কেও জন-সংযোগের পাবলিক হিসাবে গণ্য করেন। তাঁদের মতে, গণমাধ্যম যে কোনো সংস্থার জন-সংযোগ প্রক্রিয়ায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কাজে কাজেই গণমাধ্যমকেও পাবলিক হিসাবে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত।

আভ্যন্তরীণ পাবলিক

যে কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সংস্থার বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের সঙ্গে বোঝাপড়া বা সমঝোতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আভ্যন্তরীণ পাবলিক বলতে কোনো সংস্থায় কর্মরত সর্বস্তরের কর্মীদেরই বোঝায়। যে কোনো সফল প্রতিষ্ঠান তাঁদের কর্মীদের সঙ্গে বোঝাপড়ার বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। পরিচালন কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীদের, উভয়ের স্বার্থ রক্ষা করে, এই রকম কাজের পরিবেশ গড়ে তোলাই যে কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিচালন কর্তৃপক্ষের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন সহযোগিতা এবং আলাপ আলোচনা। যোগাযোগই তার পথ প্রশস্ত করে। প্রতিষ্ঠানে উর্ধ্বমুখী, নিম্নমুখী এবং পার্শ্বমুখী, সর্বব্যাপী যোগাযোগের দ্বারা। এই প্রয়োজন মেটায় যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ এবং যোগাযোগের বিভিন্ন কলাকৌশলে নিপুণ—জনসংযোগ বিভাগ। প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ পাবলিক-এর সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা জন-সংযোগ বিভাগের দায়িত্ব। যে কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাই সাধারণত বিভিন্ন প্রচারিত গুজবের মাধ্যমে সংস্থার বিভিন্ন কাজ এবং সিদ্ধান্তের সংবাদ পেয়ে থাকেন। তাঁরা জানেন এই ধরণের সংবাদের সত্যতা অনিশ্চিত। কর্মীরাও মনে করেন প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকেই প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত সংবাদ প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সংস্থার পরিচালনায় সবচেয়ে বড়ো সমস্যা সবসময় কোনো বিশেষ সিদ্ধান্ত নয়। ঐ বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পারিপার্শ্বিক এবং যথার্থ কারণ ব্যাখ্যা ক'রে কর্মীদের না বোঝানো বা বোঝাতে না পারাই বা কর্মীদের মনোভাবকে গুরুত্ব না দেওয়াই মূল সমস্যা।

১. অধিকাংশ কর্মীই সংস্থার কাজকর্ম এবং তাঁদের নিজেদের কাজকর্ম সম্বন্ধে বিশদ কিছু জানতে পারেন না। তাঁদের মূল প্রয়োজন নিজেদের কাজকর্ম সম্পর্কে তথ্য। বিশেষ ক'রে, পরিচালন কর্তৃপক্ষের ভাবনা চিন্তা এবং পরিকল্পনা সংক্রান্ত সংবাদ।

২. কিন্তু কর্তৃপক্ষের উপর মহল থেকে প্রচারিত তথ্য এবং সংবাদের প্রতিক্রিয়া সীমিত।

৩. যে কোনো কর্মীর কাছে সংবাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সূত্র তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়ক (immediate superior)।

৪. লোকের মুখে প্রচারিত সংবাদ, যার অপর নাম গুজব, সাধারণ কর্মীরা অনবরতই পেয়ে থাকেন। তবে তাঁরাও জানেন, এই ভাবে প্রাপ্ত সংবাদ তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় বটে, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সঠিক হয় না।

৫. উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মাঝে মাঝে মুখোমুখি কথা বলা বিশেষ সহায়ক হয়।

৬. সাধারণ কর্মীরা তাঁদের সহকর্মী এবং প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে যোগাযোগের আদান প্রদান করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদের ধারনা সংস্থার যোগাযোগ ব্যবস্থা সেরকম খোলাখুলি নয় এবং তেমন আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে না। অতএব, কর্মীদের মতামত বা সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

৭. বহু কর্মীই তাঁদের বর্তমান কাজে সন্তুষ্ট থাকেন না। আবার, যে সব কর্মী বর্তমান কাজে সন্তুষ্ট, তাঁরা হয়তো সংস্থায় তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তেমন আশান্বিত নন। এই ধরণের মনোভাব এবং পরিবেশের কারণ—প্রয়োজনীয় যোগাযোগ বা সংবাদ আদান প্রদানের অভাব। বেতন বা অন্যান্য প্রত্যক্ষ উৎসাহ এই মনোভাবের কারণ নয়।

যে কোনো সংস্থার সাফল্য নির্ভর করে সংস্থার কর্মীদের উপর। জন সংযোগের কাজের সাফল্যের জন্য আভ্যন্তরীণ সংযোগের মূল কাজ সংস্থা এবং কর্মী, পরস্পরের সুবিধাজনক বোঝাপড়ার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রয়াস করা।

বহিস্থ (বাইরের) পাবলিক

কোনো সংস্থার পাবলিককে তথ্য আদান প্রদান বা যোগাযোগের মাধ্যমে প্রভাবিত করা অত্যন্ত জটিল কাজ। এই পাবলিক, তাঁদের গঠন প্রক্রিয়া হিসাবে নানাবিধ এবং তাঁদের প্রয়োজন ও দাবিও বিভিন্ন। বহিস্থ পাবলিক সাধারণত বিচ্ছিন্ন অবস্থায়, একে অন্যের থেকে দূরে অবস্থান করেন ফলে মুখোমুখি যোগাযোগ সম্ভব হয় না। ভারতের নাগরিকরা শহর, গ্রাম এবং বড়ো শহরে, সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছেন। তাঁদের চাহিদা, আগ্রহ এবং মূল্যবোধের পার্থক্য বিরাট। কখনো কখনো সংঘাতমূলকও বটে। গণজ্ঞাপনের বিষয় আলোচনা করার সময় উপলব্ধি হয়—এই "গণ" এক বিপুল সংখ্যার মানুষ, নানা বিষয়ে একে অপরের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন, একে অপরের ক্ষেত্রে অবস্থান করছেন এবং কখনো কখনো নিজেদের মধ্যে মতান্তর বা সংঘাতেও লিপ্ত রয়েছেন। এই "গণ" বা "জন সাধারণ" এক বিরাট জন সংখ্যার সমষ্টি। এই সমষ্টির মধ্যে পুরুষদের গোষ্ঠী, মহিলাদের গোষ্ঠী, ছোটোদের গোষ্ঠী, বড়োদের গোষ্ঠী, জাতি বা জন্মসূত্রের গোষ্ঠী, প্রাদেশিক এবং ভাষাগত গোষ্ঠী, ধর্মীয় গোষ্ঠী, শ্রমিক সংগঠন, বিভিন্ন পেশার সংগঠন, সবই রয়েছে। এই সব গোষ্ঠী এবং গণমাধ্যম ক্রমাগত প্রভাবিত করছে জনসংযোগ-এর উদ্দিষ্ট "পাবলিক" এর মন।

এই নানাবিধ জনসাধারণের সমষ্টির সঙ্গে জনসংযোগ-এর কাজের প্রথম প্রয়াস—সমান আগ্রহের জনসমষ্টিকে চিহ্নিত করা যাঁরা সংস্থার কর্মসূচীকে নানাভাবে প্রভাবিত করতে পারেন। অথবা, যাঁরা সংস্থার কর্মসূচী দ্বারা কোনোও ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। এই চিহ্নিত করণের কয়েকটি পদ্ধতি আছে।

পরম্পরাগত পদ্ধতি হিসাবে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্দিষ্ট জনসাধারণকে চিহ্নিত করা হয়—শেয়ার হোলডার, ক্রেতা বা গ্রাহক, বাণিজ্যমহল, উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন জিনিস সরবরাহকারী, সরকার এবং শিল্পের আশপাশের বসবাসকারী জনগণ।

একটি জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কোনো বিশেষ একজনকে প্রচারের লক্ষ্য হিসাবে স্থির করার আরো নির্দিষ্ট যথাযথ উপায় আছে। 'জনতাত্ত্বিক'—বয়স, লিঙ্গ, ইত্যাদি হিসাবে চিহ্নিত করা। সমাজতাত্ত্বিক—অর্থাৎ, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক শ্রেণি হিসাবে। 'মনস্তাত্ত্বিক'—মূল্যবোধ, মনোভাব, জীবনশৈলী ইত্যাদির হিসাবে। একটি বিশেষ নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সঙ্গে জ্ঞাপন প্রক্রিয়ার দ্বারা সংবাদ আদান প্রদান এবং প্রতিক্রিয়া যতদূর সম্ভব নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। কোনো সংস্থা যখন কোনো একটি বিশেষ গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য ক'রে কোনো বার্তা জানান, তখন মনে রাখতে হবে, অন্যান্য গোষ্ঠীর কাছেও ঐ বার্তা পৌঁছাতে পারে। সেই কারণে, কোনো একটি বিষয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য বার্তার মূল সুর, দৃষ্টিভঙ্গি, বক্তব্য এক হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এর ফলে, সংযোগের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং ভুল বোঝাবুঝি পরিহার করা সম্ভব হয়।

৪.৬ মুক্ত রীতি ও বদ্ধ রীতি

অনেক প্রতিষ্ঠানই নিয়মিত সংবাদলিপি (Fress Release) প্রকাশ করা এবং আনুষঙ্গিক কাজকেই জন সম্পর্ক হিসাবে গণ্য করেন। এই পদ্ধতির জনসংযোগ-এর নাম "বদ্ধ রীতি"। অর্থাৎ, সংস্থা এক তরফাই বক্তব্য জানিয়ে থাকেন। যাঁদের বার্তা জানানো হচ্ছে, তাঁদের প্রতিক্রিয়া এক তরফা সংযোগের প্রতিক্রিয়া। এই পদ্ধতির মূল তত্ত্ব—সংস্থার প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্য অনুসারে পরিবেশের মনোভাব গড়ে তোলার প্রচেষ্টাই জন সংযোগ। অপর দিকে, মুক্ত রীতি জনসংযোগ। সংস্থা এবং পরিবেশকে একে অপরের পরিপূরক হিসাবে গণ্য ক'রে, প্রয়োজনমতো দুইয়ের মনোভাব পরিবর্তনের সহায়তা ক'রে জনসংযোগ প্রচেষ্টা সার্থক করে।

জনসংযোগকে যদি একটি সম্পূর্ণ কর্ম বা বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তাহলে "মুক্ত রীতি"ই যথার্থ জন-সংযোগ এবং কার্যকরী। কিন্তু জনসংযোগকে কর্মী হিসাবে বিবেচনা করলে সংস্থার তরফের বক্তব্য সরবরাহ করাই জনসংযোগ। এই জনসংযোগ "বদ্ধ রীতি"র জনসংযোগ। পাবলিককে জানানো হবে, অতএব পাবলিক পছন্দ করবেন, এই উদ্দেশ্য নিয়েই সংস্থার জনসংযোগ। সংস্থার অবস্থান অপরিবর্তিত রেখে, পাবলিক-এর মনোভাব পরিবর্তনই "বদ্ধ রীতি"র লক্ষ্য। অর্থাৎ, পাবলিককে সংস্থার স্বমতে নিয়ে আসাই এই রীতির লক্ষ্য। কিন্তু মুক্ত রীতির জনসংযোগের লক্ষ্য সংস্থা এবং পাবলিকের পারস্পরিক মনোভাবের আদান প্রদানের মাধ্যমে সংস্থার কাজকর্মের ক্ষেত্র আরো সুগম করা। এই ক্ষেত্রেই জনসংযোগ পরামর্শদাতার ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম। জনসংযোগ যদি পাবলিক-এর প্রতিক্রিয়া অনুমান ক'রে পরিচালন কর্তৃপক্ষকে আগে থেকে সতর্ক করেন, তাহলে অনেক সময় বিপর্যয় বা সংকট আগেই অনুমান ক'রে উপযুক্ত নিবারণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়। আগে থেকে সতর্ক থাকলে, কোনো বিপর্যয় ঘটলেও পরিস্থিতির মোকাবিলা করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। আভ্যন্তরীণ, এবং সংস্থার বাইরের পরিস্থিতি পর্যালোচনা ক'রে যদি দেখা যায় সংস্থার কোনো বিশেষ সিদ্ধান্ত বা কাজ পারিপার্শ্বিক সমাজের পরিপন্থী, ফলে সংস্থার সম্বন্ধে পাবলিকের মনোভাব নেতিবাচক হয়ে সংস্থার পক্ষে ক্ষতিকারক, জনসংযোগ বিভাগ পরিচালন কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে সচেতন করতে সমর্থ হন। এক্ষেত্রে সংস্থার পক্ষে কোনো সিদ্ধান্ত বা বিশেষ কোনো কাজ প্রয়োজন মতো পরিবর্তন বা সংশোধন করা সম্ভব হয়।

বেশির ভাগ সংস্থাই জনসংযোগের কর্মসূচী প্রণয়ন করেন পরিবেশের পরিস্থিতি যাচাই ক'রে সংশ্লিষ্ট পাবলিকের উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য। সংস্থার ব্যবস্থায় বা বক্তব্যে পরিবর্তন আনার জন্য নয়। এই সব ক্ষেত্রে জনসংযোগ আধিকারিক ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত এবং নির্দেশ অনুসারে সংবাদলিপি প্রচার ক'রে, পাবলিকের মনোভাব প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন।

যে সব সংস্থায় "মুক্তরীতি"র জনসংযোগ অনুসরণ করা হয়, সেখানে জনসংযোগ আধিকারিক বিশেষজ্ঞের

ভূমিকা পালন করেন। তিনি সমস্যাটি মনোনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করেন, সমস্যা মোকাবিলার উপযুক্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে পরামর্শ দেন, এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত কাজে রূপায়িত করেন। এই রীতির জনসংযোগ পারস্পরিক আদান প্রদান, আপোষ মীমাংসা এবং বোঝাপড়ার পথ প্রশস্ত করে।

৪.৭ সারাংশ

আধুনিক পরিচালন ব্যবস্থায় জন-সংযোগ পরিচালন কর্ম হিসাবেই গণ্য হয়। সংস্থার পরিস্থিতি পর্যালোচনা ক'রে জন-সংযোগের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট ক'রে জন-সংযোগ কর্মসূচী নির্ধারণ করা এবং কাজে রূপায়িত করাই জন-সংযোগের কাজ। সংস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পাবলিকের মনোভাব যাতে ইতিবাচক হয়, সংস্থা এবং পাবলিকের মধ্যে যাতে সুস্থ বোঝাপড়ার সম্পর্ক তৈরি হয় সেই উদ্দেশ্যে কাজ করাই জন-সংযোগ। এই কাজের জন্য সংস্থার সংশ্লিষ্ট পাবলিকের মনোভাব পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। পরিচালন কর্তৃপক্ষকে পাবলিকের মনোভাব সম্বন্ধে সচেতন করা, এবং পরিস্থিতি অনুসারে নির্ধারিত কর্মসূচী রূপায়নের জন্য পরিচালন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা।

সংস্থার অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে জনসংযোগ বিভাগের সুসম্পর্ক এবং সমঝোতা গড়ে তোলা বিশেষ জরুরি। জন-সংযোগের কাজ বেশির ভাগই সংস্থার অন্যান্য বিভাগের কাজের সঙ্গে যুক্ত বা সম্পর্কিত। ফলে, সংস্থার জন-সংযোগ বিষয়ে সঠিক চিন্তা ভাবনা করতে হলে, সংস্থার সকল বিভাগের কাজকর্ম, সমস্যা ইত্যাদি জানা আবশ্যক।

যাদের উদ্দেশ্য ক'রে জন-সংযোগের কাজকর্ম হয়, তাদের বলে পাবলিক। সকল সংস্থারই দুই ধরণের পাবলিক থাকে। সংস্থায় যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা আভ্যন্তরীণ পাবলিক। আর, সংস্থার বাইরের বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যাঁরা কোনোও ভাবে সংস্থার সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা বহিস্থ পাবলিক। জনসংযোগ বিভাগ এই দুই ধরণের পালবিকের উদ্দেশ্যেই গণজ্ঞাপন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করেন। দুই পাবলিকের উদ্দেশ্যে বার্তার মধ্যে পার্থক্য থাকেই। তবে স্মরণে রাখতে হয়, আভ্যন্তরীণ পাবলিকও অনেক সময় বহিস্থ পাবলিকের ভূমিকায় থাকেন, শেয়ার হোল্ডার হিসাবে বা অন্য কোনোও ভাবে। কাজেই, দুই পাবলিকের উদ্দেশ্যে বার্তা ভিন্ন হলেও, বার্তার মূল বক্তব্য এবং লক্ষ্য একই থাকা বাঞ্ছনীয়।

জন-সংযোগ কর্মে সাধারণত দুই রকম রীতি অনুসরণ করা হয়। "মুক্ত রীতি" এবং "বদ্ধ রীতি"। মুক্ত রীতির জন-সংযোগ পাবলিকের প্রতিক্রিয়া বিচার ক'রে সেই অনুসারে বার্তার পরিবর্তন বা সংশোধন করে, সংস্থার সঙ্গে পাবলিকের সমঝোতা গড়ে তোলার জন্য। যে জন-সংযোগ কেবল সংস্থার বার্তাই একতরফা ভাবে পাবলিককে জানায়, বার্তার প্রতিক্রিয়া সে রকম ভাবে বিচার করা হয় না,—সেই জন-সংযোগ, বদ্ধ রীতি জন-সংযোগ।

৪.৮ অনুশীলনী

১। জন-সংযোগ বিভাগ এবং পরিচালন কর্তৃপক্ষ, পারস্পরিক প্রত্যাশা কী? আলোচনা করুন।

২। জন-সংযোগ বিভাগের কাজ কী?

৩। জন-সংযোগ বিভাগের সংস্থার অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে?

৪। জন-সংযোগের "পাবলিক" বলতে কী বোঝেন? আলোচনা করুন।

টীকা লিখুন ঃ

ক. আভ্যন্তরীণ পাবলিক, খ. বহিস্থ পাবলিক গ. পরিচালন কার্য, ঘ. মুক্ত রীতি, ঙ. বদ্ধ রীতি

৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

(1) Public Relations ● Frank Jefkins

একক ৫ ❑ জন-সংযোগের হাতিয়ার

গঠন

৫.০ উদ্দেশ্য

৫.১ প্রস্তাবনা

৫.২. জন-সংযোগের হাতিয়ার

৫.৩ মাধ্যম

৫.৪ ব্যক্তিগত, পারস্পরিক যোগাযোগ

৫.৪.১ বৈঠক ও কনফারেন্স

৫.৫ গণমাধ্যম

৫.৫.১ গণমাধ্যমের কাজ কী

৫.৫.২ গণমাধ্যমের সীমাবদ্ধতা

৫.৬ জন সম্পর্কের বিশেষ মাধ্যম

৫.৬.১ মুদ্রণ মাধ্যম

৫.৬.২ প্রদর্শনী

৫.৬.৩ বিশেষ ঘটনা

৫.৬.৪ পোষিত কর্মসূচী

৫.৬.৫ চলচ্চিত্র

৫.৬.৬ জন-সংযোগের জন্য বিজ্ঞাপন

৫.৭ মাধ্যম সম্পর্ক

৫.৮ প্রেস কনফারেন্স

৫.৯ সাংবাদিকদের পরিদর্শন

৫.১০ সারাংশ

৫.১১ অনুশীলনী

৫.১২ গ্রন্থপঞ্জি

৫.০ উদ্দেশ্য

জন-সংযোগের কাজকর্ম কী ভাবে করা হয়, সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই এককে। পাবলিকের সঙ্গে যোগাযোগই জনসংযোগের মূল লক্ষ্য, অতএব যোগাযোগের কতকরম মাধ্যম আছে জানা প্রয়োজন। এই বিভিন্ন মাধ্যমগুলি জনসংযোগের কাজে কীভাবে ব্যবহার করা সম্ভব, সেই বিষয়েও জানা প্রয়োজন। এই এককটি পাঠ ক'রে

আপনারা জন-সংযোগের মাধ্যম বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন।

- জন-সংযোগের হাতিয়ার
- মাধ্যম বৈচিত্র্য
- ব্যক্তিগত যোগাযোগ
- গণমাধ্যমের ব্যবহার
- বিশেষ মাধ্যমের প্রয়োগ
- মাধ্যমের সঙ্গে সম্পর্ক
- প্রেস কনফারেন্স
- সাংবাদিকদের পরিদর্শন

৫.১ প্রস্তাবনা

জন-সংযোগের প্রয়োগ পদ্ধতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে আছে--মাধ্যম। কারণ, মাধ্যম ব্যতীত জন-সংযোগ সম্ভব নয়। পাবলিকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য কোনো না কোনো মাধ্যম অবশ্যই প্রয়োজন। বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহারের মধ্যে তারতম্য আছে। গুণগতভাবে, বার্তা প্রচার ক'রে কার্যকরী প্রভাব সৃষ্টি করার সক্ষমতায়ও বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে পার্থক্য আছে। একটি মাধ্যম হয়তো কোনো বিশেষ বার্তা, নির্দিষ্ট পাবলিকের কাছে কার্যকরী ভাবে পৌঁছে দিয়ে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টিতে সক্ষম। কিন্তু অন্য কোনো বার্তা, বিশেষ পরিস্থিতিতে, সাফল্যের সঙ্গে প্রচার ক'রে কার্যকরী প্রভাব সৃষ্টিতে সক্ষম না-ও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে হয়তো অন্য কোনো মাধ্যম কাজে লাগালে ভালো ফল লাভ করা সম্ভব। এই কারণেই জানা প্রয়োজন, জন-সংযোগের কাজে কোন কোন এবং কতরকমের মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে। সেই সঙ্গে, প্রত্যেক মাধ্যমের গুণগত কার্যকরীতার বিষয়ও জানা প্রয়োজন। এইগুলি জানা থাকলে তবেই বিভিন্ন মাধ্যমকে জন-সংযোগের উদ্দেশ্যে কার্যকরী ভাবে ব্যবহার করা সম্ভব। গণমাধ্যমের সঙ্গে সঙ্গে জন-সংযোগের কাজে অনেক বিশেষ মাধ্যমও ব্যবহার করা হয়। গণমাধ্যম ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন গণমাধ্যমের সঙ্গে সুসম্পর্ক। পেশাদার সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং বজায় রাখা। আবার, বিভিন্ন বিশেষ মাধ্যম ব্যবহারের জন্য রকমারি কলাকৌশলও ভালো ক'রে জানা একান্ত প্রয়োজন। তবেই, জন-সংযোগের লক্ষ্য পূরণের জন্য বিভিন্ন মাধ্যম কার্যকরী ভাবে ব্যবহার করা সম্ভব।

সংস্থার নিজস্ব, বিশেষ মাধ্যম, জনসংযোগ বিভাগের দ্বারা সৃষ্ট এবং পরিচালিত। তার ফলে, মাধ্যমগুলির উপর সংস্থার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। কিন্তু গণমাধ্যমগুলি কোনো সংস্থার জনসংযোগ বিভাগের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। সেইজন্য, গণমাধ্যমের সঙ্গে পেশাদার সম্পর্ক, পারস্পরিক বিশ্বাস ও নির্ভরতার সম্পর্ক গড়ে তোলা জন-সংযোগ বিশেষজ্ঞের বিশেষ প্রয়োজন। গণমাধ্যমের সঙ্গে পেশাদারি সম্পর্ক গড়ে তোলার রীতি নীতি এবং প্রক্রিয়াও জানা প্রয়োজন। নাহলে, গণমাধ্যমের সঙ্গে ফলপ্রসূ পেশাদার সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হয় না।

৫.২ জন-সংযোগের হাতিয়ার

জন-সংযোগের মুখ্য প্রক্রিয়া সংযোগ বা যোগাযোগ। আপনারা জানেন, যে কোনো সংযোগ প্রক্রিয়ার উপাদান— প্রেরক, গ্রাহক এবং অবশ্যই বার্তা। বার্তা, যা প্রেরক জানাতে চান গ্রাহককে বা গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দিতে চান। আর,

বার্তা পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজন মাধ্যম, উপযুক্ত মাধ্যম। বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ, কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগ, অথবা বিপুল সংখ্যক জনগণের সঙ্গে সংযোগ—সব জ্ঞাপন প্রক্রিয়া একই, তবে গ্রাহকের চরিত্র অনুযায়ী বার্তা জানানোর মাধ্যমের পরিবর্তন ঘটে।

এক বা একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে মুখের কথা, লিখিত শব্দ বা প্রতীকের মাধ্যমে কোনো ধারনা বা বক্তব্যের আদান-প্রদানই সংযোগ। মুখোমুখি সংযোগ ব্যতীত জনসম্পর্কের মাধ্যম—গণমাধ্যম, যেমন সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র, রেডিও, টেলিভিশন, সাধারণ প্রদর্শনী ইত্যাদি। গণমাধ্যম ব্যতীত, জনসম্পর্কের জন্য ব্যাপক ব্যবহার করা হয় সংস্থার নিজস্ব, সৃষ্ট মাধ্যম—হাউস জার্নাল, সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক ভিডিও, স্পনসরশিপ বা পোষিত কর্মসূচী, সেমিনার, কনফারেন্স ইত্যাদি।

বিজ্ঞাপনের জন্য মাধ্যম নির্বাচনের সুযোগ সীমায়িত। জনসংযোগের মাধ্যম নির্বাচন অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ। জনসংযোগের পাবলিক একদিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ হতে পারে, আবার অন্যদিকে সোজাসুজি চোখে চোখ রেখে কারো সঙ্গে কথোপকথনও হতে পারে। দক্ষ সংযোগ বিশেষজ্ঞ জানেন জ্ঞাপন প্রক্রিয়া দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। বার্তা পাঠিয়েই সংযোগকারীর কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। প্রেরিত বার্তার প্রতিক্রিয়া জানা প্রয়োজন। প্রতিক্রিয়া জানার ব্যবস্থা বিশেষ প্রয়োজন।

মানব সভ্যতার আদি যুগে সংযোগের উপায় ছিল সরাসরি, মুখোমুখি। এই সংযোগ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করতো অঙ্গভঙ্গি, মুখের অভিব্যক্তি এবং চোখের ভাষা। বার্তার প্রভাব সৃষ্টির জন্য একযোগে ব্যবহৃত হতো। কখনো কখনো ভাষার চেয়েও অন্যান্য অভিব্যক্তিই বেশি কার্যকরী হতো।

সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এবং মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় সংযোগ প্রক্রিয়া ক্রমশ জটিল হতে শুরু করে। বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থানকারী মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে নানাবিধ মাধ্যমের প্রচলন হয়। মাধ্যমগুলি দিনে দিনে জটিল চরিত্র ধারণ করে কিন্তু মাধ্যমের ব্যাপ্তির পরিধি বিস্তৃত হয়। মানুষের মন কখনোই শূন্য থাকে না। প্রত্যেক মানুষই তার আর্থ-সামাজিক পরিবেশ এবং আরো বিভিন্ন প্রভাবের ফলে কতকগুলি নির্দিষ্ট ধারণা, প্রবণতা, পক্ষপাতিত্ব এবং বিশ্বাস, মনের মধ্যে পোষণ করে থাকে। এর ফলে, কোনো ব্যক্তি একটি বিশেষ বার্তা গ্রহণ করতেও পারেন, আবার না-ও করতে পারেন। মানুষের মনে আগে থেকে সৃষ্ট এই ধারণা সংযোগ প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে। যে কোনো জ্ঞাপন প্রক্রিয়ার পরিকল্পনার শুরুতেই উদ্দিষ্ট পাবলিককে জানা বিশেষ প্রয়োজন। পূর্বসৃষ্ট ধারণাগুলির সমস্যা কী ভাবে মোকাবিলা করা যাবে, সে বিষয়ে বিশ্লেষণ এবং বিবেচনা ক'রে, তবেই বার্তা এবং বার্তা পাঠানোর মাধ্যম নির্দিষ্ট করা সম্ভব। একই ভাষায় যোগাযোগ রক্ষা করা যথেষ্ট না-ও হতে পারে। যেমন শহরের মানুষের বাংলা ভাষা আর গ্রামের মানুষের বাংলা ভাষার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। আবার, উচ্চশিক্ষিত জনসংযোগ আধিকারিকের বাংলা ভাষা আর কারখানায় কর্মরত সাধারণ শ্রমিকের বাংলা ভাষা কখনোই এক নয়। যদিও দুজনের ভাষাই বাংলা। লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, যে ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে, তার আবেদন এবং প্রভাব, উদ্দিষ্ট পাবলিকের উপর কতখানি কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা। এই কারণেই জন-সংযোগের উদ্দিষ্ট পাবলিককে বিশেষ ভাবে জানা প্রয়োজন।

জন-সংযোগের মূল উদ্দেশ্য উদ্দিষ্ট পাবলিককে বিভিন্ন সংবাদ জানিয়ে তাঁদের মনোভাব প্রভাবিত করা। কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে সঠিক বার্তা জানানোর ফলে উদ্দিষ্ট পাবলিকের ভুল ধারণা নিরসন হয় এবং সুস্থ বোঝাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। জন-সংযোগের আরো উদ্দেশ্য থাকে উদ্দিষ্ট পাবলিকের মনোভাব পরিবর্তন ক'রে সংস্থার অনুকূল মনোভাবে পরিণত করা, যাতে সংস্থার কাজকর্ম আরো সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

৫.৩ মাধ্যম

জন-সংযোগের মাধ্যমগুলিকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। শ্রাব্য, দৃশ্য এবং শ্রাব্য-দৃশ্য। মুখের কথা বা শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বার্তা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম—শ্রাব্য। লিখিত বা মুদ্রিত শব্দ, বিভিন্ন চিত্র বা প্রতীক—দৃশ্য মাধ্যম। আর, এই দুই মাধ্যমের মিশ্রণ—শ্রাব্য-দৃশ্য।

শ্রাব্য

মুখোমুখি—কথাবার্তা, ইন্টারভিউ, মিটিং, কনফারেন্স

মাধ্যমের সাহায্যে—রেডিও, টেলিফোন, মাইক্রোফোন ও লাউডস্পিকার

প্রতীক—বৈদ্যুতিক সংকেত যন্ত্র (Buzzer), ঘন্টা এবং অন্যান্য সংকেত যন্ত্র।

দৃশ্য

লিখিত—ব্যক্তিগত বার্তা, সারকুলার, ম্যানুয়েল, হ্যান্ডবুক, বুলেটিন বোর্ডের নোটিস ও ঘোষণা, নিউজলেটার, পুস্তিকা এবং অন্যান্য প্রকাশনা।

সচিত্র—বিভিন্ন চিত্র, ফোটোগ্রাফ, নক্সা, মানচিত্র, পোস্টার, নির্বাক ফিল্ম, চার্ট, কার্টুন।

প্রতীকী—পরিচয় জ্ঞাপক চিহ্ন, পতাকা, আলো এবং অন্যান্য প্রতীক।

শ্রাব্য-দৃশ্য

সবাক ফিল্ম, টেলিভিশন, ভিডিও, স্পষ্ট ক'রে প্রমাণ করা (demonstration)

৫.৪ ব্যক্তিগত, পারস্পরিক যোগাযোগ

কথা বলার প্রবণতা নিয়েই মানুষ জন্মগ্রহণ করে। আদিম সমাজে, যখন বিভিন্ন ভাষা এবং শব্দাবলী গঠিত হয়নি, তখনও মানুষ একে অপরের সঙ্গে বার্তা বিনিময় করত। বিভিন্ন সংকেত, অঙ্গভঙ্গি, চিহ্ন এবং প্রতীকের সাহায্যে। বিভিন্ন সংকেতের মাধ্যমে যোগাযোগের পদ্ধতিকে বলা হতো, কণ্ঠস্বর ব্যতিরেকে যোগাযোগ। কণ্ঠস্বরের দ্বারা বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বার্তা বিনিময় মানব সভ্যতার বিবর্তনে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং জটিল সমাজের পরিচয়। বিভিন্ন ভাষার অপরিণত সূচনার মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিগত ভাবে বার্তা বিনিময় শুরু হয়।

ব্যক্তিগত ভাবে পারস্পরিক জ্ঞাপন বা মুখোমুখি অবস্থানে জ্ঞাপন প্রক্রিয়ায় দুই বা দুইয়ের অধিক ব্যক্তির পারস্পরিক দেখার এবং কথা বলার পরিধির মধ্যে অবস্থান করা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। বার্তার প্রেরক এবং গ্রাহকের একই ঘরে অবস্থানের ফলে উভয় পক্ষের শারীরিক নৈকট্য কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতার অংশীদার হওয়ার এবং বার্তা বিনিময় বিশেষ কার্যকরী হওয়ার বিশেষ সহায়ক হতে পারে। এই সংযোগের সাফল্যের সম্ভাবনা খুব বেশি কারণ গ্রাহকের প্রতিবার্তা সঙ্গে সঙ্গেই জানা সম্ভব হয়। বার্তা সম্বন্ধে গ্রাহকের কোনো প্রশ্ন থাকলে তিনি তখনই প্রশ্ন ক'রে নিজের সন্দেহ নিরসন করতে পারেন। বার্তা প্রেরকও বুঝতে পারেন, গ্রাহক বার্তাটি ঠিকভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন কিনা। গ্রাহক যদি বার্তাটি বুঝে থাকেন, তাহলে কতখানি বুঝেছেন। প্রেরক এ বিষয়ে যাচাই ক'রে নিতে পারেন। মুখোমুখি অংশগ্রহণের ফলে সংযোগ সম্পূর্ণ করার সময় সংক্ষেপও করা যায়। গ্রাহকের অভিব্যক্তি এবং প্রতিক্রিয়াই প্রেরককে জানিয়ে দেয়, তাঁর বার্তা পরিবর্তন করা প্রয়োজন কিনা, বার্তাটিকে কাঙ্ক্ষিত প্রভাবশালী করার জন্য।

পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে মানুষ তার পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রতিটির মাধ্যমেই সাড়া দেয়। পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের প্রভাবের ফলে পারস্পরিক সংযোগ গ্রাহককে বেশি প্রভাবিত করে। পারস্পরিক যোগাযোগই সংযোগের পূর্ণ বা শ্রেষ্ঠ মাধ্যম বলা যেতে পারে। দেখা, শোনা, অনুভব করা, সব ইন্দ্রিয়গুলিই একসঙ্গে কার্যকরী হয় পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে। পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে আরো বিশেষ সুবিধা কথাবার্তার মধ্যেই, গ্রাহকের প্রতিক্রিয়া অনুসারে, আলোচনার দিক পরিবর্তন করা সম্ভব। আবার, কথাবার্তার সময় প্রেরক যদি বুঝতে পারেন গ্রাহক তাঁর যুক্তি মানছেন না, তাহলে নতুন যুক্তির অবতারণা করতে পারেন। গ্রাহকের প্রতিক্রিয়া একেবারে মুখোমুখি লক্ষ্য করার সুযোগের ফলে প্রেরক তাঁর বার্তা পরিবর্তন ক'রে, বার্তার আবেদনও পরিবর্তন ক'রে, সাফল্যের পথ প্রশস্ত করতে সক্ষম হন। পারস্পরিক যোগাযোগই একাধিক ব্যক্তির মধ্যে সংযোগের সর্বাপেক্ষা পূর্ণ উপায়।

৫.৪.১ বৈঠক ও কনফারেন্স

অনেকেই মনে করেন, মুখোমুখি বৈঠক বা সভা এবং কনফারেন্স জন-সংযোগের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। পারস্পরিক সম্পর্ক বা বোঝাপড়ার জন্য মুখোমুখি সাক্ষাৎকারের সুযোগ কেবল বৈঠক বা কনফারেন্স-এই সম্ভব। মুখোমুখি সাক্ষাৎকার দুই পক্ষকে একে অপরের কাছে নিয়ে আসে। বৈঠকে জানাবার যেমন সুযোগ আছে তেমনই সুযোগ আছে জানবার বা শোনার। যথার্থই দ্বিমুখী সংযোগ। পরিচালন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনো কাজ বা কর্মপদ্ধতি বিষয়ে বৈঠক এবং বিভিন্ন কাজের সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর বৈঠক, যেমন উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণ (quality control) বিষয়ক বৈঠক বর্তমানে বিভিন্ন সংস্থায় নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। এই ধরণের মুখোমুখি বৈঠকে সময় লাগে ঠিকই কিন্তু এই সব বৈঠকেই নতুন নতুন ধারণার উদ্ভবের সুযোগ থাকে। আর, যে কোনো সংস্থার পক্ষে যা বিশেষ মূল্যবান, টিম স্পিরিট (Team spirit) গড়তে সহায়তা করে মুখোমুখি বৈঠক।

সংযোগের অন্যান্য কৌশলের মতো বিশেষ লক্ষ্য স্থির ক'রে, পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক পরিচালনায় বৈঠক আয়োজন করা প্রয়োজন। ভিন্ন ভিন্ন মতের প্রকাশ এবং মত বিনিময়ের সুযোগ অবশ্যই থাকবে, কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, বৈঠক যেন দীর্ঘায়িত না হয় অথবা মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত না হয়। বৈঠকের কার্যকারীতা অনেকাংশেই নির্ভর করে বৈঠকের নিয়ামকের (Moderator) উপর। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বৈঠকের নিয়ামকের ভূমিকায়, অন্যান্যদের সহায়তা করেন মূল বিষয়ের মধ্যেই আলোচনা নির্দিষ্ট এবং সীমায়িত রাখতে। আধিকারিকের ভূমিকা সংশ্লিষ্ট অফিসারদের সমবেত করা।

বড়ো জমায়েতের জন্য, কর্মীদের জমায়েত অথবা বাইরের জনসাধারণের জমায়েত-এর আয়োজন করার দায়িত্ব সাধারণত জন সংযোগ বিভাগের উপরেই ন্যস্ত হয়। সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা (Annual General Meeting) অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত দিনের অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। শেয়ার হোল্ডারদের নোটিস পাঠানোর আইনানুগ প্রয়োজনীয়তা, সময় সীমা এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হয়। এই সব কাজে প্রথমেই সমস্ত করণীয় কাজ নির্দিষ্ট ক'রে একটি মিলিয়ে দেখার তালিকা (check list) তৈরি করা হয়। এই তালিকা অনুসারে প্রতিটি কাজ করা প্রয়োজন। তাহলে, ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা কমে যায়।

পারস্পরিক সংযোগ-এর আর একটি উপায়—প্রেস কনফারেন্স। এই এককেই, পরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

৫.৫ গণ মাধ্যম

গণ জ্ঞাপন প্রক্রিয়ার অর্থ বিপুল সংখ্যক বার্তা বিভিন্ন গণমাধ্যমের সহায়তায় বিপুল সংখ্যক মানুষকে জানানো। অর্থাৎ, গণজ্ঞাপন প্রক্রিয়ায় তথ্য ও সংবাদ প্রচারকারী মধ্যবর্তী কোনো পরিবাহক থাকা আবশ্যিক। যেমন, সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র, পুস্তক ইত্যাদি—মুদ্রণ মাধ্যম। রেডিও, টেলিভিশন, ফিল্ম বৈদ্যুতিক মাধ্যম। যে কোনো বার্তা গণমাধ্যমের সাহায্যে বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

পারস্পরিক যোগাযোগের দ্বারা সংযোগ আর গণমাধ্যমের সাহায্যে সংযোগের মধ্যে অনেক পার্থক্য। গণজ্ঞাপন প্রক্রিয়ায় বার্তার উৎস কোনো একজন ব্যক্তি নন। একটি সংস্থা, যেমন সংবাদপত্র অথবা রেডিও বার্তার উৎস। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বার্তার প্রেরক একজন পেশাদার, জ্ঞাপন বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ সংবাদ আদান প্রদানকারী। প্রেরিত বার্তা অনবদ্য (unique) এবং পরিবর্তনশীল নয় এবং অনুমেয় নয়। প্রায় সব ক্ষেত্রেই বার্তাটি বিশেষভাবে প্রস্তুত করা, সাজানো এবং অনেক সংখ্যায় প্রচারিত। প্রেরক এবং গ্রাহকের মধ্যে সম্পর্ক একেবারেই একমুখী এবং নৈর্ব্যক্তিক। বার্তার প্রেরক একজন নৈর্ব্যক্তিক, পেশাদার সংবাদ সরবরাহকারী।

গণজ্ঞাপনের পদ্ধতি এবং কলাকৌশল, পারস্পরিক জ্ঞাপনের থেকে ভিন্ন, কঠিন এবং জটিল। বার্তার প্রেরক যেহেতু একই সঙ্গে কয়েক লক্ষ গ্রাহককে উদ্দেশ্য ক'রে বার্তা প্রেরণ করছেন সেহেতু তা শ্রোতার বা পাঠকের প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। কোনো একটি বিশেষ বার্তার উপস্থাপন কিছু সংখ্যক শ্রোতার গ্রহণীয় হলেও হয়তো বিপুল সংখ্যক শ্রোতার কাছে গ্রহণীয় নয়। কাজেই গণজ্ঞাপনে সাধারণীকরণ বা সরলীকরণের প্রয়াস থাকে। গণজ্ঞাপন প্রক্রিয়ায় প্রেরিত বার্তার প্রতিক্রিয়া জানা সহজ নয়। পারস্পরিক জ্ঞাপনের সংযোগ প্রক্রিয়ায় প্রতিবার্তা সঙ্গে সঙ্গেই জানা সম্ভব। কিন্তু গণজ্ঞাপনের প্রতিবার্তা জানতে অনেক সময় লাগে এবং প্রতিবার্তা জানার জন্য সমীক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। গণজ্ঞাপনের অন্যতম বিপদ বা ঝুঁকি প্রেরক যে অর্থে বা উদ্দেশ্যে বার্তা প্রেরণ করেন, শ্রোতা হয়তো সেই বার্তার অন্য কোনো অর্থ বোঝেন, যা প্রেরকের বার্তার অভিপ্রেত অর্থ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অথবা বিপরীত।

সাধারণ হিসাবে ধরা হয় গণমাধ্যম বিস্তৃত অঞ্চলে ব্যাপ্ত বিপুল সংখ্যক জনগণের কাছে বার্তা পৌঁছানোয় সমর্থ। আক্ষরিক অর্থে সত্য। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিতে দেখা যায় দেশের বহু গ্রামাঞ্চলে এবং প্রত্যন্ত প্রান্তে সংবাদপত্র সময়মতো পৌঁছায় না। জনসাধারণের.বিপুল অংশ ক্রয়ক্ষমতার অভাবে সংবাদপত্র বা সাময়িকী কিনতে সমর্থ হন না। টেলিভিশন তো আরো দূরে। আবার নিরক্ষরতার কারণেও বিপুল সংখ্যার জনসাধারণ সংবাদপত্র বা পত্রিকা পাঠ করতে অসমর্থ। এর ফলে, গণমাধ্যমের ব্যাপ্তি যথেষ্ট সীমিত হয়ে পড়ে। তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশের পরিস্থিতিই এই রকম।

এই সব সীমাবদ্ধতা সত্বেও গণমাধ্যম যে গণ জ্ঞাপনের জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অনেকেরই ধারণা, গণমাধ্যমের সাহায্যে বার্তা প্রেরণ ক'রে জনগণের মনোভাব বা জনমত প্রভাবিত করা যায়। সত্য কথা, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁর অধিগত জ্ঞান, আর্থসামাজিক পরিবেশ এবং আগেই স্থিরীকৃত ধারণা অনুযায়ী গণমাধ্যমে প্রচারিত বার্তা গ্রহণ করেন, বর্জন করেন অথবা আংশিক ভাবে গ্রহণ বা বর্জন করেন। গণমাধ্যমের জ্ঞাপন প্রক্রিয়া একমুখী হওয়ার ফলে প্রেরক বার্তাটি গ্রাহকের কাছে পাঠিয়েই ক্ষান্ত হন।

জনসাধারণের কাছে বার্তা পৌঁছানোর জন্য গণমাধ্যম কার্যকরী, অর্থসাশ্রয়কারী মাধ্যম। বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাহায্যে বিভিন্ন জনসমষ্টির উদ্দেশ্যে সহজে, কম সময়ে বার্তা পাঠানো সম্ভব। কিন্তু মনে রাখতে হবে, গণমাধ্যমের দ্বারা বার্তা পাঠালে, পাঠক, শ্রোতা বা দর্শকের কাছে বার্তাটি পৌঁছাবে মাত্র। তিনি সেটি দেখতে পারেন, না-ও দেখতে পারেন, আবার দেখেও অগ্রাহ্য করতে পারেন।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেকেই নিজের পছন্দমতো মাধ্যমের গ্রাহক। যে মাধ্যমের সঙ্গে কোনো ব্যক্তি তাঁর ভাবনা চিন্তার, মতের, এবং আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতের মিল অনুভব করেন, সেই মাধ্যমই তিনি পাঠ করেন, শোনেন অথবা দেখেন। অর্থাৎ, মাধ্যম নির্বাচন হয়ে থাকে কতকগুলি পূর্ব নির্ধারিত অবস্থা অনুসারে। গণমাধ্যমের সাহায্যে প্রেরিত বার্তার গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করে প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য।

আরো একটি কথা, গণমাধ্যমের সাহায্যে বিপুল সংখ্যক মানুষকে উদ্দেশ্য ক'রে বার্তা পাঠানো হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বার্তার লক্ষ্য একজন ব্যক্তি। যেমন ধরুন, আপনি যে সংবাদপত্রটি পাঠ করে থাকেন, সেই সংবাদপত্র প্রতিদিন কয়েক লক্ষ মুদ্রিত হয় এবং বহু লক্ষ লোক প্রতিদিন সংবাদপত্রটি আপনার মতোই পাঠ করেন। কিন্তু আপনি যখন সংবাদপত্রটি পাঠ করছেন, তখন আপনি একজন মাত্র ব্যক্তি। ঐ সংবাদপত্রের মাধ্যমে যে সংবাদগুলি আপনার কাছে পৌঁছায়, সেগুলি আসলে আপনার কাছে, একজন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য ক'রে পৌঁছায়। গণজ্ঞাপনের আপাতবিরোধী প্রক্রিয়া এই। বিপুল সংখ্যক জনসাধারণকে উদ্দেশ্য ক'রে বার্তা পাঠালেও আসলে সেই বার্তা একজন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করেই পাঠানো হয়। এই একজন ব্যক্তি তাঁর বয়স, শিক্ষা, আয়, মূল্যবোধ, আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস, মনোভাব এবং আর্থসামাজিক পশ্চাতপট অনুযায়ী বার্তাটি গ্রহণ অথবা বর্জন করবেন, সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে।

৫.৫.১ গণমাধ্যমের কাজ কী

পর্যবেক্ষক ঃ গণমাধ্যম অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কাজ ক'রে থাকে। পর্যবেক্ষকের কাজ অন্যতম। গণমাধ্যম সমাজের বিভিন্ন পরিবর্তন, সম্প্রসারণ এবং ঘটনাবলী জনসাধারণকে জানায়। এই কারণে গণমাধ্যমকে দেশের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতির পর্যবেক্ষক হিসাবে গণ্য করা হয়। গণমাধ্যম পর্যবেক্ষণকারী।

জনমত গড়ে তোলে ঃ বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয়ে জনসাধারণকে মতামত প্রকাশ করতে এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সহায়তা করে গণমাধ্যম। সমসাময়িক ঘটনার বিভিন্ন সংবাদ প্রচার ক'রে কোনো ঘটনার বা কোনো বিশেষ সিদ্ধান্তের অনুকূলে অথবা বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে সাহায্য করে গণমাধ্যম।

কোনো বিশেষ ঘটনার বিভিন্ন তথ্য এবং নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাটি বিচার ক'রে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করে গণমাধ্যম। এর ফলে সাধারণ মানুষ তাঁদের মতামত গড়ে তুলতে সমর্থ হন। ঘটনাটির সম্পর্কে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া কী রকম হওয়া উচিত, সে বিষয়েও দিক নির্দেশ করে গণমাধ্যম। সংবাদপত্রে যাঁরা সম্পাদকীয় লেখেন, বিশেষ কলাম লেখেন, প্রবন্ধ বা ফিচার লেখেন, উপস্থাপন করেন, তাঁরাই বিভিন্ন বিষয়ে জনমত গড়তে সাহায্য করেন। টেলিভিশনে যাঁরা সংবাদ উপস্থাপন করেন, বিশ্লেষণ করেন এবং বিশেষজ্ঞ হিসাবে আলোচনা করেন, তাঁরাই জনমত গড়ে তুলতে সহায়তা করেন। পাঠক এবং দর্শকদের এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়। সম্পাদকের উদ্দেশ্যে চিঠির দ্বারা এবং টেলিভিশনে দর্শকদের অংশগ্রহণে, জনসাধারণের অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ হয়।

সাম্প্রতিক অতীতে আপনারা দেখেছেন, রূপ কানোয়ার-এর "সতী" হওয়ার উদ্দেশ্যে সহমরণের ঘটনার পরে, সারা দেশে এই বর্বর প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলে—গণমাধ্যম। আরো সাম্প্রতিককালে আপনারা লক্ষ্য করেছেন, ইরাক-এর উপর ব্রিটেন ও আমেরিকার যৌথ আক্রমণের সময় বিভিন্ন গণমাধ্যম এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলেছে। কেবল ভারতের গণমাধ্যমই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, এমনকী ব্রিটেন ও আমেরিকাতেও এই অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলেছে গণমাধ্যম।

গণমাধ্যম, সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্বন্ধে যেমন অবহিত করে, তেমনই জনমত গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দূরকে নিকট করে ঃ গণমাধ্যম দূরকে নিকটে আনে। সুদূর নাসিক-এ কুম্ভমেলার বিবরণ গণমাধ্যমই আপনার

নিকটে আনে। যুদ্ধ-বিদ্ধস্ত ইরাকের সাধারণ মানুষের দুর্দশার কথা জানিয়ে আপনার মন ভারাক্রান্ত করে গণমাধ্যম। দিল্লীর দীপাবলির রোশনাই আপনি নিজের ঘরে বসেই উপভোগ করেন। গণমাধ্যম আমাদের সমাজের বিভিন্ন মানুষকে একে অপরের নিকটে নিয়ে আসে। সমাজ এবং দেশকে দৃঢ়বদ্ধ করে। বর্তমানে তো সারা বিশ্বই আপনার কাছে উপস্থিত, গণমাধ্যমের দ্বারা।

সংস্কৃতি সংরক্ষণ করে ঃ আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সংস্কৃতি সংরক্ষণ করে গণমাধ্যম। সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর আচার ব্যবহার, শিল্প-সংস্কৃতি, লোক সঙ্গীত, লোক শিল্প, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক মূল্যবোধ, যা পুরুষাণুক্রমে উপলব্ধ হয়েছে, সেই সবই আমাদের সংস্কৃতি। সাধারণ মানুষকে এই উপলব্ধ সংস্কৃতির সংবাদ জানায় গণমাধ্যম। সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন করে এবং আগ্রহ সৃষ্টি করে। সংস্কৃতি রক্ষার গুরু দায়িত্ব পালন করছে গণমাধ্যম। ভেবে দেখুন, স্কুল কলেজের বাইরে, বিভিন্ন গণমাধ্যমের কাছ থেকে আপনি কত কী জানতে সমর্থ হয়েছেন। এই কারণেই গণমাধ্যমের আর এক নাম—সাধারণ মানুষের বিশ্ববিদ্যালয়।

মনোরঞ্জন করে ঃ গণমাধ্যমের মনোরঞ্জনমূলক কাজই বোধ হয় জনসাধারণ বেশি তারিফ করেন। প্রমোদমূলক রচনা, বিশেষ রচনা প্রকাশ ক'রে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার ক'রে গণমাধ্যম সাধারণ মানুষের সমস্যা সঙ্কুল জীবনে স্বস্তি আনে। মনে প্রফুল্লতা আনে। মানসিক চাপ কাটাতে সাহায্য করে।

নেতিবাচক কাজ ঃ গণমাধ্যম অনেক সময়ই নেতিবাচক কাজে প্রবৃত্ত হয় এবং জনমানস বিভ্রান্ত করে। গণমাধ্যম পরিবেশিত সংবাদ এবং অন্যান্য তথ্য ও বিশ্লেষণ অনুসারেই জনসাধারণ বিভিন্ন ঘটনা, পরিস্থিতি, সিদ্ধান্ত এবং নীতি সম্বন্ধে মতামত গঠন করেন। গণমাধ্যম যাঁরা পরিচালনা করেন, এবং মাধ্যমে কোন কোন বিষয় কেমনভাবে পরিবেশিত হবে, সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, জনমত গঠনে তাঁদের ভূমিকাই প্রধান। যেহেতু গণমাধ্যম একটি প্রতিষ্ঠান, সে কোনো সংবাদপত্র হোক বা টেলিভিশন চ্যানেল হোক, সেই প্রতিষ্ঠানের যাঁরা নিয়ামক, তাঁরাই স্থির করেন, কোন কোন সংবাদ পরিবেশন করা হবে, কেমন ভাবে পরিবেশন করা হবে, এবং কোন দৃষ্টিভঙ্গির জনমত গঠনের চেষ্টা করা হবে। বলা বাহুল্য, এই সব সিদ্ধান্ত অনেক সময়েই সমাজ এবং জনসাধারণের স্বার্থের অনুকূলে হয় না। বিভিন্ন বিষয়ে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে গণমাধ্যম অনেক সময়ই নেতিবাচক বা সামাজিক সুবিধার পরিপন্থী জনমত গড়ার চেষ্টা করে। সাধারণত পরিচালন কর্তৃপক্ষের নীতি এই ধরণের নেতিবাচক প্রচেষ্টার কারণ। তবে, অনেক সময় অন্যান্য কারণও থাকতে পারে।

অস্থিরতা সৃষ্টি করে ঃ গণমাধ্যম সমাজের প্রয়োজনীয় এবং হিতকারী অনেক কাজ করলেও, গণমাধ্যমের সব কাজ, সব সময় জনসাধারণের পক্ষে হিতকারী হয় না। গণমাধ্যম যদি এমন সংবাদ প্রচার করেন যার ফলে সমাজের কোনো গোষ্ঠী ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন তাহলে অনিশ্চয়তা এবং অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। মানুষের উদ্বেগ এবং উত্তেজনা বাড়ে। অনেক সময় অযৌক্তিক বিষয়েও উৎসাহিত করা হয়। আবার কখনো কখনো যুক্তিসঙ্গত বিষয়েও অনীহা সৃষ্টি করে। জনমানসে ভয় জাগায় এবং অনেক সময় সমাজের পরিপন্থী মনোভাব সৃষ্টি করে।

রুচির অবনতি ঘটায় ঃ অনেক সময় গণমাধ্যম ব্যবসায়িক এবং অন্যান্য কারণে মনোরঞ্জনের জন্য চটুল, নিচু মানের সংবাদ, ফিচার এবং ফোটোগ্রাফ প্রকাশ এবং প্রচার ক'রে থাকেন। ক্রমাগত এই সব নিম্ন মানের প্রচারের ফলে জনসাধারণের রুচি প্রভাবিত হয়। এর ফলে, গণমাধ্যমের সমাজ হিতৈষীর ভূমিকার পরিবর্তন হয়।

অবাস্তব উপস্থাপন ঃ গণমাধ্যম অনেক সময় অবাস্তব পরিবেশের চিত্র পরিবেশন ক'রে জনসাধারণকে বাস্তব অবস্থা জানতে দেয় না। কোনো ঘটনার আংশিক পরিবেশন, কোনো ব্যক্তির বক্তব্যের আংশিক উপস্থাপন ক'রে জনসাধারণকে অবাস্তব ধারণা সৃষ্টি করতে বাধ্য করে। অনেক সময়ই, এই সব প্রয়াস উদ্দেশ্য প্রণোদিত। পরিচালন কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা বা প্রয়োজন অনুসারে কোনো বিষয়ে জনসাধারণের ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলার চেষ্টা করা

হয়, বাস্তব অবস্থা অন্যরকম হলেও। আবার কোনো বিষয়ের বিরোধীতা করা বা নেতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলার জন্যও অবাস্তব পরিবেশন করা হয়।

গণমাধ্যমের গুরুত্ব ঃ ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে গণমাধ্যমের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একটি প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ সমাজ ক্রমশ আধুনিক যুগে প্রবেশ করছে। এই পরিবর্তন গ্রহণ করার জন্য মানুষের মনকে প্রস্তুত করতে, আগ্রহান্বিত ক'রে তুলতে গণমাধ্যমের বিশেষ ভূমিকা আছে। গণমাধ্যমকেই লক্ষ্য রাখতে হবে, নতুন ব্যবস্থা এবং মূল্যবোধ গ্রহণ করার আগ্রহে মানুষ যেন পুরাতন ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধ বিসর্জন না দেয়। পুরাতন এবং নতুনের সংমিশ্রণে আধুনিক যুগের উপযোগী নতুন সমাজ এবং জনমানস গঠনে গণমাধ্যমই অগ্রণী ভূমিকা নিতে সক্ষম।

৫.৫.২ গণমাধ্যমের সীমাবদ্ধতা

প্রচলিত গণমাধ্যমের ব্যাপ্তি এবং গণ জ্ঞাপনের সক্ষমতা ভারতে বেশ সীমাবদ্ধ। মুদ্রণ মাধ্যমের কার্যকরীতা সীমাবদ্ধ, কারণ স্বাক্ষর লোকের এবং বিশেষ ক'রে নিয়মিত পড়তে সক্ষম এমন মানুষের সংখ্যা যথেষ্ট কম। কাজেই, মুদ্রণ মাধ্যম দেশের বৃহত্তর অংশের মানুষের কাছে কোনো বার্তা পৌছাতে পারে না। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতাও সীমিত। নিত্য সংবাদপত্র কেনা বেশির ভাগ লোকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পত্র পত্রিকা সময়মতো পৌছায় না। দেশের বিস্তৃত বিভিন্ন অঞ্চলের সংবাদ পরিবেশন করা সম্ভব হয় না বলে সাধারণ মানুষ আগ্রহ বোধ করেন না। তারপরে আছে নানা ভাষার সমস্যা। টেলিভিশন এখনও বেশির ভাগ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। গ্রামাঞ্চলে টেলিভিশনের সমস্যা আরো বেশি। বিঘ্নিত বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং টেলিভিশন সার্ভিস করা বা সারানোর সমস্যা। বেশির ভাগ মানুষের কাছে রেডিওই একমাত্র গণমাধ্যম।

তবে সীমিত পরিধির মধ্যে গণমাধ্যম সংবাদ সরবরাহ এবং জনমত গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। সামাজিক পরিবর্তন, সাংস্কৃতিক রুচি গঠন এবং শিক্ষার প্রসারে গণমাধ্যমের যে ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন ছিল, সেটি সম্ভব হয়নি। বড়ো এবং ছোটো শহরের স্বচ্ছল নাগরিকদের উপর গণমাধ্যমের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। বোধহয় এই কারণে এবং ব্যবসায়িক সংস্থা হওয়ার দরুণ বেশির ভাগ গণমাধ্যম মূলত নির্ভর করে উত্তেজনামূলক সংবাদ, বিনোদন এবং অন্যান্য লঘু বিষয়বস্তুর উপর। প্রকৃতপক্ষে, গণমাধ্যম সচ্ছল, মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত মানুষের মাধ্যম।

রেডিওকে একমাত্র ব্যতিক্রম হিসাবে গণ্য করা যায়। রেডিও ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সর্বাধিক কার্যকরী মাধ্যম। দেশের জনসাধারণের কাছে বার্তা পৌছানোর কৃতিত্বে রেডিও অদ্বিতীয়। রেডিওর প্রচারের ব্যাপ্তি সারা দেশ জুড়ে। দেশের শতকরা ৯০ জনেরও বেশি মানুষের কাছে রেডিও-র বার্তা পৌছায়। ভারতের সমস্ত ভাষা এবং উপভাষায় রেডিও সংবাদ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান প্রচার করে। খরচের হিসাবেও রেডিও সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে। গ্রাম নির্ভর ভারতের সাধারণ মানুষের আদর্শ মাধ্যম—রেডিও।

জন-সংযোগের কাজে বহিস্থ পাবলিকের কাছে বার্তা পৌছানোর জন্য গণমাধ্যম ব্যবহার করা হয়। কখনও কখনও, বিশেষ পরিস্থিতিতে আভ্যন্তরীণ পাবলিককে জানানোর জন্যও গণমাধ্যম ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৫.৬ জন সম্পর্কের বিশেষ মাধ্যম

জন সম্পর্কের উদ্দেশ্যে গণমাধ্যম ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বেশি ক'রে নির্ভর করা হয় সংস্থার নিজস্ব সৃষ্ট বিশেষ মাধ্যমের উপর। জন সংযোগের এই বিশেষ মাধ্যমগুলি গণমাধ্যমের মতো সর্বসাধারণের কাছে পৌছায় না। সংস্থার নির্দিষ্ট, চিহ্নিত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে সংস্থার বার্তা বহন করে। সংস্থার বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য গণমাধ্যম ব্যবহার করা হয় তবে জনসংযোগের জন্য বিভিন্ন রকমের বিশেষ মাধ্যম সৃষ্টি করা হয়। হাউস জার্নাল, ব্রোশিয়োর, প্রদর্শনী, বিশেষ অনুষ্ঠান, পোষিত (sponsored) কর্মসূচী, ফিল্ম ও ভিডিও—জনসংযোগের বিশেষ মাধ্যম।

জনসংযোগের জন্য মাধ্যম নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পেশাদার জন-সংযোগ আধিকারিক মাধ্যম সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহ করেন। কোন কোন মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে, একটি মাধ্যমের সঙ্গে অপরটির পার্থক্য কী এবং কোন মাধ্যম কেমন ক'রে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সব মাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখে চলা সহজ কাজ নয়। প্রতিটি সংবাদলিপি পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে মাধ্যম নির্বাচন করা প্রয়োজন। একই সংবাদলিপি সকল মাধ্যমের জন্য নয়। কী ধরণের বার্তা ঠিক কোন কোন মাধ্যমে পাঠালে গৃহীত হবে, প্রকাশিত হবে এবং সংস্থার উদ্দেশ্য সাধন হবে, জানা বিশেষ প্রয়োজন। কোনো সংবাদ পাঠানোর আগে বিবেচনা করা প্রয়োজন, সংবাদটি কোন মাধ্যমের উপযুক্ত। জনসংযোগ আধিকারিক বার্তাটির বিষয় এবং গুরুত্ব বিবেচনা করবেন। বার্তাটি সাধারণ দৈনিকপত্রের উপযুক্ত না অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্য সম্পর্কিত সংবাদপত্রের উপযুক্ত। কারণ, প্রতিটি মুদ্রণ মাধ্যমের পাঠকদের চাহিদা অনুযায়ী, বিশেষ ধরণের সংবাদ বিশেষ দৃষ্টিকোণ নিয়ে প্রকাশিত হয়। সব পত্রিকায় একই সংবাদলিপি পাঠিয়ে বিশেষ ফল লাভ হয় না। জন-সংযোগের বিরুদ্ধে মাধ্যমগুলির অভিযোগ, একই বার্তা সব মাধ্যমকে একইভাবে পাঠালে মাধ্যমগুলির অসুবিধা হয়, ফলে বেশির ভাগ বার্তাই প্রকাশ করা সম্ভব হয় না।

জনসংযোগ আধিকারিক-কে সকল মাধ্যম সম্বন্ধে খবরাখবর রাখতে হয়। কোনো মাধ্যমই স্থিতাবস্থায় অবস্থান করে না। জনপ্রিয়তা বা প্রচার সংখ্যা বাড়তেও পারে আবার কমতেও পারে। পাঠক বা দর্শকদের পরিধি বা ব্যাপ্তির-ও ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কাঙ্খিত প্রভাব সৃষ্টির জন্য, জন-সংযোগের দায়িত্বে যিনি থাকেন, তাঁকে এই সব পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতির উপর নিয়মিত লক্ষ্য রাখতে হয়। তবেই মাধ্যম নির্বাচন সফল হয় এবং নির্বাচিত মাধ্যমে প্রচারিত বার্তা অভীষ্ট পাবলিকের কাছে পৌছায় এবং প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

পেশাদার জন-সংযোগ বিশেষজ্ঞ গণমাধ্যম অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিত মাধ্যম এবং নিয়ন্ত্রিত মাধ্যম, এই দুই চরিত্রের মাধ্যমই ব্যবহার করেন। নিয়ন্ত্রিত মাধ্যম—অর্থাৎ সংস্থার নিজস্ব প্রকাশনায় এবং কর্তৃত্বে যে মাধ্যম নিয়ন্ত্রিত এবং প্রকাশিত হয়। নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমের অর্থ যে মাধ্যমের উপর সংস্থার জন-সংযোগ বিভাগের নিয়ন্ত্রণ আছে। জনসংযোগ বিভাগেই স্থির করেন কোন কোন বক্তব্য রাখা হবে, কেমন ভাবে বলা হবে, কখন বলা হবে এবং কাদের বলা হবে। সংবাদপত্র, পত্রিকা, রেডিও বা টেলিভিশন, কোনো গণমাধ্যমে সংস্থার বার্তা প্রচারের জন্য জন-সংযোগ বিভাগের এই রকম নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখা সম্ভব নয়। তাই গণমাধ্যমগুলিকে সংস্থার পক্ষে অনিয়ন্ত্রিত মাধ্যম হিসাবে গণ্য করা হয়।

৫.৬.১ মুদ্রণ মাধ্যম

জন-সংযোগের জন্য নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে মুদ্রণ মাধ্যমের উপর নির্ভরতা অনেক দিনের। কিন্তু, কালক্রমে নিয়ন্ত্রিত মুদ্রণ মাধ্যমের প্রকৃতি, গুরুত্ব, নির্ভরতা এবং উদ্দেশ্যের অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। মূল উদ্দেশ্য অবশ্যই সংস্থার বক্তব্য পেশ ক'রে উদ্দিষ্ট পাবলিকের মনোভাব সংস্থার অনুকূলে নিয়ে আসা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে মুদ্রণমাধ্যম ব্যবহার করা হয়, তার একটি বড়ো অংশ অবশ্যই গণমাধ্যম। কিন্তু জন-সংযোগ বিভাগ বিশেষভাবে নির্ভর করেন সংস্থার নিজস্ব প্রকাশনা বা নিয়ন্ত্রিত মুদ্রণ মাধ্যমের উপর। কারণ, উদ্দিষ্ট শ্রোতা কয়েকটি ছোটো ছোটো চিহ্নিত গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এই বিভিন্ন গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য ক'রে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রিত মুদ্রণমাধ্যম ব্যবহার ক'রে, জন-সংযোগ বিশেষ ফলপ্রসূ করা সম্ভব। এই জ্ঞাপন প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কাছে নির্দিষ্ট বার্তা পৌছানো যায়।

সংস্থার মুদ্রণ মাধ্যমের পারদর্শীতা বহুমুখী। মুদ্রণ মাধ্যম যেমন সংস্থার বক্তব্য প্রকাশ করে, তেমনি, কোনো একটি বিশেষ সমস্যা, কর্মীদের কাছে যুক্তিযুক্ত ভাবে উপস্থাপন করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সংস্থার দৃষ্টিকোণ এবং কর্মীদের দৃষ্টিকোণ একত্রিত ক'রে উপস্থাপন করা হয়।

সংস্থার সাময়িক পত্র (House Journal)

সাময়িক পত্রই জন-সংযোগের নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমগুলির মধ্যে সবথেকে বেশি প্রচলিত। সংস্থার নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমের প্রাচীনতম নিদর্শন—সাময়িক পত্র। বিশ্বের প্রথম কোনো সংস্থা নিয়ন্ত্রিত সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় পৌনে দুশো বছর আগে, আমেরিকায়। কয়েকটি সংস্থার সাময়িক পত্রের প্রকাশনা উনিশ শতকে শুরু হলেও, এখনও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। অনেক সংস্থারই জন-সংযোগের প্রথম পদক্ষেপ—সাময়িক পত্র প্রকাশ।

সংস্থার আভ্যন্তরীণ সাময়িক পত্র প্রকাশ করা হয় আভ্যন্তরীণ পাবলিকের জন্য।

বহিস্থ পাবলিক বা সংস্থার বাইরের পাবলিকের জন্যও বিভিন্ন সংস্থা সাময়িকপত্র প্রকাশ করে থাকেন। সংস্থার কাজকর্ম অনুসারে এই বহিস্থ পাবলিক নানা গোষ্ঠীর হতে পারে।

আভ্যন্তরীণ এবং বহিস্থ পাবলিকের জন্য একই সাময়িক পত্র প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় নয়। আভ্যন্তরীণ পাবলিককে যে যে বিষয়, যে ভাবে এবং যে উদ্দেশ্যে জ্ঞাপন করা প্রয়োজন, সেই বিস্তৃত বিবরণ এবং খুঁটিনাটি তথ্য বহিস্থ পাবলিককে জানানো প্রয়োজন হয় না, এবং অনেক সময় না জানানোই ভালো। সংস্থার ভিতরের দৈনন্দিন কাজের তথ্য সংস্থার বাইরে প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আবার, বহিস্থ পাবলিককে সংস্থা সম্বন্ধে যা জ্ঞাপন করা হয় আভ্যন্তরীণ পাবলিককে তার বিবরণ জানানো যুক্তি যুক্ত না-ও হতে পারে। দুই ধরণের পাবলিকের জন্য দুটি ভিন্ন চরিত্রের সাময়িক পত্র প্রকাশই যুক্তিযুক্ত।

সংস্থার প্রকাশিত সাময়িক পত্র বা হাউস জার্নাল বিভিন্ন আকারের হতে পারে। বেশির ভাগ প্রকাশিত হয় ট্যাবলয়েড আকারে অর্থাৎ সান্ধ্য দৈনিকের আকারে। অথবা, সাধারণ সাময়িক পত্রের আকারে, অর্থাৎ ইন্ডিয়া টুডে বা দেশ পত্রিকার আকারে। পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা, মুদ্রণ পারিপাট্য নানা রকমের হতে পারে। কখনো সাদা-কালোয় আবার কখনো নানা রঙে মুদ্রিত হয়। সবই নির্ভর করে উদ্দিষ্ট গ্রাহকের উপর।

নিউজ লেটার ঃ বেশির ভাগ সংস্থাই পছন্দ করেন নিয়মিত নিউজ লেটার প্রকাশ করা। সাধারণত ট্যাবলয়েড আকারে, নিয়মিত, নির্দিষ্ট দিন অন্তর প্রকাশিত। সংস্থার কর্মীদের কাছে সংস্থার হালফিল কাজকর্মের, সম্প্রসারণের এবং অন্যান্য সংবাদ পৌঁছে দেয় নিউজলেটার। সরল ভাষায়, কর্মীদের বোধগম্য ক'রে সংস্থার নীতি, কোনো কাজের নতুন পদ্ধতি অথবা পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করা হয় নিউজলেটারের মাধ্যমে। এই মাধ্যমে, যে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে জ্ঞাপন করা সম্ভব হয়। নির্দিষ্ট কর্মীর জন্য নির্দিষ্ট সমস্যার ব্যাখ্যা করা বা বোঝানোর সুযোগ পাওয়া যায়। নিয়মিত প্রকাশের ফলে কর্মীরাও পরবর্তী সংখ্যার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করেন, তাঁদের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি জানার জন্য। আভ্যন্তরীণ পাবলিক বা সংস্থার কর্মীদের জ্ঞাপনের জন্য নিউজলেটার অত্যন্ত কার্যকরী মাধ্যম। অনেক সংস্থাই বিভিন্ন শাখার বা উৎপাদন কেন্দ্রের কর্মীদের জন্য বিভিন্ন ভাষায় নিউজলেটার প্রকাশ করেন। এর ফলে নির্দিষ্ট স্থানের কর্মীদের চাহিদা নির্দিষ্টভাবে মেটানো সম্ভব হয়।

সংস্থার প্রকাশিত এই পত্রিকা সংস্থার নিজস্ব বক্তব্য প্রকাশ করার সুযোগ ক'রে দেয়। সংযোগের মাধ্যমে সংস্থার লক্ষ্য পূরণের প্রয়াসে সহায়তা করে। নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট বার্তা জ্ঞাপনের সুযোগ জোগায়। সংস্থার নিজের ভাষায়, নিজের মতো ক'রে, কোনো রকম পরিবর্তন বা বাধা ব্যতিরেকেই বার্তা জ্ঞাপন করা সম্ভব হয় একমাত্র নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমের বা সংস্থার নিজস্ব প্রকাশনার দ্বারা।

যে কোনো সাধারণ পত্রিকার সম্পাদক সব সময় চেষ্টা করেন, কোনো বিষয়ে সংবাদ পরিবেশনের সময়—সংস্থার কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীদের বক্তব্য সমান ভাবে প্রকাশ করতে। সংস্থার নিজস্ব পত্রিকার সম্পাদক জানেন, সংস্থার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করাই তাঁর লক্ষ্য। তিনি সংস্থার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য রূপে কর্মীদের কাছে পেশ করেন। আবার কর্মীরাও জানেন, সংস্থার প্রকাশিত পত্রিকায় সংস্থার পরিচালন কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা, নীতি এবং কোনো বিশেষ বিষয়ে

কর্তৃপক্ষের মতামত জানা যাবে। তাঁদের কাজ, ভবিষ্যৎ উন্নতির কর্মসূচী ও পরিকল্পনা সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষের ভাবনা চিন্তার প্রকাশ এই সব পত্রিকাতেই পাওয়া যায়। ফলে, আগ্রহী শ্রোতার কাছে সার্থক ভাবে জ্ঞাপন করা সম্ভব হয়। নির্দিষ্ট বিষয়ের বক্তব্য পরিবেশন করতে সমর্থ না হলে, কেবল ভাসা ভাসা নানা সংবাদ পরিবেশনা এই প্রকাশনার গুরুত্ব কমিয়ে দেয়। কর্মীরা বিশেষ আগ্রহ বোধ করেন না।

জন-সংযোগ কর্মসূচীর অন্যতম প্রধান কার্যক্রম সংস্থার নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশনা—আভ্যন্তরীণ পাবলিকের উদ্দেশ্যে। জন-সংযোগের কাজের জন্য লেখালেখির বিশেষ দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। আরো প্রয়োজন, সম্পাদনা, ফোটোগ্রাফি, পৃষ্ঠা বিন্যাস (page layout) এবং রূপকল্প (design) বিষয়ে সম্যক জ্ঞান, সাময়িক পত্র প্রকাশের জন্য।

কোনো তথ্য দ্রুত জ্ঞাপন করার প্রয়োজন হলে নিউজলেটারই বেশি কার্যকরী হয়। সাদাসিধে উপস্থাপনের ফলে নিউজলেটারের চরিত্র একটা কাজের মনোভাব, বাস্তবতার প্রভাব সৃষ্টি করে।

সংবাদপত্রের চরিত্র বজায় রাখার জন্যই ট্যাবলয়েড মাপে সংস্থার নিউজলেটার প্রকাশ করা হয়। সংবাদপত্রের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য সাধারণ অঙ্গ সজ্জা এবং সাধারণভাবে মুদ্রিত। সাধারণ কর্মীর উপর এই ধরণের পত্রিকা বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে। আভ্যন্তরীণ পাবলিকের জন্য দামী কাগজে, বহুবর্ণে মুদ্রিত পত্রিকা বিশেষ কার্যকরী হয় না। মনস্তাত্ত্বিক বাধার জন্য পত্রিকাটি তাঁরা অস্বাভাবিক মনে করেন।

পত্রিকা ঃ বহু সংস্থার হাউস জার্নালের সম্পাদক এ-৪ মাপের সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করা পছন্দ করেন। এই মাপটি সাধারণ, গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকার সমগোত্রীয় হওয়ার কারণে, পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য পাঠক গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেন। বিভিন্ন প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। বহিস্থ পাবলিকের জন্য সাময়িক পত্রিকার এই মাপই আদর্শ বলে গণ্য হয়।

দেওয়াল পত্রিকা ঃ বড়ো কারখানায় দেওয়াল সংবাদপত্র একটি আকর্ষণীয় মাধ্যম। কারখানার বিভিন্ন জায়গায় যদি প্রদর্শন ফলক (display board) থাকে, সেখানে বড়ো হরফে মুদ্রিত সংবাদপত্র সেঁটে দিয়ে কর্মীদের বিভিন্ন বিষয়ে জানানো একটি ভালো উপায়। বিশেষ ক'রে, কারখানার দৈনিক কাজের মধ্যে এই সংবাদপত্র পাঠ করা কর্মীদের স্বস্তি দেয়। তবে, বিভিন্ন জায়গায়, অনেক প্রদর্শন ফলক না থাকলে, বেশি সংখ্যক কর্মীর পড়া সম্ভব হয় না। আর, বড়ো বড়ো হরফে মুদ্রিত না হলে কর্মীদের পক্ষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়া সম্ভব নয়।

সংস্থার সমায়িক পত্রের মূল উদ্দেশ্য সংস্থা এবং নির্ধারিত পাবলিকের মধ্যে বোঝাপড়া বা সমঝোতা সৃষ্টি করা। বিশেষ ক'রে আভ্যন্তরীণ পাবলিকের ক্ষেত্রে সংস্থা এবং কর্মীদের বোঝাপড়ার ক্ষেত্র প্রশস্ত করা। কর্মীরা যাতে উপলব্ধি করেন এটি তাঁদেরই পত্রিকা, কর্মীদের নানা কৃতিত্ব বা সাফল্যের সংবাদ, তাঁদের পরিবারের সদস্যদের কৃতিত্ব এবং সাফল্যের সংবাদ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়। কর্মীদের বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের এবং খেলাধুলার সংবাদও ফোটোগ্রাফ সমেত প্রকাশিত হয়। এর ফলে, কর্মীরা পত্রিকাটিকে তাঁদের নিজেদের পত্রিকা হিসাবে গণ্য, অনুভব এবং বিশ্বাস করতে সমর্থ হন। ফলে, পত্রিকায় প্রকাশিত সংস্থার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলির প্রভাব সৃষ্টি করা সহজতর হয়।

পুস্তিকা (Brochure) ঃ সংস্থা সম্বন্ধে নির্দিষ্ট পাবলিককে বিভিন্ন বিষয় জানানোর জন্য পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। যে কোনো সংস্থার অভ্যর্থনা কক্ষে (Reception) আপনারা বিভিন্ন সংস্থার পুস্তিকা দেখেছেন। এই ধরণের পুস্তিকা বিভিন্ন বণিক সভার কর্মকর্তা ও সদস্যদের, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে, এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমকে পাঠানো হয়। প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত খবর, যেমন কোথায় কোথায় কারখানা আছে, কোন কারখানায় কী উৎপাদন হয়, উৎপন্ন পণ্যের গুণাগুণ এবং বিভিন্ন ব্যবহার, সংস্থার আর্থিক সাফল্য, কর্মী সংখ্যা, রপ্তানি, মোট আয়, ইত্যাদির সংবাদ পরিবেশন হয়। মূল লক্ষ্য—পুস্তিকাটি পাঠ ক'রে সংস্থার বিভিন্ন কাজ, অগ্রগতি ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক ধারণা গড়ে ওঠে।

পুস্তিকা নানা ধরণের হতে পারে। সংস্থার সার্বিক পরিচয় জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই বেশির ভাগ পুস্তিকা পরিকল্পনা

এবং প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েও পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। বড়ো বিপণন সংস্থার কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য পুস্তিকা, সংস্থার তৈরি কোনো জিনিসের পরিষেবার সুবিধার জন্য গ্রাহকদের পুস্তিকা এবং যে সব সংস্থার দেশের বিভিন্ন জায়গায় উৎপাদন কেন্দ্র বা বিপণন কেন্দ্র আছে, তাঁদের কর্মীদের অবগতির জন্য সংস্থার নীতি, নিয়মকানুন, কর্মপদ্ধতি বোঝানোর জন্য পুস্তিকা।

পুস্তিকার আকার, এবং মুদ্রণ পরিপাট্য সম্বন্ধে কোনো পূর্বনির্ধারিত সূত্র থাকে না। সংস্থার আকার, কাজ কর্মের গুরুত্ব, সাফল্য এবং নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুসারেই পুস্তিকার রূপকল্প এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার মান স্থির করা হয়।

কখনো কখনো সংস্থার ইতিহাস বা বিবর্তন অথবা সংস্থার প্রতিষ্ঠাতার জীবনী এবং কৃতিত্ব পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়। এই পুস্তিকার আকার অর্থাৎ পৃষ্ঠা সংখ্যা বেশি হয়। সাধারণ পুস্তকের আকারও ধারণ করে। এই পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশের আর্থিক দায়ভার সংস্থাই বহন করেন। প্রকাশক হিসাবে কোনো প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকের নাম থাকলেও সংস্থাই প্রকাশনার ব্যয় বহন করেন।

৫.৬.২ প্রদর্শনী

যে কোনো সংস্থার পক্ষেই সংস্থার তৈরি জিনিস বাইরের লোককে প্রদর্শন করা বিশেষ প্রয়োজন। যতো বেশি লোক সংস্থার তৈরি জিনিস সম্পর্কে জানতে পারেন, সংস্থার পক্ষে ততই ভালো।

সব সংস্থারই নিজস্ব কতকগুলি স্থায়ী প্রদর্শনীর জায়গা আছে। সংস্থার মূল কার্যালয়ে অভ্যর্থনা কক্ষ আছে। বিভিন্ন কারখানা এবং শাখা অফিসেও অতিথি এবং পরিদর্শকদের অপেক্ষা করার জায়গা আছে। এই অভ্যর্থনা কক্ষগুলি সাধারণত সংস্থার জিনিস প্রদর্শন করার স্থান হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কী কী জিনিসের প্রদর্শনী হবে, কী ভাবে প্রদর্শনী হবে—জন-সংযোগ বিভাগ তার পরিকল্পনা করেন। নিয়মিত দেখভাল করেন। প্রদর্শনের গতানুগতিকতা পরিবর্তনের জন্য মধ্যে মধ্যে নতুন ক'রে সাজানো হয়। নিয়মিত অতিথি নতুন প্রদর্শনী দেখে মুগ্ধ হন এবং সংস্থার জিনিসের প্রতি আগ্রহ বোধ করেন। এই সবই সংস্থার "সমগ্র" জনসংযোগ পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে গণ্য হয় এবং একই মূল বার্তা জ্ঞাপন করে।

প্রদর্শনীর আরো বিস্তৃত ক্ষেত্র—বিভিন্ন বাণিজ্যমেলা এবং অন্যান্য প্রদর্শনী। কোনো প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের সময় সংস্থার বিপণন বা জিনিস বিক্রিই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যে কোনো প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ সংস্থার জন-সংযোগের জ্ঞাপন প্রক্রিয়ার বিশেষ সহায়ক। প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণকারীর জন সংযোগের লক্ষ্য ঃ

১. সংস্থা সম্বন্ধে নির্দিষ্ট ধারণা (perception) প্রতিষ্ঠা করা এবং বজায় রাখা।

২. গুরুত্বপূর্ণ বিশিষ্ট জনের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার।

৩. সংস্থার বিভিন্ন কাজকর্মের সার্বিক পরিচয় বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরা।

৪. সংস্থার সম্বন্ধে আরো বেশি জানার ইচ্ছা জাগিয়ে তোলার পটভূমি সৃষ্টি করা।

৫. সংস্থার কর্মকৌশল নির্ণয়ের জন্য প্রতিবার্তা সংগ্রহ করা।

প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ এবং প্রদর্শনীর পরিকল্পনার মূল সূত্র—মেলায় ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত দর্শক যেন সংস্থার প্রদর্শনীটি দেখতে আগ্রহ বোধ করেন। সাধারণত দক্ষ প্রদর্শনী বিশেষজ্ঞকে দিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। কিন্তু পরিকল্পনার মূল সূত্র এবং বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় স্থির করেন সংস্থার জন-সংযোগ বিভাগ।

যে কোনো প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণই যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। বিদেশে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ আরো বেশি ব্যয় সাধ্য। প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণের জন্য জায়গার মাপ হিসাবে উদ্যোক্তাদের টাকা দিতে হয়। তারপর, সেই জায়গাটি বিশেষভাবে সাজানো, আলোর ব্যবস্থা, এবং অন্যান্য কোনো বিশেষ চমক দেওয়ার পরিকল্পনা থাকলে তার ব্যবস্থা এবং খরচ। প্রদর্শনীর জিনিস মেলায় নিয়ে আসা এবং মেলার শেষে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা এবং খরচ। প্রদর্শনীর

দর্শকদের বিতরণের জন্য পুস্তিকা এবং অন্যান্য প্রচারপত্রের পরিকল্পনা এবং মুদ্রণ। দর্শকদের সঙ্গে কথা বলার জন্য সংস্থার কর্মীদের হাজিরা। সব মিলে, প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ বিশেষ খরচ সাপেক্ষ। তবুও, প্রদর্শনী বিশেষ ফলপ্রসূ। সংস্থার কাজকর্ম এবং পণ্য সংক্রান্ত কোনো বিশেষ নির্বাচিত প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করলে সংস্থার নির্দিষ্ট, চিহ্নিত পাবলিকের সামনে সংস্থার কাজকর্মের পরিচয় এবং বিভিন্ন পণ্যের উপস্থাপন করা সম্ভব হয়।

প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ জন-সংযোগ বিভাগের পক্ষে এক বিশেষ সুযোগ। প্রদর্শনীর আগে থেকেই সংস্থার বিভিন্ন গ্রাহক এবং বহিস্থ পাবলিককে জানানো হয়—সংস্থা ঐ বিশেষ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করছেন। প্রদর্শনীর তারিখ, সময়সূচী জানিয়ে পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হয়। ফলে, বহিস্থ পাবলিকের নিকট সংস্থার ভাবমূর্তি তৈরির পথ সুগম হয়।

একই ভাবে, বিভিন্ন গণ মাধ্যমকে অনুরোধ করা হয় পরিদর্শনের জন্য। গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের পরিদর্শনের সময় তাঁদের বিভিন্ন প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়ার ব্যবস্থা করা জন-সংযোগ বিভাগেরই কর্তব্য। সংবাদ লিপি এবং ফোটোগ্রাফ দিয়ে তাঁদের কাছে বক্তব্য পেশ করা। সংবাদ মাধ্যমের পরিদর্শন ব্যতীত অন্যান্য সকল মাধ্যমকে সংবাদ লিপি পাঠিয়ে এই বিষয়ে জ্ঞাপন করা সম্ভব হয়। কোনো সাংবাদিক কোনো বিশেষ বিষয়ে বিশদ বিবরণ জানতে চাইতে পারেন, ফোটোগ্রাফও চাইতে পারেন। আবার, কারখানা পরিদর্শনের সুযোগও চাইতে পারেন। এর জন্য প্রস্তুত থাকা এবং দ্রুত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আগ্রহ কমে যাওয়ার আগেই সুযোগ কাজে লাগাতে হয়।

৫.৬.৩ বিশেষ ঘটনা/অনুষ্ঠান

সব সংস্থাই সময় সময় বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করেন। কখনো কখনো বিশেষ ঘটনা ঘটে বা কোনো অনুষ্ঠান হয়। যেমন, একটি কারখানার বিশেষ সম্প্রসারণ বা সংযোজন। অথবা, কোনো নতুন কারখানার উদ্বোধন। কোনো বিদেশি প্রতিনিধি বা সাংসদদের অথবা বিধায়কদের কয়েকজনের কারখানা পরিদর্শন। সত্য বলতে কী, বিশেষ ঘটনার সম্ভাবনা সংখ্যাতীত। যে কোনো ঘটনাই, জন-সংযোগের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, সংস্থার জন-সংযোগের সুযোগেরই নামান্তর। সংস্থার জন-সংযোগের উদ্দেশ্যে, কোনো বিশেষ ঘটনা কী ভাবে প্রচার করা হবে সে বিষয়ে পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। ঘটনাবলীর প্রচারে এমন ধারণা সৃষ্টি করা যায়—সংস্থার অনেক রকমের অনেক কাজ হচ্ছে। আবার, সংস্থার নাম বার বার জনসমক্ষে উপস্থিত করার সুযোগও পাওয়া যায়।

৫.৬.৪ স্পনসরড বা পোষিত কর্মসূচী (Sponsored Programme)

যে কোনো কর্মসূচী, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার বা কর্মশালা আয়োজন করা খরচ-সাপেক্ষ। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা বিভিন্ন সংস্থাকে অনুরোধ করেন নির্দিষ্ট কর্মসূচীর ব্যয়ভার বহন করার জন্য। কোনো সংস্থার অর্থানুকূল্যে অনুষ্ঠিত কর্মসূচীই পোষিত কর্মসূচী বা Sponsored Programme. অর্থাৎ, এক বা একাধিক সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত কর্মসূচী।

বিভিন্ন সংস্থা অন্যের আয়োজিত কর্মসূচীর পৃষ্ঠপোষকতা করেন সংস্থার নাম প্রচার করার জন্য এবং ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য। পণ্য উৎপাদন এবং বিক্রি ব্যতিরেকে, সংস্থাটি সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন এই ভাবমূর্তি জনসমক্ষে উপস্থাপনের জন্যই পৃষ্ঠপোষকতা। বিভিন্ন গণমাধ্যমে, সংবাদপত্র, টেলিভিশন ইত্যাদিতে অবাধ প্রচারের সুযোগ পাওয়া যায়। অনুষ্ঠান পৃষ্ঠপোষকতা সংস্থার তিনটি উদ্দেশ্য সাধন করে। বিপণনের সহায়ক হয়, বিজ্ঞাপন হিসাবে কাজ করে, আবার জনসংযোগের ভূমিকাও পালন করে। প্রকৃতপক্ষে, উদ্দেশ্যগুলি একে অপরের সঙ্গে সংপৃক্ত। মূলত, বিজ্ঞাপন এবং জন-সংযোগ হিসাবেই অনুষ্ঠান পৃষ্ঠপোষকতা গণ্য হয়।

জন-সংযোগের নিরিখে, পোষিত কর্মসূচীর দ্বারা যে কোনো সংস্থা নানাভাবে লাভবান হন।

সংস্থার ভাবমূর্তি ঃ পোষিত কর্মসূচী সংস্থাকে একটি দায়বদ্ধ, সমাজ সচেতন সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর পৃষ্ঠপোষকতা সংস্থাকে নির্দিষ্ট পাবলিকের মনে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। অনুষ্ঠানের প্রভাবের ব্যাপ্তি হিসাবে ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপ্তিও বৃদ্ধি পায়। যেমন, কলকাতার কয়েকটি কলেজের মধ্যে বিতর্ক সভার পৃষ্ঠপোষকতা কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রভাব বিস্তার করে। আবার, একদিনের ক্রিকেট ম্যাচ বা টেস্ট ম্যাচ-এর পৃষ্ঠপোষকতা সংস্থাকে সারা দেশে ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপ্তি এনে দেয়।

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি ঃ পোষিত কর্মসূচীর অনুষ্ঠানের জায়গায় সংস্থার নাম, লোগো এবং সংস্থার নির্দিষ্ট রং বার বার প্রদর্শিত হওয়ার ফলে প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি বিস্তৃত হয়। সংস্থার নাম বারবার লোক চক্ষে এবং বিভিন্ন মাধ্যমে প্রদর্শনের ফলে, পাবলিকের কাছে পরিচিতি বাড়ে।

বোঝাপড়া ঃ বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে সংস্থা এবং পাবলিকের মধ্যে বোঝাপড়ার পথ প্রশস্ত হয়।

গণমাধ্যমে প্রচার ঃ যে কোনো পোষিত কর্মসূচীর পৃষ্ঠপোষক সংস্থার পক্ষে সবচেয়ে বড়ো লাভ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার। পোষিত অনুষ্ঠানের সংবাদ এবং বিবরণের সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী ভাবেই পৃষ্ঠপোষকের নাম এসে যায়। টেলিভিশনেও পৃষ্ঠপোষক সংস্থার নাম এবং লোগো বার বার প্রদর্শিত হয়। পৃষ্ঠপোষকতার খরচের তুলনায় সংস্থা অনেক বেশি লাভবান হয়। রেডিও এবং টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন খেলার ধারাবিবরণীও পৃষ্ঠপোষকতা করেন নানা সংস্থা। পোষক সংস্থার নাম বার বার উল্লেখ করা হয়। "এই অনুষ্ঠানটির নিবেদক .... সংস্থা"। আর, টেলিভিশনেতো সংস্থার নাম এবং লোগো বার বার দেখানো হয়। রেডিও এবং টেলিভিশনে অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক সংস্থাকে বিজ্ঞাপনের জন্যও কিছু সময় নির্ধারণ ক'রে দেওয়া হয়। পোষিত কর্মসূচীর কল্যাণে পৃষ্ঠপোষক সংস্থা বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপনও প্রচার করতে সমর্থ হন। কোনো অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতার আগে দেখা দরকার সংস্থার পণ্যের ব্যবহারকারীদের কী ধরণের কর্মসূচী বা অনুষ্ঠানে আগ্রহ আছে। যথাযথ ভাবে অনুষ্ঠান বা কর্মসূচী নির্বাচন ক'রে পৃষ্ঠপোষকতা করা হলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

পোষিত কর্মসূচী নানা রকমের হতে পারে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান, পুরস্কার ঘোষণা এবং বিতরণ, পুস্তক প্রকাশ, খেলাধূলা এবং আরো যে কোনো অনুষ্ঠান পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিবেচিত হতে পারে।

৫.৬.৫ চলচ্চিত্র

টেলিভিশনের ব্যাপক ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণের জন্য, এই দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম এবং টেলিভিশনে প্রচারিত চলচ্চিত্র সম্পর্কে জন-সংযোগ কর্মীদের বিশেষ সজাগ হওয়া প্রয়োজন। এই মাধ্যম শব্দ ও ছবির সমন্বয়ে এক অনবদ্য প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম। যে কোনো বিষয়, ঘটনা, কর্মসূচী এবং উৎপাদন কৌশলও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন পাবলিকের কাছে উপস্থাপন করা সম্ভব। আর, বিভিন্ন কাজকর্ম চোখে দেখার অর্থ বিশ্বাস করা।

সংস্থার বাইরের পাবলিকের কাছে সংস্থার সার্বিক চিত্র উপস্থাপনের জন্য চলচ্চিত্র বিশেষ সহায়ক। জন-সংযোগ আধিকারিক চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সহযোগিতায় সংস্থার চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। সংস্থার বক্তব্য এবং মূল উদ্দেশ্য বিবেচনা ক'রে চিত্রনাট্য রচনা করা হয়। চিত্র গ্রহণ, সম্পাদনা সবকিছুই হয় জন-সংযোগের তত্ত্বাবধানে।

টেলিভিশনের অনেক চ্যানেল হওয়ায় জন-সংযোগের বর্তমানে অনেক সুযোগ হয়েছে। চলচ্চিত্রের মূল আবেদন, কোনো ধারণা বোঝানোর উপায়, কল্পনা এবং আনন্দ উদ্দীপিত করা, সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করার জন্য আবেদন সৃষ্টি করায় চলচ্চিত্র বিশেষ পারদর্শী। জন-সংযোগের উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্রের কলাকৌশল টেলিভিশনের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জন-সংযোগের বিশেষ সুবিধা ঃ

১. দৃশ্য, শব্দ, নাটক, চলমান ছবি, বিভিন্ন রং এবং সঙ্গীতের সমন্বয়ে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি।

২. মুদ্রণ মাধ্যমে বা শ্রাব্য মাধ্যমে সম্ভব নয়, চলমান, গতি সহযোগে ধারণার উপস্থাপন।

৩. চলচ্চিত্র দেখার সময় দর্শকের একাগ্র মনোযোগ।

৪. ঘটনাবলীর বিশ্বাসযোগ্য উপস্থাপন।

৫. উৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া প্রদর্শন, যা খালি চোখে দেখা সম্ভব নয়, ক্লোজ-আপ-ও দেখানো সম্ভব।

৬. অতীত ঘটনার কৃতিত্ব এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বন্ধে দর্শককে ওয়াকিবহাল করা।

৭. ফোটোগ্রাফি এবং গ্রাফিকস্-এর সাহায্যে যে কোনো জিনিস বড়ো ক'রে অথবা ছোটো ক'রে, বা বিশেষ ক'রে দেখানো সম্ভব।

৮. আর—দেখা মানেই তো বিশ্বাস করা।

জন-সংযোগের উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্রের ব্যবহার এবং গুরুত্ব ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংস্থার চলচ্চিত্র কর্মচারীদের দেখানো হয়। সংস্থায় নতুন যোগদানকারী শিক্ষানবিশদের সংস্থা সম্বন্ধে জানানো হয় চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের সংস্থার কাজকর্ম বোঝানোর জন্য চলচ্চিত্র দেখানো হয়। বিভিন্ন প্রদর্শনীর দর্শকদের সংস্থার চলচ্চিত্র দেখানো হয়।

৫.৬.৬ জন-সংযোগের বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপন সূচিত হয়েছিল বিপণনের হাতিয়ার হিসাবে। বিজ্ঞাপনের কার্যকারীতা লক্ষ্য ক'রে জন-সংযোগের হাতিয়ার হিসাবেও বিজ্ঞাপনের ব্যবহার হচ্ছে। ব্যয় সাপেক্ষ হলেও, জন-সংযোগের উদ্দেশ্য সাধনে বিজ্ঞাপন বিশেষ কার্যকরী।

জন সংযোগের জন্য বিজ্ঞাপন একাধিক নামে অভিহিত। "প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপন" (institutional advertising)। "জনসেবামূলক বিজ্ঞাপন" (public service advertising) "পরিচিতির বিজ্ঞাপন" (identity advertising) এবং "পরামর্শদাতার বিজ্ঞাপন" (advocacy advertising)

বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যে কোনো সংস্থা তার নির্দিষ্ট পাবলিককে সংস্থার বক্তব্য জানাতে সক্ষম। সংস্থার প্রয়োজন অনুসারে সংস্থার বক্তব্য নির্দিষ্ট পাবলিকের কাছে পৌঁছে দেয় বিজ্ঞাপন। সংস্থার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিজ্ঞাপন তৈরি হয়, সংস্থা যে ভাবে চান ঠিক সেই ভাবেই, নির্বাচিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, অথবা রেডিও এবং টেলিভিশনে নির্ধারিত দিনে এবং সময়ে প্রচারিত হয়।

জন-সংযোগ বিজ্ঞাপন অত্যন্ত খরচ সাপেক্ষ। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন সংস্থা, এমনকী অনেক সরকারি সংস্থাও ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং প্রচারের জন্য জন-সংযোগ বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করছেন। বড়ো বড়ো সংস্থা যেখানে বহু কর্মী নিযুক্ত এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাঁদের কর্মকান্ড বিস্তৃত, সেই সব সংস্থার স্পষ্ট ছবি সাধারণ মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। এমনকী, যে সব কর্মীরা ঐ সংস্থায় কাজ করেন, তাঁদেরও নিজেদের কর্মকেন্দ্র ব্যতীত সংস্থা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকে না। এই সব সংস্থাকে আলাদা ক'রে চিহ্নিত করার মতো কোনো মুখচ্ছবি পাবলিকের কাছে, সংস্থার ভিতরের এবং সংস্থার বাইরের, উভয় পাবলিকের কাছেই স্পষ্ট নয়। জন-সংযোগ বিজ্ঞাপন সংস্থার সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরে, সম্যক পরিচয় জানতে সহায়তা করে।

৫.৭ মাধ্যম সম্পর্ক

জন-সংযোগ পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তির বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত হয় বিভিন্ন গণ মাধ্যমের সঙ্গে সম্পর্ক বা বোঝাপড়া গড়ে তোলার এবং বজায় রাখার প্রয়াসে। গণমাধ্যমের সাংবাদিক এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে জন-সংযোগ আধিকারিকের সম্পর্কের উপরেই তাঁর সাফল্য নির্ভর করে। যে কোনো জন-সংযোগ আধিকারিকের সবচেয়ে মূল্যবান পরিসম্পৎ (asset) সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। পারস্পরিক বিশ্বাস এবং কাজের সুবিধার ভিত্তির উপর জন-সংযোগ পেশাদার এবং সাংবাদিকদের সম্পর্ক গঠিত।

জন-সংযোগ পেশায় সফল হওয়ার জন্য পেশাদারকে তাঁর সংস্থার কর্তৃপক্ষের আস্থাভাজন হতে হবে এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন মাধ্যমেরও আস্থাভাজন হতে হবে। কাজটি মোটেই সহজ নয়। জন-সংযোগ পেশাদার প্রকৃতপক্ষে মাঝখানে পড়ে গেছেন। একদিনে তাঁর সংস্থা, অপরদিকে বিভিন্ন গণমাধ্যম। আর, সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য এবং জনসংযোগ আধিকারিকের উদ্দেশ্য বিপরীতমুখী। সকল সংস্থারই উদ্দেশ্য সংস্থার পক্ষে হিতকারী, ইতিবাচক বিভিন্ন সংবাদ গণমাধ্যমে নিয়মিত প্রচারিত হোক। কিন্তু সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য এমন সংবাদ প্রচার করা যে সংবাদ জানতে তাঁদের পাঠক, দর্শক এবং শ্রোতা বিশেষ আগ্রহী। আপনারা জানেন, এমন সংবাদ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সুখপ্রদ হয় না। এই বিচিত্র, বিরোধী লক্ষ্যের সম্পর্ক জনসংযোগের সূচনাকাল থেকে আজও চলছে। একে অপরের উপর নির্ভর করে আসছেন। কখনো সংঘাতের মধ্যে কখনো বা পরস্পরের স্বার্থরক্ষার জন্য বোঝাপড়ায়। এই টানা পোড়েনের মধ্যে জন-সংযোগ আধিকারিকের ভূমিকা অনেক ক্ষেত্রেই মধ্যস্থতার ভূমিকায় পরিণত হয়।

এই সংঘাতের মূল কিন্তু একেবারেই অযৌক্তিক নয়। সাংবাদিকের মূল উদ্দেশ্য বিভিন্ন ঘটনা উদঘাটন করা, পাঠক এবং দর্শকদের আগ্রহ এবং উত্তেজনা জাগানো সংবাদ প্রকাশ করা। বিভিন্ন সংস্থার অনেক সংবাদই সাংবাদিকদের এই উদ্দেশ্য সাধন করে। পাঠকের বা দর্শকের সন্তুষ্টি বিধান হলে মাধ্যমের প্রচার সংখ্যা বাড়ে। প্রচার সংখ্যা বাড়লে মাধ্যমের আর্থিক উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়। আবার, যে কোনো সংস্থার উদ্দেশ্য সংস্থার বিভিন্ন কর্ম সংক্রান্ত ইতিবাচক সংবাদ বিভিন্ন মাধ্যমে নিয়মিত প্রকাশ করা। যেহেতু দুই পক্ষই সর্বদা একে অন্যের উদ্দেশ্য সাধনে বাধা সৃষ্টি করে, দুই পক্ষই একে অন্যের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলে। সাংবাদিকদের অভিযোগ—

১. জন-সংযোগ পেশাদার স্বাভাবিক ভাবে সংবাদ সংগ্রহে বাধা সৃষ্টি করে এবং সংবাদকে অতিরঞ্জিত করে।

২. বিনা খরচে, প্রায় সংস্থার বিজ্ঞাপনের মতো সংবাদ প্রকাশ করতে চায়।

৩. সব সময়েই বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে অনুপ্রবেশের জন্য প্রভাব সৃষ্টি করে।

৪. মাধ্যমের চাহিদা বিষয়ে অজ্ঞতা। সংবাদ কী, সংবাদের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন, সে বিষয়ে কোনো ধারণা নেই।

এবারে দেখা যাক, জন-সংযোগ আধিকারিকের অভিযোগ কী কী—

১. পরিবর্তনশীল সমাজে, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সংবাদ প্রকাশে অনাগ্রহ। গতানুগতিক রাজনৈতিক সংবাদকেই গুরুত্ব প্রদান।

২. সংবাদ সম্পর্কে মাধ্যমের ধারণা পরিবর্তনের শ্লথ গতি। উত্তেজনা মূলক সংবাদের উপরেই নির্ভরতা। সামাজিক এবং উন্নয়নশীল সংবাদের উপর গুরুত্ব না দেওয়া।

৩. সূত্র বিচার ক'রে, সংবাদের মূল্যায়ন করা। সংবাদ বা সংবাদের গুরুত্ব বিচার ক'রে নয়।

৪. সৎ, সহযোগী, যোগ্য জন-সংযোগ কর্মী এবং অযোগ্য পদাধিকারীর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে অসমর্থ।

সংস্থা এবং মাধ্যম দুই পক্ষের উদ্দেশ্যের পার্থক্যই এই বিচিত্র, অম্লমধুর সম্পর্কের কারণ। এই সূত্রে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। সাংবাদিক বলতে কেবল যিনি সংবাদ সংগ্রহ করেন, তাঁকেই বোঝায় না। কোন সংবাদটি প্রকাশিত হবে অথবা হবে না, এই সিদ্ধান্ত যিনি নেন তিনিও সাংবাদিক। তাঁর একটি অন্য ভূমিকাও আছে। "দ্বার রক্ষক"-এর (gate keeper) ভূমিকা। সংবাদ নির্বাচন এবং সংবাদ প্রকাশের গুরুত্ব নির্ধারণ করেন বিভিন্ন সম্পাদনার দায়িত্বে রয়েছেন যে সাংবাদিক, তিনিই। জন-সংযোগ পেশাদারের কাছে, যে কোনো মাধ্যমে এই দায়িত্ব প্রাপ্ত সাংবাদিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

মাধ্যমের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, কেবল তাৎক্ষণিক কোনো প্রচারের উদ্দেশ্যে না হয়ে, যদি পারস্পরিক বোঝাপড়ার উপর ভিত্তি ক'রে হয়, তাহলে সংস্থা এবং মাধ্যম, দুই তরফের পক্ষেই সুবিধাজনক হয়। পারস্পরিক আস্থা গড়ে উঠলে, মাধ্যম তার সংবাদের অন্যতম সূত্র হিসাবে সংস্থার জন-সংযোগ আধিকারিককে গণ্য করে। এর ফলে সংস্থা প্রয়োজনীয় প্রচারের সুযোগ পায়। জন-সংযোগ পেশাদারের লক্ষ্য দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলা।

গণমাধ্যমের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার কতকগুলি মূল সূত্র আছে।

সোজাসুজি বলুন ঃ মাধ্যমের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর একেবারে সোজাসুজি দেওয়াই ভালো। মনে রাখতে হবে, সাংবাদিকরা বিভিন্ন সূত্র থেকে, নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সংবাদ সংগ্রহে পারদর্শী এবং দক্ষ। তাঁদের কোনো প্রশ্নের উত্তর সোজাসুজি না দিলে তাঁরা ঠিকই বুঝতে পারবেন। প্রশ্নের উত্তর এড়াতে চাইলেও তাঁরা বুঝতে পারবেন এবং আরো সন্দীহান হবেন। হয়তো বা নিশ্চিতও হবেন, যে সংবাদ তিনি সংগ্রহ করেছেন সেটিই সঠিক, বাস্তব ঘটনা। পাঠকদের বা দর্শকদের আগ্রহ বিবেচনা ক'রে তিনি সেই সংবাদ প্রকাশ করবেন, সংস্থার পক্ষে অসুবিধাজনক হলেও। কাজে কাজেই, সোজা উত্তর দেওয়াই ভালো। পরিষ্কার উত্তর পেলে, জন-সংযোগ আধিকারিকের সততায় প্রশ্নকারী সাংবাদিক মুগ্ধ হবেন এবং প্রকাশিত সংস্থার অসুবিধাজনক বিষয় নরম সুরেও বলতে পারেন।

জন-সংযোগ আধিকারিকদের রচনায় সাধারণত অতিশয়োক্তি থাকে, সংস্থার কৃতিত্ব উজ্জ্বল ক'রে দেখানোর জন্য। লেখার মধ্যে এই সব কারিকুরি সাংবাদিকরা সহজেই ধরতে পারেন এবং লেখাটি বাতিল হয় অথবা, কাটছাঁট ক'রে সামান্য অংশই প্রকাশিত হয়। সাংবাদিকের এবং মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে যদি সংবাদ রচনা করা হয়, তাহলে, প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

আর একটি বিষয়, কোনো সংবাদ কখনোই একটি বা দুটি মাত্র সংবাদ মাধ্যমে পাঠানো উচিত নয়। যে মাধ্যমগুলি বাদ পড়েন, তাঁরা অসন্তুষ্ট হন। সাধারণ সংবাদ সকল সংবাদপত্র এবং গণমাধ্যমকে একযোগে পাঠানো প্রয়োজন। আরো নজর রাখা প্রয়োজন সব মাধ্যমই যেন মোটামুটি একই দিনে সংবাদটি পান। তবে, কোনো বিশেষ বিচার বা অন্য ধরণের বিশেষ রচনা নির্বাচিত একটি বা দুটি মাধ্যমের সাহায্যে প্রচার করা যেতে পারে।

কাজে লাগুন ঃ অর্থাৎ, সাংবাদিকদের কাজে লাগুন। তাঁদের প্রয়োজন মতো, সংবাদ যে রকম ভাবে পেলে তাঁদের সুবিধা হবে, সেই রকম ভাবে বিভিন্ন সংবাদ পাঠালে, ক্রমশই তাঁরা আপনার উপর নির্ভর করতে শুরু করবেন। আপনাকে তাঁদের বিভিন্ন সংবাদের উৎস হিসাবে গণ্য করবেন। মাধ্যমের এবং সাংবাদিকদের সংবাদের সূত্র হিসাবে নিজেকে একবার প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হলে, আপনার পাঠানো সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে। আর একটি কথা, সাংবাদিকরা সর্বদাই সময়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে সংবাদ সংগ্রহ এবং প্রচার করেন। প্রয়োজন হলে, যে কোনো দিন, যে কোনো সময় তাঁরা জন-সংযোগ আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। তাঁদের সঙ্গে সকল সময়, সকল অবস্থাতেই সহযোগিতা করা অবশ্য প্রয়োজন। তবেই সাংবাদিকরা জন-সংযোগ আধিকারিককে তাঁদের একজন হিসাবে গ্রহণ করবেন এবং নির্ভর করবেন।

অনুনয় নয় ঃ কোনো সংবাদ প্রকাশের জন্য সাংবাদিকদের কাছে অনুনয় করা তাঁদের বিরক্তিই জাগায়, আর

কোনো কাজ হয় না। আরো একটি কথা। সংবাদ প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপন দাতা সংস্থা অনেক সময় মাধ্যমের বিজ্ঞাপন বিভাগের দ্বারা সাংবাদিকদের উপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। বলা বাহুল্য, তাঁরা ভুল করেন। সাংবাদিকদের আরো বেশি অসন্তোষ ঘটানোর কারণ হয়। যে কোনো মাধ্যমেই, সংবাদ বিভাগ এবং বিজ্ঞাপন বিভাগ দুটি পৃথক বিভাগ।

বন্ধ করার চেষ্টা নয় ঃ সংস্থার পক্ষে অসুবিধা জনক কোনো ঘটনা যদি কোনো সাংবাদিক জানতে পারেন, মাধ্যমের গ্রাহকদের আগ্রহ বিবেচনা ক'রে তিনি সংবাদটি প্রকাশ করবেন বা করতে চাইবেন। এটাই স্বাভাবিক। অনেক সময়ই জন-সংযোগ আধিকারিক চেষ্টা ক'রে থাকেন ঐ অসুবিধাজনক সংবাদের প্রকাশ বন্ধ করতে। প্রথমে, সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে অনুরোধ করা হয় সংবাদটি না প্রকাশ করতে। সফল না হলে, তাঁর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকেও অনুরূপ অনুরোধ করা হয়। এক্ষেত্রে, জন-সংযোগ আধিকারিক সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের বিরাগ ভাজন হন; যার ফল, শেষ পর্যন্ত, সংস্থার পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়।

এই রকম পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে ঘটনা সম্পর্কে সংস্থার বক্তব্য ভালো ক'রে বোঝানো প্রয়োজন। যুক্তি দিয়ে বোঝাতে সক্ষম হলে, সাংবাদিক তাঁর সংবাদটি সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ করার জন্য, সংস্থার বক্তব্যও সংবাদের অন্তর্ভুক্ত করবেন। জন-সংযোগের উদ্যোগ সফল হবে। ঘটনার বিষয়ে সংস্থার বক্তব্যও প্রকাশিত হওয়ায়, সংবাদটির ক্ষতিকারক প্রভাব অনেকটাই হ্রাস পাবে। সাংবাদিকের সঙ্গে যদি সুসম্পর্ক থাকে, তাহলে, জন-সংযোগ পেশাদারের বক্তব্য শুনে, তিনি হয়তো সংবাদটি প্রকাশ করা থেকে বিরতও হতে পারেন। এক্ষেত্রেও জন-সংযোগ আধিকারিকের উদ্দেশ্য সফল হয়। মূল কথা, সোজাসুজি সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করার চেষ্টা নয়। সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে সংস্থার বক্তব্য বোঝানোই রণকৌশল।

অসংখ্য সংবাদ দিয়ে উত্যক্ত করা নয় ঃ কোনো কোনো সংস্থার জন-সংযোগ আধিকারিক দু'এক দিন অন্তরই বিভিন্ন মাধ্যমকে নানা সংবাদ পাঠাতে থাকেন। তাঁর পাঠানো এই অসংখ্য সংবাদের অধিকাংশেরই কোনো সংবাদমূল্য নেই। এগুলি সাংবাদিকরা কাজে লাগাতে পারেন না, বরং বিরক্ত হন। আরো বিপদের কথা, যে সংস্থা থেকে নিয়মিত অসংখ্য গুরুত্বহীন সংবাদ আসে, সেই সংস্থার পাঠানো সংবাদকে মাধ্যম কার্যালয়ে কেউ গুরুত্ব দেন না। ফলে, যখন কোনো যথার্থ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ঐ সংস্থা থেকে আসে, সেটির প্রতিও যথোচিত মনোযোগ দেওয়া হয় না। নিয়মিত পাওয়া আর একটি "অসার" সংবাদ বিবেচনা ক'রে বাতিল করা হয়। সংবাদের গুরুত্ব বিবেচনা ক'রে, অবশ্যই পাঠক বা দর্শকদের আগ্রহের নিরিখে বিবেচনা ক'রে, মাঝে মাঝে সংবাদ পাঠালে সেটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয় এবং প্রকাশিত হয়। সাফল্য লাভে ইচ্ছুক জন-সংযোগ আধিকারিকের অবশ্যই এটি জানা থাকা দরকার।

আসল কথা, মাধ্যমের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়, লালন করতে হয়, বিশ্বাস অর্জনের দ্বারা।

জন-সংযোগ পেশাদারের জন্য নির্দেশাবলী ঃ

১. জন সাধারণের আগ্রহ বিবেচনা ক'রে বক্তব্য রাখুন। কেবল আপনার সংস্থার বক্তব্যই নয়।

২. সম্ভব হলে, ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলুন এবং অন্তরঙ্গ ভাবে কথা বলুন।

৩. এমন কোনো বক্তব্য রাখবেন না, যা আপনি চান না প্রকাশিত হোক।

৪. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শুরুতেই পরিবেশন করুন।

৫. সাংবাদিকদের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হবেন না। মাথা ঠান্ডা রাখুন।

৬. সাংবাদিকদের কোনো প্রশ্নে যদি বিরক্তিকর কোনো শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে, উত্তর দেওয়ার সময় সেই শব্দগুলি পুনরুক্তি করবেন না।

৭. সাংবাদিক যদি সোজাসুজি কোনো প্রশ্ন রাখেন, আপনিও একেবারে সোজাসুজি উত্তর দিন।

৮. কোনো প্রশ্নের উত্তর যদি জন-সংযোগ আধিকারিকের জানা না থাকে, তাহলে বলতে হবে—"আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে জানাবো।"

৯. যতদূর সম্ভব, নির্ভুল তথ্য জানান।

১০. কোনো তথ্য অতিরঞ্জিত করবেন না।

৫.৮ সাংবাদিক সম্মেলন (Press Conference)

বিভিন্ন মাধ্যমের সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ ক'রে এনে সংস্থার কোনো বক্তব্য বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করাই সাংবাদিক সম্মেলন, প্রেস কনফারেন্স বা প্রেস মিটিং। সংস্থার কোনো বিশেষ কৃতিত্ব, কোনো ঘটনা, কোনো পরিকল্পনা বিভিন্ন গণমাধ্যমকে জানানোর জন্য সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করা হয় অন্যান্য মিটিং-এর মতোই। আমন্ত্রিত সাংবাদিকরা সংস্থার বক্তব্য শোনেন, আলোচনা করেন এবং প্রয়োজন বোধে প্রশ্ন করেন। সংস্থার অফিসে বোর্ড রুম, বা মিটিং রুম-এ অথবা কোনো হোটেলের মিটিং রুমে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। আতিথেয়তার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকে, তবে সেই ব্যবস্থা আড়ম্বরহীন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করা জন-সংযোগ আধিকারিকের কাজ। আর, এই সম্মেলনে যোগ দেওয়া সাংবাদিকদের কাজ। অতিথেয়তার আয়োজনে ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন যাতে কাজের পরিবেশ অক্ষুণ্ণ থাকে।

যে বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হবে সেই বিষয়ে সংবাদলিপি তৈরি রাখতে হবে। কোনো সংবাদ যদি জরুরি হয় এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে, অল্প সময়ের নোটিসেও সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা যেতে পারে। বিষয়ের গুরুত্ব ঠিক ভাবে বোঝাতে পারলে সাংবাদিকরা সম্মেলনে যোগ দেবেন। জন-সংযোগ আধিকারিকদের মনে রাখা প্রয়োজন,—সাংবাদিকরা সম্মেলনে যোগ দেন সংবাদ সংগ্রহের জন্য। ভালো খাদ্য পানীয়ের জন্য নয়। অনেক সময়ই, আতিথেয়তার বাড়াবাড়ি সাংবাদিক সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য লঘু ক'রে দেয়। কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ঘোষণা করা হবে, এই প্রতিশ্রুতিই সাংবাদিকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে, আতিথেয়তা নয়।

সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করার সময় মনে রাখা দরকার—

উদ্দেশ্য ঃ সাংবাদিক সম্মেলন ডাকার যুক্তি সঙ্গত কারণ থাকা প্রয়োজন। সম্মেলনে এসে সাংবাদিকরা যে সময় দেবেন, সংবাদের গুরুত্ব যেন সেই অনুপাতে যথেষ্ট হয়। সংবাদের গুরুত্ব বিবেচনা ক'রে যদি মনে হয়, বিভিন্ন মাধ্যমে সংবাদলিপি পাঠানোই যথেষ্ট, তাহলে সাংবাদিক সম্মেলন না ডাকাই ভালো। কী জানানো হবে এবং কেন জানানো হবে, সেই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকলে বিষয়টি সাংবাদিক সম্মেলন ডাকার উপযুক্ত বিষয় কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

তারিখ এবং স্থান ঃ সাংবাদিক সম্মেলনের তারিখ নির্দিষ্ট করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদিও, যেখানে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে, সেই জায়গা কবে পাওয়া যাবে (অন্য কারো বুকিং আছে কিনা) জেনে তবেই তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব। সন্ধ্যাবেলায় সাংবাদিক সম্মেলন না করাই ভালো। সন্ধ্যাবেলাই সাংবাদিকরা সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত থাকেন। ফলে, সন্ধ্যাবেলা সম্মেলন ডাকলে সিনিয়র সাংবাদিকদের যোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। জুনিয়ার বা ফ্রি-লানস সাংবাদিকদেরই পাঠাবেন। আবার, সন্ধ্যাবেলা সম্মেলন ডাকলে পরের দিনের সংবাদপত্রে রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। সম্মেলনের স্থান নির্বাচনও সমান গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে, যে সাংবাদিকরা আসবেন, তাঁদের সকলের গাড়ি নেই। বিভিন্ন গণমাধ্যমের দপ্তর থেকে সহজে পৌঁছানো যায়, এমন জায়গায় সম্মেলন ডাকাই ভালো।

আমন্ত্রণ জানানো ঃ প্রত্যেক সংস্থার জনসংযোগ আধিকারিক বিভিন্ন গণমাধ্যমের তালিকা রাখেন। বিশেষ ক'রে তাঁর সংস্থার প্রচারের জন্য যে মাধ্যমগুলি প্রয়োজন এবং যাঁদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হয়। মনে রাখতে হবে, মাধ্যমের তালিকার অর্থ কেবলমাত্র মাধ্যমের তালিকা নয়। প্রতিটি প্রয়োজনীয় মাধ্যমের সাংবাদিকদের তালিকা, যাঁদের সঙ্গে সংস্থার নিয়মিত যোগাযোগ আছে। আমন্ত্রণ সর্বদাই সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত নামে পাঠানো উচিত। মাধ্যমকে উদ্দেশ্য ক'রে নয়। সাংবাদিকরা মাঝে মধ্যেই এক মাধ্যম ছেড়ে অন্য মাধ্যমে যোগ দেন। জন-সংযোগ আধিকারিককে সর্বশেষ পরিবর্তনও জেনে রাখতে হয়। নিজের নামে, ব্যক্তিগত আমন্ত্রণ পেলে সাংবাদিকরা খুশি হন।

উপস্থিতি ঃ সম্মেলনে উপস্থিতির জন্য কেবল আমন্ত্রণ পাঠানোই যথেষ্ট নয়। বার বার টেলিফোন ক'রে স্মরণ করানো প্রয়োজন এবং ব্যক্তিগত অনুরোধ করাও প্রয়োজন সম্মেলনে আসার জন্য। সাংবাদিক সম্মেলনে কোনো প্রতিনিধি পাঠানো সম্ভব হবে কিনা, নির্ভর করে অনেকগুলি কারণের উপর। মাধ্যম কার্যালয়ে ঐ দিন উপস্থিতির হার, অন্যান্য বিশেষ রিপোর্ট সংগ্রহের জন্য ব্যস্ততা এবং আরো বহু কারণ। সেই জন্য, বার বার স্মরণ করিয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। আর একটি কথা, যদি আশা করা হয় পঁচিশ জন সাংবাদিক সম্মেলনে যোগ দেবেন, তাহলে পঁয়ত্রিশ জনকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। তবেই আশানুরূপ উপস্থিতি সম্ভব হবে। আর, সব সময়েই, মুদ্রিত আমন্ত্রণ পত্র বা সংস্থার লেটার হেডে সুন্দর ক'রে মুদ্রিত আমন্ত্রণ লিপি পাঠানোই সাধারণ রীতি।

প্রেস-কিট ঃ সম্মেলনে যোগদানকারী সাংবাদিকদের সুবিধার জন্য বিশেষ বক্তব্য, ফোটোগ্রাফ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র ফোলডারে গুছিয়ে সাংবাদিকদের দেওয়া উচিত। তবে, সম্মেলনের পরে, চলে যাওয়ার সময় দেওয়াই ভালো। শুরুতেই দিলে, অনেক সাংবাদিকই সম্মেলনে না থেকে নিজের অফিসে ফিরে যেতে চাইবেন।

আপ্যায়ন ঃ সাংবাদিক সম্মেলনে চা-কফি এবং অন্যান্য খাবার যা দেওয়া হবে, আগে থেকে তার ব্যবস্থা ক'রে রাখতে হবে। কতজনের জন্য ব্যবস্থা করা হবে, সেই সংখ্যা বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে নির্ধারণ করতে হয়। এক, কম না পড়ে, লজ্জার কারণ না হয়। আবার অপচয় না ঘটে, সংস্থার কর্তৃপক্ষের বিরক্তির কারণ না হয়।

উপসংহার ঃ সাংবাদিক সম্মেলনের পরে সকল গণমাধ্যমের উপর নজর রাখতে হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টের কাটিং ফাইলে সংগ্রহ করা প্রয়োজন। নানা কারণে, আমন্ত্রিত সব সংবাদপত্রে রিপোর্ট প্রকাশিত না-ও হতে পারে। যে যে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে না, তাঁদের সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং সংবাদটি প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা প্রয়োজন।

৫.৯ সাংবাদিকদের পরিদর্শন

সংস্থার উৎপাদন কেন্দ্র বা কারখানায় সাংবাদিকদের পরিদর্শনের ব্যবস্থা ক'রে সংস্থার কাজকর্ম এবং পণ্য তৈরির বিষয়ে তাঁদের বাস্তব, চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ দিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। সংস্থার কাজকর্ম সম্বন্ধে সাংবাদিকদের চাক্ষুষ ধারণা হলে, জন-সংযোগ আধিকারিকের পক্ষে তাঁদের সঙ্গে বোঝাপড়ার ক্ষেত্র তৈরির পথ সুগম হয়। নতুন কোনো কারখানা চালু হওয়া, বা নতুন কোনো পণ্যের উৎপাদন শুরু হওয়া, সাংবাদিকদের পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়ার বিশেষ সুযোগ।

সাংবাদিক পরিদর্শনের পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থা বিশেষ যত্ন সহকারে করা প্রয়োজন। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর নজর রাখতে হবে। সাংবাদিকদের পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয় সংস্থার প্রচারের সুবিধার জন্য। পরিদর্শনের ব্যবস্থায় সাংবাদিকরা যদি সন্তুষ্ট না হন, যদি তাঁদের কোনোরকম অসুবিধা ভোগ করতে হয়, তাহলে অবশ্যম্ভাবী ভাবে তাঁরা সংস্থার উপর বিরক্ত হন। জন-সংযোগ আধিকারিক বিরাগ ভাজন হন। সংস্থার প্রচারের পথ সুগম না হয়ে বিপরীত হয়।

সাংবাদিকদের পরিদর্শন ব্যবস্থায় রয়েছে যাতায়াতের ব্যবস্থা, থাকার জায়গার বন্দোবস্ত এবং খাওয়া দাওয়া। ধরুন, কোনো সংস্থার সদর দপ্তর কলকাতায় এবং কারখানা বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর থেকে কিছু দূরে। পরিদর্শনের জন্য কলকাতা অফিসে গাড়ির ব্যবস্থা রাখতে হবে সাংবাদিকদের হাওড়া স্টেশনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কতজন যাবেন, সেই হিসাবে বাস বা একাধিক গাড়ির ব্যবস্থা চাই। লক্ষ্য রাখতে হবে, অতিথিরা যেন আরামেই ভ্রমণ করেন। নির্দিষ্ট ট্রেনে আগে থেকেই যথোচিত সংখ্যায় সিট রিজার্ভ ক'রে রাখতে হবে। স্টেশনে সংস্থার কর্মী আগেই উপস্থিত থাকবেন, অতিথি সাংবাদিকদের নির্দিষ্ট কামরায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। হাওড়া থেকে দুর্গাপুর পর্যন্ত যাত্রায় অতিথিদের চা, কফি এবং ব্রেকফাস্ট-এর জন্য অনুরোধ জানাতে হবে। সংস্থার কয়েকজন কর্মী দেখভালের জন্য তাঁদের সঙ্গে থাকবেন। জনসংযোগ আধিকারিক সঙ্গে থাকলেই ভালো হয়।

দুর্গাপুর স্টেশনেও কলকাতার মতো গাড়ির ব্যবস্থা থাকবে। সাংবাদিকদের কার্যসূচী অনুযায়ী সোজা কারখানায়, নয়তো হোটেলে বা গেস্ট হাউসে নিয়ে যাওয়া হবে। কার্যসূচী অনুযায়ী লাঞ্চ এবং কারখানা পরিদর্শন হবে।

কারখানার উচ্চপদস্থ কোনো কর্মচারী বা সংস্থার কোনো ডিরেক্টর সাংবাদিকদের কারখানা ঘুরিয়ে দেখাবেন। এই পরিদর্শন যেন অতিথি সাংবাদিকদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সহায়ক হয়। হ্যাঁ, জনসংযোগ আধিকারিক অবশ্যই নিজস্ব ফোটোগ্রাফার কলকাতা থেকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

সন্ধ্যাবেলা সাধারণ আলাপ-আলোচনা এবং বিশ্রাম। পরে রাতের ডিনার। হোটেলে বা গেস্ট হাউসে আগে থেকে যথেষ্ট সংখ্যক ঘর বুক ক'রে রাখতে হয়। পরের দিন আবার একই ব্যবস্থায় ফিরে আসা। হাওড়া স্টেশন পৌঁছে, কোন সাংবাদিক কোন অঞ্চলে যাবেন সেই হিসাবে গাড়ির ব্যবস্থা করা। একই অঞ্চলের দুই বা তিনজন সাংবাদিক একই গাড়িতে যেতে পারেন। তবে, আগে থেকে পরিকল্পনা ক'রে উপযুক্ত সংখ্যক গাড়ি হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত না রাখলে পরিদর্শনের শেষে অসন্তোষের সৃষ্টি হতে পারে।

জন-সংযোগ আধিকারিককে প্রতিটি বিষয়ের উপর নজর রাখতে হবে। প্রতিটি কাজের জন্য বিভিন্ন কর্মীকে দায়িত্ব বুঝিয়ে, কাজ ভাগ ক'রে দিতে হবে। নিজে সর্বদাই উপস্থিত থেকে সাংবাদিকদের গুরুত্ব এবং মর্যাদা দেবেন। তবেই সাংবাদিক পরিদর্শন সফল হবে এবং সংস্থাও সুবিধা অর্জন করবে।

এবারে খরচের বিষয়। আলোচিত প্রতিটি ব্যবস্থার আনুমানিক খরচ হিসাব ক'রে একটি বাজেট তৈরি করতে হবে। কর্তৃপক্ষের কাছে সাংবাদিক পরিদর্শনের প্রস্তাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আনুমানিক খরচের মোট অঙ্কও অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেন বুঝতে পারেন, প্রস্তাবিত সাংবাদিক পরিদর্শনের জন্য মোট কত খরচ হবে। সেই জন্যই, বাজেট হিসাব করার সময় সমস্ত রকম খরচের বাস্তব অঙ্ক অনুসারেই হিসাব করা ভালো।

৫.১০ সারাংশ

যে কোনো সংযোগ প্রক্রিয়ায় সংযোগের একটা উপায় থাকা আবশ্যিক। পারস্পরিক সংযোগের উপায় মুখের ভাষা এবং অন্যান্য অভিব্যক্তি ও অঙ্গভঙ্গী। একাধিক মানুষের সঙ্গে সংযোগের মাধ্যমও একই। কিন্তু যখন একসঙ্গে বিপুল সংখ্যক ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ প্রয়োজন হয়, তখন বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্য নেওয়া অবশ্যম্ভাবী।

জন-সংযোগের বিভিন্ন মাধ্যমগুলিকে সাধারণত তিন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়। দৃশ্য, শ্রাব্য এবং শ্রাব্য দৃশ্য।

ব্যক্তিগত পারস্পরিক সংযোগের ক্ষেত্রে, প্রেরক এবং গ্রাহকের শারীরিক নৈকট্য এবং একে অপরকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ, সংযোগের সাফল্যের সহায়ক। পারস্পরিক সংযোগই আরো বিস্তারিত হয় বৈঠক বা কনফারেন্স-এ।

গণ-জ্ঞাপনের অর্থ এক সঙ্গে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে সংযোগের দ্বারা বার্তা প্রচার। অসংখ্য মানুষের কাছে বার্তা প্রচার কোনো ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব নয়। সেই কারণেই, গণজ্ঞাপনের জন্য গণমাধ্যম ব্যবহার করা হয়। গণমাধ্যমের

পদ্ধতি এবং কলাকৌশল পারস্পরিক সংযোগ থেকে ভিন্ন। এক সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছানো হয় গণমাধ্যম দ্বারা। গ্রাহকের প্রতিক্রিয়া দেখার বা শোনার তাৎক্ষণিক সুযোগ নেই। প্রত্যেক গ্রাহক নিজের অধিগত জ্ঞান অনুযায়ী প্রেরিত বার্তা গ্রহণ অথবা বর্জন করেন।

গণমাধ্যম দেশের এবং সমাজের পর্যবেক্ষকের কাজ করে। বিভিন্ন বিষয়ে জনমত গড়ে তোলে গণমাধ্যম।

গণমাধ্যম কেবল তথ্য সরবরাহ করে না। গণমাধ্যম দেশের সংস্কৃতি সংরক্ষণ করে, পরবর্তী প্রজন্মকে সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন করে। গণমাধ্যমের সাহায্যেই দেশের প্রত্যন্ত প্রান্তের বিভিন্ন সংবাদ, সমাজের ছবি আপনার কাছে পৌঁছায়। গণমাধ্যম দূরকে নিকট করে। সাধারণ মানুষের বিভিন্ন মনোরঞ্জনের চাহিদা মেটায় বিভিন্ন গণমাধ্যম। অবশ্য গণমাধ্যমের কয়েকটি নেতিবাচক প্রভাবও আছে। নানা কারণে এবং উদ্দেশ্যে, অবাস্তব চিত্র উপস্থাপন ক'রে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। আবার সংবাদ পরিবেশনের বিভিন্ন কৌশলে সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে।

ভারতে গণমাধ্যমগুলি নানাবিধ সীমাবদ্ধতার মধ্যেই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে। সীমাবদ্ধতার কারণ, সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন মানুষের সীমিত সংখ্যা এবং নানাবিধ কারণে, বিভিন্ন মাধ্যমের দেশের সর্বত্র মানুষের কাছে পৌঁছানোর অক্ষমতা।

জন-সংযোগের জন্য বিশেষ ভাবে নির্ভর করা হয় সংস্থার নিজস্ব মাধ্যমের উপর। জন-সংযোগের বিশেষ মাধ্যমের প্রকার ভেদ আছে। মুদ্রণ মাধ্যম, প্রদর্শনী, বিশেষ ঘটনা, পোষিত কর্মসূচী, চলচ্চিত্র এবং জন-সংযোগের জন্য বিজ্ঞাপন। প্রতিটি মাধ্যমের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং সংস্থার বিভিন্ন পাবলিকের উপর কার্যকরী প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম।

জন-সংযোগ পেশাদারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিভিন্ন গণমাধ্যমের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং বজায় রাখা। যে কোনো জন-সংযোগ বিশেষজ্ঞের সবচেয়ে দামি পরিসম্পৎ—মাধ্যমের সঙ্গে সুসম্পর্ক। মাধ্যমের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার নানাবিধ উপায় আছে। নিয়মিত, দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য কী কী করণীয় এবং কী করা উচিত নয়, সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। সাংবাদিকরা জন-সংযোগ বিশেষজ্ঞের কাছে কী আশা করেন এবং সেই আশা কী ভাবে পূরণ করা যেতে পারে, সে বিষয়ে জন-সংযোগ বিশেষজ্ঞের সচেতন থাকা প্রয়োজন।

জন-সংযোগের জন্য সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়। সাংবাদিক সম্মেলন বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে করতে হয়।

সাংবাদিকদের পরিদর্শনের ব্যবস্থা জনসংযোগের অন্যতম উপায়। পরিদর্শনের জন্য, সব দিকে নজর রেখে বিস্তারিতভাবে ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

৫.১১ অনুশীলনী

১। জন-সংযোগের মাধ্যম হিসাবে ব্যক্তিগত, পারস্পরিক যোগাযোগ কার্যকরী, আলোচনা করুন।

২। গণ মাধ্যমের কাজ কী?

৩। গণ মাধ্যমের সীমাবদ্ধতা বিষয়ে আলোচনা করুন।

৪। জন-সংযোগের নিজস্ব, বিশেষ মাধ্যমগুলি বিষয়ে আলোচনা করুন।

৫। জন-সংযোগের জন্য পোষিত কর্মসূচী গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করুন।

৬। জন-সংযোগ কর্মীর পক্ষে মাধ্যম সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৭। প্রেস কনফারেন্স আয়োজন করতে হলে, কী করা প্রয়োজন?

টীকা লিখুন ঃ

ক. সাংবাদিকদের পরিদর্শন, খ. বিশেষ ঘটনা, গ. প্রদর্শনী, ঘ. জনসংযোগের জন্য বিজ্ঞাপন, ঙ. বৈঠক ও কনফারেন্স।

৫.১২ গ্রন্থপঞ্জি

(1) Public Relations Hand book ● Philip Lesly

(2) Practical Public Relations ● Sam Black

(3) Management of Public Relations and Communication ● Sailesh Sengupta

একক ৬ ❑ সরকারের জনসংযোগ, কেন্দ্র এবং রাজ্য

গঠন

৬.০ উদ্দেশ্য

৬.১ প্রস্তাবনা

৬.২ সরকারের জন-সংযোগ

৬.২.১ ভূমিকা

৬.২.২ সমস্যা

৬.৩ পাবলিক সেকটরের জন-সংযোগ

৬.৪ সরকারি গণমাধ্যম

৬.৪.১ আকাশবাণী

৬.৪.২ দূরদর্শন

৬.৪.৩ প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো

৬.৪.৪ ফিল্মস্ ডিভিশন

৬.৪.৫ প্রকাশনা

৬.৪.৬ প্রদর্শনী

৬.৪.৭ ফিল্ড পাবলিসিটি

৬.৪.৮ সংগস এ্যান্ড ড্রামা ডিভিশন

৬.৪.৯ ডি.এ. ভি.পি.

৬.৫ রাজ্য সরকারের গণমাধ্যম

৬.৬ সারাংশ

৬.৭ অনুশীলনী

৬.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৬.০ উদ্দেশ্য

কেন্দ্রিয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার জনসংযোগের কার্যকরীতার বিষয়ে সচেতন। সরকারের জন-সংযোগ বিষয়ক কাজকর্মের বৈশিষ্ট্য কী এবং প্রয়োজনীয়তাই বা কী? কেন্দ্রিয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে এই এককে আলোচনা করা হয়েছে। এই এককটি পড়লে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন—

- সরকারের জন-সংযোগের প্রয়োজনীয়তা
- সরকারের জন-সংযোগের সমস্যা

● পাবলিক সেকটরের জন-সংযোগ

● কেন্দ্রিয় সরকারের বিভিন্ন গণমাধ্যম

● রাজ্য সরকারের গণমাধ্যম

৬.১ প্রস্তাবনা

পরিচালন ব্যবস্থায় জন-সংযোগের গুরুত্ব ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। যে কোনো পরিচালন ব্যবস্থায় জন-সংযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সরকার পরিচালন করাও এক পরিচালন ব্যবস্থা। একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং কোনো নির্বাচিত সরকারের পরিচালন ব্যবস্থায় জন-সংযোগের ভূমিকায় কিছু নীতিগত পার্থক্য অবশ্যই আছে। যে কোনো নির্বাচিত সরকারের, সে কেন্দ্রিয় সরকার হোক বা রাজ্য সরকারই হোক জনসংযোগের সহায়তা অপরিহার্য। যে কোনো নির্বাচিত সরকারের জনসাধারণের নিকট দায়বদ্ধতা অনেক বেশি। দায়বদ্ধতা বেশি হওয়ার কারণে সরকারের জনসংযোগের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। কেন্দ্রিয় এবং রাজ্য সরকার এই বিষয়ে সচেতন। আধুনিক জন-সংযোগ বিজ্ঞানের বিভিন্ন কলাকৌশল প্রয়োগের দ্বারা তাঁরা জনসাধারণের মনে নিজ নিজ সরকারের স্বপক্ষে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে প্রয়াসী।

৬.২ সরকারের জন-সংযোগ

কেন্দ্রিয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারের শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় জন-সংযোগের বিশেষ ভূমিকা আছে। মনে রাখতে হবে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার নির্বাচিত হন নাগরিকদের সমর্থন লাভ ক'রে। সেই কারণে নাগরিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং শাসনব্যবস্থা পরিচালনার নীতি ও কর্মপদ্ধতি জনসাধারণকে জানানো বিশেষ প্রয়োজন। বর্তমান জীবনে, মানুষের জীবনযাত্রার এবং সামাজিক জীবনের উপর সরকারের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। নাগরিকদের বিভিন্ন তথ্য জানাবার প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে।

নাগরিকরাও অনেক বেশি সচেতন হয়েছেন তথ্য জানবার অধিকার সম্পর্কে। বিভিন্ন ফোরামে এই বিষয়ে নানা আলোচনা সাধারণ মানুষকে ক্রমাগতই আরো সচেতন ক'রে তুলছে। এই পটভূমিতে, সরকারের জনসম্পর্কের প্রয়োজন নিয়তই বর্ধমান।

সরকারি দপ্তরের জন-সংযোগের কাজ "জন-সংযোগ" না বলে "জন সাধারণ বিষয়ক" বা "জনগণের জন্য তথ্য" এই নামে অভিহিত করা হয়। সম্ভবত রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই এই নাম নির্বাচিত হয়েছে। কারণ, সরকার সব সময়ই বহাল থাকে কিন্তু সরকার পরিচালনায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দল বা ব্যক্তি থাকেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁদের পরিবর্তনও হয়। সরকারি জন-সংযোগের নিরপেক্ষতা প্রকাশ করার জন্যই সম্ভবত "তথ্য বিষয়ক" নামের প্রচলন।

কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার পরিচালন ব্যবস্থা একটি জটিল প্রক্রিয়া। এই জটিলতার ফলে সাধারণ মানুষের পক্ষে সরকারের বিভিন্ন নীতি এবং কাজকর্ম কীভাবে নাগরিকদের জীবনকে প্রভাবিত করবে সে ব্যাপারে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নাগরিকদের বিশেষ স্পষ্ট ধারনা থাকে না। সাধারণ মানুষকে অবহিত রাখার জন্যও সরকারের প্রয়োজন তথ্য আদান-প্রদান করা।

গণমাধ্যম ব্যবস্থাগুলি যাতে নির্বিঘ্নে জনসাধারণকে তথ্য সরবরাহের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলিকে তার উপযুক্ত বাতাবরণ সৃষ্টি করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। গণজ্ঞাপন ব্যবস্থা যদি ঠিক মতো কাজ করে তাহলে সরকারের বক্তব্যও জনসাধারণের কাছে নির্বিঘ্নে এবং অবিকৃত ভাবে পৌঁছাতে পারে। বিভিন্ন সরকার দেশের

গণজ্ঞাপন ব্যবস্থাগুলি, যেমন সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশন ব্যবহার করেন জনসাধারণকে বিভিন্ন নীতি এবং কর্মপ্রণালি বোঝানোর জন্য। গণজ্ঞাপন ব্যবস্থাগুলি সরকারের বক্তব্য জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়, আবার জনসাধারণের মনোভাব, প্রতিক্রিয়া বুঝতে সরকারকে সাহায্য করে। সরকারের এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় নিযুক্ত জনসংযোগ বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে সফল এবং সার্থক করার প্রয়াসে অনলস।

৬.২.১ ভূমিকা

যদি ধরে নেওয়া হয় তথ্যমূলক, স্বচ্ছ, নিরবচ্ছিন্ন সংবাদ প্রবাহই যে কোনো সরকারের নীতি এবং কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করতে সক্ষম, তাহলে জনসংযোগের ভূমিকা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সাধারণ গণ জ্ঞাপন ব্যবস্থা সরকারের নীতি এবং কর্মপদ্ধতি প্রচার এবং ব্যাখ্যা করেন ঠিকই কিন্তু সাধারণ গণমাধ্যমের নিজস্ব চারিত্রিক প্রয়োজন অনুসারে, সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থ প্রচার হয় না। গণমাধাম নিজস্ব সমালোচনামূলক প্রচারের দ্বারা সাধারণ মানুষের কাছে নিজেদের নিরপেক্ষ দৃষ্টি প্রতিষ্ঠা করতে বেশি উৎসাহী, জনপ্রিয়তা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে। সাধারণত, গণমাধ্যমের ভূমিকা প্রায় বিরোধী সমালোচকের ভূমিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাণিজ্যিক কারণেই গণমাধ্যমগুলির জনপ্রিয়তা বাড়ানো বিশেষ প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা ও অসুবিধার পক্ষ নিয়ে সরকারের সমালোচনা করা গণমাধ্যমগুলির জনপ্রিয়তা বাড়ানোর অন্যতম উপায়।

এই পরিস্থিতিতে সরকারের জন-সংযোগের বিশেষ প্রয়োজন আছে। সরকারের জন-সংযোগ বা তথ্য বিভাগ বিভিন্ন সংস্থার জন-সংযোগ বিভাগের মতোই, সরকারের নীতি ও কর্মসূচী ব্যাখ্যা ক'রে, বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করতে পারেন। বিভিন্ন মাধ্যমের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলে সরকারের বিভিন্ন সংবাদ উপযুক্ত গুরুত্ব সহকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পারেন।

এই কাজ সহজ নয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত যে বিরোধীতা, অবিশ্বাস এবং সন্দেহের পরিমন্ডল অবশ্যম্ভাবী ভাবে সৃষ্টি হয়, তার প্রভাবে সরকারের জনসংযোগের প্রয়াস এবং কর্মসূচী সর্বদাই প্রবল বিরোধীতা এবং সন্দেহের সম্মুখীন হয়। যেহেতু সকলেরই জানা আছে পরিস্থিতি এই রকমই হবে, আরো দক্ষতার সঙ্গে কাজ ক'রে প্রতিকূলতা জয় করতে হবে।

বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা স্বীকার করেন বিভিন্ন সরকারের তথ্য বিভাগ নানাভাবে তাঁদের বিভিন্ন সংবাদ সরবরাহ করে থাকেন। গণমাধ্যমে প্রচারিত বহু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ তাঁরা সরকারের তথ্য দপ্তর থেকেই পেয়েছেন। কিন্তু সংবাদ মাধ্যমের সংবাদের ক্ষুধা কখনোই নিবৃত্ত হয় না। তাঁরা অহরহ অভিযোগ করেন সরকার অনেক তথ্য গোপন করছেন। তাঁদের বক্তব্য জনসাধারণের জানবার অধিকার আছে এবং গণমাধ্যম আসলে জনসাধারণের অধিকারই বলবৎ করছেন। মনে রাখতে হবে, সরকারের দৃষ্টিকোণ থেকে যতোটা জানানো দরকার, সরকার ততোটাই জানাতে ইচ্ছুক। গণমাধ্যম চান সবকিছু জানতে। জনগণের স্বার্থে এবং বিশেষ ক'রে মাধ্যমের স্বার্থে। এই পরিস্থিতিই বজায় থাকবে। সরকারের জনসংযোগ কর্মীদের এই পরিস্থিতিতেই কাজ করতে হবে, নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

সরকারের জন-সংযোগের মূল বিষয় দুটি। জনসাধারণের জানার অধিকার আছে। কাজে কাজেই সরকারকে জানাতে হবে। আর, বিভিন্ন বিষয়ে জনসাধারণের মনোভাব এবং প্রতিক্রিয়াও সরকারের জানা প্রয়োজন। এই দুইয়ের মেলবন্ধন করতে সমর্থ—জন-সংযোগ।

৬.২.২ সমস্যা

ভারতের সংবিধান অনুসারে দেশের শাসনব্যবস্থা বহাল রাখার দায়িত্ব রয়েছে বিধানিক প্রণালি (legislative) পরিচালন ব্যবস্থা (executive) এবং বিচার ব্যবস্থার (judiciary) উপর। তত্ত্বগতভাবে, শাসনব্যবস্থার এই তিনটি

বিভাগের এক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করার কথা। বাস্তবে দেখা গেছে অন্য রূপ। বিচার ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত মনোমত না হওয়ায়, পরিচালন ব্যবস্থার (executive) যাঁরা ভারপ্রাপ্ত, তাঁরা সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে আইন পরিবর্তন করেছেন। শাসনযন্ত্রের তিনটি বিভাগের মধ্যে রেষারেষি আছে।

এর পরে আরো রয়েছে বিভিন্ন মন্ত্রকের মধ্যে রেষারেষি। আবার, কখনো কখনো এমনও দেখা গেছে একই মন্ত্রকের বিভিন্ন একক বা সংস্থার মধ্যে রেষারেষি। এর সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে রেষারেষি যার প্রভাব সরকারের জনসংযোগের উপর অবশ্যম্ভাবী। আর, সরকার এবং গণমাধ্যমের মধ্যে রেষারেষি তো চিরন্তন কাহিনী। এই জটিল পরিস্থিতির মধ্যেই সরকারের জনসংযোগ বা তথ্য বিভাগের কর্মীদের কাজ করতে হয়।

৬.৩ পাবলিক সেক্টর-এর জনসংযোগ

সাধারণভাবে মনে হতে পারে সব শিল্প বা বাণিজ্য সংস্থার জনসংযোগের উদ্দেশ্য এবং কাজকর্ম তো এক রকমই হবে। বিভিন্ন সংস্থার জন-সংযোগ বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। তাহলে, আলাদা ক'রে পাবলিক সেক্টরের জন-সংযোগ বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা কী?

সবার আগে জানা প্রয়োজন ভারতে পাবলিক সেক্টরের ভূমিকা এবং প্রয়োজনীয়তা কী? পাবলিক সেক্টরের অস্তিত্ব কেমন ক'রে সৃষ্টি হলো?

ভারতে পাবলিক সেক্টরের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে দেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে নতুন গতি আনার উদ্দেশ্যে আধুনিক শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধিই পাবলিক সেক্টরের উদ্ভবের মূল চিন্তাধারা। পশ্চিম দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের তুলনায় ভারি শিল্পের ক্ষেত্রে ভারত অনেক পিছিয়ে ছিল। ভারি শিল্প স্থাপনের বিষয় বিবেচনার সময় দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। ভারি শিল্প স্থাপনের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন, যা ব্যক্তিগত ভাবে কোনো শিল্পপতির পক্ষে লগ্নী করা নানা কারণে সম্ভব ছিল না। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী তৎকালীন সরকারের ঘোষিত নীতি ছিল "সমাজবাদের ধাঁচে ভারতীয় সমাজ" (socialistic pattern of society) গড়ে তোলা হবে। তার ফলে সিদ্ধান্ত হলো, ভারি শিল্পে লগ্নী করবেন সরকার এবং বিভিন্ন আর্থিক সংস্থা যা নাকি জনসাধারণের অর্থেই চলে। অর্থাৎ, এই সব শিল্পের মালিকানা কোনো ব্যক্তির হবে না, জনসাধারণেরই মালিকানা থাকবে। আর যেহেতু রাষ্ট্র জনসাধারণেরই প্রতিনিধি, এই সব শিল্পের নতুন নামকরণ হলো—পাবলিক সেক্টর বা রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প। অর্থাৎ, এই সব শিল্পের মালিকানা রাষ্ট্রের বা জনসাধারণের।

বুঝতেই পারছেন, ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত সংস্থার উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচী থেকে পাবলিক সেক্টরের উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচীর পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের জন্যই পাবলিক সেক্টরের জন-সংযোগের বৈশিষ্ট্য আছে, বিশেষ দায়িত্ব আছে এবং আছে জনসাধারণের প্রতি দায়বদ্ধতা।

পাবলিক সেক্টরের স্থাপয়িতাদের উদ্দেশ্য ছিল পাবলিক সেক্টর ভারতের অর্থনীতির এবং শিল্পনীতির নেতৃত্ব দেবে। দেশের অর্থনীতি এবং শিল্পনীতির ভারসাম্য বজায় রাখবে পাবলিক সেক্টর। দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষা করবে এবং কাজের সুযোগ করে দেবে—পাবলিক সেক্টর।

গত পঞ্চাশ বছরে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প ভারতের অর্থনীতি ও শিল্পের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প দুই ধরণের। জনহিতকর, পরিষেবামূলক যেমন বন্দর, রেলওয়ে, এয়ারলাইন ইত্যাদি। আর আছে, বিভিন্ন মন্ত্রকের অধীনে শিল্প সংস্থা। যেমন, পেরামবুরের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন, হিন্দুস্থান মেসিন টুল্‌স্ ইত্যাদি।

পাবলিক সেক্টরের অনেক সংস্থার কাজকর্ম বিশেষ সন্তোষজনক। সরকারের লগ্নীর টাকার ডিভিডেন্ডও সরকারকে দিচ্ছেন। অনেক পাবলিক সেক্টরের কর্মদক্ষতা পাবলিক সেক্টরের স্থাপয়িতাদের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করেছে। আবার কোনো পাবলিক সেক্টরের কাজ আশানুরূপ হয়নি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ হতাশাজনকও বটে। এর ফলে, অনেকেই এমন মত প্রকাশ করেছেন যে কেবল জনহিতকর পরিষেবা ব্যতীত অন্যান্য শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে সরকারের প্রবেশ করা উচিত হয় নি।

পাবলিক সেক্টর যেহেতু সরকারের অর্থাৎ জনসাধারণের টাকায় চলে, পাবলিক সেক্টরের কাজকর্ম সম্বন্ধে জনসাধারণ অত্যন্ত সজাগ। সব পাবলিক সেক্টরকেই জনসাধারণের কড়া নজরের মধ্যে কাজ করতে হয় এবং সকল ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য সমালোচিত হতে হয়। বেসরকারি শিল্পের চেয়ে পাবলিক সেক্টরের উপর জনসাধারণের এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের, যাঁরা জনসাধারণের প্রতিনিধি বলে দাবি করেন, তাঁদের নজরদারি অনেক বেশি।

সাধারণ মানুষের আগ্রহের জন্যই বিভিন্ন গণমাধ্যম রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সম্বন্ধে খবর নিয়মিত প্রকাশ ক'রে থাকেন। রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশ তাঁরা গণমাধ্যমের দায়িত্ব পালন এবং জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা এবং জনসেবার দৃষ্টিতে বিচার করেন। বেসরকারি সংস্থার জন-সংযোগ কর্মীকে কোনো সংবাদ প্রকাশের জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়। সেই তুলনায়, পাবলিক সেক্টরের সংবাদ সকল মাধ্যমে, সহজেই প্রাধান্য পায়। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পাবলিক সেক্টরের কৃতিত্বের তুলনায় ত্রুটি বিচ্যুতিই বেশি প্রকাশিত হয়।

আর একটি বিষয়, বিরল ব্যতিক্রম বাদ দিলে, বেসরকারি ক্ষেত্রে, সংস্থার সংবাদের উৎস সাধারণত সংস্থার জন-সংযোগ বিভাগ। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক বা শ্রমিক কর্মচারীদের সংগঠনের কাছ থেকে বিভিন্ন মাধ্যমের সাংবাদিকরা সংবাদ সংগ্রহ ক'রে থাকেন। ফলে, জন-সংযোগ কর্মীর কাজের জটিলতা বাড়ে। সংস্থার ভিতরেই একে অপরের প্রতি সন্দীহান হন, মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়।

যে কোনো রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পই সরকারের একটি বিশেষ মন্ত্রকের অধীনে কাজ করে। সরাসরি সরকারি বিভাগ না হলেও, বিভিন্ন সরকারি নিয়মের বাধাবন্ধকতার মধ্যে কাজ করতে হয়। সংস্থার বহু বিষয়ে পরিচালন কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের অনুমোদন নিতে হয়। আবার অনেক সময় অনুমোদনের জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়। ফলে সংস্থার কাজকর্ম ব্যাহত হয়। জন-সংযোগ কর্মীকে এই পরিবেশের মধ্যে অর্থাৎ, বহু বাধাবিঘ্নের মধ্যেই পেশাদারি কাজ করতে হয়।

আশার কথা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের পরিচালন ব্যবস্থায় বিশেষ পরিবর্তন এসেছে। রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পের সূচনাকালে সাধারণ সরকারি প্রশাসক, আই.এ.এস, বা সমতুল্য ক্যাডারের প্রশাসককে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পের প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত করা হতো। সরকারের সেই নীতি পরিবর্তিত হয়েছে। এখন, বিভিন্ন বিশেষ ক্ষেত্র থেকে অভিজ্ঞ এবং প্রশিক্ষিত পেশাদার ব্যক্তিদেরই রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পের পরিচালক হিসাবে নিয়োগ করা হয়। রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প পরিচালনায় পেশাদার পরিচালকদের গুরুত্ব এখন যথেষ্ট স্বীকৃত। পেশাদার পরিচালন ব্যবস্থায় জন-সংযোগের পেশাদারি কাজের সুযোগ হয়েছে। এটি খুবই আশার কথা। তবে, রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পে জন-সংযোগের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদেরই প্রমাণ করতে হবে তাঁরা যথার্থ পেশাদার, প্রশিক্ষিত এবং রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পের প্রতি উৎসর্গীকৃত।

রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পের জন-সংযোগের কাজের দায়িত্ব এবং জটিলতা বেশি। রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পের কাজকর্মের উপর গণমাধ্যমের নজরদারী অনেক বেশি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পের কাজকর্মের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখেন। সেই জন্য, জন-সংযোগ বিভাগকে সদা সতর্ক থাকতে হয়। পরিচালন কর্তৃপক্ষ এবং ক্ষেত্রবিশেষে সরকারের বক্তব্য জনসাধারণকে জানানো বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অথচ সকল কাজেই স্মরণ রাখতে হয় সংস্থার মালিকানা জনসাধারণের। সংস্থাটি জনসাধারণের কাছে দায়বদ্ধ।

রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পের জনসংযোগের লক্ষ্যমাত্রা স্বল্পমেয়াদী নয়। দীর্ঘস্থায়ী বিশ্বাসযোগ্যতা গড়ে তোলার প্রয়াস। সেইজন্য, বিভিন্ন গণমাধ্যমের দীর্ঘ, বিস্তারিত, বিচিত্র এবং অনুসন্ধানী নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর ধৈর্য সহকারে দেওয়া এবং ব্যাখ্যা করা জনসংযোগ কর্মীর বিশেষ দায়িত্ব। সংবাদ মাধ্যমের আস্থা অর্জনের জন্য সংস্থার কোনো দুর্বলতা বা কোনো বিশেষ কাজে ব্যর্থতা থাকলে, সেগুলি স্বীকার ক'রে, কারণগুলি বোঝানো প্রয়োজন। এই কাজ করতে হলে জনসংযোগ কর্মীকে সংস্থার সকল কাজকর্মের বিস্তৃত ও খুঁটিনাটি তথ্য জানতে হবে। সংস্থার স্বার্থে, নিজের বিবেচনা অনুযায়ী তথ্যগুলি ব্যবহার করতে হবে। সংস্থার বিভিন্ন বিভাগ থেকে সমস্ত তথ্য নিজেই সংগ্রহ করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন, সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক। জনসাধারণের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণেই রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার জন-সংযোগ কর্মীর দায়িত্ব অনেক বেশি।

রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পে কর্তৃপক্ষ এবং কর্মচারী সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বেসরকারি মালিকানার সংস্থার কর্তৃপক্ষ-কর্মচারী সম্পর্কের থেকে রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রে এই সম্পর্কের পার্থক্য আছে। যেহেতু জনসাধারণই রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পের মালিক রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পের শ্রমিক কর্মচারীদের ভূমিকা এবং তাঁদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি অন্য দৃষ্টিতে বিচার করা হয়। এর ফলে, রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পের জনসংযোগের কাজকর্ম আরো জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। এই জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয় জনসংযোগ বিভাগকে।

বিভিন্ন পাবলিক সেক্টরে জন-সংযোগের কাজের সুযোগ এবং বৈচিত্র্য আছে। অনেক পাবলিক সেক্টরের দেশের বিভিন্ন জায়গায় কারখানা এবং অফিস আছে। সেই সব ইউনিট-এও জন-সংযোগ বিভাগ আছে স্থানীয় প্রয়োজন মেটাবার জন্য।

৬.৪ সরকারি গণমাধ্যম

গণমাধ্যম সংবাদ প্রচার করে, বিশ্লেষণ করে এবং জনসাধারণকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন ক'রে জনমত গঠনে সহায়তা করে। সংবাদপত্র-পত্রিকা এবং অন্যান্য মাধ্যম বেশির ভাগই ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত। সেই কারণে, প্রতিটি মাধ্যমেরই একটি ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা থাকে। যে কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই রকম লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট থাকাই স্বাভাবিক। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য গণমাধ্যমগুলির লক্ষ্য প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি করা। প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই আপোষ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আপোষ মনোরঞ্জনের খোরাক মেটানোর, আপোষ উত্তেজনামূলক এবং অনেক ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ প্রচারের আর আপোষ যে কোনো বিষয়কে ভারসাম্য বজায় রেখে নয়, যথার্থ মূল্যায়ন নয়, কোনো বিশেষ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ ক'রে পরিবেশন করা জনসাধারণের মন যোগানোর জন্য। মন যোগানো আর যথার্থ সংবাদ পরিবেশন ক'রে জনমত গঠনের প্রয়াসের মধ্যে পার্থক্য আছে।

সরকারি কাজকর্মে গণমাধ্যমের নজরদারি সব দেশেই জনসাধারণকে খুশি করে। ভারতের জনসাধারণ ব্যতিক্রম নয়। গণমাধ্যমগুলি সরকারের বিভিন্ন কাজকর্ম, প্রস্তাব, পরিকল্পনা এবং নীতি যথাযথভাবে প্রকাশ করে না, কয়েকটি ব্যতিক্রম ব্যতীত। গণমাধ্যমের দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণত সরকার বিরোধী। কারণ, গণমাধ্যমের প্রচার সংখ্যা যাঁদের উপর নির্ভর করে, সেই জনসাধারণ সরকার বিরোধী সংবাদ এবং মন্তব্য সাধারণত পছন্দ ক'রে থাকেন।

সরকারের নিজস্ব বক্তব্য, নীতি ও পরিকল্পনা জনসাধারণের কাছে যথাযথ ভাবে পেশ করার জন্য ভারত সরকার পরিচালিত কয়েকটি গণমাধ্যম আছে। এই মাধ্যমগুলির উদ্দেশ্য সরকারের বক্তব্য, বিভিন্ন কর্মসূচী, সাফল্য এবং বাস্তব সমস্যা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা, যাতে জনসাধারণের পক্ষে সরকারের নীতি ও কাজকর্ম সম্পর্কে সুষম, যথাযোগ্য মনোভাব গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

মনে রাখা প্রয়োজন, সরকার পরিচালিত মাধ্যম হওয়ার ফলে, এই মাধ্যমগুলি কেবল সরকারের গুণগান করে এবং বিরোধী মতের প্রচার করে না, এই ধারণা সত্য নয়। সরকারি মাধ্যম সরকারের অর্থে, অর্থাৎ জনসাধারণের অর্থে পরিচালিত হয়। সেই কারণে, সরকারি মাধ্যমের পক্ষে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করা বিশেষ জরুরি। সরকারের স্বপক্ষে এবং সরকার বিরোধী সব রকম সংবাদ এবং আলোচনাই সরকারি মাধ্যমে প্রচারিত হয়। তবে, সরকারের বক্তব্য যথাযথ, বিস্তারিতভাবে এবং সরকারের দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রচারিত হয়।

ভারত সরকারের তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীনে গণজ্ঞাপনের অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বিভিন্ন রাজ্যে দপ্তর আছে। আকাশবাণী এবং দূরদর্শন মন্ত্রকের সরাসরি বিভাগ হিসাবে পরিচালিত হতো। নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য বর্তমানে আকাশবাণী এবং দূরদর্শন স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এই মাধ্যমদুটির পরিচালনার জন্য একটি স্বশাসিত সংস্থা গঠিত হয়েছে—প্রসার ভারতী। প্রসার ভারতীই বর্তমানে আকাশবাণী এবং দূরদর্শন পরিচালনা করে :

৬.৪.১ আকাশবাণী

ভারতে রেডিও সম্প্রচারের সূচনা ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে। বোম্বাই (অধুনা মুম্বাই) এবং কলকাতায়। দুটি সম্প্রচারই হয়েছিল ব্যক্তিগত মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তদানীন্তন ভারত সরকার এই সম্প্রচার কেন্দ্র দুটি অধিগ্রহণ করেন এবং ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং সার্ভিস (Indian Broadcasting Service) নামে সম্প্রচার শুরু করেন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে নাম পরিবর্তিত হয়—অল ইন্ডিয়া রেডিও, সংক্ষেপে এ.আই.আর. (All India Radio—A.I.R.)। ভারত স্বাধীন হওয়ার দশ বছর পরে, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে আলাদা বিভাগ এবং নামকরণ হলো—আকাশবাণী। বর্তমানে আকাশবাণী ভারতের বৃহত্তম গণমাধ্যম। আকাশবাণী সংবাদ প্রচার করে, শিক্ষার প্রসারে সহায়তা করে এবং সুস্থ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান প্রচার ক'রে জনসাধারণের মনোরঞ্জনের প্রয়োজন মেটায়। জনমত গঠনের বাতাবরণ সৃষ্টি ক'রে আকাশবাণী সামাজিক পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত করে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত যখন স্বাধীন হয়, সারা দেশে মোট ছয়টি রেডিও স্টেশন ছিল। বর্তমানে সারা দেশে পুরো দস্তুর রেডিও স্টেশন ১৮৪টি। ভারতের জনসংখ্যার ৯৭.৩ শতাংশ মানুষের কাছে আকাশবাণী সংবাদ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান পৌঁছে দেয়। দেশের ভূখন্ডের ১০ শতাংশ বাদে ৯০ শতাংশ স্থানে আকাশবাণীর বার্তা পৌঁছায়। দেশের সব ভাষায় আকাশবাণীর অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। ভারতের মোট ৩৭টি ভাষা এবং ৩৪টি উপভাষায় আকাশবাণী প্রতিদিন সর্বমোট ৩৪৬টি সংবাদ বুলেটিন প্রচার করে। দেশজুড়ে আকাশবাণীর যোগাযোগের জাল বিছানো রয়েছে।

সংবাদ এবং সাময়িক প্রসঙ্গ ভিত্তিক নানা অনুষ্ঠান প্রচার করে আকাশবাণী। সংবাদ ভিত্তিক অনুষ্ঠান ব্যতীত বিভিন্ন বিশেষ শ্রোতাগোষ্ঠীর জন্যও আকাশবাণী অনুষ্ঠান প্রচার করে। যুব সম্প্রদায়ের জন্য যুববাণী, কৃষকদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, মহিলাদের জন্য এবং শিশুদের জন্যও বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রচারিত সংবাদ এবং পাবলিক সেক্টরের জন-সংযোগ বিভাগ প্রচারিত সংবাদ আকাশবাণী বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে এবং প্রচার করে। অতীতে, সরকারি সংস্থা ব্যতীত অন্যান্য বাণিজ্যিক সংস্থার সংবাদ সহজে প্রচারিত হতো না। এখন স্বশাসিত "প্রসার ভারতী"র পরিচালনায় বেসরকারি সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ সংবাদও প্রচারিত হচ্ছে। জন-সংযোগ বিশেষজ্ঞ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পরিকল্পনা ও ব্যবহার ক'রে, আকাশবাণীর এই বিপুল শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তাঁদের সংস্থার বক্তব্য পৌঁছে দিতে পারেন।

৬.৪.২ দূরদর্শন

ভারতে প্রথম দূরদর্শন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে, দিল্লীতে। দূরদর্শন যোগে সাধারণ পরিষেবার সম্প্রচার শুরু হয় দিল্লীতে, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে। পরবর্তী দূরদর্শন কেন্দ্র চালু হয় বোম্বাইতে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে। সূচনাকালে দূরদর্শনের পৃথক অস্তিত্ব ছিল না। আকাশবাণীর নিজস্ব দপ্তর এবং নেটওয়ার্কের সুযোগ গ্রহণের জন্য আকাশবাণীর একটি অংশ হিসাবেই দূরদর্শনের কাজকর্ম শুরু হয়। পরে, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে, আকাশবাণী থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের স্বতন্ত্র বিভাগ হিসাবে "দূরদর্শন" নামে সম্প্রচার শুরু করার ব্যবস্থা হয়। স্বশাসিত সংস্থা "প্রসার ভারতী" বর্তমানে দূরদর্শনের পরিচালক।

জাতীয় কার্যক্রম ব্যতীত, দূরদর্শন প্রতিটি রাজ্যের জন্য স্থানীয় ভাষার চ্যানেলে স্থানীয় সংবাদ এবং বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। বর্তমানে একটি বিশেষ "সংবাদ" চ্যানেল (News channel) সম্প্রচারিত হচ্ছে। আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের সম্প্রচারের মূল নীতি অভিন্ন। জন-সংযোগ বিশেষজ্ঞরা প্রচারের জন্য দূরদর্শনের সম্প্রচারের সুযোগ নিয়ে থাকেন।

১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে প্রথম রঙিন অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয়। ঐ সময়েই স্যাটেলাইট ট্রান্সমিটার স্থাপন ক'রে দিল্লী দূরদর্শনের সঙ্গে অন্যান্য কেন্দ্রের যোগাযোগের দ্বারা "ন্যাশনাল নেট ওয়ার্ক" বা "জাতীয় কার্যক্রম" এর সূচনা।

শ্রাব্য-দৃশ্য মাধ্যম জনমানসের উপর বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হওয়ায়, গণ-সংযোগে দূরদর্শনের ভূমিকা বিবেচনা ক'রে, কেন্দ্রিয় সরকার দূরদর্শনের দেশব্যাপী সম্প্রসারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

মধ্যপ্রাচ্যে আক্রমণ এবং যুদ্ধের সময় থেকে বিদেশী স্যাটেলাইট চ্যানেল ভারতে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। স্যাটেলাইট চ্যানেলের জনপ্রিয়তার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার জন্য দূরদর্শনও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের জন্য "মেট্রো" চ্যানেল সম্প্রচার শুরু করেন সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় কার্যক্রমের অনুষ্ঠান সূচীতেও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের অধিক সম্প্রচারের ব্যবস্থা হয়।

বর্তমানে দূরদর্শন ২৩টি চ্যানেলের মাধ্যমে অনুষ্ঠান প্রচার ক'রে থাকেন। ১২টি আঞ্চলিক চ্যানেল ব্যতীত ডিডি স্পোর্টস, জ্ঞান দর্শন এবং ডিডি নিউজ চ্যানেলের মাধ্যমে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা আছে।

দূরদর্শনের অনুষ্ঠানসূচী তিনটি স্তরে বিভক্ত। জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয়।

জাতীয় কার্যক্রমের অনুষ্ঠানে সারাদেশের আগ্রহের বিভিন্ন ঘটনাবলী এবং অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। এই প্রোগ্রামে সংবাদ, সমসাময়িক ঘটনা, বিজ্ঞান, শিল্প, সংস্কৃতি বিষয়ক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন বিনোদন মূলক অনুষ্ঠান ও সিরিয়াল প্রচারিত হয়। আঞ্চলিক অনুষ্ঠানে গুরুত্ব দেওয়া হয়, যে অঞ্চলে অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়, সেই অঞ্চলের বিভিন্ন ঘটনাবলী আঞ্চলিক ভাষায় প্রচারের উপর। স্থানীয় অনুষ্ঠানে একটি বিশেষ স্থান-কেন্দ্রিক ঘটনাবলীর অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, ২০০০ খ্রিস্টাব্দে "জ্ঞান দর্শন" নামে একটি বিশেষ চ্যানেলের সূচনা করেন দূরদর্শন। এই চ্যানেলের উদ্দেশ্য, উচ্চমানের শিক্ষা সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি এবং ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের সহযোগীতায় এই চ্যানেলের অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের বিভিন্ন শিক্ষাসূচী "জ্ঞানদর্শন" চ্যানেলে নিয়মিত প্রচারিত হয়। শিক্ষার্থীদের "ফোন ইন" যোগাযোগের দ্বারা আলোচনা ও মতবিনিময়ের ব্যবস্থাও আছে। নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ও জ্ঞানদর্শন চ্যানেল বিভিন্ন পাঠক্রম প্রচার ক'রে থাকেন।

৬.৪.৩ প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো

ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের আর একটি বিভাগ "প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো" (Press Information Bureau) বা সংক্ষেপে পি. আই. বি. (P.I.B)। সরকারের বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচী পি. আই. বি. প্রচার ক'রে থাকে মুদ্রণ মাধ্যমের সাহায্যে। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের নানাবিধ সংবাদ পি. আই. বি. বিভিন্ন মুদ্রণ মাধ্যমকে সরবরাহ করে।

পি. আই. বি প্রচারিত সংবাদ ৭০০০ সংবাদপত্র এবং মাধ্যমের কাছে পৌঁছায়। পি. আই. বি-র মোট ৩০টি আঞ্চলিক এবং শাখা অফিস সারা দেশে ছড়ানো রয়েছে। পি. আই. বি-র আটটি আঞ্চলিক অফিস আছে মুম্বাই, চেন্নাই, চণ্ডীগড়, কলকাতা, লক্ষ্ণৌ, গুয়াহাটি, ভুপাল এবং হায়দ্রাবাদে।

বহু সংবাদপত্র পত্রিকার বিভিন্ন সংবাদের উৎস পি. আই. বি। ক্ষুদ্র সংবাদপত্র এবং বড়ো শহরের বাইরে বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র বিশেষভাবে নির্ভর করেন পি. আই. বি. প্রচারিত বিভিন্ন সংবাদের উপর। এই পত্রিকাগুলি পি. আই. বি. কে তাঁদের সংবাদের অন্যতম মূল উৎস হিসাবে গণ্য করেন এবং পি. আই. বি-র উপর নির্ভর করেন।

ক্ষুদ্র এবং মাঝারি সংবাদপত্রের সুবিধার জন্য পি. আই. বি. ইংরাজি, হিন্দী এবং আরো ষোলোটি আঞ্চলিক ভাষায় বিশেষ পরিষেবা যোগান দেন। সাপ্তাহিক সংক্ষিপ্ত সংবাদ, বিভিন্ন বিষয়ে ফোটো সহযোগে ফিচার, অর্থনৈতিক সংক্ষিপ্ত সংবাদ, কৃষি বিষয়ক নিউজলেটার, বিজ্ঞানের সংবাদ, স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনার বিশেষ সংবাদ নিয়মিত যোগান দেন পি. আই. বি।

৬.৪.৪ চলচ্চিত্র

ফিল্মস ডিভিশন (Films Division) ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের একটি বিভাগ।

এই বিভাগ বিভিন্ন সংবাদ এবং সাময়িক প্রসঙ্গ দেশের সাধারণ মানুষকে বিশেষ ক'রে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষকে জানানোর জন্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন এবং প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। এই সব চলচ্চিত্র এবং বিভিন্ন বিশেষ বিষয়ের উপর নির্মিত তথ্যচিত্র বিশেষ ক'রে গ্রামাঞ্চলের মানুষদের মধ্যে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। এই সব চলচ্চিত্র বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় নির্মিত হওয়ার ফলে গ্রামাঞ্চলের মানুষের উপর বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে। দশটি সেন্টারের মাধ্যমে দেশ জুড়ে এই সব চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে।

দেশের স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন মানুষের অপ্রতুলতা এবং শিক্ষার মান বিশেষ উল্লেখযোগ্য না হওয়ায় চলচ্চিত্র অত্যন্ত প্রভাবশালী মাধ্যম হিসাবে কার্যকরী। কারণ এটি শ্রাব্য-দৃশ্য মাধ্যম। বিভিন্ন মন্ত্রকের প্রয়োজন অনুসারে ফিল্মস ডিভিশন নানা শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন এবং প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। নির্মিত চলচ্চিত্রের প্রভাব বাড়ানোর জন্য কার্টুন এবং অন্যান্য টেকনিক ব্যবহার করা হয়।

৬.৪.৫ প্রকাশনা

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের "পাবলিকেশনস ডিভিশন" (The Publications Division) রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো প্রকাশনা সংস্থা।

পাবলিকেশনস ডিভিশন অসংখ্য বই প্রকাশ করেছেন।

হিন্দী, ইংরাজি এবং অন্যান্য ভাষায় মোট ২১টি পত্রিকা প্রকাশ করেন পাবলিকেশনস ডিভিশন।

উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ে মাসিকপত্র "যোজনা" প্রকাশিত হয় ১৩টি ভারতীয় ভাষায়। বিশেষ ক'রে গ্রামীণ উন্নয়নের বিষয়ে পত্রিকা "কুরুক্ষেত্র" প্রকাশিত হয় ইংরাজি এবং হিন্দী ভাষায়। ছোটদের জন্য বিশেষ পত্রিকা "বালভারতী" এবং সাহিত্য পত্রিকা "আজকাল" প্রকাশিত হয় হিন্দী ভাষায়।

৬.৪.৬ প্রদর্শনী

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের একটি প্রদর্শনী বিভাগ আছে। এই বিভাগের কাজ বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনীর আয়োজন ক'রে সরকারি নীতি, কর্মসূচী ইত্যাদি জনসাধারণকে জানানো।

মোট ৩৫টি ইউনিট দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা বিষয়ের উপর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। আরো ৭টি চলমান (mobile) ইউনিট আছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রদর্শনীর জন্য। বিশেষ ক'রে পরিবার পরিকল্পনার প্রচারের জন্য ৭টি প্রদর্শনী ইউনিট আছে।

৬.৪.৭ ফিল্ড পাবলিসিটি

গ্রামীণ অঞ্চলে ব্যক্তিগত পারস্পরিক যোগাযোগের জন্য বৃহত্তম মাধ্যম—ফিল্ড পাবলিসিটি ইউনিট। ভারতে, গ্রামীণ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য অদ্বিতীয় মাধ্যম। এঁদের কাজ অবশ্যই সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং কর্মসূচী সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করা। সেই সঙ্গে, সরকারের বিভিন্ন নীতি এবং কর্মসূচী সম্বন্ধে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া অনুধাবন ক'রে সরকারকে অবহিত করাও এঁদের কাজ। অর্থাৎ, গণজ্ঞাপনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করেন ফিল্ড পাবলিসিটি বিভাগ।

৬.৪.৮ সংগস এ্যান্ড ড্রামা ডিভিশন

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের বিভাগ সংগস এ্যান্ড ড্রামা ডিভিশন। নামেই পরিচয়—সঙ্গীত এবং নাটকের মাধ্যমে প্রচার করার জন্য বিশেষ ইউনিট। এঁরা বিশেষ ক'রে আমাদের পরম্পরাগত বা ঐতিহ্যগত মাধ্যম যেমন যাত্রা, কবির লড়াই ইত্যাদি আঙ্গিকে তথ্য পরিবেশন করেন যাতে প্রচার মনোগ্রাহী হয় এবং প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। বলা বাহুল্য, এই মাধ্যমের বিশেষ লক্ষ্য গ্রামীণ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ।

৬.৪.৯ ডি. এ. ভি. পি.

ডাইরেক্টরেট অফ এ্যাডভারটাইজিং এ্যান্ড ভিসুয়াল পাবলিসিটি, সংক্ষেপে ডি.এ.ভি.পি. (Directorate of Advertising and Visual Publicity—DAVP)। তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের সংস্থা।

জে. এম. সি. ৬ খ পাঠক্রমে "বিজ্ঞাপন" বিষয়ে ৮.২ এককে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৬.৫ রাজ্য সরকারের গণমাধ্যম

কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব গণমাধ্যম বিষয়ে ৬.২ এককের আলোচনায় যে বক্তব্য রাখা হয়েছে, সেই বক্তব্য রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য। একই কারণে, বিভিন্ন রাজ্য সরকারও নিজস্ব একাধিক গণমাধ্যম পরিচালনা ক'রে থাকেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ করেন পাঁচটি ভাষায়। ইংরাজি ভাষায় মাসিকপত্র "ওয়েষ্ট বেঙ্গল", বাংলা মাসিকপত্র "পশ্চিমবঙ্গ", হিন্দি পাক্ষিক পত্রিকা "পশ্চিম বঙ্গাল", উর্দু পাক্ষিক পত্রিকা "মাগবেরী বঙ্গাল" এবং সাঁওতালি ভাষায় পাক্ষিক পত্রিকা "পছিল বাংলা"। এই পত্রিকাগুলির মাধ্যমে রাজ্য সরকার তাদের বিভিন্ন কর্মসূচী

সম্বন্ধে রাজ্যের মানুষকে অবহিত রেখে, সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচীর সমর্থনে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এই পত্রিকাগুলি সম্পাদনা এবং প্রকাশ করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। এই পত্রিকাগুলি ছাড়া, রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর শিক্ষা দর্পণ নামে একটি পত্রিকার মাধ্যমে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবগত রাখেন। সেচ দপ্তর এবং বন দপ্তর এবং পূর্ত দপ্তরও নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশ করেন একই উদ্দেশ্যে। লোক সংস্কৃতি বিভাগ প্রকাশ করেন "লোকবার্তা"।

কেন্দ্রিয় সরকারের সংগস এ্যান্ড ড্রামা ডিভিশনের মতো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা গান, নাটক এবং যাত্রা অভিনয়ের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করেন। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কাজকর্মের বিষয়ও নাটক, যাত্রা ইত্যাদির মাধ্যমে জনসমক্ষে পেশ করা হয়।

ভারতের সব রাজ্যই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মতো বিভিন্ন নিজস্ব গণমাধ্যমের সাহায্যে সরকারের কর্মসূচীর অনুকুলে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।

৬.৬ সারাংশ

বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মতো সরকারেরও জন-সংযোগের বিশেষ প্রয়োজন আছে। কারণ, সরকারের বিভিন্ন নীতি এবং কর্মসূচীর স্বপক্ষে জনসাধারণের ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা আবশ্যক। সংবাদ মাধ্যমগুলি সাধারণত সরকারের দোষ ত্রুটি এবং বিভিন্ন কাজে ব্যর্থতাই জনসমক্ষে তুলে ধরেন। কারণ, সংবাদ মাধ্যমের গ্রাহকরা এই ধরণের সংবাদ বেশি পছন্দ করেন।

সরকারের বক্তব্য তুলে ধরা এবং সরকারের কর্মসূচীর অনুকুলে সাধারণ মানুষের ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা কেন্দ্র এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারের পক্ষে বিশেষ জরুরি।

পাবলিক সেক্টরের জন-সংযোগের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। ভারতের শিল্প বাণিজ্যে পাবলিক সেক্টরের দায়িত্ব এবং অবদান ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্ব থেকে পৃথক। ভারতের পাবলিক সেক্টর দেশের নাগরিকদের কাছে দায়বদ্ধ। এই দায়বদ্ধতা পাবলিক সেক্টরকে ভারতীয় অর্থনীতিতে এক বিশেষ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। সর্বসাধারণের কাছে পাবলিক সেক্টরের এই দায়বদ্ধতাই পাবলিক সেক্টরের জন-সংযোগ-এর দায়বদ্ধতা বাড়িয়ে দিয়েছে। পাবলিক সেক্টরের জন-সংযোগ অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জন-সংযোগ নয়। বিশেষ জন-সংযোগ। দায়বদ্ধতার জন-সংযোগ। পাবলিক সেক্টরের জন-সংযোগ কর্মীদের বিশেষ সচেতনতাই পাবলিক সেক্টরের উদ্দেশ্য এবং চিন্তাধারার সাফল্যের জন্য মনোভাব গড়ে তুলতে সক্ষম।

সরকারের নিজস্ব বক্তব্য জনসাধারণকে জানানোর জন্য সরকার কতকগুলি নিজস্ব গণমাধ্যম পরিচালনা করেন। এই সরকারি গণমাধ্যমগুলি সরকারের কর্মসূচী এবং নীতির স্বপক্ষে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

ভারত সরকারের গণমাধ্যম—প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো, ফিল্মস্ ডিভিশন, প্রকাশনা, ডি.এ.ভি.পি., সংস্ এ্যান্ড ড্রামা ডিভিশন ইত্যাদি।

বিভিন্ন রাজ্য সরকারও কেন্দ্রিয় সরকারের মতো নিজস্ব গণমাধ্যম পরিচালনা করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশ এবং লোকরঞ্জন শাখা পরিবেশিত নাটক, যাত্রা ইত্যাদির সাহায্যে রাজ্য সরকারের নীতি ও কর্মসূচীর অনুকুলে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।

৬.৭ অনুশীলনী

১। সবকারের জন-সংযোগ প্রয়োজন হয় কেন? সরকারের জন-সংযোগ-এর সমস্যা কী?

২। পাবলিক সেক্টরের জন-সংযোগের বিশেষত্ব কী?

৩। ভারত সরকারের গণমাধ্যমগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৪। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গণমাধ্যমগুলির উদ্দেশ্য কী? বিভিন্ন মাধ্যমের প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।

টীকা লিখুন ঃ

ক. আকাশবাণী, খ. দূরদর্শন, গ. ডি.এ.ভি.পি., ঘ. প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো, ঙ. লোকরঞ্জন শাখা।

৬.৮ গ্রন্থপঞ্জি

1. Public Relation in Business & Public Administration — V. M. Dhekney.

2. Public Relations in India — J. M. Kaul.

একক ৭ ❑ প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞাপন

গঠন

৭.০ উদ্দেশ্য

৭.১ প্রস্তাবনা

৭.২ প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞাপন কী

৭.৩ নিত্যকর্মের জ্ঞাপন

৭.৩.১ পরিচিতি

৭.৪ প্রতিষ্ঠানের জন-সংযোগমূলক জ্ঞাপন

৭.৪.১ প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপন

৭.৪.২ পোষিত বা স্পনসরড কর্মসূচী

৭.৫ সংকট নির্বাহ

৭.৫.১ সংকটের মোকাবিলা

৭.৬ কেস স্টাডি

৭.৭ জ্ঞাপন নিরীক্ষণ

৭.৮ সারাংশ

৭.৯ অনুশীলনী

৭.১০ গ্রন্থপঞ্জি

৭.০ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞাপন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞাপন বলতে কী বোঝায়, বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞাপনের লক্ষ্য কী, ও কেমন ভাবে এবং কোন কোন প্রয়োজনীয়তা সাধনের জন্য এইগুলি কার্যকরী করা হয়। প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি প্রতিষ্ঠা করা এবং ভাবমূর্তি নির্মাণে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞাপনের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। এই এককটি পাঠ ক'রে আপনারা নিচের বিষয়গুলি বুঝতে পারবেন।

- প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞাপন কী
- প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব
- নিত্যকর্মের জ্ঞাপনের প্রভাব
- প্রতিষ্ঠানের জনসংযোগ মূলক জ্ঞাপন
- সংকটকালীন জ্ঞাপন
- জ্ঞাপন নিরীক্ষণ

৭.১ প্রস্তাবনা

গণ জ্ঞাপনের একটি বিশেষ অংশ প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞাপন। যে কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই, সে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানই হোক বা ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানই হোক, প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের জন্য জ্ঞাপন পদ্ধতির প্রয়োগ এবং ব্যবহার অপরিহার্য। সাফল্য কেন, যে কোনো প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বও অনেকটাই নির্ভর করে জ্ঞাপন পদ্ধতির কৌশলী প্রয়োগের উপর।

যে কোনো প্রতিষ্ঠানকেই বিভিন্ন গ্রাহক, পরিবেষক, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সরকার এবং সমাজের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। এই যোগাযোগই জ্ঞাপন পদ্ধতির প্রয়োগ। বুঝতেই পারছেন, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ব্যতীত কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই কাজকর্ম করা এবং পণ্য অথবা পরিষেবার দ্বারা গ্রাহকের সন্তুষ্টি বিধান করা সম্ভব নয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জ্ঞাপন প্রক্রিয়ার প্রয়োগ ব্যতীত বর্তমান যুগে কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই কাজকর্ম করা এবং সফল হওয়া সম্ভব নয়।

প্রতিষ্ঠানের জ্ঞাপনের দুটি অংশ আছে। প্রথম অংশ—প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কাজকর্ম বা নিত্যকর্ম সুষ্ঠুভাবে এবং সাফল্যের সঙ্গে করার জন্য বিভিন্ন উপায়ে জ্ঞাপন। এই পদ্ধতির প্রয়োগের দ্বারাই প্রতিষ্ঠান একটি নিজস্ব পরিচিতি প্রতিষ্ঠা করে, প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত সকলের কাছে। ফলে, সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে প্রতিষ্ঠানের একটি বিশেষ পরিচিতি গড়ে ওঠে। এই পরিচিতি প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নির্মাণে সহায়ক হয়।

দৈনন্দিন, নিত্যকর্মের জ্ঞাপন ব্যতীত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ জ্ঞাপন পদ্ধতিরও প্রয়োগ করতে হয়। বিশেষ জনগোষ্ঠী, যেমন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সরকার, বিনিয়োগকারী, শ্রমিককর্মচারী এবং সমাজের কাছে প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্য, উজ্জ্বল ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করাও প্রতিষ্ঠানের জ্ঞাপনকর্মের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এই সব জনগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্যতা না থাকলে কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সফল হওয়া এবং অগ্রগতি বজায় রাখা সম্ভব নয়।

প্রতিষ্ঠান মাত্রেই বিভিন্ন সময়ে, নানা রকম সংকটের মুখোমুখি হয়। সংকটকালে প্রতিষ্ঠানের জ্ঞাপন এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। জন-সংযোগ বিষয়ে জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকে, যদি না, প্রতিষ্ঠানের জ্ঞাপনের বিভিন্ন ভূমিকা সম্পর্কে যথেষ্ট পরিষ্কার ধারণা থাকে।

৭.২ প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞাপন কী

ছোটো, বড়ো এবং মাঝারি যে কোনো প্রতিষ্ঠানই তাঁদের কাজকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখেন। আবার, তাঁদের পণ্য এবং পরিষেবার গ্রাহক এবং সমাজের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট অংশের সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করেন। এই যোগাযোগই প্রতিষ্ঠানের জ্ঞাপন। প্রতিষ্ঠানের জ্ঞাপনের উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে গ্রহণযোগ্য, আস্থাব্যঞ্জক ধারণা সৃষ্টি করা, যার ফলে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সাফল্যের সঙ্গে কাজকর্ম করা সম্ভব হয়।

ব্যক্তিগত জীবনে, বিভিন্ন লোকের সঙ্গে যোগাযোগের ফলস্বরূপ তাঁদের সম্পর্কে আপনাদের মনে বিভিন্ন ধারণা গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে, এই সব লোকের সঙ্গে ব্যবহারে আপনাদের মনে এই পূর্বগঠিত ধারণাগুলি একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কোনো প্রতিষ্ঠানের তৈরি জিনিস আপনি ব্যবহার করবেন কি না অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিষেবা আপনি গ্রহণ করবেন কিনা আপনার এই সিদ্ধান্ত বহুলাংশে নির্ভর করে, ঐ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মনে যে ধারণা গড়ে উঠেছে, তার উপর।

আর, প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আপনার মনে বিভিন্ন ধারণা গড়ে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টায় রয়েছে—প্রতিষ্ঠানের জ্ঞাপন কর্ম।

প্রতিষ্ঠানের জ্ঞাপন কর্মের উদ্দেশ্য কী? মনে করুন আপনি কোনো জিনিস কেনার জন্য ভাবছেন। অথবা, কোনো পরিষেবা যেমন ব্যাঙ্কিং বা বিমা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য চিন্তা করছেন। তখন স্বভাবতই প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে আপনার ধারণা আপনার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবে। এই পণ্য বা পরিষেবা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি আপনার মনকে প্রভাবিত করবে। প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা পরিষেবা সম্পর্কে আপনার অধীত জ্ঞান এবং অন্যান্য গ্রাহকদের এই বিষয়ে অভিজ্ঞতার বিষয়ও আপনার মনকে প্রভাবিত করবে। প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের রেকর্ড, খ্যাতি বা সুনাম, সব কিছু মিলে, আপনার ধারণায় ইতিবাচক হলে, তবেই আপনি ঐ প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা পরিষেবা গ্রহণ করবেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এতগুলি প্রশ্নের উত্তর জানিয়ে, প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মনে ইতিবাচক ধারণা কে গড়ে তুলবে? প্রতিষ্ঠানের জ্ঞাপনকর্মই এই গুরু দায়িত্ব পালন করে।

প্রতিষ্ঠানের জ্ঞাপন পদ্ধতি, দীর্ঘ সময় ধরে, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে, তিল তিল ক'রে আপনার মনে প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে ইতিবাচক, গ্রহণযোগ্য এবং আস্থাব্যঞ্জক ধারণা গড়ে তোলার প্রয়াস করে যাচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানের জ্ঞাপন কখনো কখনো তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া বা ফলের জন্য করা হলেও, সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী ফলের জন্যই প্রতিষ্ঠানের জ্ঞাপন কর্ম পরিকল্পনা এবং সম্পাদন করা হয়। যেমন, ধরা যাক, কোনো প্রতিষ্ঠানের তৈরি কোনো জিনিস ব্যবহার ক'রে আপনি দেখলেন জিনিসটির মান ঠিক নেই। অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি মতো নয়। আপনি জিনিসটির মোড়ক সমেত চিঠি দিয়ে আপনার ক্ষোভের কথা প্রতিষ্ঠানকে জানালেন। দশ দিনের মধ্যেই আপনি ঐ প্রতিষ্ঠানের মার্কেটিং ম্যানেজারের স্বাক্ষর করা চিঠি পেলেন। জিনিসটি আপনাকে সন্তুষ্ট করতে না পারায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সঙ্গে আবার ঐ জিনিসটি পাঠিয়ে আপনাকে অনুরোধ করেছেন জিনিসটি ব্যবহার ক'রে দেখতে, জিনিসটির মান আপনার আশানুরূপ আছে কি না। প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আপনার সঙ্গে এই যোগাযোগ বহু বছর এই প্রতিষ্ঠানের তৈরি জিনিস ব্যবহার করতে আপনাকে উৎসাহিত করবে। কারণ, প্রতিষ্ঠানটির জ্ঞাপনকর্ম আপনার মনে প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে ইতিবাচক ধারণা গড়ে তুলেছে। আপনি বিশ্বাস করেন, প্রতিষ্ঠানটি গ্রাহকদের বিশেষ গুরুত্ব দেন এবং গ্রাহকদের মতামতেরও গুরুত্ব দেন। গ্রাহকদের সন্তুষ্ট রাখাই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য। আপনার অভিযোগ একজন সিনিয়র ম্যানেজার বিবেচনা করেছেন এবং নিজে আপনাকে চিঠি দিয়েছেন। আবার, সঙ্গে ঐ জিনিসটি পাঠিয়ে আপনাকে ব্যবহার ক'রে দেখার জন্য অনুরোধ করেছেন। আপনার মনে ধারণা সৃষ্টি হলো, আপনি ঐ প্রতিষ্ঠানের এক গুরুত্বপূর্ণ গ্রাহক। জিনিসটি ব্যবহারের ফলে সন্তুষ্টির সঙ্গে যুক্ত হলো আপনার মানসিক সন্তুষ্টি। প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা পরিষেবা সম্পর্কে আপনার মনে গ্রহণযোগ্য, ইতিবাচক, আস্থাব্যঞ্জক ধারণার সৃষ্টি হলো। প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘকাল এর সুবিধা ভোগ করবে। আপনি নিশ্চয় আরো অনেককে, আপনার পরিচিত লোককে, আপনার এই অভিজ্ঞতার কথা বলবেন। প্রতিষ্ঠানটির সুবিধার ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হবে।

প্রতিষ্ঠানের জ্ঞাপন কর্মের দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানকে সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। নানাবিধ জ্ঞাপন পদ্ধতির সুচিন্তিত, পরিকল্পিত প্রয়োগ প্রতিষ্ঠানের জ্ঞাপনকর্মের সাফল্য নিশ্চিত করে। প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি প্রতিষ্ঠা করা এবং গ্রহণযোগ্য ভাবমূর্তি গড়ে তোলাই প্রতিষ্ঠানের জ্ঞাপন কর্মের উদ্দেশ্য। কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি এবং ভাবমূর্তিই গ্রাহকদের কাছে প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতার মাপকাঠি।

৭.৩ নিত্যকর্মের জ্ঞাপন

সব প্রতিষ্ঠানকেই নিত্যকর্মের জ্ঞাপন পদ্ধতি অনুসরণ এবং প্রয়োগ করতে হয়। বিভিন্ন কাজকর্মের জন্য। উৎপাদিত পণ্য অথবা পরিষেবার বিষয়ে পরিবেষক এবং গ্রাহকদের সঙ্গে মতবিনিময় বা সংবাদ আদানপ্রদান করা প্রতিষ্ঠানের নিত্য কর্মের অঙ্গ হিসাবে গণ্য হয়। নিত্যকর্মের জ্ঞাপনের জন্য ব্যবহার করা হয়—

চিঠিপত্র/লেটারহেড

লোগো

সাইনবোর্ড

পণ্যের বিষয়ে ফোল্ডার

প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে বুকলেট

প্রতীক

মোড়ক

আপনারা জানেন, যে কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার জন্য উপরে লিখিত জ্ঞাপন পদ্ধতিগুলি সব সময় প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। সত্য বলতে কী নিত্যকর্মের এই সব জ্ঞাপন পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যতীত কোনো প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম পরিচালনা করা, এমন কী প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বজায় রাখাও সম্ভব নয়।

নিত্যকর্মের এই সব জ্ঞাপন উপকরণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য অবশ্যই একটি বিশেষ কাজ সম্পন্ন করা। কোনো গ্রাহক বা পরিবেশক পণ্য বা পরিষেবা সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে, প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পত্র দ্বারা সেই সংবাদ জানানো হয়। এটি অবশ্যই নিত্য কর্মের বা রুটিন কাজকর্মের জ্ঞাপন পদ্ধতি। কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দিতে কত সময় লাগছে, উত্তরের ভাষা কী রকম, বাচনভঙ্গী বা লিখনভঙ্গী কেমন, এই সব মিলে গ্রাহকের মনে একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এই প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ গ্রাহকের মনে প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে একটি ধারণা গড়ে ওঠে। যে কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই এই ধারণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সব ধারণার সংমিশ্রণেই গ্রাহকের মনে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সফল করার জন্য প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সেই কারণেই কোনো সফল প্রতিষ্ঠান নিত্য কর্মের জ্ঞাপন পদ্ধতিকে অবহেলা করেন না। বরং, বিশেষ গুরুত্ব দেন। নিত্যকর্মের জ্ঞাপন পদ্ধতির উপর পরিচালন কর্তৃপক্ষকে সর্বদাই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়।

প্রতিষ্ঠানের পাঠানো পত্রের ভাষা কেমন হবে, বক্তব্যের বাচনভঙ্গী বিনীত হবে না ঔদ্ধত্যপূর্ণ হবে, সে বিষয়ে সজাগ না হলে, প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্য, ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তোলা সম্ভব নয়। নিত্যকর্মের জ্ঞাপনই প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি গড়ার প্রয়াস নিয়মিত, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ক'রে চলে।

মনে রাখতে হবে, নিত্যকর্মের জ্ঞাপন পদ্ধতি কোনো প্রতিষ্ঠানের যে ভাবমূর্তি গড়ে তোলে সেই ভাবমূর্তিই মানুষের মনে স্থায়ী আসন ক'রে নেয়।

৭.৩.১ পরিচিতি (Identity)

নিত্যকর্মের জ্ঞাপন পদ্ধতির একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ প্রতিষ্ঠানের একটি পরিচিতি জনসমক্ষে তুলে ধরা এবং প্রতিষ্ঠা করা। ইতিবাচক পরিচিতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করার পথ সুগম হয়।

যে কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিচিতির চারটি মূল উপাদান—নাম, প্রতীক, নামের জন্য ব্যবহৃত হরফের চরিত্র এবং রং।

লেটার হেড ঃ যে কোনো প্রতিষ্ঠানের লেটারহেড প্রতিষ্ঠানের একটি বিশেষ পরিচয় বহন করে। লেটারহেডে ব্যবহৃত বিভিন্ন টাইপের আকার ও চরিত্র, লেটারহেডের বিন্যাস এবং রঙের ব্যবহার, প্রতিষ্ঠানের একটি বিশেষ চরিত্র আপনার সামনে তুলে ধরে। লেটারহেড আপনার চোখের দৃষ্টির মাধ্যমে একটি বিশেষ চরিত্র আপনার সামনে উপস্থিত করে। লেটারহেড দেখে আপনার ধারণা সৃষ্টি হয়—প্রতিষ্ঠানটি পুরানো ধারণায় পরিচালিত না আধুনিক। প্রতিষ্ঠানটি

বিশাল, গম্ভীর, ধীরগতিসম্পন্ন অথবা প্রতিষ্ঠানটি আধুনিক, প্রাণবন্ত, পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে দ্রুত পা মিলিয়ে চলছে। প্রতিষ্ঠানটি নাগালের বাইরে, দূরত্ব রেখে চলে অথবা সংবেদনশীল। নিত্যকর্মের জন্য ব্যবহৃত প্রতিষ্ঠানের লেটারহেড প্রতিষ্ঠানের একটি বিশেষ পরিচিতি প্রতিষ্ঠা করে।

লেটারহেডে ব্যবহৃত একটি বা দুটি বিশেষ রং প্রতিষ্ঠানের পরিচিতির বিশেষ উপাদান হতে পারে। ধরা যাক, কোনো প্রতিষ্ঠানের লেটারহেড-এ নীল রঙের একটি বিশেষ শেড (shade) ব্যবহার করা হয়। বছরের পর বছর একটি প্রতিষ্ঠানকে ঐ বিশেষ নীল রং ব্যবহার করতে দেখলে, আপনার মনে ঐ বিশেষ নীল রঙের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির একটি ওতপ্রোত সম্পর্ক প্রতিফলিত হবে। ঐ নীল রংটি দেখামাত্রই ঐ প্রতিষ্ঠানটির কথা আপনার মনে পড়বে। অনেক প্রতিষ্ঠানই তাঁদের নিত্যকর্মের বিভিন্ন জ্ঞাপন উপকরণে একটি বা দু'টি বিশেষ রং ব্যবহার করেন। যার ফলে, প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি আরো সহজ হয়ে ওঠে।

সাইনবোর্ড ঃ বিভিন্ন বড়ো প্রতিষ্ঠানের সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে শাখা অফিস এবং বিক্রয়কেন্দ্র। প্রতিটি অফিসেই প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড থাকে। এই সাইনবোর্ডগুলি সর্বত্র একইভাবে, কোনো বিশেষ হরফে লেখা হলে এবং কোনো বিশেষ রঙের হলে, প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি একটি বিশেষ মাত্রা পায়। আপনার পক্ষে সাইনবোর্ড দেখে প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা সহজ এবং সম্ভব হয়। সেই সঙ্গে, নতুন কোনো জায়গায় গিয়ে আপনি ঐ বিশেষ প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড দেখলে, চিন্তা করেন—বাঃ! এখানেও এদের কাজকর্ম আছে! আপনারা হয়তো লক্ষ্য ক'রে থাকবেন, আমাদের ব্যাঙ্কগুলি প্রত্যেকটি একটি নিজস্ব হরফের প্যাটার্ন এবং একটি বিশেষ রং ব্যবহার করেন। যেমন, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ব্যবহার করেন সবুজ রং। আই সি আই সি আই ব্যাঙ্ক ব্যবহার করেন লাল রং।

প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত পুস্তিকা ঃ পণ্য বা পরিষেবার পরিচায়ক ফোলডার বা বুকলেট, সব কিছুতেই প্রতিষ্ঠানের পরিচায়ক একটি বিশেষ রং ব্যবহার করা হয় প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি সহজ করার জন্য। ঐ বিশেষ রংটি দেখেই আপনি চিহ্নিত করতে পারেন কোন প্রতিষ্ঠান সেটি পাঠিয়েছেন।

লোগো ঃ কোনো বিশেষ স্টাইলে বা বিশেষ চরিত্রের হরফে প্রতিষ্ঠানের নাম বা নামের কোনো অংশ ব্যবহার করা হয়। ঐ বিশেষ হরফে লেখা বা চিত্রিত প্রতিষ্ঠানের নাম—প্রতিষ্ঠানের 'লোগো' হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যতীরেকে প্রতিষ্ঠানের কোনো পণ্যের নামও একইভাবে উপস্থাপন করা যায়। আপনারা দেখেছেন—"ডানলপ", "সাহারা" ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের লোগো এবং "উইলস" ইত্যাদি পণ্যের লোগো। প্রতিষ্ঠানের এবং পণ্যের লোগো পরিচিতির এবং চিহ্নিতকরণের বিশেষ সহায়ক।

প্রতীক ঃ পরিচিতির আর একটি বিশেষ সহায়ক—প্রতীক। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একটি বিশেষ প্রতীক নির্বাচন করেন এবং প্রচার করেন—প্রতিষ্ঠানের পরিচিতির সুবিধার জন্য। যেমন—একটি জ্বলন্ত প্রদীপকে দুদিক থেকে দুটি হাত আগলে রয়েছে। এই প্রতীকটি আপনাকে মনে করিয়ে দেয়, বা পরিচয় ক'রে দেয়—জীবনবিমা। প্রতিষ্ঠানের নিত্যকর্মের জ্ঞাপনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়—রং, লোগো এবং প্রতীক।

পণ্যের মোড়ক ঃ আগেই আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন রং ব্যবহার করেন পরিচিতি সহজ করার জন্য। অনেক সময়েই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাঁদের পণ্যের মোড়কেও প্রতিষ্ঠানের পরিচিতির ঐ বিশেষ রং ব্যবহার করেন। এর ফলে, গ্রাহকদের পক্ষে প্রতিষ্ঠান এবং পণ্য দুই-ই চিহ্নিত করা সহজ হয়। বিশেষ ক'রে, ওষুধ প্রতিষ্ঠানগুলি প্রত্যেকেই একটি বিশেষ রং ব্যবহার করেন তাঁদের পণ্যের মোড়কে। সে মোড়ক শিশির লেবেলেই হোক বা কার্টন হোক অথবা ট্যাবলেটের বাক্সই হোক। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রং অনুসারে ওষুধের দোকানে ওষুধগুলি সাজানো হয়। গ্রাহক এসে কোনো ওষুধ চাইলে সেটিকে চিহ্নিত ক'রে বার করাও সহজ হয়।

প্রতিষ্ঠানের নিত্যকর্মের জ্ঞাপন কর্মের বিভিন্ন উপকরণের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব বোঝা গেল।

৭.৪ প্রতিষ্ঠানের জন-সংযোগমূলক জ্ঞাপন

আধুনিক পরিচালন ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানের জ্ঞাপন কর্মের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। অধিকাংশ পরিচালন কর্তৃপক্ষই এ বিষয়ে সচেতন। অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানের জ্ঞাপন বিষয়ে আলোচনায়, বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়, কর্তৃপক্ষ প্রথমেই চিন্তা করেন—মাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়টি। আবার, প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনের বিষয়ও আলোচনা করা হয়। এগুলি, জ্ঞাপন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন উপায় মাত্র। কোনো উপায় বা পদ্ধতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে জানা প্রয়োজন—জ্ঞাপন প্রক্রিয়ার বিষয়বস্তু কী হবে? কী ভাবে এবং কার উদ্দেশ্যে জ্ঞাপন করা হবে? জ্ঞাপনের উদ্দেশ্য কী?

কোনো প্রতিষ্ঠানের জ্ঞাপন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম বা ব্যবসা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য কেবল একটি আর্থিক বছরের উদ্দেশ্য নয়—আগামী পাঁচ বছরের, অথবা আরো বেশি দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। আর সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কী কী কার্যসূচী অনুসরণ করা হবে। কোনো প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি রাতারাতি গড়ে তোলা সম্ভব নয়। একটি প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য ভাবমূর্তি গড়ে তোলার জন্য বেশ কয়েক বছর সময় লাগে। পরিচালন কর্তৃপক্ষের চিন্তাধারার সঙ্গে সম্যক পরিচয় না থাকলে কোনো পেশাদার যোগাযোগকারীর (communicator) পক্ষে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি গড়ার সঠিক পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়।

প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য এবং কর্মপদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে প্রতিষ্ঠানের জ্ঞাপনকর্মের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

এর পরে জানা দরকার কাদের লক্ষ্য ক'রে বা উদ্দেশ্য ক'রে জ্ঞাপনকর্মের পরিকল্পনা করা হবে। এই জ্ঞাপনকর্মের শ্রোতা (audience) কারা?

কোনো জ্ঞাপনকর্মের পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে জানা প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পাবলিকের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা কী রকম? ব্যাপারটা অনেকটা আয়নায় মুখ দেখার মতো। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পাবলিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কী ভাবছেন? কী ধারণা করছেন? বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পরিচালন কর্তৃপক্ষের ধারণার সঙ্গে বিভিন্ন পাবলিকের ধারণার অনেক পার্থক্য। প্রতিষ্ঠানের জ্ঞাপন কর্মের উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে পরিচালন কর্তৃপক্ষ যেমন চান, বিভিন্ন পাবলিক যেন সেই ধারণাই পোষণ করেন। এই কাজ করতে হলে প্রথমে জানা প্রয়োজন—

- প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পাবলিক প্রতিষ্ঠানকে কেমন চোখে দেখছেন?
- প্রতিষ্ঠানের শক্তি এবং দুর্বলতা সম্পর্কে পাবলিকের ধারণা কী?
- প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে পাবলিকের অবগতির মাত্রা কেমন?
- প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে অবস্থান কী?
- পরিচালন কর্তৃপক্ষের সম্পর্কে পাবলিকের ধারণা কী রকম?
- যে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান কাজ করছেন, সেই ক্ষেত্রের জন্য কোন কোন বিশিষ্টতা থাকা প্রয়োজন বলে পাবলিকের ধারণা?

রিসার্চ বা গবেষণার দ্বারা এই প্রশ্নগুলির উত্তর সংগ্রহ করতে সক্ষম হলে, জ্ঞাপনের উদ্দেশ্য এবং কৌশল নির্ধারণ

করা সহজ হয়। আর, বিশেষ লাভ, পাবলিকের কাছে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি কীরকম, সে বিষয়ে পরিচালন কর্তৃপক্ষের ধারণা স্পষ্ট হয় এবং ভুল ধারণা শোধন করার সুযোগ পাওয়া যায়।

প্রতিষ্ঠানের জ্ঞাপনকর্মের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করতে হবে। বিভিন্ন পাবলিকের জন্য জ্ঞাপনকর্মের উদ্দেশ্য বিভিন্ন হতে পারে। তারপর স্থির করতে হবে, বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন কোন পাবলিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেই পাবলিককে উদ্দেশ্য করেই প্রতিষ্ঠানের জ্ঞাপনকর্ম পরিকল্পনা করতে হবে। যদিও পরিচালন কর্তৃপক্ষের প্রবণতা থাকে বিভিন্ন পাবলিকের উদ্দেশ্যে একই বার্তা, একই ভাবে প্রচার করার, বিভিন্ন পাবলিকের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বার্তা, বিভিন্ন কৌশলে জ্ঞাপন করার পরিকল্পনাই বেশি ফলদায়ক।

মনে রাখতে হবে, কোনো পরিকল্পনাই শেষ কথা নয়। পরিস্থিতি পরিবর্তনশীল, প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম এবং প্রস্তাবনাও পরিবর্তনশীল। এই সব পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জ্ঞাপন পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, বার্তা এবং কৌশলের প্রয়োগ বিষয়ে নিয়ত পরিবর্তনশীল পরিকল্পনা প্রয়োজন।

কোনো প্রতিষ্ঠানের জন-সংযোগমূলক জ্ঞাপন বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন পাবলিকের জন্য হতে পারে। সেই কারণে, এই সব জ্ঞাপনের পরিকল্পনা বিশেষ যত্নের সঙ্গে করা প্রয়োজন। বিভিন্ন পাবলিকের জ্ঞাতব্য বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। আবার, প্রতিষ্ঠানও বিভিন্ন পাবলিকের কাছে বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়ার প্রত্যাশায় জন-সংযোগমূলক জ্ঞাপন পরিকল্পনা করেন। সেই কারণে প্রত্যেক চিহ্নিত পাবলিকের জন্য পৃথক পৃথক পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। পাবলিক অনুসারে প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য যেমন পরিবর্তিত হবে জ্ঞাপনের জন্য মাধ্যমের ব্যবহারও নির্দিষ্ট পাবলিকের উপযোগী হবে।

অর্থনৈতিক/বিনিয়োগ ঃ সকল প্রতিষ্ঠানেরই বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যেমন ব্যাঙ্ক বা বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান, কেন্দ্রিয় এবং রাজ্য সরকারের অর্থসংক্রান্ত বিভাগগুলির সঙ্গে আদান-প্রদান থাকে। এই সব আর্থিক সংস্থাগুলি কোনো প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিশেষ ধরণের সংবাদ জানতে আগ্রহী বোধ করেন। যেগুলি তাঁদের জানা প্রয়োজন। যেমন, প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বাস্থ্য কেমন। লাভের বা লোকসানের পরিমাণ কী, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাই বা কী। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কী ভাবে সংগৃহীত হবে। পরিকল্পনাগুলির সাফল্যের সম্ভাবনাই বা কতখানি?

এই সব সংস্থার উদ্দেশ্যে জ্ঞাপন পরিকল্পনায় উপরের উল্লিখিত বিষয়গুলিই প্রাধান্য পাবে। সেই সঙ্গে সকল বার্তাই এমনভাবে পরিবেষণ করা প্রয়োজন, যাতে প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে ইতিবাচক ধারণা গড়ে ওঠে। ইতিবাচক মনোভাবের ফলস্বরূপ, আর্থিক সংস্থাগুলি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে, দ্বিধা না করে প্রয়োজনমত অর্থ জোগানের ব্যবস্থা করেন। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পরিকল্পনায় বিনিয়োগের জন্য বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলি উৎসাহ বোধ করেন।

সরকার ঃ সকল প্রতিষ্ঠানই কাজকর্মের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালনার বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতার জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের যথাযোগ্য মদতের উপর নির্ভরশীল। সেই কারণে, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম এবং পরিকল্পনা সম্বন্ধে অবহিত রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

এই ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠানের জ্ঞাপন বিভিন্ন সরকারি মহলকে অবহিত করার জন্য বিশেষ জ্ঞাপনের চরিত্র গ্রহণ করবে। জ্ঞাপনের উদ্দেশ্য হবে—দেশের অর্থনীতি এবং শিল্পের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, অবদান ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে এবং দপ্তরগুলির পরিচালকবর্গকে অবহিত করা। বুঝতেই পারছেন, জ্ঞাপনের বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনাও পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তিত হবে।

সমাজ ঃ আগেই আলোচনা করা হয়েছে, যে কোনো প্রতিষ্ঠানই সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ। এই দায়িত্ব, প্রতিষ্ঠান

ঠিকমতো পালন করতে সমর্থ হচ্ছে কিনা, এবং সমর্থ না হলে, তার যুক্তিসঙ্গত কারণ কী, সে বিষয়ে সর্বসাধারণকে জানানো যে কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই প্রয়োজনীয়। এই দায়বদ্ধতার জন্য এবং প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি গঠনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিশেষ বিজ্ঞাপনও প্রচার করা হয়।

বিপণন ঃ যে সব প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন পণ্য তৈরি করেন, বা পরিষেবা জোগান দেন বিপণনের জন্য সেই সব প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ জ্ঞাপনের ব্যবস্থা করতে হয়। বিজ্ঞাপন, পণ্যের বা পরিষেবার। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পণ্য বা পরিষেবার বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপিত পণ্যের বা পরিষেবার অনুকূলে মনোভাব গড়ে তোলা। প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মনোভাব গড়ে তোলা। অনুকূল মনোভাব বা গ্রহণযোগ্য ভাবমূর্তির ছত্রছায়ায় প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার পথ সুগম হয়।

শ্রমিক কর্মচারী ঃ যে কোনো প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম ঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন—পরিচালন কর্তৃপক্ষ এবং প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীর মধ্যে সমঝোতা। শ্রমিককর্মচারীদের কাছে প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশা, এবং প্রতিষ্ঠানের কাছে শ্রমিককর্মচারীদের প্রত্যাশা, এই দুইয়ের মেলবন্ধনই যে কোনো প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠু পরিচালনার মূল সূত্র। সকল প্রতিষ্ঠানই এই বিষয়ে সজাগ এবং যত্নশীল। প্রতিষ্ঠানের জন-সংযোগমূলক জ্ঞাপনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ শ্রমিক-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে জ্ঞাপন। এই বিষয়ে পূর্ববর্তী এককগুলিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে

৭.৪.১ প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপন

একটা জায়গায় এসে জন-সংযোগ এবং বিজ্ঞাপন মিলে মিশে এক হয়ে যায়। বলা হয়ে থাকে, বিজ্ঞাপনের জন্য যে যে মাধ্যম ব্যবহার করা হয় সেই সব মাধ্যমই জন-সংযোগের জন্যও ব্যবহার করা হয়।

সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে পণ্য এবং পরিষেবার বাণিজ্যিক কারণে প্রচারের জন্যই বিজ্ঞাপন করা হয়। আবার, কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মানুষকে জানানোর জন্যও বিজ্ঞাপন করা হয়। এক্ষেত্রে, প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কর্মসূচী, কোনো বিশেষ কৃতিত্বের অথবা, প্রতিষ্ঠানের তৈরি সমস্ত পণ্যের বিষয়ে সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। জন-সংযোগ এবং বিজ্ঞাপন, উভয়ই, ভাবমূর্তি সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন। জন-সংযোগের উদ্দেশ্য, প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্য ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য, প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তির সহায়তায় পণ্যের বা পরিষেবার ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং চাহিদা ও বাজার বাড়ানো। কোনো প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আপনার ধারণা কেমন, তার উপরেই নির্ভর করে আপনি ঐ প্রতিষ্ঠানের তৈরি জিনিস কিনে ব্যবহার করবেন কি না। প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আপনার ধারণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জন-সংযোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ প্রতিষ্ঠানের এবং প্রতিষ্ঠানের তৈরি পণ্যের ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা।

প্রতিষ্ঠানের পরিচালন কর্তৃপক্ষকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, প্রতিষ্ঠানের কী ধরণের ভাবমূর্তি তাঁরা গড়ে তুলতে চান। সেই সঙ্গে আরো সিদ্ধান্ত নিতে হয়, প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কী কী ধারণা যেন না গড়ে ওঠে। সংবাদপত্রে, সাময়িক পত্রিকায়, টেলিভিশনে আপনারা দেখছেন, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে কোন কোন অনুন্নত এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে কোন বিশেষ ব্যাঙ্কের কাজের ফলে। আরো দেখছেন, কোনো প্রতিষ্ঠান জানাচ্ছেন বিভিন্ন জিনিস রপ্তানি ক'রে কত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছেন। আবার, কোনো প্রতিষ্ঠান জানাচ্ছেন, তাঁদের বিশেষ প্রচেষ্টায় কী ভাবে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা হচ্ছে। এগুলি সবই বিজ্ঞাপন। প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন, প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপন। জনসংযোগমূলক প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপন।

প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন "সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান"-কেই প্রচার করে, কোনো বিশেষ পণ্যের নয়।

এ বিষয়ে মনে রাখা প্রয়োজন, পণ্যের বিজ্ঞাপন আপনাকে কোনো একটি বিশেষ কাজ করতে আহবান জানায়। পণ্যটি কিনতে এবং ব্যবহার করতে আহবান জানায়। কিন্তু জনসংযোগমূলক প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপনদাতার

প্রয়োজন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী আপনাকে প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে চিন্তা করতে, অর্থাৎ ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে আহ্বান জানায়।

প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন চার রকমের হতে পারে। কোনো কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা। আর এক রকম প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন—সংস্থার কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রচার করা হয়। এই বিজ্ঞাপনে প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য কর্মীদের জানানো হয়, যাতে প্রতিষ্ঠান এবং কর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন নীতি ও পদ্ধতির সম্পর্কে কর্মীদের সমঝোতার সৃষ্টি হয়। আর এক প্রতিষ্ঠানগত বিজ্ঞাপন—জনসেবামূলক বিজ্ঞাপন। জনসাধারণের স্বার্থে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান স্পনসর করা। আর চতুর্থ—সরকার, জনসাধারণ, বিশেষ গোষ্ঠী বা ব্যক্তিকে কোনো বিশেষ কাজের জন্য, বা কোনো বিষয়ে সচেতন করার জন্য আহ্বান করা।

প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন সম্পর্কে প্রায়শই পরিচালন কর্তৃপক্ষের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। এর কারণ সম্ভবত খরচ। প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপন বর্তমানে বিশেষ খরচ স্বাপেক্ষ। অথচ এই বিজ্ঞাপনের ফল বা প্রভাব সহজে বোঝা যায় না। প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপনের সাফল্যের মূল্যায়ন সময় স্বাপেক্ষ এবং কখনো কখনো কেবল গবেষণা করেই জানা সম্ভব। ভাবমূর্তি, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে মানুষের ধারণা হিসাব করার কোনো নিশ্চিত মাপকাঠি নেই। ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তোলার ফলে বাজারে যে প্রভাব সৃষ্টি হয়—সেই প্রভাবও সহজে মাপা সম্ভব হয় না। পণ্যের বিজ্ঞাপনের ফলাফল যেমন বিক্রির অঙ্কের পরিমাণে হিসাব করা সম্ভব হয় প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপনের ফলাফল সেই ভাবে হিসাব করা সম্ভব হয় না। বেশি খরচ এবং ফলাফল সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণার অভাবই, প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিচালন কর্তৃপক্ষকে দ্বিধান্বিত ক'রে তোলে। ফলে, প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপন করেন এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সীমিত। কেবল বিশেষ প্রয়োজনেই প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপন করা হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপনের প্রভাব সম্বন্ধে বিদেশে অনেক গবেষণা হয়েছে। জানা গেছে, প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপন ক'রে থাকেন এমন প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের অবগতির মাত্রা অনেক বেশি। বাজারে তাঁদের পরিচিতির মাত্রা বেশি এবং ভাবমূর্তিও বেশি উজ্জ্বল। প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপন সফল করতে হলে, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও বিজ্ঞাপন প্রচার আবশ্যক।

প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপনের কৌশল ব্যাপক, বহুবিস্তৃত, কিন্তু কার্যকরী। ভাবমূর্তি গড়ে তোলার সঙ্গে, ভাবমূর্তি বজায় রাখা বা রক্ষা করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। নচেৎ, ভাবমূর্তির অবনমন অনিবার্য। প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপনের দ্বারাই ভাবমূর্তির অবনমনের গতি রুদ্ধ ক'রে পুনরায় ঊর্ধ্বমুখী ক'রে তোলা সম্ভব। বিজ্ঞাপনের বার্তায় যে সব বিষয় উল্লেখ করা হয়, তার পরিধির বাইরের কোনো বিষয়ে ভাবমূর্তির লক্ষ্য পূরণ হয় না। প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে গ্রাহকদের মনোভাব এবং ধারণার সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপনে প্রচারিত বার্তার বিশেষ মৌলিক পার্থক্য থাকে না। প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে বিপণন বিশেষজ্ঞ ফিলিপ কোটলারের মত—গ্রাহকমাত্রেই যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জটিল অস্তিত্ব এবং কাজকর্ম সম্বন্ধে মনের মধ্যে একটি সরলীকৃত ধারণা গড়ে তোলেন। প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপন ভাবমূর্তি এবং বাস্তবের সঙ্গে গ্রাহকের ধারণা মেলাবার প্রচেষ্টা মাত্র।

প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এই বিশেষ বিজ্ঞাপনের লক্ষ্য স্থির করা প্রয়োজন। সাধারনত লক্ষ্যমাত্রা, দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা এই রকম হয় ঃ

- প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম, কাজের পদ্ধতি এবং সুফল সম্বন্ধে গ্রাহকদের স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা।
- প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে যথেষ্ট ভালো জ্ঞান এবং বোঝাপড়া তৈরি ক'রে গ্রাহকদের আচরণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সুবিধাজনক ক'রে তোলা।

- প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, গ্রাহক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহার প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সুবিধাজনক ক'রে তোলা।

  প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপনের প্রস্তুতিপর্বে প্রয়োজন নিখুঁত পরিকল্পনা।

- প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পাবলিককে বোঝার জন্য তাঁদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। গ্রাহকদের বা উদ্দিষ্ট পাবলিকের সম্বন্ধে জানার জন্য গবেষণারও প্রয়োজন হতে পারে। প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বিভিন্ন পাবলিকের জ্ঞান কতখানি এবং তাঁদের মনোভাব কী, এ বিষয়ে জানা প্রয়োজন।
- লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। গুরুত্বের পর্যায়ক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপনের লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা অবশ্য প্রয়োজনীয়।
- উদ্দীষ্ট পাবলিকের সংখ্যা, তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি, ও সামাজিক অবস্থান-এর মাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়েই প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনা করতে হবে।
- প্রোগ্রামের পরিকল্পনা, বাজেটের ব্যবস্থা, এজেন্সি নির্বাচন এবং প্রচার অভিযানের জন্য প্রয়োজনমত গবেষণা করতে হবে।

পাবলিকের বোঝাপড়ার জন্য প্রয়োজনীয় বার্তা এবং যুক্তিসঙ্গত লক্ষ্যমাত্রার উপর ভিত্তি ক'রে জ্ঞাপন প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা না করা হলে, বিজ্ঞাপনের ফলাফল নেতিবাচক হতে পারে।

এবারে দেখা যাক, প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপন কোন কোন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সফল হতে পারে।

১. প্রতিষ্ঠানের নীতি, উদ্দেশ্য এবং গুণাবলীর মাত্রা সম্বন্ধে গ্রাহকদের বা উদ্দিষ্ট পাবলিককে জানানো, বোঝানো এবং প্রভাবিত করা।

২. প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যবস্থার দক্ষতা, নৈপুণ্য, কারিগরি উৎকর্ষতা এবং অন্যান্য বিষয় জানিয়ে পাবলিকের মনের নেতিবাচক ধারণা দূর ক'রে ইতিবাচক ধারণার সৃষ্টি করা।

৩. প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ যোগ্যতা সম্বন্ধে আস্থাবাচক ধারণা সৃষ্টি করা।

৪. ভালো নিয়োগকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা।

যে কোনো প্রতিষ্ঠানের বিপণন প্রচেষ্টায় এবং পরিকল্পনায় বিশেষ সহায়তা করে প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপন। গ্রাহকরা বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপন দেখে থাকেন এবং বিশেষ বিশেষ পণ্য সম্বন্ধে গ্রাহকদের মনে বিশেষ বিশেষ ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে। প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপন কোনো বিশেষ পণ্যের বিজ্ঞাপন নয়, সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞাপন। একটি প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলি পণ্য বাজারে জনপ্রিয় হতে পারে।

প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ইতিবাচক হলে প্রতিষ্ঠানের তৈরি বিভিন্ন পণ্যের ভাবমূর্তি আরো গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তির উপর বিশ্বাস গড়ে উঠলে তবেই গ্রাহকেরা ঐ প্রতিষ্ঠানের পণ্যের গুণকীর্তন করবেন।

প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি আসলে প্রতিষ্ঠানের চরিত্রের প্রতিফলন। প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ইতিবাচক, গ্রহণযোগ্য হলে প্রতিষ্ঠানের তৈরি পণ্য বিক্রির সুবিধাজনক ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। ক্রেতারা ভাবেন, অমুক প্রতিষ্ঠানের তৈরি জিনিস যখন—ভালোই হবে। একবার ব্যবহার ক'রে দেখি। প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি পণ্য বিক্রির সহায়ক হয়। যে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তির উপর গ্রাহকদের আস্থা আছে সেই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নতুন কোনো পণ্য বাজারে চালু করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

যে কোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য বিভিন্ন স্তরে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য কর্মী প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হলে মেধাবী, বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন কর্মীরা সেই প্রতিষ্ঠানে যোগদানে ইচ্ছুক হবেন এবং

চেষ্টা করবেন। দক্ষ, শিক্ষিত কর্মীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের কর্মকুশলতা এবং সাফল্য বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।

প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীদের বিশেষ আস্থা গড়ে তোলে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি। তাঁরা মনে করেন, তাঁরা একটি ভালো প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন, এবং তার জন্য গর্ববোধ করেন। প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একাত্মবোধ করেন। এর ফলে তাঁরা প্রতিষ্ঠানকে, কর্মী হিসাবে সেরা উৎপাদন দেওয়ার চেষ্টা করেন। প্রতিষ্ঠানের কর্মকুশলতা বাড়ে।

যে কোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সময় সময়, বিভিন্ন কারণে মূলধনের প্রয়োজন হয়। ব্যাঙ্ক এবং বিভিন্ন আর্থিক সংস্থার কাছে আবেদন করা হয় প্রয়োজনীয় অর্থের যোগানের জন্য। এই আর্থিক সংস্থাগুলিই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনমত অর্থের যোগান দেন। যে প্রতিষ্ঠানের ইতিবাচক এবং আস্থাসূচক ভাবমূর্তি আছে সেই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আর্থিক সংস্থাগুলি থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। আবার ঋণের শর্তও সুবিধাজনক হয় প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তির বিবেচনায়।

পণ্যের উৎপাদনের জন্য সব প্রতিষ্ঠানেই বিভিন্ন রকমের কাঁচামাল প্রয়োজন হয়। আবার, উৎপাদিত পণ্যের বিক্রির জন্য দেশব্যাপী বন্টনের প্রয়োজন হয়। যে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ইতিবাচক সেখানে কাঁচামাল সরবরাহকারীরা যত্নের সঙ্গে, নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে কাঁচা মাল সরবরাহের জন্য সচেষ্ট থাকেন। আবার, নগদ দামের পরিবর্তে ধারেও সরবরাহ করেন। এর ফলে, প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন সূচী বজায় রাখা সম্ভব হয়। আবার আর্থিক দিক দিয়েও সুবিধা হয়। প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি সাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হলে, বন্টনকারী বা পরিবেষকরাও প্রতিষ্ঠানের তৈরি জিনিস বন্টন করতে উৎসাহ বোধ করেন। প্রতিষ্ঠানের সুনামের জন্য পণ্যের বিক্রি নিশ্চিত হয় এবং বন্টনকারী তাঁর লগ্নী করা টাকা শীঘ্র ফিরে পান। তাঁর আয় বাড়ে, টাকা আটকে থাকে না এবং ঝুঁকিও কম হয়।

প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তিই পারিপার্শ্বিক লোক সমাজকে সাহায্য করে প্রতিষ্ঠানটিকে বুঝতে। প্রতিষ্ঠানের জন্য গর্ববোধ করতে উদ্দীপিত করে। এই ব্যাপারটা আর একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক।

"ক খ গ একটি ভালো প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনে রাখা ভালো।"

"ক খ গ প্রতিষ্ঠান একটি বিশেষ পণ্যের উৎপাদনের জন্য গবেষণায় সেরা।"

"ক খ গ প্রতিষ্ঠানের তৈরি যন্ত্রপাতি ভালো। নতুন মডেলগুলি অনেক উন্নত। বিক্রির পরের পরিষেবাও ভালো।"

"কাজ করার পক্ষে ক খ গ একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান।"

এই সব বিজ্ঞাপন যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা এই সব বার্তা থেকে প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে নিজের ধারণা গড়ে নিয়েছেন। এই ধারণাই প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি।

মানুষের মনে একবার এই রকম ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব হলে, সেগুলি সহজে পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। এই সব ধারণাই মানুষের মনে আবেগের ছাঁকনি হিসাবে কাজ করে। এই সব ধারণার ফলেই মানুষ নতুন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিভিন্ন বার্তা গ্রহণ করেন অথবা বর্জন করেন। নতুন বার্তা বাস্তব হলেও অনেক সময় গ্রহণযোগ্য হয় না। অথচ, অধিগত জ্ঞানের সঙ্গে মিল থাকলে, যে কোনো, গুণগত অথবা সংখ্যাগত বার্তা গ্রাহকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে তার অনেক রকম ফল লাভ করা সম্ভব।

প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপনের জন্য বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন। সবার আগে জানা প্রয়োজন কাদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন করা হবে। এই শ্রোতাদের আকাঙ্ক্ষা কী? অবশ্যই এই প্রতিষ্ঠানের কাছে। এই শ্রোতাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যই বার্তা নির্বাচন এবং বার্তা উপস্থাপন করা প্রয়োজন। উদ্দিষ্ট গ্রাহকদের জন্যই বিজ্ঞাপনের ভাষা এবং মাধ্যম নির্বাচন করা হবে। আর, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, প্রতিষ্ঠানের যে রকম ভাবমূর্তি নির্মাণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন করা হচ্ছে, ঠিক

সেই রকম ভাবমূর্তি নির্মাণের সহায়ক বার্তাই বিজ্ঞাপনে উপস্থাপন করতে হবে, অন্য কোনো বার্তা নয়। যাতে গ্রাহক নির্দিষ্ট বার্তাটিই গ্রহণ করেন, অন্য কোনো বার্তার সঙ্গে মিশিয়ে না ফেলেন। নির্দিষ্ট ভাবমূর্তি নির্মাণের চেষ্টা যাতে সক্ষম হয়, এলোমেলো, বিভ্রান্তিকর না হয়, বিজ্ঞাপনের বার্তা যেন কাঙ্ক্ষিত প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। উদ্দিষ্ট গ্রাহক যেন প্রতিষ্ঠানের প্রয়াস অনুসারেই মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি গড়ে তোলেন।

প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপনের প্রস্তুতির জন্য করণীয় ঃ

ক. প্রতিষ্ঠানের ব্যবসার উদ্দেশ্য এবং কৌশল সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা স্থির করা।

খ. জ্ঞাপনের জন্য বাস্তবসম্মত লক্ষ্য স্থির করা।

গ. উদ্দিষ্ট গ্রাহক বা শ্রোতাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে। উদ্দিষ্ট শ্রোতারা প্রতিষ্ঠানকে কেমন চোখে দেখেন? প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কতখানি জানেন? প্রতিষ্ঠানের শক্তি এবং দুর্বলতা সম্বন্ধে কী ধারণা? প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগীদের সম্বন্ধেই বা তাঁদের ধারণা কী রকম? পরিচালন কর্তৃপক্ষের কর্মদক্ষতায় আস্থা কতখানি?

ঘ. প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে উদ্দিষ্ট গ্রাহকদের মূল্যবোধ এবং বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা।

ঙ. বিভিন্ন গ্রাহকদের ধারণা এবং আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্য আছে কিনা জানা প্রয়োজন।

চ. গ্রাহকবর্গের উদ্দেশ্যের বিবেচনায় কর্মসূচীর অগ্রাধিকার নির্ণয় করতে হবে।

ঠিক মতো পরিকল্পনা হলে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী বিজ্ঞাপন প্রচারিত হলে, প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপন যে কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

৭.৪.২ পোষিত বা স্পনসরড কর্মসূচী

প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞাপনের অন্যতম বিশেষ কর্মসূচী—স্পনসরড কর্মসূচী। ঠিকভাবে পরিকল্পনা এবং পরিচালনা সম্ভব হলে, স্পনসরড কর্মসূচী, প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নির্মাণের কাজে বিশেষ সহায়ক হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৭.৫ সংকট নির্বাহ (Crisis Management)

সংকট নির্বাহ সম্পর্কিত জ্ঞাপন একটি আধুনিক ধারণা। পুরানো জন-সংযোগ বা জ্ঞাপন সংক্রান্ত কোনো বই-এ সংকট নির্বাহ সম্পর্কিত জ্ঞাপনের কোনো উল্লেখ ছিল না। জন-সংযোগের এবং নিগমবদ্ধ সংস্থার জ্ঞাপন প্রক্রিয়ায় সমসাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে বহুধাবিস্তৃত, সূক্ষ্ম এবং বাস্তব প্রয়োগের সহায়ক বহু ধারণা বর্তমানে অধিগত হয়েছে। সংকট নির্বাহের জ্ঞাপনও একটি আধুনিক ধারণা। বিষয়টি এখনও নতুন বলেই গণ্য।

এবারে দেখা যাক সংকট কী? সহজ কথায় বলতে গেলে, সংকট বিপদের সময়। অজানা আশংকার সময়। এমন কোনো বিপদ, তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে যা সমূহ ক্ষতির কারণ হতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, অনেক ছোটো ছোটো ঘটনাবলী, আপাত দৃষ্টিতে সেরকম ক্ষতিকারক না হলেও, কালক্রমে বা বিভিন্ন ঘটনা একত্র হয়ে—সংকট সৃষ্টি করে।

অনেকের ধারণা সংকটের সময় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমকে সামলানোই সংকট নির্বাহের জ্ঞাপন। আবার কেউ কেউ সংকট ঘটলে কী কী করণীয় সেই বিষয়ে বিস্তর খুঁটিনাটি বিষয় লিপিবদ্ধ ক'রে ম্যানুয়াল ছাপিয়ে, দায়িত্বশীল কর্মীদের বিতরণ করাই—সংকট নির্বাহের জ্ঞাপন বলে মনে করেন।

জন-সংযোগের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মসূচীর ফলে কেমন প্রতিক্রিয়া হবে, অনুমান করা সম্ভব। নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কর্মসূচী গ্রহণ করা হলে তার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে, সে বিষয়েও স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব। কিন্তু সংকট একেবারেই ভিন্ন চরিত্রের। পরিকল্পনা, গবেষণা, কর্মসূচী—যতই নিখুঁত হোকনা কেন সংকট হঠাৎ ভয়ানক আকার নিয়ে উপস্থিত হয়। সংকট কখন, কোথায়, কীভাবে উপস্থিত হবে, ভবিষ্যৎ বাণী করা সম্ভব নয়। অনেক সময়েই দেখা যায়, সংকট যখন উপস্থিত হয়, নিগমবদ্ধ সংস্থায় সংকটের মোকাবিলা করার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। সংকটকালে বেশির ভাগ সিদ্ধান্তই উপস্থিত বুদ্ধির উপর নির্ভর করেই নেওয়া হয়। পরিকল্পনা এবং কৌশল হয়তো সব সময় কাজে লাগানো সম্ভব হয় না।

হঠাৎ কোনো সংকট উপস্থিত হলে পরিচালন কর্তৃপক্ষও সংকট বোধ করেন। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সামনে উপস্থিত হওয়া এবং কথা বলা কঠিন বোধ হয়। কারণ, কী বলা হবে, কতটা বলা হবে, সবকিছু বলা ঠিক হবে কিনা, এই সব চিন্তায় তাঁরা ভারাক্রান্ত থাকেন।

সংকটের সামাল দেওয়ার চেষ্টায় মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি অনেক সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সংস্থার সংকটকালে ছাপা ম্যানুয়ালে কোন ম্যানেজারের কী করণীয় ইত্যাদি নির্দেশাবলী বাস্তবে কাজে লাগানো কঠিন। বেশির ভাগ সংকটের সময় দেখা গেছে, দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা সহজাত বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ ক'রে পরিস্থিতির সামাল দিয়েছেন।

সংকট নির্বাহের প্রস্তুতি—সংকটের জন্য প্রস্তুত থাকা। অর্থাৎ, কোনো বিশেষ সংস্থায় কী ধরণের সংকট আসতে পারে, সেই বিষয়ে মানসিক এবং বাস্তব প্রস্তুতি :

সম্ভাব্য সংকট দুই রকমের হতে পারে।—"জানা-অজানা" এবং "অজানা-অজানা"।

রেলওয়ে, এয়ার লাইন, রাসায়নিক কারখানা তৈলশোধনাগার ইত্যাদি শিল্পে যে কোনো সময় সংকট উপস্থিত হতে পারে। একথা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু কবে, কখন, কোথায় সংকট জনক পরিস্থিতি ঘটবে, কারো জানা নেই। সেই কারণে, এই ধরণের শিল্পের সংকট "জানা-অজানা" নামে অভিহিত।

অন্যান্য শিল্পে, সংকট ঘটবেই, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। তবুও, নানা কারণে, কখনো কখনো সংকট ঘটে থাকে। এই সব শিল্পের সংকট "অজানা-অজানা" বলে অভিহিত।

প্রযুক্তিগত সংকট ঃ বর্তমানে সারা বিশ্বে উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতা অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রযুক্তির অভাবিত উন্নতি এবং কৌশল শিল্প উৎপাদনে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। এর ফলে, উৎপাদনের হার এবং মান যেমন অভাবিত ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, প্রযুক্তির ব্যর্থতাও মাঝে মাঝে ভয়াবহ আকারে প্রকট হচ্ছে। ভূতপূর্ব সোভিয়েট রাশিয়ার "চেরনোবিল" এবং ভারতের ভূপালে শিল্প দুর্ঘটনা, প্রযুক্তির ব্যর্থতাজনিত সংকট। আপনারা জানেন, ভূপালে, ইউনিয়ন কার্বাইডের কারখানার দুর্ঘটনায় বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়ে অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে।

সংঘাতজনিত সংকট ঃ যখন কোনো কোনো গোষ্ঠী একটি বিশেষ সংস্থার বিরোধীতা করে। সংস্থার পরিচালন নীতি এবং বিভিন্ন কাজকর্মের বিরোধীতার সময় সংঘাতমূলক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

নাশকতাজনিত সংকট ঃ কোনো ব্যক্তির বা কোনো গোষ্ঠীর নাশকতামূলক কাজের ফলে সংকট দেখা দিতে পারে। সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশে, সন্ত্রাসবাদীদের মাইন বিস্ফোরণে একটি কারখানা ধ্বংস হয়।

পরিচালন ব্যর্থতা জনিত সংকট ঃ কোনো সংস্থার পরিচালন কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন গোষ্ঠীর যথাযথ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতাও সংস্থার সংকট ডেকে আনতে পারে।

অন্যান্য ভীতিজনিত সংকট ঃ সংস্থার সংকট বাইরে থেকেও আসতে পারে। অনেক সময় কোনো বিরোধী গোষ্ঠী বা প্রতিপক্ষ সংস্থার মালিকানা দখলের চেষ্টা করতে পারে। ফলে, সংকট সৃষ্টি হয়।

ত্রুটি যুক্ত পণ্য ঃ কোনো কারণে ত্রুটিযুক্ত পণ্য বাজারে চলে গেলে সংস্থার সংকট সৃষ্টি হয়। কেবল ত্রুটি যুক্ত পণ্যটিই নয়, সংস্থার অন্যান্য পণ্যের উপরেও জনসাধারণের আস্থা চলে যায়।

ধর্মঘট জনিত ঃ কোনো সংস্থায় ধর্মঘট শুরু হলে সংস্থার তৈরি পণ্যের ব্যবহারকারীরা অসুবিধায় পড়েন। পণ্যের বাজার অনেক সময় প্রতিযোগী সংস্থা দখল ক'রে নেয়। সংস্থার ভাবমূর্তি সম্বন্ধেও জনসাধারণের মনে প্রশ্ন জাগে।

পদত্যাগ জনিত ঃ সংস্থার পরিচালক মন্ডলীর কোনো বিশিষ্ট সদস্য হঠাৎ পদত্যাগ করলে বাজারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। সংস্থার ভাবমূর্তিও প্রভাবিত হয়।

অসাধু কাজ জনিত ঃ কোনো সংস্থার কোনো পদাধিকারী অসাধু কাজে লিপ্ত আছেন বলে হঠাৎ জানা গেলে, সংস্থার কার্যপরিচালন পদ্ধতি সম্বন্ধে সন্দেহের সৃষ্টি হয়।

সংকটকালে পরিচালন কর্তৃপক্ষ জন-সংযোগ-এর গুরুত্ব অনুধাবন করেন। সংস্থার ভাবমূর্তি রক্ষা, পরিচালন কর্তৃপক্ষের নির্দোষীতা প্রমাণ এবং অসংখ্য গ্রাহকের আস্থা বজায় রাখার জন্য জন-সংযোগ এর উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

৭.৫.১ সংকটের মোকাবিলা

যে কোনো সংকটের সময় সংস্থার একজনমাত্র মুখপাত্র সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সংস্থার জন-সংযোগ আধিকারিকই সংস্থার মুখপাত্র হয়ে থাকেন। সংকটকালে, সংস্থার মুখপাত্রকে জানতে হবে—

- সংকট কীসের? ঠিক কী ঘটেছে?
- যা ঘটেছে, তার পশ্চাৎপটে কী আরো বড়ো সমস্যা আছে, যার ফলে এই সংকট ঘটেছে?
- এর পরে কী আরো ঘটনা ঘটবে? আরো বিস্ফোরণ হবে?
- ঠিক এই রকম সংকট, আরো বড়ো আকারে, কোথায় এবং কবে ঘটেছিল?
- সংস্থার বাইরের জনসাধারণ অর্থাৎ সাধারণ নাগরিক এই সংকটকে কী চোখে দেখছেন?
- সংকট কতক্ষণ বা কতদিন চলবে?
- সংস্থার পক্ষে কী ক্ষতি হবে?
- এই সংকটে বা দুর্ঘটনায় আরো কেউ জড়িত আছে?
- দোষী নির্দিষ্ট করার আঙুল, সংস্থা ব্যতীত আর কারো দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব?
- সংকট সামলাতে হবে। সংকট মিটে গেছে, এই ঘোষণা করতে সংস্থা কীভাবে এবং কত শীঘ্র সক্ষম হবে?

কাদের উদ্দেশ্যে, চিহ্নিত করুন ঃ

- এই সংকটে কারা ভুক্তভোগী?
- সংস্থাকে কারা প্রভাবিত করবে?
- কাদের জানা প্রয়োজন?
- আর, কাদের জানানো উচিত?

জন-সংযোগ আধিকারিককে স্থির করতে হবে, সংকটকালে, বার্তা কী হবে? তাঁর স্থিরিকৃত বার্তাই প্রচারিত হবে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে। সংকটের বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে সংকটের ফলে বিপদাপন্ন মানুষদের জন্য সংস্থা কী কী ব্যবস্থা

নিয়েছে সেই বিষয়েও অবশ্যই জানাবেন। যাঁদের উদ্দেশ্যে সংবাদ দিচ্ছেন, তাঁদের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা ক'রে সংবাদ রচনা করতে হবে। সংকটের সংবাদ---সংক্ষিপ্ত, নির্দিষ্ট এবং বিষয় অনুযায়ী হবে।

মনে রাখতে হবে, সংস্থার প্রচারিত সংবাদের অভাবে, অথবা সংস্থা প্রচারিত সংবাদ যথেষ্ট না হলে, গুজব এই শূন্যস্থান পূরণ করবে। গুজব অবশ্যই সংস্থার পক্ষে শুভকর হবে না। গুজবের শক্তি এবং দাপট কমানোর জন্য সংস্থার তরফ থেকে সঠিক সংবাদ প্রচার করা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমকে অবশ্যই ডাকতে হবে। সকলকে ডাকা সম্ভব না হতে পারে, আবার, ডাকলেও সব মাধ্যমের পক্ষে প্রতিনিধি পাঠানো সম্ভব না-ও হতে পারে। বিশেষভাবে নির্ভর করতে হবে পি.টি.আই. এবং ইউ.এন.আই. চ্যানেলের উপর। সকল মাধ্যমই এই দুটি চ্যানেলের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে যাবেন এবং প্রচার করবেন।

আর একটি বিষয়, দুর্ঘটনায় সংস্থার যে সব কর্মী আহত হয়েছেন বা কোনো ভাবে জড়িয়ে পড়েছেন, অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত এবং মানবিক কারণেই তাঁদের আত্মীয় স্বজনেরা বার বার যোগাযোগ করবেন। তাঁদের পরিজন সম্বন্ধে খবর জানতে চাইবেন।

এইসব প্রশ্নকারীদের মনোবেদনা বুঝে, সহানুভূতির সঙ্গে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। দুর্ঘটনায় আহত কর্মী সম্বন্ধে সংবাদ জানাতে হবে। কতখানি আহত? কোথায় আছেন? তাঁর পরিবারের লোক এখন দেখা করতে পারবেন কি না ইত্যাদি সকল প্রশ্নের উত্তর ধৈর্য সহকারে, সমবেদনার সঙ্গে জানাতে হবে। সংস্থার মানবিক ভাবমূর্তির পরিচয় পাওয়া যাবে, সংস্থার জন-সংযোগ বিভাগের কর্মীদের ব্যবহারে, কথাবার্তায় এবং সমবেদনায়।

সংকটের মোকাবিলা সঠিকভাবে হলে, সংকটের মধ্যেও সংস্থার সমব্যথী, মানবিক ভাবমূর্তি প্রকাশিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ভাবমূর্তি ভবিষ্যতে সংস্থার বিশেষ সহায়ক হয়।

৭.৬ সংকট ঃ কেস স্টাডি

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে, আমেরিকায়, জনসন এ্যান্ড জনসন কোম্পানি এক বিরাট সংকটের মুখোমুখি হয়। জে অ্যান্ড জে কোম্পানির "টাইনেলন" (Tynelon) সাধারণ ব্যথা উপশমের ট্যাবলেট সে দেশের বাজারে খুব ভালো চলত। ডাক্তাররা প্রেসক্রিপসনে টাইনেলন ব্যবহার করার সুপারিশ করতেন। জনসাধারণও আস্থার সঙ্গে ঐ ট্যাবলেট ব্যবহার করতেন। আমেরিকায় ব্যথা নিরাময়ের ট্যাবলেটের বাজারের প্রায় পঁয়ত্রিশ শতাংশ ছিল জে অ্যান্ড জে'র "টাইনেলন" ট্যাবলেটের দখলে।

হঠাৎ শিকাগো শহর থেকে রিপোর্ট পাওয়া গেল, দু'জনের মৃত্যু হয়েছে "টাইনেলন" ব্যবহার ক'রে। বিভিন্ন পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল, ঐ "টাইনেলন" ট্যাবলেটে "সায়ানাইড" রসায়নের প্রলেপ থাকাই ট্যাবলেটসেবীদের মৃত্যুর কারণ। উৎপাদনের সময়, বা প্যাকিং-এর সময় কোনো ভাবে সায়ানাইড-এর সংস্পর্শে আসার ফলে ট্যাবলেটে সায়ানাইডের প্রলেপ পড়ে। ২৯ শে সেপ্টেম্বর এই দুর্ঘটনার খবর প্রচার হওয়ার চব্বিশ ঘন্টা পরেই দেখা গেল, কোনো নাগরিক "টাইনেলন" ট্যাবলেট ব্যবহার করছেন না। কোনো ডাক্তারও তাঁর রোগীদের আর ঐ ট্যাবলেট ব্যবহার করতে বলছেন না। জে এ্যান্ড জে কোম্পানির পক্ষে এই দুর্ঘটনা এক বিরাট সংকট।

এবারে দেখা যাক, এই সংকট মোকাবিলার জন্য জে এ্যান্ড জে কোম্পানি কী করলেন। তাঁরা অবিলম্বে সারা দেশের ডাক্তার, ক্লিনিক, হাসপাতাল, ওষুধের দোকান এবং ওষুধ ব্যবসার সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত সকলকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করলেন তাঁরা যেন "টাইনেলন" প্রেসক্রিপশনে না লেখেন, এবং ব্যবহার না করেন, যতক্ষণ না আবার নিরাপদ বলে প্রমাণিত হচ্ছে। সমস্ত ওষুধের দোকান এবং বন্টনকারী সংস্থার কাছ থেকে সব "টাইনেলন" ট্যাবলেট

ফেরৎ নিয়ে নিলেন। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সাহায্যে প্রচার ক'রে জনমত গড়ে তুললেন ট্যামপার প্রুফ (tamper proof) বিশেষ প্যাকেজিং চালু করার জন্য। সরকারি দপ্তর থেকে নতুন, বিশেষ প্যাকেজিং-এর অনুমোদন নিলেন।

এর ফল—"টাইনেলন" আবার বাজারে এলো, নতুন, ট্যামপার প্রুফ প্যাকে। সংকটের মুখোমুখি হয়ে জে এ্যান্ড জে কোম্পানি প্রথমেই বাজার থেকে সমস্ত ট্যাবলেট ফেরৎ নিয়ে আসেন। সাধারণ মানুষ আশ্বস্ত হন, তাঁদের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তার জন্য কোম্পানি তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নিয়েছেন বলে। ফলে, কোম্পানির ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে, আরো উন্নত হয়। তারপরে, বিশেষ প্যাকেজিং-এর জন্য জনমত গড়া এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া। কোম্পানির সততা, মানুষের সেবার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ ও যথোচিত ব্যবস্থা নেওয়ায় কোম্পানির উপর সাধারণ মানুষের আস্থা আরো বেড়ে যায়। ফলে, নতুন প্যাকে 'টাইনেলন" আবার বাজারে এলে, অল্পসময়ের মধ্যে বাজারে পূর্বের আসন দখল ক'রে নেয়। সংকটকে সাহস এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে মোকাবিলা ক'রে একটি সুযোগে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছিল।

৭.৭ জ্ঞাপন নিরীক্ষণ (Communication Audit)

সমস্ত সংস্থাই আশা করেন, তাঁদের জ্ঞাপন কর্মসূচী ফলপ্রসূ হবে। জন মানসে, অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ পাবলিক এবং সংস্থা বহির্ভূত পাবলিক, সকলের মনেই সংস্থার অভীষ্ট ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে জ্ঞাপন কর্মসূচী সফল হবে। সংস্থার পরিচালন কর্তৃপক্ষের এই আশা কতটা পূরণ হচ্ছে সে বিষয়ে জানার জন্য, সংস্থার পক্ষ থেকে মধ্যে মধ্যে জ্ঞাপন নিরীক্ষণ-এর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সংস্থার জন-সংযোগ অধিকর্তার পক্ষেও বিষয়টি বিশেষ জরুরি। জ্ঞাপন কর্মসূচীর সাফল্যের হার জানা সম্ভব হলে, প্রয়োজনমত কর্মসূচীর কৌশল পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়।

সংস্থার জন-সংযোগ কর্মসূচীর সাফল্যের মাত্রা এবং মান জানা বিশেষ প্রয়োজন। কোনো দুর্বলতা থাকলে সে বিষয়েও জানা প্রয়োজন। পরিচালন কর্তৃপক্ষ আলাপ-আলোচনা এবং বিশ্লেষণ ক'রে স্থির করেন সংস্থার জনসংযোগ-এর উদ্দেশ্য কী? সংস্থা সম্বন্ধে ঠিক কী ধরণের ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে তাঁরা আগ্রহী? এই বিশেষ ভাবমূর্তি গড়ার উদ্দেশ্যই বা কী? উদ্দেশ্য স্থির ক'রে তবেই জন-সংযোগ-এর কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সুতরাং, জ্ঞাপন কর্মসূচীর সাফল্যের মাত্রা জানা পরিচালন কর্তৃপক্ষের বিশেষ প্রয়োজন।

আইন অনুযায়ী সব সংস্থার আর্থিক কর্মসূচী এবং আর্থিক অবস্থা প্রতি বছর নিরীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। যে কোনো সংস্থার সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে জন-সংযোগ কর্মসূচীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণেই সংস্থার জ্ঞাপন নিরীক্ষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সম্পূর্ণ জন-সংযোগ কর্মসূচীর জ্ঞাপন নিরীক্ষণ করা যেতে পারে। আবার, কর্মসূচীর কোনো বিশেষ বিষয়েও জ্ঞাপন নিরীক্ষণ করা যেতে পারে। আরো বিস্তৃত ভাবে, সংস্থার সঙ্গে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সম্পর্কের বিষয়েও নিরীক্ষণ হতে পারে। সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে সম্পর্ক নিরীক্ষণের মূল বিষয় হবে, সংস্থা সম্বন্ধে মাধ্যমের সাংবাদিকদের ধারণা কী রকম। সংস্থা যে রকম ধারণা গড়ে তোলার জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, সেই রকম ধারণাই গড়ে উঠেছে না অন্য রকম ধারণা গড়ে উঠেছে। যদি উদ্দিষ্ট ধারণার পরিবর্তে অন্য কোনো ধারণা গড়ে উঠে থাকে, তাহলে তার কারণ কী?

সংস্থার নিজের ধারণা এবং সংস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন পাবলিকের ধারণার মধ্যে পার্থক্য থাকলে, সে বিষয়ে জানা একান্ত প্রয়োজন। সংস্থার সম্বন্ধে আভ্যন্তরীণ পাবলিক এবং সংস্থা বহির্ভূত পাবলিক-এর মনোভাব কী রকম? বাস্তব অবস্থার সঙ্গে এই মনোভাবের কোনো পার্থক্য থাকলে, তারই বা কারণ কী? অন্যেরা সংস্থাটি কোন চোখে দেখছেন? এই বাস্তব অবস্থা সংস্থার পরিচালন কর্তৃপক্ষের সামনে তুলে ধরে জ্ঞাপন নিরীক্ষণ।

জ্ঞাপন নিরীক্ষণ সাধারণত দুইভাবে করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর পাবলিকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জানার প্রচেষ্টা। অথবা, কোনো জন-সমীক্ষক সংস্থার দ্বারা সমীক্ষার ব্যবস্থা করা। জ্ঞাপন নিরীক্ষণের জন্য সমীক্ষার আয়োজনে অর্থব্যয় ছাড়াও প্রয়োজন বিশেষ প্রস্তুতির। সংস্থার বাইরের কোনো নিরপেক্ষ সংস্থা বা পরামর্শদাতাকে জ্ঞাপন সমীক্ষার জন্য নিযুক্ত করা হয়।

সমীক্ষার আগে নির্ধারণ করা প্রয়োজন, সমীক্ষার বিষয় ঠিক কী হবে। সম্পূর্ণ জ্ঞাপন কর্মসূচী, মূল লক্ষ্য, না কোনো বিশেষ জ্ঞাপন সম্পর্কিত? বর্তমান আর্থ সামাজিক এবং শিল্প বাণিজ্যের প্রেক্ষাপটে সংস্থার ভূমিকা, কর্মসূচী, এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচী কী হবে, সবই সমীক্ষার বিষয় হতে পারে। যাঁরা সমীক্ষা করবেন, তাঁদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা ক'রে সমীক্ষার প্রশ্নাবলী নির্বাচন করতে হবে। আভ্যন্তরীণ পাবলিক-এর সমীক্ষার সিদ্ধান্ত হলে, আগে থেকেই তাঁদের জানিয়ে রাখতে হবে, বাইরের সমীক্ষকরা এসে তাঁদের প্রশ্ন করবেন। কর্মীরা যেন তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। সংস্থার বাইরের পাবলিক-এর সঙ্গে সমীক্ষকরা যখন যোগাযোগ করবেন, তখন নিজেদের নিরপেক্ষ সমীক্ষক হিসাবে পরিচয় দেবেন। সংস্থার দ্বারা নিযুক্ত হয়ে তাঁরা সমীক্ষা করছেন, এই তথ্য সংস্থার বাইরের পাবলিক যেন জানতে না পারেন।

৭.৮ সারাংশ

আধুনিক পরিচালন ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞাপন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক, দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য যেমন জ্ঞাপনের প্রয়োজন, জ্ঞাপন প্রক্রিয়াকে সংস্থার বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যও প্রয়োগ করা হয়। নিত্যকর্মের জ্ঞাপন প্রক্রিয়া সংস্থার পরিচিতি প্রতিষ্ঠা করে। ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সহায়তা করে। বিশেষ জনসংযোগমূলক জ্ঞাপন সংস্থার ভাবমূর্তি গড়ে তোলে।

বর্তমানের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বতন্ত্র ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কোনো সংস্থার পক্ষে সফল হওয়া কঠিন। প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তিই গ্রাহকের মনোভাব প্রভাবিত করে কোনো পণ্য অথবা পরিষেবা গ্রহণ অথবা বর্জন করতে। প্রতিষ্ঠানের জনসংযোগমূলক জ্ঞাপন ভাবমূর্তি গড়ে তোলার এই গুরু দায়িত্ব পালন করে।

প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পাবলিক বা জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষভাবে জ্ঞাপন পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। যেহেতু বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ভাবমূর্তি সৃষ্টি করা হয়, জ্ঞাপন পদ্ধতির উদ্দেশ্য এবং কৌশলও উদ্দিষ্ট গোষ্ঠী হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন হওয়াই যুক্তি সঙ্গত।

প্রতিষ্ঠানের জন-সংযোগ মূলক জ্ঞাপনের বিশেষ কর্মসূচী—জন-সংযোগমূলক বিজ্ঞাপন। জন-সংযোগমূলক প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপন ব্যয় সাপেক্ষ। দীর্ঘ প্রস্তুতি এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনা ব্যতীত জনসংযোগমূলক বিজ্ঞাপন সফল হওয়া কঠিন।

জন-সংযোগমূলক বিজ্ঞাপন পরিকল্পনায় উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং উদ্দিষ্ট গোষ্ঠী হিসাবে বার্তা নির্বাচন এবং প্রচারের মাধ্যম নির্বাচন করা প্রয়োজন। প্রাতিষ্ঠানিক জন-সংযোগমূলক বিজ্ঞাপনের কৌশল ব্যাপক এবং কার্যকরী। বিভিন্ন গোষ্ঠীকে প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তুলতে, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে জন-সংযোগমূলক বিজ্ঞাপন বিশেষ কার্যকরী। প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সচেতন রাখে। সংস্থার সঙ্গে তাঁরা একাত্ম বোধ করেন। সমঝোতা গড়ে ওঠে, যা জন-সংযোগের মূল উদ্দেশ্য।

পোষিত কর্মসূচী বা স্পনসরড প্রোগ্রাম জন-সংযোগের উপায় হিসাবে বিশেষ কার্যকরী।

প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় কখনো কখনো সংকট আসতে পারে। সব প্রতিষ্ঠানকেই সংকটের মোকাবিলার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হয়।

সংস্থার আর্থিক লেনদেন এবং অবস্থার বিষয়ে যেমন বার্ষিক নিরীক্ষণ করা হয়, জন-সংযোগ কর্মসূচীরও নিরীক্ষণ

করা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার পক্ষে বিশেষ জরুরি। জ্ঞাপন নিরীক্ষণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক ধারণা। জন-সংযোগ কর্মসূচীর সাফল্যের বিশেষ সহায়ক।

৭.৯ অনুশীলনী

১। প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞাপন কী? আলোচনা করুন।
২। প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞাপন কত প্রকার? বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানিক জ্ঞাপনের উদ্দেশ্য কী?
৩। প্রতিষ্ঠানের নিত্যকর্মের জ্ঞাপনের বিশেষ ভূমিকা ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।
৪। প্রতিষ্ঠানের জন-সংযোগ মূলক জ্ঞাপনের মূল উদ্দেশ্য কী? পরিকল্পনার সময় কী কী বিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন?
৫। জনসংযোগমূলক বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য এবং কার্যকারিতা আলোচনা করুন।
৬। জন-সংযোগমূলক বিজ্ঞাপন প্রচার ক'রে প্রতিষ্ঠানের কী কী সুবিধা হয়?
৭। পোষিত কর্মসূচী কী প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি গড়তে সহায়তা করে? বিশদ ক'রে বোঝান।
টীকা লিখুন ঃ
ক. প্রতীক, খ. পণ্যের মোড়ক, গ. পরিচিতি, ঘ. ভাবমূর্তি, ঙ. প্রযুক্তিগত সংকট

৭.১০ গ্রন্থপঞ্জি

(1) Creative Corporate Reputations—Grahame Dowling

একক ৮ ❑ জন-সংযোগের জন্য লেখা

গঠন

৮.০ উদ্দেশ্য
৮.১ প্রস্তাবনা
৮.২ জন-সংযোগের জন্য লেখা
৮.৩ সংস্থা বহির্ভূত পাবলিকের জন্য
  ৮.৩.১ সংবাদলিপি
  ৮.৩.২ পটভূমি পরিচায়ক
  ৮.৩.৩ সংক্ষিপ্ত সংবাদ
  ৮.৩.৪ প্রত্যুত্তর
৮.৪ আভ্যন্তরীণ পাবলিকের জন্য
  ৮.৪.১ হাউস জার্নাল
  ৮.৪.২ বুলেটিন বোর্ড
৮.৫ সারাংশ
৮.৬ অনুশীলনী
৮.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৮.০ উদ্দেশ্য

জন-সংযোগের কাজে নানারকম লেখালেখির প্রয়োজন হয়। এই সব লেখাই বিশেষ ভাবে লেখা, সাধারণ লেখা নয়। জন-সংযোগের জন্য লেখা আবার বিভিন্ন উদ্দেশ্যে নানা প্রকারের।

এই এককটিতে জনসংযোগের জন্য লেখার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটি পড়ে আপনারা নিচের বিষয়গুলি জানতে পারবেন।

- জনসংযোগের জন্য লেখা বলতে কী বোঝায়
- সংস্থার বাইরের পাবলিকের জন্য লেখা
- সংবাদ মাধ্যমের জন্য বিভিন্ন লেখার কলা কৌশল
- আভ্যন্তরীণ পাবলিকের জন্য লেখার বিশেষত্ব
- আভ্যন্তরীণ পাবলিকের জন্য বিভিন্ন মাধ্যমের উপযোগী লেখা

৮.১ প্রস্তাবনা

জন-সংযোগের বহুবিধ কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা হয়েছে। জন-সংযোগের বিভিন্ন কাজের নানা কলা কৌশল আলোচনা করা হয়েছে। এই সব আলোচনায় আপনারা লক্ষ্য করেছেন জন-সংযোগের মূল কাজ জ্ঞাপন বা জানানো। কখনো মুখোমুখি কথা বলে জন-সংযোগ করা হয় আবার কখনো লিখিত বার্তার সাহায্যে জন-সংযোগ করা হয়। আর, সত্য কথা বলতে কী, লিখিত বার্তার সাহায্যে জন-সংযোগই ব্যাপকভাবে প্রচলিত। যেহেতু মুখোমুখি আলাপ আলোচনার পরিধি সীমাবদ্ধ, সেই জন্য লিখিত বার্তাই জন-সংযোগ প্রক্রিয়ায় বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে। লিখিত বার্তা প্রচারের ব্যাপকতা এবং বিভিন্ন রকমের উপস্থাপনার দ্বারা নানাবিধ আবেদন ও প্রভাব সৃষ্টি করার সুযোগের জন্য জন-সংযোগের কাজে লিখিত বার্তার প্রয়োগ অত্যন্ত বেশি। সত্য কথা বলতে কী জন-সংযোগের কাজের যোগ্যতার বিশেষ মাপকাঠি হিসাবে লেখার দক্ষতাই বিশেষ ভাবে গণ্য হয়। জন-সংযোগের জন্য লেখা সাধারণত দুই শ্রেণির পাবলিকের জন্য হয়। সংস্থার কর্মীদের উদ্দেশ্য ক'রে এবং সংস্থার বাইরের পাবলিককে উদ্দেশ্য ক'রে। সংস্থার আভ্যন্তরীণ পাবলিকের সঙ্গে যোগাযোগের যে মাধ্যম ব্যবহার করা হয় তার উপস্থাপনা এবং ভাষা বিশেষ ধরণের। উদ্দিষ্ট পাবলিককে প্রভাবিত করার জন্য।

সংস্থার বাইরের পাবলিকের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম বা গণমাধ্যমের সাহায্য নেওয়া ব্যতীত উপায় থাকে না। আর সংবাদ মাধ্যম মাত্রেই নিজস্ব কিছু দায় থাকে, পাঠক, দর্শক, শ্রোতার চাহিদা মেটানোর জন্য।

প্রতিষ্ঠানের সংবাদ প্রতিষ্ঠানের জন-সংযোগ আধিকারিকের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানের সংবাদ, সংবাদ মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তার থেকে ভিন্ন চরিত্রের। এই জন্যই জন-সংযোগের পেশায় লেখার উপরে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। জন-সংযোগের প্রয়োজনীয়তা এবং সংবাদ মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা এক বিন্দুতে মিলে যায় জন-সংযোগ পেশাদারের লেখার দক্ষতায়।

৮.২ জন-সংযোগের জন্য লেখা

জন-সংযোগ পেশায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ লেখালেখি। লেখার ক্ষমতা এবং দক্ষতা এই পেশায় অবশ্য প্রয়োজনীয় গুণ হিসাবে বিবেচিত হয়। জন-সংযোগের জন্য লেখার কাজে ভাষার উপর দখল এবং লেখার ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু প্রয়োজন হয়। জন-সংযোগের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রভাব সৃষ্টিকারী লেখার ক্ষমতা। সেই সঙ্গে সংবাদ রচনার কৌশল। দুই ধরণের লেখার কাজে যথেষ্ট দক্ষতা থাকলে তবেই জন-সংযোগের জন্য লেখায় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।

জন-সংযোগের জন্য লেখার সাধারণত দুরকম উদ্দেশ্য থাকে। যে লেখা গণমাধ্যমে প্রচারিত হবে, সেই লেখার উদ্দেশ্য সংস্থা বহির্ভুত-পাবলিকের মনে সংস্থার একটি ভাবমূর্তি গড়ে তোলা। আবার, সংস্থার আভ্যন্তরীণ পাবলিকের জন্য লেখার উদ্দেশ্য কর্মীদের সঙ্গে সংস্থার বোঝাপড়া সৃষ্টি। যাতে পরিচালন ব্যবস্থার বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়নে সুবিধা হয়।

৮.৩ সংস্থা বহির্ভুত পাবলিকের জন্য

সংস্থা বহির্ভুত পাবলিক সাধারণত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ। এই বিপুল সংখ্যক পাবলিক, যাঁরা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং জ্ঞাপন পদ্ধতির বার্তা পৌঁছে দেওয়া একমাত্র গণমাধ্যমের

দ্বারাই সম্ভব। বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে দেয় সংবাদ মাধ্যম। জন-সংযোগ বিশেষজ্ঞরা এই কারণেই সংবাদমাধ্যমকে জনসংযোগের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে গণ্য করেন। এই মাধ্যম যথোচিত ভাবে ব্যবহার করতে হলে সংবাদ মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে সক্ষম এবং মাধ্যমের কাছে গ্রহণযোগ্য নানা রকমের বার্তা পাঠানো প্রয়োজন। সংবাদ মাধ্যমের কাছে গ্রহণযোগ্য বার্তা নানা রকমের হতে পারে।

মনে রাখতে হবে, সংবাদপত্র যাঁরা পরিচালনা করেন, তাঁরা প্রাপ্ত যে কোনো সংবাদের সংবাদমূল্য যাচাই করেন। সংবাদটির বিষয়ে তাঁদের পাঠক, দর্শক, শ্রোতার আগ্রহ বিবেচনা ক'রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সংবাদটি প্রকাশিত বা প্রচারিত হবে কি না। কাজেই সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য কোনো লেখা পাঠানোর সময় বিবেচনা করতে হবে, যে সংবাদটি পাঠানো হচ্ছে তার সংবাদমূল্য কী এবং কতখানি। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে হলেও, যে কোনো ঘটনা, কৃতিত্ব বা পরিস্থিতির সংবাদ এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে, বা লিখতে হবে, যার ফলে সংবাদমূল্য থাকে এবং গুরুত্ব পায়।

গণমাধ্যমে পাঠানোর জন্য সংবাদ রচনার কয়েকটি মূল সূত্র।—সংবাদ সংক্ষিপ্ত হবে। সংবাদের সার অংশ প্রথম প্যারাগ্রাফেই লিখতে হবে। সংবাদের ভাষা যেন সহজ, সরল হয়।

৮.৩.১ সংবাদ লিপি (News Release)

বেশি পরিচিত প্রেস রিলিজ নামে। কিন্তু সংবাদলিপি বলাই যুক্তি সঙ্গত। প্রেস রিলিজ বলতে বোঝায় মুদ্রণ মাধ্যমের জন্য লিখিত বার্তা। নিউজ রিলিজ বা সংবাদলিপির অর্থ সংবাদ জানানো, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের উদ্দেশ্যে যা পাঠানো হয় সেটি সংবাদ। এবং সংবাদ বলেই মাধ্যমকে পাঠানো হয়, এই ভাবটি যথার্থভাবে প্রকাশ পায়—সংবাদলিপি বা News Release নামের মধ্যে।

কোনো সংস্থার জন-সংযোগ আধিকারিক সংস্থা সম্পর্কিত যে সংবাদ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমকে পাঠিয়ে থাকেন, সেইটিই সংবাদলিপি। এখানে বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন, সংস্থার সংবাদ হলেও, গণমাধ্যমের উদ্দেশ্যে যখন পাঠানো হয় তখন এটিকে সংবাদ হিসাবেই গণ্য করতে হবে। সংবাদ যখন, তখন অন্যান্য সংবাদের বিষয়ে যে সূত্রগুলি বিবেচিত হয় সংস্থার সংবাদের ক্ষেত্রেও সেই একই সূত্র বিবেচিত হয়। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, যে মাধ্যমের জন্যই সংবাদটি লেখা হোক না কেন—সংবাদ মূল্য বিবেচনার মূল সূত্র—কে? কোথায়? কেন? কী? কখন? এবং কেমন ক'রে?—এই প্রশ্নগুলির উত্তর যে কোনো সংবাদেই থাকা একান্ত আবশ্যক। সংবাদের প্রথম অনুচ্ছেদ-এর প্রথম লাইনেই এই প্রশ্নগুলির উত্তর থাকা আবশ্যক। সংবাদলিপি যে মাধ্যমকে পাঠানো হবে, সেই মাধ্যমের উপযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। সংবাদ পত্রের সংবাদ পরিবেষণ, রেডিও'র সংবাদ এবং টেলিভিশনের সংবাদ উপস্থাপন বিভিন্নরূপে। সংবাদলিপি পাঠানোর সময় জন-সংযোগ আধিকারিক উদ্দিষ্ট মাধ্যমের প্রয়োজন এবং পরিবেষণ কৌশল বিবেচনা ক'রে সংবাদটি লিখবেন। সাধারণ সংবাদপত্রের জন্য সাধারণ সংবাদ হিসাবে, অর্থনৈতিক পত্রিকার জন্য ব্যবসায় এবং শিল্পের দৃষ্টিকোণ থেকে, রেডিও'র জন্য কানে শোনার মতো সংবাদ এবং টেলিভিশনের জন্য ছবি (visual) সমেত সংবাদ রচনা করাই যুক্তিযুক্ত। যে কোনো মাধ্যমই জন-সংযোগ আধিকারিকের পাঠানো মাধ্যমের উপযোগী সংবাদ লিপি পেলে খুশি হবেন। সংবাদটি কাজে লাগাবেন, অর্থাৎ প্রচার করবেন, সংস্থার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে।

মনে রাখা প্রয়োজন, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ রচনার জন্য যেমন বিশেষ দক্ষতা প্রয়োজন, সংবাদলিপি রচনার জন্যও বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। বরং একটু বেশি দক্ষতার প্রয়োজন। কারণ সংবাদটির প্রচার এবং প্রচারের উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া খুবই জরুরি। অন্যান্য সংবাদের মতো সংবাদ লিপি রচনার সময় নিচের সূত্রগুলি মেনে চলা প্রয়োজন।

বিষয় ঃ সংবাদলিপির মূল বিষয়টি কী সাধারণ পাঠকদের আগ্রহ জাগাবে? সংবাদটি সম্পর্কে পাঠক বা শ্রোতার

মনে যে প্রশ্ন জাগবে, সংবাদটি কী সেই প্রশ্নগুলির উত্তর যোগাতে সক্ষম? সংবাদটির তাৎপর্য কী পাঠকদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে? পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিভিন্ন সংবাদের তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে সংবাদটির সংবাদ মূল্য কী যথেষ্ট? সংবাদটির সত্যই কোনো প্রয়োজন আছে? সংবাদটি কী সংস্থার বাস্তব মূর্তি জনসাধারণের সামনে উপস্থাপন করতে সমর্থ? সংবাদে উল্লিখিত ঘটনা, তারিখ এবং বিভিন্ন ব্যক্তির নাম ঠিক ভাবে লেখা হয়েছে? কোনো কারিগরি বিষয় থাকলে, সেটি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে?

রচনাশৈলী এবং গঠন ঃ সংবাদ লিপির প্রথম লাইন কী পাঠক বা শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম? সংবাদের শিরোনাম কী দৃষ্টি আকর্ষণ করবে? সংবাদটি সুখপাঠ্য? সংবাদ রচনার মূল সূত্র সরাসরি, স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত রচনা। সংবাদ যেন বিনা খরচার বিজ্ঞাপন-এর চেহারা না গ্রহণ করে। প্রয়োজনীয় তথ্যের সাহায্যে সংবাদটি যতদূর সম্ভব নাটকীয় ভাবে পরিবেষণ করতে হবে।

এই শর্তগুলি পূরণ ক'রে সংবাদ রচনা করলে বিভিন্ন মাধ্যম আপনার সংবাদলিপি ব্যবহার করবেন, আপনার সংস্থা লাভবান হবে। মূল কথা মনে রাখা দরকার, সংবাদলিপি সংস্থার সংবাদ বহন করে, বিজ্ঞাপন নয়।

আরো কতগুলি সাধারণ বিষয় মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন।

প্রকাশের তারিখ ঃ বিষয়লিপি পাঠানোর সময় তারিখ দিতে যেন ভুল না হয়। সংবাদলিপি পাঠানো হয় প্রকাশের জন্য। যে কোনো সংবাদের পক্ষেই তারিখ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পরিচিতি ঃ সংস্থার লেটারহেড-এ ভালো ক'রে টাইপ ক'রে সংবাদলিপি পাঠানো উচিত। প্রাপ্তি মাত্রই যেন বোঝা যায়, কোন সংস্থা পাঠিয়েছেন।

প্রামাণিকতা ঃ পাঠানো সংবাদটির যথার্থতার পরিচয় সংস্থার লেটারহেড, এবং যিনি সংবাদলিপি পাঠাচ্ছেন তাঁর পদের উল্লেখ এবং স্বাক্ষর। সংবাদলিপিতে যেন অবশ্যই থাকে।

মার্জিন ঃ দু'দিকেই যেন যথেষ্ট মার্জিন থাকে। সংবাদলিপির বিভিন্ন লাইনের মধ্যে যেন "ডবল স্পেস" থাকে। সম্পাদনার সুবিধা হয়।

শিরোনাম ঃ সংবাদ লিপির শিরোনাম সাধারণত মাধ্যমই ঠিক ক'রে থাকেন। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিরোনাম দেওয়া যেতে পারে তবে শিরোনাম এবং মূল সংবাদের মধ্যে যথেষ্ট জায়গায় ছাড়া থাকা প্রয়োজন। মাধ্যমের পক্ষে যিনি সম্পাদনা করবেন, তাঁর লেখার জায়গা চাই।

কত বড়ো ঃ দু' পাতা, তিন পাতা লম্বা সংবাদলিপি না পাঠানোই ভালো। যতদূর সম্ভব ছোটো, সম্পাদিত সংবাদলিপি পাঠানোই কার্যকরী হয়। মাধ্যমের আফিসে যাঁরা সম্পাদনা করবেন তাঁরা যেন বিষয়লিপির বয়ান দেখে খুশি হন। আপনার সংবাদ প্রকাশের সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে। কোনো প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদ এক পৃষ্ঠা থেকে অন্য পৃষ্ঠায় বিস্তারিত না করা ভালো। একাধিক পৃষ্ঠা ব্যবহার করলে পৃষ্ঠার শেষে, নিচে, ডান দিকে লিখুন "more"।

রচনাশৈলী ঃ সম্পাদকরা ছোটো ছোটো বাক্য পছন্দ করেন। ক্রিয়াপদের ব্যবহার বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে করতে হবে। আর হ্যাঁ, বানান। প্রতিটি শব্দের বানান বার করে পরীক্ষা করবেন সংবাদলিপি পাঠানোর আগে।

শেষ দেখা ঃ পাঠানোর আগে সংবাদলিপি নিজে ভালো ক'রে দেখে নেবেন।

৮.৩.২ পটভূমি পরিচায়ক (Backgrounder)

পূর্ববর্তী এককে আলোচনা করা হয়েছে, বিভিন্ন মাধ্যম এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে কার্যকরী সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং বজায় রাখা জন-সংযোগের কাজে বিশেষ জরুরি। কিন্তু, এই সম্পর্ক কেবল কোনো সংবাদ প্রকাশের সময়ের

জন্য নয়। এই সম্পর্ক নিয়মিত, নিরবচ্ছিন্ন। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনার সময় জন-সংযোগ আধিকারিক উপলব্ধি করেন, তাঁর সংস্থার নানা তাৎপর্যপূর্ণ খুঁটিনাটি বিষয় সাংবাদিকদের অজানা। ধরা যাক, একটি নতুন কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে। উৎপাদন যেদিন শুরু হবে, সেদিন আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। এই উপলক্ষে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। যে সাংবাদিকরা এই সম্মেলনে যোগ দিতে আসবেন, আগে থেকেই, সংস্থার পণ্য উৎপাদন কৌশল, পণ্যের মান, বাজার, নতুন কারখানায় নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার, অত্যাধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে তাঁদের ওয়াকিবহাল ক'রে রাখাই যুক্তি যুক্ত এবং সুবিধাজনক।

মনে রাখা প্রয়োজন, সংবাদলিপি এবং পটভূমি পরিচায়ক এক নয়। কোনো একটি ঘটনার বিবরণ নিয়ে একটি সংবাদলিপি হতে পারে। সেই ঘটনার পশ্চাৎপট বা প্রস্তুতির বিষয়ে নানা তথ্য জানিয়ে সাংবাদিকদের যে বিশেষ লিপি পাঠানো হয়—সেইটি ই "পটভূমি পরিচায়ক"।

সংস্থার প্রচারিত সংবাদলিপিতে যে তথ্য পরিবেষণ করা হয় সাংবাদিকদের পক্ষে অনেক সময়েই তা যথেষ্ট নয়। সংস্থার কোনো ঘটনার বা কৃতিত্বের সংবাদ লেখার জন্য সংস্থা এবং সংস্থার কাজকর্ম সম্পর্কে অনেক বিস্তারিত ভাবে জানা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই বিস্তারিত তথ্যই সংবাদটি যথাযথ এবং পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রকাশ করতে সাংবাদিকদের সহায়তা করে। সংস্থার প্রচারও যথাযথ হয়।

মনে করুন, কোনো সংস্থা একটি জীবনদায়ী ওষুধ উৎপাদনের জন্য বিদেশ থেকে অত্যাধুনিক, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র এনে বসিয়েছেন। উৎপাদনের ঘরটি বাতানুকুল করা হয়েছে যাতে কোনো রকম ধুলো ময়লা প্রবেশ করতে না পারে। এই যন্ত্রটির উৎপাদন ক্ষমতা কী রকম? যে ওষুধটি তৈরি হবে, সেটি কী বর্তমানে আমাদের দেশে পাওয়া যায়? এই নতুন ওষুধ কোন কোন রোগে আক্রান্ত রোগীর নিরাময়ের সম্ভাবনা বাড়াবে? এই প্রকল্প রূপায়নের জন্য সংস্থা কত টাকা লগ্নী করেছেন? প্রকল্পে কত লোক কাজ করবেন? এই ওষুধটি তৈরির জন্য কোনো বিদেশী কারিগরি প্রয়োগ করা হচ্ছে কী? হয়ে থাকলে, সেই কারিগরি সহায়তা কোন দেশ থেকে পাওয়া গেছে? এই সব বিস্তৃত বিবরণ যদি "পটভূমি পরিচায়ক" পাঠিয়ে নির্বাচিত বিভিন্ন মাধ্যমের সাংবাদিকদের অবহিত করা যায়, তাহলে নতুন প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পূর্বেই প্রচারের সুযোগ হতে পারে। আর, উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সংবাদেও অনেক বিস্তৃত তথ্যের পরিবেষণ হতে পারে।

কোনো প্রকল্প, কোনো ঘটনা, কোনো অনুষ্ঠানের পশ্চাৎপট বোঝানোর জন্য বিভিন্ন মাধ্যমের সাংবাদিকদের প্রস্তুতি হিসাবে যে বিস্তারিত বিবরণ পাঠানো হয়, তাকেই "পটভূমি পরিচায়ক" বলে।

"পটভূমি পরিচায়ক" রচনার জন্য জন-সংযোগ আধিকারিক নিজে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করবেন। সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ ক'রে নির্ধারণ করবেন কোন কোন বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সংস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার ক'রে "পটভূমি পরিচায়ক" রচনা করবেন। মনে রাখতে হবে, "পটভূমি পরিচায়ক"-এর বিষয়বস্তু সাংবাদিকরা তাঁদের লেখায় ব্যবহার করবেন। "পটভূমি পরিচায়ক" তাঁদের প্রভাবিত করবে।

৮.৩.৩ সংক্ষিপ্ত সংবাদ (Press Brief)

"Press Brief" এই দুটি ইংরাজি শব্দের সমন্বয় বিভিন্ন মাধ্যমে এবং বিভিন্ন সংস্থার জনসংযোগ বিভাগে বহু ব্যবহৃত। মাধ্যমের ব্যবহারের জন্য কোনো ঘটনার সংক্ষিপ্ত সংবাদ। আবার, কোনো সংবাদের কোনো বিশেষ অংশ বোঝানোর জন্য সংক্ষিপ্ত সংবাদ "প্রেস ব্রিফ" শব্দটি দ্বর্থক।

উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক কোনো কারখানার এক মাসের উৎপাদন সারা বছরের গড় উৎপাদনের চেয়ে উল্লেখযোগ্য বেশি হয়েছে। একটি সংক্ষিপ্ত সংবাদ বিভিন্ন মাধ্যমে পাঠানো হলো যাতে মাধ্যমগুলি সংবাদটি প্রচার

করেন। আরো একটি উদাহরণ। কোনো কারখানায় কয়েকদিন আগে দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। দুর্ঘটনার জন্য পাঁচদিন বন্ধ থাকার পরে কারখানায় স্বাভাবিক কাজকর্ম আবার শুরু হয়েছে। সব মাধ্যমকে সংক্ষিপ্ত সংবাদ পাঠানো প্রয়োজন।

৮.৩.৪ প্রত্যুত্তর (Rejoinder)

সংস্থা সম্বন্ধে কোনো ভুল সংবাদ প্রচারিত হলে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমের পাঠক, শ্রোতা বা দর্শকদের অবগতির জন্য সঠিক সংবাদ উল্লেখ ক'রে সংশোধনী পাঠানো হয় সংশ্লিষ্ট মাধ্যমকে। সঠিক তথ্য উল্লেখ ক'রে মাধ্যমটি সংশোধনী প্রচার করে। এই সংশোধনী বার্তাই "প্রত্যুত্তর"।

সাধারণত জনসংযোগ অধিকর্তাই সংস্থার তরফে সংশোধনী পাঠিয়ে থাকেন। তবে, প্রকাশিত ভুল সংবাদের গুরুত্ব বা ক্ষতিকারক দিকটি বিবেচনা ক'রে অনেক সময় সংশ্লিষ্ট বিভাগের অধিকর্তার নামে সংশোধনী পাঠানো হয়। কিন্তু সংশোধনী মুসবিদা ও রচনা করেন জন-সংযোগ অধিকর্তা। সংশোধনী লেখার সময় কেবল ভুল তথ্য ও বিতর্কিত বিষয়টিই উল্লেখ করা উচিত। মাধ্যমের দ্বারা ভুল তথ্য প্রচারের জন্য সংস্থার কী এবং কতটা ক্ষতির সম্ভাবনা সে বিষয়েও উল্লেখ করা প্রয়োজন। অবশ্য সঠিক তথ্য জানাতে হবে। ভুল তথ্য প্রচারের জন্য জনসমক্ষে বা সংস্থার বিভিন্ন জিনিস ব্যবহারকারীর এবং অন্যান্য গ্রাহকদেব চোখে সংস্থার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকলে, সে বিষয়ে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

প্রত্যুত্তর রচনার সময় জন-সংযোগ অধিকর্তাকে সতর্ক থাকতে হবে। প্রত্যুত্তরের ভাষা এবং রচনাশৈলী যেন মাধ্যমকে বা সংবাদ রচয়িতাকে আঘাত না করে। প্রত্যুত্তরে যেন কারো প্রতি কোনো কটাক্ষ না থাকে। শ্লেষ না থাকে। সংবাদ রচয়িতা বা মাধ্যমের প্রতি শ্লেষ বা ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যও পরিহার করা কর্তব্য। প্রত্যুত্তরের শ্লেষ বা কটাক্ষ সংবাদ রচয়িতার বিশেষ বিরক্তির কারণ হতে পারে। তাঁর মনোভাব যদি শ্লেষের ফলে কঠিন হয়ে ওঠে তাহলে সংস্থার সমস্যা সৃষ্টি হবে।

মূল কথা যেটি মনে রাখা প্রয়োজন, জন-সংযোগ অধিকর্তা মাধ্যমের সঙ্গে এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করবেন। কোনো ভুল তথ্যের সংশোধনের জন্য তিনি এমন কিছু করবেন না যাতে মাধ্যম এবং সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ব্যাহত হয়। আরো মনে রাখা প্রয়োজন, কেবল একটি সংশোধনী প্রকাশ ক'রেই তাঁর কাজ শেষ হয়ে যাবে না। সংবাদ মাধ্যম এবং সাংবাদিকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ধারাবাহিক, নিরবচ্ছিন্নতার সূত্রে গাঁথা। এই সব বিবেচনা করেই প্রত্যুত্তরের ভাষা এবং রচনাশৈলী স্থির করতে হবে।

৮.৪ আভ্যন্তরীণ পাবলিকের জন্য

আভ্যন্তরীণ পাবলিকের সঙ্গে জন-সংযোগের প্রয়োজন মেটাতে ভিন্ন ধরণের মাধ্যম ব্যবহার করা হয়। যেহেতু এই যোগাযোগ সংস্থার নিজের কর্মীদের সঙ্গে, অতএব উদ্দিষ্ট শ্রোতা নির্দিষ্ট, চিহ্নিত এবং সংস্থার পরিচিত। এই বিশেষ পাবলিকের কাছে বার্তা পৌঁছানোর জন্য সংস্থা নিজেই মাধ্যম সৃষ্টি করেন এবং পরিচালনা করেন। এই মাধ্যমগুলি সংস্থার নিজস্ব মাধ্যম। আভ্যন্তরীণ পাবলিকের জন্য সংস্থার নিজস্ব মাধ্যমগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য এবং বহু ব্যবহৃত দুটি মাধ্যম। হাউস জার্নাল ও বুলেটিন বোর্ড।

৮.৪.১ হাউস জার্নাল (House Journal)

সংস্থার নিজস্ব পত্রিকা। সম্পাদনার সময় মনে রাখতে হয়, সংস্থার পত্রিকার যথাযথ অর্থ—সংস্থার শ্রমিক

কর্মচারিদের পত্রিকা। যে সব সংবাদ বা রচনা প্রকাশনার জন্য নির্বাচিত হবে সেগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। কোন কোন সংবাদ আভ্যন্তরীণ পাবলিকের জন্য কীভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন, কর্মচারীরা বিষয়টিকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন, এইগুলিই বিশেষ বিবেচনার বিষয়। হয়তো পরিচালন ব্যবস্থার কোনো বিষয়ে কর্মচারীদের যে ধারণা সৃষ্টি হয়েছে, সেই বিষয়ে কোনো লেখা প্রকাশ করতে হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, পাঠক যেন মনে না করেন কর্তৃপক্ষের বক্তব্যই প্রকাশ করা হচ্ছে। তাহলে লেখাটি প্রকাশ করার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। রচনাশৈলী এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে পাঠকের ভুল ধারণার পরিবর্তন হবে। কিন্তু, কেবল কর্তৃপক্ষের বক্তব্যই নয়, পাঠকের জিজ্ঞাসার উত্তরও লেখাটিতে পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য, এই কাজ সহজ নয়। ভাষার উপরে বিশেষ দখল না থাকলে এই ধরণের লেখা সম্ভব হয় না।

আরো সতর্ক পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন, যে হাউস জার্নালের জন্য লেখা হচ্ছে, সেটি ঠিক কাদের কাছে যাবে? ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের কাছে যে হাউস জার্নাল যাবে, তার বক্তব্য, উপস্থাপন এবং ভাষা এক বিশেষ ধরণের হবে। পাঠকদের শিক্ষার মান এবং সংস্কৃতির মানের উপযুক্ত হবে। কিন্তু যে হাউস জার্নাল কারখানার সাধারণ শ্রমিকদের কাছে যাবে তার বিভিন্ন লেখার ভাষা, শব্দচয়ন, উপস্থাপন এবং বক্তব্য অন্য রকম হবে। বলা যেতে পারে, অনেক সহজ হবে, সরল হবে, পাঠকদের সহজবোধ্য করার জন্য। কখনো কখনো নতুন প্রযুক্তি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন হতে পারে। সেক্ষেত্রেও রচনার মূল সূত্র সরলীকরণ। যেন সহজে বোঝা যায়।

সহজ ক'রে লিখতে হবে, এ কথা বলা সহজ কিন্তু সহজ ক'রে লেখা সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—"আমায় সবাই সহজ লিখতে বলো যে, সহজ করে যায় না লেখা সহজে"। লেখার জন্য প্রতিটি শব্দ চয়নের সময় চিন্তা করতে হবে শব্দটি উদ্দিষ্ট পাঠকের কাছে সহজবোধ্য কি না। যে সব ছবি বা ড্রয়িং ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলি পাঠকের মনে কাঙ্খিত প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছে কি না। লেখার প্রভাব বাড়ানোর জন্যই ছবি আর ড্রয়িং ব্যবহার করা হয়। সেই উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে কিনা জানা প্রয়োজন।

যেহেতু হাউস জার্নাল মূলত আভ্যন্তরীণ পাবলিকের জন্য সেই কারণে বিভিন্ন লেখায় পাঠকদের মতামত আহ্বান করা বিশেষ প্রয়োজন। পাঠকদের বক্তব্যই বুঝিয়ে দেয়, জার্নালে লেখার উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে কিনা। পাঠকদের বক্তব্যের আদান প্রদান পাঠকদের এবং পত্রিকার পরিচালকদের অর্থাৎ কর্তৃপক্ষের মধ্যে বোঝাপড়া সৃষ্টির বিশেষ সহায়ক।

৮.৪.২ বুলেটিন বোর্ড

বিভিন্ন কারখানায় এবং বড়ো অফিসে নির্দিষ্ট জায়গায় বুলেটিন বোর্ড রাখা হয়। আভ্যন্তরীণ পাবলিককে জানানোর জন্য নানা সংবাদ বুলেটিন বোর্ডে দেওয়া হয়। বুলেটিন বোর্ডের সংবাদ সংক্ষিপ্ত, নির্দিষ্ট এবং বড়ো হরফে লেখা প্রয়োজন। পাঠক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এবং বেশ কয়েকজন একসঙ্গে বুলেটিন বোর্ডের সংবাদ পড়ে থাকেন। তাঁদের পড়ার সুবিধা এবং সহজে পড়ার সুবিধার দিকে নজর রাখা প্রয়োজন। বুলেটিন বোর্ডে যে কোনো বক্তব্য সোজাসুজি, সহজভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। আরো মনে রাখা দরকার, বুলেটিন বোর্ডের সংবাদে একটি তাৎক্ষণিক আবেদন অথবা সাম্প্রতিক আবেদন থাকা ভালো। তাহলে সংবাদের সাম্প্রতিকতা এবং গুরুত্ব বাড়ে।

৮.৫ সারাংশ

জন-সংযোগের জন্য প্রচুর লেখার কাজ করতে হয়। তবে এই সব লেখা সাধারণ লেখা নয়। জন-সংযোগের জন্য লেখার অনেক বিশেষত্ব আছে এবং বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। উদ্দিষ্ট পাবলিকের মনোভাব প্রভাবিত করাই জন-

সংযোগের জন্য লেখার উদ্দেশ্য। সেই কারণেই, বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন, জনসংযোগের উদ্দেশ্যে লেখার জন্য।

সাধারণত দুই শ্রেণির পাবলিকের উদ্দেশ্যে জন-সংযোগের জন্য লেখা হয়। সংস্থার বাইরের পাবলিক এবং আভ্যন্তরীণ পাবলিক। সংস্থার বাইরের পাবলিকের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য গণমাধ্যম ব্যবহার করা হয়। গণমাধ্যমের কতকগুলি নিজস্ব চাহিদা আছে। গণমাধ্যমের জন্য জন-সংযোগমূলক লেখার জন্য মাধ্যমের রীতি নীতি এবং চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে লিখতে হয়। লেখার ভাষা, রচনাশৈলী সবই মাধ্যমের চাহিদামত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সংবাদ মাধ্যমের জন্য সংবাদলিপি, পটভূমি পরিচায়ক, সংক্ষিপ্ত সংবাদ এবং প্রত্যুত্তর রচনা করতে হয়। প্রতিটি লেখার নিজস্ব বৈশিষ্ট, প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা আছে।

সংস্থার আভ্যন্তরীণ পাবলিকের সঙ্গে জনসংযোগের জন্য সংস্থার নিজস্ব মাধ্যম ব্যবহার করা হয়। সংস্থার নিজস্ব মাধ্যমের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—হাউস জার্নাল ও বুলেটিন বোর্ড। যেহেতু আভ্যন্তরীণ পাবলিকের জন্য, উদ্দিষ্ট পাবলিকের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হাউস জার্নালের বার্তা, বার্তার ভাষা, রচনাশৈলী, উপস্থাপনা স্থির করা প্রয়োজন। মূল কথা, যাদের উদ্দেশ্যে এই মাধ্যম ব্যবহার করা হয়, তাদের কাছে বার্তা যেন সহজবোধ্য হয়, নির্দিষ্ট সংবাদ জানাতে সক্ষম হয়।

৮.৬ অনুশীলনী

১। জনসংযোগের জন্য লেখার বৈশিষ্ট কী কী?

২। সংস্থা বহির্ভূত পাবলিকের উদ্দেশ্যে লেখার জন্য গণমাধ্যমের লেখার শর্ত মানার প্রয়োজন হয় কেন?

৩। সংবাদলিপি লেখার জন্য কী কী নির্দেশাবলী মেনে চলা প্রয়োজন?

৪। "পটভূমি পরিচায়ক" লেখার প্রয়োজনীয়তা কী?

টীকা লিখুন ঃ

ক. সংক্ষিপ্ত সংবাদ, খ. প্রত্যুত্তর, গ. হাউস জার্নাল, ঘ. বুলেটিন বোর্ড

৮.৭ গ্রন্থপঞ্জি

1. Public Relations Writing Form & Style — Dough Nessom and Bob Carre

পি. জি. ডি. জে. এম. সি

ষষ্ঠ পত্র—গ

একক ১ ❒ সিনেমার আদিপর্ব

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ সিনেমার জন্ম

১.৪ টমাস আলভা এডিসন

১.৫ ল্যুমিয়ের ভাতৃদ্বয়

১.৫.১ ল্যুমিয়ের ভাইদের ছবি

১.৫.২ সিনেমার ক্রমউন্নয়ন

১.৫.৩ দ্য ওয়াটারার ওয়াটার্ড

১.৬ জর্জ মেলিয়ে

১.৬.১ এ ট্রিপ টু দ্য মুন

১.৭ সারাংশ

১.৮ অনুশীলনী

১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন :

- সিনেমার জন্মকথা,
- চলচ্চিত্রের প্রথম প্রদর্শক ল্যুমিয়ের ভাতৃদ্বয়ের ছবির কথা,
- ট্রিক ফিল্মস্-এর জনক জর্জ মেলিয়ে-য়ের অবদান সম্পর্কে,

১.২ প্রস্তাবনা

চলচ্চিত্রে চলমান জীবনকে দেখা গেলেও তার উৎসে রয়েছে স্থির চিত্র। স্থির চিত্রে চলমান জীবনের একটি মুহূর্তকে ফ্রেমবন্দি করেও বিজ্ঞানীরা সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তারা চেষ্টা করতে থাকেন চলমান জীবনকে পর্দায় দেখাবার। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ১৮৯৪ সালে আমেরিকার বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন আবিষ্কার করেন কিজেটোস্কোপ। এডিসন ছিলেন প্রথম বিজ্ঞানী যিনি চলমান জীবনকে ক্যামেরাবন্দি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু এই ছবি পর্দায় দেখানোর কৃতিত্ব ফ্রান্সের ল্যুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয়ের — লুই ও অগাস্ট। ১৮৯৫ সালের প্যারিসে তাঁরা প্রথম চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী করেন। ছবিটি ছিল ওয়ার্কার্স লিভিং দ্য ফ্যাক্টরি। এটি নিছকই কারখানার শ্রমিকদের কারখানা ছেড়ে বেরোনোর দৃশ্য। দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করা ছাড়া ওঁরা আর কিছু করেননি। চলচ্চিত্রের বিপুলতাকে প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন অপর এক ফরাসী — জর্জ মেলিয়ে। যাদুকর থেকে পরিচালক মেলিয়ে "ট্রিক ফিল্মস্" জ্যঁর-এর জন্ম দিয়েছিলেন। আবিষ্কার করেছিলেন বিভিন্ন কৌশলের। প্রথম কাহিনীচিত্রের নির্মাতাও ছিলেন এই মহান স্রষ্টা।

১.৩ সিনেমার জন্ম

চলচ্চিত্র মাধ্যমেই আমরা প্রথম চলমান জীবনকে দেখতে পাই। কিন্তু এর মূলে রয়েছে স্থির চিত্র। অনেকগুলি স্থির চিত্রের অতি দ্রুত — প্রতি সেকেণ্ডে ২৪টা ফ্রেম — প্রক্ষেপণের দ্বারা যখন গতির একটা ভ্রান্তি (illusion of movement) সৃষ্টি হয় তখন আমরা পর্দায় চলমান জীবনের ছবি দেখতে পাই। এই ভ্রান্তি সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে ইঙ্গমার বার্গমানের (Ingmar Bergman) ভাষার মানুষের চোখের একটি 'ত্রুটির' জন্য, যাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা হয় 'persistence of vision' বা বাংলায় 'অবিরত প্রত্যক্ষণ'। যে কোন জিনিস দেখার পর মানুষের মস্তিষ্কে খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও তার একটা রেশ থেকে যায়। বৈজ্ঞানিকরা অনুভব করেন যদি এমন একটা মেশিন আবিষ্কার করা যায় যার দ্বারা স্থির চিত্র এত দ্রুত দেখানো যাবে যে তার ফলে মানুষের মস্তিষ্কে গতির একটা ভ্রান্তি সৃষ্টি করা সম্ভব হবে! কিন্তু এই আবিষ্কার এক দিনে সম্ভব হয়নি। এর পিছনে রয়েছে বহু বছরের প্রয়াস।

'সিনেমা' শব্দটির উৎস গ্রিক শব্দ 'কিমেমা' থেকে, যার অর্থ 'গতি'। চলমান জীবনের গতিময়তা মানুষকে আকৃষ্ট করেছে সভ্যতার আদিযুগ থেকে। আলতামারির গুহা চিত্রে দেখা গেছে বাইসনের ছ'টা পা। এটি আসলে গুহাশিল্পীর দ্বারা বাইসনের ছুটন্ত অবস্থা বোঝানোর চেষ্টা।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ক্যামেরা আবিষ্কৃত হলেও 'ক্যামেরা' শব্দটি প্রথম পাওয়া যায় 'রেনেসাঁস' যুগে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির 'ক্যামেরা অব্‌সকিউরা' থেকে। দ্য ভিঞ্চি বর্ণিত ক্যামেরা অব্‌সকিউরাতে ক্যামেরার সমস্ত উপাদান থাকলেও ফিল্মের কোন উল্লেখ ছিল না।

১৮২৬ সালে ক্যামেরা আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু তাতে চলমান ছবি তোলা সম্ভবপর ছিল না। সে সময় একটি ছবি তোলার জন্য ফিল্মের উপর বহু সময়ের জন্য আলো ফেলতে হত। ছবি তোলার পরিভাষায় একে বলা হয় লেংদি এক্সপোজার (Lengthy Exposure)। অথচ চলমান ছবি তুলতে হলে প্রয়োজন ছিল দ্রুততার। আগেই বলেছি চলচ্চিত্রের জন্য প্রয়োজন ১ সেকেণ্ডে ২৪টা ফ্রেম। সিনেমার শৈশবে অবশ্য ২৪টা ফ্রেম নির্ধারিত ছিল না। ক্যামেরা চালনা এবং ছবি প্রদর্শন দুই-এর কোনটাই তখন স্বয়ংক্রিয় (automatic) ছিল না, ফলে একজনের থেকে আরেকজনের ফ্রেম সংখ্যা অন্যরকম হত। উনিশ শতকের শেষের দিকে অবস্থার ক্রমে উন্নতি হয়। ১৮৭৯ সালে আমেরিকার এডওয়ার্ড মেব্রিজ (Eadword Maybridge) একাধিক ক্যামেরা ব্যবহার করে ছুটন্ত ঘোড়ার ছবি তোলেন। এই সময় ফ্রান্সের এঁতিয়েন মারে (Etienne Marrey) ফটোগান (Photogun) নামে একটি ক্যামেরা আবিষ্কার করেন। ক্যামেরাটি

ছিল রাইফেলের মত দেখতে। ট্রিগার টিপলেই পর পর এক সঙ্গে অনেকগুলি ছবি তোলা যেত। এইখান থেকেই শুটিং শব্দটা চলচ্চিত্রের ছবি তোলার সাথে জড়িয়ে যায়।

এর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার — সেলুলয়েড (celluloid), এটি প্রথম বাজারে আনে কোডাক কোম্পানী। মারে আবিষ্কৃত ক্যামেরা এবং এই সেলুলয়েড, এই দুইয়ের সমন্বয়ে প্রথম চলমান ছবি তোলার সম্ভাবনা দেখা দিল। ক্যামেরায় তোলা ছবি প্রজেক্টর (projector)-এর মাধ্যমে পর্দায় প্রদর্শিত হয়। সেই প্রজেক্টর-এর পূর্বসূরি হল ম্যাজিক ল্যানটার্ন (Magic Lantern)। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ম্যাজিক ল্যানটার্নের সাহায্যে পর্দায় ছবি ফেলে দেখানো হত। ১৮৭৭ সালে এমিল রেনড-এর (Enile Reynaud) আবিষ্কৃত প্রাক্সিনোস্কোপ (Praxinoscope) হল প্রথম যন্ত্র যার দ্বারা সফলভাবে চলমান ছবি প্রদর্শন সম্ভব হয়।

১.৪ টমাস আল্‌ভা এডিস্‌ন্‌

১৮৯৪ সালে বিখ্যাত আমেরিকান বৈজ্ঞানিক টমাস আল্‌ভা এডিস্‌ন্‌ (Thomas Alva Edison) আবিষ্কার করেন কিনেটোস্কোপ (Kinetoscope)। ইনিই পৃথিবীর প্রথম ব্যক্তি যিনি চলমান ছবি তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এডিসন আবিষ্কৃত যন্ত্রটি ছিল একটি বাক্সের মত। যার ভিতরে ফিল্ম এমনভাবে চাকার মধ্য দিয়ে লাগানো থাকতো যে সম্পূর্ণ ফিল্মটুকু কোথাও না থেমে টানা চলে শেষ হত। প্রতিবার একজনমাত্র দর্শক বাক্সের উপরে একটি ছিদ্র দিয়ে উঁকি মেরে সেই ছবি দেখতেন। এডিস্‌ন্‌ তুলেছিলেন সার্কাসের বিভিন্ন খেলার ছবি। কিন্তু তিনি মনে করতেন চলমান চিত্র কখনই চিরস্থায়ী হবে না, ফলে ছবিকে পর্দায় ফেলে প্রদর্শনের কোন চেষ্টাই তিনি করেননি।

১.৫ ল্যুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয়

সিনেমাকে তার পরিপূর্ণতা দিয়ে পৃথিবীর মানুষের কাছে প্রথম উপস্থাপিত করেন এডিসনের সমসাময়িক ফ্রান্সের ল্যুমিয়ের (Lumiere) ভাতৃদ্বয় — ল্যুই (Louis) ও আগস্ট (Auguste)। তাঁদের তোলা প্রথম ছবিটি ছিল ওয়ার্কার্স লিভিং দ্য ফ্যাক্টরি (Workers Leaving the factory)। ওঁদের নিজেদের কারখানার সামনে ক্যামেরা বসিয়ে শ্রমিকদের কারখানা ছেড়ে যাওয়ার দৃশ্য ক্যামেরায় তুলে নেন। প্রথম থেকেই ল্যুমিয়েরদের ছবির বিষয়বস্তু ছিল দৈনন্দিন জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ওঁরা ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন রাস্তায়। ক্যামেরা কাঁধে রাস্তায়, পার্কে ঘোরার সময় যে ঘটনা বা দৃশ্য মনমত হত, হয়ত বা খুবই সাধারণ প্রতিদিনের ঘটনা সেটাই তাঁরা ক্যামেরাবন্দী করতেন — যেমন, ট্রেন এনটারিং দ্য স্টেশন (Train Entering the Station), ফিডিং দ্য বেবি (Feeding the baby) যেখানে ল্যুই ল্যুমিয়ের দম্পতি তাঁদের ছোট শিশুকে বাগানে বসে দুধ খাওয়াচ্ছে, এ কার্ড গেম (A card game) এখানে ল্যুমিয়ের ভাইদের বাবা ও তাঁর বন্ধুরা বসে তাস খেলছেন, ইত্যাদি। ১৮৯৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তাঁরা তাঁদের ছবির প্রথম প্রদর্শন করেন প্যারিস শহরে 'গ্র্যাণ্ড কাফেতে'। ১৮৯৬ থেকে ১৯০৬ সালের মধ্যে তাঁরা হাজার খানেক ছবি তৈরী করেছিলেন। সব কটি ছবিই নিত্যদিনের বিভিন্ন ঘটনাবলী। প্যারিসের বিভিন্ন রাস্তা, পার্ক, বাগান, সমুদ্রতট ইত্যাদি জায়গায় তাঁরা ঘুরে ঘুরে ছবি তুলতেন। প্রথম দিকের অতি সরল, সহজ বিষয় থেকে ক্রমশ তাঁরা আরও কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়ে ছবি করতে থাকেন, অর্থাৎ — দেওয়াল ভেঙে পড়ার দৃশ্য বা মুরগীদের খাওয়ানো ইত্যাদি বিষয় থেকে সরে তাঁরা দেখান জাহাজের জাহাজখাটা ছেড়ে যাওয়া, জননেতার জনগণের প্রতি ভাষণ, পেশীবহুল ব্যক্তির পেশীর আস্ফালন ইত্যাদি।

ল্যুমিয়ের ভাতৃদ্বয়ের কাছে সিনেমা ছিল নিছকই বাণিজ্যের উপাদান। প্যারিস শহরের সাফল্যের পর তাঁরা তাঁদের ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন বিশ্বজয়ে। ভারতবর্ষেও তাঁরা এসেছিলেন। বোম্বাই শহরে তাঁদের ছবি প্রদর্শিত হয়।

ল্যুমিয়েররা ভাবেননি সিনেমা কোনদিন শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে। তাঁরা সিনেমার বিষয়বস্তু নিয়েও ভাবনাচিন্তা করেননি। স্থির চিত্রের সাথে আপাত কোন তফাৎ ছিল না ছবিগুলির শুধু চিত্রাবলী ছিল চলমান। দৃশ্যের বিষয়বস্তু নিয়ে ভাবিত না হলেও দৃশ্য গ্রহণের সময় তাঁরা সতর্ক থাকতেন বিষয়বস্তু যেন যথার্থ আলোকিত হয়।

সেই সময় দর্শকও চলমান দৃশ্যের অভিনবত্বে রোমাঞ্চিত হতেন, মুগ্ধ হতেন। বিষয়বস্তু বা ভালমন্দের বিচার তাঁরাও করতেন না। এ বিষয়ে যথার্থ বলেছেন অ্যালবার্ট স্মিথ (Albert Smith)। অ্যালবার্ট স্মিথ ছিলেন তৎকালীন সিনেমা জগতের প্রথম সারির এক ব্যক্তিত্ব এবং ভিটাস্কোপ (Vitascope) যন্ত্রের যুগ্ম আবিষ্কারক। উনি লিখেছেন, "It was motion alone that intrigued the spectators."।

১.৫.১ ল্যুমিয়ের ভাইদের ছবি

ল্যুমিয়ের ভাইদের ছবিগুলি ছিল স্বল্প— দৈর্ঘ্যের। পাঁচ থেকে দশ মিনিটের হত প্রত্যেকটি ছবি। সব ছবিই বাস্তব জীবনের বিভিন্ন মুহূর্ত। সেই সময়ে প্রতি এক সেকেণ্ডে থাকত ১৬টা ফ্রেম। ক্যামেরা বসানো হত চোখের সামন্তরালে এবং সরাসরি সামনে। যেভাবে আমরা সাধারণতঃ দেখে থাকি। যেমন ওয়ার্কার্স লিভিং দ্য ফ্যাক্টরি (workers leaving the factory) ছবিটি তোলার সময় ওঁরা কারখানার সামনে ক্যামেরা বসিয়ে দিয়েছিলেন আর শ্রমিকরা ক্যামেরার সামনে দিয়ে কারখানা থেকে বেড়িয়ে চলে গেছে। এছাড়া ক্যামেরা যথাসম্ভব পিছনে নেওয়া হত যাতে সমস্ত ঘটনাবলীই দেখা যায় সেই শটে। একটি শটেই পুরো ছবি শেষ হত। সেই শট ছিল এখনকার মিড লং শট (Mid Long shot)। ছবির দৈর্ঘ্য নির্ভরশীল ছিল ফিল্মের দৈর্ঘ্যের উপর। সচরাচর যা ছিল আধ মিনিটের মত। ফিল্ম ফুরিয়ে গেলে সেই ছবি সেখানেই শেষ।

১.৫.২ সিনেমার ক্রম-উন্নয়ন

সিনেমা তার শৈশবে ছিল বিস্ময়ের বস্তু। বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে নাচ, গান, যাদুর খেলার সাথে স্বল্প দৈর্ঘ্যের এই বাস্তব চিত্রগুলি দেখানো হত। সিনেমা অচিরেই জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু পরবর্তীকালে গল্পহীন, কম্পহীন বাস্তবের এই বোবা প্রদর্শন দর্শকের কাছে আকর্ষণ হারায়। বিনোদনের জনপ্রিয় উপাদান থেকে সিনেমা পরিণত হয় সাধারণ চেসার্স-এ (Chasers), অর্থাৎ মূল অনুষ্ঠানের ফাঁকে দর্শকের যাতায়াতের সময়ই শুধু দেখানো হত।

ল্যুমিয়ের ভাইরা তাঁদের ছবির সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারেন। তাঁরা চেষ্টা করেন এই স্বল্প-দৈর্ঘ্যের ছবিতে সাজানো ঘটনা দিয়ে হাস্য কৌতূক সৃষ্টি করার। যেমন, ১৮৯৫ সালে তৈরী দ্য ওয়াটারার ওয়াটার্ড (The Waterer Watered).

১.৫.৩ দ্য ওয়াটারার ওয়াটার্ড

এই ছবিটির শ্যুটিং একটি বাগানে করা হয়েছিল। ছবিটি এরকম: একজন মালী গাছে জল দিচ্ছে। এমন সময় মালীর পেছন দিক থেকে একটি ছেলে এসে জলের নলের ওপর দাঁড়াল। স্বাভাবিকভাবেই জল বন্ধ হয়ে গেছে। মালী যেই জল বন্ধ হওয়ার কারণ দেখতে নল মুখের কাছে আনলো ছেলেটা পাইপ ছড়ে দাঁড়াল আর মালী জলের তোড়ে ভিজে গেল। সিনেমার ইতিহাসে এই স্বল্প-দৈর্ঘ্যের ছবিটি অত্যন্ত মূল্যবান। ছবিতে এই প্রথম গল্প বলার চেষ্টা করা হয়।

এই ধরণের হাস্য কৌতূকের ছবি ওঁরা আরও তৈরী করেছিলেন। এই ধরণের ছবিগুলিতে ল্যুমিয়ের ভাতৃদ্বয় বাস্তব দৃশ্যের এবং অভিনীত ঘটনার খুব সুন্দর সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন।

বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটলেও দৃশ্যগ্রহণ একই রকম ছিল। ক্যামেরা পেছনে বসিয়ে একটি শটে পুরো ঘটনা দেখানো হয়েছিল। অবশ্য দৃশ্য গ্রহণের একটি ব্যতিক্রম দেখা গেছে 'ট্রেন এনটারিং দ্য স্টেশন' (Train Entering the Station) ছবিটিতে। এখানে ছবিতে ক্যামেরা ট্রেনের সরাসরি সামনে না বসিয়ে একটু তেরচা করে অনেক নীচে একটি জায়গায় বসানো হয়েছিল।

ল্যুমিয়ের ভাইরা কখনও সিনেমাকে শিল্প মাধ্যম হিসেবে ভাবেননি। তাঁরা এটাও ভাবেননি সিনেমা চিরস্থায়ী হতে পারে। তাঁরা ক্রমশ ছবি নির্মাণ কমিয়ে দেন এবং অবশেষে ১৯০৫ সালে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেন। ল্যুমিয়ের ভাতৃদ্বয় সিনেমার আবিষ্কারক না হলেও ভবিষ্যতের সিনেমার ধারা এবং বাণিজ্যিক সাফল্যের ইঙ্গিত তাঁদের কাজ থেকেই প্রথম পাওয়া যায়।

১.৬ জর্জ মেলিয়ে

ল্যুমিয়ের ভাইদের পরেই আসে ফরাসী দেশের আর এক ছবি নির্মাতার কথা — জর্জ মেলিয়ে (Geroges Milies)। প্যারিসের বিখ্যাত যাদুকর রবার্ট হনডিন-এর (Robert Hondin) ছাত্র জর্জ মেলিয়ে পেশায় যাদুকর ছিলেন। ল্যুমিয়ের ভাইদের ছবি দেখে তিনি বুঝতে পারেন বাস্তব জীবনের হুবহু চিত্রণের বাইরে সিনেমায় একটি অবাস্তব যাদুর জগৎ সৃষ্টি করা সম্ভব। ১৮৯৬ সালে মেলিয়ে প্রথম ছবি তৈরী করেন। তাঁর প্রথম জীবনের ছবিগুলিও ল্যুমিয়ের ভাইদের মত বাস্তব চিত্রণ ছিল। ১৮৯৬ সালের এপ্রিল মাসে রবার্ট-হনডিন থিয়েটারে তাঁর ছবির প্রথম প্রদর্শন করেন। মেলিয়ে-এর নিজের কথায় চলচ্চিত্র নিমার্ণের প্রথম বছরেই একটি শ্যুটিং-এর সময় ক্যামেরার যান্ত্রিক গোলযোগের মধ্য দিয়ে তিনি আবিষ্কার করেন সিনেমায় যাদুর জগৎ সৃষ্টি করার কৌশল। ঘটনাটা ছিল এরকম — দেল অপেরাতে (del Opera) শুটিং চলাকালীন হঠাৎ ক্যামেরা বন্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর মেলিয়ে ক্যামেরাকে সচল করতে সক্ষম হন এবং আবার শুটিং শুরু করেন। পরে যখন মেলিয়ে ফিল্মটি দেখেন তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখেন একটি ঘোড়ায় টানা গাড়ি পরের শটে একটি শব-বাহী গাড়িতে পরিণত হয়েছে। আসলে ক্যামেরাটি যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন ঘোড়ায় টানা গাড়িটি সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, এরপরই ক্যামেরা বন্ধ হয়ে যায়। পরে ক্যামেরা যখন চালু হয় ততক্ষণে ওই গড়িটি চলে গেছে আর ক্যামেরার সামনে এসে গেছে শব-বাহী গাড়িটি। এই অসঙ্গতির ফলে মেলিয়ে-এর চোখের সামনে খুলে যায় নতুন সম্ভাবনার পথ। নতুন লব্ধ এই অভিজ্ঞতাকে মেলিয়ে ব্যবহার করেন দ্য ভ্যানিসিং লেডি (The Vanishing Lady) ছবিটিতে। এখানে দেখা যায় হঠাৎ এক মহিলা মঞ্চ থেকে উধাও হয়ে গেলেন। মেলিয়ে করেছিলেন কি একটি শট নিয়েছিলেন খালি মঞ্চের আরেকটি নিয়েছিলেন মহিলাকে মঞ্চে রেখে। এরপর মহিলা মঞ্চের উপর এবং খালি মঞ্চের শট দুটি পর পর যুক্ত করে দেন আর পর্দায় দেখা যায় যাদুর খেলা। দ্য হন্টেড ক্যাসেল (The haunted castle, 1896) ছবিতেও এই কৌশল ব্যবহার করেছিলেন।

এই ছবির সাথে জন্ম হয় এক নতুন জ্যঁর-এর (Jenre), 'ট্রিক ফিল্মস্' (Trick Films)। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সিনেমার সেই শিল্পকলায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন যাকে পরবর্তীকালে স্পেশাল এফেক্টস্ (Special Effects) নামে অভিহিত করা হয়। ফেড (Fade), ডিস্‌ল্‌ভ্ (dissolve), সুপারইম্পোজিস্‌ন্ (Superimpositions), ইত্যাদি। বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে মেলিয়ে তাঁর ছবিতে সৃষ্টি করেছিলেন এক অলৌকিক জগৎ।

বিভিন্ন কৌশলের আবিষ্কারকর্তা, নতুন জ্যঁর-এর স্রষ্টা মেলিয়ে-এর আর একটি অনবদ্য অবদান — সম্পূর্ণ এক রিলের গল্পনির্ভর ছবি প্রথম তৈরি করেছিলেন। আধ মিনিট থেকে ছবির দৈর্ঘ্য মেলিয়ে-এর ছবিতে বেড়ে ১০ থেকে ১৫ মিনিট হয়ে যায়।

১৮৯৭ সালে মেলিয়ে ফ্রান্সের প্রথম স্টুডিও নির্মাণ করেন। শুরু করেন স্টার ফিল্ম কোং (Star Film Co.)। এটি ছিল ফ্রান্সের প্রথম ফিল্ম কোম্পানি যারা শুধুমাত্র চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজই করত।

১৮৯৬ থেকে ১৯১২ সাল অব্দি মেলিয়ে ৬০০টির ওপর ছবি তৈরি করেছিলেন। শুধুমাত্র পরিচলনা নয়, গল্প লেখা, ছবির জন্য সেট তৈরি করা, অভিনয় করা সবই তিনি করতেন। যাদুকর হওয়ার দরুণ সিনেমার বিভিন্ন কলাকৌশল প্রয়োগ করে, যাদুর বিভিন্ন ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া কর্মের মধ্যে দিয়ে ছবিতে সবসময় এক মায়ার জগৎ সৃষ্টি

করার চেষ্টা করতেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি তাই তৈরি করেছিলেন রূপকথার ওপর ভিত্তি করে বহু ছবি। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল সিন্‌ড্রেলা (Cindrella, 1899)। রূপকথার পাশাপাশি তাঁর কল্পনাকে রূপ দিতে তিনি তৈরি করেছিলেন কল্পবিজ্ঞান-নির্ভর ছবি। এর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল ১৯০২ সালে নির্মিত 'এ ট্রিপ টু দ্য মুন' (A Trip to the Moon)। এ ছাড়াও আছে অ্যান ইম্‌পসিব্‌ল্ ভয়েজ (An Impossible Voyage) ১৯০৪ সালে, দ্য কঙ্কোয়েস্ট অফ্ দ্য পোল, ১৯৯২ সালে (The conquest of the Pole) ইত্যাদি।

কাল্পনিক জায়গার প্রেক্ষাপটে অসাধারণ সব গল্প লিখেছিলেন মেলিয়ে। সেই গল্পের উপর নির্ভর করে তৈরি করতেন তাঁর ছবি। আর সেই গল্পগুলিকে রূপ দিতে মেলিয়ে নিজেই তৈরি করতেন বিপুলাকারের সেট, প্রায়জনীয় দৃশ্যাবলী। আর সেই জন্যই তাঁকে বলা হয় মিসে-এন্-সিনের (mise-en-scene) জনক। এই ছবিগুলিতে একেকটি শটের ট্যাবলো (tableaux) তৈরি করতেন আর সেগুলো যুক্ত করতেন ওয়াইপ (wipe), ডিস্‌ল্‌ভ্ (dissolve), ফেড (fade) ইত্যাদি দিয়ে।

১.৬.১ এ ট্রিপ টু দ্য মুন

মেলিয়ে নির্মিত সর্বাধিক বন্দিত ছবি 'এ ট্রিপ টু দ্য মুন' নিয়ে এবার আলোচনা করব। গল্পটি মূলত এইরকম — একদল বৈজ্ঞানিক পৃথিবী থেকে রকেট নিয়ে চাঁদে যাত্রা করেছেন। জুলে ভা -এর (Jules Verne) একটি গল্পের থেকে নিয়ে মেলিয়ে ছবিটি তৈরী করেন। মোট ৩০টি সিনের ছবি। ছবিতে অভিনয় করেছিলেন পেশাদার অভিনেতারা, স্বয়ং মেলিয়ে ছিলেন প্রধান বৈজ্ঞানিকের ভূমিকায়। মেলিয়ে-এর নিজস্ব স্টুডিওতে মঞ্চ তৈরি করে তার উপর অভিনীত হয়েছিল সিনগুলি। প্রত্যেকটি সিন ছিল একটি শটের। ক্যামেরা বসানো হয়েছিল এমন জায়গায় যেখান থেকে সম্পূর্ণ মঞ্চ ও প্রতিটি কর্মকান্ড স্পষ্টভাবে দেখা যেত। অভিনেতারা মুকাভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁদের অভিব্যক্তি। তবে তাঁদের অভিনয়ে নাটকের প্রভাব খুবই স্পষ্ট ছিল। মঞ্চে অভিনয়ের মতই তাঁরা মঞ্চের এধার থেকে ওধারে স্থান বদলেছেন, মঞ্চের দু'ধার দিয়ে প্রবেশ ও প্রস্থান করেছেন। সিনেমায় ক্যামেরার সামনে যে এই প্রবেশ প্রস্থানের প্রয়োজন থাকে না সে সম্পর্কে মেলিয়ে অভিহিত ছিলেন না। মঞ্চাভিনয়ের মত এখানেও অভিনেতারা দর্শকের (এখানে ক্যামেরা) উদ্দেশ্যে মাথা হেলিয়েছেন, অভিবাদন করেছেন। তাঁদের সাজ সজ্জাতেও নাটকের প্রভাব লক্ষণীয় ছিল। মিসে-এন্-সিনও (mise-en-scene) নাটকের মঞ্চসজ্জার অনুরূপ ছিল। নাটকের মতো পেছনের দৃশ্যাবলী ওঠানো নামানো হয়েছিল, আর সমস্ত দৃশ্যাবলীই হাতে আঁকা ছিল। নাট্য মঞ্চের মতই তৈরি করেছিলেন লুকনো দরজা।

মেলিয়ে থিয়েটারের পাশাপাশি নিজের আবিষ্কৃত সিনেমার কৌশলও ব্যবহার করেছিলেন। যেমন, সিন্ বদলের সময় পর্দা ওঠানো নামানোর বদলে ডিস্‌ল্‌ভ ব্যবহার করে সিনগুলি যুক্ত করেছিলেন। একটি বিশেষ সিনে যেখানে রকেট চাঁদের কাছে পৌঁছেছে, দৃশ্যটি দেখে মনে হয় dolly shot। এখানে ক্যামেরা চাঁদের কাছে যাওয়ার বদলে ক্যামেরাকে স্থবির রেখে চাঁদকে ক্যামেরার কাছে নিয়ে গিয়ে দৃশ্যটি গ্রহণ করেছিলেন।

এই পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবিতে মেলিয়ে অসামান্য দক্ষতায় শুধুমাত্র গল্পই বলেননি, সিনেমার কৌশল ব্যবহার করে মিসে-এন্-সিনের (mise-en-scene) অসাধারণ প্রদর্শন করে, পেশাদার অভিনেতাদের মুকাভিনয়ের মধ্য দিয়ে ছবি তৈরির এক অনন্য নিদর্শন স্থাপন করেন। মেলিয়ে-এর নিজের ভাষায় "artifically arranged scenes" আজও দর্শককে মুগ্ধ করে। কিন্তু ছবিতে নাটকের অতি প্রভাবের ফলে এবং ক্যামেরার একই স্থানে থাকার ফলে বহু ক্ষেত্রে নাট্য মঞ্চ বলে ভ্রম হয়।

পরবর্তীকালে মেলিয়ে আরও অনেক ছবি নির্মাণ করলেও 'এ ট্রিপ টু দ্যা মুন' (A trip to the moon) ছবিটিকে অতিক্রম করতে পারেন নি।

তবে ১৯১২ সালের পর মেলিয়ে আর ছবি করেননি। সিনেমা শিল্পে মেলিয়ে-এর অবদান আজও অনস্বীকার্য এবং ওঁর 'ট্রিক ফিল্মস্' (Trick films) পরবর্তীকলের ফ্রান্সের Avant Garde ছবির ভিত্তি স্থাপন করে, যে ধারা ১৯২০ সালে শুরু হয়ে আজও প্রবহমান আছে।

১.৭ সারাংশ

চলচ্চিত্রের আদিপর্বে দেখা যায় বহুরকমের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পর ১৮৯৪ সালে আমেরিকার বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন কর্তৃক আবিষ্কৃত কিনেটোস্কোপ হল প্রথম যন্ত্র যেখানে চলমান জীবনকে ক্যামেরাবন্দী করা সম্ভব হয়। চলচ্চিত্রের প্রযুক্তির মূলে রয়েছে স্থির চিত্র। একটি নির্দিষ্ট গতিতে একাধিক স্থির চিত্র পরপর দেখানো হয় তখন গতির ভ্রান্তি সৃষ্টি হয় মানুষের মস্তিষ্কে, আর এটিই হল চলমান দৃশ্যের মৌলিক নীতি। তবে চলচ্চিত্রকে পূর্ণাঙ্গ রূপ সমেত পৃথিবীর মানুষের কাছে উপস্থিত করেন ১৮৯৫ সালে লুই আগস্ট ল্যুমিয়ের। এই ফরাসী ভাতৃদ্বয় ক্যামেরায় দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী তুলে এনে মানুষকে দেখাতেন। মানুষ চলচ্চিত্রের অভিনবত্বে চমৎকৃত হয়ে তাই দেখতেন, গুণগতমান নিয়ে ভাবতেন না। ল্যুমিয়ের ভাতৃদ্বয়ও চলচ্চিত্রকে নিছকই একটি ক্ষণস্থায়ী বিনোদনের মাধ্যম ভেবেছিলেন।

ল্যুমিয়ের ভাতৃদ্বয়ের পরেই আসে আর এক ফরাসী জর্জ মেলিয়ে-এর কথা। চলচ্চিত্রের সম্ভাবনার কথা মেলিয়েই প্রথম অনুধাবন করেছিলেন। বিভিন্ন কৌশলের আবিষ্কার করে ছিলেন মেলিয়ে। তার প্রয়োগ করে 'ট্রিক ফিল্মস্' নামক জ্যাঁ-এর জন্ম দেন। তিনিই প্রথম এক রীলের একটি সম্পূর্ণ কাহিনীচিত্র নির্মাণ করেন।

১.৮ অনুশীলনী

১. সিনেমা বা চলচ্চিত্রের জন্মকথা আলোচনা করুন।
২. চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ল্যুমিয়ের ভাতৃদ্বয়ের ভূমিকা বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করুন।
৩. জর্জ মেলিয়ের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

1. Flashback — A brief history of Flim — L. Giannetts & scott Eyman
2. A History of film — Jack C. Kalris
3. Film Art : An introduction — D. Bordwell & K. Thompson

একক ২ ❑ হলিউডের আদিযুগ

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ হলিউড স্টুডিও সিস্টেম : নিবার্ক পর্যায়ে

২.৩.১ সবাক হলিউডের স্টুডিও সিস্টেম

২.৪ এডউইন এস: পোর্টার

২.৪.১ পোর্টারের পদ্ধতি

২.৪.২ দ্য লাইফ অফ অ্যান আমেরিকান ফায়ারম্যান

২.৪.৩ দ্য গ্রেট ট্রেন রবারি

২.৪.৪ ক্লেপটোম্যানিয়াক

২.৫ ডেভিড ওয়ার্ক গ্রিফিথ

২.৬ চার্লস চ্যাপলিন

২.৬.১ ম্যাক সেনেট

২.৬.২ কীস্টোন কোম্পানিতে চ্যাপলিন

২.৬.৩ এসেনেতে চ্যাপলিন

২.৬.৪ মিউচুয়ালে চ্যাপলিন

২.৬.৫ ফার্স্ট ন্যাশেন্‌ল্‌স্‌-এ চ্যাপলিন

২.৬.৬ ইউনাইটেড আর্টিস্টস কর্পোরেশন

২.৬.৭ সবাক্‌ চিত্র

২.৭ বাস্টার কিটন

২.৭.১ চলচ্চিত্র পেশার চিত্রলেখ

২.৭.২ কিটনের কমেডি

২.৭.৩ কিটনের চলচ্চিত্র জীবনের পর্যাবসান
২.৮ জন ফোর্ড
২.৯ সারাংশ
২.১০ অনুশীলনী
২.১১ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- হলিউডের বিখ্যাত স্টুডিও সিস্টেম সম্পর্কে
- এডউইন পোর্টারের পদ্ধতি
- ডি. ডবলিউ গ্রিফিথের অবদান
- পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কমেডিয়ান চার্লস চ্যাপলিনের কথা
- কমেডিয়ান বাস্টার কিটনের কথা
- ওয়েস্টার্ন জ্যঁর-এর শ্রেষ্ঠ পরিচালক জন ফোর্ড সম্পর্কে

২.২ প্রস্তাবনা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সমস্ত পৃথিবীতে হলিউড ছবি অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। হলিউড ছবির চাহিদা তখন আকাশচুম্বী। হলিউড কিন্তু সেদিন চাহিদার সাথে পাল্লা দিয়ে জোগান দিয়ে গেছে। কেমন ছিল সেই হলিউডের কার্যপ্রণালী? এর উত্তরে হলিউডের বিখ্যাত স্টুডিও সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এরপর আসে হলিউডের কয়েকজন বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতার কথা যেমন এডউইন পোর্টার (Edwin Porter), ডি. ডবলিউ. গ্রিফিথ (D.W. Griffith), চার্লস চ্যাপলিন (Charles Chaplin), বাস্টার কিটন (Buster Keaton) এবং জন ফোর্ড (John Ford)। বিস্তারিতভাবে এঁদের কাজের বৈশিষ্ট্য, কিছু গুরুত্ব পূর্ণ ছবি, চলচ্চিত্র শিল্পে এঁদের অবদান ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে।

এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় হলিউড চলচ্চিত্র শিল্প কিভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হল।

২.৩ হলিউড স্টুডিও সিস্টেম : নির্বাক পর্যায়ে

১৮৯৬ সালে আমেরিকায় চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়। সে সময় চলচ্চিত্র ভৌডেভিল (Vaudeville)-এর বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ ছিল মাত্র। কিন্তু তখন থেকেই চলচ্চিত্র জনপ্রিয়তার শীর্ষে। এই সময়টাকে বলা হত প্রিমিটিভ পিরিয়ড (Primitive Period)।

১৮৯৬ সাল থেকে ১৯০৭ সাল অব্দি ক্যামেরাম্যান অর্থাৎ চিত্রগ্রাহক পদ্ধতিতে (Cameraman System) চলচ্চিত্র তৈরি করা হত। চিত্রগ্রাহক পদ্ধতি (Cameraman System)-র কার্যপ্রণালী ছিল এরকম: চিত্রগ্রাহকরা নিজেরাই বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতেন। তারপর সেই শুটিং-এর জন্য আবশ্যিক আলো, দৃশ্যাবলী; অভিনেতা বন্দোবস্ত চিত্রগ্রাহকই করতেন। এমনকি কিভাবে শুটিং হবে, ক্যামেরা কোথায় বসানো হবে, শুটিং-এর পর সম্পাদনার কাজ কীভাবে হবে সমস্তই চিত্রগ্রাহক ঠিক করতেন। এই সময়কার কিছু বিখ্যাত চিত্রগ্রাহক-চলচ্চিত্রকাররা হলেন ডবলিউ. কে. এল. ডিক্সন (W.K.L. dickson), অ্যালবার্ট স্মিথ (Albert Smith), বিলি বিৎজার (Billy Bitzer) এবং এডউইন এস. পোর্টার (Edwin S. Porter)। এই সময় এমনও দেখা গেছে কিছু চিত্রগ্রাহক নিজেরাই কোম্পানির মালিক ছিলেন।

তখনকার চিত্রগ্রাহকরা ছিলেন কারিগরদের মত। সমস্ত কর্মকাণ্ডের প্রতিটি পর্ব সম্পর্কে তাঁরা অবগত থাকতেন।

কিন্তু ১৯০৬ সাল থেকে যখন নিকেলোডিওন (Nickelodeon)-এ ছবির চাহিদা ক্রমশ বাড়তে লাগল এই পদ্ধতিতে অসুবিধা দেখা দিল। কারণ চিত্রগ্রাহকরা ক্রম-বর্ধমান চাহিদা অনুযায়ী জোগান দিতে পারছিলেন না। এছাড়া উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্ত দক্ষ চিত্রগ্রাহকেরও অভাব ছিল।

১৯০৭ সাল থেকে পরিবর্তন আসে পদ্ধতিতে। জোগান বাড়াতে উৎপাদন বাড়াতে হবে, ফলে এক নতুন পদ্ধতির প্রচলন হয়। চিত্রগ্রাহকের সাথে আরও একজনকে নিয়োগ করা হয় যে পরিচালনার কাজ আলাদা ভাবে করবে। আর চিত্রগ্রাহকের কাজ হবে শুধুই ছবি তোলা। পরিচালক (যিনি পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন) শুধু মাত্র অভিনয় নয়, দৃশ্যাবলী, সেট (set), শুটিং-এর স্থান এমনকি শ্যুটিং-উত্তর পর্বের সম্পাদনার কাজও পরিচালিত করতেন। স্টুডিওতে ছবির শুটিং-এর ক্ষেত্রে সামান্যতম পরিবর্তনও পরিচালকের মতানুযায়ী হত। অন্যদিকে প্রযোজক হওয়ার সুবাদে অর্থের দায়িত্বও তাঁর ছিল। ডি. ডবলিউ. গ্রিফিথ (D. W. Griffith) ছিলেন প্রযোজক-পরিচালক। তখন প্রযোজক এবং পরিচালক আলাদা ব্যক্তি হতেন না।

কিছুকাল পর থেকে চলচ্চিত্রের পরিকল্পনা, প্রাথমিক ভাবনা চিন্তা এবং কর্ম সমাপনের মধ্যেও শ্রম বিভাজন দেখা দিল। সেটি এরকম — চিত্রনাট্য (যার ওপর ভিত্তি করে শুটিং হত) আর পরিচালক লিখবেন না, লেখার জন্য আলাদা লোক থাকবে। এই বিভাজনের কারণও সেই চাহিদার তুলনায় জোগান কম। স্টুডিওগুলি এরপর থেকে হয় চিত্রনাট্য লেখার জন্য লোক নিযুক্ত করত অথবা লেখকদের থেকে লেখা নিয়ে তার উপর ভিত্তি করে চিত্রনাট্য তৈরি করত। ১৯১১ সালের মধ্যে এটি প্রচলিত পদ্ধতি হয়ে যায়।

১৯০৭ সাল থেকে কারিগর ক্যামেরাম্যান পদ্ধতির অবসান ঘটে। আর নতুন পদ্ধতিকে বলা হত ডিরেক্টর সিস্টেম (Director System)।

এই পদ্ধতির ফলে একাধারে যেমন ছবির উৎপাদন বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কর্মদক্ষতাও বাড়ে। এই সময় চলচ্চিত্র নির্মাণ স্টুডিও-নির্ভর হয়। তার ফলে সম্পূর্ণ উৎপাদন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা যেত। আর ফলস্বরূপ অর্থ ও সময় বাঁচত।

ডিরেক্টর সিস্টেম (Director System) ১৯০৭-০৯ অব্দি প্রচলিত ছিল। কিন্তু ১৯০৯ সাল থেকে চলচ্চিত্রের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পায় এবং বাধ্য হয়ে নতুন আর এক পদ্ধতির প্রবর্তন ঘটে।

নতুন পদ্ধতির নাম ডিরেক্টর-ইউনিট সিস্টেম (Director-Unit System)।

১৯০৯ সাল অব্দি স্টুডিও থেকে প্রতি সপ্তাহে একটি করে ১-রীলের ছবি পরিবেশকদের কাছে পাঠানো হত। কিন্তু ক্রম-বর্ধমান চাহিদার ফলে স্টুডিও মালিকরা বুঝতে পারলেন বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন আবশ্যক। মুনাফা বাড়াতে প্রতি সপ্তাহে অন্তত চারখানা ১-রীলের ছবি উৎপাদন করতে হবে। কিন্তু একজন পরিচালক-প্রযোজক সপ্তাহে মাত্র একটি ছবিই তৈরি করতে পারে। সমস্যার সমাধানে স্টুডিও মালিকরা একাধিক ডিরেক্টর নিয়োগ করেন। এককে জন পরিচালক এককেটি ছবির দায়িত্বে থাকবেন।

দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ায়, ১৯১১ সালের মধ্যে একাধিক স্টুডিও পাকাপাকিভাবে তৈরি হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোম্পানিগুলি হল সেলিগ (Selig), পাথে ওয়েস্ট কোস্ট (Pathe West Coast), বায়োগ্রাফ (Biograph), কালেম (Kalem), এসেনে ওয়েস্টার্ন (Essanay Western), বাইসন (Bison)।

সিনেমা শিল্পের (industry) সম্প্রসারণের সাথে সাথে বিভিন্ন কোম্পানি একত্রিত হয়ে ১৯০৮ সালের শেষের দিকে তৈরি করেন Motion Picture Patents Company।

১৯১৫ সালে একটি সমীক্ষায় দেখা যায় তখন আমেরিকার ষাট শতাংশ চলচ্চিত্র হলিউডে অবস্থিত স্টুডিওগুলিতে তৈরি হত এবং ১৫,০০০ মানুষ এই শিল্প (industry)-এর সাথে জড়িত ছিল।

এই সময় স্টুডিওগুলিকে 'ফ্যাক্টরি' (factory) বলা হত, কারণ অন্যান্য দ্রব্যের উৎপাদন রীতি বা কার্যপ্রণালীর সাথে স্টুডিওগুলিতে কর্মপদ্ধতির কোন প্রভেদ ছিল না। ১৯১১ সালের জুলাই মাসে মোটোগ্রাফি (Motography)-তে লেখা হয়েছিল : The selig plant is an cnorneous art factory, where film plays are turned out with the same ancount of organized efficiency, division of labour and manipulation of matter as if they were locomotives or sewing machines.

উৎপাদন বৃদ্ধি করলে চলচ্চিত্রগুলির একরূপ হওয়াটা একান্তই আবশ্যক। শুধু গল্প নয় সেট (set) এমনকি আলোও একরকম ব্যবহার হত।

কর্মীদের বেতন বা মজুরিও তখন উৎপাদনের গতি বাড়াতে নির্ধারিত হত কাজের গতি এবং নির্দিষ্ট সময়সীমা (ছবি শেষ করার)অনুযায়ী।

ডিরেক্টর-ইউনিট সিস্টেম (Director-Unit System) ১৯০৯ থেকে ১৯১৪ সাল অব্দি প্রচলিত ছিল। শ্রম-বিভাজনের ফলে কর্মদক্ষতা (কর্মীদের) বাড়তে বাধ্য ছিল। উৎপাদন গতিও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এরপর যে পদ্ধতিগত পরিবর্তন আসে তা হল দ্য সেন্ট্রাল প্রোডিউসার সিস্টেম (The Central Producer System)। উৎপাদন গতির পাশাপাশি এরপর ছবির মানকে উন্নত করাও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এর সাথে সাথে ছবির দৈর্ঘ্যও বৃদ্ধি পায়। ১৮ মিনিট থেকে ছবির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেয়ে ৭৫ মিনিটের হয়ে যায়। এই সব কারণেই আরও বিজ্ঞানসম্মত পরিচালনব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে।

ক্লাসিকাল হলিউড ধারার প্রবর্তন হয় এইসময় থেকে। ছবি আরও কাহিনী-নির্ভর হয়, স্বচ্ছতা আসে, ছবির কনটিন্যুটি (continuity) বজায় রাখা হয় এবং সর্বোপরি বাস্তবের এক ভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়।

এই সময় আমেরিকার চলচ্চিত্র শিল্পে এক আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়।

১। বিখ্যাত নাটক, উপন্যাস, গল্প-এর ওপর ভিত্তি করে ছবি তৈরি হতে থাকে।

২। ছবির দৈর্ঘ্য হয় বড়, যাতে সাহিত্যে কর্মকে যথার্থভাবে চলচ্চিত্রে রূপ দেওয়া যায়।

৩। গ্রন্থসত্ত্ব সংরক্ষণ করা শুরু হয়। স্টুডিওগুলি বিভিন্ন লেখকদের গ্রন্থস্বত্ত্ব নিয়ে নেয় ছবি তৈরির নিমিত্তে। ফলে এতদিন হলিউডে যে অপেশাদার লেখক বা যারা শুধুমাত্র চলচ্চিত্রের নিমিত্তে কাহিনী বা চিত্রনাট্য লিখতেন তাদের থেকে চিত্রনাট্য বা কাহিনী নেওয়ার রীতিতে ছেদ পড়ে যায়।

সেন্ট্রাল-প্রডিউসার সিস্টেম (Central Producer System) অনুযায়ী পরিচালক আর প্রযোজক আর এক ব্যক্তি থাকবেন না। এই দুটি বিভাগের কাজ দু'জন ব্যক্তির ওপর থাকবে। নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালক চিত্রনাট্য, অভিনেতা নির্বাচন, সেট, পোষাক, সম্পাদনা — সব বিষয়ে তাঁর মতামত জানাবেন কিন্তু শেষ কথা বলবেন প্রযোজক।

প্রযোজক একজন পরিচালককে নির্বাচন করবেন যেভাবে চিত্রগ্রাহক, সম্পাদক, লেখক প্রমুখদের নির্বাচন করেন। শুটিং-এর সময় অবশ্য পরিচালকের মতামতই শেষ কথা। সেখানে শীর্ষস্থানে তিনিই আসীন। প্রযোজকের দায়িত্ব ছিল পূর্বনির্ধারিত আয়ব্যয়কের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক চলচ্চিত্র উৎপাদন করা।

আয়ব্যয়কের পূর্বনির্ধারণের ক্ষেত্রে চিত্রনাট্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কনটিন্যুটি বজায় রাখতেও চিত্রনাট্যর ভূমিকা

অপরিসীম ছিল।

সেন্ট্রাল-প্রোডিউসার সিস্টেম-এর প্রবর্তনের পর প্রতিটি ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা বিভাগ তৈরি হয়। যেমন প্রোডাক্শন (Production) বিভাগ : এই বিভাগের কাজ ছিল প্রযোজককে পরিকল্পনায় সাহায্য করা। প্রতিদিনের খরচ নির্ধারণ করা, স্টুডিওর বিভিন্ন ব্যবস্থাদি করা ইত্যাদি। এছাড়া, সুষ্ঠভাবে কম খরচে কার্য সমাধা করার দায়িত্ব এই বিভাগের ওপর ছিল।

প্রোডাক্শন বিভাগ ছাড়াও চিত্রনাট্য, গবেষণা, শিল্প নির্দেশনা, সাজসজ্জা, মেক-আপ, অভিনেতা নির্বাচন, চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, সঙ্গীত সব পৃথক হয়ে যায়। প্রতিটি বিভাগে স্বতন্ত্র পরিচালক থাকতেন।

২.৩.১ সবাক হলিউডের স্টুডিও সিস্টেম

হলিউড সবাক হওয়ার কৃতিত্ব মূলত কতগুলি স্টুডিওর। এরমধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নাম হল ওয়ার্নার ব্রাদার্স। ১৯২০-র দশকের শেষ থেকে ওয়ার্নার ব্রাদার্স ব্যবসার উন্নতিকল্পে এবং নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে ছবিকে সবাক্ করতে অর্থ লগ্নি করতে শুরু করে। প্রথম পর্যায়ে দৃশ্যের সাথে রেকর্ডের (ডিস্কের) সঙ্গীত বা শব্দকে একসাথে দেখানোর (...a system using records in synchronization with film images) চেষ্টা করা হয়। এই পর্যায়ের প্রথম ছবি ডন্ জুয়ান্ (Don Juan) তৈরি করেছিল ওয়ার্নার ব্রাদার্স, ১৯২৭ সালে। ৬ই অগাস্ট মুক্তি পায়। ১৯২৭ সালে তৈরি হয় দ্য জ্যাজ সিঙ্গার (The Jaaz Singer)। রেকর্ডের সঙ্গীতের পাশাপাশি এই ছবিতে ডায়ালগও ব্যবহার হয়। ওয়ার্নার ব্রাদার্সের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য স্টুডিওগুলি সবাক ছবিতে লগ্নি করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। অচিরেই প্রযুক্তির উন্নতি ঘটে। বর্তমান ব্যবস্থা অর্থাৎ ফিল্মে সাউন্ড ট্র্যাক যুক্ত হয়ে সাউন্ড-অন-ফিল্মের প্রচলন শুরু হল। ১৯৩০-এর মধ্যে আমেরিকার প্রায় সব হলেই এই নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়ে যায়।

তবে সবাক ছবির দৃশ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রথম দিকে কলাকুশলীদের খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। ক্যামেরায় তখন এত শব্দ হত যে বাধ্য হয়ে একটি কাঁচের ঘরে (যেখান থেকে শব্দ বাইরে আসবে না) ক্যামেরা বসিয়ে দৃশ্য গ্রহণ করা হত। দ্বিতীয়তঃ মাইক্রোফোনগুলি হত বৃহতাকারের, ফলে সেগুলিকে এক জায়গায় স্থির রাখতে হত। বাধ্য হয়েই অভিনেতাদের নির্দিষ্ট ফ্রেমে আবদ্ধ থেকে অভিনয় করতে হত। তবে স্টুডিওগুলি ক্রমে এই প্রাথমিক অসুবিধাগুলি কাটিয়ে ওঠে। ছবির কাহিনীবিন্যাসে এই শব্দ সংযোজনা এক নতুন মাত্রা যোগ করে। সম্পাদনার ক্ষেত্রেও খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় শব্দ সংযোজনা।

হলিউডের একটি অন্যতম জনপ্রিয় জ্যাঁর.... মিউসিকাল (musical)-এর জন্ম হয় সিনেমা সবাক হওয়ার পর। ওয়ার্নার ব্রাদার্সের নতুন প্রযুক্তিতে লগ্নি করার ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্যই ছিল ভডেভিলের নৃত্য-গীতকে সিনেমায় আনা। ক্রমে তিরিশের দশক থেকে রঙিন ফিল্মের ব্যবহার শুরু হয়। সিনেমায় আসে বৈচিত্র্য।

সিনেমা সবাক হওয়ার পর তার জনপ্রিয়তা স্বাভাবিকভাবে বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। পরিবর্তন আসে পরিচালন ব্যবস্থায়, যথা,

<u>প্রডিউসার-ইউনিট সিস্টেম : ১৯৩১-১৯৫৫</u>

১৯৩১ সাল থেকে আমেরিকার সিনেমা শিল্পের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটে। প্রশাসনিক দায়িত্ব একক কোন প্রডিউসার (সেন্ট্রাল প্রডিউসার সিস্টেম অনুযায়ী)-এর বদলে একাধিক প্রডিউসার সম্বলিত একটি গোষ্ঠী গ্রহণ করে। এই গোষ্ঠী বছরে ৬ থেকে ৮টি করে ছবি প্রযোজনা করত। একেক জন প্রডিউসার একেকটি ছবির দায়িত্বে থাকতেন। পূর্বোক্ত অন্যান্য ব্যবস্থার মত এখানেও কর্মীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়, তবে এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞতা ঘটে প্রশাসনিক স্তরে।

প্রডিউসারের কাজে বিশেষজ্ঞতার উন্মেষ ঘটে সেন্ট্রাল প্রডিউসার সিস্টেমের সময় থেকেই। একজন জেনেরেল ম্যানেজার (general manager) তখন একসাথে ৫০ থেকে ৮০টি ছবির দায়িত্বে থাকতেন। এঁর অধীনে একাধিক

প্রডিউসার বিভাগীয় দায়িত্বে থাকতেন, যেমন, এক্সিকিউটিভ ম্যানেজার (executive manager) (আইন ও অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয় এবং স্টুডিওর রোজকার কার্যাবলীর দেখাশোনা দায়িত্বে), প্রোডাকশন ম্যানেজার (production manager) (প্রাক্-শুটিং ও শুটিং-উত্তর কাজকর্ম দেখাশোনার দায়িত্বে), স্টুডিও ম্যানেজার (studio manager) (বিভিন্ন অন্যান্য বিভাগগুলির দায়িত্বে)। এছাড়া থাকতেন একদল পর্যবেক্ষক বা সুপারভাইসার (superviser)।

১৯২৬ সাল নাগাদ হলগুলিতে দর্শক সমাগম কমে যায়। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে স্টুডিও কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারেন যে নির্মীত এবং নির্মীয়মান ছবিগুলি সবই একঘেয়ে এবং ক্লান্তিকর আর এর মূলে হচ্ছে প্রডিউসারের উপর অত্যধিক চাপ। একজন প্রডিউসারকে বছরে তখন গড়ে ৫০টি করে ছবি তৈরি করতে হত। সমস্যার সমাধানে তখন ঠিক করা হয় একাধিক প্রডিউসার মিলে একটি ছবি তৈরি করবে।

১৯৩১ সালে সিনেমা শিল্পে আবার সংকট দেখা যায়, দর্শক সংখ্যা কমতে থাকে। আর এর সাথে আসে নীতির পরিবর্তন। সংকটের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় সেন্ট্রাল প্রডিউসার পদ্ধতি অনুযায়ী কর্মীদের একাধারে যেমন স্বাধীনতার অভাব অন্যদিকে এই পদ্ধতি ভীষণভাবে নতুন ভাবনা, নিজস্বতা এবং শৈল্পিক বিকাশের পথে অন্তরায়। পূর্বাস্থা ফেরাতে এবং কর্মদক্ষতা বাড়াতে স্টুডিও কর্তৃপক্ষ কর্মীদের সাথে নতুন চুক্তি করেন। সেই চুক্তি অনুযায়ী কর্মীরা কোম্পানির মুনাফার অংশ পাবেন। কর্তৃপক্ষ ভেবেছিলেন নতুন চুক্তি অনুযায়ী চলচ্চিত্রকার স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন। ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে কলোম্বিয়া কোম্পানি প্রথম এই পদ্ধতির প্রচলন করে।

তৎকালীন আমেরিকায় তখন চরম অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা চলছিল। তার থেকে সিনেমা শিল্পও রেহাই পায়নি। খরচ সঙ্কুচিত করতে স্টুডিওগুলি একাধিক নিয়ম করেন। বড় ছবি নির্মাণের খরচ ২ লক্ষ ডলারে সীমাবদ্ধ করে। দ্বিতীয়তঃ তারকা শিল্পীদের নিমিত্ত দরাদরি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এছাড়া কর্মী ছাঁটাইও হয়। শুধুমাত্র অকর্মণ্য কর্মীই নয় নামী দামী কর্মীরাও বাদ পড়ে যান। এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হল ফক্স কোম্পানির জন ফোর্ড। ওঁর বদলে কোম্পানি তিন কর্মী সম্বলিত এক গোষ্ঠীকে সেই কাজ অর্পণ করে। ফলস্বরূপ কোম্পানি আধ শতাংশ কম খরচে তিন গুণ বেশি কাজ পেয়েছিল।

নতুন এই পদ্ধতির ফলে একক প্রডিউসারের আধিপত্যের দিন শেষ হয়ে যায়। একাধিক প্রডিউসার নিয়োগ করা হয় প্রত্যেকটি স্টুডিওতে, যেখানে একেকজন প্রডিউসার একেকটি ছবির দায়িত্বে থাকতেন। সংশ্লিষ্ট ছবির শুরু থেকে শেষ অবধি প্রডিউসারের তত্ত্বাবধানে তৈরি হত। এর ফলে, স্টুডিও কর্তৃপক্ষ মনে করেছিলেন ছবির মান উন্নত হবে এবং প্রডিউসারদের কর্মদক্ষতা বাড়বে।

তিরিশ ও চল্লিশের দশকে কর্মপদ্ধতির হরেক রকম পরিবর্তন ঘটে। শ্রম বিভাজনের দরুণ প্রশাসনিক এবং শিল্প বিভাগ আরও ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হয়। তৈরি হয় নতুন প্রশাসনিক পদ। কর্ম বিশেষজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। তৈরি হয় স্পেশাল এফেক্টস (special effects) বিভাগ।

প্যাকেজ-ইউনিট সিস্টেম : ১৯৫৫-র পর

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর থেকে হলিউডে নির্মাণ শিল্পে পরিবর্তন আসে। প্রাক ২য় বিশ্বযুদ্ধ হলিউডে ছবি তৈরি করত কতগুলি স্টুডিও। প্রত্যেকটি স্টুডিও একেকবারে একাধিক ছবি নির্মাণ করত। হলিউডের বাইরে একক প্রযোজকের ভূমিকা খুবই নগন্য ছিল। মূলত হলিউডের স্টুডিওগুলিতেই অধিকাংশ ছবি তৈরি হত। কিন্তু যুদ্ধের পরে এই ব্যবস্থার বদলে প্রচলন হয় প্যাকেজ-ইউনিট সিস্টেমের। এই পদ্ধতি অনুযায়ী একটি কোম্পানি আর একাধিক ছবি তৈরি করত না, কর্মীরাও আর একটি বিশেষ স্টুডিও বা কোম্পানির বেতনভুক রইল না। নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী একেকজন প্রযোজক যখন একেকটি ছবির দায়িত্ব নেবেন তারা ছবির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, কর্মী নিজেই জোগাড় করে নেবেন। ইতিপূর্বে অর্থ এবং কর্মীর যোগান দিত স্টুডিওগুলি। প্রডিউসার-ইউনিট সিস্টেম অনুযায়ী একেকজন প্রযোজক বছরে যখন ৬ থেকে ৮টি করে ছবি তৈরি করতেন তখন সেই স্টুডিওর অন্তর্ভুক্ত কর্মীদের নিয়েই তাঁকে কাজ করতে হত।

কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থায় একজন প্রযোজকের সেই বাধ্যবাধকতা আর রইল না। পূর্ববর্তী ছবির কর্মীদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে মাপকাঠি হল তাদের কর্মদক্ষতা, নৈপুণ্য, কর্ম পদ্ধতি, পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি। বর্তমানে কোন ছবি করতে হলে প্রযোজক স্টুডিও থেকে তার প্রয়োজনীয় উপাদান যেমন ফিল্ম, ক্যামেরা, আলো, পোষাক-আষাক, সাজ সজ্জা, সেট, ইত্যাদি আর পাবেন না। প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় বস্তু একজন প্রযোজককে ভাড়া করতে হবে। এই বস্তুগুলির যোগান দিতে একাধিক সংস্থা গড়ে উঠেছিল। কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও মধ্য ও নিম্নমানের কর্মীদের রক্ষার্থে তৈরি হয়েছিল শ্রমিক ইউনিয়ন। তবে পূর্ববতি ব্যবস্থার শ্রম বিভাজন অবশ্য প্যাকেজ-ইউনিট সিস্টেমেও বর্তমান ছিল। এই নতুন পদ্ধতির প্রবর্তনের সাথে সাথে হলিউডের অনুনকরণীয় স্টুডিও সিস্টেমের অবসান ঘটে।

এই স্টুডিওগুলি হত প্রায় ছোটখাট এক শহর। লাস্কি স্টুডিও (Lasky Studio) সম্পর্ক ১৯১৮ সাল ফোটোপ্লে (Photoplay)-তে লিখেছিল 'a veritable city within a city'।

হলিউডের এই বিখ্যাত স্টুডিও সিস্টেমে ১৯১৩ সাল অব্দি চলচিত্র নির্মিত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে প্রথমত: ছবির মান উন্নত হয় এবং মানের সূচক নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয়ত: উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পায় এবং ক্রম বর্ধমানে উৎপাদনের সাথে নির্মাণের খরচ কমে। তৃতীয়ত: হলিউড সিনেমা সাধারণ কারিগরি শিল্প থেকে একটি বহু কোটি ডলারের শিল্পে উন্নীত হয়।

২.৪ এডউইন এস. পোর্টার

পোর্টার ছিলেন ক্যামেরাম্যান সিস্টেম (Cameraman System)-এর সময়কার চলচ্চিত্র নির্মাতা। এডিসন (Edison) ওঁকে ১৯০০ সালে চিত্রগ্রাহক হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। পোর্টার সম্পূর্ণরূপেই একজন দক্ষ যন্ত্রবিদ্, একজন দক্ষ চিত্রগ্রাহক ছিলেন। মেলিয়ে-এর মত অন্য কোন শিল্পমাধ্যমে পূর্বশিক্ষা ওঁর ছিল না।

১৯০২ সালে পোর্টার তৈরি করেন দ্য লাইফ অফ অ্যান অ্যামেরিকান ফায়ারম্যান (The Life of An American Fireman)। এই ছবিটি আমেরিকার চলচ্চিত্র ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণের সূচক। পোর্টার-এর সম্পাদনা সবাইকে চমৎকৃত করে। ছবিটির বৈশিষ্ট্য ছিল এখানেই যে একই সময়ে কিন্তু ভিন্ন স্থানে ঘটমান দুটি ঘটনাকে তিনি সমান্তরালভাবে দেখিয়েছেন। এই নতুন পদ্ধতি শুধুমাত্র কাহিনী বিন্যাসের ক্ষেত্রেই কার্যকরি হয়নি, সম্পাদনার ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করেছে এবং সর্বোপরি সামগ্রিকভাবে চলচ্চিত্র শিল্পকে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে, চলচ্চিত্র শিল্পকে উন্নীত করেছে।

২.৪.১ পোর্টারের পদ্ধতি

এডিসনের অধীনে চিত্রগ্রাহক থাকাকালীন পোর্টার একটি ছবি করার নিমিত্তে পড়ে থাকা কিছু ফিল্ম (film) দেখতে দেখতে দমকল বাহিনীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ছবি পান। সেই সময় দমকল বাহিনীর ছবি তাদের কাজের বৈচিত্র্যের জন্য দর্শককুলের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় ছিল। অতএব, পোর্টার এই ফিল্মগুলি নিয়ে একটি ছবি বানাবেন স্থির করেন। কিন্তু ছবির কাঠামোর জন্য একটি গল্পের প্রয়োজন ছিল। পোর্টার নিজেই একটি গল্প ভাবেন যেখানে একটি বাড়িতে আগুন লেগেছে আর বাড়ির ভেতর আটকা পড়ে গেছে এক মা ও তার সন্তান। দমকল বাহিনী গিয়ে তাদের উদ্ধার করবে।

এখানে বিপদগ্রস্ত মা ও সন্তানের সাথে সমান্তরালভাবে দমকলবাহিনীকে পোর্টার দেখিয়েছেন। এক রীলের ছবিটির এটাই বৈশিষ্ট্য ছিল। বর্তমানে এটি অতি স্বাভাবিক হলেও তখন অভূতপূর্ব ছিল। তখনকার রীতি ছিল একটি সিনের সম্পূর্ণ ঘটনা দেখিয়ে তারপর পরবর্তী সম্পর্কিত সিনটিকে দেখানো হত। পোর্টারই প্রথম দেখালেন যে একটি সিনকে সম্পূর্ণ একেবারে না দেখিয়ে ঘটনার খানিক অগ্রগতি দেখিয়ে অন্য সম্পর্কিত সিন দেখানো যায়। একই ভাবে দ্বিতীয় সিনের

খানিক অগ্রগতির পর প্রথম সিনে আবার ফিরে যাওয়া যায় যখন সেখানে ঘটনার আরও খানিক অগ্রগতি হয়েছে।

এই ভাবেই পোর্টার সম্পাদনার এক পদ্ধতি প্যারালাল লাইন্‌স্‌ অফ্‌ অ্যাকসন (Parallel lines of action)-কে প্রথম উপস্থাপিত করেন।

২.৪.২ দ্য লাইফ অফ অ্যান অ্যামেরিকান ফায়ারম্যান

ছবিটি ছিল এরকম : এক দমকল কর্মী তার কর্মস্থানে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন যে একটি বাড়িতে আগুন লেগেছে আর বাড়ির ভিতরে এক মহিলাও তার শিশুসন্তান আটকা পড়ে গেছে। এখানে দুটি শটকে সুপারইম্পোজ (Superimpose) করা হয়েছে।

পরের শট ক্লোজ-আপ (Close-up) অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ-জ্ঞাপক যন্ত্র (fire-alarm)-টির। একটি হাত ফ্রেমের ভিতর আসছে এবং যন্ত্রটি বাজাচ্ছে।

পরবর্তী সিনে দমকলকর্মীরা তাদের বিছানার ওপর উঠে চটপট তৈরি হয়ে বেড়িয়ে পড়ল ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে।

এর পরের সিন ঘটনাস্থলে। দমকলকর্মীরা উদ্ধারকার্যের উপযোগী জিনিসপত্র নিয়ে উপস্থিত।

ডিস্‌লভ (dissolve) করে বাড়ির ভিতরের একটি ঘরে চলে যায় যেখানে বিপদগ্রস্ত মহিলা ও তার সন্তান রয়েছে। জানালার কাছে এসে মহিলা চিৎকার করছে, ঘরের ভিতরে ছুটোছুটি করছে কিন্তু এক সময় ধোঁয়ায় জ্ঞান হারায়। এমন সময় কুঠারের আঘাতে দরজা ভেঙে এক দলকল কর্মী (নায়কও বটে) ঢুকে অবলীলায় মহিলাকে কাঁধে ফেলে জানালায় লাগানো লম্বা মই বেয়ে নেমে আসলেন।

আবার ডিস্‌লভ (Dissolve) করে বাড়ির বাইরে বর্হিদৃশ্য — মহিলা কাঁদছে, ওর সন্তান ভিতরে রয়ে গেছে। আবার সেই দমকল কর্মী ভিতরে যায় এবং উদ্ধার করে আনে।

ছবির কাঠামো বা স্ট্রাক্‌চার (Structure) :

পোর্টার প্রথম শটে একটি সমস্যা সৃষ্টি করেছন (স্বপ্নে মা ও সন্তানের আটকে পড়া), যার সমাধান হচ্ছে ছবির শেষে।

ছবিতে ট্যাবলো (tableau) ব্যবহার করেননি।

স্বয়ংসম্পূর্ণ সিনকে যুক্ত না করে, ঘটনা পরম্পরায় শট সংযুক্তকরণের ফলে দর্শকের মনে ভ্রান্তি সৃষ্টি হয় যেন সম্পূর্ণ ঘটনাটি অবিচ্ছিন্ন।

দ্বিতীয়ত : আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, পোর্টারের পূর্বে কোন চলচ্চিত্রকার অভিনীত দৃশ্য এবং বাস্তব চিত্র যুক্ত করে এভাবে ছবি তৈরি করেননি।

এছাড়া, আরেকটি অভূতপূর্ব বৈশিষ্ট্য ছিল পোর্টারের পদ্ধতিতে। পূর্বে গৃহীত বাস্তব চিত্র (stock films) থেকে কাহিনী চিত্র নির্মাণের কথা ইতিপূর্বে কেউ ভাবেননি।

পোর্টারের প্যারালাল এডিটিং পরিচালককে একটি ঘটনাকে বহু অংশে বিভক্ত করার স্বাধীনতা দেয়। এবং একটি ঘটনাকে একটানা না দেখিয়ে তাকে একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাধা হচ্ছে। কিন্তু ঘটনাটিকে কখনই বিছিন্ন মনে হয় না, কারণ ঘটনার উল্লেখযোগ্য মুহূর্তগুলি বেছে নিয়ে যুক্ত করে অবিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবেই উপস্থাপিত করা হয়।

২.৪.৩ দ্য গ্রেট ট্রেন রবারি

পোর্টারের পরবর্তী ছবি দ্য গ্রেট ট্রেন রবারি ওঁর পূর্বোক্ত ছবিটি অপেক্ষাও উন্নত। এটিও ১৯০৩ সালে নির্মীত। এবং এখানে ওঁর নব আবিষ্কৃত সম্পাদনা নীতির আরও উৎকর্ষ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই ছবিটি পোর্টারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবি।

দ্য গ্রেট ট্রেন রবারি-কে পরবর্তীকালের আমেরিকান ছবির এক অপরিণত আদিরূপ (archetype) বলা যেতে পারে। স্থান, কাল ও যুক্তির এক স্বচ্ছ সরল রেখায় ছবিটি এগিয়েছে। ডাকাতদের আগমন, ট্রেন আক্রমণ, পলায়ন এবং পরিশেষে পুলিশের কাছে ধরা পড়ে যাওয়া সবই সরল রেখায় উপস্থাপিত করা হয়েছে, যা দর্শকের কাছে খুবই উপভোগ্য হয়েছে।

ছবিটিতে একসাথে তিনটি জায়গার ঘটনাবলীকে সমান্তরালভাবে দেখানো হয়েছে। সিনগুলি এরকম :-

১ম সিন : একটি রেলে ডাক-তার অফিস। ডাকতারা অফিসে ঢুকে কর্মরত ডাক কর্মীটিকে বাধ্য করে ট্রেন থামানোর নির্দেশ দিতে। তারপর কর্মীটিকে মেরে ধরে বেঁধে রেখে চলে যায়।

২য় সিন : দু'জন ডাকাত জলের ট্যাঙ্কের পিছনে লুকিয়ে বসা। ট্রেন চলতে শুরু করলেই লাফিয়ে ট্রেনে উঠে পড়ল।

৩য় সিন : ট্রেনের ভিতরের দৃশ্য — ডাকাতরা যাত্রীদের লুঠ করছে।

৪র্থ সিন : ট্রেনের চালককে ট্রেন থামাতে বাধ্য করছে।

৫ম সিন : চালক ট্রেন থামিয়ে দিল।

৬ষ্ঠ সিন : যাত্রীরা ট্রেন থেকে নেমে পড়ছে, সারবদ্ধভাবে দাঁড়াচ্ছে, ডাকাতরা তাদের সমস্ত জিনিস কেড়ে নিচ্ছে।

৭ম সিন : ডাকাতরা ট্রেনে উঠে পড়ল, ট্রেন চলতে শুরু করল।

৮ম সিন : ট্রেন কোন স্টেশনে পৌঁছনোর আগে মাঠের মধ্যে থামল আর ডাকাতরা নেমে গ্রামের দিকে পালিয়ে গেল।

৯ম সিন : ডাকাতরা পাহাড় বেয়ে নেমে নদী পেরিয়ে ওপারে অপেক্ষামান ঘোড়ায় চড়ছে।

১০ম সিন : ডাক কর্মীর মেয়ে ছুটে ডাক অফিসে ঢুকে বাবাকে মুক্ত করল। ডাককর্মী দৌড়ে অফিস থেকে বেড়িয়ে গেল।

১১শ সিন : এক বড় হল ঘরে নৃত্যরত কিছু দম্পতি, ডাককর্মী টলতে টলতে ভেতরে ঢুকল। নাচ বন্ধ হয়ে গেল। পুরুষরা বন্দুক নিয়ে বেড়িয়ে গেল।

১২শ সিন : ক্যামেরার সামনে দিয়ে প্রথমে ডাকাতরা, পরে পুলিশ বাহিনী চলে গেল।

১৩শ সিন : ডাকাতরা নিরাপদস্থানে পৌঁচেছে ভেবে লুটের জিনিস নিয়ে বসেছে, এমন সময় পুলিশ বাহিনী এসে তাদের ঘিরে ফেলে সবাইকে মেরে ফেলল।

প্রথম থেকে নবম সিন অব্দি গল্প সরল রেখায় এগিয়েছে। কিন্তু দশম সিনে আবার প্রথম সিনের স্থানে অর্থাৎ ডাকঘরে ফিরে গেছে। নবম এবং দশম সিনে দুটি সমান্তরাল ঘটনা দেখানো হয়েছে।

একাদশ সিনেও দুটি সমান্তরাল ঘটনার ইঙ্গিত আছে। ১০ম সিনে ডাককর্মী অফিসঘর থেকে বেড়িয়ে পড়ল। ১১শ সিনের প্রথমে দেখছি হলঘরে নৃত্যরত দম্পতি, কিছু পরে এসে ঢুকছে সেই ডাককর্মী। অর্থাৎ দম্পতিরা যখন নৃত্যরত তখন ডাককর্মী পথে।

২.৪.৪ ক্লেপটোম্যানিয়াক

১৯০৫ সালে নির্মীত ক্লেপটোম্যানিয়াক ছবিতে পোর্টার প্যারালাল এডিটিং (Parallel editing)-এর সুন্দর ব্যবহার করেছিলেন। শুধুমাত্র যুগপৎ দুটি ঘটনাই দেখাননি, এই পদ্ধতির দ্বারা ছবির বিষয় বস্তুকেও উন্নীত করেছেন। সেখানে পোর্টার দুই মহিলার ভাগ্যের তুলনামূলক বিচার করেছিলেন যাদের একজন দরিদ্র, অনাহারী অন্যজন অর্থবান। দু'জনে দুটি পৃথক ঘটনায় চৌর্যকর্মে ধরা পড়ে।

পোর্টার ওঁর পরবর্তী ছবিগুলিতে এই এডিটিং প্রয়োগ করলেও 'দ্য গ্রেট ট্রেন রবারি' ছবিটিকে অতিক্রম করতে পারেনি।

২.৫ ডেভিড ওয়ার্ক গ্রিফিথ

প্যারালাল এডিটিং (Parallel Editing)-এর দ্বারা ভিন্ন স্থানে কিন্তু যুগপৎ ঘটমান দুটি বা তার বেশি ঘটনাকে একসাথে দেখানোর পদ্ধতি পোর্টার অবিষ্কার করেন। কিন্তু পোর্টার-এর ছবিতে ক্যামেরা একই জায়গায় বসিয়ে দৃশ্যগ্রহণ করা হত।

দ্বিতীয়ত : নাটকীয়তা সৃষ্টি করতে, দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা সঞ্চারিত করতে, অভিনেতাদের অতিব্যক্তি দেখানোর অবশ্যিকতাও পোর্টার কোনদিন অনুভব করেননি।

ডেভিড ওয়ার্ক গ্রিফিথ-ই প্রথম উপলব্ধি করেন ক্যামেরা স্থানানন্তরিত করে শটে বৈচিত্র্য আনা, কাহিনী-বিন্যাস এবং দর্শকের সুখানুভূতি বাড়াতে, একান্তই প্রয়োজন।

গ্রিফিথের পূর্বে শট (shot)-কে ছবির মূল একক (basic unit) হিসেবে কেউ ভাবেন নি। তখন মূল একক ছিল সিন (scene)। কিন্তু গ্রিফিথ প্রথম দেখালেন লক্ষ্যবস্তুর সাথে ক্যামেরার দূরত্ব রকমফের করে বিভিন্নরকম শট পাওয়া সম্ভব, যে গুলিকে যুক্ত করে একটি সিন গঠিত হবে। এর ফলে দর্শক ছবিকে আরও বেশি করে উপভোগ করতে পারবে। দর্শকের ছবির সাথে একাত্মতা বাড়াতেও বাধ্য। এই সময় থেকেই একটি দৃশ্যের বিভিন্ন কোণ থেকে শট নেওয়া শুরু হয়। লং শট (Long shot), মিড শট (Mid shot), ক্লোজ আপ (Close Up) ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের শটের কারিগরিগত ফারাক এবং দর্শক মনকে প্রভাবিত করার ক্ষমতায় যে প্রভেদ তা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রথম দেখিয়েছিলেন গ্রিফিথ।

গ্রিফিথই প্রথম ক্লোজ-আপকে ইনসার্ট (insert) হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

ছোট ছোট একাধিক শট যুক্ত করে ছবির টেম্পো (Tempo) অর্থাৎ ক্ষয় বৃদ্ধি করে দর্শক মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করার উপায় প্রথম আবিষ্কার করেন গ্রিফিথ। পোর্টারও একটি ঘটনাকে একাধিক অংশে বিভক্ত করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তা সম্পূর্ণ বাহ্যিক কারণে, অর্থাৎ ঘটনাটি সম্পূর্ণভাবে একটি শটে দেখানো সম্ভব ছিল না।

অন্যদিকে ছবি যখন ক্রমশ পরিণতির দিকে অগ্রসর হত, গ্রিফিথ উত্তেজনা সৃষ্টি করতে ছবির 'লয়' বা 'টেম্পো' বাড়িয়ে দিতেন। 'টেম্পো' বাড়াতে শটের দৈর্ঘ্য কমাতেন কিন্তু সংখ্যা বাড়িয়ে দিতেন। গ্রিফিতের ছবির শেষ সিকোয়েন্স (sequence) যেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে চেজ্ সিকোয়েন্স (chase sequence) হত অর্থাৎ যেখানে একজন অন্যজনকে তাড়া করছে, সেখানে উত্তেজনার পারদ বৃদ্ধি করতে গ্রিফিথ এই পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। ফলে তখন এই ক্রশ-কাটিং (cross-cutting)-এর পদ্ধতিকে বলা হত "Griffith Last minute rescue."।

গ্রিফিথ শট যুক্ত করতে কাট (cut)-এর পাশাপাশি ফেড্ (Fade) এবং ডিস্লভ (Dissolve) ও ব্যবহার করেছিলেন। পোর্টার যেখানে ফেড্স্ ব্যবহার করেছেন শুধুমাত্র সিনের বাহ্যিক সংযুক্তকরণের জন্য, গ্রিফিথ সেখানে সংযুক্তকরণ ছাড়া স্থান ও কালের পরিবর্তন বোঝাতেও ফেড্স্ ব্যবহার করতেন। গ্রিফিথ ডিস্লভ অপেক্ষা বেশি ফেড্স্ পছন্দ করবেন।

গ্রিফিথ শট যুক্ত করতে আইরিস (iris) ও ব্যবহার করেছেন। আইরিস হল শট যুক্ত করার একটি বিশেষ রীতি যেখানে একটি শট একটি বৃত্তের মধ্যে আবির্ভূত হয়, এবং ক্রমে বৃত্তটি বড় হলে সম্পূর্ণ শটটি দৃষ্টিগোচর হয়। তেমনি সেই বৃত্তের সাথে ছোট হতে হতে একটি শট অদৃশ্য হয়ে যায়।

কোন শটে কোন বিশেষ কিছুকে প্রাধান্য দিতে গ্রিফিথ মাস্কিং-এর ব্যবহার করতেন। যেমন, একটি স্তম্ভের দৈর্ঘ্য বোঝাতে ফ্রেমের দু'ধারে কালো করে মাঝখানে স্তম্ভটি দেখান। অশ্বপৃষ্ঠে সৈন্য — বাহিনীর অগ্রসর দেখাতে ফ্রেমের উপর এবং নীচ কালো করে দিতেন।

গ্রিফিথ কাহিনীর বিন্যাসের প্রয়োজনে ফ্ল্যাশ-ব্যাক (flash back) ব্যবহার করেছিলেন।

● **অভিনয় ও গ্রিফিথ :**

থিয়েটারে অভিনয় জীবনের শুরু হলেও সিনেমা পরিচালনা করতে করতে তিনি বুঝতে পারেন **দুটি মাধ্যমের** অভিনয় রীতি একরকম হতে পারে না। থিয়েটার সংলাপ-নির্ভর, নির্বাক চলচ্চিত্র সংলাপ বর্জিত। ফলে গ্রিফিথ অনুভব করেন মুখের অভিব্যক্তির দ্বারাই অভিনেতাকে মনের ভাব প্রকাশ করতে হবে। কিন্তু সেই অভিনয় হবে সূক্ষ্ম। থিয়েটারের অভিনয়ে অঙ্গভঙ্গির আধিক্য, সিনেমায় বাহুল্য মাত্র। সিনেমায় যেহেতু ক্লোজ-আপ-এর সাহায্যে শেষের সিটের দর্শকও চরিত্রের মুখ সমান বড় দেখতে পাচ্ছে সেখানে সংযত অভিনয়ই আবশ্যিক। এই সংযম গ্রিফ্রিথ অনুভব করেন চরিত্রের হাঁটাচলা, মেক-আপ, সাজ-সজ্জা — সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজন।

● **আলো ও গ্রিফিথ :**

গ্রিফিথের প্রথম দিকের ছবিগুলিতে আলোর ব্যবহার ছিল নাটকের মত। ক্রমে উনি এ বিষয়েও সচেতন হয়ে ওঠেন এবং উজ্জ্বলতর, শক্তিশালী আলোর আবিষ্কারের সাথে সাথে গ্রিফিথ আলোর পরিবর্তন করতে সক্ষম হন।

● **ছবির দৈর্ঘ্য ও গ্রিফিথ :**

গ্রিফিথ যখন চলচ্চিত্র শিল্পে যোগ দেন তখন শুধুমাত্র ১ রীলের ছবি তৈরি হত। সেগুলি বড় জোর ১০-১৫ মিনিটের হত। কিন্তু চলচ্চিত্র নির্মাতার যতই মাধ্যমটির বিভিন্ন সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন, জ্ঞাত হয়েছেন ততই তাঁরা জটিলতর বিষয়-নির্ভর ছবি করতে আগ্রহী হয়েছেন। কিন্তু স্বল্প-দৈর্ঘ্যের এই প্রচলিত রীতির ফলে তাঁরা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হন। ১৯১০ সালে গ্রিফিথ 'হিজ্ ট্রাস্ট' (His Trust) নামে দু'রীলের একটি ছবি তৈরি করেন কিন্তু সেটি স্টুডিও থেকে মুক্তি পায় ১রীলের দু'টি ভাগে। পরবর্তী ২-রীলের ছবি 'এনোক আর্ডেন' (Enoch Arden)-এর পরিণতিও একইরকম হয়। কিন্তু এতে দমে না গিয়ে গ্রিফিথ এবং অন্যান্য চলচিত্রকাররা ২-রীলের ছবির জন্য তাদের দাবিতে অনড় থাকেন। ২-রীলের ছবি গৃহীত হলেও গ্রিফিথ পরবর্তীকালে ছবির দৈর্ঘ্য আরও বড় করতে চান। 'জুডিথ অব বেথুলিয়া' (Judith of Bethula) ছবিটি ৪-রীলের করতে সক্ষম হন। আমেরিকান ছবির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির নিমিত্ত আন্দোলনে গ্রিফিথের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। আন্দোলনের সাফল্য দেখতে পাওয়া যায় ১৯১৫ সালে, যখন গ্রিফিথ তৈরি করেন তিন ঘন্টার মহাকাব্যীয় ছবি 'দ্য বার্থ অফ্ এ নেশন' (The Brith of A Nation)। এই সময় থেকে পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি আমেরিকান চলচ্চিত্র শিল্পে গৃহীত হয়ে যায়।

● **দ্য বার্থ অফ এ নেশন (The Birth of A Nation) :**

১৯১৫ সালে এই মহাকাব্যীয় ছবি আবিভার্বেই চমৎকৃত করে দেন চলচ্চিত্র-প্রেমীদের। চলচ্চিত্র শিল্পে গ্রিফিথের এই ছবি এক অসামান্য অবদান।

এই ছবিতে কল্পিত কাহিনীর সাথে ঐতিহাসিক ঘটনার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। এখানে প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের হত্যা ছবির একটি মুহূর্ত হিসেবে অভিনয়ের মাধ্যমে পুনঃগঠিত হয়েছিল। ছবিটি মূলত: দুটি পরিবারকে কেন্দ্র করে। যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর রাষ্ট্রের পুনঃগঠনের সময়ে উক্ত দুই পরিবারের — ক্যামেরন (Cameron) এবং স্টোনম্যান (Stoneman) – অবস্থা ও প্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্র করে ছবিটি গড়ে উঠেছে। দুটি পরিবারেই স্বামী-স্ত্রী তাদের সন্তান, অধীনস্ত দাস নিয়ে সুখে বসবাস করছিল। দুটি পরিবারের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। যুদ্ধের ফলে দুটি পরিবারই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুক্ত দাসেরা তখন পূর্বতন সাদা চামড়ার মনিবদের ওপর অত্যাচার শুরু করে। মহিলা ও মেয়েদের ওপর হতে লাগল শারীরিক নির্যাতন। ক্যামেরন পরিবারের একটি মেয়ে বাধ্য হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। অবশেষে নব গঠিত 'ক্লু ক্লাক্স্ ক্ল্যান' (Klu Klax Klan)-এর সদস্যরা সাদা চামড়ার মানুষদের রক্ষা করল।

কারিগরিগত উৎকর্ষতা, জটিল আখ্যানের সুবিন্যাস সত্ত্বেও ছবিটিকে এবং গ্রিফিথকে বিপুলভাবে সমালোচিত হতে হয়। কালো মানুষদের, নিগ্রোদের এই ঘৃণ্য-আচরণ দেখানোর ফলে বিতর্কের ঝড় ওঠে ছবিটিকে কেন্দ্র করে। গ্রিফিথ কঠোরভাবে সমালোচিত হন ওঁর মানসিকতার জন্য।

তবে ছবির কারিগরিগত উৎকর্ষতাকে অস্বীকার করা অসম্ভব। ছবিতে চরিত্রের অভিব্যক্তিকে দর্শকের কাছে সুস্পষ্ট করতে ক্লোজ-আপ ব্যবহার করেছেন, পাশাপাশি এই ক্লোজ আপ দর্শকের উত্তেজনা বাড়াতে কার্যকরি হয়েছিল। স্থানের ব্যাপ্তি বোঝাতে লংশট ব্যবহার করেছেন। ইতিপূর্বে শটের বৈচিত্র্যের অভাবে শুধুমাত্র লং-শটই ব্যবহার হত।

গ্রিফিথ এখানে অনেকগুলি চরিত্র নিয়ে কাজ করেছেন যা পোর্টারের ছবিতে অনুপস্থিত ছিল।

এর পরবর্তী ছবি ইনটলারেন্স (Intolerance) আরও জটিল ছবি। ওখানে চারখানা ভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতির কাহিনীকে একত্রে বাঁধবার চেষ্টা করেছেন গ্রিফিথ। কিন্তু ইনটলারেন্স বাণিজ্যিকভাবে একেবারেই সফল হয়নি।

২.৬ চালর্স চ্যাপলিন

আইজেনস্টাইনের ভাষায় 'King of Humour'-এর জন্ম ১৮৮৯ সালের ১৬ই এপ্রিল লন্ডনের এক নিম্নবিত্ত পরিবারে। বাবা, মা দুজনেই ভোড্ভিল (Vandeville) শিল্পী ছিলেন। চরম দুরাবস্থায় এবং দারিদ্রে শৈশব কাটে। বাবা ছিলেন মদ্যপ, মা ছিলেন অশক্ত। চ্যাপলিনের ছেলেবেলাতেই বাবা, মার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। চ্যাপলিনের মা দারিদ্র, অশক্ত স্বাস্থ্য, অত্যধিক পরিশ্রম সব মিলিয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। মা মানসিক হাসপাতালে, বাবা মৃত। চ্যাপলিন তখনও দশ বছর নয়। কিছু কাল অনাথ আশ্রমে, কিছু কাল পথে— এই ভাবে কৈশোরে পা দেন। অর্থাভাব, খাদ্যাভাব, সামাজিক অমর্যাদার যন্ত্রণা চ্যাপলিন বুঝেছিলেন খুব ছেলেবেলাতেই। বাঁচার তাগিদেই বাবা, মার বৃত্তি গ্রহণ করেন। অতি দ্রুত এই কিশোর প্রতিভা ভোডোভিল মঞ্চে অভিনয়ের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন।

১৯১৩ সালে ফ্রেড কার্নো (Fred Kerno)-র ইংলিশ প্যান্টোমাইম ট্রুপ (English Pantomime Troupe)-এর সাথে আমেরিকায় অভিনয় করতে গিয়ে কিস্টোন কোং ম্যাক সেনেটের কাছ থেকে ওঁর কোম্পানিতে কাজ করার প্রস্তাব পান। সিনেমা মাধ্যমটি সম্পর্কে দ্বিধা এবং সন্দেহ নিয়েই ১৯১৩ সালে কিস্টোন কোম্বানীতে যোগ দেন।

২.৬.১ ম্যাক সেনেট

ম্যাক সেনেট ছিলেন আমেরিকান কমেডি সিনেমার জনক। ১৯১২ সালে সেনেট কিস্টোন (keystone) কোং শুরু করেন। সেখানে নিছকই হাস্য কৌতুক নির্ভর নির্বাক কমেডি (comedy) তৈরি হত।

সেনেটের কমেডির বৈশিষ্ট্য হল "মানুষের মেশিনে পরিণত হয়ে যাওয়া (conversion of men into machines)। অর্থাৎ চরিত্রগুলির কোন মনুষ্যোচিত ব্যক্তিত্ব থাকে না। তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে শারীরিক বৈশিষ্ট্য-নির্ভর। যেমন রোগা-মোটা, বেঁটে-লম্বা, ফর্সা-কালো, ইত্যাদি। জড় পদার্থের মতই কোন বাহ্যিক পার্থক্য থাকে না। তাদের চলাফেরাও ছিল যান্ত্রিক বস্তুর মত। স্ক্রিনের এদিক থেকে ওদিক ছোটে, আর ধাক্কা খায় দেওয়ালে, আসবাবপত্রে, কখনও পরস্পরের সাথে। কিন্তু তাদের আঘাত লাগে না। পড়ে গিয়েও তারা উঠে দাঁড়িয়ে একইভাবে চলতে শুরু করে। মুখের ভাবে কোন পরিবর্তন ঘটে না। যতই এদের ধাক্কা লাগুক দর্শক আতঙ্কিত হবেনা, কারণ এতো মানুষ নয়, যন্ত্র। বড় জোর কোথাও একটু বেঁকে যাবে। সেনেট বুঝেছিলেন চরিত্রদের যদি মানুষ মনে হয় তবে তাদের আঘাতের আশঙ্কায় দর্শক তাদের সংঘাত বা পতন উপভোগ করতে পারবে না। তাদের আঘাতপ্রাপ্তির আশঙ্কাতেও যেমন দর্শক ভীত ছিল না, তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দেখলেও কেউ আতঙ্কিত হত না। কারণ দর্শকের কাছে সেই বন্দুকের গুলি মুখে একটি মুষ্ঠাঘাত বা পশ্চাৎদেশে একটি পদাঘাতের সমান।

ম্যাক সেনেটের কমেডিতে চরিত্রতা স্বাভাবিক গতিতে হাঁটত না। অস্বাভাবিক গতিশীল ছিল তাদের চলাফেরা। এটা ছিল সেনেটের একটি কৌশলের ফল। সেনেট দৃশ্যগ্রহণের সময় সেকেণ্ডে ১০-১২ ফ্রেম তুলতেন। কিন্তু প্রদর্শনের সময় সেকেণ্ডে ১৬ ফ্রেমেই প্রদর্শন করতেন। ফলে চরিত্রদের সামান্য হাত নাড়াও অস্বাভাবিক লাগত। আরও বেশি করে মেশিনের মত লাগত।

সেনেটের ছবি কোন বিষয়বস্তু বা গল্প-নির্ভর হত না। ছবিগুলি ছিল শুধুমাত্র কিছু কৌতুকাবহ ঘটনার সমাহার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই ঘটনার সমাপ্তির সাথে সাথে ছবি শেষ হত।

সেনেটের কমেডির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল প্রায় সব ছবির শেষেই একটি 'চেজ' (chase) সিন থাকত। এবং সেখানে কে না থাকত! সাঁতারের পোষাকে মহিলা থেকে শুরু করে পুলিশ, কমেডিয়ান (comedian), কুকুর, বেড়াল, বাচ্চা, গাড়ি, ট্রেন, নিরীহ পথচারী...। একেক সময় মনে হত একটা শহর ছুটছে, কখনও বা মনে হত যেন একটা গোটা সভ্যতাই ছুটে চলেছে।

২.৬.২ কিস্টোন (Keystone) কোম্পানিতে চ্যাপলিন

এক বছরের কিছু বেশি সময়ে (১৯১৩-১৫) কিস্টোন কোম্পানিতে চ্যাপলিন বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের মোট ৩৫টি কাজ করেন। ছবিগুলির দৈর্ঘ্য ১/২ থেকে ৬ রীলের মধ্যে ছিল। এর মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ ছবি চ্যাপলিন পরিচালনা করেন।

চ্যাপলিন যখন সিনেমা শিল্পে যোগ দেন তখন ছবি তৈরির প্রণালী সম্পর্কে অবিদিত ছিলেন না। চ্যাপলিন এডিটিং (Editing) সম্পর্কে এতই অজ্ঞ ছিলেন যে, অসম্পর্কিত কতগুলি সিন থেকে কীভাবে ছবি তৈরি হবে বুঝতে পারতেন না। কার্যপ্রণালী শিখতে এডিসন থেকে শুরু করে গ্রিফিথ সবার কাছে শিক্ষানবীশ থেকে ছবি তৈরির কৌশল শেখেন। এরপর এক বছরের কম সময়ে পরিচালনা শুরু করেন।

কিস্টোন কোম্পানিতে চ্যাপলীন অভিনীত প্রথম ছবি ছিল মেকিং এ লিভিং (Making A Living)। এখানে ওঁর কোন বিশেষ ভূমিকা ছিল না। একেবারেই সেনেটের চিরাচরিত কৌতুকাভিনয় — যন্ত্রের মত হাঁটা চলা, পড়ে যাওয়া, ধাক্কা লাগা ইত্যাদি। চ্যাপলিনের উপস্থিতি কখনই বিশেষরূপে অর্থবহ হয়নি।

চ্যাপলিনের অনন্যতা প্রথম অনুভূত হয় কিস্টোনে ওঁর সপ্তম ছবিতে। ছবিটি ছিল ফেভারিট পাস্টাইম (His Favourite Pastime)। এখানে চ্যাপলিন একজন মদ্যপ। ওঁর সবচেয়ে প্রিয় অবসর বিনোদন হল মদ্যপান করা। পান করার অভিপ্রায়ে মদ্যপানের নিমিত্ত যে দোকান সেখানে ঢুকতে গিয়ে দোকানের স্যুইং ডোর (Swing Door)-এ বাধা পান। স্যুইং ডোর হল একটি কাঠের দরজা যার কপাট দু'ধারেই খোলা আর আপনা আপনি বন্ধ হয়, দরজাটা যেন ওঁর প্রতিপক্ষ। চ্যাপলিন দরজা ঠেলে, দরজা ফিরে এসে মুখে আঘাত করে। চ্যাপলিন পদাঘাত করে দরজা পেছনে ধাক্কা দেয়। এইরকম বারে বারে বাধা পেয়ে পরিশ্রান্ত চ্যাপলিন শেষে প্রতিপক্ষ (অর্থাৎ দরজা)-কে এড়িয়ে তার তলা দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকে। চ্যাপলিনের অভিনয় গুণে কাঠের দরজাটিকে জীবন্ত মনে হয়। অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে উনি জড়বস্তুর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতেন, জড়বস্তুতেও প্রাণ সঞ্চারিত করতেন। পরবর্তীকালে বহুবার এই অভিনয় দৃষ্ট হয়েছে।

জড় বস্তু নিয়ে চ্যাপলিনের এই অভিনয় আরও ভালোভাবে দেখা গেছে ডৌ অ্যাণ্ড ডিনামাইট (Dough and Dynamite) ছবিতে। একটি রুটি তৈরির কারখানাতে চার্লি এবং চেস্টার কনক্লিন (Chester Konklin)-এর মধ্যে মারপিটে রুটি, মাখা ময়দার তাল, ময়দার বস্তা ছোঁড়াছুঁড়ি হচ্ছে। এই ময়দার তালকে চ্যাপলিন বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেছেন। কখনও বক্সিং-এর গ্লাভস্, কখনও হাতের চুড়ি, কখনও আঘাত করার অস্ত্র বিশেষ। এমনকি একটি অল্পবয়সী মেয়ের সাথে প্রেমালাপের সময় হাত দুটি নিয়ে কী করবেন ভেবে না পেয়ে ময়দার তাল হাতে নিয়ে ময়দা মেখে নেন।

- **চ্যাপলিন পরিচালিত প্রথম ছবি :**

কিস্টোনেই চ্যাপলিনের পরিচালনায় হাতেখড়ি। ওঁর পরিচালিত প্রথম ছবি ছিল কট ইন দ্য রেন (Cought in The

Rain)। প্রথম ছবিতেই সেনেটের সাথে ওঁর পার্থক্য অনুভূত হয়। অনাহারক্লিষ্ট শৈশবের সেই দুর্দিনগুলিকে কোনদিন চ্যাপলিন ভুঁলতে পারেন নি। উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের বৈষম্য চ্যাপলিনকে সারা জীবন তাড়িত করেছে। বারে বারে ওঁর ছবিতে মোটিফ হিসেবে এই ভাবনা এসেছে। 'কট ইন দ্য রেন' ছবিতেই আমরা দেখতে পাই একটি হোটেলের ঘরে ম্যাক স্বেন (Mack Swain) এবং ওঁর স্ত্রীর মধ্যে তুমুল বাগ্‌বিতন্ডা চলছে। কিন্তু যে মুহূর্তে হোটেলের এক কর্মচারী দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকছে ওঁরা হাসি হাসি মুখ করে একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকছে। কর্মচারীটি বেড়িয়ে যাওয়ামাত্র আবার যে কে সেই।

এই ছোট্ট সিকোয়েন্সের মধ্যে দিয়ে উচ্চবিত্তদের সম্পর্কের অন্তসারহীনতা, তাদের ভদ্রতার কৃত্রিমতাকে দেখাতে চেয়েছেন।

• ট্র্যাম্প (Tramp)-এর সূত্রপাত :

চ্যাপলিনের বিখ্যাত ট্র্যাম্প (Tramp) বা ভবঘুরে চরিত্রটির সূত্রপাত ঘটে কিস্টোন-এ। এখানেই চ্যাপলিন ট্র্যাম্প-এর পোষাক ক্রমে একাধিক ছবির মধ্যে দিয়ে গড়ে তোলেন।

চ্যাপলিন কিন্তু প্রথম থেকেই ট্র্যাম্পের এই পোষাক পরতেন না। প্রথম ছবি 'মেকিং এ লিভিং'-এ চ্যাপলিন সুসজ্জিত ছিলেন। এছাড়া সমাজের উচ্চবিত্তদের মতো এক চোখে থাকত চশমা এবং ওয়াল্‌রস্ (Walrus) গোঁফ। দ্বিতীয় ছবি 'কিড অটো রেসস্ অ্যাট ভেনিস' (Kid Anto Races At Venice)-এ চ্যাপলিনকে প্রথম সুপরিচিত ট্র্যাম্পের পোষাকে দেখা যায়। মজার ব্যাপার হল এই পোষাকের কোনটাই চ্যাপলিনের নিজের ছিল না। প্যান্ট ধার করেছিলেন ফ্যাটি আর্‌বাকল (Fatty Arbucle)-এর থেকে। বিশাল এক জোড়া জুতো নিয়েছিলেন ফোর্ট স্টার্লিং (Ford Sterling)-এর থেকে। তাও আবার উল্টো করে পরেছিলেন অর্থাৎ বাঁ পায়েরটা ডান পায়ে আর ডান পায়েরটা বাঁ পায়ে। এছাড়া জামার ওপর পরণের জ্যাকেটটি ধরে নেন মিন্টা ডার্ফি (Minta Drufee)-র বাবার থেকে — যেটি চ্যাপলিনের গায়ে খাটো ছিল। এমনকি গোঁফটিও ছিল ম্যাক স্বেনের আদলে (toothbrush moustache)। হাতের ছড়িটি সম্ভবত: ম্যাক্স লিন্ডার (Maxlinder)-এর থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে। আর মাথার টুপিটা ছিল মাথার অনুপাতে ছোট যাতে সেটা বারে বারে পড়ে যায়। এই পোষাকের প্রত্যেকটি পরস্পর সামঞ্জস্যহীন ছিল কিন্তু সব কটি একত্রিত হয়ে এক অনন্য একক সৃষ্টি হয়।

তবে চ্যাপলিন কিস্টোন-এ পরবর্তী সব ছবিতে এই পোষাক পরেননি। এমনকি টিলিস্ পাঙ্কচারড রোমান্স (Tillies Punchored Romance) ছবিতে চ্যাপলিন যথেষ্ট পরিপাটি ছিলেন।

ট্র্যাম্পের চরিত্রটি অবশ্য কিস্টোনে গড়ে ওঠেনি। এখানে ট্র্যাম্প ছিল রুক্ষ, লড়াকু, অশান্তিপ্রিয়, কলহপ্রিয়, কখনও নিষ্ঠুরও। আমাদের অতিপরিচিত ভালমানুষ পরোপকারী, স্বার্থত্যাগী ট্র্যাম্পের সাথে কোনভাবেই মেলে না।

• চ্যাপলিন ও সেনেট :

চ্যাপলিনের সাথে সেনেটের অচিরেই মতবিরোধ হয়। চ্যাপলিন সেনেটের এই গল্পহীন, কল্পহীন কৌতুকের সমাহার মানতে রাজী হন না। চ্যাপলিন চেয়েছিলেন সব চরিত্রই একরকম না হয়ে, একেকজনের কিছু বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিস্বতন্ত্রতা থাকা আবশ্যক। কিন্তু সেনেট এ প্রস্তাব খরিজ করে দেন। দ্বিতীয়ত: সেনেটের মতো ছবিতে কৌতুকই শেষ কথা কিন্তু চ্যাপলিনের মতে কৌতুক একটি মাধ্যম মাত্র, যার দ্বারা অনেক কথা বলা যায়।

এমনকি ট্র্যাম্প-এর আলাদা পোষাকও সেনেটের আপত্তি ছিল। কারণ এই পোষাকে চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক ছিল।

মতবিরোধের জেরে ১৯১৫ সালে চ্যাপলিন কিস্টোন ত্যাগ করে এসেনে (Essanay)-তে যোগ দেন।

২.৬.৩ এসেনে (Essanay)-তে চ্যাপলিন

এখানে চার্লি কাজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছিলেন। একবছরে (১৯১৫-১৯১৬) এখানে ১৪টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। সেনেটের অর্থহীন কৌতুক-নির্ভর ছবি থেকে সরে গিয়ে চার্লির ছবির প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে ওঠে আশ্রয়, খাদ্য, ভালবাসা। শৈশবে চার্লির আশ্রয়হীনতা, অনাহারে দিনযাপনের সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা ওঁর ছবিকে সমৃদ্ধ করেছিল। এই সমৃদ্ধতার উন্মেষ ঘটে এসেনে থেকে। এখান থেকেই ওঁর ক্রম-উন্নয়ন এবং পূর্ণতাপ্রাপ্তির শুরু।

কৌতুকের আড়ালে চ্যাপলিনের গভীর জীবনবোধ ওঁর ছবিকে আরও বাঙময় করে তোলে।

তবে এই ধারা চ্যাপলিন একদিনে অর্জন করতে পারেননি। এসেনেতে চ্যাপলিনের প্রথম পাঁচটি ছবি — হিজ নিউ জব (His new job), এ নাইট আউট (A night out), দ্য চ্যাম্পিয়ন (The Champion), ইন দ্য পার্ক (In the park), জিটনী ইলোপমেন্ট (Jitney Elopment) — সেনেটের ধাঁচেই তৈরি করেছিলেন। কিন্তু ওঁর ষষ্ঠ ছবি দ্য ট্র্যাম্প (The Tramp) এক অনন্যসাধারণ ছবি। এখানেই প্রথম চ্যাপলিনের ট্র্যাম্পকে দেখা যায়। এখানে ট্র্যাম্পের সেই মানবিক গুণগুলির প্রকাশ ঘটে যার জন্য ট্র্যাম্প আজও সর্বপ্রিয় একটি চরিত্র।

● দ্য ট্র্যাম্প (The Tramp) :

কিস্টোনের কঠিন, রাগী ট্র্যাম্প এখানে এক নতুন মাত্রা পায় — সে ভাবপ্রবণ, সহানুভূতিশীল, প্রেমিক। সে প্রকৃতিকে, নারীকে (এখানে Edna Purviance) ভালবাসে। এখানে নারী প্রকৃতি, পবিত্রতা, ভালবাসার প্রতীক। এখানে ট্র্যাম্পের মানবিক গুণগুলির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়! ট্র্যাম্প এখানে নির্ভীক, কঠিন কিন্তু দয়াশীলও। সে অনুভূতিপ্রবণ কিন্তু দৃঢ়চেতা। সে আন্তরিক, ভাবাবেগপূর্ণ এক মানুষ। সে স্বার্থত্যাগ (যে সাহায্য চায় তার জন্য) করতে পিছপা হয় না, কিন্তু শত্রুর সাথে সে কঠোর। যারা ওকে শাস্তি প্রদান করে তারা সমাজের চোখে (অর্থাৎ তাদের নিজেদের চোখে) উচ্চ শ্রেণীতে অবস্থিত। তারা হীন, অমানুষ, সহানুভূতিহীন, অসৎ এবং অশিষ্ট। ট্র্যাম্পের স্বার্থত্যাগ মানুষত্বের প্রতীক, ভালবাসার জন্য। কিন্তু ট্র্যাম্প জাগতিক পুরস্কার বা প্রতিদান পায় না। ট্র্যাম্প স্বপ্ন দেখে, স্বপ্নে সে পুরস্কৃত হয়। কিন্তু সে হাল ছাড়ে না, ভেঙে পড়ে না, সে দৃঢ়চেতা।

'দ্য ট্র্যাম্প' (The Tramp) ছবিতে চার্লি দ্য ট্র্যাম্প (Charlie the Tramp)-এর পূর্ণবিকাশ ঘটে।

এখানে অন্যান্য ভবঘুরেদের সথে সে একত্রে এডনা পার্ভিয়েন্স (Edna Purviance)-কে ডাকাতি করলেও এডনার কান্না দেখে সমস্ত টাকা ফেরত দিয়ে দেয়। এটা চার্লির সংবেদনশীল পরিচয়। কিন্তু ট্র্যাম্প একজন মানুষ। এডনাকে টাকা ফেরত দেওয়ার পর সেখান থেকে এডনার অজান্তে কিছু নিজের জন্য সরিয়ে নেয়। এই বৈপরীত্যের জন্য ট্র্যাম্প চরিত্রটি অসাধারণ।

ছবিতে ট্র্যাম্পের স্বার্থত্যাগের আরেকটি পরিচয় পাই যখন এডনার বাবার সাথে মিলিত হয়ে ডাকাতদের প্রতিরোধ করে, বাড়ি রক্ষা করে। এই সময় ডাকাতদের ছোঁড়া গুলিতে সে আহতও হয়।

স্বার্থত্যাগের শ্রেষ্ঠ নমুনা দেখি ছবির শেষে। আহত চার্লিকে এডনা শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলে। আর চার্লি ওর প্রেমে পড়ে যায়। কিন্তু এই সময় শহর থেকে আগত এডনার সুপুরুষ, অর্থবান বাগ্‌দত্ত স্বামীকে দেখে চার্লি বুঝতে পারে এডনার জীবনে ওর কোন স্থান নেই। শেষ দৃশ্যে চার্লি আবার রাস্তায়।

ছবির প্রথম দৃশ্যেও চার্লি দ্য ট্র্যাম্প গ্রামের মেঠো পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। এমন সময় বিত্তশালী কেউ গাড়িতে করে যাবার সময় চার্লিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে চলে যায়। চার্লি নিরুদ্বেগে, ভাবলেশহীন মুখে উঠে দাঁড়িয়ে ধুলো ছেড়ে হাঁটতে শুরু করে। চার্লি সমাজের নিম্নবিত্তের প্রতিভূ। সে জানে উচ্চবিত্ত তাদের অবজ্ঞা করে। তাই এই ধাক্কা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

আর ছবির শেষে চার্লি যখন রাস্তায় তখন সে একজন পরিপূর্ণ মানুষ।

'দ্যা ট্র্যাম্প' ছবির কাঠামোটি বৃত্তাকার। ছবি যেখান থেকে শুরু সেখানে এসেই শেষ হয় — অর্থাৎ চার্লির রাস্তায় প্রত্যাবর্তন। দ্বিতীয়তঃ সব অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে — স্বার্থত্যাগ, যন্ত্রণা, বিশ্বস্ততা। এবং এই পুনরাবৃত্তির মধ্যে দিয়ে ট্র্যাম্প ক্রমে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে।

এখানে চ্যাপলিন শটের ব্যবহারেও বৈচিত্র্য আনেন, লংশটের ওপর প্রাধান্য থেকে সরে দ্য ট্র্যাম্প ছবিতে দেখা যায় লংশট, মিডশট, ক্লোজআপ-এর কার্যকরি ব্যবহার।

● এসেনেতে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ছবি :

এর পরবর্তী ছবি ওয়ার্ক (Work)। এখানে চার্লি এক ধনবান ব্যক্তির ভৃত্য। ছোটখাট চেহারার মানুষ চার্লি ভারি মোট নিয়ে পাহাড়ি রাস্তায় অতি কষ্টে হাঁটে। মনিব বড় সড় চেহারার মানুষ। তার পক্ষে মোট বহন করা সহজ হলেও সে অর্থের অধিকারী ফলে সামাজিক মর্যাদাবান ব্যক্তি, তাই সে গাড়িতে বসা, আর চার্লি অর্থের অভাবে ভারবাহী পশুতে পরিণত হয়েছে, অতএব সে-ই গাড়ি টানছে।

একটি সিকোয়েন্সে অর্থের সাথে সামাজিক মর্যাদার যে আঙ্গিক সম্পর্ক তা খুব সুন্দর তুলে ধরেছেন। মনিবের সাথে এবং ধনী মহিলার গৃহে গেছে। মহিলা ওর মনিবকে সমাদরে আহবান করলেও চার্লির পোষাক আযাকের দিকে অবজ্ঞামূলক দৃষ্টি হেনে দ্রুত ঘরের আলমারি দামী জিনিসপত্রের দিকে দেখে নিল।

দ্য ব্যাঙ্ক (The Bank) ছবিটি আরেকটি উল্লেখযোগ্য ছবি। এখানে চার্লি একজন অদক্ষ চতুর্থ শ্রেণীর ব্যাঙ্ক কর্মচারী। এখানে আমরা আবার ট্রাম্পের চারিত্রিক গুণাবলীর ইঙ্গিত পাই। চার্লি ব্যাঙ্ককে ডাকাতি হওয়া থেকে রক্ষা করে, এডনাকে ডাকাতদের থেকে রক্ষা করে। এডনার প্রেমেও পড়ে কিন্তু এডনা ফিরিয়ে দেয়।

প্রথম সিকোয়েন্সে চার্লির ব্যাঙ্কে পদমর্যাদা বুঝিয়েছেন খুব সুন্দরভাবে। চার্লি সুসজ্জিত পোষাকে ব্যাঙ্কের ভেতরে গম্ভীর মুখে হাঁটছে। স্ট্রংরুম (Strong room : যেখানে টাকা রাখা থাকে)-এর বিশাল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কোটের হাতায় লিখে রাখা নম্বর মিলিয়ে তালা খুলে ভেতরে গেল। হাঁটাচলায়, কাজেকর্মে আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা ফুটে উঠছে। দর্শক চার্লির জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করে। চার্লি গম্ভীর মুখে বেড়িয়ে আসে ঝাড়ু আর বালতি হাতে।

ছবির শেষ দিকে এই ঝাড়ু নিয়ে খুব সুন্দর একটি সিকোয়েন্স আছে। চার্লি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে যেন এডনাকে চুম্বন করছে। এমন সময় ঘুম ভেঙে আবিষ্কার করে এডনার মুখ নয় চুম্বনটা করছিল আসলে ঝাড়ুটাকে, হাতে ধরা এডনার জন্য ফুল।

প্রেমের রূপক হিসেবে ফুল চ্যাপলিনের ছবিতে বারে বারে এসেছে। তবে দ্য ব্যাঙ্ক ছবিতেই প্রথম এর ব্যবহার দেখা যায়। ফুলের আরও একটি গভীরতর অর্থ আছে। বাস্তবে চার্লি প্রেমিকাকে পায়নি কিন্তু প্রেমিকার নিমিত্ত ফুলটুকু অন্তত ওর জন্য আছে।

এর পরের উল্লেখযোগ্য ছবি হল পুলিস (Police)। বিষয়বস্তু হিসেবে চ্যাপলিনের ছবিতে পুলিস এই প্রথম দৃষ্ট হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ছবিতে আবশ্যিক উপাদান হিসেবে 'পুলিশ' ব্যবহৃত হয়েছে। তবে চ্যাপলিন পুলিশের 'রক্ষক' ভাবমূর্তিকে কটাক্ষ করেছেন, বিদ্রুপ করেছেন। পুলিশ নিজের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ কিন্তু ক্ষমতার প্রদর্শন এবং আস্ফালন একমাত্র হতদরিদ্র, নিরীহ ট্র্যাম্প-এর বেলায় দেখা যায়।

'পুলিস' ছবিটিই এসেনে-তে সৃষ্ট চ্যাপলিন-এর শেষ চলচ্চিত্র। এরপর চ্যাপলিন যোগ দেন মিউচুয়াল (Mutual)-এ।

২.৬.৪ মিউচুয়াল (Mutual)-এ চ্যাপলিন

এখানে চ্যাপলিন ছিলেন ১৮ মাস, তৈরি করেছিলেন মোট ১২টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি। ছবি নির্মাণের সমস্ত সুবিধা, চূড়ান্ত স্বাধীনতা এবং প্রচুর অর্থলাভ-এই ছিল মিউচুয়ালে যোগ দেবার কারণ।

ওঁর যে বিশেষ অভিনয় দক্ষতা, যার দ্বারা জড়বস্তুকে জীবন্ত বস্তুতে পরিণত করতেন, তার উৎকর্ষতার শীর্ষে পৌঁছন মিউচুয়াল-এ। এই পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবি এখানে দ্য পন্‌শপ্ (The Pawnshop) এবং ওয়ান এ.এম. (One AM)। দ্য পনশপ-এ বিভিন্ন জড়বস্তু নিয়ে নাড়া চাড়া করেন চার্লি। কিন্তু সবচেয়ে কৌতুকের হয় যখন একটি লোক একটি ঘড়ি বেচতে দোকান আসে। ডাক্তারের রোগী দেখার মত করে চার্লি ঘড়িটিকে পরীক্ষা করে।

ওয়ান এ.এম ছবিতে চার্লি মদ্যপান করে রাতে ফিরেছে। বাড়িতে চার্লি ছাড়া আর সবই জড়বস্তু, যেমন টেবিল, মেঝেতে বাঘছাল, ঘড়ি ইত্যাদি। প্রত্যেকটিই চার্লির ব্যবহারে জীবন্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু একটি মার্ফি (murphy) বিছানার মত করে কেউ চার্লিকে বিরক্ত করে না। চার্লি বহুবার শোবার চেষ্টা করে কিন্তু বিছানাটি প্রত্যেকবারই বাধা দেয়। কখনও বন্ধ হয়ে যায়, কখনও ওর প্রায় মাথার ওপর খুলে পড়ছে। শেষে চার্লি গিয়ে বাথটাবে রাত কাটায়।

দ্য ইমিগ্রান্ট (The immigrant) ছবিটিও খুব উল্লেখযোগ্য ছবি। বিভিন্ন কৌতুকময় ঘটনার পাশাপাশি চ্যাপলিনের নিজস্ব মানবতাবোধের পরিচয় মেলে। উদ্বাস্তুদের নিয়ে নৌকো আমেরিকা পৌঁছনোর পথে Statue of Liberty দেখা যায়। পর্দায় 'Land of Liberty' লেখা কার্ড ফুটে ওঠে। এরপরই হঠাৎ কিছু সরকারী কর্মচারী নৌকোর মানুষদের দড়ি দিয়ে বেঁধে তাদের পরিচয়পত্র দেখতে থাকে। অর্থাৎ স্বাধীনতার পীঠস্থানে মানুষ আর গরু ভেড়ার কোন পার্থক্য নেই।

ইজিস্ট্রীট (Easy Street) ছবিতে চ্যাপলিন পুলিশ পুনরুদ্ধার আশ্রমকে বিদ্রুপ করেছেন। নামে ইজিস্ট্রীট হলেও ওটি একটি ভয়ঙ্করতম রাস্তা। ওখানে এক বিশালদেহী গুণ্ডা ওই রাস্তার বাসিন্দাদের জীবন অতীষ্ট করে তুলেছিল। চার্লি আর কোন চাকরি না পেয়ে বাধ্য হয়ে পুলিশে যোগ দেয় এবং ওই রাস্তায় পাহারাদারের কাজ পায়। চার্লি এসে কী ভাবে এই দুর্দান্ত গুণ্ডা (Eric Campbell) -কে পরাভূত করে তাই নিয়েই ছবি।

এখানে ওঁর অন্যান্য ছবি হল :

দ্য অ্যাডভেঞ্চারার (The Adventurer), দ্যা ফ্লোরওয়াকার (The Floor Walker), দ্য ফায়ারম্যান (The Fireman), বিহাইন্ড দ্য স্ক্রিন (Behind the Screen), দ্য ভ্যাগাবন্ড (the Vagabond), দ্য কেয়ার (The Care), দ্য রিঙ্ক (The Rink), দ্য কাউন্ট (The Count).

২.৬.৫ ফার্স্ট ন্যাশেন্‌ল্‌স্ (First Nationals)-চ্যাপলিন

১৯১৮ সালে ফার্স্ট ন্যাশেন্‌ল্‌স-এ যোগ দেন। ১৯১৮-১৯২২ এই সময়ের মধ্যে চ্যাপলিন মোট আটটি ছবি তৈরি করেন।

এখানে ওঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবি হল দ্য কিড (The kid)। এটি চ্যাপলিনের একটি অন্যতম কালজয়ী ছবি। এটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি। এখানে আবার আমরা চার্লি দ্যা ট্র্যাম্প-কে পাই। এবার সে 'বাবা' তবে আইনত নয়। অবৈধ সন্তানকে এডনা সমাজের ভ্রুকুটি এড়াতে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ঘটনাচক্রে সেই শিশুর ভার চার্লিকে নিতে হয়। প্রাথমিক অনিচ্ছা সত্ত্বেও। শতচ্ছিন্ন পোষাক পরিহিত চার্লি সভ্য সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে কখনই 'বাবা' হতে পারে না।

কিন্তু ছবি যত এগোয় আমরা দেখতে পাই চার্লি এবং জ্যাকির (সেই পরিত্যক্ত শিশুটি) মধ্যে নিগূঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। চার্লি 'বাবা'র সমস্ত কর্তব্যই সুষ্ঠভাবে সমাপন করে। কিন্তু সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিরা যারা সমাজের রীতি নীতির ধারক, তারা মনে করে চার্লির বাড়ি নয় জ্যাকির ভালর জন্য ওর ঠাঁই হওয়া উচিত অনাথ আশ্রমে। চার্লি জ্যাকিকে নিয়ে পালিয়ে যায় (অনাথ আশ্রম সম্পর্কে ভীতি — চ্যাপলিনের ছবির মোটিফ)। এডনা ততদিনে প্রতিষ্ঠিত নায়িকা ও সমাজ সেবিকা। সন্তানকে ফেরত পেতে সে পুরস্কার ঘোষণা করে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়। চার্লি জ্যাকিকে নিয়ে যে ধর্মশালায় রাত কাটাতে যায় সেখানকার মালিক পুরস্কারের লোভে জ্যাকিকে এডনার কাছে পৌঁছে দেয়।

ছবির শেষটা অবশ্য নির্দিষ্ট করে কিছু বলে না। চার্লিকে দেখা যায় এডনার সাদর আহ্বানে ওর বিশাল সুসজ্জিত বাড়িতে প্রবেশ করছে।

এই ছবিতে চার্লির নিজের শৈশবের কৈশোরের অভিজ্ঞতার প্রভাব লক্ষণীয়— যেমন দারিদ্র, অনাথ আশ্রমের প্রতি ব্রাত্য মনোভাব এবং সর্বোপরি বাবা ও সন্তানের মধ্যে গভীর ভালবাসা।

চার্লি সমাজকে প্রশ্ন করেছে আইন পিতৃত্বের দাবি বনাম অবৈধ পিতৃত্বের ভালবাসার দাবি নিয়ে।

২.৬.৬ ইউনাইটেড আর্টিস্টস্ কর্পোরেশন

১৯১৯ সালে চ্যাপলিন ইউনাইটেড আর্টিস্টস কর্পোরেশন নামে নিজস্ব কোম্পানি শুরু করেন। কিন্তু ১৯২৩ সালের আগে এখানে কাজ শুরু করতে পারেন না। ১৯২৩ সালে প্রথম ছবি তৈরি করেন 'এ উম্যান ইন প্যারিস' (A Woman In Paris)। এরপর ১৯২৫-এ তৈরি 'গোল্ডরাশ' (Gold Rush) এবং ১৯২৮-এ 'দ্য সার্কাস' (The Circus)।

এরমধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল গোল্ডরাশ। এমনকি চ্যাপলিনের মতে গোল্ডরাশ ওঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ছবি।

বিষাদ, কৌতুক, খাবার এবং আশ্রয় (নূন্যতম বাঁচার জন্য), মানুষের মধ্যে পশুত্ব, লোভ, শ্রেণীগত বৈষম্য এবং সর্বোপরি ভালবাসা — এই সব উপাদানের এক অনন্যসাধারণ মিশ্রণ ঘটেছে এই ছবিতে। এইট চ্যাপলিনের শৈল্পিক দক্ষতার এক অসাধারণ নমুনা।

'ক্ষুধা' ছবির একটি অন্যতম বিষয়বস্তু। ক্ষুধা 'খাদ্যের' জন্য, ক্ষুধা 'সোনা'-র জন্য। চ্যাপলিন এবং অন্যান্যরা সুদূর উত্তরে গেছে সোনার খোঁজে। সেখানে যেমন ঠাণ্ডা, তেমন খাদ্যাভাব। সে এক বরফে ঢাকা রুক্ষ, নির্দয়, সভ্যতা বর্জিত বন্য প্রান্তর।

চ্যাপলিন তাঁর নিজস্ব ঢঙে ক্ষুধা দেখিয়েছেন। একটি সিকোয়েন্সে চার্লি এবং সঙ্গী ম্যাক স্বেন খাদ্যের অভাবে চার্লির জতোকে নুন দিয়ে সেদ্ধ করে খাচ্ছে! চার্লির তৃপ্তিভরে খাওয়া দেখলে মনে হয় এর থেকে সুস্বাদু খাবার আর হয় না। এক সময় ম্যাক মরীচিকা দেখে — চার্লি যেন একটি বৃহৎ মুরগী! ভাবামাত্র বন্দুক নিয়ে তাড়া করে।

অন্য আরেকটি সিকোয়েন্সে দেখিয়েছেন সোনার জন্য ক্ষুধা। ব্ল্যাক লার্সেন (Black Larsen) লোভে উন্মাদ। সে সোনার জন্য মানুষ মারতেও দ্বিধা করে না। কিন্তু প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয়। পাহাড় ভেঙে লার্সেন খাদে তলিয়ে যায়।

কিন্তু চার্লির উদ্দেশ্যে খুব স্পষ্ট নয়। অন্যদের মত সে সোনার লোভে উন্মাদ নয়। সে যথারীতি প্রকৃতি (নারী অর্থে) প্রেমিক। জর্জিয়া (Georgia) রসিকতার ছলে চার্লিকে নৃত্যে আহ্বান করলেও চার্লি যথারীতি ভুল বোঝে। জর্জিয়া এবং তার বন্ধুদের জন্য রাতভর নিজের সাধ্যমত ঘর সাজিয়ে অপেক্ষা করে কিন্তু তারা প্রতিশ্রুতি ভুলে গেছে! সেই চিরাচরিত শ্রেণীগত বৈষম্য।

তবে প্রকৃতি এখানেও প্রতিদান দেয়। চার্লিই সোনা পায় এবং নারী (জর্জিয়াই) পায়।

পাহাড়ের ওপরে যে কাঠের বাড়িতে ছিল চার্লি সেটা মর্ডান টাইমস-এর বাড়িটাকে মনে করায়। এখানে ওটা পাহাড়ের ওপরে এমন এক জায়গায় দোলে, যে খাদের দিকে ঘরে লোক থাকলে বাড়ি প্রায় খাদে!

২.৬.৭ সবাক্ চিত্র

১৯৩০ সালে শব্দ সংযোজনা শুরু হয় সিনেমায়। বিশ্ব জুড়ে তখন সবাক্ চলচ্চিত্রের চাহিদা এবং রমরমা। কিন্তু চ্যাপলিন তখনও তৈরি করেন তাঁর কালজয়ী নির্বাক চলচ্চিত্র সিটিলাইট্স্ (City lights)। চ্যাপলিন চলচ্চিত্রের সবাক হওয়াকে কোনদিন মেনে নিতে পারেননি। ওঁর মতে চরিত্রের মুখে সংলাপ থাকলে চলচ্চিত্রের সর্বজনীনতা হারিয়ে যাবে। চলচ্চিত্রেও শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি হবে। সংলাপের সাথে আসবে শিক্ষা, সংস্কৃতির তুলনামূলক বিচার আর মৃত্যু ঘটবে কৌতুকাভিনয়ের।

সিটিলাইট্স্-এর প্রথম সিকোয়েন্সেই শব্দকে বিদ্রুপ করেছেন। ভাষণরত জননেতার বক্তৃতা আসলে কিছু অর্থহীন আওয়াজ।

একটি অন্ধ মেয়ে ফুল বেচে। তার চোখের দৃষ্টি ফেরাতে চার্লি অর্থ জোগাড় করবে। কিন্তু কী ভাবে? চার্লি তো একজন ট্র্যাম্প! এই হচ্ছে মূল গল্প।

এখানে আবার দেখি সেই অনুভূতিপ্রবণ কিন্তু দৃঢ় ট্রাম্প-কে। নিজের একটি আস্ত পোষাক নেই, বাসস্থানের ঠিক নেই কিন্তু অর্থের আয়োজন সে করবেই। এমন সময় কাকতালীয়ভাবে আলাপ হয়ে যায় এক অর্থবান ব্যক্তির সাথে। চার্লি একদিন রাতে আত্মহত্যা করা থেকে রক্ষা করে। সে রাতে মদ্যপ অবস্থায় চার্লিকে পরম বন্ধুভাবে কিন্তু দিনের বেলায় চিনতেও পারে না। চার্লিকে সে উপহারস্বরূপ টাকা দেয় কিন্তু সকালে পুলিশ আসলে চার্লিকেই সবচেয়ে আগে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। চার্লির জেল হয়।

উচ্চবিত্তদের কৃত্রিমতা, অন্তঃসারহীনতা, মেকী বন্ধুত্বকে বিদ্রুপ করেছেন। পুলিশ যথারীতি বিনা বিচারে সেই সহজ শিকার ট্র্যাম্পকেই ধরে।

চার্লির জেল যাওয়ার মধ্যে দিয়ে ট্র্যাম্পের আত্মদান আবার মোটিফ হিসেবে ফিরে এসেছে।

চার্লি জেল থেকে বেরিয়ে দেখে সেই মেয়েটি এখন চোখে দেখতে পায়। এখন আর ঘুরে ঘুরে ফুল বেচে না, একটা সুন্দর দোকান হয়েছে। এদিকে মেয়েটির চার্লিকে দেখে করুণা হয়। একটি পয়সা দিতে আসে। চার্লিও দ্বিধাগ্রস্ত পরিচয় দিতে। কিন্তু পয়সা দেওয়ার সময় হাতে হাতে ছুঁয়ে গেলে চার্লিকে মেয়েটি চিনতে পারে। মেয়েটির চোখে বিস্ময়ের হাসি, চিনতে পারার আনন্দ।

শেষ দৃশ্যে চার্লি গালে একটা গোলাপ ধরে হাসছে। সে হাসি তৃপ্তির, আনন্দের। কিন্তু জানা যায় না সম্পর্কের পরিণতি কী! ট্র্যাম্প কি আবার চিরাচরিত ধারায় পথে নামবে না মেয়েটির ভালবাসা পাবে।

ফুল আবার ভালবাসার রূপক হিসেবে ব্যবহৃত।

১৯৩৬ সালে চ্যাপলিন তৈরি করেন ওঁর আরেকটি অসামান্য ছবি মডার্ন টাইমস (Modern Times)। এই ছবিতে নাগরিক জীবন, মেশিনের আধিক্যকে কটাক্ষ করেছেন।

এটিও সবাক্ যুগে একটি নির্বাক ছবি। শব্দ ব্যবহার করেছেন ব্যাঙ্গার্থে। জেলের ভেতর নিকৃষ্ট মানের চা খেয়ে পেটে গার্গেলের শব্দ শোনা যায় আর সেই আওয়াজে কুকুর চিৎকার করে। এই দুটি ক্ষেত্রে শব্দ সংযোজন করেছেন।

সংলাপ ব্যবহারের মধ্যে দিয়েও শ্রেণী বিভাজন দেখিয়েছেন। যেমন কারখানার মালিক যখন শ্রমিকদের নির্দেশ দেয় তখন সংলাপ শোনা যায়। কিন্তু শেষে চ্যার্লি যখন হোটেলে গান গায় তখন কোন শব্দ বোঝা যায় না।

ছবির শুরুতেই একটি অসাধারণ মন্তজে ছবিটিকে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসে। একদল ভেড়াকে কসাইখানায় ঢোকানো হচ্ছে। পরের শটে একইরকম গাদা গাদি করে এক দল মানুষ ভূগর্ভস্থ পথ দিয়ে ওপরে উঠছে এবং রাস্তা পার হয়ে কারখানায় ঢুকছে। Geralt Most বলেছেন এখানে **আইজেনস্টাইনের প্রভাব স্পষ্ট**।

ছবিতে তৎকালীন আমেরিকার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে বিদ্রুপ করেছেন। চার্লি জেলে থাকতেই বেশি আরামবোধ করে। এমনকি ছাড়া পেলেও সে জেলে থাকতে চায়। বাইরে তখন চাকরীর হাহাকার, কর্মী ছাঁটাই হচ্ছে, শ্রমিক অসন্তোষ। আমেরিকাতে তখন অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা চলছে। কারখানার পর কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর থেকে চার্লির মতে জেলে থাকা অনেক শান্তির।

শ্রমিক চার্লির সমান্তরালভাবে দেখানো হয় নিম্নশ্রেণীর একটি অল্পবয়সী মেয়েকে। বেকারত্বর পাশাপাশি খাদ্য মডার্ন ঠাইম্স্-এর একটি উপপাদ্য বিষয়। মেয়েটি ছোট ভাইবোনদের জন্য সামান্য কলা চুরি করে। পরে অন্যত্র সামান্য রুটি চুরির অপরাধে জেল হয়।

মেয়েটির বাবা শ্রমিক ছিল। তার হঠাৎ মৃত্যুর পর মেয়েটির ভাই বোনেদের অনাথ আশ্রমে নিয়ে যাওয়ার সময় মেয়েটি পালায়। সমাজের চোখে মেয়েটি তাই পলাতক। 'অনাথ আশ্রম' চ্যাপলিনের ছবির একটি গুরুত্বপূর্ণ মোটিফ। সমাজ, সামাজিক ব্যবস্থাকে পরিহাস করতে চ্যাপলিন বারে বারে অনাথ আশ্রমকে ব্যবহার করেছেন।

চার্লিও জেল ফেরত আসামী, মেয়েটিও পলাতক — পরবর্তীকালে এরা দু'জনে একসাথে সমাজ-বহির্ভূত একটি একক হয়।

আধুনিক জীবনে মেশিনের আধিক্যের ফলে মেশিন খাদক হয়ে যায়, মানুষকে গ্রাস করে। একটি দৃশ্যে চার্লি একটি মেশিনের ভেতর ঢুকে যায়। পরে মেশিন আবার তাকে বের করে দেয়। ছবির শুরুতে একটি সিকোয়েন্সে দেখা যায় একটি মেশিন আবিষ্কৃত হয়েছে যে মানুষকে খাইয়ে দেয়। মানুষকে হাত দিয়ে খেতেও হবে না। চার্লিই সেই হতভাগ্য শ্রমিকটি যার ওপর পরীক্ষাটি করা হয়। মানুষের মেশিনের ওপর নির্ভরতাকেই বিদ্রুপ করেছেন। এটি একটি অত্যন্ত মনোগ্রাহী সিকোয়েন্স।

পুলিসকে আবার ব্যঙ্গ করেছেন চ্যাপলিন। লোহার পাত নিয়ে একটি লরি যাচ্ছিল, সেখান থেকে লাল নিশান রাস্তায় পড়ে যায়। চার্লি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। নিশানটা তুলে নিয়ে লরির পেছনে দৌড়োয়। ঠিক তখনই পাশের রাস্তা থেকে একটি ধর্মঘটী শ্রমিকদের মিছিল ঘুরে এসে স্লোগান দিতে দিতে চার্লির পেছনে এগোয়। এমন সময় পুলিস এসে চার্লিকে চরমপন্থী নেতা হিসেবে তুলে নিয়ে যায়।

এই কঠোর বাস্তবের চাপ সত্ত্বেও চার্লি এবং ওর বন্ধু স্বপ্ন দেখে সুন্দর জীবনের। এই স্বপ্নই তাদের বাস্তবের সাথে যুঝতে শক্তি জোগায়, অনুপ্রাণিত করে, জীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। শেষ দৃশ্যে দু'জনে হাত ধরাধরি করে পথে, নগর সভ্যতার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে।

মডার্ন টাইম্স্ চ্যাপলিনের সর্বশেষ নির্বাক চলচ্চিত্র। পরবর্তী সব ছবিই সবাক। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : দ্য গ্রেট ডিক্টেটর, মঁসিয়ে ভের্দু, লাইমলাইট।

দ্য গ্রেট ডিক্টেটর (The Great Dictator) : একটি রাজনীতি বিষয়ক ছবি। চ্যাপলিন এখানে দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। একজন হচ্ছেন তোমানিয়ার একনায়ক রাষ্ট্রনেতা, অন্যজন এক ইহুদি পরামাণিক।

চ্যাপলিন যুদ্ধোন্মাদ এই রাষ্ট্রনেতা হিঙ্কেলকে বিদ্রুপ করেছেন ছবিতে। রাষ্ট্রনেতার ভাষণ কিছু অর্থহীন শব্দের সমাহার। তার আচরণ অস্বাভাবিক, তার চাহনি অস্বাভাবিক।

রাষ্ট্রনেতার একটা গ্লোবাকৃতি বেলুন নিয়ে হিঙ্কেলের একটি নৃত্যের দৃশ্যে হিঙ্কেলকে একটি কিশোর মনে হয়। কিন্তু যেই একবার লাফিয়ে বেলুন ধরতে যায় বেলুন ফেটে যায় আর খেলা শেষ।

ইহুদি পরামাণিকের স্বাভাবিক জীবনের সাথে তুলনা করে রাষ্ট্রনেতার ভাবনা অবাস্তবতা, অর্থহীনতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ছবির শেষে পরামাণিককে হিঙ্কেলের সাথে ভুল করে (চেহারার সাদৃশ্যের দরুণ) ভাষণের জন্য দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় তখনই প্রথম চ্যাপলিনের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শোনা যায়। যে চ্যাপলিন এতদিন শব্দের ব্যাপারে বিমুখ ছিল, দ্বিধাগ্রস্ত ছিল সে সবাক হল। প্রথমেই যেটা লক্ষণীয় তা হল কৌতুকের অবসান ঘটল। পরামাণিক অতি সহজ সরলভাবে শাশ্বত মানব বোধের, জীবনের কথা বলে কিন্তু এখানে বিন্দুমাত্র কৌতুকাভিনয় নেই।

মঁসিয়ে ভের্দু (Monsieur Verdoux) : অঁরি ভের্দু: (Hemin) ভের্দু একজন শিক্ষিত, ভদ্র, প্রাক্তন ব্যাঙ্ককর্মী। অর্থনৈতিক মন্দাবস্থায় চাকরী যায়। অসুস্থ, পঙ্গু স্ত্রী এবং শিশুপুত্রর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নতুন কর্মজীবন শুরু করে। এই নতুন পেশাটি বেশ অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক। ভের্দু বয়স্ক, কুৎসিত অর্থবান মহিলাদের প্রেমে পড়ার ভান করে এবং বিয়ে করে। পরে তাদের হত্যা করে অর্থ আত্মসাৎ করে।

অথচ অন্যদিকে তিনি স্নেহশীল পিতা, কর্তব্যশীল স্বামী, তিনি স্ত্রীকে ভালওবাসেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও। এই ভয়ঙ্কর দ্বিত্ব ন্যায়-অন্যায় নৈতিক-অনৈতিক ইত্যাদি মূল্যবোধকে প্রশ্ন করে।

চ্যাপলিন ছবির শেষে রাষ্ট্র-পরিচালিত যুদ্ধ এবং ভের্দু দ্বারা কৃত হত্যার তুলনা করে যুদ্ধের নৈতিকতাকে প্রশ্ন করেছে! "As a mass killer I'm an amateur....Wars, conflict. It's all business. One murder makes a rillain, millions a hero."

ছবিটি হিরোশিমার দু'বছব পর তৈরি হয়। যখন পাদ্রী ভের্দুকে জিজ্ঞাসা করে পাপের জন্য ক্ষমা চায় কিনা, ভের্দু উত্তরে বলে, কে জানে কোনটা পাপ ("Who knows what sin is.")

লাইমলাইট (Limelight) : হচ্ছে নির্বাক যুগের এক সফল কমেডিয়ানের সবাক যুগে ব্যর্থতার, অসফলতার কাহিনী। চার্লি নিজেই সেই বৃদ্ধ কমেডিয়ান, কালভেরো (Calvero)। দর্শক বিমুখতার পর নিরাশা এবং মদে ডুবে আছে। এমন সময় এক ব্যালে নর্তকী টেরী (Terry)-কে আত্মহননের পথ থেকে ফিরিয়ে আনে। তাকে মানসিক অবসাদ কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। এমনকি পুনর্বার ব্যালে নৃত্যে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। টেরী এবার অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। আর নিজের অজান্তে চার্লিও ইতিমধ্যে বদলে যাওয়া নতুন মানুষ। মদ্যপান ত্যাগ করে সুস্থ একটি মানুষ। কিন্তু মঞ্চে সে আর ফিরতে পারে না, দর্শক গ্রহণ করে না। টেরী ওঁকে বিয়ে করতে চায়। কালভেরো রাজি হয় না। একদিন উধাও হয়ে যায় কাউকে না বলে। কয়েক বছর পর টেরী ওঁকে খুঁজে বের করে। সংবর্ধনার আয়োজন করে। এখানে দেখা যায় চ্যাপলিন ও কিটনের যুগলবন্দী। আশ্চর্যজনকভাবে দর্শক অত্যন্ত আনন্দ পায় ওঁদের কৌতুকাভিনয়ে। দর্শকবৃন্দ তুমুল করতালি দিয়ে ওদের অভিবাদন জানায়। অভিভূত চ্যাপলিন অসুস্থ হয়ে পড়ে মঞ্চে এবং কিছু পরে সেখানেই প্রাণ হারায়।

মৃত্যুর দৃশ্যকে চ্যাপলিন প্রতীকী করেছে। কালভেরো মঞ্চের পাশে অন্ধকারে মৃত্যুশয্যায়। মঞ্চে তখন টেরী নৃত্যরত। কালভেরো টেরীর দিকে তাকিয়ে, ভবিষ্যতের তাঁর আস্থা, বিশ্বাস ফুটে ওঠে। টেরীকে দেখতে দেখতে কালভেরোর মৃত্যু হয়।

লাইমলাইট খুবই উচ্চগ্রামের মেলোড্রামা। এখানে অনেকগুলি দ্বিত্ব উপাদান হিসেবে এসেছে — মানুষ-শিল্পী, বার্ধক্য-যৌবন, শিল্প-জীবন।

এই ছবিটি যেন চ্যাপলিনের কর্মজীবনের সমাপ্তি ঘোষণা করে।

লাইমলাইট-এর কালভেরো যেন নির্বাক যুগের সমস্ত কমেডিয়ানের প্রতীকীরূপ।

একমাত্র চ্যাপলিনই সবাক যুগেও সফল হয়েছিলেন। জেম্‌স অগী বলেছেন, The only man who really survived the flood was Chaplin, the only one who was rich, proud and popular enough to afford to stay silent...and at last made an all-talking picture Monsienr Verdoux, creating for that purpose on entirely new character who might properly talk a blue streak."

জেরাল্ড মাস্ট (Gerald Mast) ওঁর কমিক মাইণ্ড (Comic Mind)-এ চ্যাপলিন সম্পর্কে বলেছেন, "He is to the movies what Shakespeare is to the drama."

২.৭ বাস্টার কিটন

হলিউড-এর কমেডির আলোচনায় সেনেট, চ্যাপলিনের সাথে যাঁর নাম সমস্বরে উচ্চারিত হয় তিনি হলেন বাস্টার কিটন।

বাস্টার কিটন সম্পর্কে জেম্‌স্ অগী (James Agee) বলেছিলেন, "He was by his whole style & nature so much the most deeply 'silent' of the silent comedians that even a smile was as deafeningly out of key as a yell." জেমস অগীর এই মন্তব্য কিটনের কমেডির বৈশিষ্ট্য এবং অভিনয় রীতিকে খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে। ওঁর অভিনয় রীতিকে খুব সন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে। ওঁর অভিনয়রীতির বৈশিষ্ট্য ছিল দর্শককে কিটন আনন্দ দিত একটি প্রস্তরবৎ, কঠিন, অভিব্যক্তিহীন মুখ নিয়ে। ওঁর শরীর যখন অস্বাভাবিক সব স্টান্ট, কসরত করছে তখন ওঁর মুখ ভাবলেশহীন, ক্লেশের চিহ্নমাত্র নেই। পর্দায় ওঁর উপস্থিতি ছিল এরকম : অত্যন্ত সুসজ্জিত এক ব্যক্তি, সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগে, পরম নিশ্চিন্তে অদ্ভুত, অমানুষিক সব কাণ্ডকারখানা করে যাচ্ছে, যেমন বোমার জ্বলন্ত সলতে থেকে

সিগারেট ধরাচ্ছে, জলপ্রপাতে ঝাঁপ দিচ্ছে, গায়ের ওপর দেওয়াল ভেঙে পড়ছে ইত্যাদি।

চ্যাপলিনের সমসাময়িক এই কমেডিয়ানের সাথে চ্যাপলিনের বহু সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়। দু'জনের ক্ষেত্রেই পারিবারিক অবস্থা তাঁদের ছবিকে, ছবির বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করেছে। অবশ্য চ্যাপলিনের মত অভাব, গৃহহীনতায় ওঁর শৈশব কাটেনি। ১৮৯৫ সালে কান্সাস (Kansas)-এর পিকা (Piqua) শহরে এক ভৌডেভিল (Vaudeville) শিল্পী পরিবারে ওঁর জন্ম। সাড়ে তিন বছর বয়স থেকে বাবা মার সাথে ভৌডেভিল কৌতুকাভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন। বাস্টার কিটনের একটা বিশেষত্ব ছিল ওঁর অস্বাভাবিক শারীরিক দক্ষতা ও সুস্থতা। ওঁর বাবা জো কিটন (Joe Keaton) ওঁকে মঞ্চে ঝাড়ু হিসেবে ব্যবহার করতেন। অর্থাৎ ওঁকে উল্টো করে ধরে ওঁর চুল দিয়ে মঞ্চ পরিষ্কার করবার ভান করতেন এবং পরিষ্কারকার্য সমাধা হওয়ার পর ঝাড়ুকে ছুঁড়ে ফেলবার মত বাস্টারকে মঞ্চে একধারে ছুঁড়ে দিতেন। (একবার তো দর্শকাসনেও ছুঁড়ে দিয়েছিলেন।) খুবই আশ্চর্যের, বাস্টার কিন্তু এতে আঘাত পেতেন না। এই অনুষ্ঠানের প্রচারপত্রে বাস্টার সম্পর্কে লেখা হত দ্য হিউমান মপ (The human mop)।

ওঁর বাস্টার নামটাও এই বৈশিষ্ট্যের কারণে পাওয়া। ওঁর আসল নাম জোসেফ ফ্রান্সিস কিটন (Joseph Francis Keaton)। মাত্র ছ'মাস বয়সে সিঁড়ি দিয়ে পড়ে গিয়েও কোনরূপ আহত হয় না। তাই দেখে যাদুকর হ্যারি হৌডিনি (Harry Houdini) তাঁর নামকরণ করেন 'Buster'। বড় হয়েও ওঁর অভিনয় জীবনে কঠিনতম কসরৎ করলেও কোনদিনই আহত হননি। একবারই শুধু একটা জটিলতম মেশিন নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তার ভেতরে পা আটকে গিয়ে চোট পেয়েছিলেন।

২.৭.১ চলচ্চিত্র পেশার চিত্রলেখ

২১ বছর বয়সে ফ্যাটি অর্বাকল (Fatty Arbackle)-এর আহ্বানে যখন সিনেমায় যোগ দেন তখন ভৌডেভিল (Vaudeville)-এর অনুষ্ঠানের এক প্রথম সারির অভিনেতা। ওঁর প্রথম ছবি ছিল দ্য বুচার বয় (The Butcher Boy)। ১৯১৭ থেকে ১৯১৯ অব্দি কিটন একটানা অর্বাকল-এর সাথে কাজ করেন। অচিরেই কিটন জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এরপর কিটন নিজে ছবি পরিচালনা শুরু করেন। পরিচালনার পাশাপাশি লেখা এবং অভিনয় দুই-ই করতেন। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ছবি হল ওয়ান উইক (One Week) ১৯২০ তে; ১৯২১-এ দ্য বোট (The Boat); ১৯২২-এ দ্য ইলেকট্রিক হাউস (The Electric House)। ১৯২৮-৩৩ সাল অব্দি কিটন শুধুই পূর্ণদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। মোট ২০টি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি করেছিলেন। এরমধ্যে কিছু নিজের প্রযোজনায় কিছু এম-জি-এমর সাথে।

চলচ্চিত্র সবাক হওয়ার পর নির্বাক চলচ্চিত্রের এই বিখ্যাত কমেডিয়ান অন্তরালে চলে যান।

২.৭.২ কিটনের কমেডি

মানুষকে নিছক আনন্দ দেবার জন্যই কিটন কমেডি ছবি তৈরি করতেন। ওঁর কমেডির বৈশিষ্ট্য হল ওঁর অভিব্যক্তিহীন মুখ। গম্ভীর, কঠিন থাকত ওঁর মুখ, যেন এক দার্শনিক গভীর চিন্তায় মগ্ন। ওঁর অভিব্যক্তির প্রকাশ ছিল শরীরী কার্যকলাপে।

কিটনের কমেডি কখনই চ্যাপলিনের কমেডির মত গভীর বোধের বা ব্যাঞ্জনার ছিল না। কিটন কখনই কোন সামাজিক, রাজনৈতিক বা শাশ্বত জীবনবোধের কথা ছবির মধ্য দিয়ে বলতে চাননি। অনাবিল হাস্য কৌতুক ছিল ওঁর ছবির মূখ্য বিষয়বস্তু।

কিটনের ছবিতে যন্ত্র এবং যান্ত্রিকতা বরাবর একটি মুখ্য বিষয় ছিল। ছেলেবেলা থেকেই কিটন যন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতেন। জটিলতম সব যন্ত্র নিয়ে কিটন এমনভাবে অভিনয় করতেন যেন সেগুলোও ছবির চরিত্র। কিটনের এই প্রস্তরবৎ মুখের পাশাপাশি অস্বাভাবিক ও অসম্ভব কিছু শরীরী কসরৎ এত অনায়াসে করতেন যে কখনও কখনও কিটনকেই যন্ত্র মনে হত। চ্যাপলিনের কমেডি যেমন ওঁর মুখ-হাত-পা-নির্ভর ছিল, যেখানে প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রতঙ্গ ভিন্ন

ভিন্ন ভাবে অর্থবহ হত, কিটনের কমেডি ছিল সম্পূর্ণ বা গোটা শরীরনির্ভর।

কিটনের প্রস্তরতুল্য মুখের অর্থ এই নয় যে চরিত্রটি অনুভূতিহীন বা নির্বোধ। ভাবলেশহীন মুখ আসলে ভাব লুকোনোর প্রয়াস। মুখটা যেন একটা মুখোশ। ক্রিয়াশীল মস্তিষ্কের মুখোশ।

১৯২৬ সালে তৈরি দ্য জেনারেল (The General) ছবিটি থেকে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। কিটন ওঁর প্রণয়ীনী আনাবেলার সাথে দেখা করতে যাচ্ছে আর পিছু নিয়েছে দুটি ছেলে। বাস্টারের পিছু পিছু আনাবেলার দোকানে ঢুকে চেয়ারে বসেছে। কিটন অভিব্যক্তিহীন মুখ নিয়ে উঠে দাঁড়াল, মাথায় টুপি দিল, দরজার দিকে এগিয়ে গেল। স্বাভাবিকভাবে ছেলে দুটিও উঠে গেল। বাস্টার গিয়ে দরজা খুলল, ছেলেদুটি বেড়িয়ে গেল বাস্টার বেরোচ্ছে এই আশা করে। কিন্তু বাস্টার দরজা বন্ধ করে, টুপি খুলে ভেতরে গিয়ে আনাবেলার পাশে বসে পড়ল।

কিটনের পোষাক পরিচ্ছদ থাকত অত্যন্ত পরিপাটি। কিটন কখনোই চ্যাপলিনের মত শতচ্ছিন্ন পোষাক পরতেন না, সে যে চরিত্রেই অভিনয় করান বা যে শ্রেণীরই হোক। বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন রকম চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন কিটন। কিন্তু সব চরিত্রের মূল চরিত্রায়ন একই রকম ছিল। গম্ভীর, শান্ত, অনমনীয়, যে কোন বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম এবং অভীষ্ট পুরণে একনিষ্ঠ।

কিটনের ছবির আরেকটি জরুরী উপাদান হল প্রকৃতি। প্রকৃতির বিশালতার মাঝে কিটন একজন এক ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব। কিন্তু আশ্চর্যের হল কিটন কিছুতেই ভীত নয়। যে অনায়াস অবলীলায় কিটন যন্ত্রকে আয়ত্ত করতেন বিশাল প্রকৃতির বুকে সেই ভাবে বিচরণ করেছেন। যে অনায়াসে বিশাল প্রান্তর দৌড়ে পার হয়েছেন, সে ভাবেই জলপ্রপাতে ঝাঁপ দিয়েছেন। দুটি ক্ষেত্রেই কিটন প্রণয়িণীকে পেতে প্রকৃতিকে জয় করেছে। কিটনের এই অসম্ভব সব কর্মকাণ্ডের অনুপ্রেরণা ছিল প্রণয়িণী লাভের আকাঙ্খা। প্রণয়িণীকে জয় করতে, নিজের প্রেমের, আগ্রহের প্রমাণ দিতে এবং সর্বোপরি বেঁচে থাকতে কিটন অসম্ভব কাণ্ডে লিপ্ত হত।

কিটনের ছবিতে প্রকৃতি যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল ওঁর ছবিতে লং-শটের ব্যবহারই বেশি করতেন। চ্যাপলিনের মত ওঁর মুখের অভিব্যক্তি দেখানোর জন্য ক্লোজ-আপের প্রয়োজনীয়তা ছিলনা। বরঞ্চ কিটনের সম্পূর্ণ শরীর নির্ভর যে অভিনয় রীতি, মানুষ-যন্ত্রের এবং মানুষ প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্ককে দর্শকের কাছে তুলে ধরতে লং-শটের আবশ্যিকতাই বেশি। গো ওয়েস্ট (Go West) ছবিতে কিটন এক্সট্রিম লং-শট (Extreme Long Shot) ব্যবহার করেছেন সীমাহীন প্রান্তর দিয়ে ওঁর দৌড় দেখাতে। একাধারে যেমন এখানে প্রকৃতির বিশালত্ব উন্মোচিত হয়, অন্যদিকে কিটনের দৌড়ও দেখা যায় সম্পূর্ণভাবে। স্বাভাবিকভাবেই ওঁর ছবি বহির্দৃশ্য-নির্ভর।

এই শরীরী অভিনয়ের জন্য স্টাণ্ট (Stunt) কিটনের এক অতি প্রিয় উপাদান ছিল। স্টাণ্ট হচ্ছে লোক-দেখানো কিছু কর্মানুষ্ঠান বা কর্মপ্রচেষ্টা। (সংসদ ইংরাজি-বাংলা অভিধান মতে।) কিটনের প্রত্যেকটি ছবিতে স্টাণ্ট দেখতে পাওয়া যেত এবং প্রত্যেকটি কিটন নিজেই করতেন। কিটনের ছবির এটি একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক সব স্ট্যাণ্ট কিটন দৈনন্দিন কাজের মত অনায়াসে করে ফেলতেন। স্টিমবোট বিল, জু (Steamboat Bil, Jr; ১৯২৮-এ তৈরি) ছবিতে কিটন সিনেমার ইতিহাসের সবচেয়ে শ্বাসরোধকারী এবং প্রায় আত্মহননীয় একটি স্টাণ্ট করেছিলেন।

কিটন একটি বাড়ির সামনে দাঁড়াবেন এবং ওঁর পেছনের দেওয়ালটা হঠাৎই ভেঙে পড়বে ওর ওপর, কিন্তু ওঁর কিছু হবে না। কারণ কিটন যেখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন ঠিক সেখানেই ওঁর মাথার ওপর পড়বে সেই বাড়ির দোতলার একটি খোলা জানালা। ফলে কিটনের চারিধার ইঁট, দেওয়ালের ভগ্নাংশ স্তূপীকৃত হয়ে গেলেও কিটন সম্পূর্ণ অক্ষত থাকবেন। কিটনের এই প্রস্তাবকে উন্মাদের কল্পনা বলে ওঁর অধিকাংশ কর্মী মায় পরিচালক পর্যন্ত সেট ছেড়ে চলে যান কিন্তু কিটন ছিলেন অদম্য। এবং অতি আশ্চর্যের কিটন সত্যিই অক্ষত থেকে সফলভাবে এটি করেছিলেন। এই স্টাণ্টগুলি সম্পূর্ণভাবে দেখাতে লং-শটই যথার্থ ছিল এবং ওঁর প্রতিক্রিয়াহীন মুখও খুব সহায়ক ছিল। কারণ দর্শক এই বিপজ্জনক স্টাণ্ট দেখে আঁতকে উঠে কিটনের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হবেন — সেখানে কোন ভাবান্তর নেই।

কিটনের ছবিতে নারী চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। শুধুমাত্র কিটন তাঁদের কামনা করতেন, এই ছিল তাঁদের

উপস্থিতির কারণ। এঁরা নিছকই কাহিনীর প্রয়োজনে থাকতেন।

চ্যাপলিনের সাথে বিষয়বস্তু বা উপস্থাপনায় কোন সামঞ্জস্য না থাকলেও কিটনের ওপর একজনের প্রভাব খুব স্পষ্টভাবেই ওঁর ছবিতে দেখা যায় — তিনি হলে ডি. ডবলিউ. গ্রিফিথ (D.W. Griffith)। কিটনের একাধিক ছবিতে — আওয়ার হস্‌পিটালিটি (Our Hospitality), সেভেন চান্সেস (Seven Chances), শার্লক জু (Sherlock Jr.) কলেজ (College), স্টিমবোট বিল জু (Steamboat Bill, Jr.), স্পাইট ম্যারেজ (Spite Marriage) — গ্রিফিথের বিখ্যাত 'Last Minute Rescues'-এর বিভিন্ন রকম ব্যবহার দেখা গেছে।

২.৭.৩ কিটনের চলিচ্চত্র জীবনের পর্যাবসান

"As soon as the screen began to talk, silent comedy was pretty well finished." কথাটা বলেছিলেন জেম্‌স্ অগী (James Agee)।

তিরিশের দশকের মধ্যভাগ অব্দি কিটন অনেকগুলি পূর্ণদৈর্ঘের ছবি তৈরি করেছিলেন। এছাড়া সবাক স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রও তৈরি করেছিলেন, কিন্তু ওঁর অভিনয় ধরণের সাথে শব্দ কখনই একাত্ম হতে পারেনি। বরঞ্চ কিটনের অভিনয়ের বৈশিষ্ট্যকে সংলাপ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়। (... his dark, dead voice, though it was in keeping with the visual character, tore his intensely silent style to bits & destroyed the illusion within which he worked.)।

Gerald Mast ওঁর Comic Mind ওঁর বইতে অবশ্য আরও কিছু কারণ তুলে ধরেছেন। ওঁর ব্যক্তিগত জীবন সুখের ছিল না। দ্বিতীয়ত ঃ অত্যধিক মদপানের ফলে ওঁর চেহারা নষ্ট হয়ে যায়, কণ্ঠস্বর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কপালে বার্ধক্যের ছাপ, চোখ কোটরাগত, ওঁর শারীরিক ক্ষমতা, দক্ষতা হ্রাস পায়। ৩৮ বছর বয়সেই কিটনকে 'হোয়াট! নো বিয়ার?' (What! no Bear? ; ১৯৩৩ সাল) ছবিতে লাইমলাইট (Lime light)-এর ৬৩ বছর বয়সী চ্যাপলিনের থেকে বৃদ্ধ লাগে।

এছাড়া পেশাগত কারণও ছিল। তিরিশের দশকে কিটন তখন এম-জি-এমে কাজ করছিলেন। ওখানে কিটনকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হয় না। কিটন, ওদের নির্দেশমত চিত্রনাট্যে কিছু বিশেষ উপাদান (নাচ, গান, দৃশ্যাবলী, সাজসজ্জা) যোগ করতে বাধ্য হন। ফলে ছবিতে চিরপরিচিত কিটনকে পাওয়া যায় না। কিটনের জনপ্রিয়তা দ্রুত হারিয়ে যায়। তবে কিটন অভিনয় করা ছাড়েন না। নাটকে অভিনয়, ছবিতে ছোটখাট চরিত্রে, ফ্রান্সে, মেক্সিকোতে সবাক কমেডি ছবিতে অভিনয় করেছেন। এমনকি ফরাসী সার্কাসে ক্লাউনও হয়েছেন। জেম্‌স্ অগী (James Agee) যথার্থই বলেছেন, "He gallantly and correctly refuses to regard himself as 'retired'."

২.৮ জন ফোর্ড

হলিউডের নির্বাক যুগে (১৯১৪) যখন ফোর্ড ছবি নির্মাণ শুরু করে তখন হলিউডে স্টুডিও সিস্টেমে (Studio System)-র মধ্যে কাজ করতে হত। স্টুডিওগুলিতে অন্য যে কোন দ্রব্যের মত চলচ্চিত্রও উৎপাদন (Production) হচ্ছিল প্রচুর পরিমাণে, যাতে উৎপাদন-খরচ (Production Cost) কম হয়। এই কারণে তখন স্টুডিওকে ফ্যাক্টরি (Factory)ও বলা হত। এমনকি এইরকম প্রচুর পরিমান উৎপাদনের (Economies of scale) প্রাথমিক শর্ত হিসেবে ছবিগুলি তৈরি হত সমমানের এবং প্রায় একইরকম (homogeneous product)। ফোর্ডকেও এই ব্যবস্থার মধ্যে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে হত। কিন্তু ফোর্ডের কৃতিত্ব এইখানেই যে এই ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করেও তাঁর ছবিগুলি স্বতন্ত্র ছিল।

১৯১৪-১৯৭০— এই দীর্ঘ কর্মজীবনে ফোর্ডকে আমেরিকান চলচ্চিত্র শিল্পের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতা বলা হত।

বিখ্যাত চলচ্চিত্র পত্রিকা 'কায়ের-দু-সিনেমা' (Cahier-du-Cinema)-র সমালোচকদের মতে ফোর্ড ছিলেন যথার্থ শিল্পী, একজন 'অতার' (auteur)।

• অতার (Auteur) :

'কায়ের-দু-সিনেমা' পত্রিকার সমালোচকরা ছিলেন ফ্রাঁকোয়া ত্রুফো (Francios Truffaut), জঁ-লুক-গোদার (Jeanluc-Godard), আন্দ্রে বাঁজা (Andre Bazin) প্রমুখ। এঁরা বলেছিলেন জন ফোর্ড ছিল আমেরিকান সিনেমা 'অতার'। এঁদের মতে অতার (auteur) হলেন তাঁরাই যাদের চলচ্চিত্র কেবল সাহিত্যের চিত্ররূপ ছিল না। তাঁদের ছবি চলচ্চিত্র মাধ্যমে একটি মৌলিক সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁদের ছবির মধ্যে নিজস্বতার ছাপ থাকে, স্বতন্ত্রতা থাকে।

বিখ্যাত আমেরিকান সমালোচক অ্যান্ড্রু স্যারিস (Andrew Sarris)-এর মতে সমস্ত বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও একজন অথার (author)-এর ব্যক্তিত্ব তাঁর শিল্পকর্মকে সমৃদ্ধ করে, পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়। তাঁর কাজের বিভিন্ন অংশ যতই ভাল হোক না কেন, সংযুক্তকরণের পর একটি অর্থপূর্ণ একক হতে হবে।

• জ্যঁর (Genre) :

ফোর্ড ওয়েস্টার্ন (Western) জ্যঁর-এর ছবি করতেন। বিভিন্ন ধরনের চরিত্র সম্বলিত ছবিগুলো শুধুমাত্র সুন্দর গল্পই বলত না, প্রত্যেকটি ছবিতে আমেরিকার ইতিহাস, মৌলিক বিশ্বাসের, সংস্কৃতির ছোঁয়া থাকত যা দর্শককে ভাবাত। সর্বোপরি ওঁর ব্যক্তিত্বকে অনুভব করা যেত ওঁর কাজের মধ্যে।

জ্যঁর-এর সূত্রপাত সাহিত্যে। সিনেমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় নির্বাক যুগেই। হলিউডে স্টুডিও সিস্টেমের যখন রমরমা অবস্থা তখন সেখানে বিভিন্ন ধরনের জ্যঁর-এর জন্ম হয়। যেমন, ওয়েস্টার্ন (Western), মিউজিকাল (Musical), মেলোড্রামা (Melodrama), হরর (Horror), কমেডি (Comedy), গ্যাঙস্টার (Gangstar), সায়েন্স ফিক্‌শ্‌ন (Science fiction)। পরবর্তী এর সাথে যোগ হয় ফিল্ম নয়র (Film noir)। যে কোন জ্যঁর-এর ক্ষেত্রে, প্রত্যেকটি ছবিতে কিছু মূল উপাদানকে একরকম হতে হবে যাতে দর্শক একবারেই চিনতে পারে। যেন একটা ছবি তার পূর্বতন ছবিকে নকল করছে। ছবির বিষয়বস্তুও একরকম হতে হবে। ছবির চরিত্র, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাদের পোষাক আষাক সব কিছুই সুপরিচিত হতে হবে। এমনকি পরিবেশ, জায়গা, বাতাবরণ যেখানে গল্প তার শাখা প্রশাখা নিয়ে নিজেকে মেলে ধরবে, সেগুলোর পুনরাবৃত্তি একান্তই আবশ্যক।

জ্যঁর ছবির ক্ষেত্রে দর্শকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দর্শকের চিনতে পারা, সদর্থক প্রতিক্রিয়া খুবই জরুরী।

জ্যঁর ছবির ক্ষেত্রে চরিত্রদের সহজে চেনার জন্য টাইপকাস্টিং (typecasting) করা হয়ে থাকে। টাইপকাস্টিং হল কোন বিশেষ ধরনের চরিত্রাভিনয়ে বাঁধা পড়ে যাওয়া। এটা দেখতে পাওয়া যায় যে কোনো বিশেষ ধরনের চরিত্রের পূর্ণ সাফল্য বা জনপ্রিয়তার কারণে বা ওই ধরণের চরিত্রে বিশেষভাবে মানাবে এইরূপ শারীরিক গঠন বা মুখের ছাঁদের জন্য কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে ক্রমাগত একই ধরনের চরিত্রের অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত করা হয়।

জ্যঁর চরিত্ররা কাল্পনিক জগতের বাসিন্দা। তারা সম্পূর্ণ অবাস্তব, অগভীর, স্বার্থত্যাগী চরিত্র। তারা আমাদের থেকে উন্নত, কর্মঠ এবং তাদের সহজেই চেনা যায়।

• ওয়েস্টার্ন (Western) জ্যঁর ছবির বৈশিষ্ট্য :

জন ফোর্ড যেহেতু ওয়েস্টান জ্যঁর-এর ছবি নির্মাণ করতেন, তাই ওয়েস্টান জ্যঁর-এর বৈশিষ্ট্যগুলি আলাদা করে দেখাটা একান্তই প্রয়োজন।

ওয়েস্টার্ন-এর বহির্জগত হয় মরুভূমি নয়ত পর্বত। আর অর্ন্তদৃশ্য নেওয়ার জায়গাগুলো ছিল একটু অদ্ভুত রকমের :

মদ্যপানের নিমিত্ত দোকান, বেশ্যালয়, হোটেল, গবাদি পশুর থাকার জায়গা। পুরুষ চরিত্ররা অধিকাংশ সময়েই বহির্জগতে রাত কাটায় বা ভবঘুরের জীবনযাপন করে। তাদের পোষাকের বিশেষত্ব হল চওড়া প্রান্তের টুপি,গলায় রুমাল বিশেষ বাঁধা, শার্টের কলার ও উপরের বোতাম খোলা, আঁটো সাঁটো জিন্সের প্যান্ট এবং জুতোর গোড়ালি অস্বাভাবিক উঁচু। হাতে থাকে আগ্নেয়াস্ত্র, মূলত ঃ বন্দুক। ঘোড়া আরেকটি জরুরী উপাদান। পুরুষ চরিত্ররা ঘোড়া ছাড়া চলে না। এরা অত্যন্ত আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন, বলিষ্ঠ, পুরুষোচিত চেহারা সম্পন্ন পুরুষ। মেয়েরা স্বভাবতই মেয়েলি।

এগুলি সবই ছবির বাহ্যিক এবং কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ছবির 'গল্প' বা 'বিষয়বস্তু'।

● **উল্লেখযোগ্য ছবি :**

জন ফোর্ড নির্বাক যুগে চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজ শুরু করলেও ওঁর সবাক যুগের ছবিই অধিক উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৫ সালে নির্মীত ছবি 'দ্য ইনফর্মার' (The Informer)-এর জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরুস্কার পান। এবং এই পুরুস্কাবের সাথে সাথে ফোর্ড পাদ প্রদীপের আলোয় চলে আসেন। এই ছবিটি আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা অন্দোলন নিয়ে রচিত একটি উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করেন। 'হাউ গ্রিন ওয়াজ মাই ভ্যালি' (How Green was my valley), ১৯৪৯-এ তৈরি ছবিটির জন্য শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকারের পুরস্কার লাভ করেন। তবে ফোর্ডের সবেচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবি হল স্টেজকোচ (Stagecoach)। স্টেজকোচ ১৯৩৯ সালে তৈরি করেন ড্রামস অ্যালং দ্য মোহক (Drums Along the Mohawk)। এটি আমেরিকার আন্দোলনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি।

লিঙ্কনের জীবন নিয়ে তৈরি করেছিলেন ইয়ং মি. লিঙ্কন (Young Mr. Lincoln)। এটিও ১৯৩৯ সালে নির্মীত। ১৯৪০ সালে নির্মীত গ্রেপস্ অফ্ র‍্যাথ (Grapes of Wrath) জন স্টেনবেক'র উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে তৈরি করেন। ওঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ছবি হল 'দ্য ম্যান হু শট লিবার্টি ভ্যালেন্স (The man who shot liberty valence) দ্য সান শাইনস্ ব্রাইট (The Sun Shines Bright), মাই ডার্লিং ক্লেমেনটাইন (My Darling Clementine), দ্য লং ভয়েজ হোম (The Long Voyage Home), ওয়াগনমাস্টার (Wagonmaster), রিও গ্র্যান্ড (Rio Grande), দ্যা কোয়াট ম্যান (The Quiet Man) ইত্যাদি।

● **বিষয়বস্তু :**

ফোর্ড-এর উল্লেখযোগ্য ওয়েস্টার্ন (Western) ছবিগুলিতে দুটি মূল ভাবনা কাজ করে। বন্যকে সভ্য করা এবং নায়িকা-নায়কের মিলনের মধ্যে দিয়ে নায়ককে গার্হস্থ্য জীবনে নিয়ে আসে নায়িকা। ভালবাসার মধ্যে দিয়ে নায়ক সভ্য হয়, ব্যক্তির প্রেমের গল্প ক্ষুদ্রাকারে দিগন্ত বিস্তৃত বন্য পশ্চিমকে জয় করার কথাই বলে। এ যেন সভ্যতার আগমনের, নায়কের সামাজিক জীবনে প্রবেশের এক প্রতীক। অন্যদিকে নিখিল বিশ্বও শোধ নেয়। পশ্চিমকে জয় করার আকাঙ্ক্ষা আসলে ব্যক্তির সামাজিক জীবনে প্রবিষ্ট হওয়ার প্রতীক স্বরূপ। দুটি ক্ষেত্রেই প্রকৃতিজ বনাম সভ্যতার মূল্যবোধের সংঘাত বেঁধেছে। ফোর্ডের নারী চরিত্র একাধারে সভ্যতার প্রতিভূ অন্যদিকে তারা প্রাকৃতিক শক্তিরও অধিকারী। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে লাভ করার পাশাপাশি হারাতেও হয়। হারাতে হয় স্বাধীনতা, ক্ষমতা কিন্তু লাভ করে মনুষ্যত্ব, লাভ করে অন্তর্দৃষ্টি।

● **ফোর্ডের বৈশিষ্ট্য :**

ফোর্ডের ছবিতে (ওয়েস্টার্ন) সব সময় কতগুলি বৈপরীত্য কাজ করেছে। যেমন বাগান বনাম বন্যতা, ইউরোপীয়ান (European) বনাম ইণ্ডিয়ান (Indian), সভ্য বনাম জংলী, বই বনাম বন্দুক, বিবাহিত বনাম অবিবাহিত, পূর্ব বনাম পশ্চিম, গৃহস্থ বনাম যাযাবর। এই বিভিন্ন বিষয় একে অপরকে কখনও ঢেকে দিয়েছে। একেকটি ছবিতে একেকটি বিষয় (বৈপরীত্য) মূল বক্তব্য হয়েছে। কিন্তু ফোর্ডের বিশেষত্ব এখানেই যে ওঁর ছবি বারে বারে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গেছে।

ফোর্ডের ছবিতে ইতিহাস, মূলত আমেরিকার ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ফোর্ড তাঁর প্রত্যেকটি ছবিকে আমেরিকার ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সমৃদ্ধ করেছেন। ফোর্ডের নায়ক শুধুমাত্র সভ্য হয় না, সেও ইতিহাসে স্থান অধিকার করে আছে। নায়ক তার কালকে অতিক্রম করে আমেরিকান বিশাল ইতিহাসের অঙ্গ হয়েছে। অতএব ফোর্ডের নায়ক মৃত্যুর সাথে লীন হয়ে যায় না।

২.৯ সারাংশ

১৮৯৬ সালে আমেরিকায় চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়। এই সময় আমেরিকার চলচ্চিত্র শিল্প নিছকই একটি কারিগরি শিল্প ছিল। তখন থেকে ১৯০৭ অব্দি ক্যামেরাম্যান পদ্ধতিতে চলচ্চিত্র নির্মীত হত। তখন ক্যামেরাম্যানরাই সব করতেন। বিষয় নির্বাচন থেকে শেষ ধাপ অব্দি তারাই সামলাতেন। এই সময়কার গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্রকার ছিলেন এডউইন এস. পোর্টার।

১৯০৭-০৯ অব্দি ছিল ডিক্টের-সিস্টেম। এই সময় ক্যামেরাম্যান আর একা সমস্ত করতেন না। বিষয়বস্তু নির্বাচন, নির্দেশনা ডিরেক্টর বা পরিচালক করতেন আর চিত্রগ্রাহক শুধুই ছবি তুলতেন।

১৯০৯ থেকে পদ্ধতির বদল ঘটল। শুরু হল ক্রম-বর্ধমান চাহিদার সাথে পাল্লা দিতে ডিরেক্টর-ইউনিট সিস্টেম। এই সময় স্টুডিওগুলি একাধিক পরিচালক নিয়োগ করতে শুরু করেন। এটি চলে ১৯১৪ অব্দি।

এরপর আসে সেন্ট্রাল প্রডিউসার সিস্টেম। এরফলে পরিচালক আর প্রযোজনার কাজ সামলাবে না। বরং এই প্রযোজকই সমস্ত বন্দোবস্ত দেখাশুনা করবেন এবং অর্থের দায়িত্বভার নেবেন। এই সময় থেকেই শ্রম বিভাজন আরও কার্যকরি হয়। সমস্ত কাজের পৃথক বিভাগ তৈরি হয়। এতে ফিল্মপিছু খরচও কমে আর অন্যদিকে উৎপাদন পরিমান বাড়ে। কর্মীদের কর্মদক্ষতাও বৃদ্ধি পেয়েছে এই ব্যবস্থার ফলে। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এটি চলেছে। সেই সময় স্টুডিওগুলিকে কারখানা বলা হত। এই ছিল হলিউডের বিখ্যাত স্টুডিও সিস্টেম।

এই শৃঙ্খলের মধ্যে কাজ করেও কিছু চলচ্চিত্র নির্মাতা তাদের নিজস্বতা বজায় রেখেছিলেন।

ক্যামেরাম্যান এডউইন পোর্টার প্রথম প্যারালাল কাটিং-এর প্রবর্তন করেন। যুগপৎ কিন্তু ভিন্ন স্থানে ঘটমান একাধিক ঘটনাকে সমান্তরালভাবে দেখানোর উপায় হল প্যারালাল কাটিং। ওঁর উল্লেখযোগ্য ছবি হল 'দ্য গ্রেট ট্রেন রবারি'।

ডি. ডবলিউ. গ্রিফিথ প্রথম ক্যামেরা স্থানান্তরিত করে শটে বৈচিত্র্য আনেন। মঞ্চের প্রভাব থেকে সিনেমাকে মুক্ত করার ক্ষেত্রেও গ্রিফিথের অবদান অসীম। ওঁর উল্লেখযোগ্য ছবি পূর্ণ দৈর্ঘের 'দ্য বার্থ অফ এ নেশন'।

এরপর আসে হলিউড কমেডির বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং কমেডিয়ানরা। যেমন চার্লি চ্যাপলিন এবং বাস্টার কিটন। এঁদের কর্মদক্ষতা, বৈশিষ্ট্য, অবদান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যদি চ্যাপলিন মুখের অভিব্যক্তির অনবদ্য অভিনয় করতেন তবে প্রস্তর কঠিন মুখ করে অসাধারণ শরীরী অভিনয়ে প্রদর্শন করেন বাস্টার কিটন।

হলিউড স্টুডিও সিস্টেম থেকে জন্ম নেওয়া জ্যঁর-এর অন্যতম ওয়েস্টার্ন। শেষে এই ওয়েস্টার্ন জ্যঁর-এর সুন্দরতম চলচ্চিত্র নির্মাতা জন ফোর্ডকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 'কায়ের দু-সিনেমা' নামক ফরাসী চলচ্চিত্র পত্রিকার সমালোচকদের মতে উনি ছিলেন যথার্থ 'অতার'।

স্টুজিও সিস্টেম, এবং এরমধ্যে কর্মরত প্রথমদিকের এই বিখ্যাত স্রষ্টাদের সৃষ্টি পৃথিবীর চলচ্চিত্র শিল্পকে অপরিসীমভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

২.১০ অনুশীলনী

১. হলিউড স্টুডিও সিস্টেমকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করুন।
২. হলিউড সিনেমায় ডি. ডবলিউ গ্রিফিথের অবদান কী কী?
৩. চার্লি চ্যাপলিনের 'ট্র্যাম্প" চরিত্রটি কীভাবে গড়ে ওঠে আলোচনা করুন।
৪. চার্লি চ্যাপলিনের সবাক চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনা করুন।
৫. বাস্টার কিটনের কমেডির বৈশিষ্ট্য কী ছিল?
৬. জন ফোর্ডের ছবি আলোচনা করে ওয়েস্টার্ন জঁ্যা-এর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন।

২.১১ গ্রন্থপঞ্জী

1. The Classical Hollywood Cinema — Bordwell, Staiger & Thomproa
2. Film Art : An Introduction — Bordwell & Thompson.
3. A History of Film — Jack C. Kallis
4. Comic Mind — Gerald Mast
5. Comedy's Greatest Era : An Article by James Angee

একক ৩ ☐ সোভিয়েত মাস্টার্স

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ প্রারম্ভিক কাল

৩.৪ বলেশেভিক আন্দোলন ও সোভিয়েত সিনেমা

৩.৫ জিগা ভেরতব

৩.৫.১ জিগা ভেরতব ও ফিউচারইজম

৩.৫.২ কিনো-প্রাভদা

৩.৫.৩ কিনোকি

৩.৫.৪ ভেরতবের তথ্যচিত্রাবলী

৩.৫.৫ ওয়ান সিক্সথ্ অফ দ্য ওয়ার্লড

৩.৫.৬ ভেরতব ও কম্যুনিস্ট সরকার

৩.৫.৭ দ্য ম্যান উইথ দ্য মুভি ক্যামেরা

৩.৬ অ্যালেকজাণ্ডার দোভজেনকো

৩.৭ সেভোলোদ পুদভকিন

৩.৭.১ পুদভকিন ও কুলেশভ

৩.৭.২ পুদভকিন বর্ণিত উদাহরণ

৩.৭.৩ পুদভকিনের মন্তাজ

৩.৭.৪ এডিটিং বা মন্তাজের প্রকারভেদ

৩.৭.৫ পুদভকিনের ছবি

৩.৮ **সের্গেই আইজেনস্টাইন**

৩.৮.১ আইজেনস্টাইনের মন্তাজ

৩.৮.২ আইজেনস্টাইনের ছবি

৩.৯ **সারাংশ**

৩.১০ **অনুশীলনী**

৩.১১ **গ্রন্থপঞ্জী**

৩.১ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- সোভিয়েত সিনেমার প্রেক্ষাপট।
- জিগা ভেরতবের তত্ত্ব।
- পুদভকিন ও আইজেনস্টাইনের মন্তাজ তত্ত্ব।
- আইনেজস্টাইন ও পুদভকিনের সমসাময়িক হয়েও দোভজেনকোর ছবি কীভাবে মন্তাজের প্রভাব থেকে মুক্ত এবং অনন্য।

৩.২ প্রস্তাবনা

১৯১৭ সালের ঐতিহাসিক বলশেভিক আন্দোলন সোভিয়েত রাশিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমূল পরিবর্তন আনে। পরিবর্তন আসে সিনেমাশিল্পে। রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাবে বিষয়বস্তু ও গঠনে আসে পরিবর্তন। জন্ম নেয় বিভিন্ন মতবাদের। চরম অব্যবস্থা ও সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে নিজ কাজে একনিষ্ঠ থেকেছেন সেদিনের চলচ্চিত্র নির্মাতারা। জার শাসকদের পরাভূত করে সমগ্র দেশ এক মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। সে হল সমাজতন্ত্রের মন্ত্র। শিল্পী, সাহিত্যিকদের মূল লক্ষ্য ছিল সেই আদর্শকে (মার্ক্সীয়) প্রতিষ্ঠা করা। একেকজন চলচিত্রকার তাঁর মত করে অভীষ্ট পুরণ করার চেষ্টা করেছেন। আকারগত প্রভেদ থাকলেও মূল লক্ষ্য তাঁদের একই। বিভিন্ন রকম মন্তাজ তত্ত্ব পরিবেশন করেন বিভিন্ন চলচ্চিত্রকারেরা। পুদভকিনের মতে, মন্তাজের মূল কাজ দর্শকের ওপর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তার করা। আইজেনস্টাইনের মতে মন্তাজের মূল কথা 'সংঘর্ষ'। কিন্তু এদের মূল বিশ্বাস একই — সিনেমা শিল্পের বৈশিষ্ট্য এবং ভিত্তি মন্তাজ। পৃথিবীর চলচ্চিত্রের ইতিহাসকে, তত্ত্বকে, ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে এই মন্তাজ তত্ত্ব।

৩.৩ প্রারম্ভিক কাল

সোভিয়েত রাশিয়ার মানুষ সিনেমার সাথে প্রথম পরিচিত হয় ল্যুমিয়ের ভাতৃদ্বয়ের ছবি দিয়ে। এরপর ক্রমে রাশিয়াতে ছবি তৈরি শুরু হয়। তখন জারদের শাসনকালে ছবি মূলত ছিল প্রেম, ভালবাসা, রাজা-রাণী কেন্দ্রিক। সাধারণ মানুষের মধ্যে অবশ্য সিনেমা জনপ্রিয় ছিল না। ওরা মূলধারার এই সিনেমার সাথে একটা দূরত্ব অনুভব করত। তাদের জীবনের কথা তারা পর্দায় দেখতে পেত না, সিনেমায় প্রদর্শিত হত এক সম্পূর্ণ অপরিচিত, বিজাতীয় এক জগৎ।

এছাড়া টিকিটের দাম ছিল অস্বাভাবিক বেশি, সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত। সাধারণ মানুষের মধ্যে তখন অশিক্ষার হার ছিল অত্যন্ত বেশি। ফলে ছবির ইন্টার টাইটেল (intertitle) — অর্থাৎ দৃশ্যের মধ্যে লিখিত কোন সংলাপ বা সূত্র — পড়া তাদের কাছে অসম্ভব ছিল, ফলে ছবির অর্থ উদ্ধার করা দুরূহ কাজ ছিল। আর শিক্ষিত সমাজের উপযোগী সাহিত্য-নির্ভর, সাহিত্যঘেঁষা ছবি জনসাধারণকে সিনেমার প্রতি আরও বিমুখ করে তুলেছিল।

৩.৪ বলশেভিক আন্দোলন ও সোভিয়েত সিনেমা

১৯১৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় ঘটে ঐতিহাসিক বলশেভিক আন্দোলন। সমস্ত দেশজুড়ে তখন চরম অব্যবস্থা। এর মধ্যে অধিকাংশ নির্মাতা যারা জার শাসকদের সমর্থক ছিল তারা দেশ ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়। যাওয়ার সময় বহু যন্ত্রপাতি এবং ফিল্ম (film) সাথে নিয়ে যায়। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে পাঁচটা বছর (১৯১৮-১৯২২) লেগে যায়। কিন্তু যুদ্ধের অবসান ঘটতে না ঘটতেই দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব, মহামারী।

জার শাসনের অবসান ঘটিয়ে লেনিনের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হয়। লেনিন বুঝতে পারেন গণ মাধ্যম হিসেবে সিনেমার গুরুত্ব, বুঝতে পারেন যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট রাশিয়ায় সাধারণ মানুষের মনের জোর ফেরাতে সিনেমা অপেক্ষা শক্তিশালী মাধ্যম আর নেই। ১৯২২ সালে শিক্ষা দফতরের কমিশার (Commissar) আনাতোলি লুনাচারস্কির সাথে সিনেমা সংক্রান্ত আলোচনায় লেনিন বলেছিলেন "সব শিল্পকলার মধ্যে আমাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি জরুরি সিনেমা" (Of all the arts, for us film is the most important). তিনি আরও বলেছেন ছবিতে সোভিয়েতের বাস্তব অবস্থাকে দেখানো দরকার এবং সেই ধারার ছবির প্রথম ধরণ হবে নিউজরীল (Newsreel)। সরকারের প্রচার মাধ্যম হিসেবে কাজে লাগাতে ১৯১৯ সালে লেনিন সিনেমাকে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয়করণ করেন। নতুন রাশিয়ায় ছবি নির্মাতাদের অনুশীলনের জন্য মস্কো এবং পেট্রোগ্রাডে তৈরি হয় স্টেট ইনস্টিটিউট অফ সিনেমাটোগ্রাফি (State Institute of Cinematography)। লেনিনের নির্দেশে প্রচারের উদ্দেশ্যে চালু হয় অ্যাজিটেশনাল-প্রোপাগাণ্ডা ট্রেন (agitational-propaganda train) অর্থাৎ আন্দোলন-প্রচারক ট্রেন। এই ট্রেন শিল্পী, লেখক, চলচ্চিত্র নির্মাতাদের নিয়ে রাশিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে আন্দোলনের প্রচার করত। শিল্পীরা আন্দোলনের সপক্ষে হাতে লিখে, এঁকে, মুদ্রণ করে প্রচার পত্র বিলি করতেন জনসাধারণের মধ্যে। কখনও কখনও ট্রেনে মুদ্রণ যন্ত্রও থাকত। চলচ্চিত্র নির্মাতারা যাত্রার ফাঁকে জনজীবনের ছবি তুলতেন, সেই ট্রেনেই সম্পাদনা করে স্টেশনে স্টেশনে ট্রেন থামিয়ে সেই ছবি প্রদর্শিত হত। ট্রেন ছাড়া প্রচারের কাজে নৌকোও ব্যবহার করা হত। বাষ্পচালিত নৌকোর সাথে বড় নৌকো বাঁধা থাকত যেখানে ছবি প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত তো বটেই ৮০০ লোককে একসাথে বসাবার জায়গাও থাকত।

ট্রেনে, নৌকোয় যখন প্রচারের কাজ চলছে, তখন মস্কোর স্টেট ইনস্টিটিউট অফ্ সিনেমাটোগ্রাফিতেও (State Institute of Cinematography) পুরোদমে তথ্যচিত্র তৈরি হচ্ছে। সেখানেও চলচ্চিত্র নির্মাতাদের লক্ষ্য ছিল প্রোলেতারিয়েত (Proletariat) মতাদর্শকে সিনেমার মাধ্যমে তুলে ধরা। বুর্জোয়া মেলোড্রামার (bourgeosic melo-drama) কোন স্থান ছিল না যুদ্ধোত্তর নতুন সোভিয়েত রাশিয়ায়। বিবিধ প্রতিবন্ধকতায় অনমনীয় থেকে চরমপন্থী, মার্ক্সীয় মতবাদে বিশ্বাসী আঁভা গর্দ (Avant-garde) শিল্পীরা কাজ করে গেছেন। একাধারে ফিল্মের প্রাদুর্ভাব, জার শাসকদের পৃষ্ঠপোষনে সমৃদ্ধ প্রোযোজকরা রাশিয়া ছেড়ে যাওয়ার সময় সাথে বিপুল পরিমাণ ফিল্ম নিয়ে যায়। অন্যদিকে খাদ্যাভাব, স্টুডিওগুলির ভগ্নদশা। আলো কাজ করে না, ঘরগুলো স্যাঁতসেঁতে, বড় বড় ক্ষুধার্ত ইঁদুর এদিক থেকে ওদিক দৌড়ে বেড়ায়। শীতকালের অসম্ভব ঠাণ্ডাতেও স্টুডিও গরম রাখার বন্দোবস্ত নেই। তৎসত্ত্বেও নিবেদিত প্রাণ সেই শিল্পীরা সমস্ত কিছুকে তুচ্ছ করে নিজেদের কাজ করে গেছেন। ফিল্মের অভাবে বিদেশ থেকে আগত বিদেশী ছবিগুলিকে পুনরায় সম্পাদনা করত। এই পুনঃসম্পাদনা হত তাঁদের মতাদর্শ অনুযায়ী। এছাড়া পূর্বে ব্যবহৃত ফিল্মের

ফেলে দেওয়া অবশিষ্টাংশ জোগাড় করে ছবি তুলতেন।

সোভিয়েত রাশিয়ার এই আঁভা গার্দ (avant garde) সিনেমার উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র নির্মাতারা হলেন জিগা ভেবতব (Dziga Vertov), অ্যালেকজাণ্ডার দোবজেন্‌কো (Alexander Dobzhenko), সেভোল্‌দ্‌ পুদভ্‌কিন (Vsevold Pudovkin), সের্গেই আইজেনস্টাইন (Sergei Eisenstein) প্রমুখ।

প্রথমে আলোচনা করব জিগা ভেরতবকে (Dziga Vertov) নিয়ে।

৩.৫ জিগা ভেরতব (১৮৯৬-১৯৫৪)

লেনিনের মতালম্বী এবং এই ধারার অন্যতম ধারক ছিলেন ভেরতব। ভেরতবের আসল নাম ডেনিস কফম্যান (Denis Kaufman)। জিগা ভেরতব ওঁর ছদ্মনাম। ছদ্মনামের অর্থ হল ঘূর্ণায়মন লাট্টু অর্থাৎ যে সবসময় ঘুরছে। সোভিয়েত সিনেমার আঁভা গার্দ (avand-garde) আন্দোলনের উনি ছিলেন অন্যতম সক্রিয় শিল্পী।

এই আন্দোলনে লিপ্ত হওয়ার সময় ভেরতব ছিলেন ডাক্তারীর ছাত্র এবং কবি। ফিউচারইজ্‌ম্‌-এ বিশ্বাসী ভেরতব বল্‌শেভিক আন্দেলনের পর মস্কোর সিনেমা কমিটিতে সপ্রতিভ হয়ে যোগ দেন। সিনেমা কমিটির ফিল্ম-উইকলি 'কিনো-নেদেলিয়া'-র (Kino-Nedelia) সম্পাদক হন। ফিল্ম-উইকলি আদতে ছিল নিউজরীল। তখন ভেরতবের বয়স মাত্র বাইশ বছর। চারিদিক থেকে দুর্যোগের, আন্দোলনের, জয়ের যে টুকরো ছবি আসত ভেরতব সেগুলো নিজের মতো করে সম্পাদনা করে সাবটাইটেল (subtitle) যুক্ত করে একটি পূর্ণ তথ্যচিত্র তৈরি করতেন। এই তথ্যচিত্রগুলিই আন্দোলন-প্রচারক ট্রেনে (agitation-propaganda train) করে রাশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে প্রদর্শিত হত। রাশিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামেও এই ছবি দেখানো হত। ভেরতব নিজেও আন্দোলন-প্রচারক ট্রেনের শিল্পী দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ভেরতবের এই নিউজরীল (newsreel) আন্দোলন সহায়ক কাজে খুব বড় ভূমিকা নিয়েছিল। একাধারে আন্দোলনকারীদের যেমন মনোবল বাড়িয়েছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে, একত্রিত রেখেছে, মার্ক্সীয় আদর্শে বিশ্বাসী করে তুলেছে।

৩.৫.১ জিগা ভেরতব ও ফিউচারইজ্‌ম

সিনেমাতে যোগ দেবার আগে থেকেই ভেরতব ফিউচারইজম্‌-এ বিশ্বাসী ছিলেন। ফিউচারইস্ট (Futurist) আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে ইতালীতে। ফিউচারইস্ট আন্দোলনকারীরা তাঁদের শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে যন্ত্রের জয়গান গেয়েছেন। তাঁদের মতে যন্ত্রই শেষ কথা। রুশ চিত্রশিল্পী, নাট্যকার, কবি সবার শিল্পকর্মেই প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতি মুগ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। ভেরতবের ভাষায় "...চলমান এবং চালিত যন্ত্রের কবিতা দীর্ঘজীবি হোক, দীর্ঘজীবী হোক চাকার কাব্য, ইস্পাতের পাখার কাব্য। যন্ত্রের ধাতব শব্দের কাম্যময়তা দীর্ঘজীবী হোক। তড়িৎ প্রবাহের দৃষ্টিআচ্ছন্নকারী ঝলকানি দীর্ঘজীবী হোক।" (...Long live the poetry of moved and moving machinges, the poetry of levers, wheels steel wings, the metalic claneour of movememt and the blinding grimace of the scorching electric current.") যন্ত্র, যান্ত্রিকতাকে কেন্দ্র করে ভেরতবের এই উচ্ছ্বাসের সাথে ইতালীয় ফিউচারইজ্‌ম-এর (Futuraism) 'যন্ত্রের সৌন্দর্যবাদ'-এর (Aesthestics of machine) সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। ১৯১৬ সালে প্রকাশিত 'দ্য ফিউচারিস্ট সিনেমা' (The Futurist Cinema) ঘোষণাপত্রে ওঁরা সমস্ত শিল্পকর্মের মধ্যে সিনেমাকে শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। সিনেমা সম্পর্কে ওঁদের বিজ্ঞপ্তি এরকম ঃ 'সিনেমা একটি স্বয়াত্ত শিল্প। সিনেমা তাই কখনই নাট্য শিল্পকে অনুকরণ করবে না। দৃশ্য মাধ্যম হওয়ার দরুন সিনেমার সর্বাগ্রে উচিত চিত্রশিল্পের বিবর্তনকে পূর্ণ করা। সিনেমাকে বাস্তব থেকে, স্থির চিত্র থেকে, ধর্ম থেকে, সুন্দর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। সিনেমা হতে হবে অসুন্দর, শিষ্ঠাচার বর্জিত, কৃত্রিম ইম্প্রেশনিষ্ট (Impressionist) অর্থাৎ বিশদ বিবরণ বা খুঁটিনাটি বিবরণ না

দিয়ে যখন ভাব প্রকাশ করা হয় এবং সর্বশেষে হতে হবে গতিময়' ('Cinema is an autonomous art, Cinema must therefore never copy the stage; being essentially visual, cinema must, above all, fulfill the evolution of painting, detach itself from reality, from photography, from the graceful and solemn; it must become antigraceful, deforming, impressionistic, synthetic, dynamic, freewording.")।

ভেরতবও মনে করতেন সিনেমা একটি স্বাধীন ও স্বয়ম্ভু শিল্প। থিয়েটার, চিত্র শিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন শিল্পকলা থেকে সিনেমার মুক্ত থাকা উচিত। তিনি আরও মনে করতেন থিয়েটারের আদলে, কাহিনী-নির্ভর ছবি করা কখনই উচিত নয়। সেই ছবিতে কখনই বাস্তবের সঠিক চিত্রায়ণ হয় না। সেই ছবি হয় মোড়কে মোড়া বাস্তবের এক বিকল্প চিত্র। ছবি নির্মাতাদের উদ্দেশ্যে ভেরতব বলেছিলেন বাস্তব জীবন, গদ্য জীবন ("the prose of life") থেকে পালিয়ে যেও না।

ফিউচারইজম্-এ বিশ্বাসী ভেরতব মনে করতেন অসংখ্য একক দিয়ে একটি ছবিকে 'গড়ে' তোলা হয়। ছবিকে তুলনা করেছিলেন 'গৃহের' সাথে আর ছবি নির্মাণের তুলনা করেছিলেন 'স্থাপত্য শিল্পের' সাথে।

৩.৫.২ কিনো-প্রাভদা

১৯২২ সালের মে মাস থেকে ভেরতব কিনো-প্রাভদা (Kino-Pravda) নামে নতুন নিউজরীল তৈরি করা শুরু করেন। মোট ২৩টি (১৯২২-২৫) কিনো প্রাভদা নির্মিত হয়েছিল। কিনো-প্রাভদা কিনো-নেদেলিয়ার তুলনায় বিতর্কমুক্ত ছিল। কিনো-নেদোলিয়া যেমন মূলত ঃ আন্দোলন-প্রচারমূলক ছিল, কিনো-প্রাভদায় ভেরতব অনেক বেশি রুশ জনজীবন দেখিয়ে ছিলেন।

'Kino' শব্দের অর্থ সিনেমা আর 'Pravda' শব্দের অর্থ সত্য (truth)। এই 'কিনো-প্রাভদা' নামটাই এই রকমের ঘোষণাপত্র। লেনিনের পত্রিকা 'প্রাভদা'-র (১৯১২সালে প্রথম প্রকাশিত) অনুপ্রেরণায় ভেরতব ওঁর নিউজরীলের নামকরণ করেছিলেন। প্রোলেতারিয়েতদের (Proletariat) ছবি সত্যের ওপর ভিত্তি করেই তৈরি হয় — ভেরতবেই এই আদর্শের কথাই যেন ঘোষিত হয়েছে 'কিনো-প্রাভদা' নামের মধ্য দিয়ে।

কিনো-প্রাভদা মূলত ঃ তিনটি মানুষের প্রচেষ্টার ফসল। ভেরতব স্বয়ং, স্ত্রী এলিজাবেতা সিলোভা (Yelizaveta Svilova) এবং ভাই মিখেল কফম্যান (Mikhail Kaufman)। এলিজাবেতা ছবি সম্পাদনার কাজ করতেন আর মিখেল ছিলেন ক্যামেরাম্যান। ভেরতব তিনজনের এই দলের নাম দিয়েছিলেন ত্রয়কা (troika) অথবা কাউন্সিল অফ থ্রি (coucil of three)।

কিনো-প্রাভদার একেকটি পর্বে রুশ জনজীবনের দৈনন্দিন চিত্র দেখানো হত। ল্যুমিয়ের ভাইদের ছবির সাথে আপাত সামঞ্জস্য থাকলেও ভেরতবের মূল লক্ষ্য ছিল তৎকালীন রাশিয়ার বাস্তব জীবনকে তুলে ধরা।

শটের (shot) সাথে ইটের আর চলচ্চিত্র নির্মাতার সাথে রাজমিস্ত্রীর তুলনা করে ভেরতব কিনো-প্রাভদার প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'গৃহ নির্মাণকার্যে যেমন ইটের প্রয়োজন তেমনই কিনো প্রাভদার ক্ষেত্রেও লাগে কিছু উপকরণ, ইট দিয়ে ক্রেমলিনের প্রাচীর, উনুন ও আরও অনেক কিছু তৈরি করা সম্ভব। ক্যামেরায় গৃহীত উপকরণ (শট) দিয়েও বিভিন্ন ফিল্ম-বস্তু (film-things) তৈরি করা যায়। সুগৃহ নির্মাণে যেমন ভাল ইট আবশ্যক তেমনি ভাল ছবি নির্মাণে আবশ্যক ক্যামেরায় গৃহীত উৎকৃষ্ট উপকরণ।' (Film-Truth is made of material as a house is mode of bricks. Using bricks, one can make an over, the Krmelin wall, and many other things. From the filmed materials [shots], one can construct different film-things. Just as one needs good bricks to make a good house, so one needs good film materials to organize a good film.")

কিনো-প্রাভদার ক্যামেরা বাজার, স্কুল,কারখানা সর্বত্র পৌঁছে যেত। প্রতিদিনের জনজীবনের ছবি ওঁরা তুলতেন। জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত চিত্র পাওয়ার জন্য অনেক সময় ওঁরা ক্যামেরাকে আড়ালে রেখে ছবি তুলতেন। তবে কোন দৃশ্যই

অভিনীত হত না। নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনার বৈচিত্র্যই তথ্যচিত্রে নাটকীয়তা সৃষ্টি করত।

যে ধরনের ছবি কিনো-প্রাভদায় দেখানো হত, তা হল — যুদ্ধের ট্যাঙ্ক দিয়ে রাস্তা সমান করা হচ্ছে বিমানবন্দরের জন্য। মস্কো শহরের ট্রাম-লাইন সারানো হচ্ছে। হাসপাতালে যুদ্ধে আহত শিশুদের চিকিৎসা হচ্ছে। এই শটের সাথে ভেরতব একটি দুর্ভিক্ষের শট যুক্ত করে ছবিকে আরও মর্মস্পর্শী করে তুলেছেন। কিনো-প্রাভদার কুশলীরা গৃহ নির্মাণের ছবি বিশেষ করে পছন্দ করতেন। একাধারে এই দৃশ্য তাঁদের মতাদর্শের চিত্ররূপ, অন্যদিকে যুদ্ধ-ক্লিষ্ট রাশিয়ার মানুষের মনোবল ফেরাতে এই গঠন-মূলক কাজের দৃশ্য খুবই কার্যকরি ছিল।

৩.৫.৩ কিনোকি

ভেরতবকে কেন্দ্র করে সমাজতন্ত্র মতালম্বী কিছু স্বার্থত্যাগী, অল্পবয়স্ক চলচ্চিত্র নির্মাতা ও কলা-কুশলী একত্রিত হন। ভেরতব এঁদের নাম দেন কিনোকি (Kinoki)। 'Kinoki' শব্দটি দুটি শব্দ থেকে গঠিত। 'Kino' (কিনো) অর্থ সিনেমা, 'oko' (ওকো) অর্থ চক্ষু, অর্থাৎ সিনেমা চক্ষু বা cine-eyes। ভেরতব, এলিজাবেতা ও মিখেল ব্যতীত অন্যান্য যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন ইভান বেলিয়াকোভ (Ivan Beliakov), পিটর জোটোভ (Petr Zotov), ইলিয়া কোপালিন (Ilia Kopalin), অ্যালেকজান্দার লেমবার্গ (Alexander Lemberg), বরিস ফ্র্যান্টসিশন (Boris Frantsisson) এবং বরিস বারাণ্টসিভিচ (Boris Barantsievich)। এঁরা বিশ্বাস করতেন সিনেমা একটি সর্বজনের ভাষা। দৃশ্যের মাধ্যমে সিনেমা ভাব প্রকাশ করে, ফলে দেশের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে সিনেমা সর্বপ্রিয় ও সর্বজনগ্রাহ্য হতে পারে। এঁরা মনে করতেন সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত শ্রমিক শ্রেণীর কথা প্রচার করাই সিনেমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। জিগা ভেরতব নির্দেশ দিয়েছিলেন যে বুর্জোয়া মেলোড্রামা নয়, দৈনন্দিন ঘটনাবলী সম্বলিত তথ্যচিত্র নির্মাণ করতে হবে।

কিনোকি স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্রে ভেরতব দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রথমটি হল ক্যামেরার বহুমুখীতা ও অতিমানবিক ক্ষমতা। ভেরতবের মতে, মানুষের চোখের সীমাবদ্ধতা আছে, কিন্তু ক্যামেরার নেই। মানুষের গতিবিধির সীমাবদ্ধতা আছে, ক্যামেরার নেই। স্থান কালের বাধা অতিক্রম করতে পারে। একটি ঘোষণাপত্রে ভেরতব বলেন, মেশিন সর্বশক্তিমান, "মেশিনকে জায়গা করে দাও" ("Make way for the machine!")। আমাদের চোখের আর উন্নতি সম্ভব নয় কিন্তু ক্যামেরার উন্নতিসাধন সব সময়ই সম্ভব।

অন্যত্র লিখেছিলেন, "...আমি সিনেমা-চোখ — আমি যান্ত্রিক চোখ। আমি, একটি যন্ত্র, তোমাকে একটি জগৎ দেখাব যে রকম আমি দেখব।

চিরকালের জন্য মানুষের চলৎশক্তিহীনতাকে ঝেড়ে ফেলে আমার গতিবিধি এখন অবাধ। লক্ষ্যবস্তুর নিকটে যাই, দূরে সরে আসি, তার তলা দিয়ে হামা দিয়ে যাই, তার ওপর ঝাঁপ দিই। ছুটন্ত ঘোড়ার সাথে ছুটি আমি, ভিড় ঠাসা জনতা ভেদ করে যাই, ধাবমান সৈন্যের মুখোমুখি ছুটে যাই; পরমুহূর্তে মুখ ঘুড়িয়ে বিমানে করে উড়ে যাই। বস্তুর সাথে সমানতালে উঠি, পড়ি আমি।

সেকেণ্ডে ১৬-১৭ ফ্রেমের বাঁধা থেকে মুক্ত আমি, স্থান কালের গণ্ডি থেকে মুক্ত আমি, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র গতিশীল আমি।

জগতের একটা নতুন অর্থ সৃষ্টি করা আমার লক্ষ্য। জগতকে আমি নতুনভাবে ব্যাখ্যা করব যা তোমার সম্পূর্ণ অজানা।

(...I am cinema-eye—I am machanical eye. I, a machine, show you a world such as only I can see.

From now on and for always I cast off human immobility, I move constantly, I approach & pull away from subject, I creep under them, I leap onto them, I move alongside the mouth of

a galloping horse, I cut into a crowd, I run before charging troops, I turn on my back, I take off with an airplane, I fall and rise with falling & rishing bodies.

Freed from the tyranny of 16-17 images per second, freed from the framework of space and time, I coordinate any and all points of the universe, wherever I may record them.

My mission is the creation of a new perception of the world. Thus I decipher in a new way or world unknown to you.)

ক্যামেরার বহুমুখীতার পাশাপাশি ভেরতব সম্পাদনার গুরুত্বের কথাও বলেছিলেন।

ভেরতবের মতে, "But it is not enough to show bits of truth on the screen, separate frames of truth. These frames must be thematically organized so that the whole is also a truth." অর্থাৎ বাস্তবের শুধু কিছু টুকরো ছবি দেখালে হবে না, সেগুলোকে যুক্ত করে একটি অর্থবহুল সত্যনিষ্ঠ ছবি করতে হবে। ভেরতবের কিনো-প্রাভদার প্রতিটি পর্বে এই বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে। ভেরতব সম্পাদনার কাজ সম্পূর্ণ নিজের আদর্শ অবলম্বনে করতেন। তাঁর ব্যবহৃত কৌশল, সম্পাদনা পদ্ধতি সমালোচিত হলেও বহুক্ষেত্রে খুবই কার্যকরি হয়েছে। যেমন কিনো-প্রাভদার ২৪নং পর্বে, লেনিনের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকীতে দেখা যায় মানুষ সারিবদ্ধভাবে লেনিনের কফিনের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। এর মধ্যে হঠাৎ দেখা যায় পর্দায় এক কোণে লেনিন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছেন। নিঃসন্দেহে এটি একটি পূর্বে গৃহীত শট। কিন্তু এই দৃশ্য মিশ্রণ সাধারণ মানুষকে নাড়া দিয়ে যায়।

৩.৫.৪ ভেরতবের তথ্যচিত্রাবলী

সিনেমা-আই (Cinema-eye) — ১৯২৪ সাল ফরওয়ার্ড সোভিয়েত (Forward, Soviet), ১৯২৬ সাল ওয়ান সিক্স্‌থ অফ দ্য ওয়ার্লড (One sixth of the World), ১৯২৬, দ্য ইলেভন্‌থ্ ইয়ার (The Eleventh Year), ১৯২৮, দ্য ম্যন উইথ দ্য মুভি ক্যামেরা (The Man with the Movie Camera), ১৯২৯।

৩.৫.৫ ওয়ান সিক্স্‌থ্ অফ্ দ্য ওয়ালর্ড

ওয়ান সিক্স্‌থ অফ দ্য ওয়াল্‌র্ড তথ্যচিত্রটি রাশিয়ায় এবং বিদেশে বেশ জনপ্রিয় হয়। ছবিটিতে সোভিয়েত রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের বৈচিত্রময় ছবি দেখা গেছে। বিভিন্ন বৃত্তির মানুষ নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। ভেরতব এদের সকলকে আহ্বান করেছেন ছবির মধ্য দিয়ে। তাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন তারা প্রত্যেকে পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশের অধিকারী।

৩.৫.৬ ভেরতব ও কম্যুনিস্ট সরকার

ভেরতবের এই তথ্যচিত্রটি জনপ্রিয় হলেও ভেরতব তখন ক্রমশ জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিল। লেনিনের উত্তরসূরি স্টালিন তখন ক্ষমতায় আসীন। ভেরতবের চরমপন্থী মানসিকতার দরুন সরকারের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। স্টালিনও লেনিনের মত সিনেমায় আগ্রহী ছিলেন কিন্তু স্টালিন সিনেমার ওপর আরও বেশি সরকারী অধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯২৮ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নির্ধারিত হয় যে প্রত্যেকটি ছবির একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে হবে। সরকারি অনুদানের জন্য সমস্ত চিত্রনাট্য সরকারকে আগে জমা দিতে হবে। এতে ভেরতব খুবই অসুবিধায় পড়ে যান। তথ্যচিত্রের কি চিত্রনাট্য হওয়া সম্ভব? কিন্তু ভেরতবের অনমনীয় মনোভাবের দরুন তাঁকে পরিকল্পনা-বিরোধী বলা হয়। অবশেষে ভেরতব সরকারের শর্ত মেনে নেন। তবে চিত্রনাট্য না বলে শ্যুটিং-পূর্ব পরিকল্পনার নাম দেন অ্যানালিসিস (analysis) অর্থাৎ বিশ্লেষণ। এখানে ভেরতব নিজের পরিকল্পনা এবং তৎপ্রয়োজনে শট ও সিকোয়েন্সগুলির উল্লেখ করে দেন।

৩.৫.৭ দ্য মান উইথ দ্য মুভি ক্যামেরা

১৯২৯ সালে ভেরতব তৈরি করেন ওঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত ছবি 'দ্য ম্যান উইথ দ্য মুভি ক্যামেরা (The man with the movie camera)। এই ছবির প্রোটাগনিস্ট (Protagonist) অর্থাৎ মুখ্য চরিত্র ছিল চিত্রগ্রাহক বা ক্যামেরামান।

ভেরতবের ফিউচারিস্ট ভাবনার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছিল এই ছবিটিতে। ক্যামেরার অবাধ গতিবিধি এবং অতিমানবিক বহুমুখীতা এই ছবিতে দেখা গেছে। ক্যামেরা কাঁধে মিখেল কফম্যান এই ছবির মুখ্য চরিত্র। কখনও ক্যামেরা ব্রিজের ওপর, কখনও মেঝেতে শোওয়া ছবি তোলার জন্য। কখনও গাড়িতে, কখনও ট্রেনে। কখনও পার্কে একা, কখনও ভিড়ের মাঝখানে। মিখেল আসলে রুশ জনজীবনের ছবি তুলছিলেন। ক্যামেরার এই গতিবিধির দৃশ্যাবলীর দ্বারা ভেরতব দেখাতে চেয়েছিলেন যে মানুষ যেখানে পৌঁছতে পারে না, ক্যামেরা পারে। 'দ্য ম্যান উইথ দ্য মুভি ক্যামেরা' ছবিতে, ছবির শ্যুটিং এবং ছবি দুই-ই একসাথে দেখা যায়।

দৃশ্য গ্রহণের পাশাপাশি এখানে সম্পাদনাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অসংখ্য এককের যথার্থ সংযোজনার ফলে একটি অর্থবহুল ও কাঙ্ক্ষিথ ছবি তৈরি হয় — কনস্ট্রাক্টিভিজ্‌ম (Constructivism)-এর এই তত্ত্ব যে ভেরতবকে অনুপ্রাণিত করেছিল তা সহজেই অনুমেয়। ছবির একটি সিকোয়েন্সে চলমান দৃশ্যের মাঝে হঠাৎ এক সারি স্থির চিত্র। এরপর দেখা যায় একটি ৩৫ এম এম (35 mm) ফিল্মে ওই চিত্রগুলি সম্পাদক এলিজাবেতা সিলোভা সম্পাদনার টেবিলে বসে দেখছেন। এরপর 35mm ফিল্মের স্থির চিত্রগুলি চলমান দৃশ্য হিসেবে পর্দায় দেখা যায়।

ছবিতে কিছু অপ্রচলিত দৃশ্য যুক্ত করেছিলেন, যেমন — এক মহিলার কাপড় কাচার দৃশ্যের সাথে যুক্ত হয়েছে জানালা ধোওয়ার দৃশ্য; ছাপাখানায় কাগজের বিশাল চাকা গড়িয়ে যাওয়ার সাথে যুক্ত করা হয়েছে বাঁধের জল পড়ার দৃশ্য। ভেরতব এর মধ্যে দিয়ে দু'ধরনের কাজের মধ্যে সমান্তরাল রেখা টানার চেষ্টা করেছেন। একটি দৃশ্যে পরপর বিবাহ, মৃত্যু, জন্ম, বিবাহ বিচ্ছেদের শট যুক্ত করেছেন। একটি দৃশ্যে ট্রাইপডের (Tripod) উপর ক্যামেরা প্রায় প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের সমান দেখতে লাগে আর মিখেল কফম্যান এক দল লোকের ভিড়ে দাঁড়ানো যাদের অতি ক্ষুদ্র দেখতে লাগছে। অত্যন্ত অর্থপূর্ণ এই দৃশ্য। ছবি শেষে ক্যামেরা ও ট্রাইপড দুইই দশর্কের উদ্দেশ্যে অভিবাদন করে।

ভেরতবের এই ছবি খুবই বির্তকের সৃষ্টি করে। ভেরতব মনে করতেন প্রত্যেক চলচ্চিত্র নির্মাতারই উচিত ক্যামেরায় গৃহীত বাস্তব চিত্রগুলিকে নিজের ব্যক্তিগত মতাদর্শ অনুযায়ী ব্যাখ্যা করবে এবং সেই অনুযায়ী সম্পাদনা হবে। কিন্তু অধিকাংশ ফিউচারইজ্‌ম্ ও কনস্ট্রাকটিভিজম মতালম্বী চলচ্চিত্র নির্মাতা দ্বিমত পোষণ করতেন। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতেন বাস্তব-নির্ভর তথ্যচিত্রে ব্যক্তিগত মতামতের কোন স্থান নেই। এখানে বাস্তব চিত্র অনুযায়ী তথ্যচিত্র নির্মীত হবে।

'দ্য ম্যান উইথ দ্য মুভি ক্যামেরা' ছবিতে বিভিন্ন কোণ থেকে দৃশ্য গ্রহণ ও সম্পাদনার ধরণে ভেরতবের নিজস্ব মতামত অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে উপস্থিত। এছাড়া কৌশলের অত্যধিক প্রয়োগ, নির্দিষ্ট ভাবনা ও বক্তব্যের অভাব এবং তার সাথে এই অপ্রচলিত দৃশ্য সংযোজন ছবিটিকে দুর্বোধ্য ও জটিল করে তুলেছে। দর্শক ও সিনেমা জগতের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ধন্দে পড়ে যান ভেরতবের বক্তব্য অনুধাবন করতে। যদিও ছবিটি অত্যন্ত চমকপ্রদ কিন্তু দেশে বিদেশে শংসার থেকে সমালোচনাই বেশি কুড়িয়েছে।

এই ছবিতে ভেরতব ওঁর পূর্বকথিত মতেরও লঙ্ঘণ করেছেন। যেমন ভেরতব বলতেন কোন দৃশ্য অভিনীত হবে না। ক্যামেরা শুধু চলমান জীবনের ছবি তুলবে। কিন্তু এখানে ক্যামেরাসহ মিখেল কফম্যানকে চিত্রগ্রাহক হিসেবে বহু দৃশ্যে দেখা গেছে। এই দৃশ্যগুলি তুলেছিলেন ওঁর সহকারীরা। যদিও এখানে ক্যামেরার অসীম কর্মদক্ষতাও চিত্রগ্রাহকের কর্মকাণ্ড ও গুরুত্ব বোঝাতে ক্যামেরাসহ মিখেল কফম্যানকে দেখানো হয়েছে, তবুও এই দৃশ্যগুলি তো অভিনীত!

সিনেমায় শব্দ আসার পর ভেরতবের গুরুত্বপূর্ণ ছবি হল এনথুসিয়াজম (Enthusiasm), সিম্‌ফনি অফ দ্য দনবাস (Simphony of the Donbas) দুটোই ১৯৩১ সালে তৈরি। ১৯৩৪ সালে তৈরি করেন থ্রি সঙস্ অফ লেনিন (Three Songs of Lenin)।

৩.৬ অ্যালেক্‌জাণ্ডার দোভ্‌জেন্‌কো

ইউক্রেনের এক দরিদ্র, অশিক্ষিত চাষী পরিবারে জন্ম অ্যালেক্‌জাণ্ডার দোভ্‌জেন্‌কোর। দোভ্‌জেন্‌কো প্রথমে একজন চিত্রশিল্পী ছিলেন।

ওঁর ছবি সমকালীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের থেকে অন্যরকম ছিল। মার্ক্সীয় মতবাদে বিশ্বাসী দোভজেনকোর ছবিও রাশিয়ার মানুষের কথাই বলেছে, কিন্তু ওঁর ছবিতে মন্তাজের আধিক্য ছিল না। দোভ্‌জেন্‌কো মন্তাজের চমকে বিশ্বাসী ছিলেন না। বরঞ্চ ওঁর ছবিতে দেখা গেছে লংশট, বড় সিন, বড় সিকোয়েন্স। যখন ভেরতব তাঁর ছবিতে বাস্তবের রূঢ় চেহারাকে দেখাচ্ছিলেন তখন দোভজেনকোর ছবি ছিল অতীন্দ্রিয় রহস্যময়তায় ঢাকা। বড় বড় সিকোয়েন্সগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। দোভজেনকোর কাছে শটের সংযোজনার থেকে বেশি আকর্ষণীয় ছিল সিন্ আর সিকোয়েন্সের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংযোজনা। কখনও এক শটেই একটি সিন হয়েছে। তৎকালীন রুশ ছবিতে যা অভাবনীয় ছিল। কোন কোন সিকোয়েন্সে পরস্পর বিরোধী দৃশ্যের সংযোজনায় অদ্ভুত রহস্যময়তার সৃষ্টি হয়েছে, অন্তর্নিহিত অর্থ লুক্কায়িত থেকেছে।

দোভজেনকোর ছবির অতীন্দ্রিয়তা ছাড়া আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল চিত্রশিল্পের প্রত্যক্ষ প্রভাব। বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে Wide Angel shot ব্যবহার করেছেন ক্যানভাসের মত। লং টেক-এ (Long take) অনেকগুলি ঘটনা একসাথে ঘটছে, এবং সব মিলে নিগূঢ় অর্থ সৃষ্টি হয়েছে। চিত্র শিল্পের একটি নিস্পন্দ মুহূর্তের মত দৃশ্যও দোভ্‌জেন্‌কোর ছবিতে দেখা গেছে। যেমন আর্থ (Earth) ছবিটিতে ফলে ভরা গাছের একটি দৃশ্য নিস্পন্দতা ও সীমাহীন কালের প্রতীক। দোভজেনকোর ছবিতে বারে বারে এসেছে ইউক্রেনের গ্রামাঞ্চলের দৃশ্য যেখানে দেখা যায় দূরে দিগন্তের রেখা, মাথার ওপর বিপুল আকাশ আর শূন্য প্রান্তরে হেঁটে যাচ্ছে ক্ষুদ্র আকারের এক দল মানুষ। দোভজেনকোর ছবি আইজেনস্টাইনের ছবির মত নাটকীয় বা পুদভকিনের ছবির মত বর্ণনামূলক নয়, বরঞ্চ অনেক বেশি কাব্যিক। ওঁর ছবিতে ব্যবহৃত রূপক বা প্রতীক অনেক বেশি মানুষেব জীবনের কাছাকাছি, মাটির কাছাকাছি, কখনই যা কৃত্রিম মনে হয় না।

দো্জেন্‌কোর ছবি আন্দোলন-প্রচারমূলক নয়। ওঁর ছবিতে রয়েছে প্রকৃতির কথা, শাশ্বত জীবনের কথা। আর্থ (Earth) ছবিটিতে দোভ্‌জেন্‌কো বলেছেন, একজন বৃদ্ধের মৃত্যু (শান্তিতে) হবে সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু একজন যুবকের (যুদ্ধের ফলে) মৃত্যু (প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারণ) হওয়াটা অন্যায়। তবে মৃত্যুর পরই জীবন আসে। আর্থ (Earth) ছবিটিতে একটি সুন্দর সিকোয়েন্স আছে যেখানে মানুষের জীবন, কর্ম, মৃত্যু, প্রকৃতি সব একাকার হয়ে গেছে। ভাসিলির (Vasily) যখন অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া চলছে তখন এক মহিলাকে দেখা যাচ্ছে সন্তানের জন্ম দিচ্ছে আর একই সময় ভাসিলির সহকমরেডরা ওঁর অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ছবির শেষে শরতের বৃষ্টিকে প্রথমে মনে হয় অশ্রুধারা, কিন্তু এই ধারাই জীবনদায়ী, শস্যকে পূর্ণতা এনে দেয় যখন দেখা যায় ক্ষেত ভরা শস্যের ওপর ঝরে পড়ছে।

বলশেভিক সরকারের প্রতি আনুগত্য সত্ত্বেও দোভজেনকো তাঁর মানবতাবোধের দরুন নতুন ও পুরাতন দুই-এর প্রতি সমান সহানুভূতিশীল ছিলেন। প্রকৃতি বরাবর তাঁর ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে।

মস্কো শহরে মুক্তিলাভের পর অত্যন্ত সমালোচিত হয়। সমালোচকদের মতে ছবিটি 'আন্দোলনবিরোধী' এবং 'পরাজিত মনোভাবসম্পন্ন'। 'আর্থ'-এর ধীর গতি, অতীন্দ্রিয়তা, রহস্যময়তা, দুর্বোধ্যতা এবং দৃশ্যের অত্যধিক আধিক্য এবং নির্ভরতার জন্য দোভজেনকো সমালোচিত হন। বলা হয় কম্যুনিস্ট সরকারের আদর্শ, নীতি, মতবাদ প্রচার করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ এই ছবি।

- **দোভজেন্‌কোর চিত্রাবলী :**

১৯২৮ সালে জেনিগোরা (Zrenigora), ১৯২৯ সালে তৈরি করেন আর্সেন্‌ল্ (Arsenal) এবং ১৯৩০ সালে আর্থ (Earth)। তিনটি চলচ্চিত্রই নির্বাক।

● **দোভজেন্‌কোর অনন্যতা :**

দোভ্‌জেন্‌কোর সমকালীন অন্যান্য চলচ্চিত্র নির্মাতারা যখন বলশেভিক আন্দোলন, তৎকালীন যুদ্ধোত্তর রাশিয়ার বাস্তব জীবন এবং মন্তাজের জারিজুরি নিয়ে ব্যস্ত তখন দোভ্‌জেন্‌কো এক অনন্য ব্যতিক্রম। দোভ্‌জেন্‌কো ওঁর ছবিতে বলেছেন নিত্য, শাশ্বত জীবনবোধের কথা। তিনি মানুষের আর প্রকৃতির সৌন্দর্যে রোমাঞ্চিত হয়েছেন আর সেই সৌন্দর্যকে ছবিতে তুলে ধরতে ক্যামেরা এবং চিত্র গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

৩.৭ সেভোলোদ পুদভ্‌কিন

সিনেমার জগতে আসবার আগে পুদভ্‌কিন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। বলশেভিক আন্দোলনের পর কিছুকাল একটি সামরিক রসায়নাগারে কাজ করেছিলেন। কিন্তু এই কাজে তিনি আনন্দ পেতেন না। পুদভ্‌কিন তখন নিজের পেশা নিয়ে খুবই অসুখী এবং পরিবর্তন করে শিল্পকলায় যোগ দেবেন কিনা ভেবে দ্বিধান্বিত ছিলেন, এই দোলাচালের মধ্যে ডি. ডবলিউ. গ্রিফিথ (D.W. Griffith) পরিচালিত ইন্‌টলারেন্স (Intolerence) ছবিটি দেখে বুঝতে পারেন চলচ্চিত্র শিল্পেই উনি যোগ দেবেন। পুদভ্‌কিনের বয়স তখন ২৭ বছর।

৩.৭.১ পুদভ্‌কিন ও কুলেশভ

চলচ্চিত্রের প্রশিক্ষণ নিতে পুদভ্‌কিন মস্কোর স্টেট স্কুল অফ সিনেমাটোগ্রাফিতে (State school of Cinematography) যোগ দেন। সেখানে ওঁর শিক্ষক ছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক লেভ কুলেশভ (Lev Kuleshov)। শিক্ষানবীশ থাকাকালীন পুদভ্‌কিন কুলেশভ-এর থেকে খুবই প্রভাবিত হন। কুলেশভ-এর 'মন্তাজ' (Montage) সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় পুদভ্‌কিন কুলেশভের সাথে ছিলেন। ওঁর ফিল্ম টেকনিক এণ্ড ফিল্ম অ্যাক্টিং (Film Technique And Film Acting) বইটিতে পুদভকিন এই বিষয়ে লিখেছেন, "...It was from him (Kuleshov) that I first learned of the meaning of the word "montage", a word which played such an important part in the development of our film-art." অর্থাৎ কুলেশভের কাছ থেকেই প্রথম পুদভ্‌কিন 'মন্তাজ' সম্পর্কে অভিহিত হন। চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নে যে মন্তাজের অবদানই সবচেয়ে বেশি। চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে কুলেশভ বলেছিলেন, "In every art there must be firstly a material, and secondly a method of composing this material specially adopted to this art." অর্থাৎ, সব শিল্পের ক্ষেত্রেই একটা প্রাথমিক উপকরণ আবশ্যক আর সেই উপকরণকে সুনিব্যস্ত করতে প্রয়োজন সেই শিল্পের উপযোগী একটি পদ্ধতির। কুলেশভের এই কথাকে উদ্ধৃত করে পুদভকিন বলেছেন, "...film-art does not begin when the artists act and the various scenes are shot — this is only the preparation of the material. Film-art begins from the moment when the director begins to combine and join together the various pieces of film. By joining them in various combinations in different orders, he obtains differing results." অর্থাৎ কুলেশভ ও পুদভকিনের মতে অভিনেতার অভিনয় এবং দৃশ্যের চিত্রগ্রহণের দ্বারা ছবির উপকরণ সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু তখন ফিল্ম শিল্প নয়। ফিল্ম তখনই শিল্প সম্মত হয় যখন পরিচালক ফিল্মের বিভিন্ন অংশগুলিকে একত্রিত করে যুক্ত করেন। আবার এই অংশগুলিকে নানান ক্রমানুযায়ী, বিভিন্নভাবে যুক্ত করে পরিচালক হরেক রকম ফলাফল পেতে পারেন।

৩.৭.২ এই তত্ত্বের সমর্থনে পুদভ্‌কিন বর্ণিত উদাহরণ

ফিল্মের তিনটি টুকরো আছে। একটিতে দেখা যাচ্ছে একটি হাস্যোজ্জ্বল মুখ, দ্বিতীয়টিতে ভীত সন্ত্রস্ত মুখ, তৃতীয়টিতে

একটি হাতে তাক করে ধরা একটি রিভলভার (revolver)। দু'ভাবে এই তিনটি ফিল্মের টুকরোকে সাজানো যেতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে প্রথমে থাকছে হাস্যোজ্জ্বল মুখ, তারপর রিভলভার, সবশেষে ভীত মুখ। অন্যভাবে সাজিয়ে প্রথমে ভীত মুখ, তারপর রিভলভার, এবং তারপর হাস্যোজ্জ্বল মুখ। প্রথম ক্ষেত্রে মনে হয় ব্যক্তিটি ভীরু, রিভলভার দেখে ভীত, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রিভলভার দেখেও ব্যক্তিটি ভীত নয়, সে সাহসী। অর্থাৎ বিন্যাসের রকমফের ঘটলে অর্থ বদলে যায়।

পুদভ্‌কিন আরেকটি উদাহরণ দিয়েছেন। কুলেশভের সহযোগী হিসেবে এই পরীক্ষাটিতে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই পরীক্ষাটিতে কুলেশভ ও পুদভকিন বিখ্যাত রুশ অভিনেতা ইভান মোস্‌জুখিন-এর (Ivan Mosjulchin) একাধিক ক্লোজআপ শট (Close-up shcrt) নিয়েছিলেন। প্রত্যেকটিতে মোস্‌জুখিনের মুখ অভিব্যক্তিহীন। এই ছবিগুলির সাথে বিভিন্ন বিষয়ের ছবি যুক্ত করেন ওঁরা। একটিতে মোস্‌জুখিনের শটের পর টেবিলের ওপর এক পাত্র স্যুপের শট যুক্ত করেন ওঁরা। আরেকটি ক্লোজ-আপের সাথে কফিনে শায়িত এক মৃত মহিলার শট যুক্ত করেন। তৃতীয় ক্ষেত্রে যুক্ত করেন খেলনা নিয়ে একটা বাচ্চা মেয়ের খেলার দৃশ্য। এরপর দর্শকদের সামনে প্রদর্শিত হয়। তাঁরা এই পরীক্ষা সম্বন্ধে অভিহিত ছিলেন না। তাঁরা মোসজুখিনের অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁদের মতে প্রথমটিতে মোস্‌জুখিন স্যুপ খেতে ভুলে গেছেন দেখে নিজেই গম্ভীর। দ্বিতীয়টিতে কফিনে মৃত মহিলার দিকে গভীর বেদনাসহ তাকিয়ে আছেন। তৃতীয়টিতে বাচ্চা মেয়েটিকে দেখে ওঁর মুখ আনন্দে ভরে উঠেছে। দর্শকদের প্রতিক্রিয়াই প্রমাণ করে পরীক্ষার সাফল্য কারণ প্রত্যেকটি শটেই মোস্‌জুখিনের মুখ সমান অভিব্যক্তিহীন ছিল।

৩.৭.৩ পুদভ্‌কিনের মন্তাজ

পুদভ্‌কিনের মতে সিনেমা শিল্পের ভিত্তি হল এডিটিং (Editing) বা সম্পাদনা (The foundation of film art is editing)। ওঁর মতে 'এডিটিং'-এর অর্থ শুধুমাত্র দুটি শট সংযুক্তকরণ নয়। এডিটিং হল সেই মূল সৃজনীশক্তি যার দ্বারা প্রাণহীন চিত্র (বিচ্ছিন্ন শট) সজীব হয়, চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়।

সাহিত্যের সাথে তুলনা করে পুদভ্‌কিন বলেছেন, একজন সাহিত্যিকের কাছে একেকটি শব্দ হচ্ছে তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল উপকরণ। প্রত্যেকটি শব্দের বিভিন্নরকম অর্থ আছে। সেই বিভিন্ন অর্থের উন্মেষ ঘটে বাক্যে সেই শব্দের ব্যবহার অনুযায়ী। একজন চলচ্চিত্র নির্মাতার কাছে একটি শট হচ্ছে সাহিত্যের একটি শব্দ। উনি আরও বলেছেন, একটি ছবি ক্রমে গড়ে ওঠে। ওঁর ভাষায় "film is not 'shot', but 'builf'." টুকরো টুকরো সেলুলয়েড যুক্ত করে একটি ছবি গঠিত হয়। এই সেলুলয়েড হচ্ছে ছবি তৈরির উপকরণ (raw material)। অভিনেতার অভিনয়ও শুধু উপকরণ। কিন্তু সেলুলয়েডের যুক্তকরণই যথেষ্ট নয়। একজন পরিচালকের সেলুলয়েডের অংশের দৈর্ঘ্যকে নিয়ন্ত্রণ এবং নিজ উদ্দেশ্যের উপযোগী করা একান্তই আবশ্যক। কারণ এর দ্বারা ছবির লয় সৃষ্টি হয় এবং দর্শকের মনকে প্রভাবিত করে। পুদভ্‌কিনের কথায়, "...editing is not merely a method of the junction of separate scenes or pieces, but is a method that controls the 'psychological guidance' of the spectator."

৩.৭.৪ এডিটিং বা মন্তাজের প্রকারভেদ

দর্শকের মনে প্রভাব বিস্তার করতে কার্যকরি পাঁচরকম এডিটিং (editing) বা মন্তাজ পদ্ধতির কথা পুদভকিন বলেছেন।

১। কনট্রাস্ট (Contrast) :- বৈষম্য প্রদর্শনের জন্য দুটি দৃশ্যের বা সিকোয়েন্সের (Sequence) মধ্যে তুলনা করাকে পুদভ্‌কিন বলেছেন কনট্রাস্ট এডিটিং মেথড (Contrast Editing Method)। উদাহরণস্বরূপ পুদ্‌ভকিন বলেছেন, এক অনাহারী ব্যক্তির দুর্দশার কথা দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে সেই ব্যক্তির দৃশ্যের সাথে এক অর্থবান ব্যক্তির বোধহীন ঔদারিকতার দৃশ্য যুক্ত করা প্রয়োজন। এর দ্বারা এক চূড়ান্ত বৈষম্য প্রদর্শিত হবে।

২। প্যারাল্‌ল্‌ইজম (Parallelism) :- ভিন্ন স্থানে কিন্তু একই সময়ে ঘটমান দুটি সম্পূর্ণ সংযোগহীন ঘটনাকে সমান্তরালভাবে দেখানোকেই বলে প্যারাললইজম (Parallelism)।

৩। সিম্বল্‌ইজ্‌ম (Symbolism) :- এই এডিটিং (editing) পদ্ধতিটি পুদভ্‌কিন্‌ বুঝিয়েছেন একটি উদাহরণের সাহায্যে। আইজেনস্টাইন (Eisenstein) পরিচালিত স্ট্রাইক্‌ (Strike) ছবিটিতে শ্রমিকদের হত্যার দৃশ্যের মাঝে কসাইখানায় ষাঁড়ের মুণ্ডচ্ছেদের দৃশ্য দেখা যায়। পরিচালক বোঝাতে চেয়েছেন যে, যে রকম ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে, নির্মমভাবে কসাইখানায় পশু হত্যা হয়, সেই একইভাবে শ্রমিকদের হত্যা করা হচ্ছে। এই বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা দর্শকের বোধে এক বিমূর্ত ভাব জাগতে সফল হন পরিচালক।

৪। সিমাল্‌ট্যানীটি (Simultaneity) :- দুটি পরস্পর সম্পর্কিত যুগপৎ ঘটমান ঘটনার ক্রম বর্ধমান অবস্থাকে সমান্তরালভাবে দেখানোকে বলা হয় সিমালট্যানীটি (Simultaneity)। হলিউড ছবির শেষে বিখ্যাত 'চেজ সিন' (Chase Scene) যেখানে হিরো ভিলেনের পিছু নেয় গাড়িতে সেখানে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এর দ্বারা দর্শকের মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয়। ভারতীয় হিন্দি মূলধারার ছবিতেও এই বিশেষ সম্পাদনা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় এবং একইভাবে।

৫। লিট-মোটিফ (Leit-motif) :- অর্থাৎ একই বিষয়ের পুনরুল্লেখ। কখনও কখনও চিত্রনাট্যকার বা পরিচালক ছবির মূল ভাবনাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে কোন দৃশ্যের বা বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে থাকেন।

ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে এই বিশেষ "এডিটিং" পদ্ধতির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় 'কোমলগান্ধার' ছবিটিতে "শকুন্তলা" একটি মোটিফ ছিল। শকুন্তলার কণ্বমুনির আশ্রম ত্যাগের উল্লেখ ছবিতে বারে বারে এসেছে। এটি ছিল ছবির মূল নারী চরিত্র অনুসূয়ার সম্ভাব্য কলকাতা ত্যাগের যন্ত্রণার একটি রূপক। আর এই দুটি ঘটনাকে শ্রী ঘটক ছবিতে ব্যবহার করেছেন বাধ্যতামূলক (দেশভাগের কারণে) স্বদেশ ত্যাগের যন্ত্রণাকে মূর্ত করতে।

৩.৭.৫ পুদভ্‌কিনের ছবি

পুদভ্‌কিনের উল্লেখযোগ্য ছবিগুলি হল 'মাদার' (Mother), ১৯২৬ সালে। এটি মাক্সিম্‌ গোর্কির উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে তৈরি করেন। এছাড়াও আছে 'দ্য এণ্ড অফ্‌ পিটার্সবার্গ' (The End of St. Petersburg), ১৯২৭ সালে নির্মীত; 'স্টর্ম ওভার এশিয়া' (Storm Over Asia), ১৯২৮ সালে। পুদভ্‌কিনের ছবি আইজেন্‌স্টাইনের ছবির মত আঘাত করে না, বরঞ্চ অনেক বেশি আবেগকে, অনুভূতিকে ছুঁয়ে যায়।

৩.৮ সের্গেই আইজেনস্টাইন

অন্যান্য রুশ শিল্পীদের মত আইনজেনস্টাইনও অন্য পেশার মানুষ ছিলেন। আইজেনস্টাইন ছিলেন যন্ত্রবিদ্‌ (engineer)। সিনেমা শিল্পে যোগ দেবার পূর্বে নাট্যজগতের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি জাপানী চিত্রাক্ষরে আকৃষ্ট হন। জাপানী চিত্রাক্ষরে 'ক্রন্দন' বোঝাতে 'চোখ' এবং 'জল'-এর চিত্ররূপের সংযুক্তকরণ করা হয়। তেমনি, 'মুখ' — যেখান থেকে সুর নির্গত হয় এবং 'পাখী'-র আলেখ্যর সংযোগে 'সঙ্গীত' শব্দটি বোঝানো হয়। দুটি ভিন্ন চিত্রের সংযোজনায় তৃতীয় একটি অর্থ সৃষ্টি হওয়ার এই প্রক্রিয়া আইজেন্‌স্টাইনের ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করে। ফ্রেমের সীমাবদ্ধতার প্রতি সচেতন থেকে তার ভিতরে কী ভাবে একটি ছবিকে বাঙ্ময় করে তোলা যায়, জাপানী চিত্রকলার ছাত্রদের তা শেখানো হত। এছাড়া, জাপানের কাবুকী (Kabuki) থিয়েটারে বিভিন্ন শৈল্পিক উপাদানের সমতা বজায় রেখে যেভাবে একত্রিত করা হয়, তা আইজেনস্টাইনকে মুগ্ধ করে। কাবুকী থিয়েটার যতটা বাচনিক ততটাই দ্রষ্টব্য।

প্রোলেত্‌কাল্ত থিয়েটারের (Proletkult Theatre) দৃশ্য পরিকল্পক হিসেবে নাট্যজগতে পদার্পণ। প্রোলেত্‌কাল্তের

মূল লক্ষ্য ছিল প্রোলেতারিয়েত শিল্পীদের উন্নতিসাধন ও শ্রমিকশ্রেণীকে শিক্ষাদান। আইজেনস্টাইন প্রোলেত্‌কাল্ত থেকে খুবই প্রভাবিত হন। এখানেই তিনি শেখেন উনবিংশ শতাব্দীর নায়ককেন্দ্রিক ত্রিকোণ-প্রেমের বুর্জোয়া থিয়েটার বর্জন করতে। তিনি শেখেন, কীভাবে 'গণ'কে (mass) মুখ্য চরিত্র করে সামাজিক সমস্যা তুলে ধরতে হয়।

এরপর আইজেনস্টাইন কাজ করেন চরমপন্থী নাট্য পরিচালক সেভোলোদ্ মেয়েরহোল্ডের (Vsevolod Meyerhold) সাথে। মেয়েরহোল্ডের কাছে শিক্ষানবীশ থাকাকালীন নাটকের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষালাভ করেন। পরবর্তীকালে চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে এই শিক্ষা আইজেনস্টাইনের পক্ষে খুবই সহায়ক হয়।

শৈল্পিক নাটককে বর্জন করে, তৎকালীন দর্শক অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জন্য নাটক করতে আইজেনস্টাইন নাটককে রঙ্গালয়ের বাইরে নিয়ে যান। সের্গেই ত্রেতিয়াকোভের (Sergei Tretyakov) নাটক 'গ্যাস মাস্কস' (Gas Masks) নাটকটি মঞ্চস্থ করেন মস্কোর গ্যাস কারখানার মধ্যে। আর অভিনয় করেন কারখানার শ্রমিকেরা।

কিন্তু আইজেনস্টাইনের মতে তিনি অভীষ্ট পুরণে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি শিল্পকে (art) বর্জন করে সেইখানে জীবনকে (life) প্রতিস্থাপন করতে পারেননি। কারখানার অভ্যন্তরে শ্রমিকদের দিয়ে অভিনয় করিয়ে তিনি শুধুমাত্র নাটকের কৃত্রিমতা প্রকাশ করে দেন, যেটা রঙ্গালয়ের ভিতরে কখনো অনুভূত হয় না। এইখান থেকেই আইজেনস্টাইন সিনেমায় আকৃষ্ট হন। ওঁর মনে হয় কারখানার শ্রমিক শ্রেণীর বাস্তবকে একমাত্র সিনেমাই যথাযথভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারে।

৩.৮.১ আইজেনস্টাইনের মন্তাজ

আইজেনস্টাইনের মন্তাজ তত্ত্বের ভিত্তি 'সংঘর্ষ (Collision), পুদভকিনের মত সংযুক্তকরণ নয়। কুড়ি দশকের গোড়া থেকে শুরু করে সারা জীবন ধরে আইজেনস্টাইন ওঁর মন্তাজ তত্ত্ব নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখেছেন, যা ওঁর 'Film Form' এবং 'The Film Sense' বইদুটিতে সংকলিত হয়েছে।

আইজেনস্টাইনের মতে মন্তাজ কাহিনী বিন্যাসের সহায়ক হবে না। মন্তাজের কাজ এক নতুন বাসব (a new reality), নতুন ভাবনা (new idea) সৃষ্টি করা। জাপানি চিত্রলেখার প্রভাব আইজেনস্টাইনের তত্ত্বে অত্যন্ত প্রকট। জাপানী চিত্রলেখায় দুটি ভিন্ন আলেখ্যর সংযোগে তৃতীয় এবং ভিন্ন একটি অর্থ সৃষ্টি হয়। আইজেনস্টাইন বলেছেন যদি 'A' একটি শট হয়, এবং 'B' আরেকটি শট হয় তবে দুই-এর মন্তাজে 'C' সৃষ্টি হবে। 'C' একটি নতুন ভাব বা ধারণা যার সাথে 'A' বা 'B'-র আপাত-সামঞ্জস্য থাকে না। আইজেন্‌স্টাইন আরও বলেছেন যে একটি শটের মূল উপাদান (basic clements) হল তার 'attractions'। সে ক্ষেত্রে শট 'A'-এর 'Attractions' এবং শট 'B'-র attractions-এর সংঘর্ষে তৃতীয় অর্থ উৎপন্ন হয়। একেই আইজেনস্টাইন বলেছেন 'montage of attractions.' দর্শকের ভূমিকা সম্পর্কেও আইজেন্‌স্টাইন ও পুদভ্‌কিনের মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। আইজেন্‌স্টাইন দাবী করেছেন দর্শক নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকবে না। 'C' বা নতুন এই ধারণাকে উপলব্ধি করতে দর্শকের ভূমিকা সক্রিয় হতে হবে। মন্তাজের সহজাত অর্থ বুঝতে তাদেরকে ভাবতে হবে।

মন্তাজের সংজ্ঞাকে আরও প্রসারিত করে আইজেন্‌স্টাইন বলেছেন, "Instead of a static 'reflection' of an event with all possibilities for activity within the limits of the event's logical action, we advance to a new plane — free montage of arbitrarily selected, independent...attractions...". অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গ ত ঘটনার বাইরে স্বেচ্ছায় বেছে নেওয়া স্বাধীন 'অ্যাট্র্যাক্‌শন্‌স'-এর (attractions) মন্তাজ হওয়া সম্ভব।

৩.৮.২ আইজেনস্টাইনের ছবি

আইজেন্‌স্টাইনের প্রথম ছবি হল স্ট্রাইক (Strike), ১৯২৫ সালে নির্মীত। কলকারখানা, সেখানে কর্মরত শ্রমিক শ্রেণী আইজেনস্টাইনকে বরাবর আকর্ষণ করেছে। প্রথম ছবি স্ট্রাইক (Strike) সেই কারখানা ও শ্রমিক শ্রেণীকে দিয়ে তৈরি। এখানে শ্রমিক শ্রেণী একত্রে ছবির মুখ্য চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই ছবিতে 'montage of attractions'-এর দ্বারা ছবির গতি যেমন দ্রুত হয়েছে তেমনি দশর্কের মনে চমক সৃষ্টি হয়েছে। ছবিতে অবশ্য থিয়েটার

প্রভাবও দেখা গেছে। 'স্ট্রাইক'-এ একাধারে যেমন রয়েছে ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা, প্রতীকের আধিক্য, অতি রঞ্জিত অভিনয়, অন্যদিকে কাঠামো তথ্যচিত্রের ন্যায় শিথিল। এর ফলে সম্পূর্ণ ছবি তত সফল নয়। বরঞ্চ কিছু কিছু বিশেষ সিকোয়েন্স অনেক বেশি কৌতূহলোদ্দীপক।

এর পরে ১৯২৫ সালেই আইজেনস্টাইন তৈরি করেন ওঁর সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ছবি — ব্যাটেলশিপ পটেমকিন (Battleship Potemkin)। ১৯০৫ সালে যুদ্ধজাহাজ পটেমকিনে খালাসীরা সংঘবদ্ধভাবে জাহাজের উচ্চপদস্থ কর্মীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহের কারণ ছিল তাদের পচা খাবার খেতে দেওয়া হয়েছিল। ১৯২৫ সালে সেই বিদ্রোহের উদ্‌যাপন করতে এই ছবি তৈরি করেন আইজেনস্টাইন। যদিও এটি একটি কাহিনী-নির্ভর ছবি, কিন্তু দেখতে লাগে তথ্যচিত্রের মত। এখানে আইজেনস্টাইনের মন্তাজের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় তিনটি শটের মধ্য দিয়ে। প্রথম শটে দেখা যায় দুটি পাথরের সিংহ শুয়ে আছে। পরের শটে তারা উঠে বসেছে এবং তৃতীয় শটে তারা দাঁড়িয়ে পড়েছে। এর মধ্যে দিয়ে আইজেনস্টাইন খালাসীদের জাগরিত হওয়াকে বুঝিয়েছেন। এছাড়া ওডেসার (Odessa) সিঁড়ি সিকোয়েন্সটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ক্রমশ লয় বৃদ্ধি করে উত্তেজনা সৃষ্টি করেন। কিছু উত্তেজনার মুহূর্তে শটের দৈর্ঘ্য কমতে কমতে '২' ফ্রেম ও হয়েছে এবং সেই দৃশ্যাবলী ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। যেমন একটি শটে কস্যাকের (Cossak) তরবারি অতি দ্রুত নামছে কেটে, পরের শটে এক মহিলার ভাঙ্গা চশমা এবং মহিলার রক্তাক্ত মুখ দেখা যায়। 'শক্' (Shock) বা সংঘর্ষের ভাব উৎপন্ন করতে আইজেনস্টাইন প্রচুর ক্লোজ আপ ব্যবহার করেছিলেন। দৃশ্যের এবং শটের দ্রুত কাটিং (cutting) এবং ফ্রেমের মধ্যে ঘটনার দ্রুত পরিবর্তন ঘটলেও ক্যামেরা কিন্তু একই জায়গায় স্থবির থেকেছে। তবে ছবির একটি দ্রষ্টব্য বিষয় হল বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গৃহীত শট, যা সম্পাদনার কাজে অত্যন্ত উপযোগী হয়েছে।

স্ট্রাইক এবং ব্যাটেলশিপ পটেমকিন, দুটি ছবি একই আদর্শে অনুপ্রাণিত। পটেমকিন যুদ্ধজাহাজের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা যাদের বিরুদ্ধে খালাসীরা ১৯০৫ সালে বিদ্রোহ করেছিল, তাঁদের সাথে স্ট্রাইক ছবির পুঁজিপতিদের কোন পার্থক্য নেই। একইভাবে পটেমকিনের ওডেসা সিঁড়ির ওপর হত্যাকারী কস্যাক্ (Cossak) আর স্ট্রাইক ছবির পুলিশ আর সেনা দুই-ই সমান। দুটি ছবিতেই শাসক গোষ্ঠী অত্যন্ত উদ্ধত, প্রতারক এবং শেষে তারা হত্যাকারী। অন্যদিকে সমাজের নিচুশ্রেণীর মানুষ — কারখানার শ্রমিক, জাহাজের খালাসীরা খুবই সরল ও বিশ্বাসভাজন। আর প্রোলেতারিয়েত নেতারা পৃথিবীর সব বিষয়েই অকপট। এই নেতারা কোন অন্যায় বা দুষ্কর্মে লিপ্ত হয় না যদি না মালিকপক্ষ বাধ্য বা প্রতারিত করে। এরা শুধুমাত্র অসহনীয় অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে হিংসার আশ্রয় নেয়। দুটি ছবিতেই আইজেনস্টাইন শ্রমিক শ্রেণীকে উৎপাদক ও গণতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে দেখিয়েছেন। এবং দুটি ক্ষেত্রেই প্রোলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের অভিলাষ প্রকাশ পেয়েছে। শ্রমিকশ্রেণী একত্রিত হয়ে দেখা যাচ্ছে সবার উপযোগী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তারা বলেছে, "One for all & all for one."

দুটি ছবিতেই নায়ক হচ্ছে 'গণ' বা mass, অভিনয় করেছে সাধারণ মানুষ যাদের বাস্তবের জীবনধারার সাথে ছবিতে অভিনীত জীবনধারার কোন পার্থক্য ছিল না। আইজেন্স্টাইন এদের সমষ্টি হিসেবেই দেখিয়েছেন, চরিত্রায়ণ করে প্রভেদ সৃষ্টি করেননি। যেটুকু প্রভেদ আছে তা শুধু শারীরিক বা চেহারাগত। স্ট্রাইক ছবিটির গঠনে বা কাঠামোতে যে শৈথিল্য ছিল পোটেম্‌কিনে কিন্তু কাহিনীর বুনট এবং চিত্রনাট্য অনেক টানটান ছিল। পোটেমকিন কাহিনী-নির্ভর হলেও উপস্থাপনায় তথ্যচিত্রের ভাব খুবই স্পষ্ট। স্ট্রাইক এবং ব্যাটেল্‌শিপ পোটেম্‌কিন দুটি ছবিই সামাজিক-রাজনৈতিক ছবি। ছবিগুলির দৃশ্যগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে বাইরে হয়েছিল। যেমন, পটেমকিনে ওডেসার সিঁড়ির শ্যুটিং (Shooting) ওডেসার সিঁড়িতেই হয়েছিল।

স্ট্রাইক (Strike), ব্যাটেল্‌শিপ পটেম্‌কিন (Battleship Potemkin) ছাড়া আইজেন্স্টাইনের উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র হল অক্টোবর (১৯২৮) (October), ওল্ড এণ্ড নিউ (১৯২৯) (Old & New)। এটি হল আইজেনস্টাইনের সর্বশেষ নির্বাক চলচ্চিত্র।

আইজেনস্টাইনের উল্লেখযোগ্য সবাক চলচ্চিত্র হল, অ্যালেক্‌জাণ্ডার নেভ্‌স্কি (১৯৩৮) (Alexander Nevsky), ইভান দ্য টেরিব্‌ল্ প্রথম ভাগ (১৯৪৪) ২য় ভাগ (১৯৫৮) (Ivan the Terrible)। 'ইভান দ্য টেরিব্‌ল্' আইজেনস্টাইনের

একটি অন্যতম কালোত্তীর্ন ছবি।

জীবনের শেষ ভাগে আইজেন্স্টাইন শুধু তত্ত্ব লেখা এবং শিক্ষকতায় নিমগ্ন থেকেছেন।

৩.৯ সারাংশ

বলশেভিক আন্দোলনের পর লেনিনের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হয় সোভিয়েত রাশিয়ায়। রাশিয়ায় তখন চরম অব্যবস্থা। এর মধ্যে লেনিন ঘোষণা করেন 'এই দুর্দশার দিনে আমাদের সিনেমাকেই প্রয়োজন।' সিনেমা হল সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম এবং সরকারের আদর্শ প্রচার করতে, মানুষকে একত্রিত করতে, আন্দোলনকারীদের মনোবল অটুট রাখতে সিনেমাকে কাজে লাগাতে বলেন। ওঁর মতে সিনেমার প্রথম কাজ বাস্তব চিত্র তুলে ধরা আর সেটা সম্ভব শুধুমাত্র তথ্যচিত্রের মাধ্যমে।

লেলিনের মতালম্বী জিগা ভেরতব তৈরি করেন পরের পর তথ্যচিত্র, নিউজরীল। সম্পূর্ণ বাস্তব-চিত্র-নির্ভর ছিল এই তথ্যচিত্র। ফিউচারইজ্‌মে বিশ্বাসী ভেরতব মনে করতেন যন্ত্রই চরম। ক্যামেরা ছবির উপকরণ জোগাড় করবে আর সম্পাদনার মাধ্যমে সেই উপকরণ থেকে চলচ্চিত্র নির্মীত হবে।

পুদভ্‌কিন্‌ও বিশ্বাস করতেন চলচ্চিত্র সম্পদনার মাধ্যমে গঠিত হয়। এডিটিং বা মন্তাজই হল সিনেমা-শিল্পের ভিত্তি। আর মন্তাজের মূল কাজ হল দর্শকের মনকে প্রভাবিত করা।

আইজেনস্টাইন মনে করতেন মন্তাজের ভিত্তি 'সংঘর্ষ, সংযুক্তকরণ নয়। আর দর্শক কখনই নিশ্চেষ্ট থাকবে না। মন্তাজের সহজাত অর্থ অনুধাবন করতে দর্শককে সক্রিয় হতে হবে, ভাবতে হবে।

এঁদের সবার ব্যতিক্রম ছিলেন দোভ্‌জেন্‌কো। 'মন্তাজ' নয় দোভ্‌জেন্‌কোর ছবিতে প্রাধান্য পেয়েছে ক্যামেরায় গৃহীত দৃশ্য। দোভ্‌জেন্‌কো তাঁর ছবিতে বলেছেন প্রকৃতির কথা, শাশ্বত, জীবনবোধের কথা।

আইজেন্‌স্টাইন, পুদভ্‌কিন, কুলেশভের মন্তাজ তত্ত্ব সিনেমা শিল্পকে গভীরভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

৩.১০ অনুশীলনী

১. সোভিয়েত সিনেমার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করুন।
২. সোভিয়েত সিনেমায় জিগা ভেরতবের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৩. আইজেনস্টাইনের মন্তাজ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।
৪. পুদভকিন ও কুলেশভ দ্বারা কৃত মন্তাজের পরীক্ষার বিবরণ দিন এবং তৎসঙ্গে পুদভকিনের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।
৫. দোভজেনকোর ভঙ্গীমা নিয়ে আলোচনা করুন।

৩.১১ গ্রন্থপঞ্জী

1. Kino
2. The Film Technique and Film Acting — V. Pudovkin
3. The Film Sense — S. Eisenstein
4. The Film Art
5. The Film Theory — D. Audrew
6. How To Read A Film — James Monaco.
7. Documentary — A History of Non-Fiction Film — Cric Burnow

একক ৪ ❑ ভারতীয় সিনেমা

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ প্রাক্ দাদা সাহেব ফালকে

৪.৪ দাদা সাহেব ফালকে

৪.৫ ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী

৪.৬ কাহিনীচিত্র এবং ম্যাডান

৪.৭ অন্যান্য স্টুডিও

৪.৮ প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া

৪.৯ স্টুডিও সিস্টেম

৪.৯.১ সবাক্ সিনেমা

৪.৯.২ নিউ থিয়েটার্স এবং স্টুডিও-র কার্য প্রণালী

৪.১০ সারাংশ

৪.১১ অনুশীলনী

৪.১২ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককে ভারতীয় সিনেমায় অদিপর্ব থেকে শুরু করে সবাক্ যুগে পদার্পণ অব্দি আলোচিত হয়েছে। অতএব এই একক পড়ে অপনি জানতে পারবেন—

- ভারতবর্ষে তথা বাংলায় সিনেমার সূত্রপাতের কথা।
- প্রথম কাহিনী চিত্রকার দাদা সাহেব ফালকে সম্পর্কে।
- বাংলায় সিনেমা শিল্প গড়ে ওঠার কথা।
- প্রথম সামাজিক ছবির নির্মাতা ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী সম্পর্কে।
- ভারতীয় সিনেমার সবাক হওয়া।
- প্রমথেশ বড়ুয়ার আধুনিকতা।

৪.২ প্রস্তাবনা

সিনেমা বা চলচ্চিত্র আবিষ্কারের বছরেই কলকাতার মানুষ চলচ্চিত্রের সাথে পরিচিত হয়। জনৈক মি. স্টিফেন্স কলকাতায় বিদেশী ছবি (দৈনন্দিন জীবনের চিত্র) নিয়ে আসেন। হীরালাল সেন, বাংলা সিনেমার জনক অনুপ্রাণিত হন এবং শুরু করেন বাংলার প্রথম সিনেমা কোম্পানি। ম্যাডানরা ব্যবসা করতে আসেন সিনেমা নিয়ে। ক্রমে সিনেমার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

ভারতবর্ষেও তৈরি হয় কাহিনীচিত্র। ধুন্দিরাজ গোবিন্দ্ ফালকে ১৯১৩ সালে 'রাজা হরিশচন্দ্র' তৈরি করেন। এটিই প্রথম কাহিনীচিত্র।

বাংলাও পিছিয়ে ছিল না। তৈরি হল প্রথম নির্বাক কাহিনীচিত্র 'বিল্বমঙ্গল', ১৯১৯ সালে।

এই সময়ের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (ডি.জি)। 'বিলেত ফেলত' (১৯২১) তৈরি করা ছাড়াও ভদ্র, শিক্ষিত পরিবারের মেয়েদের সিনেমায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি।

আরেকজন গুরত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হলেন প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া। বাংলা সিনেমায় প্রমথেশচন্দ্র থেকে একটি সময়কে 'প্রমথেশ যুগ' বলে অভিহিত করা হয়।

তিরিশের দশকের শুরুতে সিনেমা সবাক হয়। বাংলার প্রথম সবাক চলচ্চিত্র ছিল জামাইষষ্ঠী। এই সময়ে হলিউডের আদলে বাংলায় শুরু হয় স্টুডিও সিস্টেম। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোয্য ছিল বীরেন্দ্রনাথ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও। এর দ্বারা বাংলা সিনেমা যথেষ্ট উপকৃত হয়। জনপ্রিয়তায় সিনেমা তখন তুঙ্গে ছিল। কিন্তু দুর্বল পরিচালনা ও অপেশাদারিত্বের ফলে চল্লিশের দশকের পর স্টুডিও সিস্টেমের পতন হয়।

৪.৩ প্রাক্ দাদা-সাহেব ফালকে

কলকাতাবাসী প্রথম চলচ্চিত্রের মুখোমুখি হন স্টার থিয়েটারে, সময় ১৮৯৬ সাল।

কলকাতায় তখন থিয়েটারের রমরমা অবস্থা। এই সময় স্টার থিয়েটার-এর কর্তৃপক্ষের কাছে এসে মি. স্টিফেন্স নামে এক বিদেশী ভদ্রলোক প্রত্যেক রাতের অভিনয় শুরুর আগে স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র দেখাবার অনুমতি প্রার্থনা করেন।

বাংলা চলচ্চিত্রের জনক হীরালাল সেন তখন যুবক। তিনি বিনোদনের এই নতুন উপাদানটি দেখে চমৎকৃত হন এবং উৎসাহিত হন। লণ্ডনের 'জন রেঞ্জ এন্ড সন্স' থেকে সিনোমাটোগ্রাফ মেশিন আনিয়ে কলকাতায় চলচ্চিত্র প্রদশর্নী শুরু করেন। এই কাজে তিনি সহযোগী হিসেবে টেনে নেন ছোট ভাই মতিলাল সেনকে।

তাঁরা প্রদশর্নীর জন্য বিদেশ থেকে ছবি আনাতেন। এছাড়া তৎকালীন বিখ্যাত সব থিয়েটারের অংশ তুলে তার প্রদশর্নী করতেন। যেমন, ভ্রমর, সীতারাম, গিরিশ ঘোষের 'মনের মতন', অমরেন্দ্রনাথ দত্ত'র 'মজা' ইত্যাদি।

১৯০০ সালে ওঁরা তৈরি করেন রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানী (Royal Bioscope Company)। এটি ছিল বাংলার প্রথম সিনেমা কোম্পানী। এই কোম্পানীর নামেই ওঁরা সর্বত্র ছবি দেখাতেন।

নাটকের দৃশ্যও তোলা ছাড়াও হীরালাল সেন বিজ্ঞাপন চিত্র তৈরি করেছিলেন, 'এডওয়ার্ড এণ্ড ম্যালেরিয়া স্পেসিফিক' নামক ওষুধ এবং 'জবাকুসুম' তেলের বিজ্ঞাপন চিত্র তৈরি করেছিলেন। এছাড়াও ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে যে ঐতিহাসিক জনসভা হয়েছিল, পুরনো ট্রেজারি বিল্ডিং-এর উপর থেকে সেই শোভাযাত্রার ছবি তুলেছিলেন হীরালাল সেন। ১৯১১ সালে দিল্লীতে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরীর ছবি তোলেন।

হীরালাল সেন-এর সাথেই আসে জামশেদজী ফ্রামজী ম্যাডান বা সংক্ষেপে জে. এফ. ম্যাডানের কথা। ১৯০১ সালে গড়ের মাঠে তাঁবু খাটিয়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন ম্যাডান। জে. এফ. ম্যাডান হীরালাল সেনের ন্যায় মাধ্যমটির অভিনবত্বে আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে আসেননি, তিনি এর ক্রম-বর্ধমান জনপ্রিয়তা দেখে বাণিজ্যিক মূল্য বুঝতে পারেন। তাই গড়ের মাঠে এই তাঁবুর ছবিঘর, যার নামকরণ করেছিলেন এলফিনস্টোন বায়োস্কোপে (Elphinstone Bioscope)। ম্যাডানরা প্যাথে কোম্পানি (Pathe Co.)-র স্বল্প-দৈর্ঘ্যের ছবি দেখাতেন। এখানে প্যাথে নিউজরীলও দেখানো হত।

শহরাঞ্চল ছাড়া গ্রামাঞ্চলেও তখন চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা হত। একদল মানুষ যাদের বলা হত ফেরিওয়ালা তারা মাথায় করে উট, ঘোড়া, গাধা, হাতির পিঠে চাপিয়ে বা গরুর গাড়িতে চাপিয়ে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী করতেন।

১৯০৭ সালে ম্যাডান কলকাতায় তৈরি করেন ভারতবর্ষের প্রথম সিনেমাহল এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেস (Elphinstone Picture Palace)। এর পর পরই আবদুল আলী ইউসুফালী বম্বেতে তৈরি করেন সিনেমা হল। মাদ্রাজেও প্রায় একই সময়ে সিনেমা হল নির্মান হয়। পরবর্তীকালে ম্যাডানরা ভারতে, ব্রহ্মদেশে, সিংহলে মোট ১৭২টি চিত্রগৃহ নির্মাণ করেন। এসব চিত্রগৃহে মূলতঃ বিদেশের নামী ফিল্ম কোম্পানী যেমন প্যাথে (Pathe), এক্লেয়ার (Eclair), অ্যাম্‌ব্রোসিও (Ambrosio), লুবিন্‌ (Lubin), ওয়ারউইক্‌ (Warwick), ভিটাগ্রাফ্‌ (Vitagraph) আমেরিকান্‌ বায়োস্কোপ্‌ (American Bioscope), ইত্যাদি-র ছবি দেখানো হত। এছাড়া তখন ফিল্ম কোম্পানিগুলি নিজেরাও নিউজরীল তৈরি করতেন। ভারতীয় কোম্পানির মধ্যে ম্যাডান কোম্পানিই সবচেয়ে বেশি পরিমানে স্বল্প দৈর্ঘ্যের এই নিউজরীল তৈরি করত।

ক্রমে চলচ্চিত্র গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলেই বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কোম্পানীগুলোও শহরাঞ্চলেই ছবি দেখাতে বেশি উৎসাহী হয়। শহর-কেন্দ্রিকতার দুটি কারণ ছিল। এক, গ্রামের মানুষের হাতে নগদ টাকার অভাব। দুই, বিদেশী চলচ্চিত্রের প্রতি গ্রামের মানুষের বিমুখতা।

এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অনিশ্চিত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে গ্রামাঞ্চলে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি ভারতীয় চলচ্চিত্র ও সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ হীরালাল সেনের কোনও ছবিই এখন নেই। সবই বিশাল এক অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যায়।

৪.৪ দাদাসাহেব ফালকে

ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাল '১৯১৩'। এই বছর ভারতবর্ষের কাহিনীচিত্র 'রাজা হরিশচন্দ্র' নির্মীত হয়, নির্মাণকারী ধুন্দিরাজ গোবিন্দ ফালকে (দাদাসাহেব ফালকে নামেই অধিক পরিচিত)। পৌরাণিক এই কাহিনীচিত্রে চিত্রশিল্প, সঙ্গীত এবং নাটকের মেলবন্ধন ঘটেছিল।

দাদাসাহেব ফালকে ওঁর পূর্বসূরি রাজা রবি বর্মার চিত্রশৈলী থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং ছবির চরিত্রের অর্থাৎ রাজা হরিশচন্দ্র, রাণী তারামতির সাজসজ্জায়, হাঁটা-চলায় রবি বর্মার প্রভাব খুবই স্পষ্ট। এছাড়া তৎকালীন মারাঠী নাট্যমঞ্চও ফালকে-কে প্রভাবিত করেছিল।

এই ছবির নির্মাণকালে দাদাসাহেব ফালকে রাণী তারামতির চরিত্রে কোন মহিলা না পেয়ে 'মিস্টার সালুঙ্কে' নামে এক পুরুষকে রাণী তারামতি সাজিয়েছিলেন। হরিশচন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ডি. জি. ডাবকে।

'রাজা হরিশচন্দ্র' ১৯১৩ সালে নির্মীত হলেও এরকম ছবি করার কথা ফালকে ভেবেছিলেন ১৯১০ সালেই। সেই সময় 'দ্য লাইফ অফ ক্রাইস্ট' নামে একটি ছবি দেখে অনুপ্রাণিত হন। ঠিক এরকমই ভারতীয় পুরাণের ভিত্তিতে একটি সম্পূর্ণ ভারতীয় চলচ্চিত্র তৈরি করবেন স্থির করেন।

ইতিপূর্বে ফালকে বিভিন্নরকম পেশায় যুক্ত ছিলেন।

১৮৭০ সালে মহারাষ্ট্রের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ফালকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে জে. জে. স্কুল্ অফ্ আর্ট (J. J. School of Art)-এ ছাত্র হিসেবে যোগ দেন। এরপর বরোদার কলাভবন-এ যোগ দেন। দুটি ক্ষেত্রে শিক্ষণের ফলে ফালকে শিল্পকলা (তেল রঙ এবং জল রঙ), ছাঁচ-নির্মাণ (Moulding), লিথোগ্রাফ্ (Lithograph), স্থাপত্যবিদ্যা (Architecture), এবং ফটোগ্রাফিতে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ফালকে এই সময় মঞ্চাভিনয়েও যোগ দেন। তিনি যাদুবিদ্যাও রপ্ত করেছিলেন, যা ওঁর মতে চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরি।

ভারত সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের আলোকচিত্রকর এবং লিথোগ্রাফার (Lithographer) হিসেবে কর্ম-জীবন শুরু করেন। এরপর ফালকে নিজেই একটি মুদ্রণালয় স্থাপন করেন। এখানেই ফালকে লিথোগ্রাফির দ্বারা রবি বর্মার তৈলচিত্রের অনুকরণে তৈল-রঙে-রঞ্জিত নকল (Olegraph) তৈরি করতেন।

'রাজা হরিশচন্দ্র' ১৯১৩ সালে ৩রা মে করোনেশন সিনেমাটোগ্রাফ্ (Coronotion Cinematograph)-এ মুক্তিলাভ করে।

'রাজা হরিশচন্দ্র' অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছিল সমগ্র ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষের মানুষ এই প্রথম সম্পূর্ণ ভারতীয় বিষয়-বস্তু-নির্ভর একটি ভারতীয় ছবি দেখতে পেল। তারা ছবিটির সাথে একাত্মবোধ করে।

১৯১৭ সালে ফালকে 'হিন্দুস্তান ফিল্ম কোম্পানি' তৈরি করেন। এই কোম্পানির প্রথম ছবি ছিল 'শ্রীকৃষ্ণজনম' (১৯১৮)। ১৯১৯ সালে তৈরি হয় 'কালীয়মর্দন'। এই ছবিতে ফালকের মেয়ে 'মন্দাকিনী' মূল চরিত্রে অভিনয় করেছিল।

ফালকে মোট ১২০টি চলচ্চিত্র তৈরি করেছিলেন। ওঁর শেষ ছবি ছিল 'গঙ্গাবতরণ' (১৯৩৭)।

১৯৪৪ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি দাদাসাহেব ফালকে পরলোক গমন করেন।

৪.৫ ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (ডি.জি)

ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর জন্ম ১৮৯৩ সালের ২৬শে মার্চ, কলকাতায়। অত্যন্ত শিক্ষিত পরিবারে জন্ম হয়েছিল ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর। ছেলেবেলাতেই ধীরেন্দ্রনাথ চলে যান শান্তিনিকেতনে। এবং সেখানে বালক বয়সেই সঙ্গীত, অঙ্কন, অভিনয় এবং যন্ত্রবাদনে ধীরেন্দ্রনাথ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। শান্তিনিকেতনে উনি রবীন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। 'বাল্মিকী প্রতিভা'য় কবির সাথে অভিনয় করেছিলেন, কবি হয়েছিলেন বাল্মিকী এবং ধীরেন্দ্রনাথ হয়েছিলেন 'মায়া'।

শান্তিনিকেতনে এন্ট্রান্স পাশ করে কলকাতায় স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হন। এরপর সরকারী আর্ট স্কুল থেকে পাশ করেন।

১৯১৬ সালে ধীরেন্দ্রনাথ হায়দ্রাবাদের নিজাম আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ হন।

কিন্তু ১৯১৮ সালে কর্মস্থলে ইস্তফা দিয়ে উনি কলকাতায় ফিরে আসেন। মূল উদ্দেশ্য ছিল চলচ্চিত্র নির্মাণ করা। তৈরি করনে ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোং (Indo-British Film Co.)। ওঁর সাথে যোগ দেন ম্যাডান কোম্পানীর তৎকালীন জেনেরল ম্যানেজার নীতিশ লাহিড়ী। ধীরেন্দ্রনাথ তৈরি করেন প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের সম্পূর্ণ বাংলা ছবি 'বিলেত ফেরত'। ছবির ইংরাজি নাম ছিল ইংল্যাণ্ড রিটার্নড্ (England Returned)। ১৯২১ সালে ২৬শে ফেব্রুয়ারি ভবানীপুরে রসা থিয়েটারে মুক্তিলাভ করে। এটি একটি সামাজিক ছবি ছিল। ভারতীয়দের ইউরোপীয় আচার ব্যবহার নকল করাকে বিদ্রুপ করেছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ এই ছবিতে।

ছবির মূল চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ স্বয়ং। এছাড়া ছবির কাহিনীকার এবং পরিচালকও ছিলেন তিনি। কমেডিয়ান হিসেবে প্রথম ছবিতেই প্রতিষ্ঠালাভ করেন।

ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোং-এর দ্বিতীয় ছবি ছিল 'যশোদানন্দন'। এই ছবির কাহিনীকার ছিলেন নীতিশ লাহিড়ী।

ওঁদের তৃতীয় ছবি ছিল 'সাধু কী শয়তান'। কিন্তু এই ছবির নির্মাণকার্য সমাপন হওয়ার আগেই ধীরেন্দ্রনাথ

কোম্পানি ত্যাগ করেন।

প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যে এবং সামাজিক ছবির নির্মাতা ধীরেন্দ্রনাথের আরেকটি অনস্বীকার্য অবদান হল প্রথম শিক্ষিত, ভদ্র পরিবারের মেয়েদের সিনেমায় নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। নিজের স্ত্রী প্রমিলাদেবীকে 'যশোদানন্দনে'-এ অভিনয় করিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে কন্যা মনিকাকেও সিনেমায় নিয়ে এসেছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথেব ভাষায়, "আমি মেয়েদের শিল্পী হতে আহ্বান জানিয়েছিলাম পর্দায়। আমি ওদের মর্যাদা আদায় করে নিতে শিখিয়েছিলাম। আমার স্ত্রী ঠাকুরবাড়ির মেয়ে। তাঁকে প্রথমেই নামিয়ে আমি অন্যদের অনুপ্রাণিত করেছিলাম।" ওঁর মতে খারাপ পল্লীর মেয়েদের অশিক্ষা কুশিক্ষা, অসংযত জীবনযাত্রা শিল্পের সৌন্দর্য-সৃষ্টিকে বিঘ্ন ঘটাতো। শিল্পের উৎকর্ষতার জন্য শিক্ষিত মহিলাদের সিনেমায় যোগদান একান্ত আবশ্যক।

১৯২২ সালে ধীরেন্দ্রনাথ হায়দ্রাবাদে গড়ে তোলেন লোটাস ফিল্ম কোম্পানি। ওঁর অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ছিলেন হায়দ্রাবাদ নিজাম এস্টেটের ইঞ্জিনিয়র। ওঁর সহায়তায় ধীরেন্দ্রনাথ ফিল্ম কোম্পানি গড়ে তোলেন। স্টুডিও-র যন্ত্রপাতি, ক্যামেরা ইত্যাদি অবশ্য কলকাতা থেকেই কিনেছিলেন।

লোটাস ফিল্ম কোম্পানির প্রথম ছবি 'ইন্দ্রজিৎ ও লেডী টিচার'। টাইটেল সহ ছবিটি মুক্তি পায় ১৯২২ সালের ১৯শে আগস্ট। এটি ছিল ৮রীলের ছবি। ধীরেন্দ্রনাথ স্বয়ং ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। এরপর একে একে তৈরি করেন 'ম্যারেজ টনিক', 'বিমাতা', 'হরগৌরী', 'যযাতি', 'বিল্বমঙ্গল', সতী সীমন্তিনী ইত্যাদি। ছবিগুলি হায়দ্রাবাদে লক্ষ্মী সিনেমায় দেখানো হত।

১৯২৯ সালে ধীরেন্দ্রনাথ প্রমথেশ বড়ুয়ার সাথে তৈরি করেন ব্রিটিশ-ডোমিনিয়ন ফিল্মস্ লিমিটেড (British-Dominion Films Limited)।

৪.৬ কাহিনীচিত্র এবং ম্যাডান

ম্যাডানরা প্রদর্শনী থেকে চলচিত্র প্রযোজনায় চলে আসে। প্রথম কাহিনী চিত্র ছিল 'নল দময়ন্তী' (১৯১৭)। তবে ছবির মূল অভিনেতারা ছিলেন ইতালিয় ম্যানেলী দম্পতি।

বাংলার সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ নির্বাক চিত্র তৈরি করেন ম্যাডানরা। ছবির নাম 'বিল্বমঙ্গল'। ১৯১৯ সালে নির্মীত এই ছবি কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে মুক্তিলাভ করে। মূল চরিত্রে অভিনয় করেছিলন মিস্ গহর। পরিচালনা করেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯২০ সালে তৈরি করেন 'সত্যবাদী রাজা হরিশচন্দ্র' (৪ রীলের ছবি) এবং ৮ রীলের 'মহাভারত'।

১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ম্যাডান কোম্পানি নির্মীত ছবি হল 'নল দময়ন্তী', 'ধ্রুব চরিত্র', 'শিব রাত্রি', 'মা দুর্গা'। 'নল দময়ন্তী' ছিল ১০ রীলের ছবি। পরিচালক ছিলেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। দময়ন্তীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন পেসেন্স কুপার এবং বিদূষক হয়েছিলেন মাঃ রোহন।

পৌরাণিক কাহিনীর পাশাপশি বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনী নিয়েও ম্যাডানরা ছবি করেছিলেন, যেমন বিষবৃক্ষ (১৯২২), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৯২৭), দূর্গেশ নন্দিনী (১৯২৭)।

অধিকাংশ ছবির পরিচালনা করেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া ছিলেন প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী। শ্রীগাঙ্গুলী 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'দূর্গেশনন্দিনী' পরিচালনা করেছিলেন।

৪.৭ অন্যান্য স্টুডিও

ম্যাডান কোম্পানি বা ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানি ছাড়া অন্যান্য যে স্টুডিওগুলি ছিল সেগুলি হল :

অরোরা সিনেমা কোম্পানি—প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯১১ সালে। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অনাদিনাথ বসু, দেবী ঘোষ। এঁদের

প্রথম ছবি ছিল 'রত্নাকর'। ছবির কাহিনীকার ও পরিচালক ছিলেন সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়। মূল চরিত্রে অভিনয় করেন চুনিলাল দেব, শশীমুখী ও সুশীলাবালা। এটি ৭ রীলের ছবি ছিল।

ইণ্ডিয়া ফিল্মস্ — ছবি নির্মাণ করা ছাড়া পরিবেশনের কাজও করতেন।

কোহিনূর ফিল্ম কোম্পানি — এদের প্রথম ছবি ছিল 'কৃষ্ণ সুদামা' (৭ রীলের ছবি)।

ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানি — প্রথম ছবির নাম 'লবকুশ'।

হিন্দুস্তান ফিল্ম কোম্পানি — প্রথম ছবি 'কংসবধ'। ৭ রীলের এই ছবি মুক্তি পায় ১৯২২ সালে।

তাজমহল ফিল্ম কোম্পানি — প্রথম ছবি 'আঁধারে আলো'। এটিও ১৯২২ সালে মুক্তিপাপ্ত হয়।

ব্রিটিশ-ডোমিনিয়ন ফিল্মস্ লিমিটেড : এটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া প্রমুখ। ১৯২৯ সালে ৭ই জানুয়ারি স্টুডিও শুরু হয়। ধীরেন্দ্রনাথ হায়দ্রাবাদ থেকে ফিরে এসে এই কোম্পানিটি শুরু করেন।

মোট আটটি ছবি তৈরি হয় এখানে। 'কামনার আগুন' (১২ রীল), টাকায় কী না হয় (৪ রীলের), দুষ্টু বালক (৩ রীলে), অলীক বাবু (৭ রীল), পঞ্চশর (১০ রীল), মরণের পরে (১০ রীল), সীমান্ত চোর (১০ রীল) এবং চরিত্রহীন (১০ রীল)।

ব্রিটিশ-ডোমিনিয়ন ফিল্মস্ লিমিটেড বাংলা চলচ্চিত্রকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। প্রথমতঃ বেশ কিছু প্রতিভাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞের হাতেখড়ি এখানে। যেমন দেবকীকুমার বসু এখানেই কাজ শুরু করেন। দ্বিতীয়ত ঃ সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের ধীরেন্দ্রনাথ এখানেও নিজের ছবির জন্য নিয়ে আসেন।

এখানেই 'টাকায় কী না হয়' ছবিতে প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে।

তবে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল বাংলা সিনেমার নির্বাক যুগের একটিমাত্র খণ্ডচিত্র পাওয়া যায়, তার নাম 'জামাইবাবু'। পরিচালক ছিলেন কালীপদ দাস। এটি ১৯৩১ সালে নির্মীত। স্ল্যাপ-স্টিক ধরণের কমেডি ছবি ছিল জামাইবাবু।

৪.৮ প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া

বাংলা চলচ্চিত্র ইতিহাসে একটি বিশেষ সময়কে প্রমথেশ যুগ বলা হয়। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রমথেশ বড়ুয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম।

প্রমথেশ বড়ুয়ার জন্ম ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে, ২৪শে অক্টোবর, আসামের গৌরীপুর রাজ পরিবারে। বাবা ছিলেন শ্রী প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া। প্রমথেশচন্দ্র ছিলেন পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ছেলেবেলা থেকেই পড়াশোনা ব্যতীত শিকার, খেলাধুলো, গানবাজনা এবং ছবি আঁকার আগ্রহ ছিল ওঁর। পরবর্তীকালে এর সাথে যুক্ত হয় ছবি তোলার শখ। তবে ছবি তোলার ব্যাপারে ওঁর আগ্রহ এতটাই গভীর ছিল যে এ বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের বিভিন্ন জায়গায় যান।

১৯২০ সালে কলকাতার হেয়ার স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে এবং '২৪ সালে প্রেসিডেন্সী থেকে পদার্থ বিদ্যা নিয়ে বি.এস.সি পাশ করেন।

১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে চিত্তরঞ্জন দাস-এর স্বরাজ পার্টিতে যোগ দেন। এছাড়া আসামের লেজিস্লেটিভ অ্যাসেম্ব্লীর (Legislative Assembly) সদস্য ছিলেন ১৯২৮ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত। ১৯২৮ সালে বাংলা লেজিস্লেচর (Legislature)-এ অ্যান্টি টেনানসি (Anti-Tenancy) এবং অ্যান্টি-মুসলিম (Anti-Muslim) বিল পাশ হয়।

বিদেশে থাকাকালীন প্রমথেশচন্দ্র রেনে ক্লেয়ার (Rene Clair), আর্নস্ট লুবিৎশ্ (Ernst Lubitsh)-এর ছবি দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সিনেমা শিল্পে।

১৯২৯ সালে ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর সাথে একযোগে তৈরি করেন ব্রিটিশ-ডোমিনিয়ন ফিল্মস্ লিমিটেড (British Dominion Films Limited)। প্রমথেশচন্দ্র কোম্পানির অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক চলচ্চিত্রকারদের মত তিনি কাজ করতে করতে শেখেননি। তিনি প্যারিসে বিখ্যাত ফক্স ফিল্মস্ (Fox Films)-এর ক্যামেরাম্যান মি. রজার্জের অধীনে সহ-ক্যামেরাম্যান হিসেবে কাজ করে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন।

১৯৩০ সালের শেষ দিকে 'পঞ্চশর' ছবিতে প্রথম আবির্ভাব। ইণ্ডিয়ান সিনেমা আর্টসের নির্বাক চলচ্চিত্র 'ভাগ্যলক্ষ্মী'-তে অভিনয় করে বিদগ্ধজনের নজরে আসেন। ১৯৩১ সালে বড়ুয়া ফিল্মস্ (Barua Films) নামে একটি চিত্রপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। বড়ুয়া ফিল্মস্-এর প্রথম ছবি ছিল 'অপরাধী' যেখানে শ্রীবড়ুয়া পরিচালনা ছাড়া নায়কের ভূমিকায় অভিনয়ও করেন। এই ছবির দৃশ্যগ্রহণ করা হয়েছিল ফ্লোরে, কৃত্রিম আলোতে।

শ্রীবড়ুয়া পরিচালিত প্রথম সবাক্ চলচ্চিত্র ছিল 'বাংলা ১৯৮৩'।

১৯৩২ সালে প্রমথেশচন্দ্র নিউ থিয়েটার্স-এ যোগ দেন। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৯-র মধ্যে তৈরি করেন একের পর এক কালজয়ী ছবি এবং সূচনা করেন বাংলা চলচ্চিত্রের এক নতুন যুগের। উল্লেখযোগ্য ছবিগুলি হল, 'দেবদাস', 'রজতজয়ন্তী', 'গৃহদাহ', 'অধিকার', 'মুক্তি', 'জিন্দেগী', 'উত্তরায়ণ', 'মায়ের প্রাণ', 'শেষ উত্তর', 'চাঁদের কলঙ্ক', 'মায়া।'।

'মুক্তি' এবং 'দেবদাস'-এই দুটি ছবি বাংলা তথা ভারতবর্ষের চলচ্চিত্র তাত্ত্বিকদের বারে বারে ভাবিয়েছে। তাঁর অভিনয়শৈলী বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। 'মুক্তি' এবং 'রজতজয়ন্তী'-তে বাস্তবতার ছাপ ছিল, তাত্ত্বিকদের মতে সে বাস্তবতা আরও দৃঢ়ভাবে ভারতীয় ছবিতে প্রতিষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। ক্যামেরার অবাধ গতি আর প্রকৃতিকে ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নতুনত্ব দেখা যায়। বিষাদমাখা প্রেমের গল্প, তার সাথে আভিজাত্যপূর্ণ, নিরাসক্ত ভাবাপন্ন অভিনয় ওঁর ছবিগুলিতে অনন্য মেলোড্রামা সৃষ্টি করেছিল।

নিউ থিয়েটার্স-এর সাথে সম্পর্কে ছিন্ন করার পর প্রমথেশচন্দ্র বিভিন্ন স্টুডিও-তে কাজ করেন। মোট ২১টি ছবির পরিচালনা করেন শ্রীবড়ুয়া। এর মধ্যে ১৪টি ছিল বাংলা ছবি এবং ৭টি হিন্দী। তিনি কয়েকটি ছবিতে সুরারোপও করেছেন।

১৯৫১ সালের ২৯শে নভেম্বর এই মহান শিল্পীর জীবনাবসান ঘটে।

৪.৯ স্টুডিও সিস্টেম

ভারতীয় সিনেমায় স্টুডিও সিস্টেমের স্বর্ণযুগ ছিল ১৯৩০-৪০-এর দশক। তিরিশের দশকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল সিনেমার সবাক হওয়া।

৪.৯.১ সবাক্ সিনেমা

ভারতবর্ষের প্রথম সবাক্ চলচ্চিত্র হল আর্দেলির ইরানির 'আলম আরা'। এটি নির্মীত ১৯৩১ সালে। 'আলম আরা' ছবিতে প্রায় এক ডজন গান এবং নাচ ছিল। ছবিটি অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই ছটিতেই কিন্তু পরবর্তীকালের ভারতীয় সিনেমার ধারা সৃষ্টি হয়। ১৯৩৩-৩৪ সাল ভারতীয় সিনেমার মূল উপাদানই ছিল গান আর নাচ। এমনকি কোন কোন ছবিতে প্রায় পঞ্চাশখানা গানও থাকত। ভারতীয় দর্শক বিদেশী ছবির থেকে এই নৃত্যগীত সম্বলিত ছবিই বেশি উপভোগ করতেন।

বাংলা সিনেমা সবাক হয়েছিল বিখ্যাত গায়িকা মুন্নিবাঈয়ের গান গাওয়ার দৃশ্যের মধ্য দিয়ে। এটিও ম্যাডানরাই তুলেছিলেন। এমনকি বাংলার প্রথম সবাক চলচ্চিত্র 'জমাইষষ্ঠী' নির্মাণের কৃতিত্বও ম্যাডানদের। ১৯৩১ সালের ১২ই এপ্রিল 'জামাইষষ্ঠী' মুক্তিলাভ করে। পরিচালক ছিলেন অমর চৌধুরী।

বিদেশী ছবির ফলে যে দর্শক সিনেমার প্রতি বিমুখ হয়েছিলেন এই সবাক সিনেমা তাদের ফিরিয়ে আনে। সিনেমা শিল্প হিসেবে এই প্রথম সাফল্যের মুখ দেখে। ১৯২৮-এ এদেশে মোট ২৫৭টি সিনেমাহল ছিল, ১৯৩৮-এ তা বেড়ে হয় ১৬৫৭। শহরে, মফস্বলে এমনকি বর্ধিষ্ণু গ্রামাঞ্চলেও স্থায়ী সিনেমাহল তৈরি হয়। আর গ্রামে তৈরি হয় অস্থায়ী সিনেমা হল।

শিল্পের সম্প্রসারণ (Industrial growth)-এর পাশাপাশি সিনেমা শৈলীতে এক পরিবর্তন আসে। সিনেমার মান উন্নত হয়। মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় অবদান ছিল স্টুডিও সিস্টেমের। তিরিশের দশকের প্রথমদিকে বোম্বাই, পুনে আর কলকাতায় এবং দশকের শেষের দিকে মাদ্রাজসহ দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি শহরে স্থায়ী বিনিয়োগের ভিত্তিতে স্টুডিওতৈরি হয়। বাংলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্টুডিও হল নিউথিয়েটার্স (New Theatres)। সবাক্ যুগে কিছু সবাক্ চলচ্চিত্র যেমন, জোরবরাত (১৯৩১), ঋষির প্রেম (১৯৩১), তৃতীয় পক্ষ (১৯৩১) ইত্যাদি তৈরি করলেও ১৯৩৩-এ ম্যাডান কোম্পানি বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে নিউ থিয়েটার্স-এর অবদান বাংলা সিনেমাতে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

৪.৯.২ নিউ থিয়েটার্স (New Theatres) এবং স্টুডিও কার্য প্রণালী

নিউ থিয়েটার্স-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ সরকার। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর নিউ থিয়েটার্স-এর উদ্বোধন হয়। টালিগঞ্জে শুরু হয় ১নং স্টুডিও যার ২নং স্টুডিও গড়ে তোলেন আনোয়ার শাহ্ রোডে।

নিউ থিয়েটার্স-কে চলতি কথায় এন.টি বলে উল্লেখ করা হয়। এখানে অনেক গুণী মানুষের সমাবেশ ঘটে। ডি.জি. বা ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর মত অভিনেতা-পরিচালক, পরিচালক দেবকীকুমার বসু, পরিচালক-অভিনেতা প্রমথেশ বড়ুয়া প্রমুখ।

এন.টি প্রযুক্তিগত অনেক পরিবর্তন আনে। সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনাধীন ইনডোর শুটিং শুরু হয়। তৈরি করা হয় ফ্লোর (floor) অর্থাৎ শ্যুটিং এর চত্বর। ব্যবস্থা করা হয় কৃত্রিম আলোর। ক্যামেরা পরিচালনার ক্ষেত্রেও আধুনিক কলাকৌশলের প্রয়োগ যেমন, ট্র্যাকিং দেখা যায়। এখানে পরিচালনব্যবস্থা (management)-র উপর গুরুত্ব দেওয়া হত। লোকচালনা (man management) এবং মানবসম্পদবিকাশ (human resource development)-কে বিশেষ করে প্রাধান্য দেওয়া হয়। স্টুডিও-র সাথে জড়িত সমস্ত কলাকুশলী, শিল্পীই মাস মাইনের কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হতেন। স্টুডিওর কতগুলি নিয়ম ছিল যার দ্বারা কলাকুশলীদের শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধতা তৈরি হবে এবং তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখা যাবে। যেমন, কলাকুশলী এবং অভিনেতা অভিনেত্রীদের কোন ছবির কাজ না থাকলেও নিয়মিত স্টুডিওতে হাজির থাকা বাধ্যতামূলক ছিল। বাধ্যতামূলক ছিল অনুশীলন। নিয়মিত অনুশীলন এবং পর্যবেক্ষণের দ্বারা তাঁরা নিজেদের আরও উন্নত করার সুযোগ পেত। এই কারণেই স্টুডিওতে তৈরি ছবিগুলোতে দক্ষ-কুশলতার একটা নূন্যতম মাত্রা তৈরি হয়েছিল। এবং সার্মগ্রিকভাবে উপকৃত হয়েছে চলচ্চিত্র মাধ্যম। ফলে এই স্টুডিওগুলি (মূলত ঃ নিউ থিয়েটার্স, অনুল্লেখনীয় স্টুডিওগুলি হল রাধা ফিল্মস্, শ্রীভাগ্যলক্ষ্মী পিকচার্স, ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস্ ইত্যাদি) বিশের দশকের স্টুডিওগুলির মত শুধু শ্যুটিং-এর জায়গা ছিল না, বরঞ্চ বৃহত্তর অর্থে শিক্ষাক্ষেত্রও ছিল।

নিউ থিয়েটার্স-এর ছবি ভাগ্যচক্র থেকে প্লে-ব্যাক (play back) গানের শুরু। ব্যাকগ্রাউণ্ড (Back ground) মিউজিক ব্যবহারে ছবি যে নতুন চেহারা নেয়, এন.টি.-র ছবি 'বিদ্যাপতি'-তে তা প্রথম দেখান দেবকী বসু।

এত বড় কর্মকাণ্ডের কর্ণধার বীরেন্দ্রনাথ সরকার-এর জন্ম অত্যন্ত বিত্তশালী এবং উচ্চশিক্ষিত পরিবারে। বাবা ছিলেন বিশিষ্ট আইনবিদ স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার। নৃপেন্দ্রনাথ ছিলেন তৎকালীন বড়লাটের আইন উপদেষ্টা কমিটির সদস্য। বীরেন্দ্রনাথের জন্ম ১৯০১ সালের ৫-ই জুলাই, ভাগলপুরে। প্রেসিডেন্সী থেকে আই.এস.সি. পাশ করে ১৯২৩-এ লণ্ডন থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। কলকাতায় এসে মার্টিনবার্ন কোম্পানিতে শিক্ষানবীশ থেকে, পরে স্বাধীনভাবে ব্যবসা শুরু করেন।

১৯২৮-২৯ সালে চলচ্চিত্রের জন্য জড়িত হন এবং চলচ্চিত্রের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জনের তাগিদে

১৯৩০-এ এই বিশাল কর্মকাণ্ডের অবতারণা করেন।

নিউ থিয়েটার্স এবং অন্যান্য স্টুডিওগুলি পুঁজি পরিকল্পনায় যথেষ্ট অদক্ষ ছিল। তাঁদের কাজের মধ্যে সুস্পষ্ট পরিকল্পনার অভাব ছিল। একধারে ছবি তৈরির নির্দিষ্ট সময়সীমা লঙ্ঘিত হত, অন্যদিকে পুঁজি আবর্তনের কোন রীতি ছিল না। আর্থিক সংগঠনগুলি মূলত বিদেশীদের কুক্ষিগত হওয়ার দরুণ বাংলা সিনেমা সম্পর্কে বা সেখানে লগ্নি করার বিষয়ে তারা উদাসীন ছিল। বীরেন্দ্রনাথ সরকারও বাণিজ্যের মূল মন্ত্র পুঁজি-পণ্য-আরও পুঁজি এই চক্রাকার আবর্তনে নিষ্ঠা সহকারে মেনে চলেননি।

আসলে সিনেমার সাফল্যের তখন মূল কারণ ছিল দর্শক আনুকূল্য। আর তার মূলে ছিল তৎকালীন সিনেমা শৈলী। একাধারে সিনেমা সবাক্ হয়েছে অন্যদিকে সিনেমা সাহিত্য-নির্ভর হয়ে ওঠে। শব্দ সংযোজনার সুযোগ নিয়ে তৎকালীন বাংলা সিনেমা সম্পূর্ণভাবে সাহিত্যের চিত্ররূপ দিতে শুরু করে। নাচ, গান এবং সাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্ররূপ সিনেমাকে দর্শকমহলে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা এনে দেয়।

কিন্তু চল্লিশের দশকের পর থেকেই স্টুডিও সিস্টেম ভেঙে পড়তে শুরু করে। এর মূলে ছিল শৃঙ্খলাহীন পুঁজি ব্যবস্থা। পুঁজির বাজার তৈরি না হওয়া এবং সম্পূর্ণরূপে মহাজনী পুঁজির উপর নির্ভরশীল হওয়ার দরুণ স্টুডিও মালিকদের ক্ষতিপুরণ দিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তিও হারাতে হয়।

দ্বিতীয়ত ঃ ব্যবসার উন্নতির সাথে সাথে পড়ন্ত জমিদার এবং উড়ন্ত কালোয়াররা ভিড় করে লগ্নি করে সহজেই মুনাফা করতে। স্বাভাবিকভাবেই বিনিয়োগের এককেন্দ্রীকতা বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে। স্টুডিও মালিক এবং প্রযোজক দুটি আলাদা সূত্র তৈরি হয়।

তৃতীয়ত ঃ অভিনেতা অভিনেত্রীরা আর নিছক বেতনভূক হয়ে থাকতে রাজী হয় না। তাঁরা তাঁদের ব্যবসায়িক মূল্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।

নিউ থিয়েটার্স এত প্রতিকূলতার মধ্যে ক্রমশ বিলীন হতে শুরু করে। ১৯৪৩ পর্যন্ত গড়ে দুই বা তিনখানি ছবি বানালেও ক্রমে তার অবস্থার অবনতি ঘটে। স্টুডিও সিস্টেম এভাবেই ক্রমে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

৪.১০ সারাংশ

কলকাতার মানুষকে প্রথম সিনেমা দেখিয়েছিলেন মি. স্টিফেন্স নামে এক ব্যক্তি, সেটা ছিল ১৮৯৬ সাল। দর্শকদের মধ্যে ছিলেন যুবক হীরালাল সেন, যে অনুপ্রাণিত হয়ে বিদেশ থেকে মেশিন আনিয়ে কলকাতায় প্রথম বাঙালি প্রদর্শক হন। ১৯০০ সালে তৈরি করেন রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানি। তখনকার বিখ্যাত নাটকগুলির অংশ বিশেষের ছবি তুলে দর্শক সম্মুখে দেখাতেন।

১৯০১ সালে জে.এফ. ম্যাডান নামে এক পার্শী কলকাতার গড়ের মাঠে তাঁবু খাটিয়ে ছবি দেখানো শুরু করেন। ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেস। এটি ছিল ভারতবর্ষের প্রথম সিনেমা হল।

১৯১৩ সালে দাদাসাহেব ফালকে তৈরি করেন 'রাজা হরিশচন্দ্র', ভারতবর্ষের প্রথম কাহিনীচিত্র।

বাংলার প্রথম নির্বাক চলচ্চিত্র 'বিল্বমঙ্গল' তৈরি করেন ম্যাডানরা। ১৯১৯ সালে নির্মীত হয় বিল্মমঙ্গল।

বাংলার অন্যমত উল্লেখযোগ্য সিনেমা ব্যক্তিত্ব হল ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী বা ডি.জি। ১৯১৮ সালে তৈরি করেন ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোং। ডি.জি নির্মীত প্রথম ছবি বিলেতফেরত (১৯২১) অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। মুখ্য চরিত্র ডি.জি স্বয়ং অভিনয় করেন। ডি.জি-র সাথে সেদিন কোম্পানিতে ছিলেন নীতিশ লাহিড়ী। বাংলা সিনেমার শিক্ষিত ঘরের মেয়েদের আনার কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে ধীরেন্দ্রনাথের। ভদ্র, শিক্ষিত মেয়েদের সিনেমায় এনে মাধ্যমকে আরও সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। ওঁদের অনুপ্রাণিত করতে এবং দৃষ্টান্তস্থাপন করতে ধীরেন্দ্রনাথ নিজের স্ত্রী প্রমিলাদেবীকে সিনেমায় নিয়ে

আসেন। পরবর্তীকালে কন্যা মণিকাকে সিনেমায় অভিনয় করিয়েছিলেন।

ইন্দো-ব্রিটিশ কোং-এর পর কিছুকালের জন্য হায়দ্রাবাদে থেকে লোটাস ফিল্ম কোম্পানি তৈরি করেন। এরপর ১৯২৯ সালে কলকাতায় ফিরে প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার সাথে তৈরি করেন ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্ম কোম্পানি।

প্রমথেশ বড়ুয়া ছিলেন আসামের রাজপরিবারের সন্তান। বিদেশ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে কলকাতায় এসে ধীরেন্দ্রনাথের সাথে একত্রে তৈরি করেন ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্ম কোম্পানি। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৯ সাল অব্দি নিউ থিয়েটার্স-এ ছিলেন।

১৯৩০-এ ধীরেন্দ্রনাথ সরকার তৈরি করেন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও। ১৯৩০-৪০-এর দশকে স্টুডিও সিস্টেমের স্বর্ণযুগ বলা হয়। স্টুডিও সিস্টেমের আদর্শ উদাহরণ হল নিউ থিয়েটার্স। এই সময় নিউ থিয়েটার্স বা এন.টি-তে বহু গুণী মানুষের সমাগম হয়। ডি.জি. দেবকী বসু, প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া প্রমুখ। প্রমথেশ বড়ুয়া এই সময়ে একাধিক সফল ছবির পরিচালনা করেন যেমন দেবদাস, রজতজয়ন্তী, মুক্তি ইত্যাদি।

তিরিশের দশকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। এই সময় চলচ্চিত্র নির্বাক থেকে সবাক হয়। ভারতবর্ষের প্রথম সবাক্ চলচ্চিত্র আলম আরা (১৯৩১)। বাংলার প্রথম সবাক্ চলচ্চিত্র জামাইষষ্ঠী (১৯৩১)। এটির স্রষ্টাও ম্যাডানরা ছিলেন।

সিনেমা সবাক হওয়ার পর আরও ভাল করে সাহিত্যের চিত্ররূপ দিতে সক্ষম হল। এর সাথে যোগ হল গান আর নাচ। গান-এর উপস্থিতি সাধারণ দর্শককে সিনেমা সম্পর্কে উৎসাহিত করে। দর্শক আনুকূল্যে সিনেমা শিল্প (industry) -এর দ্রুত অগ্রগতি ঘটে। স্টুডিও সিস্টেমের শৃঙ্খলাবদ্ধ রীতিও মানোন্নয়নে সহায়ক হয়। সম্পূর্ণ ইন্‌ডোর শ্যুটিং-এর ব্যবস্থা, কৃত্রিম আলো ইত্যাদির দ্বারা পরিচালক নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো আরও ভালোভাবে।

তবে চল্লিশের দশকের পরের দিকে এই সিস্টেমের ক্রমে অবনতি ঘটে। নামী শিল্পীরাও সাধারণ বেতনভূক হয়ে থাকতে রাজী হয় না। অপেশাদার পুঁজি নিয়ন্ত্রণ আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা স্টুডিও সিস্টেমকে এক কঠিন অবস্থায় ফেলে দেয়। নিউ থিয়েটার্সও এর ব্যতিক্রম ছিল না।

৪.১১ অনুশীলনী

১. ভারতীয় সিনেমায় হীরালাল সেনের ভূমিকা আলোচনা করুন।
২. দাদা সাহেব ফালকের অবদান বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করুন।
৩. বাংলার সিনেমায় ম্যাডানের গুরুত্ব কোথায় ব্যাখ্যা করুন।
৪. ভারতীয় সিনেমার সবাক হওয়ার সাথে স্টুডিও সিস্টেমের যোগাযোগ কোথায় — ব্যাখ্যা করুন।
৫. বাংলা সিনেমা ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর আধুনিক ভাবনায় কীভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে তা আলোচনা করুন।

৪.১২ গ্রন্থপঞ্জী

History : Bengali Cinema — Kironmoy Raha
সোনার দাগ — গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ
বাংলা সিনেমা — অরুণ দত্তগুপ্ত
বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস — কালিশ মুখোপাধ্যায়
Encyclopaedia of Idian Cinema

একক ৫ ❐ নিউ সিনেমা

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য
৫.২ প্রস্তাবনা
৫.৩ পথের পাঁচালী
৫.৩.১ প্রসঙ্গ অপু ট্রিলজি
৫.৩.২ সত্যজিৎ রায়ের অন্যান্য ছবি
৫.৪ ছিন্নমূল
৫.৫ অযান্ত্রিক
৫.৬ ঋত্বিক ঘটকের ট্রিলজি : মেঘে ঢাকা তারা, সুবর্ণরেখা, কোমলগান্ধার
৫.৭ তিতাস একটি নদীর নাম
৫.৮ বাইশে শ্রাবণ
৫.৯ আকাশ কুসুম
৫.১০ ভুবন সোম
৫.১০.১ ভারতীয় সিনেমার নিউওয়েভ বা নতুনধারা
৫.১১ কলকাতা ট্রিলজি : ইন্টারভিয়্যু, কলকাতা ৭১, পদাতিক
৫.১২ একদিন প্রতিদিন, আকালের সন্ধানে, খারিজ
৫.১৩ প্যারালাল সিনেমার অন্যান্য পরিচালকরা
৫.১৪ সারাংশ
৫.১৫ অনুশীলনী
৫.১৬ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- ১৯৫৫ সাল থেকে ভারতীয় সিনেমার পরিবর্তনের কথা।
- ভারতীয় সিনেমায় পথের পাঁচালীর গুরুত্ব এবং সত্যাজিৎ রায়ের অবদান।

- ঋত্বিক ঘটকের জীবনবোধ এবং তা ভারতীয় সিনেমাকে কীভাবে সমৃদ্ধ করেছে।
- মৃণাল সেন ১৯৬৯-এর পর কীভাবে তৎকালীন নতুন পরিচালকদের উদ্বুদ্ধ করেছেন যা পরবর্তীকালে জন্ম দিয়েছে এক নতুন ধারার।
- সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক এবং মৃণাল সেনের বিভিন্ন ছবির কথা।

৫.২ প্রস্তাবনা

হলিউড এবং ইতালীয় নিও-রিয়াল্ইজ্ম্ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সত্যজিৎ রায় তৈরি করেন ওঁর যুগান্তকারী ছবি 'পথের পাঁচালী'। সেটা ১৯৫৫ সাল। চিরাচরিত ফর্মুলার বাইরে ভিন্ন স্বাদের এই সুন্দর ছবি ভারতীয় দর্শক তথা চলচ্চিত্র বোদ্ধাদের বিমোহিত করে। সত্যজিৎ রায়-ই প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্রকার যিনি চলচ্চিত্রকে একটি স্বতন্ত্র মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইতঃপূর্বে ভারতীয় চলচ্চিত্র ছিল গল্প বা উপন্যাসের নিছক চিত্ররূপ মাত্র। এখানে থেকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের পরিণত হওয়ার শুরু।

এই সময় এবং কিছু পরে একাধিক চলচ্চিত্রকার প্রচলিত রীতি নীতির বাইরে গিয়ে বাস্তবধর্মী ছবি তৈরি করেছিলেন।

১৯৫৯ সালে 'অযান্ত্রিক' ছবির মাধ্যমে বাঙালি-দর্শক পরিচিত হন আর একটি বিশিষ্ট পরিচালকের সাথে— ঋত্বিক কুমার ঘটক। কোন বিশেষ স্কুলের বা মতবাদ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নয়, সম্পূর্ণ নিজস্ব একটা প্রকাশ ভঙ্গিতে ঋত্বিক ঘটক ওঁর বক্তব্য ফুটিয়ে তুলতেন।

মৃণাল সেন প্রায় একই সময় ছবি তৈরি করা শুরু করেলও ওঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল ভারতীয় সিনেমার নব তরঙ্গের উনি সূচনা করেছিলেন। সেটা ছিল ১৯৬৯ সাল। ছবির নাম 'ভুবন সোম'। অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন অনেক নতুন চলচ্চিত্র নির্মাতা। নব তরঙ্গ কিন্তু শুধু পশ্চিমবঙ্গে আবদ্ধ থাকেনি। দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে, বম্বেতে দেখা যায় নতুন ধারার ছবি। সমগ্র সত্তরের দশক ধরে ভারতীয় সিনেমা নব তরঙ্গের দ্বারা আলোড়িত হয়। বিষয় এবং আঙ্গিক নিয়ে বিভিন্ন রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছিল সেই সময়। কিন্তু আশির দশকে এই নব তরঙ্গ স্তিমিত হয়ে যায়।

৫.৩ পথের পাঁচালী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেব পর সারা পৃথিবীতে সিনেমা শিল্পে একটা পরিবর্তন আসে। সিনেমা হয়ে ওঠে বাস্তবমুখী। সম্পূর্ণ চাকচিক্যহীন, চিরাচরিত নায়ক নায়িকা বর্জিত, অনামী সাধারণ মানুষের জীবনের গল্প নিয়ে এক নতুন ধারার সিনেমার আত্মপ্রকাশ ঘটে, যেখানে কঠোর বাস্তব হয়ে ওঠে ছবির প্রতিপাদ্য বিষয়। যেমন ইতালীর নিও-রিয়ালিজ্ম (Neo-Realism), ফ্রান্সের নিউ-ওয়েভ (New-Wave) প্রমুখ।

ভারতবর্ষেও এই পরিবর্তনের ঢেউ আছড়ে পড়ে। ১৯৫৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' তৎকালীন ভারতীয় দর্শকের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা।

এর আগে দর্শকরা অভ্যস্ত ছিলেন জনপ্রিয় উপন্যাস অবলম্বনে রোমান্টিক প্রেমের ছবি দেখতে। যে ছবি জুড়ে বাজত বিয়োগবিধুর সুর, কখনও ছবির পরিণতি হত বিয়োগান্ত ঘটনায়। ছবিগুলিকে অস্বাভাবিক আবেগপ্রবণ করা হত দর্শক আনুকূল্য পেতে। পারিবারিক সমস্যা হিসেবে নয়। মূল চরিত্রে থাকতেন জনপ্রিয় নায়ক, নায়িকা। যেমন পঞ্চাশের গোড়া থেকে সত্তরের প্রথম দিক পর্যন্ত বাংলা ছবির সর্বাধিক জনপ্রিয় জুটি ছিলেন উত্তম-সুচিত্রা।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের নাচ-গান, স্থূল ভাবাবেগের ফর্মূলা এবং সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণের রীতিকে নস্যাৎ করে দেয় পথের পাঁচালী। ভারতীয় ছবি এই প্রথম বিশ্বের দরবারে সমাদৃত হয়। ইতালীয় নিও-রিয়াল্ইজ্ম (New-Realism)

থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সত্যজিৎ রায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উপন্যাস অবলম্বনে এই ছবি তৈরি করেন। মুক্তিলাভের সাথে সাথে ভারতীয় দর্শক এই ছবি দেখে হতচকিত হয়ে যায়। প্রথমতঃ ছবিতে কোন সুনির্দিষ্ট গল্প নেই। বাংলার গ্রামের এক হতদরিদ্র পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের কাহিনী যেখানে কোন রোমাঞ্চ নেই, কোন নায়কের বীরোচিত কাণ্ডকারখানা নেই, নেই কোন নায়ক নায়িকার প্রেমগাথা। দারিদ্র এখানে বিষাদ-বিধুর নয়, জীবনের অতি স্বাভাবিক অবস্থা।

দ্বিতীয়ত ঃ ছবিতে কোন বিখ্যাত তারকা নেই। পরিবারের কর্তা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ওর স্ত্রী সর্বজায়ার ভূমিকায় অভিনয় করেন করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, অপুর ভূমিকায় সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দূর্গা হয়েছিলেন উমা দাশগুপ্ত। সুবীর এবং উমা এরপর আর অভিনয়ও করেননি।

তৃতীয়ত ঃ সঙ্গীত ছিল সর্বার্থে ভারতীয়। সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন বিখ্যাত সেতারশিল্পী রবিশঙ্কর। ভারতীয় ছবির চিরাচরিত গানের সিকোয়েন্স এবং ফর্মূলা এখানে অনুপস্থিত। গান ছিল ঠিকই কিন্তু হরিহরের বৃদ্ধ দুসম্পর্কীয়া দিদি ইন্দির ঠাকুরণের মুখে। ইন্দির ঠাকুরণের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অতীতকালের অভিনেত্রী চুনিবালা দেবী। 'হরি দিন তো গেল' গানটি চুনিবালা দেবী সাদা গলায় নিজেই গেয়েছিলেন।

চতুর্থ বিষয় হল, সম্পূর্ণ শুটিং হয়েছিল স্টুডিও-র বাইরে, তৎকালীন সিনেমায় সেটা অকল্পনীয় ছিল। হরিহরের বাড়ির শুটিং হয়েছিল বোড়ালের একটি গ্রামে আর কাশফুলসহ অপু দুর্গার বিখ্যাত দৃশ্যর শুটিং হয়েছিল অন্য একটি জায়গায়।

ছবির ডিটেলস্ (Details) ছিল দেখবার মত, ভারতীয় সিনেমায় অভূতপূর্ব। যেহেতু ইন্দির ঠাকুরণ দাওয়ায় একা বসে গান গাইবেন, চুনিবালার গানে শ্রীরায় কোন বাদ্য যন্ত্রের সঙ্গতে রাখেননি। চুনিবালা দেবীকে একটি শতছিন্ন পুরনো শাড়ি পড়তে দেওয়া হয়েছিল চরিত্রটিকে বাস্তবসম্মত করার জন্য।

সম্পূর্ণ মেলোড্রামা বর্জিত এই ছবিতে একটি লক্ষণীয় বিষয় হল সংলাপের কার্পণ্য। সেই নূন্যতম সংলাপ এতই স্বাভাবিক এবং বাস্তবধর্মী যে মনে হয় যেন কোন কাহিনী চিত্রের চরিত্র নয়, বাস্তবে কোন মানুষের কথা। সংলাপের বদলে শুধু সঙ্গীতের ব্যবহারের দ্বারা একটা দৃশ্য কতটা বাঙ্ময় হতে পারে, দৃশ্যের ব্যঞ্জনা কত গভীর হতে পারে তার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হরিহরের দেশে ফিরে দূর্গার মৃত্যু সংবাদ পাওয়া। এখানে সত্যজিৎ রায় মূল উপন্যাস থেকে সামান্য পরিবর্তন করলেও সিনেমা মাধ্যমটির যথার্থ প্রয়োগ করেছেন। সত্যজিৎ রায়ের কথায় — "কান্নার শব্দে কেমন একটা বিভৎসতা আছে যেটা পরিহার করার উদ্দেশ্যে এই দৃশ্যে স্বাভাবিক শব্দের বদলে তার সানাই-এর তার-সপ্তকে পটদীপ রাগে একটি করুণ রস বাজানো হয়েছিল। এ যেন কান্নারই সামিল। আমার বিশ্বাস এতে করুণরস ঘনীভূত হয়েছে।"

ছবির চিত্রনাট্য স্বয়ং সত্যজিৎ রায় রচনা করেছিলেন। ওঁর কথায় "চিত্রনাট্যের কাজটা পরিচালকের পক্ষেই করা স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়।" উনি আরও বলেছেন, "কাহিনী নির্বাচনের প্রথম কাজ হল চিত্রনাট্য-রচয়িতার, ইনি কাহিনীকে চলচ্চিত্রের ছাঁচে ঢেলে সাজান।...চিত্রনাট্যর ভাষা হলো ছবির ভাষায় লিখিত ইঙ্গিত মাত্র। এর মূল্য কাঠামো বা 'স্কেলিটন' হিসাবে। ...ছবির যে ভাষায় ইঙ্গিত চিত্রনাট্যে দেওয়া হলো, তাকে ব্যক্ত করা হবে ক্যামেরার মাধ্যমে।" সত্যজিৎ রায়ের কথার প্রয়োগ দেখা গেছে পথের পাঁচালী-তে। সাহিত্যের মূল বক্তব্যের প্রতি সৎ থেকেও চলচ্চিত্রের একটা ভাষার উপস্থিতি এই প্রথম উপলব্ধ হয়। সত্যজিৎ রায়ের মতে, "...কাহিনী মাত্রেরই দুই দিক আছে — এক হলো তার বক্তব্য, আর এক হলো তার ভাষা। ...চলচ্চিত্র শিল্পও তার ভাষায়, তার বিন্যাসকৌশলে। যেখানে ভাষা দুর্বল, সেখানে গল্প ভাল হলেও ছবি শিল্প সাফল্য লাভ করতে অক্ষম। চলচ্চিত্রের এই ভাষা ছবির ভাষা। পরিচালককে এই ভাষা জানতে হবে, এর ব্যাকরণ তাঁকে আয়ত্ত করতে হবে।" চলচ্চিত্রের ভাষার প্রয়োগ ইতিপূর্বে কোন ছবিতে দৃষ্ট হয়নি। কাহিনীর বর্ণনাকে ক্যামেরার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

ভারতীয় এক সমালোচকের ভাষায় "যে চিত্রভাষার অভাবে ভারতীয় সিনেমা পাশ্চাত্যের ছবির সমতুল্য হতে পারত না, ওঁর ছবিতেই প্রথম সেটা পাওয়া গেল।"

সারা পৃথিবীতে সমাদৃত হয় পথের পাঁচালী। ১৯৬৬ সালে কান চলচ্চিত্র উৎসব (Cannes Film Festival)-এ 'দ্য বেস্ট হিউম্যান ডকুমেন্ট' (The Best Human Document) হিসেবে পুরস্কৃত হয়। এছাড়া এডিনবরা (Edinburgh) ফিল্ম উৎসব ১৯৫৫, সান্ ফ্রান্সিস্কো-র ফিল্ম উৎসব (১৯৫৭), বার্লিন-এর সেল্জ্নিক্ গোল্ডেন লরেন অ্যাওয়ার্ড (Selznik Golden Lawrel Award) প্রমুখ পুরস্কারে ভূষিত হয়। ভারতবর্ষে শ্রীরায় পেয়েছিলেন প্রেসিডেন্টস্ গোল্ড মেডেল (President's Gold Medal) ১৯৫৬ সাল।

৫.৩.১ প্রসঙ্গ অপু ট্রিলজি (Apu Trilogy)

১৯৫৬ সালে সত্যজিৎ রায় উপন্যাস পথের পাঁচালীকে আবার অবলম্বন করে তৈরি করেন 'অপরাজিত'। এখানেও কোন গল্প নেই। বালক থেকে কিশোরে পরিণত অপুকে আমরা এখানে দেখি। হরিহর কাশীতেই দেহরক্ষা করেন। গ্রামে (নিশ্চিন্দপুরে নয় অবশ্য) ফিরে আসা, অধিক পড়াশোনা করতে দু'চোখ ভরা স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অপুর কলকাতা যাত্রা— ক্রমে কলকাতার সাথে একাত্ম হয়ে পড়া অপুর মার সাথে দূরত্ব তৈরি হওয়া— সর্বজায়ার মৃত্যু— অপুর বরাবরের জন্য দেশ ত্যাগ এই হল ছবি 'অপরাজিত'।

'অপরাজিত' শ্রীরায়ের একটি অনবদ্য শিল্পকর্ম। কিন্তু বাঙালি দর্শক 'অপরাজিত'-কে গ্রহণ করেনি। এর কারণ সম্ভবত: বাঙালি দর্শকের স্বাভাবিক আবেগপ্রবণতা। 'অপরাজিত'-তে অপু-সর্বজায়ার মধ্যে শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা দূরত্ব, অপুর মায়ের প্রতি বয়সসুলভ উদাসীনতা ছবির মধ্যে একটা নির্মম ভাব তৈরি যা তৎকালীন দর্শকের পক্ষে গ্রহণীয় হয়ে ওঠেনি।

মূল উপন্যাস থেকে ছবিতে পরিবর্তন করেছিলেন শ্রীরায়। উপন্যাসে কলকাতায় অপুর জীবনে এক নারী এসেছিল। কিন্তু শ্রীরায় তাঁর ছবিতে এই নারী চরিত্রকে রাখেননি। মা এবং পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় নারী চরিত্রের বদলে দূরত্বের কারণ হিসেবে শুধুমাত্র শহর কলকাতাকেই উপস্থিত করেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী অপরাজিত অবলম্বনে সত্যজিৎ রায়ের তৃতীয় ছবি 'অপুর সংসার'। ১৯৫৯ সালে নির্মীত হয় এই ছবি। 'পথের পাঁচালী' - 'অপরাজিত' - 'অপুর সংসার' এই তিনটি একত্রিত হয়ে অপু ট্রিলজি (Apu Trilogy) নামে বিখ্যাত। যৌবনে উপনীত অপু সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন দেখে। হঠাৎ করে অপর্ণার সাথে পরিণয়। নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেও অপর্ণা-অপুর সংসার মাধুর্যময় ছিল। কিন্তু সন্তান প্রসবকালে অপর্ণার আকস্মিক মৃত্যু অপুর জীবন তছনছ করে দেয়। অপু সদ্যজাত পুত্রকে মেনে নিতে পারে না। অপুর কাছে জীবন ধূসর, বালুকাময় লাগে। অবশেষে পরিণতিতে আমরা দেখতে পাই পাঁচ বছর বয়স্ক পুত্র কাজলকে নিয়ে অপু শ্বশুরালয় থেকে বেড়িয়ে পড়ে, জীবনের অর্থ সে খুঁজে পেয়েছে।

পথের পাঁচালী থেকে অপুর সংসার — এই যাত্রা কালে সত্যজিৎ রায়ের দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমে যেন নিরাসক্ত থেকে অপুর সাথে একাত্ম হয়ে গেছে। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে মোট ৩৬টি ছবি করেছেন সত্যজিৎ রায়। এই দীর্ঘ সময়ে কোন বিশেষ একটি থিমে আবদ্ধ না থেকে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে গেছেন।

৫.৩.২ সত্যজিৎ রায়-এর অন্যান্য ছবি

পথের পাঁচালী, অপরাজিত-তে গ্রাম, গ্রাম্য জীবন নিয়ে কাজ করার পরেই '৫৮-তে কলকাতা শহরের প্রেক্ষাপটে, মধ্যবিত্তের স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তৈরি করেন পরিহাসমূলক ছবি 'পরশ পাথর'। ১৯৫৮-তেই আবার বিষয়ান্তর। সামন্ততান্ত্রিক ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত্যের সঙ্গে নব্য ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্ব-এর ছবি 'জলসাঘর'। শিল্পায়নের ইঙ্গিত পাওয়া যায় গ্রামের মেঠো রাস্তায় মোটর গাড়ির ধুলো ওড়ানোর মধ্যে দিয়ে। পুরনো-নতুন-এর সংঘাত আবার এসেছে 'দেবী' (১৯৬০) ছবিতে। তবে এখানে সংঘাত ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার বনাম যুক্তিবাদী আলোকিত চিন্তাধারার।

কাঞ্চনজঙ্ঘা (১৯৬২) ছবিতে পুরনো-নতুন-এর দ্বন্দ্ব ছবির একটি অন্যতম উপাদান। ঔপনিবেশিক মানসিকতাকে

স্বাধীনতা-উত্তর নতুন প্রজন্মের মুক্ত চিন্তাধারার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হতে হয়। কলকাতার পটভূমিকায় একাধিক ছবি করেছেন সত্যজিৎ রায়। ১৯৬৩-তে 'মহানগর'। দেশভাগের পর হাজার হাজার পরিবারে চরম দারিদ্র্যের মুখোমুখি হয়। তার সাথে ঘটে যায় এক সামাজিক বিপ্লব। মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা গৃহবধূরা অর্থোপার্জনের তাগিদে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। সে করমই এক গৃহবধূ এ ছবির মুখ্য চরিত্র। মহানগর-এর ৭ বছর পর তৈরি করেন প্রতিদ্বন্দ্বী। এখানেও জীবিকার সন্ধানে জীবনযুদ্ধ। কিন্তু এখন কলকাতার পরিবেশ বদলে গেছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বদল ঘটেছে। একদিকে নকশাল আন্দোলনের অশান্ত পরিবেশ অন্যদিকে চাকরির ক্ষেত্রে হাহাকার। সিদ্ধার্থ এক মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। চারিদিকে অবক্ষয়ের চিহ্ন, মূল্যবোধের অবনতি ঘটেছে। ছবির শেষে স্লোগান ভরা কলকাতার দেওয়ালের ওপর দিয়ে একটি লম্বা প্যান শট নিয়ে শেষ হয় মফস্বলে। সিদ্ধার্থ যেখানে চাকরি নিয়ে চলে গেছে। সেখানে কোন স্লোগান নেই। পাখির ডাক, 'রামনাম সৎ হ্যায়' ডাক নিরন্তর প্রকৃতির শাশ্বত জীবনের কথা বলে। এর পরের বছর তৈরি করেন 'সীমাবদ্ধ'। শ্যামলেন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, বেসরকারি কোম্পানিতে উচ্চ পদে আসীন। আরও উন্নতিকল্পে মূল্যবোধ বিসর্জন দেয়। নতুন প্রজন্মের অবক্ষয়ের কথা সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে এর পরেও দেখা গেছে শাখা প্রশাখা (১৯৯০) ছবিতে। বাবা আদর্শবাদী সত্যনিষ্ঠ মানুষ, সফলও বটে। কিন্তু ছেলেদের সাফল্যের পিছনে আছে মূল্যবোধ বিসর্জনের গল্প। '৭৫ সালে নির্মীত 'জনঅরণ্য' ছবিতে আবার বেকারত্ব, জীবিকার সন্ধানের গল্প। সোমনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুলে নম্বর কম পায়। চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই দেখে ব্যবসা করতে যায়। অর্ডার সাপ্লাই-এর ব্যবসা। অফিসে অফিসে কাগজ-কালির জোগান দেয়। ব্যবসা করতে নেমে আরও বড় জোগানদারের খোঁজ পায়, সে জোগান দেয় 'মেয়ে'। খোঁজ পায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মা-র, যে দুই মেয়েকে দিয়ে ফ্ল্যাটে বসেই 'দেহ ব্যবসা' চালায়। ছবির শেষে বড়সড় অর্ডার পেতে এক অফিসারকে 'মেয়ে' জোগান দেবার সময় চরম অবস্থার মুখোমুখি হয়। মেয়েটি ওর বন্ধুর বোন। অর্থাভাবে সে দেহ বিক্রী করছে, দাদা বেকার, ঘরে বসা। সামাজিক অবক্ষয়ের এক চূড়ান্ত রূপ। অত্যন্ত বাস্তববাদী এই ছবি পরিচালকের নিরপেক্ষ ভঙ্গীমায় আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে। এই বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে চারুলতা (১৯৬৪)। অত্যন্ত কাব্যময় এই ছবির প্রেক্ষাপটে রেনেসাঁস যুগের কলকাতা। ধনী, শিক্ষিত, চিন্তাশীল বিভূতি আর তার শিক্ষিত রুচিশীল স্ত্রী চারুলতার জীবনে হঠাৎই কালবৈশাখীর ঝড়ের মত অমলের প্রবেশ (ছবিতে কালবৈশাখীর সাথে অমল প্রবেশ করেছিল)। তাদের জীবনকে তছনছ করে সে যখন চলে গেল তখন বিভূতি, চারু-র মধ্যে যোজন দূরত্ব, দুই মেরুতে অবস্থিত। এখানে চারুর একাকীত্ব দেখানার সিকোয়েন্সটি একটি অসাধারণ শিল্পকর্মের নিদর্শন। এই একাকীত্ব আমরা আরেকটি ছবিতে পাই, যদিও পটভূমিকা বদলে গেছে — 'নায়ক ছবিতে। 'নায়ক' অরিন্দম-এর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ভীতি, একাকীত্ব তাকে একজন মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। হাজার হাজার মানুষের আরাধ্য রূপোলী পর্দার নায়কও আদতে একটি মানুষ — ছবির শেষে এটাই আবিষ্কার করে দর্শক। এখানে কলকাতা থেকে দিল্লিগামী ট্রেনে নায়ক অরিন্দমের সহযাত্রীদের বিচিত্রতা ছবিকে একটি আলাদা মাত্রা দেয়। দুটি অসম বয়সী মানুষের সম্পর্কের মধুর ছবি 'পোস্টমাস্টার'। তিনকন্যা ('৬১)-র প্রথম ছবি এটি। সত্যজিৎ রায়রে ছবিতে জাতপাতের সমস্যা খুব নির্মমভাবে দেখানো হয়েছে। ছবির নাম 'সঙ্গতি'। ১৯৮১ সালে নির্মীত এটি। ব্রাহ্মণ ঘসিরামের গৃহে কাজ করতে আসা মৃত দুখী চামার-এর শব ব্রাহ্মণ ছোঁবে না। অতএব শবকে ঘসিরাম দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে যায়। '৬৯-এ ভিন্ন স্বাদের ছবি 'অরণ্যের দিন রাত্রি' তৈরি করেন। কলকাতা শহরের চারজন যুবকের শহরের বাইরে বেড়াতে যাওয়া নিয়ে ছবি। চরিত্রগুলির অবস্থান, বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের আবেগ অনুভূতির স্তর ভেদ, তার সাথে ওখানে গিয়ে আলাপ হওয়া দুটি মেয়ের ক্রমবিকাশ — পরিচালকের বিশ্লেষণী ক্ষমতা, শৈল্পিক মনের এবং দক্ষতার এক অসাধারণ নিদর্শন। রাজনৈতিক ছবি না হলেও রাজনীতির কুরূপ খুব প্রকটভাবে দেখা গেছে ঘরে বাইরে (১৯৮৪) ছবিতে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতীয় রাজনীতিবিদ্‌দের সুবিদাবাদী ও নোংরা চেহারাটা এই ছবিতে শ্রীরায় দেখিয়েছেন। 'শতরঞ্জ কী খিলাড়ী' (১৯৭৭) ছবিতে আরেকটি চিত্র দেখা যায়। অকর্মণ্য আয়েসি নবাব-আমির-ওমরাহদের সরিয়ে কত অনায়াসে অযোধ্যার শেষ নবারের আমলে ইংরেজরা তাদের শাসন কায়েম করে। ছোটদের

জন্যও একাধিক ছবি করেছেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'হিরকরাজার দেশে' (১৯৮০) ছোটদের ছবির থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ একনায়কতন্ত্র নিয়ে পরিচালকের বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গির জন্য। সর্বশেষ ছবি আগন্তুক (১৯৯১)-কে সত্যজিৎ রায় সভ্যতার ধারণাকে প্রশ্ন করেছেন। এ ছবিতে তিনি যেন নিজের জীবন দর্শনের কথাই বলতে চেয়েছেন। পরিব্রাজক আগন্তুক আসলে সত্যজিৎ রায়েরই অল্টার ইগো (alter ego)।

সত্যজিৎ রায় একাধিক ছবি জনপ্রিয় লেখকদের গল্প অবলম্বনে করেছেন। যেমন পথের পাঁচালী, অপরাজিত, অপুর সংসার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী অপরাজিতর উপর ভিত্তি করে নির্মীত। চারুলতা— রবীন্দ্রনাথেব নষ্টনীড় অবলম্বনে, পরশপাথর রাজশেখর বসুর পরশপাথর অবলম্বনে, দেবী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প থেকে, মহানগর নরেন্দ্রনাথ মিত্রর অবতারণিক অবলম্বনে ইত্যাদি। প্রয়োজনে ছবিতে মূল রচনার পরিবর্তন করেছেন কিন্তু কখনই তাঁর সেই গল্পের বা উপন্যাসের চিত্ররূপ হয়নি। বরঞ্চ অন্য মাধ্যমে নির্মীত শিল্পকর্মের তিনি সার্থক স্রষ্টা ছিলেন।

পথের পাঁচালীর যে অভিনবত্ব ছিল অর্থাৎ অনামী অভিনেতা, শুটিং সম্পূর্ণভাবে স্টুডিও-র বাইরে তা থেকে সত্যজিৎ রায় নিজেই পরে সরে এসেছিলেন। ছবি বিশ্বাস (জলসাঘর-এ, কাঞ্চনজঙ্ঘা-য়), উত্তমকুমার (নায়ক-এ) ত্রিমুখ তারকাদের নিয়ে পরবর্তীকালে কাজ করেছেন; সম্পূর্ণ একটি ছবি (গণশত্রু) ও ইণ্ডোরে তুলেছিলেন। কিন্তু ওঁর নির্মাণের যে মূল শৈলী তার প্রতি বরাবর সত্যনিষ্ঠ থেকেছেন। চলচ্চিত্রের ভাষায়, ছবির ভাষায় গল্প তিনিই প্রথম বলেছিলেন।

৫.৪ ছিন্নমূল

পথের পাঁচালীর আগে নিমাই ঘোষ তৈরি করেছিলেন 'ছিন্নমূল' ১৯৫১ সালে। বাংলাদেশ থেকে আগত বাস্তুহারাদের নিয়ে ছিল নিমাই ঘোষেব ছিন্নমূল। ছবির অনেকটা শুটিং হয়েছিল শিয়ালদহ স্টেশনে। বিষয়বস্তুতে এবং আঙ্গিকে 'ছিন্নমূল' যথেষ্টই বাস্তবধর্মী ছিল। তবে বাণিজ্যিক সাফল্য পায়নি ছবিটি। এক সমালোচক বলেছিলেন, "A major milestone in the growth of a socially conscious cinema in India."

৫.৫ অযান্ত্রিক

সুবোধ ঘোষের ছোট গল্প অবলম্বনে ঋত্বিক কুমার ঘটক ১৯৫৯ সালে তৈরি করেন 'অযান্ত্রিক'। একটি ভাঙা গাড়ি জগদ্দল এবং তার চালক বিমল এরাই হল ছবির মূল চরিত্র। বিমল যদি হয় নায়ক তবে ওর নায়িকা ওই গাড়ি। এইরকম অভিনব বিষয়বস্তু নিয়ে ইতিপূর্বে কেউ কাজ করেনি। সত্যজিৎ রায় অযান্ত্রিক সম্পর্কে বলেছিলেন, "ঋত্বিক বিষয়বস্তু নির্বাচনে একটা অসম সাহসের পরিচয় দিয়েছিল। ঠিক সেই জাতীয় ছবি তাঁর আগে বাংলার চলচ্চিত্র জগতে কেউ করেনি। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে নীরস ছবি— নায়ক বলতে একজন গাড়ির ড্রাইভার এবং নায়িকা বোধহয় সেই গাড়িটাকে বলা চলে। সেখানে সাহসের পরিচয় বলতে একটা ছিল যে সেই গাড়িটার মধ্যে একটা মনুষ্যত্ব আরোপ করার চেষ্টা করা হয়েছিল, যাকে বলা যেতে পারে এক ধরণের "anthropomorphism." ঋত্বিক ঘটকের ছবির একটা বৈশিষ্ট্য হল ওঁর সব চরিত্রই archetypal, এখানে বিমল যেন যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য বয়ে আনা আদিবাসীদের সাথে একাত্ম হয়ে যায়। ছবিতে ব্যবহৃত ওঁরাও-দের লোকসঙ্গীতের সুর ছবিকে তাই আরও বাঙ্ময় করে তোলে। মূল গল্প যেখানে শুধুই জগদ্দল এবং বিমলের সম্পর্ক নিয়ে সীমিত থেকেছে সেখানে ঘটকের এই লোক সংস্কৃতির প্রসঙ্গ টেনে আনার মধ্যে দিয়ে ছবির গভীরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ঋত্বিক ঘটকের কথায়। "...there is an epic tradition which dominates the Indian mentality. It has seeped into the Indian subconscious. It is no surprise, therefore, that Indians are attracted to mythologicals. I am part of it. I am all for

it. It is in our time since time immemorial. In my film I rely mainly on the folk form." ছবি শেষে নতুন জীবনের ইঙ্গিত দেয়। জগদ্দলকে ঠেলায় করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর তখন জগদ্দলের ভাঙা হর্ন বাজায় একটি ছোট্ট ছেলে। জন্ম-শিকার-বিবাহ-মৃত্যু-নবজন্ম জীবনেরএই চক্র সাঁওতাল নাচের মধ্যে দিয়েও বলা হয়।

সাধারণ দর্শককুল এই ছবি গ্রহণ না করলেও বিদগ্ধজনেরা এই নতুন ভঙ্গিমা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছিলেন। ভারতীয় চলচ্চিত্রে এটি অভূতপূর্ব ছিল।

৫.৬ ঋত্বিক ঘটকের ট্রিলজি : মেঘে ঢাকা তারা, সুবর্ণরেখা, কোমলগান্ধার

"দেশ, সমাজ, মানুষকে বাদ দিয়ে কোন মহৎ শিল্পকার্য হয় না।" ঋত্বিক ঘটকের সমস্ত কাজের মধ্যে তাঁর এই বিশ্বাসের, ভাবনার পরিচয় আমরা পেয়েছি। দেশভাগের যন্ত্রণা থেকে শ্রীঘটক কোনদিন মুক্ত হতে পারেন নি। তাঁর কাজের মধ্যে বারে বারে তিনি এই যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করেছেন। সে কথা শুধুমাত্র গৃহহীন এক ব্যক্তির কাতরোক্তি নয়, এ হল গৃহচ্যুত, শিকড় থেকে উৎপাটিত ছন্নছাড়া এক জাতির কথা। এ প্রসঙ্গে ফরাসী চলচ্চিত্রকার জঁ রনোয়া (Jean Renoir)-র একটি মন্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক— সব পরিচালকই জীবনে একটি ছবিই বানাতে চায়, একটি কথাই বলতে চায়। ঋত্বিক ঘটক তাঁর কবিতা, গল্প, নাটক, চলচ্চিত্র সব কিছুরই মধ্য দিয়ে বলতে চেয়েছেন তাঁর বড় প্রিয় অভাগা এই বাংলার কথা। 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৫৯), 'কোমলগান্ধার' (১৯৬০) এবং 'সুবর্ণরেখা' (১৯৬১) এই তিনটি ছবিরই প্রতিপাদ্য বিষয় দেশভাগ, উদ্বাস্তু মানুষদের জীবনের কথা। ঋত্বিক ঘটক মেঘে ঢাকা তারা এবং সুবর্ণরেখার সুস্পষ্ট গল্পের আশ্রয় নিয়েছেন, কোমলগান্ধারে সচেতনভাবেই গল্পকে বর্জন করেছেন। তিনটি ছবিতেই কিছু উদ্বাস্তু মানুষ এবং তাদের বাঁচার চেষ্টার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় নতুন এক সমাজের চিত্র। এই সমাজ সম্পর্কে ঘটক তাঁর হতাশা গোপন করেননি। উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষগুলি হারিয়ে ফেলেছে তাদের পরিচয়, তাদের শিক্ষা, তাদের দায়িত্ববোধ। শিকড়হীন হয়ে তারা যেন আজ নিরালম্ব বায়ুভূত। এই সমাজের মানুস 'মেঘে ঢাকা তারা'-র নিতা, শংকর, গিতা...'সুবর্ণরেখা'-র ঈশ্বর, সীতা, অভিরাম। নিতা এই সমাজে বাস করতে পারে না কারণ সে বিনা প্রতিবাদে শুধুই নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। সংসারের প্রয়োজনে টাকা দিয়েছে, আত্মসুখ বিসর্জন দিয়েছে এমনকি নিজের প্রেমিককে তুলে দিয়েছে বোনের হাতে। মৃত্যুই তাই তার ভবিতব্য এবং সেখানেই ওর মুক্তি। সুবর্ণরেখাতে এই আত্মসুখসর্বস্ব সমাজের প্রতিনিধি ঈশ্বর। ঈশ্বর বিসর্জন দেয় নিজের আদর্শ, ত্যাগ করে পরিজন, বিস্মৃত হয় তার দায়িত্ব— বোন সিতার প্রতি, অভিরামের প্রতি, সমাজের প্রতি। ঋত্বিক ঘটক 'উদ্বাস্তু' বলতে শুধুমাত্র ভিটে মাটি ছেড়ে আসা মানুষগুলির কথা বলেননি, 'উদ্বাস্তু' শব্দটিকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন বর্তমান পচনশীল সমাজকে বোঝাতে। বর্তমান সমাজ গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে ক্রমাগত ভোগ লালসায় উন্মত্ত হয়ে সর্বনাশের খেলায় মেতে উঠেছে। এই সমাজে ভিন্নভাবে বাঁচা যায় না। তাই সীতা অভিরামের প্রেম, বিবাহ সফল হয় না। হরপ্রসাদের মত আদর্শবাদী মানুষও সর্বস্ব খুইয়ে ঈশ্বরের সাথী হয়ে কলকাতায় আসে বীভৎস মজা লুটতে। কলকাতার পানশালায় বুর্জোয়া শ্রেণীর অবক্ষয় বোঝাতে ফেলিসির 'লা দোলচে ভিতা'-য় ব্যবহৃত 'প্যাট্রিসিয়া' সুর ঋত্বিক ঘটক ব্যাক গ্রাউণ্ড মিউজিক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। হরপ্রসাদের মুখে তখন উপনিষদের শ্লোক। পশ্চিমী সমাজের বিকৃতিকে আঘাত করতে ফেলিনি এই সুর ব্যবহার করেছিলেন।

সুবর্ণরেখাকে অবক্ষয়ের ছবি বলে সমালোচনা করা হয়েছিল। কিন্তু ঋত্বিক ঘটক ছবিতে সামাজিক অবক্ষয়ের অবস্থা তুলে ধরলেও ছবির শেষে সেই আসার সুর। সীতা অভিরামের শিশুপুত্র বিনু-র হাত ধরে ঈশ্বর এগিয়ে যায় নতুন বাড়ির দিকে।

ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে মেলোড্রামা ছবির কাঠামোর কাজ করে। ওঁর ছবিতে তিনটি স্তর থাকে। প্রথমটি হচ্ছে নিছক গল্পের স্তর। দ্বিতীয়টি বৃহত্তর সমাজের সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করছে আর তৃতীয়টি সবচেয়ে গভীরে অবস্থিত। এটি হচ্ছে

সেই স্তর যেখানে পুরাণ, ইতিহাসের সাথে চরিত্র একাত্ম হচ্ছে। "মেঘে ঢাকা তারা"-য় হারাণ মাস্টারের সংসারের গল্প নিয়ে গঠিত ছবির প্রথম স্তর। দ্বিতীয় স্তরে নিতার কাহিনী সার্বজনীন হয় আর তৃতীয় স্তরে নিতাকে শ্রীঘটক জগদ্ধাত্রী রূপে কল্পনা করেছেন।

ছবিতে মেলোড্রামার প্রয়োগ করে ঋত্বিক ঘটক তীব্রতা সৃষ্টি করেছেন। যেমন ঈশ্বর বীভৎস মজা লুটতে নিজের অজান্তে নিজের বোন সীতার ঘরে ঢোকে। সীতা বাধ্য হয় আত্মহত্যা করতে। ঈশ্বর বিনুর হাত ধরে শহর ত্যাগ করে।

কোমলগান্ধার ছবিতে ঘটক দেশভাগের পাশাপাশি নাট্য আন্দোলন ও নাটকের স্টাইল নিয়ে কিছু প্রশ্ন রেখেছেন। নিজে IPTA-র সাথে যুক্ত থাকার দরুণ কিভাবে সদস্যদের মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া মানসিকতা নাট্য আন্দোলনকে নষ্ট করে দেয় তা তিনি দেখেছেন। তারই প্রতিফলন দেখা যায় কোমলগান্ধার ছবিতে। গণনাট্য আন্দোলনে সামিল হয়েও আন্দোলনের Socialist realism-কে তিনি মানতে চাননি। ঋত্বিক ঘটকের মতে 'নবান্ন' নাটকের মূল বক্তব্য কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের মধ্যে দিয়েও প্রকাশ করা সম্ভব। ছবিতে মূল চরিত্র ভৃগু ঘটকের alterego। ঘটকের হয়ে সে এই মতপ্রকাশ করে। ভৃগুর পদ্মা পারে দাঁড়িয়ে ওপারে নিজের বাড়ি খোঁজার যন্ত্রণা থেকে ঘটকের দেশত্যাগের যন্ত্রণা অনুভূত হয়। After ego-র উপস্থিতি ঘটকের সব ছবিতেই পাওয়া যায়। সুবর্ণরেখায় alter ego হরপ্রসাদ আর মেঘে ঢাকা তারায় হারাণ মাস্টার। এই সত্যবাদী আদর্শবান মাস্টারমশাই আজকের ভয়ঙ্কর সময়ে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত। বড় মেয়ের চমর পরিণতির প্রতিবাদ করতে গিয়ে কাউকে অভিযুক্ত করতে না পেরে তার আঙুল গুটিয়ে যায়।

ঋত্বিক ঘটকের ছবির একটা স্বতন্ত্র স্টাইল আছে যা সম্পূর্ণভাবেই তাঁর নিজস্ব ও ভারতীয়। তিনি কোন বিশেষ স্কুলের ফিল্ম স্টাইল মানেন নি। এ প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের মন্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"....উনিশশো ত্রিশ বা পঁচিশ থেকে শুরু করে প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বা ষাট অবধি আমরা হলিউডের বাইরে খুব বেশি ছবি দেখতে পারিনি। আমাদের সকলের মধ্যেই তাই কিছু কিছু হলিউডের প্রভাব ঢুকে পড়েছে। কিন্তু ঋত্বিক এক রহস্যময় কারণে সম্পূর্ণ সে প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল; তাঁর মধ্যে হলিউডের কোন ছাপ নেই। এটা যে কী করে হয়েছিল সেটা এখনও আমার কাছে রহস্য রয়ে গেছে। যদি প্রভাবের কথা বলতে হয়, আমার মনে হয়, ঋত্বিকের ছবিতে কিছুটা — কিছু কিছু সোভিয়েট ছবির প্রভাব লক্ষ্য করা যায় কিন্তু সে প্রভাবটা — প্রভাব মানে সেখানে অনুকরণ নয়, কারণ ঋত্বিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর মৌলিকতা এবং সেটা সে শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছিল। এই সোভিয়েট ছবির প্রভাব এবং সংলাপে, বিষয়বস্তুতে, ছবির পরিসমাপ্তিতে নাটকের প্রভাব তাঁর মধ্যে ছিল, এবং এই দুটো জিনিস দাঁড়িয়েছিল যে ভিত্তির উপর সেটা একেবারে বাংলার মাটিতে বসানো। ঋত্বিক মনে প্রাণে বাঙালি পরিচালক ছিল, বাঙালি শিল্পী ছিল...'

ঘটকের ছবিতে পুরাণ, পৌরাণিক কাহিনী, লোক কাহিনী লোক সঙ্গীত, ধ্রুপদী সঙ্গীতের ব্যবহার খুবই দেখতে পাওয়া যায়। এর প্রতিটি মুখ্য কারণ হল ভারতীয় সংস্কৃতিতে এগুলি খুবই উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। এমনকি তাঁর চরিত্রগুলি যেমন নিতা, সীতা, ঈশ্বর, ভৃগু, অনুসূয়া সবই archetypal. ছবিতে চরিত্রের উর্দ্ধে উঠে গিয়ে তারা প্রতীক রূপে উপস্থিত হয়। নীতাকে শ্রীঘটক কল্পনা করেছেন জগদ্ধাত্রীরূপে। তার মধ্যে "মহীয়সী মাতার" ভয়াবহ রূপ ঘটক দেখাতে চেয়েছেন। তার এই লাঞ্ছনা, দুর্দশা যেন বাংলার লাঞ্ছনা, যন্ত্রণার প্রতীক। সুবর্ণরেখায় সীতার লাঞ্ছনা রামায়ণের সীতার লাঞ্ছনার সাথে একাত্ম হয়ে যায়। কোমলগান্ধারে অনুসূয়াকে কল্পনা করেছেন তপোবনে শকুন্তলা হিসেবে। এ সম্পর্কে ঋত্বিক ঘটকের নিজের কথা হল— "ছবিতে mythology-র প্রসঙ্গকে নানাভাবে টেনে এনে একটি পৌরাণিক ধারা বিচ্যুত আধুনিক জীবনের শূন্যগর্ভ মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছি।"

ঋত্বিক ঘটকের এই নির্মাণ-শৈলী বিদগ্ধজনেদের আপ্লুত করলেও সাধারণ দর্শকের কাছে গ্রহণীয় হয়নি। কিন্তু শ্রীঘটক বর্তমানে ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম সমাদৃত পরিচালক।

৫.৭ তিতাস একটি নদীর নাম

১৯৭৪ সালে ঋত্বিক ঘটক তৈরি করেন 'তিতাস একটি নদীর নাম'। অদ্বৈত মল্লবর্মর উপন্যাস অবলম্বনে এই ছবিটি করেন। 'তিতাস'-এর প্রেক্ষাপট পূর্ববাংলা। পূর্ববাংলার প্রতি তাঁর মগ্নতা থাকলেও এ ছবিতে ঋত্বিক ঘটক মালোদের জীবন কাহিনীই মূলত দেখিয়েছেন। তিতাস পারের মালোদের জীবন উঠে আসে এ ছবিতে, তাঁদের সুখ দুঃখ ধ্বংসের সমগ্রতা নিয়ে।

ঋত্বিক ঘটকের অননুকরণীয় নির্মাণশৈলী পরবর্তীকালে তাঁর ছাত্র (FTII; ১৯৬৪-৬৫) কুমার সাহানী, মণি কলকে অনুপ্রাণিত করে।

৫.৮ বাইশে শ্রাবণ

মৃণাল সেন দ্বারা পরিচালিত — 'বাইশে শ্রাবণ' একটি অন্য ধাঁচের ছবি। এটি শ্রীসেনের তৃতীয় ছবি। মুক্তিলাভ ১৩ই মে ১৯৬০ সালে। 'বাইশে শ্রাবণ' নাম হলেও ছবিতে কোথাও রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ পর্যন্ত নেই। শ্রীসেন দেখাতে চেয়েছেন সাধারণ মানুষের জীবনেও এই তারিখটি তাদের ব্যক্তিগত কারণে স্মরণীয় হতে পারে। যেমন এখানে দেখি এই দিনে এক দম্পতির বিবাহ হয়। এই বিবাহ তাদের জীবনে খুবই তাৎপর্যময় এক ঘটনা কিন্তু তাদের বিবাহজীবন সুখের হয় না। স্বামীটি বয়স্ক এবং কুদর্শন আর স্ত্রী অল্পবয়স্কা, সুন্দরী। দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ, অবক্ষয়, মৃত্যু ওদের মিলিত জীবনকে প্রভাবিত করে। জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে বৌটির পক্ষে। সংসারে দারিদ্র, স্বামী সুখে বঞ্চিত শুধু নয়, স্বামীর সন্দেহ বিষে জর্জরিত আর এর সাথে যুক্ত হয় দুর্ভিক্ষের যন্ত্রণা — স্ত্রী সহ্য করতে পারেনা, বিবাহ বার্ষিকীতে আত্মহত্যা করে। এ যেন এক প্রকার এই অসম বিবাহ-এর বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ।

ছবির পটভূমি গ্রাম বাংলা হওয়ার ফলে শ্রীসেন খুবই সাবধানী ছিলেন যেন পথের পাঁচালীর সাথে তুলনা করা না হয়। তাই তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্যর বদলে মানুষের মুখের অভিব্যক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বাইশে শ্রাবণেও ঝড়ের দৃশ্য আছে এবং ঝড়ে ঘর ভেঙে নায়কের মার মৃত্যু ঘটে। এখানে শ্রীসেন ঝড়ের ধ্বংসের ভয়াবহ দিকটাই দেখিয়েছেন যাতে পথের পাঁচালীর দুর্গার মৃত্যু সময়ের ঝড়ের সাথে কোন তুলনা করা সম্ভব না হয়।

ছবির বিষয়বস্তুতে নতুনত্বের ছোঁয়া থাকলেও 'ফর্ম' (form)-এ কোন অভিনবত্ব ছিল না।

৫.৯ আকাশ কুসুম

১৯৬৬ সালে এই ছবিতে চিরাচরিত আখ্যানের ধারাকে ভেঙে ফেলেন মৃণাল সেন। ছবিটি মধ্যবিত্তের স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তৈরি। ছবিতে প্রচুর ফ্রিজ শট (freeze shot), জাম্প কাট (jump cut) ব্যবহার করেন। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে অজয় (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) ধনীর কন্যা মণিকার (অপর্ণা সেন) প্রেমে পড়ে। তাকে মুগ্ধ করতে নিজের অবস্থা সম্পর্কে একরাশ মিথ্যা বলে। অবশেষে ধরা পড়ে যায়। মেয়েটির বাবার দ্বারা বিতাড়িত হয়। ছবিটি আগাগোড়া হালকা মেজাজের ছিল। কিন্তু শেষ সিকোয়েন্সে হঠাৎ ছবি থমকে দাঁড়িয়ে গম্ভীর হয়ে যায়।

শ্রীসেন এখানে স্বাধীনতা-উত্তর নতুন প্রজন্মের কথা বলেছেন যাদের কাছে জৈবিক সুখই শুধু কাম্য। এরা শুধু অর্থোপার্জন করতে চায়, নৈতিক অবক্ষয় সম্পূর্ণ অর্থহীন।

ছবির একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ফ্রিজ শট (Freeze Shot) -এর অত্যধিক ব্যবহার। সম্ভবত : ত্রুখোর ছবি 400 Blows থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

৫.১০ ভুবন সোম

১৯৬৯ নির্মীত এই ছবি ভারতীয় সিনেমার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারার সূচনা ঘটায়। এই ধারাকে বলা হয় ভারতীয় ছবির নব তরঙ্গ বা নিউওয়েভ (New Wave)। বনফুল (আসল নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)-এর গল্প অবলম্বনে এই ছবি নির্মীত হয়। ছবিটি হিন্দীতে তৈরি করেন। মৃণাল সেনের এটি প্রথম হিন্দি ছবি। মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেন উৎপল দত্ত এবং সুহাসিনী মুলে। উৎপল দত্ত ছিলেন রেলে উচ্চ পদস্থ কর্মচারী আর সুহাসিনী গ্রাম্য মেয়ে যার স্বামীও ঘটনাচক্রে রেলের এক সাধারণ কর্মচারী। উৎপল দত্ত শিকার করতে ভালবাসে কিন্তু পারে না। শেষে সুহাসিনীর সাহায্যে স্থানীয় গ্রাম্য পোষাকে সজ্জিত হয়ে সুহাসিনীর নির্দেশমত চলে পাখি শিকার করতে সমর্থ হয়। ছবির শেষে ভারতের নৈতিক অবক্ষয়ের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুহাসিনীর অসৎ, ঘুষখোর স্বামীকে উৎপল দত্ত শাস্তিস্বরূপ বদলি করে দেয়। খুশী হয়ে সে সুহাসিনীকে চিঠিতে লেখে এবার যেখানে যাবে সেখানে ঘুষ নেওয়ার সম্ভাবনা আরও বেশি।

ছবিটি বাণিজ্যিক সাফল্যই শুধু অর্জন করেনি। শ্যাম বেনেগাল, গোবিন্দ নিহালনীর মত পরিচালকরা ছবিটির ভূয়সী প্রশংসা করে। এফ. এফ. সি. (F.F.C)-র টাকায় এটিই ভারতবর্ষের প্রথম ছবি। সরকারী লোন-এ কম টাকায় ছবি তৈরির ধারা এই সময় থেকে শুরু হয়।

ছবিটি তৎকালীন হিন্দি ছবির বাতাবরণে এক ঝলক তাজা হাওয়ার মত এসেছিল। ভারতীয় সিনেমায় একটা পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ছিল তখন। ষাটের দশকে মেহবুব খান, বিমল রায়, গুরু দত্ত-র মত বিখ্যাত পরিচালকদের জীবনাবসান ঘটে। রাজকাপুর-এর 'রাজু'-কে দর্শক আর গ্রহণ করে না। মৃণাল সেনেরও বম্বেতে কাজ করার এটাই ছিল প্রথম অভিজ্ঞতা। এমনকি সর্বভারতীয় দর্শকের কাছে পরিচালক, অভিনেতারা (উৎপল দত্ত, সুহাসিনী মুলে, শেখর চট্টোপাধ্যায়), সবাই ছিলেন নতুন। এমনকি ক্যামেরাম্যান কে. কে. মহাজন পরবর্তীকালে যে বম্বের প্রথম সারির ক্যামেরাম্যান হয়েছেন তাঁরও এই প্রথম বম্বেতে পদার্পণ। মৃণাল সেন সচেতন ভাবেই চলচ্চিত্রের পরিচিত রীতিকে বর্জন করেন। তারকা বর্জন করেন, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের গল্প বাছেন আর প্রায় পুরো শুটিং-ই করেন স্টুডিও-র বাইরে। ছবির পটভূমিকা ছিল গুজরাট। এর ফলে সর্বভারতীয় দর্শকের একাত্ম হতে আরও সুবিধা হয়।

৫.১০.১ ভারতীয় সিনেমার নিউ ওয়েভ বা নতুন ধারা

নতুন ধারা বা নিউওয়েভ-এর কোন নিয়ম নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। তবে প্রচলিত রীতিনীতি বর্জন করে এই নতুন ধারারও একটা রীতি তৈরি হয়। যেমন তারকা শিল্পীদের বাদ দিয়ে নতুন শিল্পীদের নিয়ে কাজ করা হয়, ছবির খরচ কম রাখাটাই বাঞ্ছনীয়, ছবি হয় কঠোর বাস্তববাদী। মাধ্যম নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা এই নতুন ধারার পরিচালকেরা শুরু করেন। যেমন 'মণি কাউল', 'কুমার সাহানি'-র মত পরিচালকরা পরিচিত রীতি পরিহার করেন। সকলের জন্য ছবি করার বদলে ওরা যেন ছবিতে মগ্ন থেকেছেন নিজ নিজ ভাবনায়। মণি কাউলের উস্কি রোটি (১৯৬৯) ও এফ.এফ. সি.-র টাকায় নির্মীত। ওঁর অন্যান্য ছবি আষাঢ় কা এক দিন (১৯৭০), দুবিধা (১৯৭৩), সতা সে উঠাতা আদমি (১৯৮০) সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। কুমার সাহানীর ছবি মায়া দর্পণ (১৯৭২)।

উক্ত পরিচালকদের আত্মমগ্নতার পাশাপাশি আরেক ধরনের ছবি দেখা গেছে যেখানে সামাজিক বঞ্চনা, বৈষম্য অর্থনৈতিক শোষণ, দুর্নীতি; বর্ণাশ্রমের নিগ্রহ ইত্যাদি বিষয় ছবির মূল বক্তব্য। মূলধারার অনেক ছবিতেই এগুলি দেখা গেছে, কিন্তু ওখানে এগুলি শুধুই জনপ্রিয় উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যদিকে কঠোর বাস্তববাদী নতুন ধারার ছবিতে এইগুলি হয়েছে উপজীব্য বিষয়। যেমন শ্যাম বেনেগালের প্রথম ছবি অঙ্কুর (১৯৭৩)। সত্তরের দশকে নতুন ধারার অগ্রগতিতে শ্যাম বেনেগালের অবদান অনস্বীকার্য। শ্যাম বেনেগালের বৈশিষ্ট্য শুধু চিত্রনাট্য রচনায় বা পরিচালনায় নয় একাধিক নতুন শিল্পী ও কলাকুশলীকে উনি আবিষ্কার করেন। যেমন শাবানা আজমী, স্মিতা পাটিল, নাসিরউদ্দীন শাহ, মোহন আগাশে, অমরীশ পুরীর মত নতুন অভিনেতাদের তিনি সুযোগ দেন। অন্যদিকে ওঁর ছবি দিয়েই পরিচিত

হন গোবিন্দ নিহ্লনীর মত ক্যামেরাম্যান, বনরাজ ভাটিয়ার মত সঙ্গীত পরিচালক।

বম্বেতে এই ধারার দু'জন বিখ্যাত পরিচালক বাসু চ্যাটার্জী এবং ঋষিকেশ মুখার্জীর ছবিতে হিরো হিরোইন হল সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ। তাদের রাগ, ভালবাসা, সমস্যা, নিস্তরঙ্গ জীবনধারা এঁদের ছবির প্রতিপাদ্য বিষয় হয়েছে। এঁরা অত্যন্ত দক্ষতায় অনুচ্চগ্রামে উক্ত উপাদানগুলি পরস্পরের সাথে বুনে ভারি সুন্দর কাব্যময় ছবি তৈরি করেছিলেন। নতুন ধারা যে দর্শক আনুকূল্য পেয়েছিল তার কৃতিত্ব অনেকটাই এই দুজনের। এঁদের এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ছবি হল ঋষিকেশ মুখার্জীর 'আনন্দ' (১৯৭০), বাসু চ্যাটার্জীর 'রজনীগন্ধা' (১৯৭৪)। 'নতুন ধারা'-র অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পরিচালকরা হলেন, দক্ষিণের আদুর গোপালকৃষ্ণণ, ছবির স্বয়ময়ম (১৯৭২); জি. অববিন্দন, ছবির নাম উত্তরায়ণম (১৯৭৪); এম. এস. সন্ধ্যু, ছবির নাম গরম হাওয়া (১৯৭৩); সৈয়দ মির্জা, ছবি— অরবিন্দ দেশাই কি আজীব দস্তান (১৯৭৮); মুজাফ্ফর আলী, ছবি — গমন (১৯৭৮); জব্বর প্যাটেল, ছবি — সিংহাসান (১৯৭৯); গোবিন্দ নিহালিনী, ছবি — আক্রোশ (১৯৮০); কেতনমেহতা ছবি — ভবানী ভবাই (১৯৮০) প্রমুখ।

৫.১১ কলকাতা ট্রিলজি : ইন্টারভিয়্যু, কলকাতা '৭১ পদাতিক

সত্তরের দশকের অস্থির, অশান্ত কলকাতার পটভূমিকায় মৃণাল সেন তৈরি করেন তিনটি রাজনৈতিক ছবি যেগুলিকে একত্রে ট্রিলজি বলা হয় — ইন্টারভিয়্যু (১৯৭০), কলকাতা '৭১ (১৯৭২) এবং পদাতিক (১৯৭৩)।

'ইন্টারভিয়্যু' ছবিটিতে মৃণাল সেন 'সিনেমা ভেরিতে' (Cinema Verite)-র ভঙ্গিমায় দৃশ্য গ্রহণ করেন। অর্থাৎ জীবন যেভাবে চলছে ক্যামেরা সেটা সে ভাবেই তুলে নিচ্ছে, এখানে কোন ঘটনা সাজানো নেই। অভিনেতাদের নাম বদলানো হয় না। মূল চরিত্র রঞ্জিতের ভূমিকায় ছিলেন রঞ্জিত মল্লিক। রঞ্জিত শিক্ষিত, বেকার, চাকুরিপ্রার্থী। রঞ্জিতকে পরিচালক উপস্থিত করে না, সে নিজেই সরাসরি দশর্কের সাথে কথা বলে। ব্রেশট-এর প্রভাব এখানে খুবই স্পষ্ট। ঔপনিবেশিক মানসিকতাকে বিদ্রুপ করেছেন এখানে। রঞ্জিত চাকরি পেতে সবক্ষেত্রেই উপযুক্ত কিন্তু সে পায় না কারণ সে ইন্টারভিয়্যুতে পাজামা পাঞ্জাবী পরে গেছিল। রঞ্জিত দর্শকের সাথে কথা বলার পরই একজন সম্পূর্ণ অচেনা ব্যক্তি বলে ওঠে এটা তারও কাহিনী। বাংলা চলচ্চিত্রে এই ভঙ্গিমাটি খুবই অভিনব।

কলকাতা ৭১ (১৯৭২) ছবিটি কাঠামোগতভাবে খুবই জটিল। মোট পাঁচটি ছোট গল্প নিয়ে একটি ছবি। এরমধ্যে অভিনবত্ব ছিল। এর আগে সত্যজিৎ রায় এইভাবে তিন কন্যা করলেও সেখানে তিনটি ছবি পরস্পর সম্বন্ধীয় নয়। কিন্তু কলকাতা ৭১-এ তৎকালীন কলকাতা শহরের নকশাল আন্দোলন, উদ্বাস্তুদের জীবন, কলকাতার নতুন প্রজন্ম— তাদের ভাবনা, সামাজিক অবক্ষয়, মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের অর্থোপার্জনের তাগিদে শরীর বিকোনো ইত্যাদি বিষয়গুলি পাঁচটি গল্পের মধ্যে দিয়ে একত্রে উপস্থিত করেছেন।

পদাতিক (১৯৭৩)-এ মধ্যবিত্তের রাজনীতি সরাসরি ভাবেই এসেছে। এখানে পলিটিকাল স্টেটমেন্ট (Political statement) রয়েছে। এই রাজনৈতিক বক্তব্য চরম বামপন্থীর মতবাদ। এই ছবিগুলিতে পরিচালকের একটা সাব্জেক্টিভ (subjective) দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পাওয়া যায়।

আরেকটি রাজনৈতিক ছবি কোরাস (১৯৭৪)-এ শ্রেণীদ্বন্দ্বের চেহারা অত্যন্ত প্রকটভাবে দেখানো হয়েছে।

বক্তব্যে, আঙ্গিকে এই প্রত্যেকটি ছবিই নতুন ধারার অন্তর্গত। কোন ছবিতেই না তারকার সমাবেশ দেখা যায়, না আছে চাকচিক্য, না আছে সুস্পষ্ট গল্প।

নতুন ধারার কিন্তু ভিন্ন বিষয় বস্তু নিয়ে মৃণাল সেন তাঁর পরবর্তী ছবিগুলিতে কাজ করেছেন।

৫.১২ একদিন প্রতিদিন, আকালের সন্ধানে, খারিজ

রাজনৈতিক বক্তব্য, বিষয়বস্তু থেকে সরে গিয়ে সত্তর দশকের শেষের দিকে মৃণাল সেন তৈরি করেন একের পর এক সামাজিক বিষয়বস্তু নির্ভর ছবি — একদিন প্রতিদিন (১৯৭৯), আকালের সন্ধানে (১৯৮০), খারিজ (১৯৮২)। দেশভাগ, নকশাল আন্দোলন-উত্তর যে কলকাতা, সেই কলকাতার রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটে চরিত্রগুলিকে উন্মোচিত করা হয়। চরিত্ররা সবাই মধ্যবিত্ত বাঙালি। এদের মূল্যবোধ, পারস্পরিক সম্পর্ক, বিশ্বাস, সংস্কারকে প্রশ্ন করেছেন পরিচালক।

একদিন প্রতিদিন-এ বাড়ির বড় মেয়ে একদিন রাতে অফিস থেকে ফেরে না। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় পরিবারের অন্যান্যরা পরস্পরকে দোষারোপ করে। অবচেতন মনে লুকিয়ে থাকা ভীতি, অশ্রদ্ধা, সংস্কার, অস্তিত্বহীনতা এই কলহের মধ্য দিকে প্রকট হয়ে ওঠে। মেয়েটি কোথায় ছিল সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা এই মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ, আত্ম বিশ্লেষণ। দেখা যায় সংসারের প্রত্যেকটা মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। বড় মেয়ে তাদের অবলম্বন, ওর অনুপস্থিতিতে সবাই নগ্ন হয়ে গেল।

খারিজ-এ বাড়ির কাজের ছেলেটি রান্নাঘরে দমবন্ধ হয়ে মারা যাওয়ার পর আবার সেই আত্ম বিশ্লেষণ। পরস্পরকে দোষারোপ, দ্বিধা, আশঙ্কা, দোলাচলের মধ্যে দিয়ে মানুষগুলিকে নতুন করে চেনা হয়।

আকালের সন্ধানে-এর কাঠামোতে একটা অভিনবত্ব আছে, এটি 'film within film'. অর্থাৎ ছবিতে দেখা যায় একদল লোক গ্রামে যাচ্ছে শুটিং-এ। তাদের গ্রামে গিয়ে বাস করা, কাজ করা — এই নিয়েই ছবি আকালের সন্ধানে। এখানে যারা শুটিঙে এসেছে তাদের নিজ নামেই ডাকা হয় কিন্তু গ্রামের লোকেদের আলাদা ছবির নাম আছে। যেমন শ্রীলা মজুমদার অভিনীত চরিত্রটির নাম দুর্গা। দারিদ্র, মন্বন্তর, সামাজিক অবক্ষয় সবই এসেছে ছবিতে। তবে এগুলি আবিষ্কৃত হয় যে ছবির শুটিঙে দলটি এসেছে সেই শুটিঙের মধ্য দিয়ে। স্মিতা পাটিল অভিনীত চরিত্রটির সাথে দুর্গা সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে যায়। সে যেন নিজেকে, নিজের সংসারকে এর মধ্যে দেখতে পায়। শহর গ্রামের দ্বন্দ্ব দেখতে পাওয়া যায় যখন একদল গ্রামের লোক সহযোগীতা করতে চায় না, অন্যদিকে রূপোলী পর্দার হিরোদের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণকে বিদ্রুপ করেছেন।

আকালের সন্ধানে ছবিটিতে ইতালীয় পরিচালক ফেদেরিকো ফেলিনির প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। ভারতীয় নতুন ধারার এটি একটি অত্যন্ত গুরুবত্বপূর্ণ ছবি।

৫.১৩ প্যারালাল সিনেমার অন্যান্য পরিচালকরা

সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক যখন একের পর এক অসাধারণ ছবি উপহার দিচ্ছেন দর্শকদের তখন রাজেন তরফদারের গঙ্গা (১৯৬০) কলকাতার মানুষকে গঙ্গায় ডিঙ্গি নিয়ে মাছ ধরে বেড়ানো জেলেদের সাথে আলাপ করানো। জেলেদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ভালবাসা-ঘৃণা ভারি সুন্দর উপস্থিত করেছিলেন ক্যামেরাম্যান-পরিচালক রাজেন তরফদার। ছবির শুটিং করেছিলেন জেলেদের পল্লীতে গিয়ে। প্রয়োজনে সুন্দরবনেও গেছেন। ওঁর পরবর্তী ছবি পালঙ্ক। একটি পালঙ্ককে কেন্দ্র করে দেশভাগ, সমাজ, শ্রেণীবিভাজন এত সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছিলেন যে বাঙালি দর্শক আজও ছবিটি সমাদর করে।

তপন সিংহ হচ্ছেন বাংলা প্যারালাল সিনেমার এক জন সফল পরিচালক যার ছবির সাধারণ দর্শকও পছন্দ করেন। বাস্তবধর্মী ছবি করলেও ওঁর ছবি কোনদিনই তত চরমপন্থী নয়। আশির দশকের আগে অবধি জনপ্রিয় গল্প, উপন্যাস অবলম্বনে ছবি করেছেন, যেমন কাবুলিওয়ালা (১৯৫৬), ক্ষুধিত পাষাণ (১৯৬০), অতিথি (১৯৬০) ইত্যাদি। আশির

দশক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা সমাজে মানুষের ব্যক্তির ভূমিকা ইত্যাদি ওঁর ছবির প্রতিপাদ্য বিষয় হয়েছে। যেমন আদালত ও একটি মেয়ে (১৯৮২), আতঙ্ক (১৯৮৪) অন্তর্ধান (১৯৯২), হুইল চেয়ার (১৯৯৪), এক ডক্টর কী মওত (হিন্দীতে ১৯৯২) ইত্যাদি।

আরেকজন পরিচালক সুস্থ রুচি সম্পন্ন অপেক্ষাকৃত হাল্কা, মূলধারা ঘেঁষা ছবি করেন, তিনি হলেন তরুণ মজুমদার। গ্রামের পটভূমিকায় কিশোর-কিশোরীর সুন্দর প্রেমের ছবি বালিকা বধু (১৯৬৭) ওঁকে খুবই জনপ্রিয় করে তোলে। তবে এর আগে পলাতক (১৯৬৩) করেই তিনি পরিচিত হয়েছিলন। তাঁর শিল্পগুণসম্পন্ন বাঙালি মেজাজের এবং মানসিকতার ছবি দর্শককে মুগ্ধ করে। বালিকা বঁধুর মিষ্টি মধুর প্রেমের মেজাজ আবার দেখা যায় নিমন্ত্রণ (১৯৭১), শ্রীমান পৃথ্বিরাজ (১৯৭৩), ফুলেশ্বরী (১৯৭৪) ছবিতে। সামাজিক সমস্যাও সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে সংসার সীমান্তে ('৭৫), গণদেবতা ('৭৮) ছবিতে।

১৯৬৬ সালে পরিচালকরূপে কবি, লেখক, চিত্রাঙ্কণশিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। 'স্বপ্ন নিয়ে' ছিল ওঁর প্রথম ছবি। এরপর নির্মীত 'স্ত্রীর পত্র' ('৭২) 'মালঞ্চ' ('৮০) ছবি দুটিতে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর প্রতিবাদ ও বিদ্রোহকে তিনি চিত্রায়িত করেছেন।

সত্তরের দশকের শেষের দিকে তিন জন সম্ভাবনাময় পরিচালকের আবির্ভাব ঘটে। এঁরা হলেন, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত এবং গৌতম ঘোষ। তিনজনই প্রথমে তথ্যচিত্র তৈরি করতেন, পরে কাহিনীচিত্র করতে আসেন। উৎপলেন্দুর প্রথম ছবি 'মুক্তি চাই' ('৭৭)। রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে এই ছবিটি সোচ্চার ছিল। শবর সম্প্রদায়ের বঞ্চনা ও যন্ত্রণা নিয়ে দ্বিতীয় ছবি 'ময়না তদন্ত' (১৯৮০)। তৃতীয় ছবি 'চোখ' ('৮২) উৎপলেন্দুকে দেশে এবং বিদেশে খ্যাতি এনে দেয়। ধর্মীয় কুসংস্কার নিয়ে 'দেবশিশু' ('৮২) তৈরি করেন।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর প্রথম ছবি দূরত্ব ('৭৮)। সত্তর দশকের গোড়াতে পশ্চিমবঙ্গের চরমপন্থী রাজনীতি ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় দূরত্ব ('৭৮) গৃহস্থ ('৮১) এবং অন্ধিগলি ('৮৪) তৈরি করেন। বিভিন্ন জ্যঁর-এর ছবি তিনি বানিয়েছিলেন। নিম্নবিত্তের সমস্যা নিয়ে কাজ করেছেন। শিল্পীর অস্তিত্ব সংকট নিয়ে করেছেন আবার আত্মবিশ্লেষণীমূলক ছবিও করেছেন।

গৌতম ঘোষ-এর ছবি আরও বাস্তবমুখী। ওঁর চিত্রনাট্যের দ্রুততা, অসামান্য দৃশ্যগ্রহণ ছবিকে তীক্ষ্ণ করে তোলে, যা দর্শককে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে। প্রথম ছবি করেন তেলেগু ভাষায় — 'মা ভূমি' ('৭৯)। তেলেঙ্গানার কৃষক বিদ্রোহ ছিল ছবির প্রতিপাদ্য বিষয়। গ্রামীণ জীবন তাদের বাঁচার সংগ্রাম, তাদের অস্তিত্বের সংকট বারে বারে ওঁর ছবিতে এসেছে। উল্লেখযোগ্য ছবি দখল ('৮২), পার ('৮৪), পদ্মা নদীর মাঝি ('৯৩) প্রমুখ।

অপর এক বিশিষ্ট পরিচালক হলেন নব্যেন্দু চ্যাটার্জী। ওঁর উল্লেখযোগ্য ছবি হল চপরে ('৮৬), সরীসৃপ ('৮৮), পরশুরামের কুঠার ('৮৯) ইত্যাদি।

১৯৮১ সালে বাঙালি দর্শক পরিচিত এক নতুন পরিচালকের সাথে যাঁকে তারা এতদিন চিনত একজন অভিনেত্রী হিসেবে — অপর্ণা সেন। ওঁর প্রথম ছবি ৩৬, চৌরঙ্গী লেন (ইংরাজি ভাষায়) একটি সম্পূর্ণ রাজনীতি বর্জিত ছবি। একটি বয়স্ক মানুষের (অভিনয় করেছিলেন জেনিফার কাপুর) একাকীত্বের কাহিনী। সুন্দর দৃশ্যাবলী, পরিমিত সংলাপ, এবং শিল্পরুচিবোধ সম্পন্ন একটি ছবি। ওঁর পরবর্তী ছবি পরমা (১৯৮৫)-কে কেন্দ্র করে খুবই বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ছবির বিষয়বস্তু এখানে হল একজন গৃহবধূ, মা, স্ত্রী নিজেকে একজন নারী হিসেবে আবিষ্কার করে। কিন্তু বিতর্ক হয় কারণ, এই আবিষ্কার সে এক পুরুষ (স্বামী নয়) এর সাহায্যে করে। নারী শিল্পীর জীবন-শিল্পবোধের দ্বন্দ্ব, দুই নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক, সংঘাত তাঁর পরবর্তী ছবির বিষয়বস্তু হয়েছে।

যাটের দশকের শেষে আর সত্তর শুরুতে যে সিনেমা আন্দোলন ভারতবর্ষে শুরু হয় আশির দশকে শেষে তার আর কোন রেশ থাকে না। আশির দশকের গোড়া থেকেই মূলধারার সিনেমা আর প্যারালাল সিনেমার দূরত্ব কমতে থাকে।

কেন এটা হয় তা আলোচনা সাপেক্ষ কিন্তু এই নতুন ভাবনা চিন্তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে ভারতীয় সিনেমাকেই সমৃদ্ধ করেছে, পরিণত করেছে তা অনস্বীকার্য।

৫.১৪ সারাংশ

১৯৫৫ সালে সত্যজিৎ রায় পথের পাঁচালীর মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষে সিনেমাকে একটি আলাদা মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

একই সময় বাস্তবধর্মী ছবি করছিলেন ঋত্বিক কুমার ঘটক, রাজেন তরফদার, নিমাই ঘোষ, মৃণাল সেন প্রমুখ। তবে এঁদের নির্মাণশৈলী, ভঙ্গিমা, বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য পরস্পরের থেকে আলাদা। কেউ বা শাশ্বত জীবনবোধের কথা বলেছেন, কেউ তৎকালীন রাজনৈতিক সামাজিক অবস্থা নিয়ে ছবি করেছেন। ঋত্বিক ঘটককে যেমন দেশভাগের যন্ত্রণা তাড়িত করেছিল, মৃণাল সেন কলকাতাকে তার ছবির পটভূমিকা করেছিলেন। তবে মৃণাল সেনের যুগান্তকারী ছবি ভুবন সোম (১৯৬৯ সালে) যা ভারতীয় নতুন ধারার সিনেমাকে সূচিত করে সৌরাষ্ট্রের পটভূমিকায় নির্মীত। সত্তরের দশকে একাধিক চলচ্চিত্রকরে ছবি করতে আসেন যাঁদের ছবিতে রূঢ় কঠোর বাস্তব, বাম রাজনৈতিক মতবাদ, সামাজিক বঞ্চনা, অবক্ষয় ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। নিজেদের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে তারা ছবির ফর্ম (form) নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। আর এই 'নতুন ধারার ছবি শুধু বাংলা নয় ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তেও দেখা যায়। তবে আশির দশক থেকে এই উন্মাদনা স্তিমিত হয়ে আসে এবং আশির দশকের শেষ থেকে নতুন ধারার কথা আর শোনা যায় না। আসলে মূল ধারার ছবির সাথে প্যারালাল সিনেমার দূরত্ব ক্রমে কমে যায়।

৫.১৫ অনুশীলনী

১. ভারতীয় সিনেমায় পথের পাঁচালীর গুরুত্ব কোথায় তা আলোচনা করুন।
২. ঋত্বিক ঘটকের ছবির ভঙ্গীমার অনন্যতা ব্যাখ্যা করুন।
৩. মৃণাল সেনের অবদান কোথায় তা আলোচনা করুন।

৫.১৬ গ্রন্থপঞ্জী

Satyajit Ray — A. Robinson.
Pather Panchali — Satyajit Ray.
Our Films Their Films — Satyajit Ray.
The Maverick Maestro : Mrinal Sen — Deepankar Mukhopadhyay.
Cinema And I — Ritwik K. Ghatak.
নতুন ধারা — কিরণময় রাহা রচিত একটি প্রবন্ধ।
চিত্রভাষ : মৃণাল সেন সংখ্যা।
চিত্রভাষ : ঋত্বিক ঘটক সংখ্যা।

একক ৬ ❒ গণ জ্ঞাপনের মাধ্যম হিসেবে সিনেমা

গঠন

৬.১ উদ্দেশ্য

৬.২ প্রস্তাবনা

৬.৩ গণ জ্ঞাপন, গণ মাধ্যম — পূর্বকথা

৬.৪ গণ জ্ঞাপনের মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র

৬.৫ সিনেমা ও অন্যান্য মাধ্যম

৬.৫.১ সিনেমা ও চিত্রকলা

৬.৫.২ সিনেমা এবং সাহিত্য

৬.৫.৩ সিনেমা ও থিয়েটার

৬.৫.৪ সিনেমা ও সঙ্গীত

৬.৫.৫ সিনেমা ও নৃত্য

৬.৬ সারাংশ

৬.৭ অনুশীলনী

৬.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৬.১ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- গণ-জ্ঞাপনের সংজ্ঞা।
- গণ-জ্ঞাপনের মাধ্যম হিসেবে সিনেমার ভূমিকা।
- সিনেমা ও অন্যান্য মাধ্যমের তুলনামূলক আলোচনা।

৬.২ প্রস্তাবনা

সিনেমা জন্মলগ্নেই যথার্থ গণমাধ্যম হয়ে ওঠে। বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে দর্শককে আনন্দদান করে প্রতিনিয়ত। প্রচারমূলক কাজেও সিনেমা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে এই কনিষ্ঠতম মাধ্যমটি বিস্ময় ও বিনোদনের বস্তু থেকে শিল্পে উন্নীত হয়। শুধুমাত্র নিম্নবিত্তের মধ্যে আর সীমিত থাকে না সিনেমা। বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়। শুরু হয় সিনেমা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

সিনেমার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার সাথে সাথে অন্যান্য শিল্প মাধ্যমের সাথে তুলনা শুরু হয়ে যায়। তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে দিয়ে নতুন তত্ত্বের জন্ম হয়েছে আর সমৃদ্ধ হয়েছে বিভিন্ন মাধ্যম। সিনেমার সাথে তুলনা হয়েছে সাহিত্যের, নাটকের, চিত্রকলার, সঙ্গীতের, নৃত্যের। সিনেমা এদের মধ্যে কনিষ্ঠতম। আলোচনায় দেখা যায় সিনেমায় যেমন অন্য মাধ্যমের প্রভাব দেখা যায়, অন্যান্য মাধ্যমও সিনেমার প্রভাব এড়াতে পারেনি।

সিনেমাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফেলেছে একমাত্র টেলিভিশন। কিন্তু টেলিভিশন কখনই সিনেমার সমকক্ষ হতে পারেনি।

৬.৩ গণ জ্ঞাপন, গণ মাধ্যম — পূর্বকথা

শিল্প বিপ্লবের পর সমাজের প্রকৃতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। যত দিন যায় ততই সমাজে রূপান্তর ঘটতে থাকে। আধুনিক যুগে সমাজ হয়ে উঠেছে বিরাট ও জটিল। আর মানুষের নির্ভরতা গণ মাধ্যমের ওপর আক্রমণ বেড়েছে।

গণমাধ্যম আবিষ্কৃত হওয়ার আগে জ্ঞাপন পদ্ধতি ছিল সরল — মুখ্যত একান্ত জ্ঞাপন পদ্ধতি ও প্রসিদ্ধ জ্ঞাপনের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন সংকেত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, হাতে লেখা বই পত্রপত্রিকা, প্রাচীর ও পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ বাণী ও শিলালিপি, মুদ্রায় অঙ্কিত মোহর ও তাম্রশাসন ও ব্যক্তিগত প্রচারক ও জ্ঞাপকদের মুখের কথাই ছিল জ্ঞাপনের বিভিন্ন উপায়।

যন্ত্রযুগে গণমাধ্যমের আবির্ভাব ঘটল। জ্ঞাপন ক্রমশ যন্ত্রনির্ভর হয়ে পড়ল।

'গণজ্ঞাপন' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকে।

● **গণ-জ্ঞাপনের সংজ্ঞা :**

গণ-জ্ঞাপনের সংজ্ঞা নির্ধারণের আগে 'গণ' অর্থাৎ 'mass' শব্দটির সংজ্ঞা নির্ধারণ করা দরকার।

গণ বলতে শুধুমাত্র কিছু জনসমষ্টি বোঝায় না। গণ হল বৃহত্তম জনসমষ্টি। তারা বিভিন্ন ভৌগোলিক প্রান্তের অধিবাসী। পরস্পরের কাছে অপরিচিত এবং একই সঙ্গে একই উদ্দীপকের সম্মুখীন হলেও তাদের প্রতিক্রিয়া হয় ভিন্ন ভিন্ন।

এহেন যে জনসমষ্টি তাদের উদ্দেশ্যে রচিত এবং গণমাধ্যমের (mass media) মধ্য দিয়ে পরিবেশিত জ্ঞাপন পদ্ধতিকে বলে 'গণজ্ঞাপন'। এক কথায় গণজ্ঞাপন গণমাধ্যমের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত জ্ঞাপন পদ্ধতি (mass mediated communication)।

গণ মাধ্যম হল সেই মাধ্যম যা যান্ত্রিক সাহায্যে উৎপন্ন এবং তৎক্ষণাৎ অথবা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের ভিতরে যার প্রতিরূপ সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।

এক কথায় গণ জ্ঞাপনের সংজ্ঞা বলা যায় এরকম যান্ত্রিক পদ্ধতির সহায়তায় গণমাধ্যমের দ্বারা বাহিত বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিরাট জনসমষ্টির উদ্দেশ্যে রচিত কোন জ্ঞাপন পদ্ধতি।

● **গণ মাধ্যমের প্রকার ভেদ :**

গণ মাধ্যম মূলত ঃ তিন ধরনের ঃ-

১। **মুদ্রিত মাধ্যম** ঃ- এর মধ্যে আছে যাবতীয় মুদ্রিত পুস্তক, ম্যাগাজিন ও সংবাদপত্র, নানান ধরণের প্রচারপত্র ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে সংবাদপত্র ও জনপ্রিয় পত্র-পত্রিকার স্থান শীর্ষে। কারণ মুদ্রিত মাধ্যমের মধ্যে সংবাদপত্রের প্রচার সবচেয়ে বেশি ও তার প্রভাবও অপরিসীম।

২। **শব্দ মাধ্যম** ঃ- শব্দ মাধ্যম দুই প্রকার — রেডিও ও রেকর্ড।

৩। **গতি মাধ্যম** ঃ- চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন হল দু'ধরনের গতি মাধ্যম।

শব্দ মাধ্যম ও গতি মাধ্যমকে এক কথায় ইলেকট্রনিক মাধ্যম (electronic Media) বলা হয়।

● **গণ মাধ্যমের কাজ :**

যে কোন গণতান্ত্রিক দেশ গণমাধ্যমের উদ্দেশ্য প্রধানত চারটি। এগুলি হল :-

১) শিক্ষিত করা (To educate)

২। বিনোদন দেওয়া (To entertain)

৩। তথ্য প্রচার করা (To inform)

৪। প্রভাব বিস্তার করা (To influence)

৬.৪ গণজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র হল সর্বকনিষ্ঠ কিন্তু সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম। জন্মলগ্ন থেকেই সিনেমা একটি যথার্থ গণমাধ্যম হয়ে ওঠে। একসাথে বিশাল এক জনসমষ্টির কাছে এত দ্রুত পৌঁছতে সিনেমার আগে অন্য কোন মাধ্যম সফল হয়নি।

১৮৯৫ সালে আমেরিকায় থমাস আল্ভা এডিসন (Thomas Alva Edison) প্রথম চলমান ছবি তোলেন, কিন্তু এডিসন সেই ছবি প্রদর্শনের কোন চেষ্টা করেন না। সেই বছরের ডিসেম্বর মাসে প্যারিসের দেল কাফে রেঁস্তোরাতে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। নির্মাতা ছিলেন ফরাসী দেশের দুই ভাই — ল্যুই (Louie) ও অগস্ট ল্যুমিয়ের (Auguste Loumiere)। লুমিয়ের ভাইরা তাঁদের ক্যামেরা নিয়ে প্যারিসের রাস্তা, পার্ক, জাহাজঘাটা, চিড়িয়াখানা সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন আর ছবি তুলতেন। প্রতিদিনের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনাই ছিল তাঁদের বিষয়বস্তু। এই সময়ে সিনেমা শুধুমাত্র বিস্ময়ের বস্তু ছিল। তখন চলচ্চিত্র হত ৫ থেকে ১০ মিনিটের। মেলায় যাদু খেলার সাথে, থিয়েটারে বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে এই চলচ্চিত্র দেখানো হত। অচিরেই চলচ্চিত্র জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সমাজের নিম্নবিত্তের কাছেই সিনেমা প্রথমে জনপ্রিয় হয়। ওদের কাছে সিনেমা ছিল স্বল্প খরচে বিনোদনের উপাদান। সারা পরিবারের একসাথে উপভোগ করবার জিনিস।

● **সিনেমার জনপ্রিয়তার বিবিধ কারণ :**

১। চলচ্চিত্রই একমাত্র মাধ্যম যার দ্বারা ছবি ও কথাকে এক সঙ্গে প্রকাশ করা যায়।

২। ভাষাগত যে বাধা জ্ঞাপনের পক্ষে মস্তবড় প্রতিবন্ধক চলচ্চিত্র তা অতিক্রম করতে সক্ষম। চলচ্চিত্র যখন আবিষ্কার হয় তখন ছিল নির্বাক, কারণ তখনও শব্দ সংযোজনের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু তাতে জনপ্রিয়তা কোনভাবেই বিঘ্নিত হয়নি। তখন অঙ্গভঙ্গি ও অভিব্যক্তির মাধ্যমে অভিনেতারা তাঁদের মনোভাব প্রকাশ করতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে চার্লি চ্যাপলিন অভিনীত ও পরিচালিত ছবিগুলির কথা। তাঁর নিছক হাস্য কৌতুকের

ছবিগুলি আজও মানুষকে অনাবিল আনন্দ দেয়। আবার, মর্ডান টাইম্স্-এর (Modern Times) গভীর ব্যঞ্জনা সমকালের সীমা ছাড়িয়ে সর্বকালে ব্যপ্ত হয়ে আছে। তেমনি ডি. ডবলিউ. গ্রিফিথ (D. W. Griffith) পরিচালিত নির্বাক চলচ্চিত্র বার্থ অফ এ নেশ্‌ন্ (Birth of A Nation) একটি কালজয়ী ছবি।

৩। চলচ্চিত্রে যেহেতু বর্ণিত ঘটনা দৃশ্যত দেখা যায়, তার বিশ্বাসযোগ্যতা অসীম।

● জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও চলচ্চিত্রের কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে সেগুলি হল :

১। চলচ্চিত্রের প্রধান সীমাবদ্ধতা তার উৎপাদন ব্যয়বহুল।

২। চলচ্চিত্রের উৎপাদন সময়সাপেক্ষ। তা বহু নিরলস আয়াসের ফল।

৩। চলচ্চিত্র যৌথ শিল্প। বহু ব্যক্তির প্রয়াসের (team work) উপর নির্ভরশীল। এ কারণে চলচ্চিত্র উৎপাদনে বৃহত্তর সংগঠনের প্রয়োজন। আর প্রদর্শন পদ্ধতিও বেশ জটিল ও প্রদর্শকদের মুখাপেক্ষী।

৪। চলচ্চিত্র সহজলভ্য নয়। চলচ্চিত্র দেখাবার জন্য প্রজেক্টর, পর্দা, অপারেটর, অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ লাগে। শ্রোতাদের প্রেক্ষাগৃহে নিয়ে আসতে হয়। শ্রোতারা সুবিধামত বা অবসর মত শো-এর আয়োজন করা সম্ভব হয় না।

৫। প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক উপকরণ না পেলে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হতে পারে না। বিশেষ করে বিদ্যুৎ বা জেনারেটর ছাড়া চলচ্চিত্র দেখানো সম্ভব নয়।

৬। চলচ্চিত্র যেহেতু দৃশ্যমাধ্যম সেহেতু খারাপ চলচ্চিত্র দর্শকদের অধঃপাতে নিয়ে যেতে পারে। চলচ্চিত্রের প্রভাবে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে। যৌনতা প্রশ্রয় পেতে পারে। একটি নিম্ন রুচির বই বা রেডিও-র কাউকে অধঃপাতে নিয়ে যাবার যত ক্ষমতা চলচ্চিত্রের ক্ষমতা তার অপেক্ষা অনেক বেশি।

বিনোদনের উপাদান হিসেবেই কিন্তু সিনেমা থেমে থাকেনি। প্রচারের মাধ্যম হিসেবেও সিনেমার অবদান অনস্বীকার্য। চলচ্চিত্র দৃশ্য মাধ্যম বলে তার বিশ্বাসযোগ্যতা অসীম। সেই হেতু রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক প্রয়োজনে খুবই কার্যকরি হয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়াতে বলশেভিক আন্দোলনের পর লেনিনের নেতৃত্বে যখন নতুন সরকার দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন তারা চলচ্চিত্রকে সর্বাধিক শক্তিশালী ও কার্যকরি মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করেন। লেনিন বুঝতে পারেন গণ-মাধ্যম হিসেবে সিনেমার গুরুত্ব। ১৯১৯ সালে সিনেমাকে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয়করণ করেন। তাঁর নির্দেশে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে চলচ্চিত্র নির্মাতারা বলশেভিক সরকারের মতাদর্শের প্রচার শুরু করেন। তৎকালীন সরকার, যন্ত্রণাক্লিষ্ট রাশিয়াবাসীদের সংঘবদ্ধ রাখতে, তাদের বিশ্বাস ফেরাতে, আন্দোলনকারীদের মনোবল অটুট রাখতে সিনেমাকে ব্যবহার করেন। চলচ্চিত্র নির্মাতারা সাধারণ মানুষের জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার ছবি তুলে তথ্যচিত্র তৈরি করেন। দেশের এক প্রান্তের মানুষের ছবি অপর প্রান্তে দেখানো হত। এই সমস্ত ছবিই ছিল আন্দোলন-প্রচারধর্মী যাকে ওঁরা বলতেন অ্যাজিটেশনল্-প্রোপাগাণ্ডা (agitational-propaganda) ছবি। এই সময় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তথ্যচিত্র নির্মাতা ছিলেন জিগা ভেরতব (Dziga Vertov)।

বিনোদনের মোড়কে প্রচার সাহিত্যে বা নাটকে ইতিপূর্বে হয়েছে কিন্তু সিনেমার মাধ্যমে সাফল্য অনেক বেশি পাওয়া গেছে। এর কারণ মূলত দুটি — একাধারে এর বিশ্বাসযোগ্যতা, অন্যদিকে বিশাল জনসমষ্টির কাছে একেবারে পৌঁছতে পারা।

সিনেমার ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই বিনোদনমূলক বা প্রচারমূলক সিনেমা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতবাদের ভিত্তিতে সিনেমা শিল্পে ঘটেছে বহু বিপ্লব, ঘটেছে ডকুমেন্টারি (Documentary) ফিল্মের আন্দোলন, তৈরি হয়েছে অন্যধারার ছবি। মূলধারার সিনেমার থেকে বরাবর আলাদা অন্যধারার এই সিনেমা। অন্যধারার সিনেমাকে প্যারালাল (parallel) সিনেমা, কখনও বা আর্ট ফিল্মও (art film) বলা হয়। প্যারালাল সিনেমা কোন দিনই বিনোদনমূলক হয়নি। বাস্তবতা নির্ভর এই সিনেমা বিশেষ কিছু মতবাদের উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়। রাশিয়ায় বলশেভিক আন্দোলনের পর মার্ক্সীয় মতের ভিত্তিতে ঘটে যায় সিনেমা বিপ্লব। জিগা ভেরতব ব্যতীত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র নির্মাতারা

হলেন সের্গেই আইজেন্‌স্টাইন (Sergei Eisenstein), অ্যালেক্‌জাণ্ডার দোভ্‌জেনকো (Alexander Dovzhenko), সেভল্‌দ পুদভ্‌কিন (Vsevold Pudovkin)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সিনেমা বিপ্লব ঘটে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। ইটালিতে ঘটে নব-বাস্তবতা (New-Realist) আন্দোলন। এই আন্দোলনের কর্ণধার ছিলেন লুচিনো ভিসকন্তি (Luchino Visconti), রবার্তো রসেলিনি (Roberto Rossellini), ভিত্তোরিও দে সিকা (Vitorio De sica) প্রমুখ। এদের ছবির বিষয়বস্তু ছিল যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইতালির বাস্তব অবস্থা। এদের ছবির মুখ্য চরিত্র ছিল ইতালির অনামী সাধারণ মানুষ। অভিনেতারা ছিলেন অপেশাদার, অখ্যাত।

যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সে জন্ম নেয় নব তরঙ্গ বা নিউ ওয়েভ (New Wave)। হলিউড সিনেমার কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন ফাঁকোয়া ত্রুফো (Francois Trauffant), জঁ্যা লুক গদার (Jean-Luc Godard), ক্লদ শাভরল (Claude Chabrol), অ্যাঁলা রেনে (Alain Resnais) প্রমুখ চলচ্চিত্র নির্মাতারা।

এই কঠোর বাস্তবাদী, বিশেষ মতবাদ নির্ভর ছবি অবশ্য সীমিত থেকেছে কিছু জনগোষ্ঠীর মধ্যে। প্যারালাল সিনেমায় ব্যক্তিগত চিন্তাধারার বিকাশ দেখা গেছে। তবে বাণিজ্যিক সফলতার প্রশ্নে মূলধারার সিনেমার সমকক্ষ হতে কখনই পারেনি অন্যধারার সিনেমা।

মূলধারার বিনোদনমূলক ছবিও কিন্তু বিশেষ কিছু বার্তা বহন করে। জনপ্রিয় ছবিগুলিতে দেখা যায় প্রাচীনপন্থী মতেরও মূল্যবোধের প্রাধান্য। তার সাথে মেলবন্ধন ঘটে জনপ্রিয় কিছু উপাদানের। এখানে 'ভাল' ও 'মন্দ'-এর বিভাজন খুব স্পষ্ট। ছবি জুড়ে মন্দের অত্যাচারে ভাল কষ্ট পেলেও পরিশেষে মন্দ শাস্তি পায়, ভাল সুখী হয়— ন্যায়ের জয়, অন্যায়ের পরাজয়। এ যেন বিনোদনের মধ্য দিয়ে এক ধরনের সামাজিক শিক্ষা দেওয়া এবং সমাজকে অটুট রাখার চেষ্টা। ভারতীয় সিনেমাতেও আমরা এই ধারা দেখতে পাই। পঞ্চাশের দশকে ভারতীয় সিনেমায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। সত্যজিৎ রায় ছিলেন এই নতুন ধারার পথিকৃৎ। বাংলা প্যারাল্‌ল সিনেমাতেও সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন প্রমুখ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের ছবির উপজীব্য বিষয় ছিল রূঢ় বাস্তব, সাধারণ মধ্যবিত্তের জীবনের যন্ত্রণা ও সংগ্রাম। কিন্তু এই সময় সমান্তরালভাবে মূলধারার সিনেমায় সুপুরুষ, সুন্দরী নায়ক নায়িকাদের নিয়ে প্রেম-অভিমান-বিবাহের সিনেমাও তৈরি হচ্ছিল। এই ছবিগুলিতে বরাবর দেখা গেছে সনাতন ভারতীয় মূল্যবোধের জয় জয়কার — শিল্পায়ন খারাপ, শহর খারাপ, খারাপ শহরের মানুষ, গ্রাম, গ্রামের মানুষ আমাদের সনাতন মূল্যবোধের ধারক ও রক্ষক। এর বিরোধীতা করাই অন্যায্য।

অন্যধারার সিনেমাতে এর ব্যতিক্রম দেখা গেলেও সিনেমার খরচ এতই বিপুল যে অন্যান্য মাধ্যমের তুলনায় এখানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা কঠিন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সমস্ত পৃথিবীতে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল হলিউডের সিনেমা। সেই সময় অধিকাংশ দর্শকই ছিল নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। কঠোর বাস্তব থেকে সরে গিয়ে হলিউডের ছবি উপস্থিত করে এক কৃত্রিম বাস্তবের চিত্র। নিম্ন ও মধ্যবিত্তরা তাদের আকাঙ্ক্ষার জগতকে পর্দায় প্রদর্শিত হতে দেখে। এছাড়া হলিউড তার কারিগরি দক্ষতার চূড়ান্তে গিয়ে সেই কৃত্রিমের বিশ্বাসযোগ্যতাকে এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে যায় যে দর্শক মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে কৃত্রিমকেই বাস্তব ভাবতে শুরু করে। হলিউড ছবিতেও দেখা যায় সনাতন মূল্যবোধ ও মতের প্রাধান্য।

ষাটের দশকে টেলিভিসন এসে সিনেমাকে এক কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ফেলে দেয়। সিনেমার এক বড় সংখ্যক দর্শককে কেড়ে নেয় টেলিভিশন। বিশ্বজুড়ে সিনেমা শিল্পে সংকট দেখা দেয়। সাধারণ দর্শক সিনেমা থেকে মুখ ঘুরিয়ে টেলিভিশন-মুখী হয়ে ওঠে। বিপন্ন হয় মূলধারার ছবি। কিন্তু টেলিভিশনের আগ্রাসনে প্যারালাল সিনেমা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়ে সিনেমার পরিচালক, অভিনেতারাও টেলিভিশনে কাজ করতে চলে আসেন। বিভিন্ন দেশে বন্ধ হয়ে যায় স্টুডিও, সিনেমা হল।

সংকটে পড়ে মূলধারার সিনেমা আরও ভীরু হয়ে যায়। বিভিন্ন কৌশলের প্রয়োগ ঘটিয়ে সিনেমাকে আরও আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করা হয়েছে।

তবে টেলিভিশন জনপ্রিয় হয় নিছকই স্বল্প খরচে ঘরে বসে আয়াস করে অবসর যাপনের এক মাধ্যম হিসেবে। সিনেমা যেমন গণসংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে টেলিভিশনের কিন্তু তেমন কোন অবদান নেই। বরঞ্চ দেখা যায় টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য বিষয় সিনেমার গান, সিনেমার তারকাদের নিয়ে অনুষ্ঠান ইত্যাদি। এমনকি টেলিভশনের সিরিয়ালে দেখা গেছে সিনেমায় ব্যবহৃত জনপ্রিয় উপাদানের ব্যবহার।

টেলিভিশনের আগ্রাসনের ফলে সিনেমার যে দর্শক সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল সেই টেলিভিশনও ভিডিও-র দৌলতে আবার এক বিপুল সংখক সিনেমার দর্শক সৃষ্টি হয়েছে যাঁরা ঘরে বসে টেলিভশনে সিনেমা দেখেন।

৬.৫ সিনেমা ও অন্যান্য মাধ্যম

৬.৫.১ সিনেমা ও চিত্রকলা

স্থির চিত্রের বহু আগে থেকে চিত্রকলা প্রচলিত ছিল। কিন্তু স্থির চিত্রের আবিষ্কারের সাথে সাথে চিত্রকলা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়, যদিও স্থির চিত্র তখন সাদাকালো ছিল। এর কারণ স্থির চিত্র সরাসরি লক্ষ্যবস্তুর প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করতে পারে। ইতিপূর্বে কোন বস্তুর বা প্রকৃতির দৃশ্যের নকল শুধু চিত্রকলার মাধ্যমেই সম্ভব ছিল কিন্তু তা ছিল হাতে আঁকা। দ্বিতীয়তঃ সমাজের উচ্চবিত্তরা চিত্রশিল্পীদের দিয়ে নিজেদের পোর্ট্রেট (portrait) আঁকাতেন। দেহ নশ্বর, তার মৃত্যু ঘটবেই, কিন্তু থেকে যাবে এই পোর্ট্রেট। এ যেন একরকম অমরত্বের পরিতৃপ্তি লাভ। স্থির চিত্র সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে এনে দিল এই সুবিধা। পোর্ট্রেট আঁকানো একটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপার এবং তাদের সাধ্যাতীত। কিন্তু স্থির চিত্র তাদের এতদিনের সাধকে সাধ্যের মধ্যে এনে দিল।

বিংশ শতাব্দীর চিত্র-শিল্পে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ধারা ইম্প্রেশনিজম্। এই ধারার বিশিষ্ট শিল্পী মনে (Monet), রেনোয়া (Renoir) প্রমুখ। ওঁরা ছবির মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ মুহূর্ত এবং 'আলো'-র বৈশিষ্ট্যকে দেখবার চেষ্টা করতেন। ফলে তাঁরা একই বিষয়ের ওপর বিভিন্ন সময়ের আলোর প্রতিফলন নিয়ে ছবি এঁকেছেন। এই ধারার সাথে যে ফোটোগ্রাফি (Photography)-র নিবিড় সম্পর্ক আছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়া মনে (Monet) একটি গির্জার এক সারি ছবি এঁকেছিলেন। ছবিগুলি ছিল গির্জাটির ওপর দিনের বিভিন্ন সময়ের আলো পড়ে আর বিভিন্ন মুহূর্তের। চিত্রগুলি দ্রুত পরপর দেখলে চলমান চিত্রকে মনে পড়ে।

চলচ্চিত্রের প্রভাবে কিনা জানা নেই কিন্তু এই সময় চিত্র শিল্পীরা ক্যানভাসে বস্তুর চলমানতাকে আঁকবার চেষ্টা করছিলেন। এ ব্যাপারে ১৯১৯ সালে আঁকা মার্সেল ডুক্যম্পের (Marcel Duchamp) আঁকা বিখ্যাত তৈলচিত্র ন্যুড ডিসেণ্ডিং এ স্টেয়ারকেস (Nude Descending a Staircase) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তৈলচিত্রটিতে শিল্পী এক নগ্ন মহিলার সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার প্রতিটি মুহূর্তে ক্যানভ্যাসে এঁকেছিলেন।

কিউবিজম (Cubism) আন্দোলনের সাথেও ফিল্মের যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। কিউবিজমকে সমস্ত বিমূর্ত শিল্পকলার উৎস বলা হয়। পিকাসো (Picasso), ব্রাক (Braque) হলেন এই আন্দোলনের বিশিষ্ট শিল্পী। ওঁরা প্রচলতি দ্বি-মাত্রিক ধারার বাইরে গিয়ে একটি বস্তুর বহু-মাত্রিক অবস্থানকে দেখতে চাইতেন। ছবিতে একটি বস্তুকে কোন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেন না। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তুটির বিভিন্ন ছবির একটি আপাত সুপারইম্পোজিশন (Superimposition) তাঁরা ক্যানভাসে আঁকতেন। এই ভাবে সেই বস্তুটির বহু-মাত্রিক অবস্থানকে তুলে ধরতেন। কিউবিজম-এর এই বৈশিষ্ট্যের সাথে সিনেমার মন্তাজ-এর (Montage) সামঞ্জস্য দেখা যায়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইতালীর ফিউচারিস্ট (Futurist) আন্দোলন সমস্ত ইউরোপ জুড়ে বিতর্কের ঝড় তোলে। এই আন্দোলনের মূল বক্তব্য ছিল গতি এবং আলো একটি জিনিসের সারবস্তুকে ধ্বংস করে ("We proclaim that movement & light destroy the substance of object.")। ফিউচারিস্ট শিল্পীরা যন্ত্র বা আকৃতির চলমানকে

ক্যানভাসে ধরবার চেষ্টা করতেন। ফিউচারিস্ট আন্দোলন চিত্র শিল্পের মধ্যে দিয়ে চলমান ছবিকে বিদ্রুপ করেছে। তবে অন্যান্য আন্দোলনের তুলনায় কিউবিজম-এর সাথে সিনেমার সম্পর্ক অনেক বেশি নিবিড়।

ভারতীয় সিনেমাতেও চিত্রশিল্পের সাথে সম্পর্ক দেখা গেছে। 'দাদা সাহেব ফালকে'— ভারতীয় সিনেমার জনক-এর ছবিতে দেখা গেছে রবি বর্মার চিত্র শিল্পের প্রভাব।

বাংলার পটচিত্রের সাথেও সিনেমার সামঞ্জস্য লক্ষনীয়। পটচিত্রের বৈশিষ্ট্য হল এর আকার। একটা লম্বাটে কাপড় বা কাগজে ছোট ছোট পট আঁকেন শিল্পীরা। প্রতিটি পটে একেকটি ঘটনার বিবরণ থাকে। এই লম্বাটে কাগজটা বা কাপড়টা গোটানো থাকে। শিল্পীরা এই গোটানো পট একটু একটু করে খোলেন আর গান গেয়ে ঘটনার বর্ণনা দেন। পৌরাণিক কাহিনীর অবলম্বনে এই পটচিত্র আঁকা হয়।

৬.৫.২ সিনেমা এবং সাহিত্য

সিনেমার গল্প বলার সাথে সাহিত্যের গল্প বলার এক অমোঘ মিল আছে। সিনেমার আবির্ভাবের বহু হাজার বছর আগে থেকে সাহিত্য মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেছে। সিনেমার জন্মলগ্ন থেকেই দেখা গেছে সাহিত্য থেকে সিনেমা হয়েছে। রাশিয়ার বিখ্যাত পরিচালক পুদভ্‌কিন বলেছিলেন সাহিত্যে যেমন 'শব্দ', সিনেমায় তেমনই 'শট'। এই দুই-ই তাদের মাধ্যমের মূল একক। অগণিত এই এককের সংযোজনায় সাহিত্য এবং ফিল্মের সৃষ্টি হয়। সাহিত্যের মত সিনেমাতেও এক জনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমস্ত গল্পটা বলা হয়। তবে দুটি মাধ্যমের মধ্যে প্রভেদও আছে। সিনেমায় ঘটনা বর্ণিত হয় চলমান দৃশ্যের মাধ্যমে, আর সাহিত্যে ভাষায় বর্ণিত হয়।

চলচ্চিত্র নির্ধারিত সময়ে বাঁধা; কিন্তু সাহিত্য তার বিপুল সম্ভার নিয়ে কোন বাঁধনে আটকে নেই। এর ফলে দেখা গেছে সাহিত্য থেকে সিনেমায় গ্রহণ করার সময় বহু ঘটনা, বর্ণনা বাদ পড়ে গেছে। সিনেমার পক্ষে সীমিত সময়ের মধ্যে কখনই একটি সম্পূর্ণ উপন্যাসকে তাঁর খুঁটিনাটি ঘটনা, বর্ণনা নিয়ে উপস্থিত করা সম্ভব নয়। অবশ্য টেলিভিশনে বহু পর্বের সিরিয়ালের (serial) মাধ্যমে আজ এটা সম্ভব। আবার সাহিত্যে কোন দৃশ্যপট বা পারিপার্শ্বিকের বর্ণনায় পাতার পর পাতা লেগে যায় কিন্তু ছবিতে সেটা একটা শটেই হয়ে যায়। অন্যদিকে সাহিত্যে কল্পনা, স্বপ্ন, স্মৃতির গভীর ব্যঞ্জনা যত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভাষায় বর্ণনা করা যায়, সিনেমায় কখনই তা সম্ভব নয়।

সাহিত্যে যে বক্তা, যে লেখক তার বর্ণনা, কথনের উপরেই আমরা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। শুধু তাই নয়, সে যে ভঙ্গীতে বলে আমরা সে ভাবে দেখতেই বাধ্য। সিনেমার ক্ষেত্রেও একটি ছবি তাঁর স্রষ্টার ভাবনা অনুসারে, দৃষ্টি ভঙ্গিতে হয়, তাঁর ইচ্ছানুসারে শট নেওয়া হয়, সম্পাদনা করা হয়, তবুও সিনেমায় দর্শকের স্বাধীনতা সাহিত্যের পাঠকের থেকে বেশি। একটি দৃশ্যের অপেক্ষা তার আবহসঙ্গীত হয়তো একজন দর্শককে বেশি আকর্ষণ করল। তেমনি একটি শটে চরিত্রদের কথোপকথনের থেকে হয়তো কোন দর্শক বেশি আকৃষ্ট হল মিসে-এন-সিনে।

একটি ছবির মূল একক যদি হয় শট, সাহিত্যে তা হল শব্দ। কিন্তু সাহিত্যের একটি শব্দের থেকে সিনেমার একটি শট অনেক অর্থবহুল।

সাহিত্য থেকে সিনেমা — এই ধারা ভারতীয় সিনেমায় নতুন নয়। বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সিনেমার অনন্যতায় আকৃষ্ট হয়ে বাংলা সাহিত্যের বহু দিক্‌পাল লেকক, শিল্পী, কবি সিনেমা শিল্পে যোগ দেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রী প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়; পরবর্তীকালে শ্রী পূর্ণেন্দু পত্রী, শ্রী বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত প্রমুখ। চিত্রনাট্য লেখা, পরিচালনা করা সবই করেছেন এঁরা। উপন্যাস, গল্পের ওপর ভিত্তি করে ছবি আজও তৈরি হচ্ছে। সত্যজিৎ রায়-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি পথের পাঁচালী ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটায়। ছবিটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে তৈরি। সাহিত্যের থেকে গ্রহণ করার সময় একজন পরিচালক কতটা অনুগত থাকবেন বা কতটা মৌলিক হবেন তা আলোচনাসাপেক্ষ। কিন্তু সাহিত্যের

উপর সিনেমার এই নির্ভরশীলতা আজও রয়েছে। অন্যদিকে প্রেমেন্দ্র মিত্রর বহু বন্দিত গল্প 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার'-কে বলা হয় চলচ্চিত্রের প্রভাবের ফল।

৬.৫.৩ সিনেমা ও থিয়েটার

পূর্বেই উল্লেখ করেছি সিনেমা কনিষ্ঠতম মাধ্যম। নাটক সিনেমার বহু আগে থেকে মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়। সিনেমার আদি পর্বে দেখা গেছে বহু ছবি আসলে মঞ্চে অভিনীত নাটকের রেকর্ডিং (recording)। এর পর যখন ছবিতে গল্প বলা শুরু হল তখন সিনেমায় নাটকের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। চরিত্রের কথার ধরনে, হাঁটা চলায়, অঙ্গ-ভঙ্গিতে, পোষাকে, দৃশ্যসজ্জায় আলো প্রক্ষেপণে — সর্বক্ষেত্রে সিনেমা থিয়েটারের নকলনবীশ ছিল। ক্রমে সিনেমা থিয়েটারের থেকে ভিন্ন হয়েছে।

থিয়েটার বা নাটকের সাথে সিনেমার একটি মূল তফাৎ হল দুটি মাধ্যমের বর্ণন ক্ষমতার। সিনেমায় যত সবিস্তারে এবং স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা যায়, থিয়েটারে তত সম্ভব নয়।

সিনেমায় বাস্তবের যে ভ্রান্তি সৃষ্টি করা সম্ভব, থিয়েটারে তা কখনই সম্ভব নয়।

নাটকের অভিনয় অনেক উচ্চ গ্রামের, চড়া সুরের হয়। মুখের অভিব্যক্তির থেকেও কণ্ঠস্বরের তারতম্য, অঙ্গ-ভঙ্গির দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করতে হয়। পিছনের সারিতে বসা দর্শকও যাতে বুঝতে পারে সেই হেতু নাটকের এই ধরণ। সিনেমায় কিন্তু ভাব প্রকাশের জন্য মুখের অভিব্যক্তির উপরই প্রাধান্য দেওয়া হয়। সিনেমা কখনই থিয়েটারের মত সংলাপ-নির্ভর নয়। সিনেমায় মেক-আপ-এর ব্যবহারও থিয়েটারের তুলনায় কম, কখনও বা প্রয়োজনে মেক-আপ ব্যবহারই হয় না। সিনেমায় যেহেতু ক্লোজ-আপ (Close-Up) শট নেওয়া সম্ভব, মুখের ভাবের সামান্যতম পরির্তনও আমরা দেখতে পাই, অভিনয়ে সূক্ষ্মতা একান্তই প্রয়োজন। এমনকি সিনেমায় যেহেতু শব্দ পরে যুক্ত করা যায়, যে অভিনেতা অভিনয় করছেন তাঁর কণ্ঠস্বর ব্যবহার না করে অন্যের কণ্ঠস্বরও ব্যবহার করা যায়। কিন্তু মুখের অভিব্যক্তি যেন যথার্থরূপে মনের ভাবকে প্রকাশ করে।

থিয়েটারে অভিনয় শুধরে নেবার কোন উপায় থাকে না। সরাসরি দর্শকের সামনে যেহেতু অভিনীত নয়। কিন্তু সিনেমায় একজন অভিনেতা এই সুবিধাটা পায়। একটি শট পছন্দসই না হলেই সেটি আবার গ্রহণ করা যায়।

সিনেমায় নির্মাতা আমাদের যেমন ভাবে একটি দৃশ্য দেখাবেন আমরা সেভাবে দেখতেই বাধ্য। যেমন — একটি দৃশ্যে দুটি মানুষ কথা বলছেন। এখন নির্মাতা যদি দু'জনকে এক সাথে দেখান, আমরা সে ভাবেই দেখব। যদি দুজনের আলাদা শট নেন, আমরা তাই দেখতে বাধ্য, কিন্তু মঞ্চেএই একই পরিস্থিতিতে একজন দর্শক কিভাবে দেখবেন তা নাট্য-পরিচালক নির্ধারণ করেন না। যদিও যিনি কথা বলছেন তাঁর উপর আলো ফেলে আলাদা করে দেখানোর রীতি আছে, কিন্তু দর্শক চাইলে অন্যভাবেও দেখতে পারেন।

সিনেমায়, মূলত ডকুমেণ্টারিতে (Documentary), অধিকাংশ ক্ষেত্রে, অভিনেতা থাকে না। এমন কি বহু ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ছবি তোলা হয় যারা জানেও না তারা একটি ছবির অংশ। থিয়েটারে এটা অসম্ভব।

থিয়েটার দর্শকের সামনে সরাসরি অভিনীত হয় — থিয়েটারের এই বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে থিয়েটারের দুই দিক্‌পাল তাত্ত্বিক বার্টল্ট ব্রেশ্‌ট (Bertolt Brecht) এবং আন্টোনিন আর্তুদ (Antonin Artand) থিয়েটারের নতুন ধারার সূচনা করেন। এই ধারার মতে দর্শক, নাটক চলাকালীন প্রত্যক্ষভাবে নাটকে যোগদান করবে অভিনেতাদের সঙ্গে। সিনেমায় কখনই এই যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব নয়।

আর্তুদের তত্ত্ব থিয়েটার অফ্ ক্রুয়েল্‌টি (Theatre of Cruelty)-র মতে মঞ্চ, থিয়েটার হল কিছুই থাকবে না। অভিনেতা ও দর্শক একটা সমান জায়গায় থাকবে। এর ফলে এই দুই-এর মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে।

ব্রেশটের তত্ত্ব এপিক থিয়েটার (Epic Theatre)-র মতে দর্শক থিয়েটারে মগ্ন হবে না, সে বাইরে থাকবে, পর্যালোচনা করবে, তার মতামত জানাবে।

পরবর্তীকালে অবশ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা ও তাত্ত্বিকরাও ব্রেশটের তত্ত্বে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

৬.৫.৪ সিনেমা ও সঙ্গীত

সঙ্গীত হল সর্বাধিক বিমূর্ত শিল্পকলা। সঙ্গীত শিল্পের জগতে একটি অনন্য স্থান অধিকার করে। সিনেমার সাথে সঙ্গীতের সম্পর্ক, অন্যান্য মাধ্যমের অপেক্ষা অধিক জটিল। সাহিত্যে বা নাটকে যে কাহিনীর বিন্যাস ঘটে, সঙ্গীতে সেই বিন্যাস ঘটে সুরের মধ্য দিয়ে। আর তাল, লয়, ছন্দের দ্বারা সে সুরের কাল পরিমাণ বা কাল বিভাগ বোঝানো হয়। সুর, ছন্দ, তাল, লয় সঙ্গীতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সঙ্গীতের সুর লালিত্য সৃষ্টি হয় সুর-তালের সংযোগে।

পরোক্ষভাবে সঙ্গীতের এই সুর, তাল, লয়ের সমন্বয় সিনেমাতেও পাওয়া যায়। চিত্রকলা বা সাহিত্য কোনটাই সঙ্গীত, নাটক বা সিনেমার মত সময়ে বাধা নয়।

সিনেমার আবিষ্কারের সাথে সাথেই সঙ্গীতের সাথে এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নির্বাক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সময় যন্ত্রশিল্পীরা সামনে বসে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। শব্দ সংযোজনার কৌশল আবিষ্কৃত না হলেও নির্বাক যুগের দিক্‌পাল চলচ্চিত্র নির্মাতারা সঙ্গীতের গুরুত্ব অনুভব করেন। যেমন, রাশিয়ার চলচ্চিত্র পরিচালক সের্গেই আইজেন্‌স্টাইন (Sergei Eismstein) তাঁর অ্যালেক্‌জাণ্ডার নেভ্‌স্কি (Alexander Nevsky) ছবিটির দৃশ্যের পরিকল্পনা করেন বিখ্যাত সঙ্গীতকার প্রোকোফিভ-এর (Prokofiev) সঙ্গীতের ওপর ভিত্তি করে।

সিনেমার আবিষ্কারর পর অর্থনৈতিকভাবে সঙ্গীতকাররা উপকৃত হয়েছেন, সঙ্গীতের ওপর তার প্রভাব পড়েছে, কিন্তু সঙ্গীতের উৎকর্ষতায় সিনেমার কোনরূপ অবদান নেই।

১৮৭৭ সালে ফোনোগ্রাফ (Phonograph) আবিষ্কৃত হয়। ইতিপূর্বে সঙ্গীত পরিবেশন অনুষ্ঠানে যোগদান শুধুমাত্র সমাজের উচ্চবিত্তদের মধ্যেই সীমিত ছিল। কিন্তু ফোনোগ্রাফের আবিষ্কারের পর সঙ্গীত আর শুধু উচ্চবিত্তের মধ্যে আটকে থাকে না। সঙ্গীত কিছু মাত্রায় হলেও তার কৌলিন্য হারায়। অনুষ্ঠানে সরাসরি সঙ্গীত পরিবেশন করা বন্ধ হয় না কিন্তু এর পর সঙ্গীত 'রেকর্ডিং' (recording) খুব জনপ্রিয় হয়।

বিংশ শতাব্দীর চারের দশকে ম্যাগনেটিক টেপ (magnetic tape) আবিষ্কৃত হয়। আর সঙ্গীতের জগতে ঘটে এক বিপুল পরিবর্তন। শব্দ বা সঙ্গীত রেকর্ডিং-এর ক্ষেত্রেও ম্যাগনেটিক টেপের আবিষ্কার এক যুগান্তকারী ঘটনা। সঙ্গীত সৃষ্টির ক্ষেত্রে রেকর্ডিং-এর ভূমিকা এখন এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে বহু সময় সঙ্গীত সৃষ্টি হচ্ছে রেকর্ডিং স্টুডিও (recording studio)-তেই।

হলিউড সিনেমায় সঙ্গীত নির্ভর ছবি তৈরি হতে শুরু হয়, যা এক ধারার জন্ম দেয় — মিউজিকাল (musical)।

ভারতীয় মূলধারার সিনেমাতেও সঙ্গীত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। প্যারালাল বা অন্যধারার সিনেমাতেও সঙ্গীতের অবদান আছে। তবে দুটি ধারায় সঙ্গীতের ব্যবহার এক রকম নয়। মূলধারায় সঙ্গীত বিনোদনের উপাদান আর অন্যধারার সিনেমার সঙ্গীত ছবির ব্যঞ্জনা আরও গভীরতর করে।

৬.৫.৫ সিনেমা ও নৃত্য

শিল্পরূপ হিসেবে নাচ চলচ্চিত্রকে নানাবিধ ভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রাচীনকাল থেকেই নাচ সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিনোদন কর্মের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল।

কোনারক বা খাজুরাহোর মত মন্দির গাত্রে এবং পৃথিবীর সর্বত্র প্রসারিত লোকশিল্পের রীতিতে নৃত্য এক সুদূর প্রসারি ভূমিকা নেয়। চলচ্চিত্রের নাচ শুধুমাত্র ক্ষণিকের বিনোদন হিসেবে আসে না, অনেক সময় রূপক ও প্রতীকের উপাদানও যোগান দেয়।

একদিকে যেমন আমরা হলিউডের ছবিগুলোতে নাচের একটা দৈনন্দিন অভ্যাসপ্রতীম উপস্থিতি পাই তেমনি আবার ইয়াঙচোর ছবিতে নাচ ইতিহাসের স্তর থেকে স্তরান্তরে নিয়ে যায়।

ভারতীয় ছবিতে নাচের এই রহস্য সর্বপ্রথম প্রকৃত অর্থে হৃদয়ঙ্গম করেন উদয়শঙ্কর তার ছবি 'কল্পনায়।' এই একমাত্র ভারতীয় ছবি যেখানে নাচ নিজেই হয়ে উঠেছে আখ্যানের পরিপূরক। জনপ্রিয় ভারতীয় সিনেমাতে নাচের প্রয়োগে ঐতিহ্য আধুনিকতার সেতুবন্ধনের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

'কল্পনা' ছবিটি তৈরি করতে উদয়শঙ্করের চার বছর লেগে যায়। ছবিটির গল্প উদয় শঙ্করের স্বপ্নের এক চিত্ররূপ। এক গল্পকার উদয়ন (উদয়শঙ্কর) এবং কামিনীর (কান্তা) কথা এক চলচ্চিত্র প্রযোজককে বলেন। উদয়ন ও কামিনী নৃত্যের পূজারী, তাঁরা একটি কলা কেন্দ্র গঠন করতে চায়। এই গল্পের উপর চিঠি করে ছবি করতে চেয়ে গল্পকার প্রযোজককে তার মনস্কামনা জানান কিন্তু প্রযোজক রাজি হয় না। উদয়নের এই স্বপ্ন আসলে স্বয়ং উদয়শঙ্করের স্বপ্ন (যার ফল আলমোরার ইণ্ডিয়ান কালচারাল সেন্টার)। সনাতনী নৃত্যের এক অনন্য প্রদর্শন ঘটে কল্পনায়, নৃত্য যেখানে স্বপ্নের রূপক। নৃত্য পরিকল্পনা ক্যামেরার সুবিধা অনুযায়ী করেছিলেন উদয়শঙ্কর।

ভারতীয় আধুনিকতা ও সিনেমার মেলবন্ধন ঘটেছিল এই ছবিতে। জেম্‌স জয়েস (James Joyce) 'কল্পনা' দেখে আপ্লুত হয়ে কন্যাকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'মঞ্চের উপর ওঁর উপস্থিতি অতিপ্রাকৃত মনে হয়। বিশ্বাস কর, এই দরিদ্র পৃথিবীতে এখনও কিছু সুন্দর জিনিস অবশিষ্ট আছে।' (He moves on the stape like a semi-divine being. Believe me, there are still some beautiful things left in this poor old world.'

৬.৬ সারাংশ

শিল্প বিপ্লবের পর যন্ত্রযুগে গণমাধ্যমের আবির্ভাব ঘটে। গণ মাধ্যমের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে সিনেমাই সর্বাধিক সফল ও জনপ্রিয়। কারণ গণজ্ঞাপনের কাজে সিনেমার মত সাফল্য আর কেউ পায়নি। একাধারে সে বিনোদনের মাধ্যম, অন্যদিকে সে প্রচারমূলক কাজেও তার জুড়ি নেই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সমস্ত পৃথিবীতে হলিউড ছবিই ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রেক্ষাপট বদলের সাথে সিনেমা-শিল্পে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে বিপ্লব ঘটে যায়। হলিউডের কৃত্রিম বাস্তবতার ছবিকে বর্জন করে তৈরি হতে থাকে কঠোর বাস্তববাদী ছবি। জন্ম নেয় বিভিন্ন তত্ত্বের।

সিনেমার জনপ্রিয়তার সাথে অন্যান্য শিল্পমাধ্যম প্রতিদ্বন্দীতার মুখে পড়ে যায়। শুরু হয়ে যায় বিভিন্ন মাধ্যমের সাথে তুলনামূলক আলোচনা।

সাহিত্যের ওপর ভিত্তি করে যেমন ছবি হয়েছে, তেমন সাহিত্যকেও সিনেমা প্রভাবিত করেছে।

শিল্পকলার ক্ষেত্রেও পারস্পরিক সম্পর্ক খুব নিবিড়।

নাটকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে — সিনেমার আদি পর্বে সিনেমার ওপর নাটকের, নাট্যমঞ্চের প্রভাব অসীম। কিন্তু ক্রমে সিনেমা নাটক থেকে মুক্ত হয়েছে।

সঙ্গীত এবং নৃত্যের সাথেও সিনেমার সম্পর্ক বেশ নিবিড়। সঙ্গীত, নৃত্য দুই-ই সিনেমার উপাদানও বটে।

তবে টেলিভিশনের মত করে কেউই সিনেমাকে সংকটে ফেলতে পারেনি। টেলিভিশন এসেই সিনেমার এক বৃহদাংশ দর্শককে কেড়ে নিয়েছে। অবশ্য সিনেমা সেই সংকট কাটিয়ে উঠেছে।

কিন্তু সিনেমা যেমন গণসংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে, টেলিভিশনের তেমন কোন অবদান নেই।

১.৭ অনুশীলনী

১. গণ-জ্ঞাপনের সংজ্ঞা কী?
২. গণ-জ্ঞাপনের মাধ্যম হিসেবে সিনেমার ভূমিকা আলোচনা করুন।
৩. সিনেমা ও থিয়েটারের সম্পর্ক আলোচনা করুন।
৪. সিনেমা ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্বন্ধ আলোচনা করুন।

৬.৮ গ্রন্থপঞ্জী

How to Read A Film — James Monaco.
Film Art-An Introduction — D. Bordwell & K. Thompson.
McQuails Mass Communication Theory : 4th Edition — Denis McQuail.
গণ জ্ঞাপন — ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

একক ৭ ❐ সিনেমার ভাষা

গঠন

৭.১ উদ্দেশ্য

৭.২ প্রস্তাবনা

৭.৩ মৌলিক ধারণা

৭.৩.১ শট

৭.৪ সিকোয়েন্স

৭.৫ মিসে-এন-সিন

৭.৬ ইমেজ

৭.৭ ডায়াক্রোনিক শট

৭.৮ মন্তাজ

৭.৯ সিনেমা টাইম এবং রিয়েল টাইম

৭.১০ সারাংশ

৭.১১ অনুশীলনী

৭.১২ গ্রন্থপঞ্জী

৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হচ্ছে সিনেমার কোন নিজস্ব ভাষা আছে কিনা তা নিয়ে আলোচনা করা। অতএব এই একক পড়ে আপনি জানতে পারবেন—

- সিনেমার ভাষা সংক্রান্ত তত্ত্ব।
- সিনেমার বিভিন্ন উপাদান।

৭.২ প্রস্তাবনা

সিনেমার আদিযুগ থেকে সিনেমার সাথে সাহিত্যের তুলনা করে সিনেমারও একটি নিজস্ব ভাষা আছে, এমন দাবী বারে বারে উঠেছে। প্রত্যেকবারই বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে এই দাবীকে কেন্দ্র করে। বিশদ আলোচনা হয়েছে, তত্ত্বের জন্ম হয়েছে তবে বিতর্ক আজও অব্যাহত। সিনেমার ভাষা সংক্রান্ত একটি আলোচনা প্রথমেই করা হয়েছে। সেখান থেকে যাচ্ছি শটে, সিকোয়েন্সে। এর পর একে একে আলোচিত হয়েছে মিস-অন-সিন, মন্তাজ, ডায়াক্রোনিক শট, ইত্যাদি। প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই কতগুলি অবশ্য পালনীয় রীতি আছে। একটি যথার্থ ছবি তৈরি করতে পরিচালক সব না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রীতি অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য। প্রচলিত রীতিকে অগ্রাহ্য করে যে ছবিগুলি তৈরি হয়েছে সেগুলিও কিন্তু অন্য একটি রীতিকে অনুসরণ করে। এই রীতি বা ব্যাকরণ একটি ভাষার নিয়ম-কানুন সম্বলিত শাস্ত্র।

৭.৩ মৌলিক ধারণা

সিনেমা কখনোই ইংরাজি বা ফরাসীর মত একটি ভাষা নয়। এখানে অক্ষরজ্ঞানেরও প্রয়োজন নেই, শব্দ ভাণ্ডার সম্পর্কে অবগত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এমনকি শিশুরাও টেলিভিশন দেখে (ভাষার সাথে কোনরূপ পরিচয়ের অনেক আগে থেকেই)।

তবে সিনেমা নিঃসন্দেহে ভাষার 'মত'। যে ব্যক্তিরা সিনেমা শিল্পে শিক্ষিত, যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা অন্যান্যদের তুলনায় সিনেমাকে অনেক বেশি মাত্রায় অনুধাবন করতে পারে। সিনেমার তথাকথিত-ভাষা শিক্ষা সিনেমাকে দর্শকের কাছে অধিকতর অর্থ বহন করে তোলে।

'ইমেজ' (Image) শব্দটির মধ্যে দুটি অর্থ নিহিত আছে। একাধারে 'ইমেজ' যেমন একটি দৃষ্টিগত নকশা বা প্যাটার্ন, অন্যদিকে তেমনই ইমেজ একটি ধারণাও বটে (এটি মানসিক)। এটি পরীক্ষিত সত্য যে ইমেজের যথার্থ অনুধাবনের জন্য শিক্ষা এবং অনুশীলন প্রয়োজন।

সিনেমা ভাষা না হলেও যেহেতু ভাষার মত তাই ভাষাতত্ত্ববিষয়ক কিছু আলোচনা সিনেমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয় হল সেমিয়টিক্স্ (Semiotics) বা সংকেতচিহ্ন বিজ্ঞান। সেমিয়টিসিয়ান (Semiotician) বা সংকেতচিহ্নবিজ্ঞানীদের মতে যে কোন জ্ঞাপন রীতি বা প্রণালী (System of communication) হল 'ভাষা'। সে অর্থে ইংরাজি বা ফরাসি হল 'ভাষা প্রণালী' (Language system)। কিন্তু সিনেমা ভাষার 'মত' হলেও 'ভাষা প্রণালী' নয়। ক্রিশ্চিয়ান মেজ্ (Christian Metz) এ প্রসঙ্গে বলেছেন "It is not because the cinema is language that it can tell such fine stories, but rather it has become language because it has told such fine stories.

সংকেতচিহ্নবিজ্ঞানীদের মতে একটি চিহ্ন (sign)-এর দুটো ভাগ থাকে : সিগনিফায়ার (Signifier) এবং সিগনিফায়েড (Signified)। Signifier অর্থাৎ নির্দেশক, যা নির্দেশিত (signified) আছে তার প্রতি নির্দেশ করে। 'বই' শব্দটি হচ্ছে signifer, সে যেটার প্রতি নির্দেশ করে তা হচ্ছে 'বস্তু বইটি'— এটি signifed।

সিনেমাতে signifier এবং signified প্রায় অভিন্ন। বই-এর ছবি এবং বস্তু বই-এর মধ্যে যে নৈকট্য আছে শব্দ 'বই' এবং বস্তু বই-এর মধ্যে তা নেই। একটি ছবি এবং সেই ছবি যার প্রতি নির্দেশ করছে, এই দুটির মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে, যেটি একটি শব্দের মানে নেই।

সিনেমার সংকেতচিহ্নের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য সিনেমার ভাষা-সংক্রান্ত আলোচনা খুব সহজ বা সরল নয়। ক্রিশ্চিয়ান মেজ (Christian Metz) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "A film is difficult to explain because it is easy to understand."

৭.৩.১ শট (Shot)

শটকে একটি ছবির মৌলিক একক ভাবা হয়। এমনকি কিছু চলচ্চিত্র তাত্ত্বিকের মতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি 'শব্দ' যা, ছবির ক্ষেত্রে তা হচ্ছে 'শট'। কিন্তু সিনেমার সংকেতচিহ্নবিজ্ঞানীদের মতে 'শট' এবং 'শব্দ'-এর অবস্থান কখনই একরকম নয়। একটি শট একটি শব্দের থেকে অনেক বেশি তথ্যবহুল হয়। দ্বিতীয়ত ঃ শটের সংজ্ঞা হিসেবে এটাও বলা হয় যে যখন ক্যামেরা একটানা চলে একটি দৃশ্যগ্রহণ তাকে সেই দৃশ্য হল একটি শট। কিন্তু একটি শটের মধ্যে সব সময়ই সম্পাদনার কিছু বিশেষ প্রণালী ব্যবহার করা যায়, যাকে বলা হয় পাঙ্কচুয়েশন (Punctuation)। আসলে সিনেমার ক্ষেত্রে কখনই ক্ষুদ্রতম একক পাওয়া সম্ভব নয় (এমনকি একটি ফ্রেমও নয়)।

অতএব ফিল্মের যে ভাষা সম্পর্কে অবহিত হওয়া গেল, তা এরকম—

প্রথমত ঃ এখানে signifier অর্থাৎ নির্দেশক এবং signified অর্থাৎ যা নির্দেশিত প্রায় সমান।

দ্বিতীয়ত ঃ এটি একটি অবিচ্ছিন্ন, পরস্পর সম্বন্ধীয় প্রণালীর উপর নির্ভরশীল, যেখানে একটি মৌলিক একককে নির্দিষ্ট করা যায় না, ফলস্বরূপ যার কোন মাত্রাগত (Quantitative) সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভবপর নয়।

৭.৪ সিকোয়েন্স (Scquence)

একটি চলচ্চিত্রকে ঘটনা পরম্পরায় যখন ভাগ করা হয়, তখন একেকটি ভাগকে সিকোয়েন্স বলা হয়। কাহিনী-নির্ভর (narrative) ছবিতে সিকোয়েন্সকে সিন বলা হয়।

একেকটি সিকোয়েন্সকে যুক্ত করা হয় ফেড (Fade), ডিসলভ (Dissolve), কাট (Cut) ইত্যাদি দিয়ে। এবং প্রত্যেকটি সিকোয়েন্স একাধিক শট নিয়ে গঠিত হয়।

হলিউডের রীতি অনুযায়ী একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যে কাহিনী চিত্রের কখনোই ৪০টির অধিক বা ৫টির কম সিকোয়েন্স থাকে না।

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'চারুলতা' ছবিটি মোট ৯টি সিকোয়েন্সে বিভক্ত।

৯-টি সিকোয়েন্সে একাধারে যেমন কাহিনীর ক্রম-বিন্যাস ঘটেছে, অন্যদিকে কতগুলি চরিত্র, পারস্পরিক সম্পর্ক, যেমন চারু-ভূপতি, ভূপতি-অমল, অমল-চারু এবং সম্পর্কের দ্বন্দ্ব দর্শকের সামনে উন্মোচিত হয়েছে।

প্রত্যেকটি সিকোয়েন্সের বাঁধুনী এবং বুনন লক্ষণীয়। পরবর্তী সিকোয়েন্সের ঘটনার ইঙ্গিত পূর্ববর্তী সিকোয়েন্সেই দেখা গেছে। যেমন ২য় সিকোয়েন্স মন্দা, উমাপদর আসার ইঙ্গিত ১ম সিকোয়েন্সে, ৩য় সিকোয়েন্সে অমল-চারুর একান্ত সাহিত্যালাপের আভাস ২য় সিকোয়েন্সের শেষেই পাওয়া যায়।

এখানে ছবির শেষে পাঞ্চুয়েশন (Punctuation) হিসেবে শ্রীরায় ফ্রিজ (Freeze) শট ব্যবহার করেছেন। কোন প্রযুক্তিগত কারণে নয়, সম্পর্কের অনিশ্চয়তা বোঝাতে ফ্রিজ শট ব্যবহার করেছেন।

৭.৫ মিসে-এন-সিন (Mese-en-scene)

● **সংজ্ঞা**

মূল ফরাসী ভাষায় ঘটনাপ্রবাহের মঞ্চস্থ করাকে মিসে-এন-সিন বলা হয়। এটি প্রথম ব্যবহৃত হয় থিয়েটারের ক্ষেত্রে। পরবর্তীকালে সিনেমাতেও 'মিসে-এন-সিন' শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। এখানে মিসে-এন-সিন-এর অর্থ হল একজন পরিচালক 'কী' দৃশ্য, 'কীভাবে' গ্রহণ করছে তার ব্যাখান।

● উপাদান

মিসে-এন-সিনের বিভিন্ন উপাদান হল দৃশ্যপট (setting), সাজসজ্জা (costume), আলোকসম্পাত (lighting), চরিত্রের অভিব্যক্তি ও চলাফেরা (expression and movement)। সিনেমায় এর কোন একটি আলাদা করে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। একাধিক উপাদানের একত্রিকরণের মধ্যে দিয়ে ছবিতে মিসে-এন-সিন সৃষ্ট হয়।

● দৃশ্যপট

সিনেমার আদিকাল থেকেই দৃশ্যপটের গুরুত্ব অনুভূত হয়। আন্দ্রে বাঁজা বলেছেন, "The human being is all-important in the theatre. The drama on the screen can exist without actors. A banging door, or leaf in the wind, waves beating on the shore can heighten the dramatic effect. Some film masterpieces use man only as a accessory, like an extra, or in counterpoint to nature, which is the true leading character". অর্থাৎ সিনেমায় সবসময় অভিনেতার প্রয়োজন থাকে না। বাতাসে গাছের পাতার উড়ে যাওয়ার দৃশ্য বা সমুদ্রতট আছড়ে পড়া ঢেউ-এর দৃশ্যই একটি মুহূর্তের নাটকীয়তা বাড়িয়ে দিতে পারে। কিছু দিক্‌পাল চলচ্চিত্রকার তো ছবিতে মানুষকে প্রকৃতির সহায়ক বা সহোযোগী হিসেবে ব্যবহার করেন, যেখানে প্রকৃতিই ছবির মুখ্য চরিত্র।

দৃশ্যপট মূলত দু'ভাগে পরিচালক নির্ধারণ করেন। এক হতে পারে পরিচালক তাঁর মনোমত দৃশ্যপট প্রস্তুত করে নিলেন। অথবা রাস্তা, পার্ক, ফ্যাক্টরি অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকাশ্য স্থানে (যেগুলি আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল, পরিচালককে এখানে কিছু তৈরি করতে হয়নি) দৃশ্যগ্রহণ করেন। উক্ত দু'ধরনের দৃশ্যপটের ব্যবহারই সিনেমার আদিযুগ থেকে দেখতে পাওয়া গেছে।

ল্যুমিয়ের ভাইরা 'দ্য ওয়াটারার ওয়াটার্ড' (The Waterer Watered) ছবিটির দৃশ্যগ্রহণ করেছিলেন একটি বাগানে। এবং এর পরবর্তীকালে দেখা গেছে স্টুডিও-র বাইরে বেড়িয়ে শুটিং করা অতি স্বাভাবিক এক ব্যবস্থা। অন্যদিকে, প্রয়োজনমত দৃশ্যপট তৈরি করার পথিকৃৎ জর্জ মেলিয়ে। এরপর হলিউডের বিখ্যাত স্টুডিওগুলিতে দেখা যায় গোটা এক শহর ওঁরা তৈরি করে ফেলতেন।

ভারতীয় ছবিতেও এই দুটি ধারাই দেখা গেছে। সত্যজিৎ রায় পথের পাঁচালীর সম্পূর্ণ দৃশ্যগ্রহণ করেছিলেন বোড়ালের একটি গ্রামে। অন্যদিকে, 'সোনার কেল্লা' ছবির শুটিং রাজস্থান থেকে সম্পূর্ণ করে আসার পরে সত্যজিৎ রায়ের মনে হয় মুকুলের (ওঁর পূর্বজন্মের বাড়ির ভিতরে) একটি কান্নার দৃশ্য প্রয়োজন। তখন কলকাতায় সম্পূর্ণ সেই ভাঙাচোরা, পাহারের ঘর, সিঁড়ি তৈরি করেন। 'সতরঞ্চ কী খিলাড়ী' ছবির জন্য বাহাদুর শাহ-র আমলের ব্যবহৃত পোষাক-আষাক, অস্ত্র শস্ত্র, গড়-গড়া, দাবার ছক, ঘুঁটি, পাল্কী সমস্ত জোগাড় করেছিলেন। এবং বাহাদুর শাহ-র সিংহাসনখানি হুবহু তৈরি করিয়েছিলেন।

ভারতীয় মূলধারার হিন্দি ছবিতেও দেখা যায় সে সময়ের প্রেক্ষাপটে ছবি তৈরি করা হয়, যে সময়ের প্রেক্ষাপটে ছবি তৈরি করা হয়, সেই সময়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। যেমন সঞ্জয় লীলা বনশালীর 'দেবদাস' ছবিতে উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতাকে বম্বের স্টুডিওতে তৈরি করেন।

● সাজসজ্জা এবং মেকআপ

দৃশ্যপটের পাশাপাশি সাজসজ্জাও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। চরিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে সাজসজ্জার ভূমিকা যে কী অপরিসীম তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত চার্লি চ্যাপলিনের জগৎ বিখ্যাত 'ট্র্যাম্প' চরিত্রটি। একজোড়া জুতো, একটি ছড়ি এবং একটি টুপি দেখলেই মানুষ চার্লিকে চিনতে পারে।

'জ্যঁর'-এর ক্ষেত্রে সাজসজ্জা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। যেহেতু একটি বিশষ জ্যাঁ-এর ছবিগুলির মধ্যে

সামঞ্জস্য থাকাটা একান্তই আবশ্যক, সেখানে পোষাকও (মুখ্য চরিত্রগুলির) ছবিগুলিতে একইরকম হয়। দর্শক পোষাক দেখেই চিনতে পারবে। যেমন 'ওয়েস্টার্ন' জ্যাঁ-এর পোষাকগত বৈশিষ্ট্য হল হিরোর পরণে থাকবে চওড়া প্রান্তের টুপি, আঁটো সাঁটো জিন্সের প্যান্ট, গায়ে ঢোলা জামা। শার্টের গলার ও উপরের বোতাম খোলা, গলায় বাঁধা থাকবে রুমাল এবং জুতোর গোড়ালি অঞ্চল অস্বাভাবিক উঁচু। হাতের আগ্নেয়াস্ত্রও (মূলত বন্দুক) কিন্তু সজ্জার একটি অঙ্গ।

এছাড়া কোন বিশেষ সময়ের বা ঐতিহাসিক কোন ছবি তৈরি করতে গেলে সজ্জার ভূমিকা অসীম। যেমন 'সতরঞ্চ কী খিলাড়ী' ছবিতে সত্যজিৎ রায় বাহাদুর শাহ এবং অন্যান্য চরিত্রের সেই সময়কার পোষাক পরিয়েছিলেন, যেমন সিল্কের ঢোলা পাজামা, সিল্কের কারুকার্যময় অঙ্গরাখা, তার ওপর দামি শাল, মাথায় জরির টুপি, পায়ে শুঁড় তোলা নাগড়া। মেকআপও তৎকালীন ধরন অনুযায়ী করেছিলেন। যেমন মাথায় বাবরি চুল।

চরিত্রকে বাস্তব-সম্মত করতে মেকআপের খুবই প্রয়োজন। ওথেলো (Othello) ছবিতে অভিনয় করতে গিয়ে চরিত্রকে বাস্তবসম্মত করতে লরেন্স অলিভিয়া (Lawrence Olivier) গায়ে মাথায় সর্বত্র কালো রঙ মেখেছিলেন। 'পরমা' ছবিতে পরিচালক অপর্ণা সেন পরমার মেক আপ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পরমার মানসিক অবস্থান ও পরিবর্তন বুঝিয়েছেন খুব সুন্দর ভাবে।

এছাড়া মেকআপের কিছু বিশেষ ব্যবহার আছে। কল্প-বিজ্ঞান-নির্ভর ছবিতে, ভৌতিক ছবিতে মেকআপ-এর কার্যকারিতা অপরিসীম।

● **আলোকসম্পাত**

সিনেমায় আলো শুধুমাত্র একটি বস্তুকে বা ব্যক্তিকে আলোকিত করে না, এখানে আলোর ভূমিকা আরও তাৎপর্যময়। আলো বস্তুকে উজ্জ্বলিত বা ছায়াবৃত করে অধিক অর্থবহ করে তোলে।

সিনেমার আলোর চারটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় :

১। প্রকৃতি (Quality)

২। গতিপথ (Direction)

৩। উৎস (Source)

৪। রঙ (Colour)

আলোর প্রকৃতি (quality) বলতে আলোর আপেক্ষিক তীব্রতা বোঝানো হয়। হার্ড লাইটিং (Hard lighting) অর্থাৎ তীব্র আলোর খুবই স্পষ্ট ছায়ার জন্ম দেয়। আর সফ্‌ট্‌ লাইটিং (Soft Lighting) অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত মৃদু আলোর ফলে সমস্ত অঞ্চল আলোয় পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়। এর ফলে দৃশ্যে এক নমনীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। হার্ড লাইটিং দৃশ্যে কঠোর বা কাঠিন্যভাব আনে। কোন কিছুকে প্রাধান্য দিতেও হার্ড লাইট ব্যবহার করা হয়।

আলোর গতিপথ (direction) বলতে বোঝায় আলোর উৎস থেকে লক্ষ্যবস্তুর উপর প্রতিফলিত হওয়ার যে গতিপথ। আলোর প্রতিফলন অনুযায়ী ৫ রকম আলো নির্দিষ্ট করা যায় — ফ্রনটাল লাইটিং (Frontal Lighting), সাইড লাইটিং (Side Lighting), ব্যাক লাইটিং (Back Lighting), আন্ডার লাইটিং (Under Lighting) এবং টপ লাইটিং (Top Lighting)।

ফ্রন্টাল লাইটিং (Frontal Lighting) : ক্যামেরার খুব কাছ থেকে লক্ষ্যবস্তুর উপর এমনভাবে আলো ফেলা হয় যাতে কোন ছায়া না পড়ে।

সাইড লাইটিং (Side Lighting) : যখন বস্তু বা ব্যক্তির একদিক আলোকিত করা হয়। বস্তুর ঘণত্ব বোঝাতে বা চরিত্রের মুখের আদলকে আলোকিত করে চরিত্রের মানসিক উত্তেজনা ফুটিয়ে তুলতে সাইড লাইটিং ব্যবহার করা হয়।

ব্যাক লাইটিং (Back Lighting) : যখন লক্ষ্যবস্তুর পেছন থেকে আলো ফেলা হয়, তাকে বলা হয় ব্যাক লাইটিং। এক্ষেত্রে আলো বিভিন্ন কোণ থেকে ফেলা যায়। কিন্তু সবই চরিত্রের পেছন থেকে। এছাড়া, যদি আলোর আর অন্য কোন উৎস না থাকে তবে সিলুয়েট (Silhouette) সৃষ্টি হয়।

আন্ডার লাইটিং (Under Lighting) : যখন বস্তুর বা ব্যক্তির নিচের দিক থেকে আলো ফেলা হয় তখন তাকে বলে আন্ডার লাইটিং। ভৌতিক দৃশ্যে এইভাবে আলোর ব্যবহার দেখা যায়।

টপ লাইটিং (Top Lighting) : এক্ষেত্রে বস্তু বা ব্যক্তির সরাসরি ওপর থেকে আলো ফেলা হয়। এই ধরনের আলো প্রক্ষেপণের দ্বারা বস্তুর বা ব্যক্তির বাহ্যিক সীমারেখাকে আলোকিত করা হয় অথবা পশ্চাদ্‌পট থেকে বস্তু বা ব্যক্তিকে পৃথক করা হয়।

আলোর উৎস (source)-র উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন রকমের আলোকসম্পাত আমরা দেখতে পাই। তথ্যচিত্রে কৃত্রিম অলোর সচরাচর ব্যবহৃত না হলেও, কাহিনী-নির্ভর ছবিতে কৃত্রিম আলোর ব্যবহার করতেই হয়। এক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রচলিত হল — থ্রি পয়েন্ট লাইটিং (3-point-lighting)— অর্থাৎ তিনটি বিশেষ কোণ থেকে আলো ফেল হয়। এই তিনটি আলো হল — কী লাইট (Key Light), ফিল লাইট (Fill Light), ব্যাক লাইট (Back Light)। উক্ত থ্রি-পয়েন্ট লাইটিং-এর সূচনা হয় হলিউডের সেই স্টুডিও সিস্টেমের সময় থেকে। ব্যাক লাইট ব্যক্তির পিছনে উপর থেকে ফেলা হয়। কী লাইট তির্যক ভাবে সামনে থেকে ফেলা হয়। এবং ফিল লাইট ফেলা হয় ক্যামেরার খুব কাছ থেকে। 'কী লাইট' ফিল লাইটের তুলনায় উজ্জ্বলতর এবং ক্যামেরার নিকটতর স্থানে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের জন্য তিনটি আলো থাকে। দু'টি চরিত্র থাকলে একজনের 'কী লাইট' অপরজনের 'ব্যাক লাইট' হয় ক্যামেরার দু'ধারে দুটি 'ফিল লাইট' থাকে।

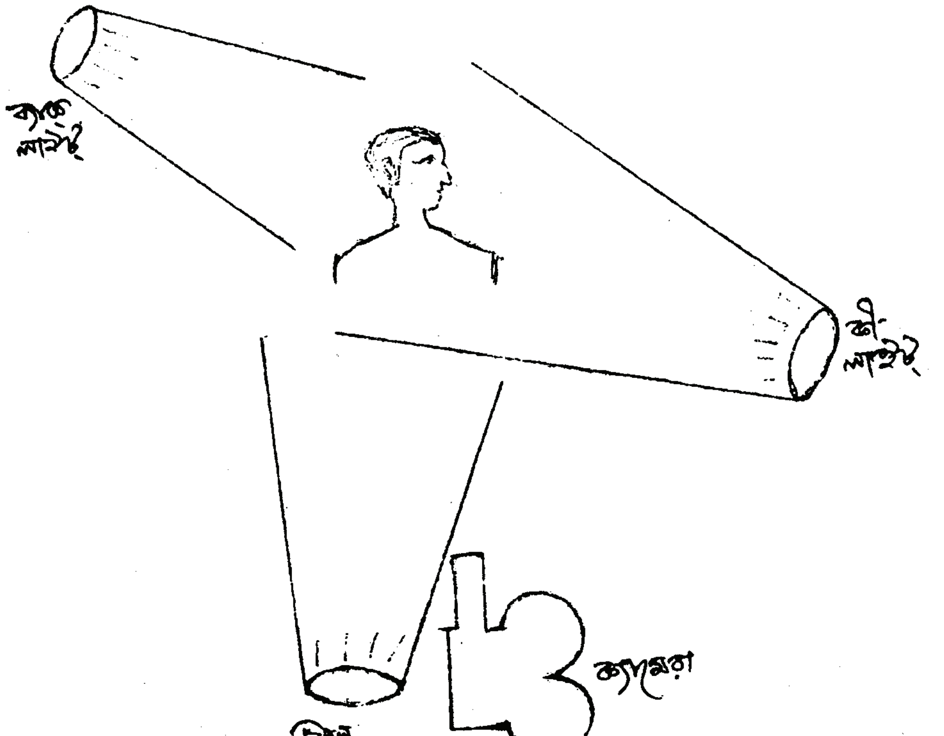

থ্রি-পয়েন্ট লাইটিং

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্যামেরা স্থানান্তরিত হলেই আলোর স্থান পরিবর্তন করতে হয়। এটি খুব বাস্তবসম্মত না হলেও দৃশ্যের ঔজ্জ্বল্য বজায় রাখতে হলিউডে এই ভাবে দৃশ্যগ্রহণ করা হয়।

দিনের বিভিন্ন সময় বোঝাতে উক্ত তিনটি আলোর তীব্রতায় তারতম্য ঘটানো হয়। এই তারতম্য দুই প্রকারের হয় : 'হাই-কীলাইটিং' (High-key Lighting) এবং 'লো-কী-লাইটিং' (Low-key lighting)। হাই-কী-লাইটিং-এর ক্ষেত্রে 'ফিল' এবং 'ব্যাক' লাইট এমনভাবে ব্যবহৃত হয় যাতে দৃশ্যের উজ্জ্বল এবং অনুজ্জ্বল অঞ্চলের বৈষম্য হ্রাস পায়। লো-কী লাইটিং-এর ক্ষেত্রে ফিল লাইট ও ব্যাক লাইটের তীব্রতা কম হয়, কখনও বা ফিল লাইট ব্যবহার করাই হয় না। ফলে দৃশ্যে আলো-আঁধারের বৈষম্য বৃদ্ধি পায় এবং দৃশ্যে একটি শানিত ও তীক্ষ্ণভাব আসে।

- **রঙ (Colour)**

সিনেমার আলো মূলতঃ দু'ধরনের হয় — একটি হয় সূর্যের আলোর ন্যায় সাদা, অপরটি ঘরের লণ্ঠন বা বাতির হলুদ আলো। চলচ্চিত্র নির্মাতারা সাদা আলো দিয়েই মূলত কাজ করেন। বিভিন্ন রকম রঙ সৃষ্টি করতে আলোর সম্মুখে ফিল্টার ব্যবহার করেন।

- **চরিত্রের অভিব্যক্তি ও চলাফেরা (Expression and movement)**

চলচ্চিত্রে 'চরিত্র' বলতে শুধুমাত্র মানুষ বোঝায় না। পশু ('সফেদ হাতি' ছবিতে ঐরাবত হাতিই মুখ্য চরিত্র) বা যন্ত্র ('অযান্ত্রিক' ছবিতে গাড়ি)-ও হতে পারে। তবে মনুষ্যকৃত অভিনয়ই আমাদের আলোচ্য বিষয়। একজন অভিনেতার অভিনয় সংগঠিত হয় দৃষ্টিগত উপাদান এবং শব্দগত উপাদান দিয়ে। দৃষ্টিগত উপাদানগুলি হল তাঁর উপস্থিতি,অঙ্গভঙ্গি এবং মুখের অভিব্যক্তি। আর শব্দগত উপাদানগুলি হল কণ্ঠস্বর এবং এফেক্টস্ (effects)।

অভিনয়ের সাথে বাস্তবতার একটি সম্পর্ক বরাবর আছে। অর্থাৎ বাস্তবসম্মত না হলেই সেই অভিনয়কে অগ্রাহ্য করা হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিটি যথার্থ নয়। কারণ প্রথমতঃ বাস্তবতার সংজ্ঞা কালে কালে বদলে গেছে। পরিবর্তনশীল এই ভাবনা ও ধারণার সাথে সাথে অভিনয়ও বদলে গেছে এবং এক সময়ের অভিনয় রীতি অন্য সময়ে বাতিল হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সব ছবিতে বাস্তবসম্মত অভিনয়ের প্রয়োজন নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে অবাস্তব অভিনয়ই ছবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এবং কিছু কিছু দেশে যেমন আমেরিকা (হলিউড), ভারতবর্ষ বা হংকং-এ মূল ধারার ছবিতে সূক্ষ্ম, বাস্তবসম্মত অভিনয় সম্পূর্ণরূপেই খাপছাড়া।

এছাড়া জ্যঁর অনুযায়ী অভিনয় রীতি পরিবর্তিত হয়। ওয়েস্টার্ন জ্যঁর এবং মিউজিক্যাল জ্যঁ-এর ছবিতে অভিনয় কখনও একরকম হতে পারেনা। একজন অভিনেতাকে তাঁর চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করতে হয়। যদি চরিত্রের চাহিদানুযায়ী সে অভিনয় করে, সে অভিনয় যদি উচ্চগ্রামের হয়, বা তার মধ্যে স্বাভাবিকের অতিরিক্ত থাকে তাতেও ক্ষতি নেই।

ক্যামেরা বা এডিটিং-এর জন্য অভিনয়ে পরিবর্তন ঘটে। থিয়েটারের অভিনয় আর সিনেমায় অভিনয়ের ক্ষেত্রে বড় পার্থক্য গড়ে দিয়েছে ক্যামেরা। সিনেমার অভিনয় কখনই থিয়েটারের অভিনয়ের মত অঙ্গভঙ্গি-সম্বলিত নয়। কিন্তু একজন চিত্রাভিনেতাকে ক্যামেরায় স্থানান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে অভিনয়ে মাত্রা বদল ঘটাতে হয়। দ্বিতীয়তঃ একজন এডিটর বা সম্পাদক একজন অভিনেতার সেরা অভিনয়টুকু বেছে নিয়ে যুক্ত করে অন্যান্য শটের সাথে। পশু বা যন্ত্র যেখানে মুখ্য চরিত্র সেখানে কিন্তু এডিটিং-এর ভূমিকা অপরিসীম।

এই সমস্ত উপাদান নিয়ে মিসে-এন-সিন কাহিনী-বিস্তারে সাহায্য করে।

৭.৬ ইমেজ

ফ্রেমের মধ্যে যে ইমেজ (Image) অর্থাৎ যে দৃশ্য আমরা দেখতে পাই, সেই ইমেজ কতগুলি প্রচলিত রীতি বা নিয়মানুযায়ী সৃষ্টি হয়।

প্রথমতঃ ইমেজের প্রস্থ এবং উচ্চতা ৪: ৩ অনুপাতে হবে। এই অনুপাত ভীষণভাবেই ক্যামেরার লেন্স্ (Lens), অ্যাপার্চার (aperture)-এর উপর নির্ভরশীল। এই অনুপাতকে '১.৩৩ : ১' ভাবেও লেখা হয় বা আরও প্রচলিত ধরণ হল ১.৩৩ অনুপাত। এটি অ্যাকাডেমি অব মোশন্ পিকচার আর্টস্ অ্যাণ্ড সায়েন্স (Academy of Motion Picture Arts and Science) দ্বারা স্বীকৃত। তবে এটি রীতির ব্যতিক্রমও দেখতে পাওয়া যায়। পঞ্চাশের দশকে ওয়াইড স্ক্রিন (Wide Screen) আসার পর এক নতুন অনুপাত দেখা যায়, ১.৮৫। সিনেমাস্কোপ (Cinemascope) এবং প্যানাভিশন (Panavision)-এর অনুপাত ছিল ২.৩৩। পঞ্চাশের আগে সংলাপ-নির্ভর আমেরিকান সিনেমার ক্ষেত্রে ১.৩৩ অনুপাত আদর্শ ছিল। কিন্তু ১.৮৫ বা ২.৩৩ অনুপাতের ফলে বহির্দৃশ্য বা বহির্জগতের ঘটনাপ্রবাহ নিঃসন্দেহে প্রাধান্য পেয়েছে।

অনুপাতের পরেই আসে ফ্রেমের সীমাবদ্ধতার কথা, অর্থাৎ একটি ফ্রেম খোলা না বন্ধ। ফ্রেমকে বন্ধ (close) তখনই বলা হয় যখন একটি ফ্রেম স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়, অর্থাৎ সমস্ত ঘটনাটুকু ফ্রেমের মধ্যে সমাপন হচ্ছে। আর একটি ফ্রেমকে খোলা (open) বলা হয় তখন, যখন ফ্রেমের মধ্যের ঘটনা ফ্রেমের বাইরের স্থান (space)-এর ইঙ্গিত করছে। উদাহরণ — কোন চরিত্র যখন ফ্রেমের বাইরে অবস্থিত কারুর (যাকে ফ্রেমে দেখা যাচ্ছে না) সাথে কথা বলে, তখন ফ্রেম খোলা (open) এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। হলিউডের ১.৩৩ অনুপাত বন্ধ ফ্রেমের সাথে সম্পর্কিত।

প্রতিটি ফ্রেমের দৃশ্যই ত্রি-মাত্রিক হয়। এখানে তিনটি গঠনমূলক ক্ষেত্র (Compositional Planes) একত্রিত হচ্ছে। প্রথমটি হচ্ছে ইমেজের ক্ষেত্র (Plane of the Image)। এই ক্ষেত্রটিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি গঠিত হয়েছে দৃশ্যের ভৌগোলিক স্থান নিয়ে। এটি মেঝে এবং দিগ্‌বলয়ের সাথে সমান্তরালভাবে অবস্থিত। তৃতীয়টি উপলব্ধ গভীরতর ক্ষেত্র (plane of depth perception)। এটি অন্যান্য দুটি সমতলের সমকোণে অবস্থিত। ইমেজের ক্ষেত্রটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলেও ভৌগোলিক স্থানের ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়। কারণ 'ইমেজ' বা দৃশ্য সৃষ্ট হচ্ছে ভৌগোলিক ক্ষেত্রে। একইভাবে ভৌগোলিক স্থানের ক্ষেত্র এবং উপলব্ধগভীরতার ক্ষেত্র পরস্পর সম্পর্কিত। এই দুটি ক্ষেত্র প্রথম ক্ষেত্র অর্থাৎ ইমেজের ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করে।

নৈকট্য এবং সঙ্গতি হল দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপরীতি। ফ্রেমের মধ্যে অবস্থিত বস্তুর পরস্পর নৈকট্য ও সঙ্গতি ক্রমাগত বদলে যায় ক্যামেরার স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে।

যেমন, কোন শট-এ দেখা গেল পুরোভূমিতে একটি, পশ্চাদ্‌ভূমিতে একটি মানুষ। এখানে খুব স্বাভাবিকভাবেই গাছটি প্রাধান্য পাচ্ছে। বলা যেতে পারে পরিচালক প্রকৃতির ও মানুষের মধ্যে তুলনা করেছেন।

কিন্তু ঠিক উল্টো কোণ থেকে দৃশ্যগ্রহণ করলেই মানুষটি পুরোভূমিতে এসে যাবে আর গাছ চলে যাবে পশ্চাদভূমি। তখন গাছের তুলনায় মানুষকে বড় দেখতে লাগবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল টেক্সচার (Texture)। এখানে টেক্সচার শুধুমাত্র ছবির বুনন নয় দৃশ্যের বাহ্যিক ত্বকের কথাও বলা হচ্ছে। ছবিতে যদি গ্রেন (grain) থাকে। [গ্রেনের অর্থ হচ্ছে কোনো সমতলে উচ্চাবচতা বা বিষমতা, বিশেষত ঃ কোনো আলোকচিত্রে বা তাহার নেগেটিভ-এ রুক্ষতা বা আলো ছায়ার ছোট ছোট কণায় ছবির সমতল ভাঙিয়া যাওয়ার লক্ষণ, যার ফলে ছবির রেখা বা আকরগুলি স্পষ্ট বোঝা যায় না।] তাহলে ছবির ত্বককে অমসৃণ লাগে। আমরা জানি ডকুমেন্টারি বা তথ্যচিত্রে এমন গ্রেন দেখা যায়। অথবা যদি কোন ছবিকে আকারে (দৈর্ঘ্যে নয়) ক্রমাগত বড় করা হয় তবে ত্বক অমসৃণ হয়, গ্রেন আসে। সবচেয়ে সুন্দর উদাহরণ এক্ষেত্রে হচ্ছে আন্তনিওনি পরিচালিত ব্লো-আপ (Blow-up) ছবিটি। ১৯৬৬ সালে তৈরি এই ছবিতে ছবির মুখ্য চরিত্র একটি ফটোতে রিভলভার হাতে এক ব্যক্তিকে চেনার জন্য ফটোটিকে যত বড় করে তত গ্রেন বাড়তে থাকে এবং শেষে ছবিটি গ্রেনে ভরে যায় আর চেনার কোন অবকাশ থাকে না।

সর্বশেষে আসে আলোকসম্পাতের রীতির কথা। সর্বাধিক প্রচলিত রীতি হল থ্রি-পয়েন্ট লাইটিং (Three-point Lighting)। অর্থাৎ কী লাইট (Key Light), ফিল লাইট (fill Light) এবং ব্যাক লাইট (Back Light)-এর মিলিত আলো। এই থ্রি-পয়েন্ট লাইটিং একাধারে যেমন স্বাভাবিক আলো সৃষ্টি হয় তেমনি নাটকীয়তাও সৃষ্টি করা সম্ভব।

৭.৭ ডায়াক্রোনিক শট

এখানে আলোচ্য বিষয় হল শটের সেই বিশেষ উপাদানগুলি যা স্থিতিশীল ফ্রেমের মধ্যে কাজ করলেও গুণগতভাবে গতিশীল। সেগুলি হল ঃ দূরত্ব (Distance), ফোকাস্ (Focus), কোণ্ (Angle), চালনা (Movement) এবং দৃষ্টিকোণ (Point of view)।

লক্ষ্যবস্তুর সাথে ক্যামেরার দূরত্বের পরিবর্তনের সাথে সাথে শটের বদল ঘটে। যেমন ক্লোজ আপ (Close Up), মিড শট (Mid Shot or Medium Shot), লং শট (Long Shot), এক্সট্রিম লংশট (Extreme Long Shot), থ্রি-কোয়ার্টার শট (Three-Quarter Shot), হেড-অ্যাণ্ড-শোলডার্স শট (Head-and-Shoulders Shot)। শটগুলির অবশ্য কোন নির্ধারিত মাপকাঠি অনুযায়ী বিভাজন হয়নি, কেউ সঠিক করে নির্ধারণ করেনি কোনখান থেকে একটি মিড শট লং শট হয় অথবা কখন লং শট এক্সট্রিম লং শট হয়।

দ্বিতীয় উপাদান ফোকাস। ফোকাসের বিভিন্ন প্রকার ভেদ আছে। যেমন, ডীপ ফোকাস (Deep Focus), শ্যালো ফোকাস (Shallow Focus), শার্প ফোকাস (Sharp Focus), সফ্‌ট্ ফোকাস (Soft Focus), ফলো ফোকাস (Follow Focus), র‍্যাক ফোকাস (Rack Focus)। ডীপ ফোকাস পুরোভূমি (Foreground), মধ্যভূমি (Middle Ground) এবং পশ্চাদ্‌ভূমি (Background) অর্থাৎ দৃশ্যের স্থানটুকু অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখা যায়। শ্যালো ফোকাসে শুধুমাত্র পুরোভূমি সুস্পষ্ট থাকে, অন্যগুলি অস্পষ্ট থাকে। শার্প এবং শফ্‌ট্ ফোকাসের ছবির টেক্সচার (Texture)-এর সাথে সম্পর্ক আছে। শার্প ফোকাস তখনই বলা হয় যখন ছবি অত্যন্ত সুস্পষ্ট থাকে। দৃশ্যের প্রতিটি ধার, কোণগুলি দেখতে পাওয়া যায়। আর সফ্‌ট্ ফোকাসে দৃশ্যে হালকা অস্পষ্টভাব থাকে। দৃশ্যে ধারালভাব থাকে না এবং দৃশ্যের কোণগুলি মিশে যায়, আলাদাভাবে সনাক্ত করা যায় না।

ফলো ফোকাস (follow focus) তখনই বলা হয় যখন লক্ষ্য বস্তুটি চলমান হলেও তার ফোকাস ঠিক থাকে অর্থাৎ সে স্পষ্ট থাকে। এটি হলিউডের ক্লাসিকাল রীতির একটি জনপ্রিয় উপাদান। র‍্যাক ফোকাস (Rack Focus) তখনই হয় যখন কোন একটি ভূমি ফোকাসে থাকে না, পালাক্রমে একেকটি ভূমি ফোকাসে থাকে। এটি করা হয় পৃথক ভূমিতে (উদা ঃ— পুরোভূমি-মধ্যভূমি; পুরোভূমি বা পশ্চাদ্‌ভূমি) অবস্থিত ভিন্ন বস্তুর প্রতি দর্শককে আকর্ষিত করতে।

ডায়াক্রোনিক শট (Diachronic Shot)-এর তৃতীয় উপাদান কোণ (angle)। ক্যামেরার বিভিন্ন কোণ তিনটি অক্ষের ওপর নির্ভরশীল। কোণ পরিবর্তন হয়ে তিন রকম শট হয় — প্যান (Pan), টিল্ট (Tilt) এবং রোল (roll)। প্যান এবং টিল্ট শটে ক্যামেরা লক্ষ্যবস্তুকে অনুসরণ করে অথবা লক্ষ্য বস্তু বদলে যায়। আর ক্যামেরা যখন রোল roll) করে তখন লক্ষ্যবস্তু বদলায় কিন্তু ফ্রেমের মধ্যে বস্তুর অবস্থান বদলে যায়। টিল্ট যে অক্ষের উপর নির্ভরশীল সেই অক্ষ শটের উচ্চতা নির্ধারণ করে, যেমন, ওভারহেড (overhead) হাই অ্যাঙ্গেল (High-Angle), লো-অ্যাঙ্গেল (Low-Angle), আই-লেভেল (Eye-level)। লো-অ্যাঙ্গেল শট বস্তু বা ব্যক্তিকে বিশাল আকারে দেখায়, গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়। হাই-অ্যাঙ্গেল শট একেবারে বিপরীত। বস্তু বা ব্যক্তিকে একেবারে গুরুত্বহীন করে দেয়। আই-লেভেল (Eye-level) এর সাধারণভাবে অর্থ হল যে দেখছে তার চোখের উচ্চতা।

যেহেতু বস্তুর অবস্থান বদলে ক্যামেরা সচরাচর 'রোল' (roll) করানো হয়না। কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে এটির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, ঝড়ে পড়ে নৌকোর উথাল-পাথাল অবস্থা বোঝাতে এই বিশেষ ব্যবহার দেখা যায়।

ক্যামেরা অক্ষগুলিকে শুধু চক্রাকারে ঘোরে না, অক্ষ বরাবর চলে 'ট্র্যাক' (Track)-এ অথবা ক্রেন (Crane)-এ। 'ট্র্যাকিং' (Tracking) শটকে ডলি (Dolly) শটও বলা হয়। ট্র্যাক শট-এর সাথে আসে জুম (Zoom) শটের কথা। তবে ট্র্যাক শটে যেভাবে প্রেক্ষাপট বদলে যায় জুম শটে তা হয় না। ক্যামেরা যখন ট্র্যাকে বা ক্রেনে চলে তখন হয় লক্ষ্যবস্তুকে অনুসরণ করে অথবা লক্ষ্যবস্তুই বদলে যায়। ক্যামেরা যখন লক্ষবস্তুকে অনুসরণ করে তখন বিষয়বস্তুকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

সর্বশেষে আসে দৃষ্টিভঙ্গি (point of view)। অধিকাংশ ছবিতেই পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গিই ফুটে ওঠে। পরিচালক যে ভাবে চান দর্শক সে ভাবে দেখতেই বাধ্য হয়।

চল্লিশের দশকেই হলিউডে 'দৃষ্টিভঙ্গি' বোঝানোর জন্য কিছু বিশেষ প্রকাশভঙ্গি গড়ে ওঠে। যেমন 'এসট্যাবলিশিং শট (Establishing Shot) বা 'লং শট' (Long Shot)-এর মধ্যে এক সাথে একাধিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ে যেত। যেমন, স্থান, অর্থাৎ দর্শক (ছবির সাথে সে একাত্ম হয়ে যায়) কোথায় আছে, সেখানে আর কে আছে, দিনের কোন সময় ইত্যাদি।

দ্বিতীয় আর একটি বহু ব্যবহৃত প্রকাশভঙ্গি দেখা যায়। যখন দুটি ব্যক্তি বসে কথা বলে তখন 'ওভার-দ্য-শোলডার' (Over-the-Shoulder) শট ব্যবহার করা হয়।

আবার, এও দেখা যায় চরিত্রটিকে দেখানোর পর সে কি দেখছে সেটা দেখানো হয় দর্শককে। এটি হল উক্ত চরিত্রের 'পয়েন্ট-অফ-ভিউ' (Point-of-view) শট।

৭.৮ মন্তাজ

আমেরিকাতে দুটি শটের সংযুক্তকরণের পোষাকি নাম হল 'এডিটিং', ইউরোপে একে বলে 'মন্তাজ'। হলিউডে এডিটিং-এর অর্থ হল ছবি থেকে অবাঞ্চিত অংশসমূহকে বাদ দিয়ে ছবিকে ছিমছাম করা। কিন্তু ইউরোপে 'মন্তাজ' সম্পূর্ণ ভিন্নার্থে ব্যবহার করা হয়। ওখানে মন্তাজ হল একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা একটি ছবি ক্রমে গঠিত হয়।

এডিটিং বা সম্পাদনার প্রণালী রীতি এরকম : হয় দুটি শটের প্রান্ত যুক্ত করা হয়, বা দুটি শটকে একটার ওপর আরেকটা দিয়ে অংশত আবৃত করা হয়।

হলিউডের মূল মন্ত্র হচ্ছে ছিমছাম, নিটোল ছবি। ফলে হলিউডে সম্পাদনার কিছু রীতি গড়ে ওঠে। যেমন ছবির শুরুতে থাকবে establishing shot পরিবেশকে দর্শকের কাছে উপস্থিত করতে। রীতি অনুযায়ী লং শট-এর পর মিড শট এবং তার পর ক্লোজ আপ — এই ক্রমানুসারে শট যুক্ত করা হয়। যেমন দুই ব্যক্তির কথপোকথনের সিকোয়েন্সে প্রথম শট থাকবে একটি মাস্টার শট (Master Shot) তারপর শট/রিভার্স শট (Shot/Reverse Shot) চলতে থাকবে কথপোকথন দেখাতে। একটি দৃশ্যে কোন এক ব্যক্তি ঘরের একদিক থেকে আরেক দিকে যাবে। এক্ষেত্রে জাম্প্ কাট (Jump Cut) ব্যবহার করার বদলে হলিউডে বিভিন্ন সম্পাদনার পদ্ধতি ব্যবহার করে ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌঁছনোর মধ্যবর্তী সময়কে প্রচ্ছন্ন রাখা হয়। তার মানে এই নয় যে হলিউডে জাম্প কাট ব্যবহার করা হয় না। একই কোণ (angle) থেকে নেওয়া শটে একাধিকবার কেটে, সেগুলিকে ডিস্লভ দিয়ে যুক্ত করা হয়।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে শট সংযুক্তকরণ ছাড়া শটের দৈর্ঘ্যের প্রতি নজর রাখা আবশ্যক। হলিউড সম্পাদনা রীতি অনুযায়ী চরম পরিণতিতে পৌঁছনোর পরই 'কাট' করা হয়।

সম্পাদনার মাধ্যমে ছবির লয়ে রকমফের ঘটানো হয়। ছবির শেষের দিকের চেজ্ (chase) সিন্-এ ক্রসকাটিং (Cross cutting)-এর দ্বারা উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয়। এক্ষেত্রে শটের দৈর্ঘ্য ক্রমাগত কমে যায় কিন্তু কাটিং-এর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

আরেকটি সম্পাদনা রীতি হচ্ছে প্যারালাল এডিটিং (Parallel Editing)। এর দ্বারা একাধিক যুগপৎ কিন্তু ভিন্ন স্থানে ঘটমান ঘটনাকে সমান্তরালভাবে দেখানো হয়।

হলিউডের উক্ত রীতির বহির্ভূত যে রীতি গড়ে উঠেছে সেগুলি সবই হয়েছে ইউরোপ। এর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল কুড়ির দশকে সোভিয়েত রাশিয়াতে মন্তাজের নতুন অর্থ দান। সোভিয়েত রাশিয়ার চলচ্চিত্র নির্মাতারা মনে করতেন সিনেমা শিল্পের ভিত্তি হল 'মন্তাজ'। পুদভকিনের মতে মন্তাজ শুধুমাত্র শট যুক্ত করে না, মন্তাজের মূল কাজ হল দর্শকের ওপর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তার করা। ওঁর মতে মন্তাজ পাঁচ রকমের ঃ- কনট্রাস্ট (Contrast)। প্যারালালইজম (Parallallism), সিম্বল্ইজম্ (symbolism), সিমালটেনীটি (Simultaneity) এবং লিট মোলিফ

(Leit Molif)। সোভিয়েত রাশিয়ার আরেক দিক্‌পাল চলচ্চিত্রকার আইজেনস্টাইনের মতে মন্তাজের মূল কথা সংঘর্ষ। অর্থাৎ দুটি শটের অন্তর্নিহিত মূল উপাদান (basic elements)-এর সংঘর্ষে তৃতীয় একটি অর্থ সৃষ্টি হয়। এবং এই তৃতীয় অর্থ অনুধাবন করতে দর্শককে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

ষাটের দশকে ক্রিশ্চিয়ান মেজ্ (Christian Metz) মন্তাজের বিভিন্ন তত্ত্বকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। উনি একটি তালিকা প্রস্তুত করে দেখিয়েছেন কী ভাবে আট রকমের মন্তাজ পরস্পর সম্পর্কিত।

সবশেষে সিনেমায় ব্যবহৃত পাঙ্কচুয়েশন (Punctuation) বা যতিচিহ্ন নিয়ে আলোচনা করা হবে। সর্বাধিক সহজ ও বহুল ব্যবহৃত পাঙ্কচুয়েশন হল "কাট" (Cut)। ফেড (Fade) হল আরেক ধরণের পাঙ্কচুয়েশন। 400 Blows (১৯৫৯) ছবি ক্রুফো ব্যবহৃত ফ্রিজ শট (Freeze Shot) পাঙ্কচুয়েশন হিসেবকালে পরবর্তী খুব জনপ্রিয় হয়। তবে একমাত্র ডিসলভ-ই সাহিত্যে ব্যবহৃত 'কমা' (comma)-র সমান। অন্যান্য সব পাঙ্কচুয়েশনই 'ইতি' বা 'শেষ' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

এই পাঙ্কচুয়েশন-এর আলোচনায় সিনেমা টাইম (Cinema Time) এবং রিয়েল টাইম (Real Time) খুবই প্রাসঙ্গিক বিষয়। একটি ঘটনা বাস্তবে ঘটতে যতটা সময় নেয় ছবিতে তার থেকে কম সময় নিয়ে ঘটে। এই সময় পার্থক্যের ক্ষেত্রে পাঙ্কচুয়েশন-এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৭.৯ সিনেমা টাইম এবং রিয়েল টাইম

একজন পরিচালক ছবিতে একটি ঘটনা বাস্তবে ঘটতে যতটা সময় লাগবে ততটা সম্পূর্ণভাবে না দেখাতেও পারেন। তিনি ঘটনার সূত্রপাত দেখিয়ে ঘটনার শেষে চলে যেতে পারেন। এবং এই মধ্যবর্তী সময়টা বোঝাতে তিনি কিছু বিশেষ এডিটিং রীতি ব্যবহার করেন, যেমন ডিস্‌লভ (dissolve)। একে বলা হয় পাঙ্কচুয়েশন (Punctuation)। একটি ঘটনার বাস্তব জীবনে ঘটতে যতটা সময় লাগে তাকে বলা হয় রিয়েল টাইম (Real Time); এবং সেই ঘটনা ছবিতে যতটা সময় নিচ্ছে তাকে বলে সিনেমা টাইম (Cinema Time)। এই দুটি সময় কখনই এক নয়। মধ্যবর্তী সময়কে বাদ দেওয়ার তিনটি উপায় আছে।

ধরা যাক একজন ব্যক্তি সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠাটা সম্পূর্ণ না দেখিয়ে কিভাবে পরিচালক দেখাতে পরেন তা দেখা যাক ঃ-

এক হতে পারে পরিচালক "পাঙ্কচুয়েশন" ব্যবহার করলেন, যেমন ডিসলভ বা ফেড অথবা ওয়াইপ। অর্থাৎ ব্যক্তিটি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করল, ডিসলভ করে পরিচালক দেখালেন ব্যক্তিটি সিঁড়ির মাথায়।

আরেকটি উপায় হচ্ছে, ব্যক্তিটি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করল এবং ফ্রেম থেকে হেঁটে বেড়িয়ে গেল। খালি ফ্রেমটা সামান্য সময়ের জন্য দেখানো হল। এরপরের শট সিঁড়ির ওপরের দিক। খালি ফ্রেম। ব্যক্তিটি ফ্রেমে প্রবেশ করল। দু'দিকের খালি ফ্রেমে মধ্যবর্তী সময় প্রচ্ছন্ন থাকে।

তৃতীয় উপায় হচ্ছে, ব্যক্তিটি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করল। অন্য এক সম্পর্কিত ব্যক্তিকে দেখালেন পরিচালক কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসার সময়ের থেকে কম সময় একে দেখানো হবে। এবং তার পরের শটে দেখা গেল ব্যক্তিটি সিঁড়ির মাথার দিকে প্রায় পৌঁছে গেছে।

এরই পাল্টা আরেকটি রীতি আছে যেখানে ছবিতে একটি ঘটনাকে সম্প্রসারিত করা হয়। ঘটনার সম্প্রসারণ করা হয় উত্তেজনা সৃষ্টি করতে। এই বিষয়ে বিখ্যাত চলচিত্র পরিচালক শ্রী মৃণাল সেন একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। শ্রীসেন বলেছেন বাস্তবে একটি দুর্ঘটনা ঘটতে যতটা সময় লাগে ছবিতে তার থেকে বেশি সময় লাগে। ঘটনার একটি উত্তেজক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে এটা করা হয়। এক্ষেত্রে সিনেমা টাইম (Cinema Time) রিয়েল টাইম (Real Time)-এর থেকে বেশি। অনেক সময় কোন ঘটনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতেও এই সম্প্রসারণ ঘটানো হয়। কুড়ির দশকের রাশিয়ান পরিচালকদের মধ্যে এরকম প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

৭.১০ সারাংশ

সিনেমা কি ইংরিজি বা ফরাসীর মত একটি ভাষা? সংকেতচিহ্নবিজ্ঞানী (Smiotician) ক্রিশ্চিয়ান মেজ্ বলেন সিনেমা একটি ভাষা নয়, কিন্তু ভাষার 'মত'। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে ভাষাগত তত্ত্ব আলোচনা করেছেন।

এঁরা মনে করেন 'শট' কখনই মৌলিক একক নয়। 'শট' এবং 'শব্দ' কখনও সমার্থক হতে পারে না। এঁরা আরও মনে করেন সিনেমার কোন ক্ষুদ্রতম একক হয় না।

প্রত্যেক ভাষার যেমন ব্যাকরণ থাকে, সিনেমা নির্মাণের একটা ব্যাকরণগত রীতি আছে। মিসে-এন-সিন, মন্তাজ সবই নির্দিষ্ট রীতি অনুসারে হয়।

মিসে-এন-সিন-এর চারটি উপাদান আছে দৃশ্যপট, সাজসজ্জা এবং মেকআপ, আলোকসম্পাত এবং চরিত্রের অভিব্যক্তি।

মন্তাজের সংজ্ঞা হলিউডে আর ইউরোপে এক নয়। হলিউডে মন্তাজ শুধুই 'কাটিং' (cutting)। কাহিনীকে যথার্থভাবে ব্যক্ত করতে, ছবিকে ছিমছাম করতে মন্তাজ-এর প্রয়োজন। কিন্তু ইউরোপে মন্তাজ হল চলচ্চিত্র নির্মাণের এক পদ্ধতি।

ডায়াক্রোনিক শট (Diachronic Shot)-এর বিশেষ উপাদানগুলি হল দূরত্ব (distance)— অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তুর থেকে ক্যামেরার দূরত্ব, ফোকাস (Focus), ক্যামেরার কোণ (Camera Angle), চালনা (movement), দৃষ্টিকোণ (point of view)। কিছু উপদান যেমন ফোকাস বা দূরত্ব স্থিতিশীল এবং গতিশীল দু'রকম শটের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সিনেমার পাঙ্কচুয়েশন বা যতিচিহ্ন হল শট, আইরিস (Iris), ফেড (Fade), ওয়াইপ (Wide)। তবে এগুলি সবই 'শেষ' অর্থে ব্যবহৃত হয়। একমাত্র ডিস্‌লভ (Dissolve)-কেই 'কমা' অর্থে ব্যবহার করা হয়।

৭.১১ অনুশীলনী

১. সিনেমার ভাষা আছে কিনা তা আলোচনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করুন।
২. মিসে-এন-সিন কী? তার বিভিন্ন উপাদান কী কী?
৩. মন্তাজ তত্ত্ব আলোচনা করুন।

৭.১১ গ্রন্থপঞ্জী

How To Read A Film — James Monaco.
Film Art : An Introduction — D. Bordwell & K. Thompson.
Film Theory — D. Andrew.

একক ৮ ☐ চলচ্চিত্রের দৃশ্যাংশ, ক্যামেরা, আলো

গঠন

৮.১ উদ্দেশ্য

৮.২ প্রস্তাবনা

৮.৩ দৃশ্যাংশ : চলচ্চিত্রের গঠনগত একক

৮.৪ দৃশ্য-সংগঠনের উপাদানসমূহ এবং দৃশ্য প্রতিমার আকৃতি

৮.৫ ক্যামেরার অবস্থান ও ক্যামেরা কোণ

৮.৬ ক্যামেরার সচলতা

৮.৭ লেন্স

৮.৮ আলোক-সম্পাত

৮.৮.১ আলোক সম্পাত ও চিত্রগ্রহণ

৮.৮.২ আলোক সম্পাত এর ব্যবহারিক কৌশল

৮.৮.৩ আলোক সম্পাত-এর প্রযুক্তিগত কৌশল

৮.৮.৪ আলোক সম্পাত-এর আদর্শগত কৌশল

৮.৯ গ্রাফিক্স

৮.১০ সারাংশ

৮.১১ অনুশীলনী

৮.১২ গ্রন্থপঞ্জী

৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককের আলোচনা থেকে আপনি জানতে পাবেন ঃ-

- দৃশ্যাংশ, দৃশ্য-সংগঠন ইত্যাদি চলচ্চিত্রের গঠনগত ও উপাদানগত বিষয় সংক্রান্ত পরিভাষা ও তাদের সংজ্ঞা।
- চলচ্চিত্রে উপরোক্ত 'প্রয়োগিক-কৌশল' (techniques), যথা ক্যামেরার চলাচল, ক্যামেরা কেনি বিভিন্ন লেন্সের ব্যবহার, আলোক-সম্পাত ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা ও উদাহরণ ব্যাখ্যা।
- চলচ্চিত্রের উপরোক্ত গঠনগত ও ভাষাগত উপাদানগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন সরল তত্ত্বাবলী।
- চলচ্চিত্র নির্মাণ (চিত্রগ্রহণ ও শ্যুটিং পর্ব) ও চলচ্চিত্র পাঠের প্রাথমিক সুত্রাবলী।

৮.২ প্রস্তাবনা

চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রধানত তিনটি ধাপ ও পর্যায় রয়েছে। প্রথমত, আখ্যান বা বিষয় নির্বাচন, চিত্রানাট্য রচনা ও খাতা-কলমের পরিকল্পনা। দ্বিতীয়ত, স্যুটিং বা দৃশ্যগ্রহণ এবং তৃতীয়ত, সম্পাদনা ইত্যাদি। এই এককে চলচ্চিত্র নির্মাণের দ্বিতীয় পর্যায়টি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু চলচ্চিত্র নির্মাণ বিষয়টির প্রয়োগিক কৌশল ও নান্দনিকতার মেলবন্ধনে গড়ে উঠেছে, তাই এই দুই-এর ব্যবহার ও মাধ্যমগত শিল্পস্তনের সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। কেবলমাত্র চলচিত্র নির্মাণ নয়, চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য (Scene)-কে দেখে কী ধরনের 'প্রায়োগিক-কৌশল' বা টেকনিক ব্যবহার করে দৃশ্যটি নির্মিত হয়েছে তা বোঝার পদ্ধতি সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে এই এককে। এক কথায় চলচ্চিত্রের কোন অংশকে বিশ্লেষণ দ্বারা তার গঠনগত ও নন্দনতাত্ত্বিক ঐক্যকে বিভিন্ন উপাদানে বিভাজিত করে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে এই অংশে।

৮.৩ দৃশ্যাংশ : চলচ্চিত্রের গঠনগত একক (Short : The Basic Element of a Film)

● দৃশ্যাংশ (shot) : সংজ্ঞা ও ভাষাগত একক

গঠনগত দিক থেকে দেখলে একটি ফিল্ম বা ছবি প্রাথমিকভাবে কয়েকটি দৃশ্যপর্যায় (sequence) নিয়ে গঠিত। প্রতিটি দৃশ্যপর্যায় আবার কয়েকটি দৃশ্য (scene)-এর সমাহারে তৈরি। এককেটি দৃশ্য আবার গঠিত হয় কয়েকটি দৃশ্যাংশ (shot)-এর সমাহারে। যদিও প্রতিটি দৃশ্যাংশ (shot) আবার অনেকগুলি ফ্রেমের যোগফল, ফ্রেমের পরিবর্তন দর্শকের চোখে ধরা পড়ে না। কারণ ফ্রেমের পরিবর্তন ঘটে অতি কম সময়ে। দৃশ্যগতভাবে চলচ্চিত্রের একক হিসাবে দর্শকের চোখে ধরা পড়ে দৃশ্যাংশ (shot)।

সহজ কথায় বলতে গেলে 'প্রতিবার ক্যামেরা চালু করা ও বন্ধ করার মধ্যবর্তি ধারাবাহিক সময়ে যে ছবি পাওয়া যায়,' তাকে বলা যায় একটি শট বা দৃশ্যাংশ। দৃশ্যাংশগুলি সম্পাদনা কক্ষে পরপর জুড়ে যথাক্রমে দৃশ্য, দৃশ্যপর্যায় ও শেষপর্যন্ত সমগ্র ছবিটির শরীর গড়ে তোলা হয়। সুতরাং, শট বা দৃশ্যাংশ হল একটি ছবির (film)-এর ভাষাগত উপাদানের একক। বাক্যের মধ্যে একটি শব্দ যে কাজ করে, একটি দৃশ্য (scene)-এর মধ্যে দৃশ্যাংশ (shot)-এর ভূমিকা অনুরূপ।

কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক অর্থে দৃশ্যাংশ (shot) ও শব্দের সাদৃশ্য খোঁজা উচিত নয়। কারণ চলচ্চিত্রের দৃশ্য-ভাষা ও চিহ্নায়িত অর্থাৎ কথ্য লিখিত ভাষা (codified language) দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মাধ্যম। চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ ও ভাষাবিদ ক্রিস্টিয়ান মেৎজ্ চলচ্চিত্রের দৃশ্যমান একক অর্থাৎ দৃশ্যাংশ (shot) ও মৌখিক/লিখিত ভাষার একক অর্থাৎ শব্দের মধ্যে কয়েকটি প্রধান পার্থক্যকে চিহ্নিত করেছেন।

প্রথমতঃ একটি শব্দের নির্দিষ্ট বাস্তবগুলি আভিধানিক অর্থ হয়। কিন্তু একটি শট বা দৃশ্যাংশের অর্থ এরকম আভিধানিক সীমায় আবদ্ধ নয়। অর্থাৎ একটি শব্দ, ধরা যাক 'গাছ'-এর নির্দিষ্ট কয়েকটি মাত্র প্রতিশব্দ, যথা বৃক্ষ, পাদপ, বিটপী, মহিরুহ ইত্যাদি থাকতে পারে। কথ্য বা লিখিত ভাষায় একটি বিশেষ শব্দের নির্দিষ্ট কয়েকটি মাত্র অর্থ বর্তমান। কিন্তু চলচ্চিত্রের বিশেষ কোন দৃশ্যাংশের বিভিন্ন দর্শক বিভিন্ন অর্থে গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে কে কী অর্থ বুঝবে তার কোন নির্দিষ্ট আভিধানিক নির্দেশ নেই। তাছাড়া একটি দৃশ্যাংশের অর্থ বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে করতে পারে, এক্ষেত্রে শব্দের প্রতিশব্দের মত কোন সংখ্যাগত সীমা নেই। একক জনের দর্শকের চোখে একটি বিশেষ দৃশ্যাংশের একেক রকম অর্থ থাকা স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়তঃ লিখিত/ কথ্য ভাষার একক অর্থাৎ শব্দগুলির সংখ্যা সীমিত। অর্থাৎ একটি ভাষায় মোট এক লক্ষ কি দেড় লক্ষ অর্থবোধক শব্দ বা একক থাকতে পারে। তার বাইরে কোন শব্দের অস্তিত্ব বা ব্যাবহার ব্যকারণ সম্মত নয়। কিন্তু চলচ্চিত্রের দৃশ্য ভাষার একক অর্থাৎ শট বা দৃশ্যাংশের ক্ষেত্রে এরকম কোন নির্দিষ্ট শব্দকোষ নেই, যার বাইরে কোন দৃশ্যাংশ গঠন করা যায় না। যে কোন ধরনের, যে কোন কোন বা ক্যামেরার যেকোন অবস্থান থেকে শট নেওয়া যায় এবং এক্ষেত্রে ক্যামেরাম্যান ও পরিচালকের কাছে যে কোন ধরনের দৃশ্যাংশ গঠন করার স্বাধীনতা আছে। চলচ্চিত্রের দৃশ্যভাষার একক অর্থাৎ শট বা দৃশ্যাংশ অসংখ্য হতে পারে, তার কোন সংখ্যাগত সীমাবদ্ধতা নেই।

তৃতীয়ত : চিহ্নায়িত ভাষা বা লিখিত/ কথ্য ভাষার ক্ষেত্রে একক অর্থাৎ শব্দগুলিকে কিভাবে পর পর যোগ করে অর্থপূর্ণ বাক্য নির্মাণ করতে হবে তার জন্য নির্দিষ্ট ও ধরাবাঁধা ব্যাকরণগত নিয়ম বর্তমান। কিন্তু চলচ্চিত্রে শট বা দৃশ্যাংশগুলিকে কি সজ্জায় পরপর জোড়া হবে তার কোন নির্দিষ্ট ব্যাকরণ নেই। এক্ষেত্রে অর্থ বা তাৎপর্য সৃষ্টির পদ্ধতি স্রষ্টার স্বাধীন চিন্তা ও বিবেচনার উপর নির্ভরশীল।

চতুর্থত : চলচ্চিত্রের একটি শট বা দৃশ্যাংশে একটি গাছ দেখালে পৃথিবীর যেকোন ভাষার লোক বুঝবে যে একটি গাছ দেখানো হচ্ছে। কিন্তু কথ্য/লিখিত ভাষাগুলির ক্ষেত্রে ধরা যাক 'গাছ' শব্দটির অর্থ কেবলমাত্র বাংলা ভাষা যে জানে তার পক্ষেই বোঝা সম্ভব, অন্যভাষায় ঐ একই শব্দ হয়ে উঠে 'ট্রি' বা অন্য কিছু। কিন্তু কোন অক্ষর জ্ঞান বা উচ্চারণ রীতি বা ভাষা নিরপেক্ষভাবে সকল লোক গাছ-এর শট দেখে 'গাছ' এই অর্থটি বুঝতে পারে।

পঞ্চমত: মৌখিক/ লিখিত ভাষার একক অর্থাৎ শব্দ গঠিত হয় নির্দিষ্ট ধাতু + প্রত্যয়-এর সংযোগ অথবা ইংরাজি ভাষার ক্ষেত্রে কতকগুলি উচ্চারণগত একক (phoneme)-এর সংযোগে। কিন্তু একটি শট বা দৃশ্যাংশের ক্ষেত্রে এককটিকে এরকম নির্দিষ্ট অংশে বিভাজিত করা যায় না। শট বা দৃশ্যাংশ তাই অবিভাজ্য ছেদহীন একক।

ষষ্ঠত : ধরা যাক দৃশ্যাংশ (shot)-এ একটি 'বাড়ি' দেখানো হল। এক্ষেত্রে শটটি 'বাড়ি' এই শব্দার্থটি বহন করে না, বরং শটটির অর্থ হল 'দেখুন, এই হল একটি বাড়ি'। অর্থাৎ একটি শট বা দৃশ্যাংশ প্রায় একটি বাক্যের সমতুল্য বলা যেতে পারে।

উপরি-উল্লিখিত পাঁচটি পার্থক্যের কথা মাথায় রেখে চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ ও ভাষাতাত্ত্বিক ক্রিস্টিয়ান মেৎজ্ চলচ্চিত্রকে বলেছেন 'ব্যাকরণবিহীন ভাষা', যেখানে শট বা দৃশ্যাংশগুলিকে পছন্দ করা ও পরস্পর যুক্ত করার ক্ষেত্রে কোন ব্যাকরণের নিয়ম নেই। কথ্য/লিখিত ভাষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণগতভাবে ভুল শব্দ' বা 'ভুল বাক্য' হতে পারে, কিন্তু চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে 'ভুল শট' বলে কিছু হয় না।

● দৃশ্যাংশের ব্যবহার : দীর্ঘ-কালীন শট (Long take) বনাম মনতাজ

খ্যাতনামা চলচ্চিত্র সমালোচক জেমস্ মোনাকো তাঁর 'হাউ টু রিড এ ফিল্ম' গ্রন্থে শট বা দৃশ্যাংশকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে : "(SHOT is) a single piece of film, however long or short, without cuts, exposed continuously." অর্থাৎ দর্শকের চোখে চলচ্চিত্রের এক একটি ছেদহীন, ধারাবাহিক চলমান ছবির অংশ হল দৃশ্যাংশ বা শট।

ফিল্মে একটি শট বা দৃশ্যাংশ-এর সময়কাল কয়েক সেকেণ্ড থেকে বেশ কয়েক মিনিট পর্যন্ত হতে পারে। দশ মিনিট হল সাধারণভাবে ফিল্মে ব্যবহৃত একেকটি সেলুলয়েড রিলের সময়-দৈর্ঘ্য। অর্থাৎ ছেদহীন ভাবে সর্বোচ্চ দশ মিনিট বা একটি সম্পূর্ণ রিলের দৃশ্যাংশ গ্রহণ করা সম্ভব। সুতরাং ফিল্মে একটি শট সাধারণত সর্বোচ্চ দশ মিনিট হতে পারে।

সোভিয়েত চলচ্চিত্রকার আইজেনস্টাইন বা ভের্তভের ছবিতে কয়েক সেকেণ্ড দৈর্ঘ্যের ছোট ছোট শট দেখা যায়। এমনকি জিগা ভের্তভ-এর বিখ্যাত **'ম্যান উইথ দ্যা মুভী ক্যামেরা'** ছবিতে একটি দৃশ্যে এক সেকেণ্ডেরও ভগ্নাংশ মাপের বেশ কিছু অত্যন্ত স্বল্প-সময়ের শট দেখতে পাওয়া যায়। আবার ফরাসী নর-তরন্দের চলচ্চিত্রকার জঁ লুক গোদার বা সোভিয়েত চলচ্চিত্রকার আন্দ্রেই তারকোভস্কি-র ছবিতে দেখা যায় দীর্ঘকালীন শট (long take)।

প্রসঙ্গত চলচ্চিত্রের গঠনগত একক হিসাবে দৃশ্যাংশ (shot)-এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রধানত দুধরনের আদর্শগত অবস্থান রয়েছে। বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত চলচ্চিত্রকারদের কাছে শট বা দৃশ্যাংশ হল 'মন্তাজ' নির্মাণের উপাদান অংশ। যেমন আইজেনস্টাইন-এর রীতি ছিল 'মনতাজ অব এ্যাট্রাক্সান' (montage of Attraction)। অর্থাৎ তাঁর মতে, ছবির প্রতিটি শট্-এ এমন উপাদান থাকবে যা এককভাবে, এবং তার পূর্ব ও পরের শট্-এর সঙ্গে সংযুক্তভাবে, দর্শকের মনকে ক্রমাগত আকৃষ্ট ও উদ্বেলিত করতে পারবে। মনতাজ গঠনের ক্ষেত্রে খুব ছোট ছোট শটগুলিকে পরপর জুড়ে তাদের মধ্যে নতুন অর্থ তৈরির চেষ্টা করা হয়।

চলচ্চিত্রের গঠনগত একক রূপে শট্গুলিকে মনতাজের অংশ ধরে নিয়ে ব্যবহার করায় আপত্তি ছিল ফরাসী নব-তরঙ্গের প্রধান তাত্ত্বিক আন্দ্রেঁ বাজাঁ-র। তিনি বলতেন, বাস্তবের দৃশ্যকে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রকারের উচিৎ যতটা সম্ভব 'দীর্ঘকালীন ও ধারাবাহিক' দৃশ্যাংশ (shot) গ্রহণ করা। তাঁর মতে বাস্তব দৃশ্য স্বয়ং যথেষ্ট অর্থময়। সুতরাং মনতাজ শৈলীর সাহায্যে ছোট ছোট শটের সমাহারে নতুন অর্থ সৃষ্টির চেষ্টা নীতিগতভাবে ঠিক নয়। ফরাসী নব-তরঙ্গের প্রধান দুই পরিচালক জুঁ লুক গোদার ও ফ্রাঁসোয়া ত্রুফোর ছবিগুলিতে আন্দ্রেঁ বাঁজার তত্ত্বের প্রকাশ দেখা যায় 'দীর্ঘকালীন শট' (long take)-এর ব্যবহারের মাধ্যমে।

● দৃশ্যাংশের গঠন : চলচ্চিত্র ও অন্যান মাধ্যম

আমরা জানি যে 'চলচ্চিত্র' এই শিল্প মাধ্যমটি অন্যান্য বেশ কয়েকটি মাধ্যম যেমন নাটক, চিত্রকলা প্রভৃতির গুনাগুন ও ফিল্মের মাধ্যমের নিজস্ব গুণাগুনের সমাহারে তৈরি। চলচ্চিত্র যেমন থিয়েটার মাধ্যম থেকে নেয় সংলাপ, চিত্রকলা থেকে নেয় দৃশ্য-সংগঠন (composition), তেমনি এই মাধ্যমের নিজস্ব গুন হল ক্যামেরার চলাচল, সম্পাদনা রীতি ইত্যাদি। একটি শট বা দৃশ্যাংশ যেহেতু চলচ্চিত্রের গঠনগত একক তাই শট্ বা দৃশ্যাংশের গঠনেও চলচ্চিত্র মাধ্যমের নিজস্ব এবং অন্যান্য মাধ্যমের আস্তা বা সংহিতা (code) গুলি বর্তমান।

একটি শট বা দৃশ্যাংশে উপস্থিত চলচ্চিত্র মাধ্যমের নিজস্ব গুণাগুন বা সংহিতা (code)গুলি হল — ফ্রেমিং, আলোক সম্পাত, রং-এর ব্যবহার, আলো-ছায়ার ব্যবহার (contrast), বস্তু বা চরিত্রগুলির সাপেক্ষে ক্যামেরার গতি (movement) এবং শব্দপথে ব্যবহৃত আবহ-সংগীত ও পারিপার্শ্বিক আওয়াজ। অপরপক্ষে অন্যান্য মাধ্যমের যেসব গুণাবলী বা সংহিতা (code) একটি শট বা দৃশ্যাংশে বর্তমান সেগুলি হল, সংলাপ, অভিনয়, চরিত্রায়ণ এবং চরিত্রগুলির পোষাক-পরিচ্ছদ নির্বাচন ইত্যাদি।

● দৃশ্যাংশ (shot) : 'মনতাজ একক'

সোভিয়েত চলচ্চিত্রকার সের্গেই আইজেনস্টাইনের মতে পরপর দুটি শট্রে মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের ফলে যেমন মন্তাজের জন্ম হয়, তেমনি একটি শট্ বা দৃশ্যাংশ যেসব উপাদানগুলি নিয়ে গঠিত সেইসব উপাদানগুলির পরস্পরের মধ্যেও দ্বন্দ্ব ও সংঘাত থাকতে পারে। তিনি প্রতিটি শটের দৃশ্যগত উপাদানগুলির মধ্যে সংঘাতমূলক (visual conterpoint) লক্ষ্য করেছিলেন। তাই প্রতিটি দৃশ্যাংশ আইজেনস্টাইনের ভাষায় 'মনতাজ একক' বা montage। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ঝড় ও একটি গাছের সংঘাতের ফলে দৃশ্যাংশে একটি গাছকে নুইয়ে পড়তে দেখা যায়। (দ্রষ্টব্য আইজেনস্টাইনের ছবি **জেনারেল লাইন**, ১৯২৯) অথবা একটি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের নল থেকে নির্গত জলোচ্ছাস ও আগুনের সংঘাতের (দ্রষ্টব্য তাঁর ছবি **স্ট্রাইক**, ১৯২৫) আগুন এতে।

যেহেতু প্রতিটি দৃশ্যাংশের মধ্যেই দ্বান্দ্বিক ও সংঘাতময় (conflicting) উপাদন রয়েছে তাই প্রতিটি একক দৃশ্যাংশ (shot) আইজেনস্টাইনের কাছে ছিল একেকটি মন্তাজ প্রকোষ্ঠ (montage cell)। সুতরাং, আইজেনস্টাইনের কাছে চলচ্চিত্রের উপাদানের একক হিসাবে দৃশ্যাংশ (shot) ছিল তার অন্তবর্তি উপাদানসমূহের পারস্পরিক সংঘাতের ফল। প্রধানত একটি দৃশ্যংশের ভিতর পাঁচ ধরনের সংঘাত চিহ্নিত করেছেন আইনজেনস্টাইন:

১. রৈখিক গতিসমূহের সংঘাত (conflict of graphic directions) :— যেমন, সমান্তরাল ও উলম্ব গতি বা অবস্থার সংঘাত। আইজেনস্টাইনের **ব্যাটলশিপ পোটেমকিন** (১৯২৫) ছবির বিখ্যাত 'ওডেসা স্টেপস্' দৃশ্যে একটি শট-এ দেখা যায় সমান্তরাল আকৃতির সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন এক মহিলা তাঁর আহত শিশুপুত্রকে নিয়ে। সিঁড়ির সমান্তরাল ধাপগুলি ও দণ্ডায়মান মহিলার উলম্ব অবস্থার সংঘাত এই দৃশ্যাংশটির অন্যতম উপাদান।

২. বস্তুগুলির মধ্যে আকৃতিগত সংঘাত (conflict of volumes) :— একটি শটের মধ্যে বিভিন্ন আকৃতির বিভিন্ন বস্তু থাকে। ছোট এবং বড় বস্তুর মধ্যে আকৃতিগত বৈপরীত্য এখানে গুরুত্বপূর্ণ। আইজেনস্টাইনের **জেনারেল লাইন** (১৯২৯) ছবির একটি শট্-এর কথা বলা যায় যেখানে ক্যামেরার সামনে সম্মুখভূমি (foreground)-তে একটি বিশাল দেহী 'ধনী' কৃষকের শরীর দেখা যাচ্ছে, পশ্চাৎভগে (background-এ) একজন 'দরিদ্র' কৃষক মহিলাকে খুব ছোট আকারে দেখা যাচ্ছে। এই দৃশ্যাংশে 'ধনী' ও 'দরিদ্র'-এর মধ্যে সংঘাত প্রকাশ পাচ্ছে 'বৃহৎ' ও 'ক্ষুদ্র' আকারের সংঘাতের ফলে।

৩. আলোক ময়তার সংঘাত (conflict in lighting) :— চলচ্চিত্র মাধ্যমটির প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল আলো ও ছায়া, সাদা ও কালো বা বিভিন্ন রঙের মধ্যে সংঘাত। আলো ও রঙের বৈচিত্র্য একটি দৃশ্যাংশ-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। আইজেনস্টাইনের ভাষায় একটি দৃশ্যাংশের মধ্যে তখনই বস্তু বা চরিত্র দৃশ্যমান হয়, যখন বস্তু বা চরিত্রের উপর এসে পড়া আলো বস্তু বা চরিত্রের শরীরে 'ধাক্কা খেয়ে' দর্শকের চোখে এসে পৌঁছায়। বস্তুর উপরি-তলের সঙ্গে আলোর সংঘাতের ফলেই বিভিন্ন রং দৃশ্যমান হয়। আইজেনস্টাইনের **আইভাল দ্যা টেরিবল** (১৯৪৪), ছবির প্রথম পর্বের বিভিন্ন দৃশ্যাংশে আলো-ছায়া ছবির দ্বিতীয় পর্বে রং-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে।

৪। স্থানিক সংঘাত (conflict in space) :— একটি দৃশ্যাংশ (shot) আসলে কিছুটা স্থান (space)-এর ছবি তোলে, সে স্থান হতে পারে স্টুডিও-র যাজানো অভ্যন্তর বা বাইরের দৃশ্যাবলী। স্থানিক সংঘাত দৃশ্যাংশের অন্যতম প্রধান উপাদান। ধরা যাক একটি দৃশ্যাংশে আমরা দেখছি এক অফিসে মালিক টেবিলের একপ্রান্তে চেয়ারে উপবিস্ট ও টেবিলের অন্যপ্রান্তে একজন শ্রমিক দাঁড়িয়ে। এখানে যদিও তারা একই ঘরে কয়েক ফুটের ব্যবধানে অবস্থান করছে। তবু তাদের মধ্যে স্থানিক সংঘাত বর্তমান।

৫. দৃশ্যাংশে দৃশ্যমান ঘটনা ও প্রকৃত বাস্তবের সংঘাত (conflict between event & it's temporality) :— আইজেনস্টাইনের **অক্টোবর** (১৯২৮) ছবিতে একটি দৃশ্যাংশে দেখা যাচ্ছে বিপ্লবের সময় উঁচু মিনার থেকে মাটিতে ভেঙ্গে ফেলা একটি মূর্তি বিশেষ কৌশল (special effect)-এর সাহায্যে ভগ্ন ও ভূপতিত স্থান থেকে স্বস্থানে ফিরে গিয়ে সম্পূর্ণ অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হচ্ছে। এখানে দৃশ্যাংশে (shot-এ) যে ঘটনা (event) ঘটতে দেখা যাচ্ছে তা আসলে বাস্তবে (in temporality) ঘটতে পারে না। তাই এই দৃশ্যাংশ আসলে দৃশ্যমান ঘটনা ও প্রকৃত বাস্তবের মধ্যে সংঘাতের ফল। বিপ্লবের ফলে যে মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, সেই মূর্তির স্বস্থানে প্রত্যাবর্তনের কল্পিত দৃশ্যের মাধ্যমে পরিচালক বিপ্লবের বিরোধী শক্তি প্রত্যাবর্তন চেষ্টার প্রতীকি উপস্থাপনা ঘটিয়েছেন।

• দীর্ঘকালীন দৃশ্যাংশ (long take) দৃশ্যপর্যায় দৃশ্যাংশ (sequence shot)

আইজেনস্টাইনের সংজ্ঞায় একটি শট ছিল তার অন্তবর্তি উপাদানগুলির সংঘাত (conflict)-এর ফল, ঠিক বিপরীত মত পোষণ করতেন ফরাসী নব-তরঙ্গের প্রবক্তা ও তাত্ত্বিক আন্দ্রে বাঁজা। তাঁর মতে দৃশ্যাংশ (shot) হল এর মধ্যস্থ উপাদনগুলির জটিল সংশ্লেষন (synthesis)-এর ফল। বাজাঁ মনে করতেন, মাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্র বাস্তবকে 'প্রায় ছুঁয়ে যেতে পারে' অর্থাৎ চলচ্চিত্র বাস্তবকে উপস্থাপনার এমনই এক উপযুক্ত মাধ্যম যে চলচ্চিত্রের দৃশ্য ও বাস্তব-দৃশ্য প্রায় সমান। সুতরাং, বাজাঁর তত্ত্বানুসারে বলা যায় চলচ্চিত্রের উপাদানগত একক বা দৃশ্যাংশ আসলে দৃশ্যমান বাস্তবের অংশকে উপস্থাপন করে। তাই বাজাঁ চাইতেন শট্ হবে দীর্ঘকালীন ও ক্যামেরার সামনের অঞ্চল যতদুর সম্ভব দৃশ্যমান হবে (deep focus) যাতে প্রতিটি শট বাস্তবের অন্তর্নিহিত জটিলতাকে বাধাহীনভাবে প্রকাশ করতে পারে।

দীর্ঘ-কালিন-দৃশ্যাংশ গ্রহণের (long take)-এর অন্যতম উদ্দেশ্য হল বাস্তবের সময়কে অবিচ্ছিন্নভাবে চলচ্চিত্রে উপস্থাপন করা। অর্থাৎ একটি ঘটনা বাস্তবে যতক্ষণ ধরে ঘটছে ততক্ষণ ধরেই অবিচ্ছিন্নভাবে ঘটনাটি উপস্থাপন করা দীর্ঘকালিন-দৃশ্যাংশ গ্রহণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। প্রবাদ-প্রতীম মার্কিন চলচ্চিত্রকার অরসন ওয়েলস-এর একটি ছবি **টাচ অব ইভিল** থেকে লং টেক-এর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। দৃশ্যাংশের শুরুতে একটি হাত গাড়িতে বোমা লুকিয়ে রাখছে, ক্যামেরা একটু ডান দিকে সরে যায়, প্রথমে দেওয়ালে আততায়ীর ছবি দেখা যায় এবং তারপর লোকটিকে দেখা যায়, ঐ একই শটে এবার ক্যামেরা ক্রেনের সাহায্যে উপরে তুলে উঁচু থেকে দৃশ্য গ্রহণ করা হয়, যেখানে দেখা যায় ঘাতক লোকটি পালালো এবং গাড়িতে এক ব্যক্তি এসে আরোহণ করল এবং গাড়ির ইঞ্জিন চালু করল এবার ক্যামেরা ক্রমে পিছনে আসতে থাকে যাতে চলমান গাড়িটিকে সামনে থেকে দেখা যায়। ক্রমে ক্যামেরা গাড়ির সামনে পিছিয়ে যাবার সময় রাস্তার ধারে দুজন প্রেমিককে দেখা যায়। ক্যামেরা আরও কিছুক্ষণ গাড়ি ও প্রেমিকদ্বয়ের সঙ্গে চলে, শেষ পর্যন্ত প্রেমিক যুগলের উপর স্থির হয়। কয়েক মুহূর্ত পরেই বোমা ফাটার শব্দ শোনা যায়।

সমগ্র দীর্ঘ-কালিন-দৃশ্যাংশটি গ্রহণ (long take)-এর ফলে গাড়িতে বোমা রাখা ও ফাটার মধ্যে বাস্তবে যে সময় লাগে, এই শট্-এ সেই সময়কে অবিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপনা (represent) করা হল।

বিখ্যাত ফরাসী চলচ্চিত্রকার জঁ রেনোয়া, নব-তরঙ্গের প্রধান পরিচালক ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো এবং জঁ. লুক. গোদার। জাপানি পরিচালক কেনেজি মিডোস্তচি ও ওজু প্রভৃতি বিখ্যাত পরিচালকদের ছবিতে দীর্ঘকালিন দৃশ্যাংশ-এর বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

প্রসঙ্গত অরসন ওয়েলস-এর **টাচ্ অব ইভিল** ছবির যে লং টেকটির উদাহরণ দেওয়া হল যেখানে একটি সম্পূর্ণ দৃশ্যপর্যায় (sequence) গঠিত হয়েছে একটি মাত্র দীর্ঘ-কালিন দৃশাংশ (shot) নিয়ে। এই ধরনের লং টেক, যেখানে দৃশ্যাংশ (shot) দৃশ্যপর্যায় (sequence)-এর সমতুল্য, সেখানে এইসব দীর্ঘ শট্গুলিকে বলা হয় দৃশ্যপর্যায়-দৃশ্যাংশ (sequence shot)। আদিযুগের চলচ্চিত্র (early cinema)-এ যেখানে সম্পাদনার কোন ভূমিকা ছিল না, যেখানে প্রতিটি দৃশ্যাংশ (shot)-ই হত লং টেক এবং দৃশ্যপর্যায়-দৃশ্যাংশ (sequence shot)।

• দৃশ্যাংশ দুরত্ব (Shot Scale)

চলচ্চিত্রের উপাদানগত একক হিসাবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দৃশ্যাংশগুলিকে ক্যামেরার সঙ্গে বস্তু/চরিত্রের দূরত্ব এবং বস্তু/চরিত্রের পর্দায় উপস্থাপিত আকারের উপর নির্ভর করে বেশ কয়েকটি ভাগে চিহ্নিত করা যায়। সেগুলি হল দীর্ঘ দৃশ্যাংশ (long shot), অতিদীর্ঘ শট দৃশ্যাংশ (extreme long shot), নাতি দীর্ঘ দৃশ্যাংশ (medium long shot), মধ্যম দৃশ্যাংশ (med. shot), নিকট দৃশ্যাংশ (close shot), মধ্যম-নিকট দৃশ্যাংশ (med close shot) এবং অতি নিকট দৃশ্যাংশ (big close shot)। (ক) সাধারনত একটি মানুষের দেহের কতটা অংশ কিভাবে পর্দায় উপস্থাপিত হচ্ছে, তার উপর নির্ভর করে দৃশ্যাংশগুলিকে উপরোক্ত বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়। একটি দৃশ্যাংশ (shot)-এর ফ্রেমে একটি মানুষর ঠিক পায়ের পাতা থেকে মাথার কিছুটা উপর পর্যন্ত দেখা গেলে তাকে বলা হয় দীর্ঘ দৃশ্যাংশ (long shot)। যে সব বৈশিষ্ট্য দেখে একটি লং শট চেনা যাবে সেগুলি হল —

(i) একটি মানুষের পা থেকে মাথা পর্যন্ত সম্পূর্ণ দেহ দেখা যাবে।

(i) পায়ের নিচের সম্মুখভাগের ভূমিতল (foreground) প্রায় দেখা যাবে না কিন্তু পশ্চাৎভূমি (back ground) দেখা যাবে এবং মাথার উপর কিছু ফাঁকা স্থান (head space) থাকতে পারে, না ও থাকতে পারে।

(iii) চরিত্রটি ফ্রেমের কেন্দ্রে থাকলে, দুপাশে পারিপার্শ্বিক (বা তথ্য কোন চরিত্রের অস্তিত্ব) দেখা যাবে।

ব্যবহারিক দিক থেকে লং শটের বিভিন্ন উপযোগীতা চলচ্চিত্রে দেখা যায়। যেমন —

১. যে চরিত্রটিকে লং শটে উপস্থাপিত করা হচ্ছে, সেই চরিত্রটির সম্পূর্ণ চেহারা, পোষাক ইত্যাদির দৃশ্যগত বর্ণনা দর্শকের কাছে পৌঁছে যাবে।

২. চরিত্রটির যে স্থানে দাঁড়িয়ে আছে বা চলাচল করছে, সেই স্থানের দৃশ্যগত বর্ণনা দর্শকের চোখে পৌঁছবে।

৩. সম্পাদনার ক্ষেত্রে ক্লোজ বা মিড শটের পর লং শট ব্যবহারের রীতি আছে। যা নাকি দর্শক মনে ক্লোজ/মিড শট দেখার উত্তেজনাকে প্রশমিত করে।

একেবারে নিখুঁত মাপের লং শট অর্থাৎ ঠিক পা থেকে মাথার উপর পর্যন্ত ছবিতে দেখতে পাওয়া হয়তো খুব সুলভ নয়, তবে লং শটের ব্যবহার চলচ্চিত্রে যথেষ্ট পরিমানে হয়।

সুইডেনের খ্যাতনামা চলচ্চিত্র পরিচালক ইঙ্গমার বার্গম্যান-এর বহু আলোচিত ছবি **সেভেন্থ সীল**-এর প্রথম দৃশ্যে একটি দীর্ঘ দৃশ্যাংশ (long shot) ব্যবহার করা হয়েছে। একটি দৃশ্যাংশে দেখা যাচ্ছে কালো পোশাকে সর্বাঙ্গ ঢেকে, বরফের মত সাদা মুখ নিয়ে 'মৃত্যু' ছবির অন্যতম চরিত্র হিসাবে এসে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘ দৃশ্যাংশে ফ্রেমের ঠিক নিচে তার পা থেকে ফ্রেমের উপরের অংশ তার মাথার উপর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। এই লং শট বা দীর্ঘ দৃশ্যাংশটিতে 'মৃত্যু'র পিছনে সমুদ্র ও বেলাভূমির পশ্চাদপট ও পারিপার্শ্বিক, তার মাথার উপর একটু খোলা স্থান (head space)। **সেভেন্থ সীল** ছবির এই লং শটটি চলচ্চিত্র মহলে যথেষ্ট পরিচিত ও আলোচিত দৃশ্যাংশ।

আর একটি উদাহরণ দেওয়া যায়, চার্লি চ্যাপলিনের **গোল্ডরাশ** (১৯২৫) ছবি থেকে। এখানে একটি দৃশ্যে চার্লিকে দেখা যাচ্ছে হাতের লাঠিটি আড়াআড়ি ধরা, চোখের দৃষ্টিবিভ্রান্ত, পায়ে বেঢপ আকৃতির জুতো। তার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে অন্য একজন চরিত্র চার্লির কাঁধে হাত দিয়ে তার মুখের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। তাদের পিছনে একটি ভাঙ্গা বাড়ির অংশ দেখা যাচ্ছে। দীর্ঘ দৃশ্যাংশে চার্লি ও তার সঙ্গের লোকটির ঠিক পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

সত্যজিৎ রায়ের **পথের পাঁচালী** (১৯৫৫) ছবিতে বেশ কয়েকবার লং শট বা দীর্ঘ দৃশাংশ-এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন, অনেকদিন পর গ্রামে ফিরে বাড়িতে প্রবেশের ঠিক আগে হরিহর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, দেখে একটা আমডাল ভেঙ্গে পাঁচিলের উপর পড়েছে। এই শটে হরিহরকে দেখা যায় লং শটে। তার পা থেকে মাথার উপর পর্যন্ত দৃশাংশে উপস্থাপিত হয়। অথবা তেল ভরা বোতাল হাতে বাড়ির ঠিক কাছে এসে অপু দাঁড়িয়ে আছে, হরিহরের গলার স্বর তার কানে গেছে। এই দৃশ্যাংটি লং শটে নিয়েছেন সত্যজিৎ রায়।

জাপানী চলচ্চিত্রকার কেনেজি মিডোগুচির ছবিতে লং শটের বহুল ব্যবহার লক্ষ্যনীয়। সত্যজিৎ রায়ের অপু ত্রয়ীর ছবিগুলিতেও লং শট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। চরিত্রের অবস্থান বা লোকশনকে প্রচেষ্টা (establish) করতে লং শট বা দীর্ঘ দৃশ্যাংশ অন্যতম ভালো উপায়। লং শটে একটি মানুষের সমগ্র শরীর দেখা যায় বলে এক পূর্ণ দৈর্ঘ্যের দৃশ্যাংশ (full shot) বলা হয়।

খ) যে দৃশ্যাংশে একটি মানুষের সমগ্র শরীর দেখা যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিকের তুলনায় মানুষটির আকৃতি লং শটের থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট হয় এবং মানুষটির অবস্থান ক্যামেরা থেকে অপেক্ষাকৃত দূরে মনে হয়, সেই ধরনের দৃশ্যাংশকে বলা হয় অতি-দীর্ঘ-দৃশ্যাংশ (extreme long shot)। এক্সট্রিম লং শটের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :-

i) চরিত্রটির সম্পূর্ণ শরীর দেখা যাবে, সঙ্গে তার সামনে, পিছনে, দুপাশে ও মাথার উপরে বেশ কিছুটা স্থান দেখা যাবে। অর্থাৎ অতি-দীর্ঘ-দৃশ্যাংশের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান চরিত্রের সম্পূর্ণ শরীরের সঙ্গে তার সম্মুখভূমি (foreground), পশ্চাদভূমি (background), 'ডান ও বাঁ পাশের পারিপার্শ্বিক এবং মাথার উপর বেশ কিছুটা অঞ্চলে দৃশ্যমান হবে।

(ii) যে মানুষটিকে অতি-দীর্ঘ-দৃশ্যাংশে দেখা যাচ্ছে তার আকৃতি লং শটের তুলনায় ছোট বোধ হবে।

(iii) শরীরের তুলনায় পারিপার্শ্বিক ফ্রেমে অনেক বেশি অঞ্চল দখল করবে। অতি-দীর্ঘ-দৃশ্যাংশের উপযোগীতাগুলিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে—

১. একটি চরিত্র কোন পারিপার্শ্বিকের মাঝে অবস্থান করছে তা এই শটে সঠিকভাবে বর্ণিত হয়। তাই এই শটকে চরিত্রের অবস্থান বোঝানোর জন্য বা এসটাবলিশিং শট্ হিসেবে সর্বাধিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

২. চরিত্রটি যে স্থানে চলাচল (move) করছে, সেই স্থানের (location-এর) সঙ্গে দর্শকের দৃশ্যগত পরিচয় ঘটে এই ধরনের শটে। সাধারণত কোন চরিত্র রাস্তা দিয়ে হাঁটলে এই ধরনের শট ব্যবহার করা হয়।

৩. নিসর্গ দৃশ্য দেখানোর জন্য অতি-দীর্ঘ-দৃশাংশ (extreme long shot)-এর ব্যবহার বহুল প্রচলিত। কারণ এই ধরনের শটে পারিপার্শ্বিক অঞ্চল সবচেয়ে বেশি পরিসরে দৃশ্যমান হয়।

৪. প্রথাগত সম্পাদনার ক্ষেত্রে মনে করা হয় যে বেশ কিছুক্ষণের ক্লোজ বা মিড শটের পর এবং আবেগঘন নাটকীয় পরিস্থিতির পর এ ধরনের শট ব্যবহার করলে মনে উদ্বেগের প্রশমন ঘটে ও দর্শক এক ধরনের মুক্তির আস্বাদ পায়। ফরাসী নব-তরঙ্গের অন্যতম প্রধান চলচ্চিত্রকার ফ্রাঁসোয়া ক্রুফোর **ফোর হান্ড্রেজ ব্লোজ** ছবিটিতে আমরা দেখি ছবির প্রধান চরিত্র কিশোর আঁতোয়ান দোয়ানেল যখনই বাড়ির বন্ধন বা স্কুলের শাসন থেকে ছাড়া পেয়ে প্যারিসের রাস্তায় ঘুরছে, তখন তার মুক্তির আনন্দ দর্শকের মনে সঞ্চারিত করতে ক্রুফো প্রচুর এক্সট্রিম লং শট ব্যবহার করেছেন ছবিতে।

যদিও হলিউডের রহস্য ছবির প্রবাদপুরুষ আলফ্রেড হিচককের ছবিতে অনেক সময়ই অতি-দীর্ঘ-দৃশাংশ ব্যবহৃত হয় সম্পূর্ণ বিপরীত উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ দর্শক মনে উদ্বেগ (tension) সৃষ্টি করার জন্য। তাঁর বিখ্যাত **নর্থ বাই নর্থ ওয়েস্ট** ছবির একটি দৃশ্যে কাহিনীর নায়ককে এক্সট্রিম লং শটে এক বিশাল খোলা প্রান্তরে দেখা যাচ্ছে। অদ্ভুত, জনমানবহীন, ধূ ধূ প্রান্তরে একজন মাত্র মানুষের উপস্থিতির ফলে এই দৃশ্যাংশ একধরনের উদ্বেগ বা অজানা আশঙ্কার সৃষ্টি করে দর্শক মনে। একট্রিম লং শটের এরকম প্রথাবিরুদ্ধ ব্যবহার ঋত্বিক ঘটকের অযান্ত্রিক ছবিতে বারবার দেখা যায়। এ ছবিতে একটি দৃশ্যে ছবির অন্যতম প্রধান একটি চরিত্র, একটি মেয়েকে অতি-দীর্ঘ দৃশ্যাংশে ছোটনাগপুরের পাহাড়ি প্রকৃতির মাঝে একেবারে ফ্রেমের এককোণে অত্যন্ত ক্ষুদ্র আকৃতিতে দেখা যায়। এখানে এই ধরনের প্রথাবিরুদ্ধ দৃশ্য-সংগঠন (composition) এই দৃশ্যাংশে এ ধরনের উদ্বেগ (tension)-এর জন্ম দিয়েছে।

অতি-দীর্ঘ-দৃশাংশের প্রথাসম্মত ব্যবহার করা হয়েছে সত্যজিৎ রায়ের **পাথের পাঁচালী** ও **অপরাজিত** ছবিতে। **পথের পাঁচালী**-তে গ্রামবাংলার প্রেক্ষাপটের সঙ্গে অপু ও দুর্গার আজন্ম লালিত সম্পর্ক বোঝাতে বারবার এক্সট্রিম লং শট ব্যবহার হয়েছে। **পথের পাঁচালী** একটি দৃশ্যের কথা বলা যায়। চিনিবাস ময়রা চলেছে বাঁক কাঁধে,তার পিছনে চলেছে অপু, দুর্গা ও একটি কুকুর। অতি-দীর্ঘ-শটে দেখা যাচ্ছে গ্রামবাংলার প্রেক্ষাপটে তিনটি মানুষ ও একটি জন্তুর চলাচলের ছন্দ।

লং শট ও এক্সট্রিম-লং শটের কথা বলতে গেলেই এসে পড়ে জাপানী পরিচালক কেনেজি নিগোস্তচির নাম। নিগোস্তচির ছবির বেশিভাগ অংশই তৈরি হয় দীর্ঘ ও অতি-দীর্ঘ শটের সমন্বয়ে। তাঁর **উগেৎসু মনোগাতারি** ( ) ছবিতে লং ও এক্সট্রিম লং শটের ব্যবহার চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়।

গ) নাতি-দীর্ঘ দৃশ্যাংশ বা মিড লং শট-এ কোন মানুষের হাঁটু থেকে মাথার উপর পর্যন্ত দেখা যায়। মাথা থেকে হাঁটু পর্যন্ত দৃষ্ট হয় বলে, নাতিদীর্ঘ দৃশ্যাংশকে অনেক সময় হাঁটু-পর্যন্ত দৃশ্যাংশ বা নী শট (knee shot) বলা হয়।

নাতি-দীর্ঘ দৃশ্যাংশের পরিচায়ক বৈশিষ্ট্যগুলি হতে পারে নিম্নরূপ —

(i) কোন চরিত্র ফ্রেমে উপস্থিত থাকলে তার মাথা থেকে হাঁটু পর্যন্ত উলম্বভাবে দৃষ্ট হয়।

(ii) এই ধরনের শটে সাধারণত মাথার উপরে কিছু স্থান (head space) ফ্রেমে থাকে।

(iii) লং শটের মতই মিড-লং শটেও, কেন্দ্রে কোন চরিত্র রয়েছে ধরে নিলে, তার দুপাশে ও পিছনে বেশ কিছুটা স্থান থাকে, তবে এক্ষেত্রে চরিত্রের শরীরের অংশ লং বা এক্সট্রিম লং শটের তুলনায় ফ্রেমের বেশি অঞ্চল জুড়ে থাকে। চলচ্চিত্রে নাতি-দীর্ঘ দৃশ্যাংশ (med long shot)-এর ব্যবহারিক উপযোগীতার তাৎপর্য নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে দেখা যায়।

১. লং শট ও এক্সট্রিম লং শটে চরিত্র ও পারিপার্শ্বিক সমান গুরুত্ব পায়। কিন্তু মিড লং শটের ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক বিশেষত পশ্চাদভূমি দৃশ্যমান হলেও চরিত্রের দৈহিক ভঙ্গি পারিপার্শ্বিকের তুলনায় একটু বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

২. কোন চরিত্রের গতি-প্রকৃতি, বিশেষত শরীরের উপরিভাগের নড়া-চড়া, কাজকর্ম পারিপার্শ্বিক-সহ দেখানোর ক্ষেত্রে মিড-লং শট প্রয়োজনীয় কৌশল।

৩. বারবার লংশট বা এক্সট্রিম লং সটের ব্যবহারের পরিবর্তে দৃশ্যগত বৈচিত্র্য আনতে মিড-লং শট হল অন্যতম উপায়।

জাপানী পরিচালক ওজু এবং মিজোগুচির ছবিতে এবং সত্যজিৎ রায়ের অপুটিলজির ছবিগুলিতে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রেই মিড-লং শট ব্যবহার করা হয়েছে। ফরাসী চলচ্চিত্রকার জুঁ লুক গোদার-এর বিখ্যাত **ব্রেথলেশ** (১৯৫৭) ছবিতে একটি অতিপরিচিত দৃশ্যাংশ আছে। দেখা যাচ্ছে ছবির নায়ক, মিশেল পোইকার ও নায়িকা প্যাট্রিসিয়া প্যারিসের রাস্তা ধরে পাশাপাশি হাঁটছে। দৃশ্যাংশে তাদের হাঁটু থেকে মাথার উপর পর্যন্ত দৃশ্যমান। এই মিড-লং শটটি একই সঙ্গে প্রেমিক যুগলের পাশাপাশি হাঁটার ছন্দ, শহরের পারিপার্শ্বিক এবং চরিত্র দুটির ঘনিষ্ঠতা ও অঙ্গভঙ্গি (gesture) প্রকাশ করেছে।

সত্যজিৎ রায়ের **কাঞ্চনজঙ্ঘা** (১৯৬) ছবির একটি দৃশ্যের কথা বলা যায়, যেখানে ছবির প্রধান দুটি চরিত্র মনিষা ও অশোক পরস্পরের মুখোমুখী অবস্থায় ও ক্যামেরার দিকে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, দূরে 'ব্যানার্জি' নামেরএকজন দাঁড়িয়ে শটটিতে সম্মুখভূমিতে (foreground-এ) থাকা মণিষা ও অশোকের মাথার উপর থেকে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে এবং এদের চারপাশে রয়েছে দার্জিলিং শহরের পার্বত্য প্রেক্ষাপট।

ঋত্বিক ঘটকের **কোমল গান্ধার** (১৯৬১) ছবির একটি অবিস্মরণীয় দৃশ্যাংশের কথা বলা যায়। প্রধান নায়ক চরিত্র ভৃগু ও নায়িকা অনুসূয়া একটি পরিত্যক্ত রেলপথের শেষের সমান্তরাল কাঠের পাটাতনে শরীরের ভর রেখে ক্যামেরার দিকে পিছু ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। শটটি একটি মিড-লং-শট, যেখানে ভৃগু ও অনুসূয়ার হাঁটুর উচ্চতা থেকে মাথার অনেকটা উপর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। আর দৃশ্যাংশটির পশ্চাদ-প্রেক্ষাপট জুড়ে রয়েছে পদ্মা ও পদ্মার ওপারের ভূমি।

ঘ) যে দৃশ্যাংশ (shot)-এ মানুষের শরীরের অর্ধেক অর্থাৎ কোমর বা কোমরের সামান্য নিচ থেকে মাথার উপর পর্যন্ত দেখা যায়, তাকে মধ্যম-দৃশ্যাংশ (med shot) বলা হয়। এই ধরনের শট-কে সাধারণত লং শট ও কোলজ শটের মধ্যবর্তি অবস্থা বলা যেতে পারে।

এই শটের বৈশিষ্টগুলি হতে পারে :-

(i) যে মানুষের শরীর পর্দায় উপস্থাপিত হচ্ছে, তার উর্ধাঙ্গ দেখা যাবে।

(ii) লং শট বা মিড-লং শটে শরীর ফ্রেমের যতটা অঞ্চল জুড়ে থাকে মিড শটে চরিত্রের দেহাংশ তার থেকে বেশি অঞ্চল জুড়ে দেখা যায়।

(iii) মিড শটে সাধারণত ক্যামেরার সম্মুখভূমি (foreground)-তে দণ্ডায়মান চরিত্রটির পশ্চাদভূমি তল (background floor) দেখা যায় না, কিন্তু চরিত্রটির পিছনে কোন মানুষের উপস্থিতি, চলাচল বা দৃশ্যসত্তা (set & decor) দৃষ্ট হয়।

মিড শটের উপযোগিতাগুলি নিম্নরূপ হতে পারে ঃ-

১. এই শট সাধারণত স্টুডিও/ঘর-এর ভিতরে (indoor-এ) ছবি তোলার সময়বহুল পরিমানে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া টেবিল ও চেয়ারে বসে কথোপকথনের দৃশ্যে মধ্যম দৃশ্যাংশ (med shot) অত্যন্ত উপযোগী উপায় হতে পারে।

২. এই শটে শরীরে উর্দ্ধাংশ পর্দায় বেশ কিছুটা অঞ্চল নিয়ে দেখা যায়, ফলে চরিত্রের অঙ্গসঞ্চলনের ভাষা, মুখভঙ্গি, কথা বলা ঢং বেশ ভালোভাবে উপস্থাপিত হয়।

৩. লং বা মিড-লং চরিত্র ও তার পারিপার্শ্বিক প্রায় সমান গুরুত্ব পায়। কিন্তু মিড শটে চরিত্রতে যথেষ্ট বেশি গুরুত্ব দিয়েও চরিত্রের অবস্থান বোঝানো যায়। সাধারণত মিড শটে চরিত্রের পিছনে অন্যান্য লোকজনের নড়াচড়া ও দৃশ্যসজ্জা (decor & set) দেখে চরিত্রের অবস্থান বোঝা যায়।

যেমন, ধরা যাক দুটি চরিত্র একটি রেস্তোঁরায় টেবলে মুখোমুখি বসে আছে। মিড শটে তাদের কোমর থেকে মাথার উপর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। তাদের পিছনে রেস্তোঁরায় কর্মীদের চলাচল বা রেস্তোঁরা গৃহসজ্জা দেখে দর্শক বুঝতে পারবেন চরিত্র দুটি কোথায় অবস্থান করছে। অথবা একটি চরিত্র, ধরা যাক রান্না করছে। মিড শটে তাকে দেখালে আমরা তার সামনের টেবিলে রান্নার সরঞ্জাম দেখে বুঝব সে রান্নাঘরে রান্না করছে।

সুইডেনের বিখ্যাত পরিচালক ইন্দমার বার্গম্যান-এর বিশেষভাবে আলোচিত **দ্য সেভেলু সীল** (১৯৫) ছবিতে একটি দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের ধারে বসে 'মৃত্যু'-র সঙ্গে দাবা খেলছে ছবির প্রধান চরিত্র। প্রায় অন্ধকার পশ্চাদভূমি। দুটি চরিত্র ও দাবার ঘুঁটিতলির উপরে তীব্র আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে। 'মৃত্যু' ও নাইট (knight) দুই চরিত্রকে মুখোমুখি দেখা যাচ্ছে মধ্যম দৃশ্যাংশ (med shot)-এ। অর্থাৎ তাঁদের কোমর থেকে মাথার উপর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

সত্যজিৎ রায়ের **পথের পাঁচালী**-র একটি অবিস্মরণীয় মিড শট-এর কথা মনে করা যায়। হরিহর দীর্ঘদিন পরে বাড়ি ফিরে দাওয়ায় বসে মেলা থেকে কিনে আনা একখানা লক্ষীর পট পুঁটলি থেকে বার করে সর্বজয়ার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। সর্বজয়া হরিহরের দিকে পিছন ঘুরে, ক্যামেরার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা ক্যামেরার সম্মুখক্ষেত্রে (foreground)-এ সর্বজায়াকে দেখছি। তাঁর কোমরের নিচ থেকে মাথার উপর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। এই মিড শট-টিতে পশ্চাদক্ষেত্রে (background) হরিহর ও হরিহরের পিছনে তাদের ভগ্নদশা যুক্ত বাড়ির দেওয়াল দেখা যাচ্ছে।

দি সেভেনু সীল ও **পথের পাঁচালী** ছবি দুটি থেকে মিড শট বা মধ্যম দৃশ্যাংশ-এর যে উদাহরণগুলি দেওয়া হল, তাতে প্রতি শটে দু-জন করে চরিত্র ছিল। যে দৃশ্যাংশের ফ্রেমে দু-জন চরিত্র অবস্থান করে সেই দৃশ্যাংশ বা শট-কে বলা হয় দুই-চরিত্র-বিশিষ্ট (two shot)।

অবশ্য মিড শটে একটি চরিত্রও অবস্থান করতে পারে। মিড-শট-এ মানুষের কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত দেখা যায় বলে এই শটকে কোমর-অবধি-দৃশাংশ (waist shot) ও বলা হয়।

(ঙ) চলচ্চিত্রের পর্দায় যে শটে মোটামুটি বুক বা তার একটু উপর থেকে সমগ্র মুখমণ্ডল ও মাথা পর্যন্ত দেখা যায়, সেই শটকে মধ্যম-নিকট-দৃশ্যাংশ (medium close shot) বা মিড-ক্লোজ শট বলা হয়। মিড-ক্লোজ শট চলচ্চিত্রের অন্যতম নাটকীয় উপাদান।

মিড ক্লোজ শট বা মধ্যম-নিকট-দৃশ্যাংশের পরিচায়ক গুনগুলি হল ঃ-

(i) বুক বা তার উপর থেকে, প্রধানত মুখমণ্ডল দেখা যায় এই শটে।

(ii) এই শটে চরিত্রের মুখমণ্ডল বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়।

(iii) মিড-ক্লোজ বা মধ্যম-নিকট শটে ফ্রেমে একাধিক মুখমণ্ডল না থাকলে, চরিত্রের মাথার পিছনের ও দুপাশের দৃশ্য কিছুটা দৃশ্যমান হয়, যদিও ফ্রেমের বেশিরভাগ অঞ্চল জুড়ে মুখ ও কাঁধ বিস্তৃত থাকে।

এই শটের বিশেষ উপযোগিতা চলচ্চিত্রের লক্ষ্য করা যায় —

১. পর্দায় একাধিক মুখমণ্ডল একটি ফ্রেমে ধরতে মিড-ক্লোজ-শট অত্যন্ত উপযোগী।

২. মুখভঙ্গি ও চরিত্রের দৃষ্টি প্রভৃতি দর্শকের সামনে বিশেষভাবে উপস্থাপিত হয়।

৩. এই দৃশ্যাংশ একই সঙ্গে আখ্যানের টেনশন এবং পর্দায় উপস্থাপিত চরিত্রটির মনজগতের অনুভূতি দর্শকের মনে সঞ্চারিত করে।

প্রখ্যাত সুইডিশ চলচ্চিত্রকার ইঙ্গমার বার্গম্যানের ছবিগুলিতে মিড-ক্লোজ শটের নাটকীয় ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। ১৯৭৫-এ তৈরি তাঁর **ফেস্-টু-ফেস্** ছবিতে একটি আবেগঘন দৃশ্যে দেখা যায় অভিনেত্রী লিভ উলমানের একটি নাটকীয় মিড ক্লোজ শট। ক্যামেরার মুখোমুখী অভিনেত্রী ভেঙ্গে পড়েছেন প্রবল কান্নার আর্তনাদে। তার খোলা অবিনস্ত্য চুলের গোছা তার মুখের দু-পাশে, হাত দুটি বুকের কাছে জড়ো করা রয়েছে. এই মধ্যম-নিকট দৃশ্যাংশটির অর্থ যেন এই একটি মাত্র দৃশ্য-প্রতিমার মধ্যেই পরিস্ফুটিত হচ্ছে।

মিড-ক্লোজ শটের আরেকটি নাটকীয় উদাহরণ দেওয়া যায় সত্যজিৎ রায়ের **অপরাজিত** (১৯৫) ছবির হরিহরের মৃত্যু দৃশ্য থেকে। একটি মিড ক্লোজ শটে দেখা যাচ্ছে স্ত্রী সর্বজায়া ও পুত্র অপু মরণোন্মুখ হরিহরের মুখের উপর ঝুঁকে পড়েছে। ফ্রেমের ঠিক নিচের অংশে হরিহরের মুখের কিছুটা দেখা যাচ্ছে। সর্বজয়া ঝুঁকে পড়ে হরিহরের মুখে ঘটি থেবে জল ঢেলে দিচ্ছেন, পাশেই অপুর মুখ। সর্বজায়া ও অপুর বুক থেকে মাথা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে দৃশাংশটিতে।

অপুর সংসার (১৯৫৯) ছবির শেষের দিকে একটি বিখ্যাত মিড ক্লোজ শট রয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে, কাজলের দৃষ্টি সামনে ও দূরে নিবদ্ধ। তাদের পিছনে দেখা যাচ্ছে নদীতে ভেসে যাওয়া একটি নৌকার পাল। অপুর মুখের হাসি এখানে পুত্রের সঙ্গে মিলনের আনন্দের অভিব্যক্তি। কাজলের দূরে নিবন্ধ দৃষ্টি গ্রাম ছেড়ে শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রার ইঙ্গিত বহন করছে।

চ) চলচ্চিত্রে ক্লোজ শট বা ক্লোজ আপ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কোন মানুষের সমগ্র মুখমণ্ডল, বেশ বড় আকারে চলচ্চিত্রের পর্দায় দেখা গেলে তাকে নিকট দৃশাংশ বা ক্লোজ-আপ বলা হয়। এছাড়া শরীরের অন্য কোন অংশ বা কোন ছোট বস্তু পর্দায় অপেক্ষাকৃত বড় আকারে উপস্থাপিত হলে তাকেও ক্লোজ শট বা নিকট দৃশ্যাংশ বলা হয়।

ক্লোজ শটের বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ-

(i) মাথা ও মুখমণ্ডল পর্দায় দেখা যায়।

(ii) মুখমণ্ডল পর্দার অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে অবস্থান করে।

(iii) পশ্চাদপট বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিস্কার থাকে না। সাধারণত ক্লোজ শটের ক্ষেত্রে চরিত্রের মুখমণ্ডল গুরুত্বপূর্ণ, পশ্চাৎপট নয়। বিবিধ ও বিচিত্র কারণে নিকট দৃশ্যাংশ (close shot) ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, যেমন —

১. দর্শকের দৃষ্টিকে একটি বিশেষ বস্তু বা মুখমণ্ডলের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করা।

২. সাধারণভাবে খালি চোখে দেখার পক্ষে যা অতি দ্রুত, অতি ক্ষুদ্র বা অতি সুদুর তাকে দর্শনের উপযোগী করে তোলা হয় নিকট-দৃশ্যাংশ (close shot)-এর সাহায্যে।

৩. মুখভঙ্গি বা মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তিকে বিশেষভাবে প্রকাশ করা যায় নিকট দৃশ্যাংশে।

৪. ক্লোজ শট তুলনায় নিস্প্রাণ বস্তু বা মুখকে আবেগবহ করে উপস্থাপিত করে।

নিকট দৃশ্যাংশ বা ক্লোজ শট চলচ্চিত্রকারের হাতে সবচেয়ে নাটকীয় উপাদান। কারণ চলচ্চিত্র 'দৃশ্যগত বস্তু' (external reality)-কে দর্শকের চোখের সামনে তুলে ধরে। সাহিত্যের মত মানুষের মনের ভিতরের কথা প্রকাশ করার ভাষা চলচ্চিত্রকারের হাতে সে অর্থে নেই। ক্লোজ শট বা নিকট দৃশ্য এই অভাব পূরণ করে। প্রতিটি ক্লোজ শট চরিত্রের অন্তর্গত মনোভাব প্রকাশ করতে চায়। চলচ্চিত্রে কখনও কখনও দেখা যায় চরিত্রের ক্লোজ শট দেখানোর পরই ফ্ল্যাশ ব্যাক বা স্মৃতিচারণায় চলে যাওয়া হয়। অর্থাৎ ক্লোজ শট দেখলেই দর্শকের মনে চরিত্রের অন্তর্গত ভাব, চিন্তা, কথা বেরিয়ে আসবে এমন প্রত্যাশা জাগে।

ক্লোজ শটের সাহায্যে চরিত্রের মুখমণ্ডল পর্দায় দেখানোর বিষয়ে ফরাসী চলচ্চিত্রকার জঁ লুক গোদার বলেছিলেন, "বোয়েল ইউ ফটোগ্রাফ এ ফেস, ইউ ফাটোগ্রাফ দ্য সোল বিহাইণ্ড" এই উক্তির যথার্থ বোঝা যায় গোদার, ব্যর্গম্যান, কার্ল ড্রায়ার এবং ঋত্বিক ঘটকের ছবি দেখলে।

ক্লোজ শটের কথা বলতে গেলে ডেনিশ পরিচালক কার্ল ড্রায়ারের **প্যাশন অব জোয়ান অব আর্ক** (১৯২৮) ছবির কথা বলতেই হয়। প্রায় সমগ্র ছবিটি তৈরি হয়েছে কাহিনীর মূল চরিত্র 'জোয়ান' নামের বিদ্রোহী মেয়েটির মুখমণ্ডলের একের পর এক বিভিন্ন কোন থেকে গ্রহণ করা ক্লোজ শট ব্যবহার করে।

সুইডিশ বার্গম্যানের দর্শনকে বলা যায় ক্লোজ-আপ-এর দর্শন। ব্যর্গম্যানের দার্শনিক বিশ্বাস ছিল যে আধুনিক মানুষের আত্মা ঈশ্বর-বিচ্যুত, তাই যন্ত্রণাময় ও বিদীর্ণ। বার্গম্যানের **সাইলেন্স, ফেস্ টু ফেস্, পারসোনা, ক্রাইস্ এণ্ড লুইস্পারস্** ছবিগুলিতে ক্লোজ আপগুলি যেমন যন্ত্রণাবিদ্ধ আত্মা (soul)-এর প্রতীক হয়ে ওঠে।

এদেশে ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে নাটকীয় মুহূর্তগুলি নিকট দৃশ্যাংশ (close shot)-এর ব্যবহার অভূতপূর্ব আবেগের সঞ্চার করে। ঋত্বিক ঘটকের **মেঘে ঢাকা তারা** (১৯৫৯) ছবির একটি দৃশ্যে প্রধান চরিত্র নীতার মুখ একটি ক্লোজ শটে দেখা যায়, তার মাথা একটু পিছন দিকে হেলানো, চুলে মাথার উপর থেকে আলো পড়ে কয়েকটি উজ্জ্বল বিন্দু তৈরি হয়েছে। ঋত্বিক ঘটকের ছবির এই বিখ্যাত ক্লোজ শট-টি বহুল পরিচিত।

নিকট দৃশ্যাংশ (close shot) এবং মধ্যম-নিকট দৃশাংশ (med close shot)-এর ব্যবহার ঋত্বিক ও বার্গম্যানের **মেঘে ঢাকা তারা** (১৯৫৯) এবং **কোমল গান্ধার** (১৯৬১) ছবি দুটিতে বেশ কয়েকটি স্থানে অভিনেত্রী সুপ্রিয়া চৌধুরীর মুখমণ্ডল কাঁধের উপর থেকে ক্যামেরার সামনা-সামনি (frontally), ফ্রেমের ঠিক কেন্দ্রে দেখানো হয়েছে। তার মাথার পিছন দিক আলোকিত, দৃষ্টি প্রতিমার মত সামনে কিন্তু অনির্দিষ্ট দিকে। ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে এই ধরনের দৃশাংশ ও ইমেজ তাঁর প্রিয় মাতৃ-বিগ্রহের কথা দর্শককে মনে করিয়ে দেয়। একইভাবে বার্গম্যানের ছবিতেও অভিনেত্রী লিভ উলমান বা বিবি আণ্ডারসনের মুখমণ্ডলের 'বিগ্রহ-প্রতিম-নিকট দৃশ্যাংশ' (iconic close shot) অর্থবহ হয়ে উঠে বার বার।

ছ) ক্লোজ শটে সাধারনত মানুষের মুখমণ্ডল, শরীরের কোন একটি অঙ্গ বা কোন বস্তুর বড় প্রতিকৃতি পর্দায় দেখা যায়, কিন্তু বিগ-ক্লোজ শট বা অতি-নিকট দৃশ্যাংশে মুখমণ্ডলের কোন অংশ, কোন অঙ্গের বিশেষ প্রত্যঙ্গ বা বস্তুর বিশেষ অংশ প্রায় পর্দার সমস্ত অঞ্চল জুড়ে উপস্থাপিত হয়।

অতি-নিকট-দৃশ্যাংশ (big close shot)-এর বিশেষত্ব হল —

(i) মুখমণ্ডলের অংশ যেমন দুটি চোখ, বা অংশ বা প্রত্যঙ্গ যেমন, একটি বাহুর অংশ অর্থাৎ করতল ইত্যাদি পর্দায় দেখা যায়।

(ii) পর্দায় খুব বড় আকারে বস্তু, অঙ্গ বা মুখমণ্ডলের অংশের দৃশ্য দেখা যায়।

(iii) বিগ ক্লোজ শট পারিপার্শ্বিক থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দৃশ্যাংশ, অতি-নিকট-দৃশ্যাংশ (big close shot)-এর ব্যবহারের উপযোগীতাগুলি হল —

১. একটি অঙ্গের মধ্যেও কোন প্রত্যঙ্গের প্রতি দর্শকের দৃষ্টি করা। যেমন দুটি চোখের বিগ ক্লোজ শট। বা একটি করতলের অতি-নিকট দৃশ্যাংশ ইত্যাদি।

২. হঠাৎ বিগ-ক্লোজ শট ব্যবহার করলে দর্শকের মনে একধরনের অভিঘাত সৃষ্টি হয়।

৩. বিগ-ক্লোজ শট যেহেতু পারিপার্শ্বিক থেকে বিচ্ছিন্ন, তাই এই শট প্রায় কাহিনী নিরপেক্ষ, একধরনের পৃথক ইমেজ সৃষ্টি করে।

বিগ-ক্লোজ শট বা অতি-নিকট দৃশ্যাংশের উপরোক্ত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত চলচ্চিত্রকার ভি.আই. পুতভকিন ও আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রে। পুতভকিন-এর মাদার ( ) ছবিতে একটি কোর্টরুমের দৃশ্যে ঘরের দেওয়ালের কয়েকটি ক্লোজ শটের পর একজন সরকারি রক্ষীর মিলিটারি বুটের অতি-নিকট দৃশ্যাংশ (big close shot) পর্দায় দেখা যায়, যা আসলে বিপ্লবকে সরকারি যেমন **ব্যাটলসিপ পোটেমকিন** (১৯২৫) ছবিতে মুষ্টিবদ্ধ হাত, একটি চশমা বা দুটি আঘাত প্রাপ্ত চশমা পরিহিত চোখের বিগ ক্লোজ শট দেখা যায়। যে শটগুলি এককভাবেই এবং কাহিনী নিরপেক্ষভাবে যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করে।

গত শতাব্দির বিশ ও তিরিশের দশকের প্রথম দিকে ফরাসী চলচ্চিত্রে যে 'নতুন উদ্যম' দেখা যায়, তার থেকেই তৈরি হয়েছিল লুই বুনুয়েল-এর পরাবাস্তববাদী (surrealist) ছবি **আঁ সিন আন্দালু (এ্যান আন্দালুসিয়ান ডগ)**, ১৯২৭। এ ছবিতে একটি করতলের বিচ্ছিন্ন বিগ-ক্লোজ শট দেখা যায়, যেখানে হাতের তালুর মাঝে একটি ক্ষত থেকে বেশ কিছু কালো বড় পিঁপড়ে বেরিয়ে আসছে।

সত্যজিৎ রায়ের **গুপী গাইন বাঘা বাইন** (১৯৭) ছবিতে ভূতের রাজার বরে পাওয়া জাদু জুতো গোড়ার বিগ ক্লোজ শট আমরা দেখতে পাই। অথবা **সোনার কেল্লা** (১৯৭) ছবিতে ফেলুদার বিছানার উপর ভিলেন 'মন্দার বোস'-এর

ছেড়ে দেওয়া কাঁকড়াবিছের বিগ ক্লোজ শট দেখা যায়। ঋত্বিক ঘটকের **সুবর্ণরেখা** (১৯৬৫) ছবির শেষ দিকে আখ্যানের প্রধান নারীচরিত্র সীতার আত্মহত্যার ঠিক পরের শটটি হল তার একটি চোখের বিগ-ক্লোজ শট (সঙ্গে শব্দপথে 'হে রাম' ধ্বনী)।

উপরের অনুচ্ছেদগুলিতে শটের দূরত্ব ও ইমেজের আকৃতির উপর নির্ভর করে যে সব দৃশাংশগুলির কথা বলা হল, সেগুলি সবসময় যে প্রচলতি প্রথানুসারে ব্যবহার হবে সেরকম কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। বিভিন্ন পরিচালক তাঁদের নিজস্ব স্টাইল ও বিবেচনা অনুসারে, বিভিন্ন ধরনের দৃশাংশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকেন।

৮.৪ কম্পজিশন বা দৃশ্য-সংগঠন-এর উপদান সমূহ ও দৃশ্য-প্রতিমার আকৃতি

● দৃশ্য-সংগঠন (composition) কী?

মানুষের চোখের সামনে যে স্থান দৃশ্যমান হয় তা ত্রিমাত্রিক অর্থাৎ দৃশ্যমান স্থান বা বস্তুর-দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা এই তিনটি মাত্রাই খালি চোখে দেখা যায়। কিন্তু যখন দর্শক চলচ্চিত্র দেখেন তখন দৃশ্য পর্দায় প্রতিফলিত অবস্থায় দেখতে পান। পর্দার কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অর্থাৎ দুটি মাত্রা আছে, উচ্চতা নেই। অর্থাৎ চলচ্চিত্র দর্শন একটি দ্বিমাত্রিক পর্দায় ত্রিমাত্রিক বস্তু বা চরিত্রের ছবি দেখার অভিজ্ঞতা।

একটি দৃশ্য চলচ্চিত্রের দ্বিমাত্রিক পর্দায় যখন দেখানো হয় তখন 'মিজ-অঁ-সিন'-এর মধ্যে উপস্থিত থাকে বিবিধ বস্তু চরিত্র ও তাদের পারিপার্শ্বিক ইত্যাদি। মিজ-অঁ-সিনের মধ্যে এইসব বস্তু বা চরিত্রের গতিপ্রকৃতি, পারস্পরিক অবস্থান, দেহভঙ্গিমা, রং-এর ঐক্য বা পার্থক্য, জ্যামিতিক আকৃতিগত সংস্থান ও আলো-ছায়ার পার্থক্য প্রভৃতির মধ্যে যে জটিল দৃশ্যগত সম্পর্ক তৈরি হয় তাকে বলা হয় কম্পজিশন বা দৃশ্য-সংগঠন।

দু-একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিস্কার হবে। সের্গেই আইজেনস্টাইনের **জেনারেল লাইন** (১৯২৯) ছবিতে একটি দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে একজন কৃষক মহিলা এক ধনী চাষি (kulac)-র সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। কুলাকটির অবস্থান ক্যামেরার কাছে অর্থাৎ সম্মুখ ভূমি (foreground)-তে ক্যামেরার দিকে পিছন করে। মহিলাটির অবস্থান ক্যামেরা অপেক্ষাকৃত দূরে অর্থাৎ পশ্চাদভূমির (background)-তে ক্যামেরার দিকে মুখ করে ক্যমেরার কাছে ও সামনে থাকার জন্য মিজ-অঁ-সিনে কুলাকটির দেহ এমনভাবে ক্যামেরার দৃষ্টিকে আড়াল করেছে যে লোকটিকে চেহারার তুলনায় অতিরিক্ত মোটা লাগছে, তার বিশাল বপুর আড়ালে কৃষক মহিলাটিকে মনে হচ্ছে ক্ষুদ্র। এই যে ক্যামেরার কোন ও ক্যামেরার সামনে চরিত্র দুটির অবস্থানগত পার্থক্যের দ্বারা দৃশ্যে দুটি চরিত্রের চোহারার আকৃতিগত পার্থক্য ঘটে গেল, এটা একধরনের কম্পজিশন বা দৃশ-সংগঠন তৈরি করল যা একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে।

● ইমেজ সাইজ ও দৃশ্য সংগঠন

উপরোক্ত দৃশ্য-সংগঠনটিতে গুরুত্বপূর্ণ হল ইমেজ সাইজ (image size) বা দৃশ্য-প্রতিমার আকৃতি। পর্দায় দুটি চরিত্রের ইমেজ বা দৃশ্য-প্রতিমার মধ্যে একটি বড় ও অন্যটি ছোট। সাধারণত দৃশ্য-প্রতিমার আকৃতি নির্ভর করে প্রথমত, বাস্তব ক্ষেত্রে দুটি বস্তু বা চরিত্রের মধ্যে আকৃতির পার্থক্যের উপর এবং দ্বিতীয়ত, ক্যামেরার লেন্স থেকে বস্তু বা চরিত্রের দুরত্বের উপর। পূর্বোক্ত উদাহরণ থেকে আমরা দেখলাম মিজ-অঁ-সিনের সম্মুখভাগ অবস্থিত বস্তু বা চরিত্রের দৃশ্য-প্রতিমা অপেক্ষাকৃত বড় এবং পশ্চাৎভাগে অবস্থিত বস্তু বা চরিত্রের দৃশ্য-প্রতিমার আকৃতি (image size) অপেক্ষাকৃত ছোট হয়।

আবার ধরা যাক প্রখ্যাত ডেনিশ চলচ্চিত্র পরিচালক কার্ল ড্রায়ার-এর বহু আলোচিত **প্যাশন অব্ জোয়ান অব আর্ক** (১৯২৮) ছবিতে জোয়ান নামের এক প্রতিবাদী ঐতিহাসিক চরিত্রকে শাস্তি দিচ্ছেন চার্চের নিয়মকর্তারা। ড্রায়ার জোয়ানের মুখটিকে ক্লোজ-আপে দেখাচ্ছেন। মেয়েটির মাথা এক দিকে হেলে আছে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর-মত, মাথার পিছনে জ্যোতির্বলয়ের মত একটি আলোর বৃত্ত সৃষ্টি করেছেন পরিচালক। জোয়ানের মাথায় মৃত্যুভূমিতে যিশুর মাথার কাঁটার মুকুটের মত একটি বস্তু রয়েছে। মেয়েটির গোলাকার মুখে যন্ত্রণা ও ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। এই বিশেষ অবস্থায় পর্দায় জুড়ে যে মুখমণ্ডল দেখছি তাও একধরনের কম্পজিশন (composition) বা দৃশ্য-সংগঠন।

দৃশ্য-সংগঠনের ভিতর দৃশ্য-প্রতিমার আকৃতি (image size)-র বিষয়টিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ক্লোজ-আপ বা ক্লোজ শটে বস্তু বা চরিত্রের শরীরের বিশেষ অংশ, যেমন পূর্বোক্ত উদাহরণের ক্ষেত্রে জোয়ানের ক্লোজ আপ, পর্দায় বড় করে দেখা যায়। আবার লং শটের ক্ষেত্রে চরিত্র বা বস্তুর সম্পূর্ণ অংশ অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ ইমেজ বা দৃশ্য-প্রতিমা দেখা যায়।

● দৃশ্য-সংগঠনের উপদানসমূহ

চলচ্চিত্রে একটি দৃশ্যাংশ (shot) বা একটি মিজ-অঁ-সিন যে সব প্রধান সংগঠনগত বিষয়গুলি (compositional elements) দ্বারা গঠিত সেগুলি নিম্নরূপ :

১. দৃশ্য-প্রতিমার আকৃতি (image size)।
২. বস্তু বা চরিত্রগুলির পারস্পরিক দূরত্ব (distances among objects or characters)।
৩. দৃশ্য-সংগঠনের দৃশ্যগত কেন্দ্রিকতা (centering of the visual configurection)।
৪. দৃশ্য-সংগঠনের 'প্রধান আকর্ষক' বস্তু বা চরিত্র (dominant in of the visual composition)।
৫. বস্তু বা চরিত্রগুলির গতি ও চলমান (movements of the object & characters)।
৬. বস্তু সংস্থানের 'স্থানিক সামঞ্জস্য' ও 'অনুপুঙ্খ বর্ণনা' (spatial symmetry & details)।
৭. দৃশ্য-সংগঠনের উপস্থিত রং, রেখা, ও ঢল-এর বৈচিত্র্য (colour, lines & texture in a composition)।
৮. বস্তু সংস্থানের আকৃতি বা চরিত্রগুলির অবস্থানের জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য (geometric shapes of objects & configuration of character placement)।
৯. দৃশ্য-সংগঠনের বস্তু/চরিত্রের অবস্থানগত বা দৃশ্যগত ভারসাম্য (balance of statics in a composition)।
১০. আলোর ঔজ্জ্বল্যের বৈপরীত্য বা ঐক্য (degree of contrast in a composition)।

১. **দৃশ্য-প্রতিমার আকৃতি ঃ-** উপরোল্লিখিত **জেনারেল লাইন** ও **প্যাশন অব জোয়ান অব আর্ক** ছবি দুটির ক্ষেত্রে দৃশ্য-প্রতিমায় বিভিন্ন বস্তু বা চরিত্রগুলির আপেক্ষিক আকৃতি কিভাবে দৃশ্য-সংগঠনকে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায় বিখ্যাত সুইডিশ চলচ্চিত্রকার ইঙ্গমার বার্গম্যান-এর ছবিতে বা এদেশের ঋত্বিক ঘটকের ছবির দৃশ্য সংগঠনের ক্ষেত্রে ক্লোজ শট-এ ধরা মুখমণ্ডলের পর্দা-জোড়া দৃশ্য প্রতিমা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার জাপানী চিত্র পরিচালক মিজোগুচি-র ছবির ক্ষেত্রে বা সত্যজিৎ রায়ের অপুত্রয়ী ছবিগুলির ক্ষেত্রে এক্সট্রিম লং বা লং শটে ধরা বিস্তীর্ণ পারিপার্শ্বিকের মাঝে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র স্থান নিয়ে চরিত্রগুলির পূর্ণ আকৃতির শরীরের প্রতিমাগুলি দৃশ্য-সংগঠনকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

২. **বস্তু/চরিত্রগুলির পারস্পরিক দূরত্ব ঃ-** দৃশ্য-সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ছবির মিজ-অঁ-সিন-এ উপস্থিত বিভিন্ন বস্তু/চরিত্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব ও অবস্থান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ-স্বরূপ, সত্যজিৎ রায়ের **অপুর সংসার** (১৯৫৯) ছবির একটি দৃশ্যে অপু ও তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু পুলু পাশাপাশি হাঁটছে। দুই বন্ধুর মধ্যে দৃশ্যগত ও শারিরীক নৈকট্য স্বাভাবিক। একইভাবে বলা যায়, এই ছবিতে অপু ও তার নববিবাহিত স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক দুজনকে নিয়ে তৈরি কম্পজিশনে চরিত্র দুটির নিকট অবস্থান থেকে প্রকাশ পায়।

আবার যখন ঐ একই ছবিতে আমরা দেখি অপু চাকরীর সন্ধানে এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে গেছে। সেখান নিশ্চয় দৃশ্য-সংগঠনে চাকুরীদাতা ও চাকুরীপ্রার্থির মধ্যে শারিরীক দূরত্ব থাকবে।

দৃশ্য-সংগঠনে চরিত্রগুলির মধ্যে নৈকট্য ও দূরত্ব তাদের মধ্যে আবেগ ও মানসিক দূরত্ব প্রকাশ করে থাকে। বার্গম্যানের **সাইলেন্স** (১৯৬০) ছবির একটি দৃশ্যে তিনটি প্রধান চরিত্রকে দেখা যাচ্ছে, একজন, তার নাম এস্তার, যে ক্যামেরার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখমণ্ডল দেখা যাচ্ছে, খুব উজ্জ্বল আলো পড়েছে তার মুখে। তার পিছনে ঘরের একপ্রান্তে বালক জোহান বসে আছে। ডিপ ফোকাসে দূরে অন্য একটি ঘরের খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে এস্টারের বোন ও যোহানের মা অ্যালা বসে আছে। যোহান ও অ্যানার উপরেও একফালি তীব্র আলো পড়েছে। এই দৃশ্য-সংগঠনে তিনটি চরিত্রের মানসিক দূরত্বকে প্রকাশ করেছে তাদের শারিরীক দূরত্ব।

৩. **দৃশ্য-সংগঠনের কেন্দ্রিকতা ঃ-** কম্পজিশনের ক্ষেত্রে ফ্রেমকে মোটামুটি তিনটি অংশে ভাগ করা যায়, মধ্যভাগ (centre), বাম অংশ এবং দক্ষিণ অংশ। প্রথানুযায়ী, মধ্যভাগ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ কারণ যেখানে দর্শকের দৃষ্টি কেন্দ্রিভূত হয়। সাধারণত প্রথা মেনে প্রধান বস্তু বা চরিত্রকে ফ্রেমের মধ্যভাগে স্থান দেওয়া হয়। হলিউড ছবি সাধারণত কেন্দ্রিকতার নিয়ম মেনে চলে। হলিউডের বিখ্যাত পরিচালক জন ফোর্ড-এর **স্টেজকোচ**, **দি সার্টার্স** প্রভৃতি 'ওয়েস্টার্ন গোত্র (western genre)-এর ছবিগুলি ছিল মার্কিন-মেক্সিকো সীমান্তের বিস্তীর্ণ ফাঁকা অঞ্চলে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ানো নায়কের কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে তৈরি। জন ফোর্ডের 'ওয়েস্টার্ন গোত্রের এই ছবিগুলিতে প্রায়ই ছবির নায়ক হলিউডের অভিনেতা জন ওয়েনকে একটু লো-এঙ্গেল ক্যামেরায় ফ্রেমের কেন্দ্রে দেখা যায়।

কখনো কখনো কেন্দ্রে কোন চরিত্রকে না রেখে ফ্রেমের ডান ও বাম অংশে দুটি চরিত্রকে রাখা হয় এবং দুই চরিত্রের মাঝে কোন বস্তু রেখে দৃশ্য-সংগঠনে কেন্দ্রিকতার সৃষ্টি করা হয়। যেমন, একটি টেবিলের দু-পাশে দুজন চরিত্র বসে আছে। সাধারণত টেবিলের উপর কোন বস্তু যেমন ফুলদানী বা গেলাস/বোতল ইত্যাদি রেখে মাঝের শূন্যস্থান পূরণ করে কেন্দ্রিকতা সৃষ্টি করা হয়।

ফরাসী চলচ্চিত্রকার ও প্রথাবিরুদ্ধ আঙ্গিকের অন্যতম স্রষ্টা জঁ লুক গোদারের ছবির দৃশ্য-সংগঠনে কেন্দ্রিকতা একটু অন্যরকমভাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন, তাঁর **লা সিনোয়া** (১৯৬৯) ছবির একটি দৃশ্যে চিন বিপ্লবের প্রতীক 'রেড বুক' থরে থরে সাজিয়ে তৈরি দূর্গের মত একটি অস্থায়ী কাঠামোর কেন্দ্রে দেখা যায় বন্দুক তাক করে একটি চরিত্রের মুখ। গোদারের ছবিতে মাঝেমাঝেই সমতল (flat) কোন দেওয়ালের সামনে দাঁড়ানো চরিত্রের মুখমণ্ডলের ক্লোজ-আপ দেখা যায়। সাধারণত দেওয়ালে কিছু ছবি বা বিজ্ঞাপন ইত্যাদি আঁকা থাকে। এক্ষেত্রে যে দৃশ্য-সংগঠনটি তৈরি হয় তাতে মনে হয় দেওয়ালটি যেন ক্যানভাস, এবং মুখমণ্ডল যেন ক্যানভাসের ছবির কেন্দ্রিয় অংশ।

৪. **দৃশ্য-সংগঠনের 'প্রধান আকর্ষক' বস্তু বা চরিত্র ঃ-** একটি কম্পজিশন বা দৃশ্য-সংগঠন সমান ভাবা হয় তখন 'প্রধান আকর্ষক' বস্তু/চরিত্র (dominant)-টিকে একটু বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। সাধারণত প্রধান বস্তু/চরিত্র-কে হলিউড ছবি ফ্রেমের কেন্দ্রে স্থান দেয় এবং তার উপর সুষম আলো ফেলে বস্তু বা চরিত্রকে উদ্ভাসিত করে। এই প্রধান বস্তু/চরিত্র দর্শককে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে। হলিউড ছবি বা সাধারণ বাণিজ্যিক ও বাস্তববাদী ছবির ক্ষেত্রে ফ্রেমে নায়ক বা নায়িকা উপস্থিত থাকলে তাদের 'প্রধান চরিত্র' (dominant) হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সোভিয়েত চলচ্চিত্রের প্রবাদপুরুষ সের্গেই আইজেনস্টাইন-এর **আইভান দ্য টেরিবল পর্ব ১** (১৯৪৪) ছবির প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় জার বা রাজা আইভাল-এর অভিষেক হচ্ছে। দৃশ্যে আরও অনেকগুলি চরিত্র রয়েছে। কিন্তু রাজকীয় পোষাক ও আচরণের একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এই দৃশ্য-সংগঠনের 'প্রধান চরিত্র' (dominant) হল আইভান। আবার এ ছবিরই অন্য একটি দৃশ্যাংশ (shot)-এ দেখা যায় একদল ক্ষিপ্ত কৃষক জারের অভিষেকে ক্ষুব্ধ, তারা আইভানকে আক্রমণ করতে উদ্যত। এই দৃশ্য-সংগঠনে প্রধান চরিত্র হল ক্ষুব্ধ কৃষক দলের নেতাটি যে আইভানকে আক্রমণে উদ্যত হয়।

ফিল্ম যেহেতু চলমান চিত্র তাই একটি দৃশ্যাংশ (shot)-এর মধ্যেই 'প্রধান আকর্ষক' (dominant) পরিবর্তন হতে পারে। যেমন, হলিউডের ব্রিটিশ চলচ্চিত্রকার ও রহস্য ছবির স্রষ্টা আলিফ্রেড হিচকক-এর **সাইকো** (১৯৬০) ছবিতে একটি দৃশ্যে অন্যতম প্রধান চরিত্র মারিয়ান স্নান ঘরে ঝর্ণা কলের জলে স্নান করছে — এখানে প্রধান আকর্ষক (dominant) হল মারিয়ান। তার পিছনের সাটিনের পাতলা পর্দার ওপাশে মুহূর্তে মারিয়ানের পরিবর্তে কম্পজিশনে প্রধান আকর্ষক (dominant) হয়ে ওঠে আততায়ীর ঐ ছায়া।

৫. **বস্তু ও চরিত্রগুলির গতি স্থিতি ও চলমান ঃ-** গতি ও চলাচল কম্পজিশন বা দৃশ্য-সংগঠনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সত্যজিৎ রায়ের **চারুলতা** (১৯৬৫) ছবির একটি বিখ্যাত দৃশ্যাংশে দেখা যায় নায়িকা চারু বাগানের একটি দোলনায় বসে দুলছে। ক্যামেরা চারুকে মিড ক্লোজ শটে দেখায়। দোলানের নিয়ম মেনে চারুর মুখ একসময় ক্যামেরার কাছে আসে আবার পিছিয়ে যায়। এই দৃশ্য-সংগঠনে চারুর গতিবিধি তার মনের দোদুল্যমান অবস্থার প্রকাশ করে।

ফরাসী নব-তরঙ্গের চলচ্চিত্রকার ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো-র **ফোর হানড্রেড ব্লোস্** ছবির শেষ দৃশ্যের কথা এ প্রসঙ্গে বলা যায়। সংশোধনাগার থেকে পালিয়ে ছুটতে থাকে বালক আঁতোয়ান দোয়ানেল। হঠাৎ সে সামনে দেখে সমুদ্র, সামনে পালাবার আর পথ নেই। আমরা দেখি, সমুদ্রকে পশ্চাৎপটে রেখে সে ক্যামেরার দিকে হেঁটে আসছে। তার গতিতে শ্রান্তির ছাপ, তারপরই ফ্রিজ হয়ে যায় বালকটির গতি। একটি ফ্রিজ শটে ধরা থাকে আতোঁয়ান দোয়ানেলের চিরস্থির মুখ।

৬. **বস্তু সংস্থানের স্থানিক সামঞ্জস্য ও সবিশেষ বর্ণনা (spatial symmetry & details) ঃ-** একটি মিজ-অঁ-সিনকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয় — মধ্যভাগ, বামভাগ ও ডানভাগ। দৃশ্য-সংগঠনের সময় লক্ষ্য রাখতে হয় যে কোন অংশ যেন অকারণ ফাঁকা না লাগে। অর্থাৎ ঘরের চেয়ারে বসে পড়ছে এরকম একটি চরিত্রকে যদি মিজ-অঁ-সিনের মধ্যভাগ (centre)-এ রাখা হয়, তাহলে দেখতে হবে চরিত্রটির ডান বা বাঁ পাশ যেন খালি না থাকে। সেখানে আলমারী, অন্যটেবিল, আসবার প্রভৃতি রাখতে হবে, যাতে চরিত্রটি চারপাশ ফাকা না লাগে। অনেক সময় মিজ-অঁ-সিনের একদিকে বস্তুর বাহুল্য হয়ে যায়, অন্যপাশে প্রায় ফাঁকা থেকে যায়। এক্ষেত্রেও দৃশ্য-সংগঠনে বহু সংস্থানের স্থানিক সামঞ্জস্য (spatial symmetry) ব্যহত হয়। সুতরাং, প্রথানুযায়ী একটি দৃশ্য সংগঠনের ক্ষেত্রে ফ্রেমে উপস্থিত বস্তু/ চরিত্রগুলির মিজ-অঁ-সিনে সুষমভাবে বন্টন হওয়া দরকার।

চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সুচিন্তিত দৃশ্য-সংগঠনের ও সবিশেষ বর্ণনা (details)-এর দর্শকের কাছে যেমন বিভিন্ন তথ্য পৌঁছে দেওয়া যায়, তেমনি মিজ-অঁ-সিনকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলা যায়। যেমন একটি দৃশ্য-সংগঠনে **পথের পাঁচালি** ছবিতে দেখা যায়, বাঁশ গাছে হেলান দিয়ে ইন্দির ঠাকরুন মারা গেছে। দুর্গা যে মুহূর্তে সামান্য ধাক্কা দেয়, প্রাণহীন দেহ মাটিতে পড়ে যায়। দেহের ধাক্কায় ইন্দিরার ঘটিটি গড়াতে থাকে। ক্যামেরা তাকে অনুসরণ করে, ঘটিটি গড়িয়ে জলে পড়ে যায়। এই ডিটেল বা বিশদ বিবরণ মৃত্যুকে দৃশ্য-শ্রাব্য ভাষায় প্রকাশ করেছে।

ডিটেল বা বিশদ বিবরণ যে কিভাবে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করতে পারে তার উদাহরণে বলা যায়, ধরাযাক এক ব্যক্তি বাড়িতে পরার সাধারণ পোষাক পরে একটি ঘরে বসে আছে, তার সামনে টেবিলের উপর বিভিন্ন আকৃতির তুলি এবং তার পিছনে কয়েকটি ক্যানভাস স্টাণ্ডের সাহায্যে দাঁড় করানো, বোঝা যাবে ব্যক্তিটি একজন চিত্রশিল্পী যিনি ছবি আঁকেন। এই যে বিভিন্ন বস্তু অর্থাৎ তুলি, ক্যানভাস, ব্যক্তিটির পোষাক ইত্যাদির সাহায্যে ব্যক্তিটির সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা গেল, তাই হল সবিশেষ বর্ণনা (details)-এর ফল। আবার যদি দেখানো যায় ক্যানভাসগুলির বেশিরভাগ ছবির বিষয় নিসর্গদৃশ্য। তবে বুঝতে হবে যে ঐ চিত্রশিল্পী নিসর্গদৃশ্য আঁকতে পছন্দ করেন।

সবিশেষ বর্ণনা (detail) অনেক সময় ছবিকে আরও বাস্তববাদী করে তোলে। **পথের পাঁচালী** (১৯৫৫) ছবিতে গ্রাম বাংলার সবিশেষ বর্ণনা অথবা **অপরাজিত** (১৯৫৯) ছবিতে বারানসী/কাশী-র দৃশ্যাবলীতে ঐ শহরের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের ডিটেল আরও বস্তবাদী করে তুলেছে।

৭. **কম্পজিশনে 'রং, রেখা ও তল' (colour, lines & texture)-এর বৈচিত্র ঃ-** আধুনিক চলচ্চিত্রে দৃশ্য-সংগঠনে রং, রেখা ও তলের বৈচিত্র্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। নব-বাস্তববাদ পরবর্তি যুগের ইটালীয় চলচ্চিত্রকার মাইকেল এঞ্জেলা আন্তোনিওনি-র **রেড ডেজার্ট** (১৯৬৪) ছবিতে বেশিরভাগ দৃশ্য-সংগঠনে লাল রং-কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কোথাও কোথাও লাল ও ধুসর বর্ণের বৈপরীত্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ছবিতে উজ্জ্বল বর্ণ যদি হয় আবেগ, কামনা, জীবনবোধ ও মুক্তির প্রতীক, তবে ধুসর বর্ণ যন্ত্র-সভ্যতায় মানুষের বন্দিত্বের প্রতীক।

আবার জঁ লুক গোদার-এর **লা পিনোয়া** (১৯৬৭) ছবিতে লাল বর্ণের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। এ ছবির বিষয়ের সঙ্গে চিনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্পর্ক আছে। এখানে লাল রং হল বিপ্লবের প্রতীক। এভাবে দৃশ্য-সংগঠনে রঙের ব্যবহারকে অর্থবহ করে তোলা যায়।

রঙের মতই রেখা (lines) ও কম্পজিশনের দ্রষ্টব্য বিষয় হতে পারে। হলিউডের ছবি, উডি এ্যালানের **ম্যানহাটন** (১৯৭৯)-এর একটি দৃশ্য-সংগঠনের কথা বলা যেতে পারে। একটি এক্সট্রিম লং শটের কম্পজিশনে দেখা যাচ্ছে নিউইয়র্ক শহরের একটি নদীর উপরের একটি সেতুর নিচে রেলিঙ ঘেরা পার্কের বেঞ্চে বসে আছে একটি মেয়ে ও একটি ছেলে। এদের মাথার উপরে ঝুলন্ত ক্যান্টিলিভার ব্রিজের কড়িবরগার বিশাল রৈখিক জটিলতা, পাশে দেখা যাচ্ছে অর্ধবৃত্তাকার বা আর্চ আকৃতির স্তুপের রৈখিক আভাস, তাদের পিছনে পার্কের আয়তাকার রেলিঙের রৈখিক বিন্যাস। এই দৃশ্য-সংগঠনে অজস্র রেখার জালের মধ্যে যেন অবস্থান করে দুটি চরিত্র।

রেখার-বৈচিত্র্যের মত তলের বৈচিত্র্যও কম্পজিশনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও বিচার্য বিষয় হতে পারে। সোভিয়েত চলচ্চিত্রকার সের্গেই আইজেনস্টাইনের **ব্যাটলশিপ পোটেমকিন** (১৯২৫) ছবির বিখ্যাত 'ওডেসা সিঁড়ি'র দৃশ্যের কথা বলা যায়। বিশাল পরিসরে ব্যাপ্ত অনেকগুলি ধাপযুক্ত সিঁড়ির উপরের ধাপে দাঁড়িয়ে আছে রাইফেল হাতে ঘাতক সৈন্যরা। সিঁড়ির তলগুলিতে ইতস্তত পড়ে আছে সৈন্যদের গুলিতে আহত বা নিহত অজস্র সাধারন মানুষের দেহ। এক মহিলা তাঁর আহত শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে সিঁড়ির কয়েক ধাপ নিচে সৈন্যদের সামনে দাঁড়িয়ে। সৈন্য ও মহিলার মাঝে অজস্র সিঁড়ির ধাপ, যেগুলি বিভিন্ন তল রচনা করেছে, যে তলগুলিতে পড়ে আছে মানুষের নিথর দেহগুলি। তলের বৈচিত্র্য এই দৃশ্য-সংগঠনের অন্যতম স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য।

৮. **কম্পজিশনে বস্তু-সংস্থানের জ্যামিতিক আকৃতি (geometric shope)-গত বৈশিষ্ট্য ঃ-** বস্তু বা চরিত্রগুলির মধ্যে জ্যামিতিক আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অনেকক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। উপরোক্ত আইজেনস্টাইনের ছবির 'ওডেসা স্টেপ্‌স' দৃশ্যে সমান্তরাল সিঁড়ির ধাপগুলির বিরুদ্ধে শিশুকোলে দণ্ডয়মান মায়ের উলম্ব অবস্থান কম্পজিশনে একধরনের জ্যামিতিক সংহতি ও বৈপরিত্য তৈরি করে। **ব্যাটলশিপ পোটেমকিন** (১৯২৫) ছবিটির অন্যতম একটি দৃশ্যে দেখা যায় ছাতা মাথায় একজন মহিলা। আইজেনস্টাইনের নিজের তত্ত্ব অনুসারে দেখলে বলা যায় ছাতার আর্চ বা অর্ধবৃত্তকার আকৃতি ও মহিলার উলম্ব দেহ, একধরনের জ্যামিতিক দৃশ্য-সংগঠন তৈরি করে।

কেবলমাত্র বস্তু নয়, চরিত্রগুলির পারস্পরিক অবস্থানের দ্বারাও একধরনের জ্যামিতিক দৃশ্য-সংগঠন জন্ম নিতে পারে। যেমন, **চারুলতা** ছবিতে চারু-অমল-মন্দা এবং চারু-অমল-ভূপতি এই ত্রিভূজগুলি কম্পজিশনে বারবার ফিরে আসে। এ ধরনের ত্রিভুজ দৃশ্য-সংগঠন ফ্রাঁসোয়া ত্রুফোর **জ্যুলে ও জিম** ছবির প্রধান তিনটি চরিত্রের ক্ষেত্রেও দেখা যায়।

৯. **দৃশ্য সংগঠনের দৃশ্যগত ভারসাম্য (balance of composition) ঃ-** কম্পজিশনে একধরনের দৃশ্যগত ভারসাম্য সৃষ্টি করার প্রথা রয়েছে। যেমন, কেন্দ্রিয় চরিত্রের চারপাশে বস্তুসমূহ এমনভাবে সজ্জিত থাকে যেন একটি সুষম দৃশ্য পাওয়া যায়। অর্থাৎ একধরনের ভারসাম্য থাকে। অথবা একটি মিজ-অঁ-সিনে হয়ত দেখা যাচ্ছে একটি চিত্রপট দেওয়ালে ঝোলানো রয়েছে। এক্ষেত্রে যদি চিত্রপট বাঁকাভাবে দেওয়ালে ঝোলে তবে প্রথাগতভাবে দৃশ্য-সংগঠনের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে বলা হবে।

সাধারনত যখন লং শটে নিসর্গ দেখানো হয়, তখন দিগন্তে ভূমিরেখার উপরে আকাশের অংশ একটু বেশি স্থান

জুড়ে থাকে। এখন রবার্ট ফ্ল্যাজার্টির তথ্যচিত্র **ম্যান অব অ্যারানি ছবিতে** বারবার দেখা যায়, দৃশ্য-সংগঠনে দিগন্তরেখা ফ্রেমের এতটা উঁচুতে উঠে গেছে যে আকাশের অংশ কমই দেখা যাচ্ছে। বরং উত্তাল সমুদ্রের অংশই কম্পজিশনে বেশি স্থান ঝুড়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রথানুসারে, দৃশ্যগত ভারসাম্য নষ্ট করা হচ্ছে। কারণ ফ্ল্যাজার্টি সুন্দর নিসর্গের চেয়ে উত্তাল সমুদ্রে জেলেদের জীবন সংগ্রামের কঠোরতা দেখানোর বিষয়টিকে কম্পজিশনে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

আইজেনস্টাইন **অক্টোবর** (১৯২৮) ছবিতে একটি অদ্ভুত দৃশ্য-সংগঠন নির্মাণ করেছেন যা দৃশ্যগত ভারসাম্যের প্রথাগত ধারণাকে নষ্ট করে অন্যধরনের অনুভূতির জন্ম দেয়। দেখা যাচ্ছে একটি লিভার যন্ত্রের দ্বারা টেনে উপরে তুলে নেওয়া একটি কাঠের সেতুর উঁচু মাথায় একটি বিশাল আকৃতির ঘোড়ার মৃতদেহ ঝুলছে। অনেক উঁচুতে আকাশের পশ্চাদপটে ঝুলন্ত বিরাট ঘোড়ার মৃতদেহের অবস্থানগত ভারসাম্যহীনতা (যেকোন মুহূর্তে নিচে জলে পড়তে পারে) কম্পজিশন বা দৃশ্য-সংগঠনে দর্শকমনে একধরনের বিস্ময় বোধের সৃষ্টি করে।

১০. **উজ্জ্বল্যের বৈপরীত্য বা ঐক্য (contrast or flatness of light)** ঃ- সাধারণত হলিউড বা সাধারণ বাণিজ্যিক ছবির কম্পজিশনে সুষম আলো থাকে। এছাড়া এসব ছবিতে নায়ক বা নায়িকার মুখে সর্বদা উজ্জ্বল আলো ফেলা হয়। তবে অনেকক্ষেত্রেই, যেমন জার্মান প্রকাশবাদী (expressionist) ছবির ক্ষেত্রে দেখা যায় চরিত্রের উপর বা মিজ-অঁ-সিনে উপস্থাপিত স্থান (space)-এ আলো-ছায়ার বৈপরীত্য, যা একধরনের অন্তর্মুখীনতা ও ভাবজগৎ-কে দৃশ্যে প্রকাশ করে।

বার্গম্যানের ছবিতে উজ্জ্বল্যের বৈপরীত্য ও চরিত্রগুলির উপর তীব্র ও আলোর ব্যবহারের ফলে সাধারণ বাস্তববাদী উপস্থাপনার পরিবর্তে দৃশ্য-সংগঠনে একপ্রকার মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান প্রকাশ পায়। পূর্বে উল্লিখিত বার্গম্যানের **সাইলেন্স** (১৯৬০) ছবির উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

● দৃশ্য-সংগঠন (composition)-এর ভূমিকা

উপরে যে দশটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হল কম্পজিশন বা দৃশ্য-সংগঠন হল এগুলির ফলাফল। বিভিন্ন বিষয়ের সমাহার বলে কম্পজিশন বা দৃশ্য-সংগঠনের পরিকল্পনা চলচ্চিত্রের একটি জটিল নির্মাণ।

একটি কম্পজিশনে যখন বেশ কয়েকটি বস্তু বা চরিত্রকে এক জায়গায় দেখা যায়, তখন প্রতিটি বস্তুকে আলাদাভাবে দেখলে যে অর্থ সৃষ্টি হত এখানে তার থেকেও গভীর বা জটিল অর্থ তৈরি হয়। স্বাভাবিকভাবেই চলচ্চিত্রের পর্দায় একটি কম্পজিশন কেবলমাত্র ইনফরমেশন বা তথ্যই দর্শকের কাছে সরবরাহ করে না, উপরন্তু এ ধরনের দৃশ্যগত তাৎপর্য তৈরি করে।

আধুনিক চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র দৃশ্যাংশই নয়, শব্দকেও কম্পজিশন বা দৃশ্য-সংগঠনের অন্যতম উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কারণ সংলাপ, আবহসঙ্গীত, অন্যান্য পারিপার্শ্বিক শব্দ বা বিশেষ শব্দ (special sound) দৃশ্য-সংগঠনকে তাৎপর্যময় করে তুলতে পারে।

কম্পজিশন বা দৃশ্য-সংগঠন বলতে তাহলে চলচ্চিত্রের দৃশ্য ও শ্রাব্য গঠনের সমস্ত উপাদানগুলির সমন্বয় বোঝায়। একজন পরিচালক কি অর্থ বোঝাতে কি ধরনের কম্পজিশন তৈরি করবেন তা একেবারে তাঁর নিজস্ব ভাবনা। তবে একথা বলা যায়, কম্পজিশন বা দৃশ্য-সংগঠনের সঙ্গে শিল্পীর পছন্দসই আঙ্গিক (form) ও ফিল্মটির বিষয় (content) উভয়েরই সম্পর্ক বর্তমান। অর্থাৎ ধরা যাক বিপ্লবী কার্যকলাপ যদি সাধারন বিষয় (content) হয়, তাহলেও দুজন পরিচালক ধরা যাক আইজেনস্টাইন ও গোদারের কম্পজিশন হবে ভিন্ন।

তবে সাধারনত ধরে নেওয়া হয়, সফল ও বিশিষ্ট কম্পজিশন বা দৃশ্য-সংগঠন প্রথমত ঃ আগ্রহ, রহস্য ও সৌন্দর্যের খোরাক জোগায়। দ্বিতীয়তঃ তাতে থাকে উপাদান ও আখ্যানের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের সম্পর্কের আভাস এবং তৃতীয়ত একটি দৃশ্য-সংগঠনে উপস্থিত সমস্ত বস্তু ও চরিত্র মিলে কেবল মাত্র কিছু তথ্যই সরবরাহ করে না, কিছু তাৎপর্যও সৃষ্টি করে।

একটি ফিল্মের দৃশ্যাংশের কম্পজিশন বা দৃশ্যসংগঠন হতে পারে সরল যা কেবলমাত্র গল্প ও আখ্যানটির প্রয়োজন মেটায়। আবার দৃশ্য-সংগঠন জটিল হতে পারে যাতে করে গল্প বলা ছাড়াও আরও কিছু তথ্য, আরও কিছু চিন্তার খোরাক দর্শকের কাছে সরবরাহ করতে চান পরিচালক।

৮.৫ ক্যামেরার অবস্থান ও ক্যামেরা কোণ

● ক্যামেরার অবস্থান ও দর্শকের দৃষ্টিকোণ

যে বস্তু/চরিত্র বা স্থানের চিত্রগ্রহণ করা হয় তার সাপেক্ষে ক্যামেরার বিভিন্ন অবস্থানের জন্য ঐ বস্তু /চরিত্র বা স্থানকে দেখার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ (angle of view) গড়ে ওঠে। যেহেতু পর্দায় যখন ছবি দেখা যায় তখন দর্শকের দৃষ্টি ক্যামেরার দৃষ্টিকেই অনুসরণ করে তাই একথা বলা যায় যে বস্তু/চরিত্র বা স্থানের সাপেক্ষে ক্যামেরার বিভিন্ন অবস্থানের জন্য দর্শকের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ তৈরি হয়।

চলচ্চিত্রে ক্যামেরার অবস্থান নির্ভর করে পরিচালকের বিবেচনার উপর। কোন চরিত্রের ছবি কোন কোন (angle) থেকে গ্রহণ করতে চাইছেন পরিচালক, তার উপর নির্ভর করে ক্যামেরার অবস্থান নির্দিষ্ট করা হয়। ক্যামেরার অবস্থান কোথায় হবে বা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে ক্যামেরা ছবি তুলবে তার কোন নির্দিষ্ট ব্যাকরণ চলচ্চিত্রে নেই। সুতরাং একথা বলা যায় যে, যে বস্তু/চরিত্র বা স্থানের ছবি তোলা হচ্ছে তার সাপেক্ষে ক্যামেরার অবস্থান বা দৃষ্টিকোণ সূক্ষ্ম অর্থে অসংখ্য হতে পারে। তবে বৃহত্তর দৃষ্টিতে দেখলে বস্তু/চরিত্র-এর সে রকম দৃশ্য আমরা দেখছি তার উপর নির্ভর করে মোটামুটি বহুলভাবে ব্যবহৃত কয়েক ধরনের ক্যামেরা অবস্থান ও ক্যামেরা কোণের কথা ধরে নেওয়া যেতে পারে।

● ক্যামেরার সমান্তরাল কোণসমূহ

বস্তু/চরিত্র-কে যদি দর্শক একেবারে মুখোমুখি দেখেন তবে ক্যামেরার সেই অবস্থানের ফলে সোজা দৃষ্টিকোণ বা ফ্রন্টাল ভিউ (frontal view) পাওয়া যায়। এই ধরনের দৃষ্টিকোণ পেতে গেলে চরিত্রের একেবারে মুখোমুখি ক্যামেরা বসাতে হবে। সাধারণত বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া এধরনের ফ্রন্টাল ভিউ বা সোজা দৃষ্টিকোণ কাহিনীচিত্রে এড়িয়ে যাওয়া হয়। তবে আইকনিক শট (iconic shot) (অর্থাৎ বিগ্রহ-দর্শনের মত দর্শক ও দর্শনের বিষয় অর্থাৎ কোন বস্তু/চরিত্র সামনা-সামনি দাঁড়ালে)-এর ক্ষেত্রে এ ধরনের ক্যামেরা অবস্থান ও দৃষ্টিকোণ তৈরি করা হয়ে থাকে। ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে সাধারণত এই ধরনের ক্যামেরা অবস্থানের ফলে মাতৃপ্রতিমা-র অনুরূপ ইমেজ তৈরি হয়। তাঁর **মেঘে ঢাকা তারা** ছবির নীতা বা **কোমল গান্ধার** ছবির অনুসূয়া-কে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে এভাবে ফ্রন্টাল ও আইকনিক দৃষ্টিকোণে ধরা হয়েছে।

বার্গম্যানের ছবিতেও চরিত্রের অন্তরের গূঢ় আবেগ ও যন্ত্রণা প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে এরকম আইকণিক ইমেজ তৈরী করা হয় ক্যামেরা ও চরিত্রের মুখোমুখি অবস্থান থেকে ক্লোজ শটের মাধ্যমে। মাইকোলেঞ্জেলো আন্তোনিওনি-র **রেড-ডেসার্ট** ছবিতে বিখ্যাত অভিনেত্রী মণিকা ভিত্তি-র এ ধরনের ফ্রন্টাল ভিউ বিখ্যাত হয়ে আছে।

যে বস্তু/চরিত্র বা স্থানের চিত্রগ্রহণ করা হচ্ছে তার ঠিক পাশ থেকে যদি ক্যামেরা ছবি তোলে তাহলে বস্তু/চরিত্র-এর পাশের দিক থেকে চেহারা সাইড প্রোফাইল দৃষ্টিগোচর হবে। এ ধরনের ক্যামেরা অবস্থান বা এই ধরনের বিশুদ্ধ সাইড প্রোফাইল (side profile) ভিউ খুব প্রচলিত নয়।

আইজেনস্টাইন-এর **আইভান দ্য টেরিবল্** ছবিতে আইভানের শরীরের ও মুখের বেশ কয়েকটি সাইড প্রোফাইল ভিউ বিখ্যাত। সাধারত চরিত্র / বস্তুর সামনের দিকের আলো কম করে ও পিছনের দিকের আলো অপেক্ষাকৃত বেশি করে চরিত্র/বস্তুর একপাশে ক্যামেরা বসিয়ে সাইড-প্রোফাইল শট নেবার প্রথা আছে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাস্তববাদী চলচ্চিত্রে চরিত্র/বস্তুর ঠিক পাশে বা মুখোমুখী ক্যামেরা না বসিয়ে, এমনভাবে ক্যামেরা বসানো হয় যাতে ক্যামেরায় একধরনের কৌণিক দৃষ্টিকোণ (oblique view) তৈরি হয়। অর্থাৎ কোন একটি চরিত্র বা বড় বাড়ি-কে দেখানোর সময় ক্যামেরা এমনভাবে বসানো হয় যেন একেবারে বিশুদ্ধ সাইড ভিউ বা একেবারে সঠিক ফ্রন্টাল ভিউ না পাওয়া যায় কিন্তু এ দুই-এর মাঝামাঝি একটি দৃষ্টিকোণ তৈরি করা হয় যাতে চরিত্র বা বস্তুর সামনের কিছুটা অংশ ও পাশ থেকে কিছুটা অংশ একসঙ্গে দেখা যায়। এ ধরনের অবলিক বা কৌণিক ক্যামেরা কোণ তৈরি করলে বস্তু, চরিত্র বা স্থানকে অনেক বেশি করে ত্রিমাত্রিক ও বাস্তব মনে হয়। প্রসঙ্গত আদিযুগের চলচ্চিত্র (early cinema)-এ যেমন ফ্রন্টাল ভিউ ও সাইড ভিউ-র প্রচলন বেশি ছিল, তেমনি আধুনিক বাস্তববাদী ছবিতে কৌণিক বা অবলিক্ ভিউ-র বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

অনেক সময় ফিল্মে আমরা দেখি কোন কোন ফ্রেম একদিকে একটু বাঁকানো অবস্থায় আছে। বিশেষত টি.ভি.তে বিভিন্ন ফিচারধর্মী অনুষ্ঠানের সময় এই ধরনের বাঁকানো বা ক্রমাগত দুপাশে হেলানো ফ্রেম দেখা যায়। এই ধরনের দৃষ্টিকোণকে বলা হয় তির্যক দৃষ্টিকোণ বা ক্যানটেড (canted) ভিউ।

ক্যানটেড ভিউ সাধারনত টি.ভি. তথ্যচিত্রের একটি শৈলী। বিশেষত সিনেমা ভেরিতে আন্দোলনের ছবিগুলিতে এ ধরনের তির্যক দৃষ্টিকোণ দেখতে পাওয়া যায়। জিগা ভের্তভের **ম্যান উইথ দ্য মুভী ক্যামেরা** নামের তথ্যচিত্র 'পথ-দুর্ঘটনা' পর্যায়ে এরকম বেশ কিছু মন্তাজ সিকোয়েন্সের মধ্যে ক্যান্টেড ভিউ তৈরি করা হয়েছে।

● ক্যামেরার উলম্ব কোণ সমূহ

উপরের আলোচনায় যে ধরনের দৃষ্টিকোণগুলির কথা আলোচনা করা হল সেগুলি তৈরি হয় সমান্তরাল অক্ষে (অর্থাৎ যে বস্তু/চরিত্রের ছবি তোলা হচ্ছে তার সামনে, পাশে, ডানদিকে বা বাঁদিকের বিভিন্ন জায়গায়) ক্যামেরার অবস্থানের জন্য। বস্তু/চরিত্র (profilmic object/character)-এর সাপেক্ষে উলম্ব অক্ষের বিভিন্ন অবস্থান (অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত নিচু বা উঁচু স্থান)-এ ক্যামেরা বসিয়ে ছবি তোলার জন্যও বেশ কয়েক ধরনের দৃষ্টিকোণ (angle of view) তৈরি হতে পারে।

দৃশ্যবস্তু (profilmic object, character or space) নিচে আর ক্যামেরা তার তুলনায় উঁচুতে রেখে ছবি তোলার নাম হাই-অ্যাঙ্গেল-শট (high-angle-shot)। উপর থেকে কোন দৃশ্যবস্তুকে দেখলে যে ধরনের দৃষ্টিকোণ তৈরি হতে পারে এ ধরনের ক্যামেরা অবস্থানেও তাই হয়। সাধারণত হাই-অ্যাঙ্গেল শট-এ দৃশ্যবস্তু বা চরিত্র-কে তার পারিপার্শ্বিকের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বলে মনে হয়। প্রথানুসারে তাই হাই-অ্যাঙ্গেল দৃষ্টিকোণ-এর শট ব্যবহার করে পরিবেশের চাপে বিপর্যস্ত চরিত্রের অবস্থান বোঝানো হয়। 'অপরাজিত' ছবিতে কাশীর গঙ্গায় স্নান করে উঠে আসছে হরিহর। ক্যামেরা অনেক উঁচুতে সিঁড়ির উপর থেকে তাকে হাই-এ্যাঙ্গেলে দেখছে, সে অসুস্থ, বিপর্যস্ত ও অসহায় বোধ করছে। আবার অন্যদিকে হাই-অ্যাঙ্গেল শট অনেকখানি জমিকে উপর থেকে দেখাতে পারে, তাই কোন স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান বা বৈচিত্র্য দেখানোর জন্য বা কোন বড় জনসভা ইত্যাদি দেখানোর জন্য হাই-এ্যাঙ্গেল শট, বিশেষত টপ শট (top shot) অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদ্ধতি।

হাই-অ্যাঙ্গেল শট-এর চূড়ান্ত অবস্থা, অর্থাৎ যখন মাথার একেবারে উপর থেকে ক্যামেরা চিত্রগ্রহণ করে, তখন সেই ধরনের দৃষ্টিকোণের ফলে টপ শটের জন্ম হয়। সত্যজিৎ রায়ের **প্রতিদ্বন্দ্বি** ছবিতে কলকাতার ময়দানে মিছিল ও জমায়েতের একটি দৃশ্যাংশ তোলা হয়েছিল বহুতলবিশিষ্ট একটি বাড়ি (টাটা সেন্টার)-এর উঁচু ছাদ থেকে। এটি একটি হাই-অ্যাঙ্গেল টপ শটের উদাহরণ। আলফ্রেড হিচকক-এর বিখ্যাত **সাইকো** ছবির শুরুর শটটিতে অনেক উঁচুতে বসানো ক্যামেরা নিয়ে আমেরিকার অ্যারিজোনা শহরটি দেখানো হচ্ছে। ঋত্বিক ঘটক-এর **কোমল গান্ধার** ছবিতে একটি দৃশ্যে উঁচু পাহাড়ের মাথা থেকে একটু নিচের কালিম্পং শহরের দৃশ্যাবলি দেখা যাচ্ছে। এগুলি হাই অ্যাঙ্গেল টপ শট-এর বিভিন্ন উদাহরণ।

দৃশ্যবস্তু উঁচুতে ও ক্যামেরা তার তুলনায় নিচুতে রেখে ছবি তোলার নাম লো অ্যাঙ্গেল শট (Low angle shot)। ধরা যাক রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটি উঁচু বাড়ি উপরের কোন দৃশ্যবস্তুর দিকে তাকালে যে ধরনের দৃষ্টিকোণ তৈরি হতে পারে, লো অ্যাঙ্গেল শট-এর ক্ষেত্রেও তাই হয়। সত্যজিৎ রায়ের **অপরাজিত** ছবিতে একটি দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে অপু উঁচু মন্দিরের চাতালে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এখানে ক্যামেরা বসানো হয়েছে অপেক্ষাকৃত নিঁচুতে কাশীর গঙ্গার ঘাটে। ফলে একটু নিচু থেকে অপেক্ষাকৃত উঁচুতে অতি-দীর্ঘ-শটে সন্তরণরত অপু-কে দেখা যাচ্ছে লো-অ্যাঙ্গেল দৃষ্টিকোণ থেকে।

তবে অনেকসময় কোন বস্তু বা চরিত্রের একেবারে সামনে থেকে লো-অ্যাঙ্গেল দৃষ্টিকোণ থেকে শট নিলে বস্তু বা চরিত্র-কে বিশাল বড় এবং কিছুটা অতিমানবিক মনে হয়। ফলে দৃশ্যে একধরনের ভাবগত অতিরঞ্জন তৈরি হয়। যেমন, নাৎসীবাদ প্রচারক ছবি লেনী রিফেনস্টাজ্‌লের **ট্রাম্ফ অব উইল** ছবিতে হিটলারকে দেখানো হয় লো-অ্যাঙ্গেল শট-এ, ফলে তার চ্যারিসমাটিক চরিত্র ছবিতে ফুটে উঠে। ঋত্বিক ঘটকের **মেঘে ঢাকা তারা** ছবির একটি দৃশ্যে দেখা যায় ব্যথিত, প্রত্যাখ্যাত নীলা (আখ্যানের প্রধান চরিত্র) সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। ক্যামেরা রাখা হয় সিঁড়ির নিচে এবং সিঁড়ির উপরের ধাপে অবস্থানরত নীতার চিত্র গ্রহণ করা হয় লো অ্যাঙ্গেল দৃষ্টিকোণ থেকে। ঋত্বিকের ছবিতে মাতৃপ্রতিমার মত আইকনিক (iconic) দৃশ্য তৈরি করতে ক্যামেরাকে একটু লো-এ্যাঙ্গেলে রেখে ক্লোজ শটে-এ বা মিড ক্লোজ শট-এ চরিত্রকে দেখানো হয়।

লো-অ্যাঙ্গেল বা হাই-অ্যাঙ্গেল শট হল ক্যামেরার বিশেষ অবস্থান। স্বাভাবিক অবস্থান হল দণ্ডায়মান চরিত্রের চোখের সমতলে (eye level) যখন ক্যামেরা অবস্থান করে। সাধারণত একজন ক্যামেরা চালক যখন চরিত্রটি যে সমতলে রয়েছে ঐ একই সমতলে সম্পূর্ণ দণ্ডায়মান অবস্থায় তার চোখেব সমতলে (eye level-এ) ক্যামেরা রেখে ছবি তোলেন তখন তা হয় স্বাভাবিক দৃষ্টি-কোণ বিশিষ্ট শট (normal angle shot)।

● **ব্যতিক্রমী ক্যামেরা কোণি : ওজুর চলচ্চিত্র**

প্রখাত জাপানী কাহিনীচিত্র পরিচালক ইয়ুসুজিরেশ ওজু-র ছবির বৈশিষ্ট্য হল যে তাঁর ক্যামেরা উলম্ব অক্ষের একটি অদ্ভুত অবস্থানে থাকে। জাপানী কায়দায় হাঁটু মুড়ে নতজানু হয়ে বসলে মানুষের চোখ যেখানে থাকে, ওজু-র ক্যামেরারলেন্স প্রতি শটেই সেই উচ্চতায় থাকে। অর্থাৎ ক্যামেরা চালককে মাটি থেকে মাত্র দু-হাত উঁচুতে ক্যামেরা থাকার জন্য প্রায় নিচু হয়ে বসে, প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে কাজ করতে হয়। ওজু-র ছবিতে এই অদ্ভুত দৃষ্টিকোণের জন্য একধরনের অসাধারণ বিশেষত্ব তৈরি হয়। অর্থাৎ তাঁর ছবিতে কোণ টপ অ্যাঙ্গেল বা হাই অ্যাঙ্গেল শট নেই এবং লো-অ্যাঙ্গেল শট থাকে অনেক বেশি সংখ্যায়। প্রথাবিরুদ্ধ ক্যামেরা কোণ ব্যবহার করায় তাঁর ছবির দৃষ্টিকোণ 'বাস্তববাদী' নয়। ওজু-র **টোকিও স্টোরী** (১৯৫৩), **দি এন্ড অব সামার** (১৯৬১) **ওহাইয়ু এ্যন অটাম আফটারনুন** প্রভৃতি বিখ্যাত ছবিগুলিতে এ ধরনের ক্যামেরা কোণের ব্যবহার দেখা যায়।

৮.৬. ক্যামেরার সচলতা

● **ক্যামেরার চলাচল ও চলচ্চিত্রের ভাষা**

একটি মাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্র অন্যান্য বেশ কয়েকটি শিল্পমাধ্যমের গুনাগুণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে গঠিত। যেমন চলচ্চিত্র সাহিত্য মাধ্যম থেকে পেয়েছে আখ্যান বর্ণনার ঐতিহ্য। নাটক থেকে নিয়েছে সংলাপ ও অভিনয় এবং চিত্রকলা থেকে চলচ্চিত্র নিয়েছে বিভিন্ন দৃশ্য-সংগঠন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ দৃষ্টিকোণ তৈরির রীতি।

কিন্তু ক্যামেরার চলাচল চলচ্চিত্র মাধ্যমে যে বৈচিত্র্য তৈরি করে তা একেবারেই মাধ্যমটির নিজস্ব ভাষার বৈশিষ্ট্য। চলচ্চিত্র ব্যতীত অন্যকোন মাধ্যমে ক্যামেরার চলাচল (camera movement)-এর অনুরূপ কোন পদ্ধতি নেই।

ক্যামেরার সচলতা (camera movement) চলচ্চিত্র-কে অন্যান্য মাধ্যমের তুলনায় অনেক বেশি করে বাস্তববাদী করে তুলেছে। কারণ মানুষের চোখ যেমন ঘাড়ের সচলতার সাহায্যে ডানদিক-বাঁদিক, উপরে বা নিচে যেতে পারে তেমনি চলচ্চিত্রের ক্যামেরার পক্ষেও এ ধরনের সচলতা সম্ভব। তাছাড়া মানুষের চোখ ও দৃষ্টি যেমন তার শরীরের চলাচলের মাধ্যমে সচল হতে পারে তেমনি ক্যামেরার চোখও পারে স্থান পরিবর্তন করতে। সুতরাং মানুষের চোখ যেমন বাস্তবকে সচল দৃষ্টিতে দেখে চলচ্চিত্রের ক্যামেরাও তা পারে, যা চলচ্চিত্র মাধ্যমটিকে অধিকতর বাস্তববাদী করে তুলেছে।

সাধারণত দুভাবে ক্যামেরার দৃষ্টির পরিবর্তন (camera movement) ঘটতে পারে। প্রথম ত্রিপদসহ সমগ্র ক্যামেরা স্থান পরিবর্তন না করে ক্যামেরার লেন্সের অভিমুখ দু-পাশে বা উপর-নিচে সাবলীলভাবে ঘোরানো যেতে পারে। দ্বিতীয়ত (ত্রিপদ-সহ) সমগ্র ক্যামেরা ক্যামেরাচালক-সহ দু-পাশে, উপর-নিচে বা বৃত্তাকার-উপবৃত্তাকার পথে চলাচল করবার সময় চিত্রগ্রহণ করতে পারে।

● প্যানিং, টিল্টিং ও আর্চিং (panning, tilting & arching)

ত্রিপদ (tripod)-এর উপর নির্দিষ্ট অবস্থানে রেখে, অনুভূমিক অক্ষ বরাবর ডানদিক থেকে বাঁদিকে বা বিপরীতক্রমে কিছুটা সময় ধরে ক্যামেরার অভিমুখ ঘুরিয়ে চিত্রগ্রহণ করলে, তাকে বলা হয় প্যানিং।

ফরাসী নব-তরঙ্গের অন্যতম পরিচালক ফ্রাঁসো ত্রুফোর- **ফোর হান্ড্রেড ব্লো-স'** এবং **জুলে এন্ড জিম** প্রভৃতি ছবিতে ছন্দবদ্ধ প্যানিং দেখতে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত ত্রুফোর প্রথম দিক্‌কার ছবিগুলিতে প্যান শট অন্যমাত্রা যোগ করে।

সত্যজিৎ রায়-এর অপু-ত্রয়ী ছবিগুলিতেও বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দৃশ্যে প্যানিং ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন **পথের পাঁচালী** ছবিতে হরিহর দীর্ঘদিন পর গ্রামের বাড়িতে ফিরছে। মেঘলা দিন, হরিহরের ভিটের দক্ষিণের পাঁচিলের সামনে লং শটে হরিহর এসে দাঁড়ায়। সে দেখে একটা আমডাল ঝড়ে পাঁচিলের উপর ভেঙ্গে পড়েছে। হরিহর ডালটা ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে আসে — ক্যামেরা সঙ্গে সঙ্গে প্যান করতে থাকে।

ঋত্বিক ঘটকের **সুবর্ণরেখা** ছবির একটি দৃশ্যে একটি স্মরণীয় প্যান শটের কথা বলা যায়। ছবির অন্যতম প্রধান চরিত্র সীতা-র বিয়ের মুকুটটিকে মিড শটে সুবর্ণরেখা নদীতে ভেসে যেতে দেখা যাচ্ছে। ক্যামেরা ধীরে ধীরে প্যান করে নদী থেকে নদীর তীরের দৃশ্যে চলে যায়, দেখা যায় সীতা ও অভিরাম নদীর ধারে এগিয়ে আসছে।

প্যানিং অনেকটা সময় ও স্থান জুড়ে হতে পারে। এমনকি ক্যামেরার দু-পাশে অনুভূমিক অক্ষ বরাবর ১৮০ পর্যন্ত বা তারও বেশি হতে পারে। ফরাসী নব-তরঙ্গের প্রধান পরিচালকদের, যেমন ত্রুফো, গোদার —এদের ছবিতে এ ধরনের দীর্ঘ সময় ও বিস্তৃত স্থানে ব্যাপী প্যানিং দেখা যায়। ফরাসী নব-তরঙ্গে অন্যতম প্রধান প্রবক্তা আন্দ্রে বাঁজা বলতেন যে স্থান ও কালকে যতটা সম্ভব নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলচ্চিত্রের ক্যামেরায় ধরা উচিৎ, সেক্ষেত্রে দীর্ঘ প্যান শট খুবই উপযোগী একটি পদ্ধতি। প্যান শট যখন কোন বস্তু/চরিত্র-এর গতিবিধিকে অনুসরণ করে তখন বস্তু/চরিত্রের পারিপার্শ্বিক ও দৃশ্যমান হয়।

এক বস্তু/দৃশ্য থেকে অন্যবস্তু/দৃশ্যে খুব দ্রুত ক্যামেরা প্যান করলে তাকে সুইস-প্যান (swiss pan) বা জিপ প্যান (zip pan) বলে। সুইস/জিপ প্যান শটে প্যানিং-এর সময় দৃশ্যাবলী ঝাপসা (blurred) হয়ে যায়। **অপরাজিত** ছবির একটি দৃশ্যে সর্বজয়া দেখছেন অপু বাড়ির মালিকের পাকা চুল তুলে দিচ্ছে, এ দৃশ্য তার মনে আশঙ্কার সৃষ্টি করে যে এ বাড়িতে থাকলে অপু-কে চাকরের মত ব্যবহার করা হবে। পরিচালক এক ঝলকে একটি জিপ প্যান ব্যবহার করেন যাতে ঐ বাড়ির দৃশ্যাবলী থেকে শুরু করে দ্রুত প্যান শেষ হয় কলকাতাগামী ট্রেনে (অবশ্য এর মধ্যে একটি লুকোন কাটে (cut) থেকে গেছে)।

একটি নির্দিষ্ট স্থানে ত্রিপদের উপর ক্যামেরা রেখে, ক্যামেরার অভিমুখ উলম্ব অক্ষ বরাবর উপর থেকে নিচে বা নিচে থেকে উপরে পরিবর্তন করার সময় চিত্রগ্রহণ করলে, তাকে টিল্টিং (tilting) বলা হয়। চিত্রগ্রহণের সময়

ক্যামেরার অভিমুখ উপর থেকে নিচে নামালে তাকে বলা 'টিল্টিং ডাউন' এবং অভিমুখ নিচে থেকে উপরে তুললে তাকে বলা হয় 'টিল্টিং আপ'।

যেমন **পথের পাঁচালী**-র একটি দৃশ্যে সর্বজয়া রান্না করেছেন। ক্লোজ শটে দেখা যাচ্ছে হাঁড়িতে ভাত ফুটছে, হাঁড়ির ঢাকনা বাষ্পচাপে ওটা-নামা করছে। ক্যামেরার দৃষ্টি আস্তে আস্তে উপরে উঠে অর্থাৎ টিল্ট আপ করে উনুনের সামনে উবু হয়ে বসে থাকা সর্বজয়ার মুখে স্থির হয়।

ঋত্বিক ঘটক **অযান্ত্রিক** (১৯৫৪) ছবিতে একটি দৃশ্য শুরু হয় আকাশ দেখিয়ে। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘ দেখা যাচ্ছে, এবার ক্যামেরা অভিমুখ আকাশ থেকে নামিয়ে এনে, অর্থাৎ টিল্ট ডাউন করে ছবির প্রধান চরিত্র বিমল-এর মুখ ক্লোজ শটে আনা হয়। সাধারনত যে বস্তু/চরিত্র-কে দৃশ্যাংশে প্রাধান্য দেওয়া হবে, একেবারে সরাসরি তাকে না দেখিয়ে অন্যকোন বস্তু/চরিত্র/স্থানের দৃশ্য থেকে শুরু করে টিল্ট ডাউন করে দেখানো হয়। সরাসরি মূল বস্তু/চরিত্রকে না দেখিয়ে এভাবে দেখালে দৃশ্যগত বৈচিত্র্য তৈরি হয়।

উঁচু বাড়ি বা সৌধ ইত্যাদিকে উলম্বভাবে দেখানোর জন্য টিল্ট আপ বা টিল্ট ডাউন উপযোগী শট। ধরাযাক একটি বহুতল বাড়ির সামনের রাস্তায় কোন চরিত্রকে দেখানো হবে। এক্ষেত্রে অনেকসময়ই বহুতল বাড়ির উঁচু অংশ থেকে টিল্ট ডাউন শুরু করে অবশেষে নিচে রাস্তায় দৃশ্যে এনে শেষ করা হয়। এরকমই একটি শট দিয়ে শুরু হচ্ছে ফ্রাঁসোয়া ক্রুফোর ছবি **দি ব্রাইড ওর ব্ল্যাক।** ছবির প্রথম শটেই দেখা যাচ্ছে একটি চার্চের উঁচু চূড়া থেকে ক্যামেরার দৃষ্টি টিল্ট ডাউন করে নিচে চার্চের প্রবেশ দ্বারে ও তার সামনের সিঁড়ি-র দৃশ্যে এসে শেষ হয়।

অনেক সময় উপর থেকে নিচ বা নিচে থেকে উপরে কোণ বরাবর ক্যামেরার অভিমুখকে পরিবর্তন করা হয়, এ ধরনের শটকে যথাক্রমে আর্চিং ডাউন ও আর্চিং আপ বলা হয়। 'আর্চিং' শটে প্যানিং ও টিল্টিং-এর মাঝামাঝি ফল (effect) পাওয়া যায়। ক্রুফোর **জুলে এণ্ড জিম** ছবিতে এ ধরনের বেশকিছু শট দেখতে পাওয়া যায়।

● ট্র্যাকিং, ডলি ইন/আউট এবং প্যাথিং শট

ক্যামেরা ও ক্যামেরা-চালক কোন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সামনে, পিছনে বা বৃত্তাকার, উপবৃত্তাকার পথে স্থান পরিবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যগ্রহণ করলেও দৃশ্যে গতির সঞ্চার হয়। সমতল ও মসৃণ মেঝে বা রাস্তায় একটি চাকা লাগানো ডলি বা ট্রলির উপর অবস্থানপূর্বক ক্যামেরা-চালক তার ক্যামেরা নিয়ে ক্রমে দৃশ্যবস্তুর দিকে এগিয়ে গেলে তাকে বলা হয় ডলি ইন। উল্টোদিকে ঐ অবস্থায় দৃশ্যগ্রহণের সময় ক্যামেরা যদি দৃশ্যবস্তু থেকে ক্রমে দুরবর্তি হতে থাকে, তবে তাকে বলা হয় ডলি আউট (Dolly out)।

ট্রলি বা ডলি চালানোর মত উপযুক্ত মসৃণ মেঝে (floor) না থাকলে, দুখানি সমান্তরাল রেল (rail)-এর উপর অবস্থিত চাকা লাগানো পাটাতনে আরোহণপূর্বক ক্যামেরাচালক ক্যামেরাসহ দৃশ্যগ্রহণ করার সময় দৃশ্যবস্তুর দিকে এগিয়ে গেলে তাকে বলা হয় ট্র্যাক ইন বা ট্র্যাক ফরোয়ার্ড। অন্যদিকে রেলের উপর দিয়ে ক্যামেরা দৃশ্যবস্তু বা চরিত্র থেকে ক্রমে দুরবর্তি হতে থাকলে তাকে বলা হয় ট্র্যাক আউট বা ট্র্যাক ব্যাক।

পথের পাঁচালী-এর একটি দৃশ্য থেকে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। হরিহর দীর্ঘদিন পরে বাড়ি ফিরেছে। কন্যা দুর্গার জন্য সে ডুরে শাড়ি এনেছে। সে জানে না ইতমধ্যে দুর্গার মৃত্যু ঘটেছে। হরিহর সর্বজয়ার হাতে দুর্গার জন্য আনা শাড়িটি দিতেই সর্বজয়া হরিহরের সামনে কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে পড়ে যায়। আবহ-সঙ্গীত তার সানাই-এর মুর্ছনা শোনা যায়।

'মিড শট ঃ- সর্বজয়া কাঁদতে কাঁদতে মেঝেতে শুয়ে পড়ে। হরিহর তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয়। যেন সে জানতে চায় কী হল? সর্বজায়া মাথা নেড়ে জানায় দুর্গা আর নেই! এবার মিড শট থেকে ক্যামেরা 'ট্র্যাক ইন/ফরোয়ার্ড' করতে থাকে, মিড শটে আমরা হরিহরের কোমরের উপর থেকে মাথার উপর পর্যন্ত দেখছিলাম, এবার 'ট্র্যাক ফরোয়ার্ড' করে ক্যামেরা ক্রমে হরিহরের দিকে এগিয়ে এসে ক্লোজ শটে তার মুখে স্থির হয়।

হরিহর বুঝতে পারে যে দুর্গা নেই, তার মুখে ক্লোজ শটে তীব্র যন্ত্রণার ভাব ফুটে উঠতে থাকে, এবার ক্যামেরা আবার 'ট্র্যাক আউট/ব্যাক' করে পিছনে সরে যেতে থাকে। ফলে ক্রমে হরিহর ও সর্বজয়াকে আবার আগের মত মিড শটে দেখা যায়।'

ঋত্বিক ঘটক-এর **কোমল গান্ধার** (১৯৬২) ছবিতে একটি অনবদ্য ট্র্যাক ফরোয়ার্ড দেখা যায় 'লালগোলা দৃশ্যপর্যায়ে'। দুটি পরিত্যক্ত সমান্তরাল রেললাইনের উপর দিয়ে ক্যামেরা দ্রুত ট্র্যাক ফরোয়ার্ড করতে থাকে, সঙ্গে শব্দ পথে শোনা যায় "দোহাই আলি" ধ্বনি।

ট্র্যাকিং-এর পরিবর্তে অনেক সময় জুম ইন/আউট (১.৩ অংশে দেখুন) ব্যবহার করা হয়, কিন্তু ট্র্যাক ইন/আউটের ফল জুম ইন/আউটের সঙ্গে এক হয় না। যদিও দু ক্ষেত্রেই ক্যামেরার দৃষ্টি ক্রমে দৃশ্যবস্তুর কাছে আসতে থাকে বা ক্রমে দূরে সরে যেতে থাকে। ধরা যাক ট্র্যাক ইন-এর ক্ষেত্রে ক্যামেরার সামনের যে ভি আকৃতির অঞ্চল দৃশ্যমান হয় তার কোণ ক্রমে ছোট হয়ে আসে না, কিন্তু জুম ইন করলে ক্যামেরার সামনে ভি-আকৃতির দৃষ্টি কোণ ক্রমে সরু (narrow) হয়ে আসে। সুতরাং দৃশ্যগতভাবে ট্র্যাকিং ও জুমিং-এর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বর্তমান, যদিও দুধরনের শটেই ক্যামেরার দৃষ্টিতে গতির সৃষ্টি হয়।

দৃশ্যবস্তুর দিকে বা দৃশ্যবস্তু থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাওয়ার পরিবর্তে দৃশ্যবস্তু বা চরিত্রের পাশ দিয়ে ট্র্যাকিং করে ক্যামেরাকে সচল করলে যে ধরনের শট দেখা যায় তাকে **সমান্তরাল-ট্র্যাকিং** (parallel tracking) শট বলা হয়। জঁ লুক গোদার-এর **উইকএন্ড** (১৯৬৮) নামের বিখ্যাত কাহিনীচিত্রের প্রথম দৃশ্যপর্যায়ে একটি প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ গাড়ির জ্যাম (traffic jam) দেখা যায়। ক্যামেরার গাড়িগুলির পাশ দিয়ে দীর্ঘক্ষণ ট্রাকিং করে যায়। গোদারের বিভিন্ন ছবিতে আমরা দীর্ঘ ট্র্যাকিং দেখতে পাই।

জঁ লুক গোদার-এর একেবারে প্রথমদিকের **ব্রেথলো** (১৯৫৮) ছবিতে ট্র্যাকিং-এর খরচ বাঁচাতে তাঁর ছবির ক্যামেরা চালক রাউল কুতার কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে শেষ দৃশ্যে দীর্ঘ-সময়ের শট (long take)-এ একটি চরিত্র-কে অনুসরণ করতে থাকে। ট্র্যাক-এর পরিবর্তে কাঁধে ক্যামেরা থাকার ফলে ক্যামেরা একটু দুলেছিল ঠিকই তবে এই শট চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অন্যতম স্টাইল হয়ে দাঁড়ালো। এই শটটি সম্পর্কে সত্যজিৎ রায় মন্তব্য করেছেন : "মনে হল গোদার যেন বলতে চাইছেন যে এই ছবি জিনিসটা মেশিনে তৈরি নিষ্প্রাণ ছিমছাম কিছু নয়—এটা আসলে মানুষের হাতের কাজ, সুতরাং ছবিতে সেই হাতের ছাপ থাকাটা শিল্পের বিচারে গর্হিত কিছু নয়", (বিষয় চলচিত্র : সত্যাজিৎ রায়)। কাঁধে-ক্যামেরা-নিয়ে এ ধরনের সচলতাকে হ্যান্ড-হেল্ড (hand-held) ক্যামেরা বা সোল্ডার-ক্যামেরা (shoulder camera) বলা হয়।

অনেক সময় কোন গতিশীল যানবাহনে চেপে ক্যামেরাচালক যদি ছবি তুলতে থাকেন তবে চলমান যান থেকে রাস্তার দুপাশের বা যেকোন একপাশের দৃশ্যাবলী সচলভাবে রোধ করা যায়, এই ধরনের শট-কে পাসিং শট (passing shot) বলা হয়। যেমন, চলমান ট্যাক্সি বা গাড়ি থেকে শহরের দৃশ্য, চলন্ত ট্রেন থেকে মাঠঘাটের দৃশ্য ইত্যাদি রেকর্ড করা হয়।

অপরাজিত ছবিতে এ ধরনের একটি শট দেখা যায় যখন অপু-সর্বজায়া কাশী থেকে আবার বাংলাদেশের গ্রামে ফিরছে ট্রেনে চেপে। সেখানে চলমান ট্রেনের ভিতর থেকে বাইরের নিসর্গ দৃশ্য দেখা যেতে থাকে।

● ক্রেন শট ও বার্ডস্-আই-ভিউ শট

ক্রেন হল একটি চক্রবাহী যন্ত্র যা একটি বিশাল লম্বা লৌহদণ্ডকে কোনাকুনি উপরে তুলে রাখে এবং এই লৌহদণ্ডকে দু-পাশে সরানো যায় বা উপরে-নিচে তোলা-নামানো যায়। ঐ লম্বা উত্তোলিত লৌহদণ্ডের উপরের প্রান্তে একটি পাটাতন ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। যে পাটাতনের উপর ক্যামেরাচালক ক্যামেরা নিয়ে বসতে পারে।

অনেকক্ষেত্রে টিল্ট আপ / ডাউনের পরিবর্তে ঝুলন্ত পাটাতনে ক্যামেরা বসিয়ে ধীরে ধীরে ক্রেনের সাহায্যে উপরে

তুলে বা উপর থেকে ধীরে ধীরে নিচে নামানোর সময় ছবি তোলা হয়। অথবা মাটি থেকে কুড়ি ফুট বা তারও অনেকটা উপরে ক্যামেরাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ডানপাশে বা বাঁপাশে অথবা বৃত্তাকারে পথে দৃশ্যবস্তুর মাথার উপর দিয়ে চলাচল (move) করানো বা ঘোরানোর সময় ছবি তোলা হয়। এভাবে তোলা শটকে ক্রেন শট বলা হয়।

ক্রেন শট সাহায্য করে পারিপার্শ্বিক ও স্থানের বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্যকে মাথার উপর থেকে টপ শটে দেখাতে। অনেক সময় ক্রেনের সাহায্যে অনেক উপরে ক্যামেরাকে তুলে মাথার উপর দিয়ে ঘোরালে যে ধরনের দৃশ্যাংশ তৈরি হয়, তাকে বলে পক্ষি-দৃষ্টি-দৃশ্যাংশ (birds-eye-view-shot)। কারণ এধরনের শটে উড়ন্ত পাখির দৃষ্টিতে নিচের দৃশ্য যেভাবে দেখা যেতে পারে সেই ধরনের দৃশ্য ক্যামেরায় শ্রীহিত হয়। অত্যন্ত ব্যয়-সাপেক্ষ বলে এধরনের শট খুব বেশি নেওয়া হয় না। আলফ্রেড হিচকক-এর **মাইকো** (১৯৬০) ছবির একেবারে প্রথম দৃশ্যে বস্তু উঁচু থেকে ক্রেনের সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা শহরটির 'পক্ষি-দৃষ্টি-দৃশ্য' বা বার্ডস্-আই-ভিউ পাওয়া যায়। ক্রেন শট প্রথমত ক্যামেরার চলাচলে বৈচিত্র্য আনে, দ্বিতীয়ত এই ধরনের শট নাটকীয়তা সৃষ্টিতে বা সাস্পেন্স বা রহস্যজাল সৃষ্টিতে সাহায্য করে থাকে।

● ফ্রিজ মুভমেন্ট ও চলচ্চিত্র :

চলচ্চিত্র হল চলমান-চিত্রের সমাহার। পরপর সচল চিত্রগুলিকে গেঁথে নিয়ে তৈরি হয় একটি ফিল্ম। আর এই চলমানতার মাঝে যদি একটি এমন শট থাকে যার মধ্যে ক্যামেরা বা বস্তু/চরিত্রের চলমানতাকে সম্পূর্ণ থামিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাহলে সেই শটটিকে বলা হয় ফ্রিজ শট এবং এই ঘটনাকে বলা হয় ফ্রিজ মুভমেন্ট। আমরা জানি যে চলচ্চিত্র যেমন চলমান সময়কে দৃশ্যমান করে, তেমনি চিত্রকলার একটি ফ্রেম একটি মুহূর্তকে স্থির চিত্রে ধরে রাখে। চলমান-চিত্র বা চলচ্চিত্রের মধ্যে একটি ফ্রিজ শট যেন চিত্রাবলীর একটি ফ্রেমের মত স্থির দৃশ্যাংশটিকে চিরকালীন ধরে রাখে। চলচ্চিত্রের অনেক মুহূর্তের মধ্যে ফ্রিজ শটটি যে ফ্রেম তৈরি করে তা যেন দর্শককে বলে ঐ বিশেষ মুহূর্তটিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে।

ফ্রাঁসোয়া ত্রুফোর ছবিতে প্রথম সৃষ্টিশীল ফ্রিজ শট দেখা যায়। তাঁর **ফোর ব্রাণ্ডেড ক্লো-স** ছবিতে শেষ দৃশ্যে দেখা যায় একটি বালক সংশোধনাগার থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। ক্যামেরা তার সঙ্গে দীর্ঘ ট্র্যাক করতে থাকে। অবশেষে ছেলেটি দেখে সামনে সমুদ্র, পালাবার পথ নেই সে ফিরে আসতে থাকে ক্যামেরার দিকে, এ সময় তার ফিড ক্লোজ শট ফ্রিজ হয়ে যায়। পরিচালক যেন বলতে চান সে যতই ছুটুক না কেন, সেটা থেমে থাকার সামিল! এখানে ফ্রিজ মুভমেন্ট তাই গভীরভাবে অর্থবহ। ত্রুফোর **জুলে এন্ড গিম** ছবিতেও একাধিক ফ্রিজ শট আছে। এক টুকরো হাসি, এক পলক চাহনী, বিশেষ ছন্দময় দেহভঙ্গি-এর অনক কিছুই ত্রুফো ফ্রিজ শটে বাঁধিয়ে রেখেছেন যেন। প্রসঙ্গত মৃণাল সেনের বিখ্যাত **ভুবন সোম** (১৯৬৯) ছবিতেও বেশ কয়েকটি অনবদ্য ফ্রিজ শট লক্ষ্য করা যায়।

৮.৭. ক্যামেরার লেন্স

● লেন্স : প্রাথমিক প্রযুক্তি

একেবারে প্রথম যুগে ক্যামেরা হিসাবে ব্যবহার করা হত একটি কালো বাক্স, যার একদিকে থাকত একটি অতিক্ষুদ্র ছিদ্র এবং অন্য সবদিক বিশেষভাবে ঢেকে রাখা হত যাতে কোন অবাঞ্ছিত আলো প্রবেশ করতে না পারে। যে বস্তুর ছবি তোলা হত সে বস্তুর সামনে ক্যামেরার সূচী ছিদ্রটিকে উন্মুক্ত করা হত। ফলে আলোক-পর্দার্থবিদ্যার নিয়মানুসারে ছিদ্রের উল্টোদিকে ক্যামেরার ভিতরের দেওয়ালে রাখা ফিল্ম-এর উপর বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ত এবং রাসায়নিক পদ্ধতিতে ফিল্মের উপর চিত্র নীহিত হত।

ক্রমে ক্যামেরা প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সূচীছিদ্র পথে বসানো হল লেন্স। ফলে বস্তু থেকে আগত আলোক রশ্মিগুলি লেন্সের ভিতর দিয়ে ক্যামেরার ভিতরে প্রবেশ করে অনেক সুসংহতভাবে ফিল্ম-এর উপর প্রতিবিম্ব গঠন করে। এই প্রযুক্তি স্থিরচিত্র ক্যামেরা (still photography camera) ও চলচ্চিত্র ক্যামেরা (movie camera) উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়। ক্যামেরা লেন্সের ব্যবহার অনেকটাই মানুষের চোখের গঠনের অনুরূপ। মানুষের চোখের মাঝখানে অর্থাৎ মণিতে একটি লেন্স বসানো আছে। তবে এই লেন্স ক্যামেরার লেন্সের মত কাঁচের তৈরি নয়, একধরনের স্বচ্ছ জৈব অর্ধতরল পদার্থ দিয়ে তৈরি।

আলোক-পদার্থ-বিদ্যার জ্ঞান থেকে আমার জানি যে পটলের মত আকৃতির একটি লেন্স (উত্তর লেন্স)-এর বেধ যত মোটা হয়, তত দূরের জিনিষ আবছা হয়ে যায় ও কাছের জিনিষ অধিকভাবে স্পষ্টতর হয়ে দেখা যায়। আলোক বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে ফোকাস। অর্থাৎ পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে ফোকাস দূরের ক্ষেত্রে নেই, রয়েছে কাছের ক্ষেত্রে। আবার অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে খুব কাছের জিনিষ অস্পষ্ট (blurred) কিন্তু একটু দূরের জিনিষ অনেকটা দূরত্ব পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বলা যায় ফোকাস এক্ষেত্রে দূরে নিবদ্ধ, কাছে নয় এবং এক্ষেত্রে লেন্সের বেধ হয় অপেক্ষাকৃত কম। অর্থাৎ ক্যামেরার সামনে বসানো উত্তর লেন্সের বেধ যত বেশি হবে ফোকাস (focus) তত কাছের বস্তুতে নিবদ্ধ থাকবে এবং বিপরীতক্রমে লেন্সের বেধ যত কম হবে, ফোকাস তত বেশি দূরত্বকে স্পষ্টভাবে দৃষ্টির সামনে আনবে।

● স্বাভাবিক (normal) ও বিস্তীর্ণ-কোণ (wide angle) লেন্স

আধুনিক উন্নত ক্যামেরায় একধরনের লেন্স থাকে না, বরং একাধিক লেন্সের জটিল সমাহারের ফলে 'লেন্স-পদ্ধতি' গড়ে উঠেছে। লেন্স তৈরির উপাদানও এখন কেবলমাত্র কাঁচ নয়। স্বচ্ছতা কাঁচের থেকেও বেশি এরকম বস্তু দিয়ে লেন্স তৈরি হয়।

মানুষের চোখের ক্ষেত্রে চোখের পেশীগুলির সঙ্কোচন প্রসারনের ফলে লেন্সের বেধের পরিবর্তনের ফলে ফোকাস-দূরত্ব পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু ক্যামেরার যান্ত্রিক পদ্ধতি এতটা সংবেদনশীল ও নমনীয় নয়। এক্ষেত্রে মোটামুটি ক্যামেরাম্যানের সামনে তিন ধরনের পছন্দ থাকতে পারে :— স্বাভাবিক লেন্স (normal lens), বিস্তীর্ণ-কোণ (wide angle) লেন্স, দূরদানি (telepoto) লেন্স। এই তিন ধরনের লেন্স সাধারণত ব্যবহার করা হয় চলচ্চিত্র ক্যামেরায়।

লেন্সের চরিত্র অনুসারে এগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। বিভাজনের ক্ষেত্রে লেন্সের ফোকাস অঞ্চলের উপর নির্ভর করা হয়েছে। ৩৫ মিমি ছবির ক্ষেত্রে (অর্থাৎ সাধারণ পর্দায় যে ছবি দেখানো হয়), একটি 'স্বাভাবিক লেন্সে' (normal lens)-এর বেধ হয় ৩৫ মিমি থেকে ৫০ মিমি পর্যন্ত। 'স্বাভাবিক লেন্স' চলচ্চিত্রে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। ক্যামেরার সামনে বহুদূরের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পর্যন্ত দেখাতে না চাইলে বা দূরের বস্তুকে কাছে দেখাতে না চাইলে, চলচ্চিত্রে 'স্বাভাবিক লেন্স' ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ বলা যায় এক্সট্রিম লং/লং শট অথবা মিড ক্লোজ/ক্লোজ আপ ছাড়া সাধারণ দৃশ্যাবলী দেখানোর ক্ষেত্রে অর্থাৎ মিড শটের ক্ষেত্রে সাধারণত 'স্বাভাবিক (normal) লেন্স ব্যবহার করা হয়। সাধারণত খালি চোখে যা দেখা যায় 'স্বাভাবিক লেন্স'-এ সেরকম দৃশ্যাবলী পাওয়া যায়।

বিস্তীর্ণ-কোণ (weide angel) লেন্সের ক্ষেত্রে ক্যামেরার সামনের অনেক দূরের ক্ষেত্র পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। অর্থাৎ ডিপ ফোকাস বা বহুদূর পূর্যন্ত অঞ্চল দেখাতে গেলে এই লেন্স ব্যবহার করা হয়। এক্সট্রিম লং শট বা লং শট যেখানে পশ্চাদভূমি অনেক দূর, পর্যন্ত দেখা যায়। সেখানে বিস্তীর্ণ-কোণ (wide angle) লেন্স ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া এই ধরনের লেন্স ক্যামেরায় ব্যবহারের ফলে ক্যামেরার সামনে দৃশ্যমান শঙ্কু আকৃতির স্থানটি চওড়া হয়, অর্থাৎ শঙ্কুর কোণ বিস্তীর্ণ হয়। এক্ষেত্রে যেমন বহূদূরের ভূমি দেখা যায় তেমনি 'স্বাভাবিক' লেন্সের তুলনায় দুপাশের অঞ্চল অনেকটা বেশি দেখা যায়।

যে সব চলচ্চিত্র পরিচালক ডিপ ফোকাস ফটোগ্রাফী বেশি ব্যবহার করেন, তাঁদের ছবিতে বিস্তীর্ণ-কোণ লেন্সের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন ফরাসী চলচ্চিত্রকার জঁ রেনোয়া-র ছবিতে বা প্রবাদপ্রতীম মার্কিন চলচ্চিত্রকার

অর্সন ওয়েলসের ছবিতে, বিশেষত তাঁর **সিটিজেন কেন** ছবিতে বিস্তীর্ণ-কোণ (wide angle) লেন্স-এর প্রয়োগ দেখা যায়। এ ছবির একটি ভোগসভার দৃশ্যের কথা উদাহরণ হিসাবে বলা যায়। এ ছবির একটি ভোগসভার দৃশ্যের কথা উদাহরণ হিসাবে বলা যায়। একটি বিশাল লম্বা টেবিলের একপ্রান্তের সম্মুখভূমি (foreground) থেকে বহুদূরের পশ্চাৎভূমি (background) পর্যন্ত স্পস্ট দেখা যাচ্ছে এখানে ওয়াইড-এ্যাঙ্গেল লেন্স ব্যবহৃত হয়েছে।

সত্যজিৎ রায়ের **পথের পাঁচালী**-র একটি দৃশ্যের কথা বলা যায়, যেখানে দুর্গা এক্সট্রিম লং শট-এ বিস্তীর্ণ কাশবনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই শটে বিস্তীর্ণ-কোণ লেন্স ব্যবহার করা হয়েছে। ঋত্বিক ঘটক-এর **মেঘে ঢাকা তারা** ছবির প্রথম দৃশ্যে একটি বিস্তীর্ণ বটগাছের তলায় দূর থেকে নীতা (ছবির প্রধান চরিত্র)-কে হেঁটে আসতে দেখা যাচ্ছে। দৃশ্যাংশটি বিস্তীর্ণ-কোণ লেন্সে তোলা হয়েছে। বিস্তীর্ণ-কোণ লেন্সের ব্যবহারের সময় কোন বস্তু খুব কাছে চলে এলে, তার আকৃতিগত বিকৃত (distortion) হয়, যাকে চলচ্চিত্রের পরিভাষায় বলা হয় 'ওয়াইড এ্যাঙ্গেল ডিস্টরসন'। ঋত্বিক ঘটকের পূর্বোক্ত ছবিটির একটি জায়গায় নীতার বাবা ক্যামেরার দিকে আঙুল তুলে বলছে, "তাই এ্যাকিউস ইউ...।" যেহেতু ক্যামেরায় বিস্তীর্ণ-কোণ লেন্স ব্যবহার করা হয়েছিল এবং খুব কাছে হাত ও আঙুল চলে এসেছিল, তাই একধরনের 'ওয়াটইড এ্যাঙ্গল ডিস্টর্শন' হয়, ফলে আঙুলগুলিকে বিশাল বড় ও একটু বাঁকা বলে মনে হয়।

দূর থেকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ-কোণ লেন্স অত্যন্ত উপযোগী, তবে রৈখিক অবস্থানের ধারণা বিস্তীর্ণ-কোণ লেন্স ব্যবহার করলে সঠিকভাবে পাওয়া যায় না। এই লেন্সের ব্যবহারের অপেক্ষাকৃত কাছের জিনিষকে বড় ও অপেক্ষাকৃত দূরের বস্তুগুলিকে তাদের আকৃতির তুলনায় ছোট বলে মনে হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে লেন্সের বেধ যত কম হবে, ক্যামেরার সামনের ক্ষেত্র (depth of field) তত বেশি করে স্পষ্ট হবে। সুতরাং, বিস্তীর্ণ-কোণ লেন্সের বেধ স্বাভাবিক লেন্সের থেকে কম। ৩৫ মিমি ছবির ক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ-কোণ (wide angle) লেন্সের বেধ হতে হবে ৩৫ মিমি-এর থেকে কম (৩৫ মিম- ২৮ মিমি)।

সাধারণত একটি ৫০ মিমি 'স্বাভাবিক' লেন্সে ক্যামেরার সামনের দৃশ্যাঞ্চল-শঙ্কুর কোণ হবে ৪৬ ডিগ্রি। কিন্তু একটি ২৮ মিমি 'বিস্তীর্ণ-কোণ' লেন্সের ক্ষেত্রে ঐ কোণ হবে প্রায় ৭৪ ডিগ্রি। এই তুলনা থেকেই বোঝা যাচ্ছে বিস্তীর্ণ কোণ (wide angle) পরিভাষাটির স্বার্থকতা। আজকাল এমন বিস্তীর্ণ-কোণ লেন্স আবিষ্কৃত হয়েছে যার ক্ষেত্রে ক্যামেরার দুপাশে প্রায় ১৮০ ডিগ্রি পর্যন্ত অঞ্চল দৃশ্যমান হয়। এই ধরনের এক্সট্রিম ওয়াইড-এ্যাঙ্গেল বা অতি-বিস্তীর্ণ-কোণ লেন্সকে বলা হয় মীন-চক্ষু (fish eye) লেন্স।

- **দূর-দর্শন (telephoto)**

'বিস্তীর্ণ-কোণ' লেন্সের ঠিক বিপরীত ভূমিকা পালন করে দূর-দর্শন (telephoto) লেন্স। সাধারণত টেলিস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে যেমন দূরের বস্তুকে কাছে ও বড় করে দেখা যায়, 'দূর-দর্শন' বা টেলিফটো লেন্সের সাহায্যে ঐ একইরকম কাজ করা হয় চলচ্চিত্রে। টেলিফটো লেন্সের বেধ বেশ পুরু হয়। সাধারণত ৩৫ মিমি ফিল্মের ক্ষেত্রে 'দূর-দর্শন' লেন্সের বেধ হবে ৬০ মিমি-এর অধিক। টেলিফটো লেন্সের বেধ প্রায় ২৫০ মিমি পর্যন্ত হতে পারে। বেধ যত বেশি হয় টেলিফটো লেন্সের কাজ অর্থাৎ দূরের বস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখানোর ক্ষমতা তত বেশি হয়।

'দূর-দর্শন' লেন্স বহুদূরের বস্তুকে ক্লোজ শটে দেখাতে পারে, কিন্তু এই লেন্স ব্যবহার করলে বস্তুটি কতটা দূরে আছে সেই ধারণা অর্থাৎ দূরত্বের বোধ (depth perception) নষ্ট হয়ে যায়। দর্শক বস্তুর আকার-আকৃতি পর্দায় বড় করে দেখতে পায় কিন্তু বস্তুর দূরত্ব সম্পর্কে কোণ ধারণা হয় না। দূর-দর্শন লেন্স ব্যবহার করলে ক্যামেরার সামনের দৃশ্যাঞ্চল-কোণ (angle of view) ছোট হয়ে আসে অর্থাৎ দুপাশে দৃষ্টির বিস্তার কম হয়। একটি ১৩৫ মিমি বেধের 'দূর-দর্শন' লেন্সের দৃশ্যাঞ্চল-কোণ-এর মান মোটামুটিভাবে ১৮ ডিগ্রি হয়। অর্থাৎ ক্যামেরার সামনে দুপাশের বস্তু খুব বেশি দৃশ্যমান হয় না, কিন্তু দৃষ্টি দূরের বস্তুতে নিবদ্ধ থাকে।

'দূর-দর্শন (telephoto) লেন্সের ব্যবহার খুব বেশি হয় অভিযানমূলক বা ভ্রমণমূলক তথ্যচিত্রের ক্ষেত্রে। অনেক

সময় বন্য জীবজন্তুর জীবনাযাত্রা, আচার-আচরণ খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতি রেকর্ড করার জন্য দূর থেকে শক্তিশালী টেলিফটো লেন্সের সাহায্যে ছবি তোলা হয়। টি.ভি-তে ডিসকভারী, অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট প্রভৃতি চ্যানেলে 'ওয়াইল্ড লাইফ' সম্পর্কিত অনুষ্ঠানগুলিতে টেলিফটো লেন্সের সাহায্য নিয়ে বন্য-জন্তুর শিকার ইত্যাদি দূরে ক্যামেরা বসিয়ে দেখানো হয়।

খেলাধূলা টিভিতে দেখানোর সময় টেলিফটো লেন্সের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ধরা যাক, প্রায় ৮০ গজ ব্যাসার্ধের একটি ক্রিকেট মাঠের ঠিক মাঝখানে ব্যাটসম্যান ব্যাট করছে। আমরা ব্যাটসম্যানের মুখ/শরীর দেখতে পাই, এমনভাবে যেন মনে হয় খুব কাছ থেকে দেখছি। এসব ক্ষেত্রে 'দূর-দর্শন' (telephoto বা long-focal-length) লেন্স ব্যবহার করা হয়, যার ফলে দূরের বস্তুকে কাছে বলে মনে হয়।

চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে প্রখ্যাত জাপানী চলচ্চিত্রকার আকিরা কুরসাওয়া-র ছবিতে বেশ কয়েকটি দৃশ্যাংশ টেলিফটো লেন্সের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। তাঁর **রেড বেয়ার্ড** ছবিতে একটি দৃশ্যাংশ দেখা যায় একজন মানসিকভাবে অসুস্থ রোগী এক ডাক্তারের ঘরে ঢুকে তার দিকে আসছে। কুরসাওয়া টেলিফটো লেন্সে দৃশ্যাংশটি তোলেন, ফলে ডাক্তার ও রোগীর মধ্যে দূরত্ব বোঝা যায় না, মনে হয় যেন দূরে দণ্ডায়মান রোগীটি ডাক্তারের খুব কাছে চলে এসেছে। পরের দৃশ্যাংশে আবার পাশ থেকে 'স্বাভাবিক' লেন্সে যখন চরিত্র দুটিকে দেখা যায়, তখন বোঝা যায় তাদের মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব রয়েছে।

অনেকসময় খুব শক্তিশালী টেলি-লেন্সের সাহায্যে অতিরিক্ত অতি নিকট-দৃশ্যাংশ (extreme-big-close-up) নেওয়া হয় এ ধরনের শটে। ধরা যাক মুখের কোন অংশের একেবারে চামড়ার ভাঁজ পর্যন্ত বা রোমকূপ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। এক্ষেত্রে যে অতি শক্তিশালী লেন্স ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় 'অতি-বৃহৎ' বা 'ম্যাক্রো' (macro) লেন্স। এই ধরনের লেন্সের ব্যবহার সাধারণত বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে বা অনেক সময় ভয়ের ছবি (horror film)-তে ব্যবহার করা হয়।

● জুম লেন্স

ওয়াইড-এ্যাঙ্গেল ও টেলিফটো লেন্স ছাড়াও এদের সংমিশ্রণে জুম লেন্স তৈরি করা হয়েছে, যাতে একটি শটেই ক্যামেরাকে একস্থানে স্থির রেখে ওয়াইড-এ্যাঙ্গেল থেকে ক্রমে দূর-দর্শনে (telephoto-তে) পৌঁছনো যায়। অথবা টেলিফটো থেকে ক্রমে ওয়াইড-এ্যাঙ্গেল বা বিস্তীর্ণ-কোণ অবস্থায় পৌঁছানো যায়।

অর্থাৎ জুম (zoom) লেন্স ব্যবহারের ফলে দূরের বস্তুকে আস্তে আস্তে কাছে আনা যায় ও বিপরীতক্রমে কাছে যে বস্তুকে দেখানো হচ্ছে তাকে ক্রমে দূরে সরিয়ে দিয়ে তার প্রকৃত দূরত্ব। দৃশ্যে স্থাপন করা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে বস্তু যখন ক্রমে কাছে আসে তখন বস্তুর দুপাশের পারিপার্শ্বিক ক্রমে দৃশ্য থেকে বাইরে চলে যেতে থাকে। একে জুম-ইন (zoom in) বলা হয়। অন্যদিকে বস্তু যখন দূরে সরে যায় অর্থাৎ জুম আউট (zoom out)-এর ক্ষেত্রে বস্তুটি ক্রমে তার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে প্রকৃত দূরত্বে চলে যায়।

ক্যামেরা বস্তুর কাছে নিয়ে যাবার পরিবর্তে জুম ইন (zoon in) এবং ক্যামেরাকে বস্তু থেকে দূরে নিয়ে যাবার পরিবর্তে (zoom out) ব্যবহার করা হয়। জুম ইন বস্তু যেমন ক্রমে কাছে আসে তেমনি তার আকারও ক্রমে বাড়তে থাকে এবং বিপরীতক্রমে জুম আউটের ক্ষেত্রে বস্তু যখন ক্রমে দূরে সরে যেতে থাকে তখন বস্তুর আকার ও ক্রমে ছোট হতে থাকে।

মৃণাল সেনের **ভুবন সোম** (১৯৬৯) ছবিতে জুম ইন বা জুম আউটের একটি শৈল্পিক উদাহরণ পাওয়া যায়। আখ্যানের প্রধান নারী চরিত্র একটি পুরোনো রাজবাড়িতে বসে সেই রাজবাড়ির রাণীর গল্প বলছে ভুবন সোমকে। সে বসে আছে একটি খোলা জানলার গেবরাটে। পরিচালক মেয়েটিকে ক্রমে জুম ইন ও জুম আউটে দেখাতে থাকেন। ফলে মনে হয় মেয়েটি একটি দোলনায় বসে দুলছে জুম আউটে, ক্রমে সে দূরে চলে যাচ্ছে আবার জুম ইনে কাছে চলে আসছে।

জনপ্রিয় হিন্দি ছবিগুলিতে জুম লেন্সের প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। ধরা যাক নায়ক অনেক লোকের মাঝে জনসভায় কিছু বলছে। প্রথমে জনসভার দৃশ্য থেকে শুরু করে দ্রুত জুম ইন করে নায়কের মুখে চলে যাবার রীতি হিন্দি ছবিতে অনবরত ব্যবহার করা হয়।

একটি দৃশ্যাংশ চলার সময়ে কোন বস্তু বা চরিত্রের চলাচলের সঙ্গে সঙ্গেই সে বস্তু বা ব্যক্তিকে অনুসরণ করে লেন্সের ফোকাস দূরত্বকে নিয়ন্ত্রণ করা হলে, তাকে বলা হয় 'অনুসরণকারী' ফোকাস (follow focus)। অনেক সময় একটি শটে অবস্থিত পশ্চাদভূমিতে অবস্থিত বস্তু বা চরিত্র থেকে সম্মুখভূমিতে অবস্থিত বস্তু বা চরিত্রে ফোকাস পরিবর্তন করে দর্শকের আকর্ষণকে এক বস্তু/চরিত্র থেকে অন্য বস্তু/চরিত্রের দিকে সরিয়ে আনা যায়। এই ধরনের ফোকাসকে বলা হয় 'র‍্যাক ফোকাস (rack focus) বা 'পরিবর্তনশীল' ফোকাস।

● অ্যাপারচারের ভূমিকা

ক্যামেরার গঠনকে অনেক সময় মানুষের চোখের সঙ্গে এবং ক্যামেরার লেন্সকে চোখের লেন্সের সঙ্গে তুলনা করা হয়। আমরা অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে বেশি আলো চোখে পড়লে চোখ আপনা থেকেই কুঁচকে যায় এবং এভাবে চোখের লেন্সের যে গোলাকার অঞ্চলটি আলোর সামনে থাকে তার ব্যাসার্ধ কমে ছোট হয়ে যায়। ফলে চোখে কমও সহজযোগ্য আলো প্রবেশ করে। আবার আমরা দেখেছি বহুদূরের জিনিষ যখন আমরা দেখতে চেষ্টা করি তখন চোখ কিছুটা কুঁচকে তাকাতে হয়, যাতে আগের মতই চোখের লেন্সের যে অঞ্চল খোলা থাকে তার পরিমান কমে ছোট হয়ে যায়।

চোখ বা ক্যামেরার লেন্সের যতটুকু অঞ্চল আলোর সামনে খোলা থাকে তাকে বলে অ্যাপারচার (aperture)। অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখতে গেলে (বা বেশি আলো লেন্সে পড়লে) লেন্সের 'অ্যাপারচার' ছোট করতে হয়। অর্থাৎ যদি ক্যামেরায় অনেকটা দূর পর্যন্ত ভূমি (deep focus)-এর শট নিতে হয় তবে ক্যামেরার লেন্সের অ্যাপারচার ছোট করতে হবে। অন্যদিকে বলা যায়, টেলিফটো বা দূর-দর্শনে-র ক্ষেত্রে অ্যাপারচার বড় রাখতে হবে যাতে বহুদূরের বস্তুটি থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ আলো লেন্সের মধ্যে দিয়ে ক্যামেরায় প্রবেশ করতে পারে।

তাহলে একথা বলা যায়, সাধারণত বিস্তীর্ণ-কোণ (wide angle) লেন্সের ক্ষেত্রে অ্যাপারচার ছোট রাখতে হয় যাতে ক্যামেরার সামনে বহুদূর পর্যন্ত ভূমি (depth of field) পরিষ্কার দেখা যায়। আবার স্বাভাবিরক (normal) লেন্সের ক্ষেত্রে অ্যাপাচার একটি মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে। টেলি-লেন্সে বা জুম লেন্সের ক্ষেত্রে অ্যাপারচার অপেক্ষাকৃত বড় হয়, যাতে ফোকাস কেবলমাত্র দূরের একটি বস্তুর উপরেই 'কেন্দ্রিভূত হয়' এছাড়া লেন্সের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের 'পরিশোধক' (filter) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দৃশ্যকে একটি নির্দিষ্ট রঙের (monocolour) করে তুলতে সেই রঙের ফিল্টার ব্যবহার করা যায়। যেমন, সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় লালচে বা কমলা ফিল্টার ব্যবহার করা হয়। আবার দিনের আলোয় লেন্সে গাঢ় নীল ফিল্টার লাগালে, রাত্রি মনে হয়। এইভাবে দিনের আলোয় ফিল্টার ব্যবহার করে রাত্রির দৃশ্যাংশ তোলা হলে তাকে বলে ডে ফর নাইট (day for night) বা দিনে রাত্রির দৃশ্যাংশ গ্রহণের সুটিং।

৮.৮ আলোক সম্পাত

৮.৮.১ আলোক সম্পাত ও চিত্রগ্রহণ

চলচ্চিত্র হল আলোর কারুকার্য। চিত্রগ্রহণের সময় বস্তু থেকে আগত আলোর রশ্মি ফিল্মের উপর রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার পর সেই ফিল্মকে প্রোজেক্টরের সাহায্যে আলোকিত করলে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহের পর্দায় ছবি ফুটে উঠে।

চলচ্চিত্রে চিত্রগ্রহণ (shooting)-এর সময় পরিচালক 'ক্যামেরার সামনে বস্তু/চরিত্র' (profilmic object/char-

actor)-এর উপর কি ধরনের আলোক-সম্পাত করবেন তা নির্ভর করে তাঁর বিবেচনার উপর। দিনের আলোতে (shotting) হবে নাকি 'ক্যামেরার সামনে স্থান' (pro-filmic space)-এ সৃষ্টি করা হবে আলো-ছায়ার মায়াজাল, না কি বিভিন্ন রঙের অস্তিত্বে ক্যামেরার ফিল্ম (raw film)-এ ধরা পড়বে জগতের রূপ, তা নির্ভর করে বিষয় ও নান্দনিকতার দাবির উপর।

স্থানের বিচারে চলচ্চিত্রে চিত্রগ্রহণ (shooting) দু ধরনের হয়—আউটডোর সুটিং ও ইনডোর সুটিং। দিনের বেলায় স্টুডিও বা ঘরের বাইরে 'খোলা জায়গায় চিত্রগ্রহণ' (outdoor shooting)-এর ক্ষেত্রে সূর্যের আলোতেই কাজ চলতে পারে। কিন্তু 'ঘর বা স্টুডিও-র অভ্যন্তরে চিত্রগ্রহণ' (indoor shooting)-এর সময় বিভিন্ন ধরনের কৃত্রিম আলো ব্যবহার করতে হয়। আলোক-সম্পাতের ক্ষেত্রে বিশেষত কৃত্রিম আলো ব্যবহার করলে দৃশ্য-সংগঠন (composition)-এ আলো ও অন্ধকার বেশি আলো ও কম আলোর বৈপরীত্য তৈরি হতে পারে। সাধারণত দর্শকের দৃষ্টি মিজ-অঁ-সিনের আলোকিত বা বেশি আলোকিত (well illuminated) বস্তু/চরিত্র বা স্থানের দিকে আকর্ষিত হয়। অন্যদিকে মিজ-অঁ-সিনের অন্ধকার বা কম আলোকিত বস্তু/চরিত্র বা স্থানের দিকে দর্শকের দৃষ্টি সাধারণত ততটা যায় না।

চলচ্চিত্রে আলোক-সম্পাত বা আলোর ব্যবহারকে তিনভাবে দেখা যেতে পারে— ব্যবহারিক কৌশল (practice), প্রযুক্তিগত কৌশল (technology) এবং আদর্শগত কৌশল।

৮.৮.২ আলোক-সম্পাত (Lighting)-এর ব্যবহারিক কৌশল

চলচ্চিত্রে চিত্র গ্রহণের সময় যে আলো বস্তু / চরিত্র বা স্থানের উপর পতিত হয়, তার চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যনীয়। সেগুলি হল অলোর গুণাগুন (quality), আলোর উৎস (source), 'আলোক রশ্মিগুচ্ছের উৎসের দিক' (direction) এবং আলোর বর্ণ বা রং (colour)।

আলোর গুণাগুন (quality) বলতে বোঝায় বস্তু বা চরিত্রের উপর পড়া আলোক রশ্মির তীব্রতার পরিমাপ। তীব্র আলো কোন বস্তু বা চরিত্রের উপর পড়ে তার ছায়া ছায়া বা মিজ-অঁ-সিনে আলো-ছায়ার যথেষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করলে তাকে বলা হয় 'কঠোর আলো' (hard light)।

কঠোর আলো ব্যবহার করলে বস্তু/চরিত্র-এর পিছনের দেওয়ালে বা অতি-দীর্ঘ দৃশ্যাংশ (Extreme-long-shot)-এর ক্ষেত্রে মেঝের উপর পরিস্কার ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে আলো ও ছায়ার সীমারেখা যথেষ্ট প্রকট হয়। তাছাড়া 'কঠোর আলো' ব্যবহার করলে আলোকিত অঞ্চল ও ছায়াচ্ছন্ন অঞ্চলের অবস্থানের জন্য দৃশ্য-সংগঠন (composition)-এ একধরনের 'জটিল নকশা বা প্যার্টান' (texture) তৈরি হয়।

সত্যজিৎ রায়ের **অপরাজিত** (১৯৫৯) ছবির একটি বিখ্যাত দৃশ্যের কথা মনে করা যায়, যেখানে চিন্তিত সর্বজয়া একরাত্রে ততায় ক্যামেরার দিকে মুখ করে বসে আছেন, তার পাশে অপুর ভূগোল শিক্ষার একটি গোলক (globle)। পরিচালক সর্বজয়ার বাঁ দিক থেকে 'কঠোর আলো' (hard light) ফেলেছেন। ফলে তীব্র আলোয় সর্বজয়ার মুখও মিড শটে দেখা যাওয়া শরীরের উপরের অংশ আলোকিত হয়ে উঠেছে। ঘরের বাকি অংশ প্রায়ন্ধকার। সর্বজয়ার শরীরের ছায়া পিছনের আলোকিত দেওয়ালে খুব স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। সর্বজয়ার সাদা শাড়ির উপর পাশে স্ট্যান্ডে রাখা গোলকটির গাঢ় কালো ছায়া ফুটে উঠেছে।

কঠোর আলো কিভাবে দৃশ্য-সংগঠনে অদ্ভুত নকশা বা texture তৈরি করতে পারে তার উদাহরণ আমরা পেতে পারি ঋত্বিক ঘটকের **মেঘে ঢাকা তারা** (১৯৫৯) ছবির সেই বিখ্যাত দৃশ্যে যেখানে আখ্যানের প্রধান নারী নীতা ও তার দাদা শঙ্কর একটি ঘরের মধ্যে গাইছে 'যে রাতে মোর দুয়ারখানি...'। নীতা ও শঙ্করের মুখে, তাদের পিছনের দেওয়ালে ও মেঝে তীব্র আলো ও গাঢ় ছায়া পাশাপাশি অবস্থান করে একধরনের জটিল নকশা বা texture গড়ে তুলেছে।

ইঙ্গমার বার্গম্যান-এর ছবিতে বারবার কঠোর আলোর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। **দি সাইলেন্স** (১৯৬০) ছবিতে একটি দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে এস্তার নামের এক মহিলা ক্যামেরার দিকে মুখ করে সম্মুখভূমি (foreground)-এ দাঁড়িয়ে

আছেন, তার কোমরের উপর থেকে শরীরের বাকি অংশ দেখা যাচ্ছে। এস্তারের পিছনে কিছুটা দূরে বসে রয়েছে বালক জোহান। পশ্চাৎভূমিতে অনেকটা দূরে এস্তারের বোন এবং জোহানের মা অ্যানা-কে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। এই দৃশ্য-সংগঠনের দৃশ্যমান স্থানের বেশিরভাগ অংশেই অন্ধকার, কেবলমাত্র চরিত্রগুলির উপর 'কঠোর আলো' ফেলা হয়েছে।

অন্যদিকে মিজ-অঁ-সিনের বিভিন্ন অংশে যদি সুষমভাবে আলো ফেলা হয় বা আলোকিত ও ছায়াচ্ছন্ন অঞ্চলের কোন সীমারেখা স্পষ্টভাবে না থাকে এবং বস্তু বা চরিত্রের পরিস্কার ছায়া তৈরি না হয়, সে ক্ষেত্রে সে আলোক সম্পাত করা হয়, তাকে বলে 'নরম আলো' (soft lighting)। 'নরম আলো'-র ব্যবহার কঠোর আলোর মত দৃশ্য-সংগঠনকে অলো-ছায়ার সাহায্যে তাৎপর্যময় করে তুলতে পারে না।

হলিউড ছবির বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 'নরম আলো'র ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় যেখানে 'তিন-প্রকার আলোক সম্পাত' (three-point-lighting)-এর সাহয্যে 'নরম আলো' সৃষ্টি করা হয় যেখান দৃশ্যাংশে বস্তু/চরিত্র-এর ছায়া বা আলো-অন্ধকারের বৈপরীত্য তৈরি হয় না। তিন-পকার-আলোক-সম্পাত বা থ্রি পয়েন্ট লাইটিং হল প্রথাগত আলোক সম্পাতের প্রাথমিক বিধি। আলোর উৎসের উপর নির্ভর করে এই তিন-প্রকার আলোর নামককরণ করা হয়ঃ- 'প্রধান-আলোক' উৎস (key light source), 'পূরক-আলোক'-উৎস (fill ligfht source) এবং 'পশ্চাদ-আলোক' উৎস (back-light source)।

প্রধান-আলোক উৎস সাধারণত অন্য দুধরনের আলো থেকে তীব্রতর এবং বস্তু/চরিত্র-কে আলোকিত করার প্রধান উৎস। ক্যামেরা ও বস্তু/চরিত্র-এর অক্ষের সঙ্গে সাধারণত ৪৫ ডিগ্রি কোণ করে এই আলোক উৎসটিকে স্থাপন করা হয়। এই আলো সরাসরি বা বিচ্ছুরিত (dispersed) ভাবে বস্তু/চরিত্রের উপর পড়ে বস্তু/চরিত্র-কে স্বাভাবিকের থেকে একটু বেশি ঔজ্জ্বল্যে আলোকিত করে। বস্তু বা চরিত্র-এর ছায়া যাতে পিছনের দেওয়ালে বা মেঝেতে না দেখা যায়, সেই উদ্দেশ্যে অপেক্ষাকৃত কম তীব্রতার একটি আলো ক্যামেরার পাশ থেকে বস্তু/চরিত্র-এর পিছনে ফেলা হয়, যাতে 'প্রধান-আলো' বস্তু/চরিত্র-এর শরীরের উপর পড়ে যে ছায়া সৃষ্টি করে তা অদৃশ্য হয়ে যায়। ছায়া অদৃশ্য করা ছাড়াও পিছনের দৃশ্যসঙ্গ (set & decor) যাতে দৃশ্যমান হয় সে ব্যবস্থাও হয় এই আলো ব্যবহারের ফলে। এই ধরনের আলোকে বলে পূরক আলো (fill light)।

প্রধান-অলোক-উৎস ও পূরক-আলোক উৎস ছাড়াও উদ্দিস্ট বস্তু/ চরিত্র-কে পিছন থেকে আলোকিত করার জন্য অপেক্ষাকৃত কম তীব্রতার আলো বস্তু/চরিত্র-এর উপর ফেলা হয়। এই আলো বস্তু/চরিত্র-এর ত্রিমাত্রিক রূপটিকে ভালোভালে ফুটিয়ে তোলে। এই ধরনের আলোকে পশ্চাৎ উৎসের আলো (back-light) বলা হয়। পশ্চাৎ-উৎসের আলো এবং পূরক আলো উভয়েই তিন-প্রকার আলোক সম্পাত (three-point-lighting)-এর ক্ষেত্রে সহকারী আলোক-উৎস হিসাবে কাজ করে। প্রধান আলোক উৎস এক্ষেত্রে কি-লাইট (key light)।

থ্রি-পয়েন্ট-লাইটিং-এর ক্ষেত্রে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যে দৃশ্য-সংগঠনে উপস্থিত প্রতিটি চরিত্র ও বস্তুর জন্যই পৃথক পৃথকভাবে ঐ তিনধরনের আলো স্থাপন করার প্রয়োজন হতে পারে।

আলোর প্রধান উৎস হিসাবে কি-লাইট (key light) বা প্রধান-আলোক-উৎস থেকে দু-ধরনের আলো ব্যবহার করা যায়। প্রথমটি হল উজ্জ্বল-প্রধান-আলো (high-key-light), যাতে যে স্থানের ছবি নেওয়া হচ্ছে সেখানকার সমস্ত ক্ষেত্র, বস্তু/চরিত্র সুষমভাবে উজ্জ্বল আলো পেতে পারে। এই আলো দিনের আলোর মত বা অনেকক্ষেত্রে তার থেকেও একটু বেশি উজ্জ্বল। হলিউড ছবিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হাই-কি-লাইট (high-kcy-light) ব্যবহার করা হয়। উজ্জ্বল-প্রধান-আলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূরক আলো (fill lifght) এবং পশ্চাৎ-উৎসের আলোগুলিকে ও উপযুক্তভাবে উজ্জ্বল হতে হয়, যাতে কোন ছায়ার সৃষ্টি না হয়।

অন্যদিকে বিশেষ-প্রধান-আলো (low-key-light)-এর ব্যবহারের ফলে ছায়ার সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ এক্ষেত্রে 'কাঠোর-আলো' (hard light) তৈরি হয়। স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ-প্রধান-আলো (low-key-light)-এর তীব্রতা এরসঙ্গে ব্যবহৃত

পূরক আলো (fill light) ও পশ্চাৎ উৎসের আলো (back-light)-এর থেকে অনেক বেশি। ফলে বিশেষ-প্রধান-আলোর ব্যবহার আলো-ছায়া, সাদা-কালো ইত্যাদির বৈপরীত্য সৃষ্টি করে। লো-কি-লাইটিং উপরোক্ত হাই-কি-লাইটিং-এর মত সাদামাটা (flat) দৃশ্য-সংগঠন তৈরি করে না, বরং দৃশ্য-সংগঠনকে অনেক বেশি তাৎপর্যময় ও ইঙ্গিতময় করে তোলে।

মিজ-অঁ-সিনে উপস্থিত কোন চরিত্রের অবস্থানের নিরিখে আলোক-রশ্মিগুচ্ছের-উৎসের দিক অনুসারে সাধারণত পাঁচ ধরণের আলোক সম্পাত করা যেতে পারে। যেমন, চরিত্র/বস্তুর 'সামনে-থেকে-আগত' আলো (frontal lighting), 'পিছন-থেকে-আগত' আলো (back lighting), 'পাশ-থেকে-আগত' আলো (Side lighting), 'উপর-থেকে-আগত' আলো (top or over-head lighting) এবং 'নিচ-থেকে-আগত' আলো (under lighting)।

'সামনে-থেকে-আগত' আলো বা ফ্রন্টাল লাইটিং সাধারণত সৃষ্টি করা হয় কি-লাইট-এর সাহায্যে। এধরনের আলো হতে পারে 'কঠোর' আলো (hard lighting) যাতে বস্তু/চরিত্র-র ছায়া সৃষ্টি হবে। অথবা ফ্রন্টাল লাইটিং হতে পারে 'নরম' আলো (soft lifht) যাতে কোন ছায়া সৃষ্টি হয় না। জঁ লুক গোদার-এর ছবিতে সাধারণত কোন সমতল দেওয়ালের সামনে ক্যামেরার দিকে মুখ করে দাঁড়ানো কোন চরিত্রের ক্লোজ শট-এ 'সামনে-থেকে-আগত' অলোর ব্যবহার করা হয়। তাঁর **ল্য সিনোয়া** ছবিতে এধরনের বেশ কয়েকটি উদাহরণ আছে। ফ্রন্টাল লাইট সাধারণত ফ্ল্যাট দৃশ্য তৈরি করে যেখানে বস্তু/চরিত্র-র দৈহিক গঠনের ত্রিমাত্রিক অবস্থান বোঝা যায় না।

'পিছন-থেকে-আগত' আলো বা ব্যাক-লাইটিং সাধারণত কিলাইটের থেকে কম তীব্র হয়। এই আলোর ব্যবহার বস্তু/চরিত্রের শরীরের ত্রিমাত্রিক গঠনকে দৃশ্যে প্রতিষ্ঠা করে। তবে যদি ব্যাক-লাইট প্রধান আলোর উৎস হয়ে ওঠে সেখানে কি-লাইট বা ফিললাইট নেই বা অপেক্ষাকৃত ম্লান, সেখানে ব্ল্যাক-লাইটের ব্যবহারের ফলে বস্তু/চরিত্রের কেবলমাত্র' দেহরেখা (silhouette) তৈরি হয়। ইন্দমার বার্গম্যানের **দ্য সেভেনু শীল** ছবির প্রায় শেষ দৃশ্যাংশে দেখা যায় সূর্যাস্তের সময় অপেক্ষাকৃত কম আলোতে আলোর উৎস অর্থাৎ সূর্যকে পিছনে রেখে আটটি মানুষ পরস্পরের হাত ধরে হাঁটছে। এখানে সূর্য ব্যাক লাইটের কাজ করছে এবং আলোর প্রদান উৎসের ভূমিকা নিচ্ছে। ফলে দিগন্তে ঐ আটটি মানুষের কেবলমাত্র দেহরেখা (silhouette) দেখা যাচ্ছে। একইভাবে কৃত্রিম ব্যাকলাইটের সাহায্যেও সিল্যুয়েট (silhouette) তৈরি করা যায়।

পাশ-থেকে-আগত' আলো (side or cross lighting)-এর উৎস থেকে বস্তু/চরিত্রের ডান বা ও বাঁ পাশে। কোন বস্তু/চরিত্র-এর উপর যেকোন একপাশ থেকে সাইড-লাইটিং বা ক্রস লাইটিং করলে বস্তু/চরিত্র-এর যেকোন একপাশ আলোকিত হয় এবং অন্যপাশ অপেক্ষাকৃত অন্ধকার থাকে। কোন চরিত্রের উপর ধরা যাক চরিত্রের বাঁ পাশ থেকে সাইড-লাইট ফেলা হল। ফলে চরিত্রটির মুখের বাঁপাশ আলোকিত হবে ও ডানপাশ অপেক্ষাকৃত অন্ধকার লাগবে। এইভাবে মুখমণ্ডলের একপাশ আলোকিত ও অন্যপাশ অন্ধকার রেখে চরিত্রটির মনের দোদুল্যমানতা, নৈতিকতার সমস্যা সম্পর্কিত মানসিক দ্বন্দ্ব (বার্গম্যানের ছবিতে দেখা যায়), চরিত্রের খণ্ডিত সত্ত্বা (split personality) ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়।

অনেক সময় বস্তু/চরিত্র-এর মাথার 'উপর-থেকে-আগত' আলো বা টপ লাইটিং-এর সাহায্যে নাক, চোখ বা গালের হাড়ের ছায়া সৃষ্টি করে কোন চরিত্রের মুখমণ্ডলের একধরনের বিকৃত দৃশ্য পাওয়া যায়। চরিত্রের মুখমণ্ডলের তথাকথিত সৌন্দর্য্য নষ্ট (deglamurize) করতেও মুখ ভয়ঙ্কর ক্লান্তি বেদনা ও স্বাস্থ্যহীনতার ছাপ তৈরি করতে এ ধরনের আলো ব্যবহার করা হয়। ঋত্বিক **ঘটকের মেঘে ঢাকা তারা** ছবিতে একটি দৃশ্যে বেদনাহত নীতা মুখ ক্লোজ শটে দেখা যাচ্ছে, তার মুখ একটু উপর দিকে তোলা। তার মুখ ও কপালে মাথার উপর-থেকে-আগত আলো বা টপ লাইট ব্যবহার করা হয়েছে।

টপ লাইটের ঠিক উল্টো অবস্থান থেকে আসে আণ্ডার লাইট বা 'নিচ-থেকে-আগত' আলো। বিশেষত ক্লোজ শটে নিচ থেকে আন্ডার লাইট ব্যবহারের ফলে আলো চরিত্রের মুখে পড়লে এক ভয়ঙ্কর, অতিমানবিক দৃশ্যাংশ তৈরি হয়।

সাধারণত ভয়ের ছবি (horror film) বা জার্মান প্রকাশবাদী (expressionist) ছবি যথা **ক্যাবিনেট অব ড. ক্যালিগারী** বা **নস্‌ফোরটো**-এগুলির বহু বেশ কিছু দৃশ্যাংশে আণ্ডার-লাইট ব্যবহার করা হয়েছে।

চলচ্চিত্রে আলোর বর্ণের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আলোর বর্ণগুলিকে সাধারণত দু-ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমত— উষ্ণ বর্ণ (warm tone) যথা লাল, কমলা ও হলুদ এবং দ্বিতীয়ত— শীতল বর্ণ (cool tone) যথা নীল, বেগুনী, আকাশী ইত্যাদি। বস্তু বা চরিত্র-এর উপর রঙীন আলো ফেলে বা লেন্সে ফিল্টার লাগিয়ে আলোর বর্ণ সৃষ্টি করা হয়। উষ্ণ বর্ণের আলোর ব্যবহার-আবেগ, প্যাশন, আনন্দ ইত্যাদিকে প্রকাশ করা থাকে। আবার শীতল বর্ণগুলির তাৎপর্য্য হল অপার্থিব, ভৌতিক অবস্থা বর্ণনা করা। যেমন গোদার-এর **লা সিনোয়া** ছবিতে ক্লোজ শটে মুখের উপর লাল আলো ফেলা হয়েছে, যা বিপ্লবের প্যাশনকে প্রকাশ করেছে। আবার-তারকোভস্কি-র **স্টকার** ছবিটিতে অদ্ভুদ নীল আলো এক অপার্থিব জগৎ সৃষ্টি করেছে। আণ্ডোনিওনির **রেড ডেজার্ট** ছবিতে লাল রং যেমন যৌন উদ্দিপনার প্রতীক, আইজানস্টাইন-এর **আইভান দ্য টেরিবল** ২য় পর্বের শেষ দিকে একটি চরিত্রের উপর এসে পড়া নীলাভ-সবুজ নাটকীয় আলো আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কার প্রতীক।

৮.৮.৩ আলোক-সম্পাত-এর প্রযুক্তিগত কৌশল

চলচ্চিত্রের ইতিহাসের আদিযুগে চিত্রগ্রহণ করা হত স্বাভাবিক দিনের আলোয় (day light) এবং খোলা জায়গায় (out door)। পরের দিকে কাঁচ দিয়ে তৈরি ছাদ ও দেওয়াল আছে এরকম স্টুডিও-তে সূর্যের আলোকে কাজে লাগিয়ে ছবি তোলা হত। ফিল্মের চিত্র গ্রহনের কাজে ব্যবহার করা যায় এরকম কৃত্রিম আলো প্রথম তৈরি হয় ১৯০১ সালে যখন পিটার কুপার-হেউইট আবিস্কার করেন পারদ-বাষ্প আলো (mercury-vapour lamp)। এই আলোগুলি ছিল শক্তিশালী নিওন বাতির মত। কুপার-হেউলাইট মার্কারী-ভেপার ল্যাম্প থেকে উজ্জ্বল বিচ্ছুরিত আলো তৈরি হত। সাধারণত নয়টি এই ধরনের আলো স্টুডিও-র দেওয়াল ও ছাদে স্থাপন করে সুষম উজ্জ্বল বিচ্ছুরিত আলো তৈরি করা হত।

আমরা জানি যে সাদা আলো সাতটি বিভিন্ন রং-এর আলোর সমাহার। প্রতিটি বিশেষ রং-এর আলোর নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে। উপরোক্ত কুপার-হেউলাইট ল্যাম্পে শীতল রং অর্থাৎ সবুজ ও নীল রং-এর ব্যবহার বেশি হত, কারণ তখন যে অর্থক্রোমাটিক ফিল্মে ছবি তোলা হয় তা নীল ও সবুজ আলোয় ভালো কাজ করত। তাছাড়া এই ধরনের আলো ‘নরম’ আলো (soft light)-এর উৎস হিসাবে কাজ করত এবং স্বাভাবিক বিচ্যুরিত সূর্যের অলো মত ব্যবহার করত।

চিত্রগ্রহণের সময় কঠোর’ আলো (hard light) তৈরির জন্য যে ধরনের আলোক-রশ্মিগুচ্ছ বা আলোর ফালি প্রয়োজন তার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ১৯১০ সাল নাগাদ। এই ধরনের ‘স্পট লাইট’ যা আলোক রশ্মিগুচ্ছকে একটি বিশেষ বস্তু/চরিত্র বা স্থানের দিকে চালিত করে তাকে বলা হত ক্লেগ লাইট (klieg light)।

এ প্রসঙ্গে বলা যায়, চিত্রগ্রহণের সময় ব্যবহৃত আলোকমগুলিকে দুধরনের গোষ্ঠী (category)-তে ভাগ করা যায়। যে সব আলোক-উৎপাদক (lamp) দিনের আলোর মত সুষম, উজ্জ্বল আলো সৃষ্টি করে তাদের বলা হয় ফ্লাড-লাইট (flood light)। অন্যদিকে যেসব আলোক উৎপাদন (lamp) বিশেষ দিকে রশ্মিগুচ্ছকে পাঠাতে পারে তাদের বলা হয় স্পট লাইট (spot-light)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধেব পর চিত্রগ্রহনের সহায়ক একধরনের শক্তিশালী আলোক-উৎপাদকের ব্যবহার শুরু হয়, একে বলা হত সান-আর্ক (sun-arc) ল্যাম্প। এই ল্যাম্পগুলি যুদ্ধেব সময় রাতের অন্ধকার ভেদ করে শত্রুপক্ষের হানাদার যুদ্ধবিমানকে আকাশে চিহ্নিত করার কাজে ব্যবহার করা হত। এই আলোর ব্যবহার সুটিং-এর ক্ষেত্রে চালু হবার ফলে রাত্রে ফ্লাড-লাইট-এ চিত্রগ্রহণ ভালোভাবে শুরু হয়। ক্রমে ‘আর্ক’ ল্যাম্পের পরিবর্তে টাংস্টেন-ফিলামেন্ট ল্যাম্প ও আরও পরে টাংস্টেন-হ্যালোজেন ল্যাম্পের ব্যবহার শুরু হয়। কারণ ‘আর্ক’ ল্যাম্পগুলি বিশেষত ‘কার্বন-আর্ক’ ল্যাম্পগুলির ত্রুটি ছিল এগুলি চলার সময় বেশি বিদ্যুৎ নষ্ট হত, এগুলি থেকে যান্ত্রিক শব্দ হত যা সাউণ্ড-ফিল্ম আসার পর অসুবিধার সৃষ্টি করত।

আধুনিক কালে আলোক-উৎপাদকের প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে এইচ.এম.আই ল্যাম্প তৈরি করা হয়েছে। ১৯৭০ সালে এই প্রযুক্তির ব্যবহার চলচ্চিত্রের প্রথম শুরু হয়। আজকাল স্টুডিও-তে কি-লাইট ও ফিল-লাইট হিসাবে এইচ. এম. আই বা মাল্টি ল্যাম্প ব্যবহার করা হয়।

৮.৮.৪ আলোক-সম্পাতের আদর্শগত কৌশল

চিত্রগ্রহণের সময় আলোর ব্যবহারের ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে চার ধরনের আদর্শগত অবস্থান চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত:- হলিউড ছবির 'হাই-কি' (high key) লাইটিং, যেখানে ক্যামেরায় যে স্থানের ছবি তোলা হচ্ছে (pro-filmic space)-কে সুষমভাবে আলোকিত করা হয় এবং নায়ক, নায়িকা বা প্রধান চরিত্রগুলিকে, বলা ভাল তারকা অভিনেতা, অভিনেত্রীদের মুখ উজ্জ্বলভাবে আলোকিত করা হয়। এ ধরনের আলোক-সম্পাতের প্রধান আদর্শগত কারণ বাণিজ্যিক। ধরে নেওয়া হয় নায়ক/নায়িকার ও তারকাদের গ্ল্যামার বা আকর্ষণেই ছবির জনপ্রিয়তা তৈরি হয়, তাই তাদের উপর উজ্জ্বল আলো ফেলা হয় এবং তাদের চারপাশে সাধারণত ছায়াচ্ছন্ন স্থান রাখা হয় না। হলিউড ছবির এরকম সুষম (flat), হাই-কি (high-key), নরম আলো (soft light)-এর ব্যবহার একধরনের বাস্তববাদ তৈরি করে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে আলোকিত করার এই পদ্ধতি বাস্তবচিত্রের মত নয়। কারণ প্রকৃত বাস্তবে সবসময় নায়ক/নায়িকার মুখে উজ্জ্বল আলো পড়তে পারে না বা ক্যামেরার সামনের স্থানে (pro-filmic space-এ) সবসময় সুষম আলো পড়তে পারে না। তাই বাণিজ্যিক হলিউড ছবির অলোর ব্যবহারকে আদর্শগতভাবে 'বাস্তববাদী' (realist) না বলে বরং 'অলীক-বাস্তবাদী' (psudo-realist) আলোক সম্পাত বলা উচিৎ।

দ্বিতীয়ত:- প্রকৃত বাস্তববাদী আলোক-সম্পাত দেখা যায় ১৯৪০ ও '৫০-এর দশকের ইটালীর নব্যবাস্তববাদী ছবিগুলিতে এবং এদেশে সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে, বিশেষত অপু ত্রয়ী ছবিগুলিতে, নব্য বাস্তববাদী চলচ্চিত্রকাররা আদর্শগতভাবে মনে করতেন, চলচ্চিত্রে বাস্তবের হুবহু উপস্থাপনা (representation of authentic reality) প্রয়োজন। ধরা যাক নব্য-বাস্তববাদী ছবিতে দেখানো হচ্ছে যে একটি চরিত্র এমন একটি ঘরে উপস্থিত যেখানে দুটি জানালা দিয়ে আলো আসছে। নব্য-বাস্তববাদী পরিচালক-ক্যামেরাম্যানরা এমনভাবে আলোক-সম্পাত করবেন যেন পর্দায় ছবি দেখার সময় মনে হয় যে দুটি জানালা দিয়ে এবং দুটি জানালা দিয়েই মাত্র আলো আসছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আলোক-সম্পাতের দ্বারা স্থান-এর 'বাস্তব প্রতিকৃতি' (reality effect) তৈরি করা হয়, অতিরিক্ত আলো বা অকারণ আলো-ছায়া সৃষ্টি করা হয় না। বাস্তবে চরিত্রটি ঐ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকলে যে পরিমাণ বা যে ধরনের আলো তার উপর এসে পড়ত ঠিক সেই ধরনের কৃত্রিম আলাক-সম্পাত করা হয়েছে।

এধরনের আলোর উদাহরণ সত্যজিৎ রায়ের **অপরাজিত** ছবিতে খুঁজে পাওয়া যায়। একটি দৃশ্যে রাত্রে অপু ও তার মা সর্বজয়া কথা বলছে হ্যারিকেনের আলোয়। এ ছবির ক্যামেরাম্যান সুব্রত মিত্র এমনভাবে চরিত্র দুটির উপর কৃত্রিম অলোক-সম্পাত করলেন যেন মনে হয় ঘরের মধ্যে অলোর একমাত্র উৎস অর্থাৎ হ্যারিকেন থেকে আলো এসে অপু-সর্বজয়াকে আলোকিত করেছে। এরকম 'প্রকৃত বাস্তববাদী' আলোক-সম্পাতের উদাহরণ **পথের পাঁচালী, অপরাজিত** ও **অপুর সংসার** ছবিতে বিরল নয়।

তৃতীয়ত :- 'জার্মান প্রকাশবাদী' (german expressionist) আলোক-সম্পাত, যেখানে অবাস্তব ও প্রায় অলৌকিক ধরনের আলো-ছায়া সৃষ্টি করা হয়। এই ধরনের আলোক-সম্পাত চরিত্রগুলির মনোজগতের আলো-ছায়ার প্রতিকী প্রকাশ। প্রকাশবাদী অলোক-সম্পাত সব সময়ই লো-কি আলোক সজ্জা, চরিত্রগুলির উপর 'কঠোর আলো' (hard light) পড়ার ফলে স্পষ্ট ছায়া তৈরি হয়, ক্যামেরার সামনের স্থান (pro-filmic space)-এ তীব্র আলো ও গাঢ় ছায়ার নকশা তৈরি হয়। একে বলা হয় 'চিয়ারোস্কুরো এফেক্ট' (chiaroscuro effect)। জার্মান প্রকাশবাদী (expressionist) আদর্শে সৃষ্টি চিয়ারোস্কুরো আলোর ব্যবহারের ফলে চরিত্রগুলিকে অতিমানবিক ও রহস্যময় বলে মনে হয়। জার্মান প্রকাশবাদী ছবিগুলিতে **যথা ক্যাবিনেট অব ড. ক্যালিগারী, নস্‌ফেরেটো** এবং বার্গম্যানের ছবিতে বারবার এ ধরনের

আলোর ব্যবহার দেখা যায়। ঋত্বিক ঘটকের ছবিগুলিতে বেশ কয়েকটি দৃশ্যেও এ ধরনের আলোক-সম্পাত দেখা যায়।

হলিউডের ছবির মধ্যে রহস্য ছবি, ভয়ের ছবি (horror films), মাফিয়া বা আণ্ডারওয়ার্ল্ড-কে নিয়ে ছবি (film noir) ইত্যাদি ছবিতে অপার্থিব রহস্যময়তা তৈরি করতে 'চিয়ারোস্কুরো' আলো-ছায়া ব্যবহার করা হয়। জার্মান প্রকাশবাদী আলো ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রধান আদর্শগত আপত্তি তোলেন বাস্তববাদী চলচ্চিত্রকাররা, তাদের মতে এ ধরনের আলোক-সম্পাত ব্যবহারের ফলে দর্শকের মনকে প্রকৃত বাস্তব থেকে সরিয়ে দিয়ে একটি অলৌকিক পরিস্থিতিতে নিয়ে যাওয়া হয়। যার ফলে বস্তুবাদ (materialism)-এর পরিবর্তে দর্শকের মধ্যে আধ্যাত্মবাদী (spiritual) প্রতিক্রিয়া (effect) তৈরি করার চেষ্টা হয়।

চতুর্থতঃ- আলোক-সম্পাতের সঙ্গে বর্ণ বা রং-এর সম্পর্ক রয়েছে। রঙীন ছবিগুলিতে বস্তুর উপর আলো পড়ে যে দৃশ্যের সৃষ্টি হয় তা সাধারণত বাস্তববাদী হয়, অর্থাৎ বাস্তবে বস্তুর যে ধরনের রং দেখা যায় ছবিতেও তা দেখা যায়। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই বস্তুর উপর বিশেষ রং-এর আলো ফেলে পর্দারছবিতে বাস্তবকে বিশেষ রং দেওয়া হয়। এই ধরনের আলোর ব্যবহারের আদর্শগত অনুপ্রেরণা এসেছিল ফরাসী দেশের গত শতাব্দির প্রথমভাগের 'ইমপ্রেশনিষ্ট চিত্রকলা'-র প্রভাবে। ইনপ্রেশনিষ্টরা বলেন ঃ 'আমরা বাস্তবকে দেখি একথা বলার থেকে বলা ভাল যে আমরা বাস্তবের বস্তুগুলি থেকে আগত আলোকরশ্মি চোখে দেখি। অর্থাৎ বস্তুর উপর পড়া অলোর বর্ণ ও চরিত্র পরিবর্তন করলে বাস্তবের দৃশ্যগত রূপ ও অন্যভাবে দর্শকের চোখে ধরা দেবে।'

ইতালীয় মাইকেলেঞ্জেলো আন্তনিওনির **রে ডেসার্ট** ছবিতে বাস্তবকে লাল রঙে অতি-রঞ্জিত করা হয়েছে। অথবা গোদার-এর **লা শিনোয়া** ছবিতে লাল রঙের আলো বারবার চরিত্রগুলির উপর ফেলে তাদের বিপ্লবী সত্ত্বার প্রকাশ ঘটানো হয়।

ফরাসী নবতরঙ্গ (new wave) আন্দোলনের অন্যতম পরিচালক অ্যালা বের্নঁ-র **নাইট-এন্ড-ফগ** ছবির বিষয় নাৎসী পরিচালিত অস্‌ভিৎস কারাগারের ইহুদি নির্ধনের স্মৃতি। অস্‌ভিৎস-এর 'বর্তমান' ছবি যেন পিকচার পোস্টকার্ড, দর্শকের চোখে পড়ে সোনালী-কমলা রং-এর শান্ত প্রকৃতির ছবি। হঠাৎ ক্যামেরা চলে যায় অতীতের নাৎসী কনসেনট্রোন ক্যাম্পের দৃশ্যে, দর্শক দেখেন যে সোনালী-কমলা রং-এর বদলে অতীত সামনে এসেছে সাদা-কালো রং রূপে। এ ছবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল শান্ত গোধূলির ইমপ্রেশনিস্ট রং থেকে ধূসর অতীতে সঞ্চরণ।

ইঙ্গমার বার্গম্যানের **ক্রাইস এন্ড হুইস্পারস** ছবিতে বারবার লাল বর্ণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, লাল এখানে রক্তের বর্ণ, বিদীর্ণ আত্মায় আঘাতের ক্ষত চিহ্নের প্রতীক। সোভিয়েত চলচ্চিত্রকার তারকোভস্কির ছবি **স্টকার**-এ নীলাভ আলোর নিরন্তর ব্যবহারে একধরণের আলৌকিক ও অপার্থিব জগৎ গড়ে উঠেছে।

৮.৯ গ্রাফিক্স

● গ্রাফিক কাকে বলে?

একটি মাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্র যে পাঁচটি সংযোগ-পদ্ধতি বা চ্যানেল (channel) নিয়ে তৈরি, চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক ক্রিস্টিয়ান মেৎজ্-এর মতে সেগুলি হল, দৃশ্য, কথা, পারিপার্শ্বিক শব্দ, আবহ-সঙ্গীত এবং গ্রাফিক্স, চলচ্চিত্রে কোন বার্তা বা বক্তব্য লেখার অক্ষর, রেখাচিত্র বা বিশেষ পদ্ধতি (special effect) ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করা হলে তাকে বলা হয় গ্রাফিক্স (graphics)।

সাধারণত গ্রাফিক্স তিনভাবে তৈরি করা হয়। এক : আক্ষরিক বর্ণমালা বা লিপি (lettering), দুই : রেখাচিত্র (diagram) এবং তিন : এ্যানিমেশন।

একটি কার্ড বা ক্যানভাসের উপর হাতে লিখে তার চিত্রগ্রহণ করে আক্ষরিক বর্ণমালা বা লিপির গ্রাফিক্স তৈরি করা

যায় অথবা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বা কম্পিউটারের সাহায্যে সম্পাদনার সময় অক্ষরগুলিকে ফিল্মের উপর সরাসরি ফুটিয়ে তুলেও গ্রাফিক্স তৈরি হতে পারে।

● লিপি ও রেখাচিত্র

আক্ষরিক বর্ণমালা দিয়ে গঠিত গ্রাফিক্স সাধারণত চলচ্চিত্রে তিনভাবে ব্যবহার করা হয়— টাইটেল ও ক্রেডিট, ইন্টার-টাইটেল এবং সাবটাইটেল। ছবি শুরুর সময় বা ছবি শুরুর একটু পরেই ছবিটির নাম কলাকুশলী, ক্যামেরাম্যান, সম্পাদক, পরিচালক ও প্রযোজক-এর নাম সম্বলিত লিখিত অক্ষরের যে গ্রাফিক্স দেখা যায় তাকে বলা হয় ছবির টাইটেল ও ক্রেডিট। টাইটেল ও ক্রেডিট-কে ছবি (film)-র মুখবন্ধ বলা যায়। টাইটেল ও ক্রেডিট তৈরি করার সময় তাই অনেক পরিচালক বা প্রযোজক সংস্থা তাঁদের বিশেষ শৈলী (sytle) অবলম্বন করেন। যেমন, সত্যজিৎ রায়ের **পথের পাঁচালী** ছবির টাইটেল-কার্ড বিশেষ ধরনের হস্তাক্ষর-এর ধরনে বা বিশেষ ধরনের ক্যালিগ্রাফি-তে লেখা হয়েছিল। আবার ঋত্বিক ঘটকের **সুবর্ণরেখা** ছবির টাইটেল-কার্ড তৈরি করা হয়েছিল গোল করে পাকিয়ে রখা (scroll) পুঁতির ঢং-এ, যার দ্বারা ঋত্বিক বোঝাতে চান **সুবর্ণরেখা** ছবিটি আসলে যেন কোন গোপন পুঁথির মধ্যে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অনুসন্ধান।

হলিউডের নামী প্রযোজনা কোম্পানীগুলি যেমন, এম.জি.এম, ইউনিভার্সাল, ওয়ার্নার ব্রাদার্স-এদের প্রত্যেকের ছবির টাইটেলও ক্রেডিট তৈরির পৃথক শৈলী (style) লক্ষ্য করা যায়। এদের প্রত্যেকের টাইটেলে বিশেষ ধরনের অক্ষর (lettering) বা লোগো (logo)-এর ব্যবহার যেখা যায়। এইসব বাণিজ্যিক প্রযোজক কোম্পানীগুলির ক্ষেত্রে টাইটেল হল কোম্পানীর আত্মপরিচয় প্রকাশের অন্যতম প্রধান উপায়।

নির্বাক যুগের ছবিগুলিতে আখ্যানের একটি পর্যায় (sequence) বা এপিসোড থেকে অন্য পর্যায় বা এপিসোডে যাবার সময় সংযোগ সূত্র বা লিঙ্ক (link) হিসাবে যে বাক্য শব্দগুলি পর্দায় লিখিত অবস্থায় ফুটে উঠতে দেখা যেত সেগুলিকে বলা হয় ইন্টার-টাইটেল। চার্লি চ্যাপলিনের ছবিতে এ ধরনের ইন্টার-টাইটেলের প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। ইন্টার-টাইটেলের ব্যবহারকে একটু অন্যভাবে প্রয়োগ করেছেন আইজেনস্টাইন ও কার্লড্রায়ার। আইজেনস্টাইনের ছবিতে ইন্টার-টাইটেল যেন ছবির পরবর্তি পর্যায়ের দৃশ্যগত বক্তব্যের সারকথার আক্ষরিক প্রকাশ, কেবলমাত্র আখ্যানের সূত্রধারক নয়। তাঁর **স্ট্রাইক** ছবির বিষয় হল, 'একটি শ্রমিক ধর্মঘট গড়ে উঠল ও ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর শাসকশ্রেণী প্রবল অত্যাচার নামিয়ে আনল।' ছবির শেষদিকে একটি চোখের বিরাট ক্লোজ শটের সঙ্গে ইন্টার-টাইটেল দেখা যায়, "প্রোলেটারিয়ানস্, রিমেম্বার!" (অর্থাৎ শাসক শ্রেণীর এই ভূমিকার কথা স্মরণ রাখুন!) এই ইন্টার-টাইটেল আখ্যানের সূত্রধারক নয়, বরং ছবির বক্তব্য বিষয় (discourse)-এর উপসংহার অংশ।

ঋত্বিক ঘটকের **সুবর্ণরেখা** ছবিতে ইন্টার-টাইটেলের ব্যবহার দেখা যায়, যেখানে সময় (filmic time)-কে বাস্তব-সময়ের (read time)-এর এক একটি পিণ্ড (chunk) হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। যেমন, এ ছবিতে ইন্টার-টাইটেল দেখা যায়, "আরও কয়েকটি বৎসর কাটিয়া গেল" বা "এ রাত্রিরও শেষ আছে। দিন কাটিয়া মাস, মাস কাটিয়া বৎসর...।" ইত্যাদি।

টাইটেল ও ইন্টার-টাইটেল ছাড়াও ছবিতে সাব-টাইটেলের মাধ্যমে গ্যাফিক্সের ব্যবহার হয়। ছবির চরিত্রগুলির কথা, সংলাপ, স্বগতোক্তি ইত্যাদি ভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করার জন্য পর্দায় ফ্রেমের ঠিক নিচের অংশে লিখে দেওয়া হয়, একেই বলা হয় সাব-টাইটেল। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সম্পাদনা কক্ষে, আজকাল কম্পিউটারের সাহায্যে ছবির সম্পাদনা শেষে এই কাজ করা হয়। এক ভাষার ছবির কথা, সংলাপ সাব-টাইটেলের সাহায্যে অন্য ভাষার দর্শকের কাছে বোধগম্য হয়। দর্শককে ছবির দৃশ্যাবলী দেখার সঙ্গে সঙ্গে সাব-টাইটেলও পড়ে নিতে হয়, তাই সাব-টাইটেলের বাক্যগুলি হওয়া উচিৎ যতটা সম্ভব ছোট, সহজভাষায় লেখা ও সহজবোধ্য। এক (কথ্য) ভাষা থেকে অন্য একটি (লিখিত) ভাষায় সাব-টাইটেলে তৈরির সময় যেন অনুবাদ যথাযথ কিন্তু সরল হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

চলচ্চিত্রে গ্রাফিক্সের প্রয়োগ অনেক সময় রেখাচিত্রের ব্যবহারের দ্বারাও করা হয়। একটি কাগজ বা ক্যানভাসের উপর আঁকা রেখাচিত্রের দৃশ্যগ্রহণ করে তা ফিল্মের মধ্যে ব্যবহার করা হয়। মোটামুটি তিনটি ক্ষেত্রে ছবিতে রেখাচিত্রের ব্যবহার বহুল প্রচলিত — এক, বিশেষত তথ্যচিত্রের ক্ষেত্রে যেসব ঐতিহাসিক স্থান, সৌধ, রাস্তা ইত্যাদি বদলে গেছে বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের লিখিত বিবরণ থেকে তৈরি প্রামাণ্য রেখাচিত্রের ছবি তুলে তার ব্যবহার করার প্রচলন আছে। যেমন ধরা যাক পুরোন কলকাতার একটি প্রাচীন গঙ্গার ঘাট যা প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে তার অঙ্কিত রেখাচিত্রের ছবি তুলে ইতিহাসের সময়কে বর্ণনা করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

দুই, যেসব দৃশ্য সরাসরি দেখানো ঠিক নৈতিক বা শোভন নয় সেসব ক্ষেত্রে রেখাচিত্রের দ্বারা দৃশ্যটি দর্শককে বোঝানো হয়। যেমন, দুর্ভিক্ষের ছবি বা গঙ্গার সরাসরি-দৃশ্য এতই ভয়ঙ্কর যে তা দেখানো নীতি বিরুদ্ধ বা অনেকসময় এ ধরণের দৃশ্য সরাসরি দেখানোয় ফিল্ম সেন্সার বোর্ডের আপত্তি থাকতে পারে, এসব ক্ষেত্রে রেখাচিত্র নির্ভর গ্রাফিক্স-এর সাহায্য নেওয়া হয়।

তিন, অনেক সময় বিশেষ কোন চিহ্ন (symbol)-কে আলাদাভাবে দেখানোর জন্য রেখাচিত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যেমন ঋত্বিক ঘটকের **যুক্তি-তর্ক-গল্প** ছবিতে টাইটেল কার্ড-এ একটি মাঙ্গলিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে যার ব্যবহার ছবির বিষয়ের সঙ্গে এতটাই বিপরীতধর্মী যে তা এক ধরনের শ্লেষ তৈরি করেছে।

● অ্যানিমেশন (animation)

চলচ্চিত্রে প্রতি সেকেণ্ডে চব্বিশটি ফ্রেম থাকে। জীবন্ত ছবির এই চব্বিশটি ফ্রেম আলাদা করে তোলা হয় না, চিত্রগ্রহণের সময় আপনা আপনিই প্রতি সেকেণ্ডে চব্বিশটি ফ্রেম থেকে যায়। কিন্তু অ্যানিমেশন গ্রাফিক্সের ক্ষেত্রে চব্বিশটি ভিন্ন ভিন্ন ছবি আঁকা হয়, তারপর এই চব্বিশটি ফ্রেমের এক সেকেণ্ডে গ্রহণ (record) করলে ছবির নড়াচড়া বোঝা যায়। অর্থাৎ যদি অ্যানিমেশন ছবিতে এক সেকেণ্ডে একটি হাত উপরে তোলা হল দেখাতে হয়, তবে হাতের উপরে উঠার চব্বিশটি পর্যায়ের ছবি এঁকে ফেলা হয়। তারপর এই চব্বিশটি পর্যায়ের ছবিকে যখন আমরা একসঙ্গে প্রতি সেকেণ্ডে চলচ্চিত্রের পর্দায় দেখি তখন মনে হয় বুঝি হাত উপরে উঠছে। অ্যানিমেশন গ্রাফাক্সি সাধারণত প্রতিটি ফ্রেমের ছবি আঁকতে হয়।

অ্যানিমেশন বিভিন্ন-ভাবে সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। অ্যানিমেশন সৃষ্টির পদ্ধতিগুলি সাধারণত চার প্রকার হতে পারে— এক, অধিক্য অ্যানিমেশন (drawn animation), খোদিত অ্যানিমেশন (engraving), কাট-আউট/ পুতুল অ্যানিমেশন (cut-out & puppet animation) এবং কম্পিউটার অ্যানিমেশন (computer animation)।

'অঙ্কিত অ্যানিমেশনে'র ক্ষেত্রে চব্বিশটি বিভিন্ন ছবি এঁকে কোন বস্তুর নড়া-চড়ার বিভিন্ন পর্যায় তৈরি করা হয়। এবার পর্দায় এক সেকেণ্ডে চব্বিশটি ফ্রেম দেখলে অধিক্য বস্তুর নড়াচড়া বোঝা যায়। এ ধরনের কাজ পরিশ্রম সাধ্য ও সময়-সাপেক্ষ। এই ধরনের অ্যানিমেশনের প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় ১৯০২ সালে জর্জ মেলিয়েস-এর **ভয়েজ টু মুন** ছবির একটি দৃশ্যে চাঁদের অ্যানিমেশনে। পরে 'অঙ্কিত অ্যানিমেশন'কে বিখ্যাত করেন মার্কিন অ্যানিমেশন ছবির জনক ওয়াল্ট ডিস্নি। তার অ্যানিমেশনের বিখ্যাত সৃষ্টি মিকি মাউস চরিত্র। ওয়াল্ট ডিসনি-ই প্রথম কথা বলা অ্যানিমেশন ও রঙিন অ্যানিমেশন তৈরি করেন। ১৯২৮ সালে প্রথম কথা বলা কার্টুন চরিত্রের দেখা পাওয়া যায় **স্টিমবোট উইলি** অ্যানিমেশন ছবিতে। ১৯৩২ সালে ডিসনি-র অ্যানিমেশন ছবিতে প্রথম রঙিন কার্টুনের ব্যবহার দেখা যায়।

কানাডার অ্যানিমেশন ছবির শ্রষ্টা নরম্যান ম্যাকলারেন সূঁচ, ছুরির তীক্ষ্ণ প্রান্ত ও রেজার, ব্লেড ইত্যাদির সাহায্যে ফিল্ম-স্টক বা সেলুলয়েডের উপর দাগ কেটে ও বিভিন্ন ছবি খোদাই করে কার্টুন ফিল্ম তৈরি করেন। এভাবে তৈরি অ্যানিমেশন ফিল্মকে বলা হয় খোদিত অ্যানিমেশন (engraving animation)। ম্যাকলারেনের **ব্লিংকেটি ব্ল্যাঙ্ক** অ্যানিমেশন বিভিন্ন ছবি খোদাই-এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে।

বিভিন্ন বস্তু ও চরিত্রের নরম কাট বা পিচবোর্ড দ্বারা নির্মিত কাট-আউট বা মাটি ইত্যাদি দ্বারা তৈরি পুতুল ব্যবহার

করেও অ্যানিমেশন ছবি তৈরি করা যায়। পূর্ব ইউরোপ, বিশেষত চেকোস্লোভাকিয়া এবং এশিয়ায় জাপানে এ ধরনের কাট-আউট ও পাপেট অ্যানিমেশন তৈরির জন্য বিখ্যাত।

চেকোশ্লভাকিয়ার অ্যানিমেশন পরিচালকদের মধ্যে জেরী ট্রাংকা, জনো মারগ্লোভা এঁদের কাট-আউট ও পাপেট অ্যানিমেশন ছবিগুলিতে রূপকথা, পরাবাস্তববাদী ইমেজ ইত্যাদির সৃষ্টিশীল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এ দেশেরই জঁ লেনিকা-র কাট-আউট গ্রাফিক্স এবং উইটোল্ড গিয়াস্ৎ-এর কাঁচের অপর অঙ্কিত গ্রাফিক্স বিখ্যাত। জাপানে পুতুল অ্যানিমেশনের সাহায্যে কল্প-বিজ্ঞান, লোককথা, উপকথা-র গল্প বলার কৌশল যথেষ্ট ভাল শিল্পের কদর পাচ্ছে। জাপানে মূলত পাপেট অ্যানিমেশন ছবি তৈরির জন্য বেশ কয়েকটি প্রযোজনা সংস্থা গড়ে উঠেছে যে গুলির মধ্যে তোয়ী (Toei) ও গাক্কেন (gakken) বেশ বড় সংস্থা। তোয়ী সংস্থার প্রধান প্রযোজক অ্যানিমেশন পরিচালক শ্রীমতি মেৎসু জিম্‌বো।

অ্যানিমেশন ছবিতে সর্বাধুনিক সংযোজন কম্পিউটার গ্রাফিক্স-এর সাহায্যে তৈরি ইমেজ-এর ব্যবহার। বিশেষত আমেরিকায় কম্পিউটার অ্যানিমেশন গ্রাফিক্সের বহুল প্রচলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, কল্পবিজ্ঞান ছবির অন্যতম প্রধান শ্রষ্টা স্টিফেন স্পিলবার্গ-এর বিখ্যাত **জুরাসিক পার্ক** (১৯৯২) ছবিতে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডাইনোসর-এর অ্যানিমেশন তৈরি করা হয়েছিল। এছাড়া হলিউডের পরিচালক জেমস্ ক্যামেরন-এর জনপ্রিয় **টাইটানিক** ছবিটিতে জাহাজ ভেঙ্গে দু টুকরো হয়ে পড়ার দৃশ্যটিতে বেশ কিছু কম্পিউটার দ্বারা সৃষ্ট গ্রাফিক অ্যানিমেশন ব্যবহার করা হয়েছিল।

৮.১০ সারাংশ

প্রত্যেক বার ক্যামেরা চালু করা ও বন্ধ করার মাঝে যে নিরবিচ্ছিন্ন ছবি সেলুলয়েড বা ভিডিও টেপে শ্রীহিত হয় তাকে বলা হয় দৃশ্যাংশ (shot)। দৃশ্যাংশগুলিকে পর পর জুড়ে চলচ্চিত্রের অবয়ব দেওয়া হয়। সুতরাং দৃশ্যাংশ চলচ্চিত্রের মূলগত একক (basic element/unit)।

অনেক সমালোচক চলচ্চিত্রের মধ্যে একটি দৃশ্যাংশকে একটি বাক্যের মধ্যে একটি শব্দ (word)-এর সঙ্গে তুলনা করেন। যদিও তাত্ত্বিকভাবে চলচ্চিত্রের ভাষা ও কথ্য/লেখার ভাষার মধ্যে ব্যবধান রয়েছে।

চলচ্চিত্রের দৃশ্য মূলত আলো রঙ দ্বারা গড়ে উঠে। দৃশ্যের মধ্যে থাকতে পারে মানুষ, বস্তু, স্থান ইত্যাদি। একটি দৃশ্যাংশ বিভিন্ন বস্তুগুলির ও মানুষ/সজীব বস্তু ইত্যাদির পারস্পরিক অবস্থানের ফলে যে আলো ও রঙের আভাস পর্দায় দেখা যায় তাই হল একটি শটের 'কম্পজিশন' (composition)। কম্পজিশন দৃশ্যাংশকে অর্থবহ ও ইঙ্গিতবহ করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

চলচ্চিত্রের দৃশ্যগ্রহণের মাধ্যম হল ক্যামেরা। দৃশ্যাংশের দাবি অনুসারে দৃশ্যগ্রহণের সময় পরিচালকের নির্দেশক্রমে ক্যামেরাচালক ক্যামেরাকে বিভিন্ন কোন (angle) বা অবস্থান (position)-এ স্থাপন করে ছবি তুলতে পারেন। যেমন যে বস্তু (object) বা স্থান (space) ছবি তোলা হচ্ছে ক্যামেরা তাকে উপরের দিক থেকে দেখলে বলা হয় 'টপ শট' বা 'হাই্ এ্যাঙ্গেল শট'। আবার ক্যামেরা বস্তু/চরিত্রকে একটু নিচু থেকে দেখলে তাকে 'লো এ্যাঙ্গেল শট' বলা হয়।

চলচ্চিত্রের ক্যামেরাকে উলম্ব অক্ষ বরাবর উপর থেকে নিচে নামানোর সময় ছবি তুললে তাকে 'টিল্ট ডাউন' বলা হয়, তেমনি ক্যামেরা উলম্ব অক্ষ বরাবর নিচ থেকে উপরে তুললে তা হয় টিল্ট আপ'। 'টিল্ট আপ' করলে বস্তু/ব্যক্তির নিচের অংশ থেকে ক্রমে উপরের অংশ দৃশ্যমান হয়। বিপরীত ঘটনা ঘটে টিল্ট ডাউনে।

চলচ্চিত্রের ক্যামেরাকে ডানদিক থেকে বাঁদিকে বা বাঁ থেকে ডান দিকে ঘুরিয়ে ছবি তুলতে থাকলে তাকে যথাক্রমে রাইট টু লেফট 'প্যানিং ও লেফট টু রাইট 'প্যানিং' বলা হয়। ক্যামেরাকে সম্পূর্ণভাবে স্থানান্তরিত করার সময়ও ছবি তোলা যায়। সেক্ষেত্রে দুটি লোহার বা ধাতব লাইনের উপরের পাটাতনে ক্যামেরা রেখে চলমান অবস্থায় 'ট্র্যাকিং শট' নেওয়া যায় বা সমতল মেঝে হলে সাধারন চাকা লাগানো পাটাতনের ব্যবহারও একই ফল দেয়।

ছবি তোলার আগে, যদি যথেষ্ট প্রাকৃতিক আলো না থাকে তবে যে ব্যক্তি/বস্তু ও স্থানের শট নেওয়া হচ্ছে তাকে যথেষ্ট ও যথাযথভাবে আলোকিত (lighting) করতে হয়। একটি দৃশ্যাংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে কী ধরনের 'লেন্স' ব্যবহার করা হচ্ছে তাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

৮.১১ অনুশীলনী

(নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী)

১। চলচ্চিত্রের গঠনগত একক কী?

২। 'লঙ টেক' কাকে বলা হয়?

৩। 'ফ্রিজ শট' কাকে বলে?

৪। 'প্যানিং' কী ধরনের ক্যামেরা সচলতা?

(স্বল্প দৈর্ঘ্যের উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী)

১। উদাহরণ সহ 'লং শট' ও 'ক্লোজ শট' বর্ণনা করুন।

২। 'চলচ্চিত্রের ভাষা' ও লেখ্য/কথ্য ভাষার মধ্যে পার্থক্যগুলি লিখুন।

৩। 'ট্র্যাকিং' ও 'ট্রলি শট' উদাহরণ সহ বোঝান।

৪। চলচ্চিত্রের গ্রাফিক্সের ব্যবহার—টীকা লিখুন।

৫। টীকা লিখুন— অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র।

(দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী)

১। চলচ্চিত্রে দৃশ্য-সংগঠন বা 'কম্পজিশন' উদাহরণসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।

২। দৃশ্যগ্রহনে ক্যামেরা কোণ ও বিভিন্ন লেন্সের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

৩। চলচ্চিত্র নির্মাণের আলোর ভূমিকা কী? বিভিন্ন প্রকার আলোক উৎস চলচ্চিত্রের দৃশ্যগ্রহণে কিভাবে ব্যবহার করা হয়?

৪। চলচ্চিত্রে দৃশ্যগ্রহণের বিভিন্ন দিক সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৮.১২ গ্রন্থপঞ্জী

১। হাউ টু রিড এ ফিল্ম : জেমস মোনাকো, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড-নিউইয়র্ক, রিভাইসড এডিশন, ১৯৮১

২। চলচ্চিত্রের অ আ ক খ : ধীমান দাশগুপ্ত, বাণীশিল্প, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬

৩। বিষয় চলচ্চিত্র : সত্যজিৎ রায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা তৃতীয় মুদ্রণ (১ম সংস্করণ), ১৯৯৩
[প্রবন্ধ : চলচ্চিত্রের ভাষা ও চলচ্চিত্র রচনা]

৪। ইডিওলজি এন্ড দি ইমেজ : বিল নিকল্স, ইন্ডিয়ানা, ইউনিভার্সিটি প্রেস, ব্লুমিংটন, ১৯৮১ [চ্যাপ্টার-ফোর]

৫। ফিল্ম আর্ট অ্যান ইন্ট্রোডাকশান : ডেভিড বর্ডওয়েল ও ক্রিস্টিন থমসন, দি ম্যাকগ্রোহিল কম্পানীস্, নিউইয়র্ক-নিউদিল্লি, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৯৭।

একক ৯ ❐ চলচ্চিত্র সম্পাদনা : দৃশ্যাংশগুলির সংযুক্তি

গঠন

৯.০ সম্পাদনা

৯.১ উদ্দেশ্য

৯.২ প্রস্তাবনা

৯.৩ কিভাবে দৃশ্যাংশগুলিকে জোড়া হয়

৯.৪ কাট

৯.৫ ডিসলভ, ফেড ইন ফেড আউট ও ওয়াইশ

৯.৫.১ ফেড আউট, ফেড ইন এবং ওয়াইপ্

৯.৬ ম্যাচ কাট্

৯.৬.১ সংজ্ঞা ও প্রয়োগ

৯.৬.২ বিভিন্ন ম্যাচ কাট্

৯.৭ চলচ্চিত্রে স্থান ও কালের ধারাবাহিকতা

৯.৭.১ চলচ্চিত্রের স্থান ও কাল

৯.৭.২ সময়-এর ধারাবাহিক উপস্থাপনা

৯.৭.৩ স্থানের ধারাবাহিক উপস্থাপনা

৯.৮ জাম্প কাট

৯.৮.১ সংজ্ঞা ও প্রয়োগ

৯.৮.২ বিভিন্ন কৌশল

৯.৯ প্রতিষ্ঠাকারী শট (master shot) ও কাট ইন

৯.১০ সন্নিবিষ্ট শট (insert) ও কাট অ্যাওয়ে

৯.১১ ফ্ল্যাশ ব্যাক-ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ড

৯.১২ সারাংশ

৯.১৩ অনুশীলনী
৯.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

৯.১ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ে আপনি জানবেন ঃ

- চলচ্চিত্র সম্পাদনার সাধারণ রীতি-পদ্ধতি।
- চলচ্চিত্রে একটি দৃশ্যাংশ থেকে অন্য দৃশ্যাংশে যাবার কৌশলগুলি কী ধরনের হতে পারে।
- চলচ্চিত্র সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন পদ্ধতিগুলির প্রয়োগরীতি।
- চলচ্চিত্র সম্পাদনার সঙ্গে বিভিন্ন পরিভাষা ও তাদের সংজ্ঞা।
- চলচ্চিত্র সম্পাদনার সাহায্যে কিভাবে একটি গল্প বলা হয় বা একটি কাহিনী গড়ে ওঠে তার আলোচনা।
- চলচ্চিত্রের সম্পাদনা কিভাবে নিরবিচ্ছিন্ন স্থান-কালের অনুভূতি সৃষ্টি করে থাকে তার ব্যাখ্যা।
- চলচ্চিত্র সম্পাদনার প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রতিষ্ঠানবিরোধী রীতি ইত্যাদি।

৯.২ প্রস্তাবনা

চলচ্চিত্রের আদিযুগে চলচ্চিত্র সম্পাদনা অর্থাৎ ক্যামেরায় তোলা ছবি থেকে কাটা-ছেঁড়া করে নির্বাচিত অংশ রাখা ও অপ্রয়োজনীয় অংশ বর্জন করার পদ্ধতির অস্তিত্ব ছিল না। ক্রমে চলচ্চিত্র যত বেশি করে গল্প বলার আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করল ততই সম্পাদনার প্রয়োজন দেখা দিতে থাকল। অর্থাৎ একথা বলা ঠিক নয় যে চলচ্চিত্রের সম্পাদনা রীতির উন্নতির ফলে মানুষ চলচ্চিত্রের পর্দায় গল্প বলতে শিখল। বরং বলা যায় যে চলচ্চিত্রে গল্প বলার প্রবল আগ্রহের ফলেই সম্পাদনা পদ্ধতির উন্নতির কথা মানুষ ভেবেছে ও সফল হয়েছে। আধুনিক চলচ্চিত্রে বিভিন্ন শটগুলিকে কোথায় কিভাবে জোড়া হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে সমগ্র ছবিটির গুণগত মান। অর্থাৎ সম্পাদনা চলচ্চিত্র ভাষা প্রয়োগের অন্যতম প্রধান ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে দেখা দিয়েছে।

৯.৩. কিভাবে দৃশ্যাংশগুলিকে জোড়া হয় (সম্পাদনা)

চিত্রগ্রহণ (shooting) পরবর্তি কর্মকাণ্ড ঃ- চলচ্চিত্র প্রস্তুতির ক্ষেত্রে তিনটি প্রধান ধাপ (section) বর্তমান। প্রথমতঃ- চিত্রগ্রহণ-পূর্ব (pre-production) প্রস্তুতি। এ পর্যায়ে রয়েছে ছবির বিষয় বা গল্প নির্বাচন, চিত্রনাট্য রচনা, চিত্র গ্রহণের স্থান (location) নির্বাচন ইত্যাদি। চলচ্চিত্র তৈরির দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে চিত্রগ্রহণ বা স্যুটিং। এই পর্যায়ের কাজকে প্রোডাকশন (production) বলা হয়।

চিত্রগ্রহণ (shooting)-এর পরে চলচ্চিত্র নির্মাণের যে তৃতীয় ও শেষ পর্যায়ের কাজ বাকি থাকে তা হল সম্পাদনা (editing)। সম্পাদনা ইত্যাদিকে চিত্রগ্রহণ-পরবর্তি (post-production) কাজ বলা হয়।

আমরা আগেই বলেছি যে একবার ক্যামেরা চালু করে দৃশ্যগ্রহণ করা ও তারপর ক্যামেরা বন্ধ করার মধ্যে যে সময়টুকুর নিরবিচ্ছিন্ন ছবি পাওয়া যায় তাকে বলা হয় একটি দৃশ্যাংশ বা শট। অর্থাৎ প্রত্যেকটি শট নিতে গেলে একবার করে ক্যামেরা চালু করতে হয় এবং ক্যামেরা বন্ধ করতে হয়। একাধিক শটকে চলচ্চিত্রে কিভাবে পরপর জুড়ে একটি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজটি করা হয় সম্পাদনার সময়।

সম্পাদনার কাজটি আসলে পছন্দ বা বর্জন (selection or rejection)-এর সিদ্ধান্তের কার্যকর রূপ। সম্পাদক পরিচালকের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেন যে কোন দৃশ্যাংশ (shot)-এর পরে কোন দৃশ্যাংশটি রাখা হবে, অথবা কোন দৃশাংশ ক্রটিপূর্ণ বলে বর্জন করা হবে। এছাড়া বিশেষ কৌশল (special effect) আরোপ, গ্রাফিক্সে টাইটেল, ইন্টার টাইটেল ও সাব-টাইটেল যোগ করা, দৃশ্যে শব্দ যোগ করা ও শব্দ শব্দ-পথগুলির মিশ্রণ ঘটানো এবং শেষ পর্যন্ত প্রদর্শন যোগ্য প্রিন্ট প্রস্তুত করা এসবই সম্পদানার বিভিন্ন পর্বে। পরিকল্পিত, অর্থবহ ও নিপুণ সম্পাদনা ব্যতিরেকে কোন চলচ্চিত্র উপযুক্তভাবে নির্মিত হয় না।

উপরোক্ত দৃশ্য বা শব্দ পথগুলির মিশ্রণ বা পরপর জুড়ে পূর্ণাঙ্গ ছবির তৈরি ক্ষেত্রে যেসব পরিচিত সম্পাদনা-যন্ত্র (editing machine)-গুলি ব্যবহার করা হয় তাদের মধ্যে বিখ্যাত হল 'মুভীঅলা' (moviola), 'স্টিনবেক' (steenbeck) ও 'কেম' (kem) প্রভৃতি ব্র্যাণ্ড। তিরিশের দশক থেকে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত ইউরোপ আমেরিকা ও অন্যন্য দেশে 'মুভীঅলা' ব্র্যাণ্ডের 'সম্পাদনা-যন্ত্র' বেশি ব্যবহার করা হত। '৬০-এর দশক থেকে 'স্টিনবেক' ও 'কেম' ব্র্যাণ্ডের যন্ত্রের ব্যবহার বেশি করে হতে থাকে কারণ এগুলিতে অপক্ষোকৃত দ্রুত অনেকগুলি দৃশ্য/শব্দ পথ নিয়ে কাজ করা যায়।

সম্পাদনা টেবিলে অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি কেটে বাদ দেওয়ার পর প্রয়োজনীয় সেলুলয়েডের টুকরোগুলি পরিকল্পিতভাবে পর পর জোড়া হয় একধরনের রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে। একে ফিল্ম সিমেন্ট (film cement) বলা হয়। দৃশ্য অংশগুলির সঙ্গে এর সঙ্গে সাজুর্য্যপূর্ণভাবে শব্দপথের ঐক্য ঘটানো হয়। অর্থাৎ দৃশ্যপথ ও শব্দপথের দুটি সেলুলয়েডের লম্বা ফিতেকে পাশাপাশি পরস্পরের সঙ্গে যোগ করা হয়। দৃশ্যপথ ও শব্দপথ একসঙ্গে যোগ করলে যে প্রিন্ট তৈরি হয় তাকে বল হয় 'ম্যারেড প্রিন্ট' (married print)। এই 'ম্যারেড প্রিন্ট' হল সবাক চলচ্চিত্রের উপাদান যাকে প্রোজেক্টর (projector)-এর সাহায্যে চালালে দৃশ্য ও শ্রাব্য দুই-ই পাওয়া যায়।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে দৃশ্যপথ (image track)-এর তুলনায় শব্দপথ (sound tracks)-এর মিশ্রণ ও সম্পাদনা অনেক জটিল। প্রথমত, সম্পাদনার পূর্বে শব্দপথ তৈরি করতে হয় একাধিক। সংলাপ, পারিপার্শ্বিক শব্দ ও সঙ্গীত এই তিন ধরনের শব্দের জন্য প্রাথমিকভাবে তিনটি শব্দপথ রেকর্ড করা হয়। পরে সম্পাদনার সময় ঐ তিনটি শব্দপথকে মিশ্রিত করে শেষপর্যন্ত একটি শব্দপথ তৈরি করা হয় যার সঙ্গে দৃশ্যপথের 'ম্যারেড প্রিন্ট' প্রস্তুত করা হয়। এছাড়া চিত্রগ্রহণের সময় প্রত্যক্ষভাবে (direct sync, sound) করা হতে পারে, অথবা সম্পাদনার সময় সংলাপ রেকর্ড বা 'ডাবিং' করে এবং অন্যান্য শব্দ কৃত্রিমভাবে তৈরি করাও শব্দপথ নির্মাণ করা যেতে পারে।

সম্পাদনার সময় দৃশ্য বা শব্দের অংশ নির্বাচন ও বর্জন করার সময় প্রধানত দু-ধরনের পদ্ধতি নেওয়া হয়। প্রথমত, দৃশ্যপথের সম্পাদনা প্রথমে করা হয়। তারপর দৃশ্যের সঙ্গে সাজুর্য্যপূর্ণ (matching) শব্দ যোগ করা বা তৈরি করা হয়। দ্বিতীয়ত, শব্দগুলির সম্পাদনা প্রথমে করা হয়, তারপর সেগুলি মিশ্রিত করে একটি শব্দ নির্মাণ করা হয়। এবার এই সম্পাদিত শব্দপথের সঙ্গে মিলিয়ে দৃশ্যগুলিকে পরপর যোগ করা হয়। তথ্যচিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সাধারণত দ্বিতীয় পন্থাটি বহুল প্রচলিত।

চলচ্চিত্রে প্রতি সেকেণ্ডে চব্বিশটি সেলুলয়েড ফ্রেম থাকে। অর্থাৎ একটি পূর্ণাঙ্গ দেড় ঘন্টার ফিল্মে প্রায় এক লক্ষ তিরিশ হাজার ফ্রেম সম্পাদনা করতে হয়।

৯.৪ 'কাট'

বাস্তবের সময় ও স্থান যেমন নিরবিচ্ছিন্নভাবে অনুভূত হয় চলচ্চিত্রে তা হয় না। ফিল্মে একটি কাজ (action) দেখানোর জন্য স্থান ও সময়-এর টুকরো টুকরো অংশের ছবি পর পর জুড়ে দেওয়া হয়। যেমন, চলচ্চিত্রে যদি দেখাতে হয় একটি লোক বাড়ি থেকে অফিস যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বেরোচ্ছে তবে ক্যামেরা সব সময় লোকটির ছবি তোলে না। হয়ত প্রথমে দেখানো হল সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পোশাক পড়ছে, পরের দৃশ্যাংশে দেখা গেল সে ফ্ল্যাটের

দরজা খুলে বেরোচ্ছে তারপর হয়ত দেখানো হল যে সে বাসস্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করছে, হাতে অফিস যাবার উপযুক্ত ফোলিও ব্যাগ ইত্যাদি।

উপরের উদাহরণটিতে যে টুকরো বা কাটা-কাটা অংশগুলিকে জুড়ে দৃশ্য (scene) তৈরি হল সেখানে বিভিন্ন স্থান ও সময়ের অংশগুলি একের পর এক যুক্ত হওয়ার অন্যতম পদ্ধতি হল 'কাট' (cut)। পর্দায় যখন দর্শক দেখেন যে একটি দৃশ্যপ্রতিমা (image)-এর স্থানে সরাসরি অন্য দৃশ্যপ্রতিমা বা ইমেজ চলে এলো তখন বুঝতে হবে যে দুটি দৃশ্যাংশ (shot)-এর মাঝে একটি 'কাট' থেকে গেছে।

ফিল্ম আর্ট : এ্যান ইন্ট্রোডাকশন হইতে বর্ডওয়েল ও থমসনের সংজ্ঞায়, "সেলুলয়েডের দুটি নিরবিচ্ছিন্ন অংশ পর পর একটির প্রান্তের সঙ্গে অন্যটির প্রান্ত সরাসরি (ফিল্ম-সিমেন্ট ইত্যাদি দ্বারা) যুক্ত হলে, একটি দৃশ্যাংশ থেকে অন্য দৃশ্যাংশে যাবার (transition) মধ্যে একটি 'কাট' (cut) থেকে গেল বলা হয়।"

চলচ্চিত্রের আদিযুগে (early period, 1895-1902) সম্পাদনা ও 'কাট' ইত্যাদি ছবিতে থাকত না। একটির রিল (real)-এ যতটা ফিল্ম থাকত তার সবটা নিয়েই একটি নিরবচ্ছিন্ন 'এক রিল'-এর (one realer) ছোট চলচ্চিত্র (দশ থেকে বারো মিনিটের) তৈরি হত।

১৯০৩ সালে এডুইন পোর্টারের **লাইফ অব এন আমেরিকান ফায়ারম্যান** ছবিতে কাটিং (cutting)-এর সম্ভাবনাময় ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তার পরের ছবিগুলিতে এবং প্রধানত ডি. ডাব্বু, গ্রিফিথের ছবিতে সম্পাদনা, বিশেষত কাটিং (cutting) চলচ্চিত্র শিল্পের অন্যতম ও অনিবার্য প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে গুরুত্ব পায়। সম্পাদনা বা বলা যায় প্রধানত 'কাট' (cut)-এর ব্যবহার চলচ্চিত্রকে দিয়েছে উপন্যাসের মত বর্ণনা পদ্ধতি। উপন্যাস যেমন বিভিন্ন স্থান, কাল ও চরিত্রের টুকরো টুকরো বর্ণনার সমন্বয়ে একটি আখ্যানকে গড়ে তোলে তেমনি 'কাট' (cut)-এর ব্যবহারের দ্বারা চলচ্চিত্রেও এ ধরনের টুকরো টুকরো বর্ণনার সাহায্যে আখ্যান নির্মাণ সম্ভব হতে থাকল।

চলচ্চিত্রে 'কাট' (cut)-এর ব্যবহারের সবচেয়ে বড় সফল হল মন্‌তাজ (montage)। ফরাসী মন্‌তাজ শব্দের অর্থ এডিটিং (editing) বা সম্পাদনা। সাধারণত কম সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি দৃশ্যাংশ (shot) পর পর পরিকল্পনা-মাফিক জুড়লে মন্‌তাজের জন্ম হয়। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মন্‌তাজ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন হলিউড ছবিতে বিশেষত ডি. ডাব্লু. গ্রিফিথের ছবিতে দেখা যায় ছোট ছোট সময়কালের দৃশ্যাংশগুলি কাটের সাহায্যে যোগ করে অখ্যান নির্মাণ করা হয়। বিভিন্ন স্থান ও কালের বিভিন্ন ঘটনাগুলিকে গল্পের প্রয়োজনমত ছোট ছোট শটে বারবার 'কাট' করে দেখানোর পদ্ধতিকে মন্‌তাজ বলা সাধারণ অর্থে যেতে পারে।

তবে মন্‌তাজকে সম্পূর্ণ অন্য অর্থে ব্যবহার করতেন ১৯২০-এর দশকের সোভিয়েত চলচ্চিত্রকাররা। মূলত কুলেশভ, আইজেনস্টাইন, পুডভকিন ও ভের্তভ বিশেষভাবে ও প্রত্যেকের নিজস্ব ঢঙে মনতাজের প্রয়োগ শুরু করেন। লেভ কুলেশভ একটি পরীক্ষায় দেখান যে বিভিন্ন স্থান ও কালে গ্রহণ করা কয়েকটি শট কিভাবে 'কাট'-এর সাহায্যে পর পর জুড়ে একটি মন্‌তাজ সিকোয়েন্স তৈরি করে যার ফলে একটি সম্পূর্ণ নতুন অর্থের উদ্ভব হয় যে অর্থ ঐ শটগুলির মধ্যে এককভাবে ছিল না।

কুলোভ পরীক্ষায় দেখা যায়— দুটি পৃথক শটে দুটি ভিন্ন স্থান থেকে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হেঁটে এল। তারা পরের শটে মিলিত হল মস্কো শহরের একস্থানে। ছেলেটি মেয়েটিকে আঙুল তুলে কিছু দেখালো। পরের শটে দেখা গেল একটি সাদা বাড়ি আমেরিকায় (হোয়াইট হাউস) ও তার সিঁড়ি। পরবর্তি শটে দেখা যায় যে ছেলেটি মেয়েটির হাত ধরে আমেরিকার (হোয়াইট হাউসের) সিঁড়ি দিয়ে উঠছে।

সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন স্থান-কালের শটগুলি এভাবে পরিকল্পনামত জুড়ে গল্পের কাঠামো দেওয়া সম্ভব এবং এই মনতাজ সিকোয়েন্স আবার গল্পের কাঠামো অতিক্রম করে নতুন অর্থবোধক হয়ে উঠতে পারে। পরে ভের্তভ ও আইজেনস্টাইনের ছবিতে এই মনতাজ আরও জটিল শৈল্পিক রূপ নেয়।

আইজেনস্টাইনের কাছে 'কাটিং' বা এডিটিং-হল চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর মতে একটি চলচ্চিত্রকে

অর্থবহ করতে পারে উপযুক্ত ছন্দে 'কাট'-এর ব্যবহার। সুতরাং মন্তাজ ছিল তাঁর ছবিতে প্রধান বিষয়। আইজেনস্টাইনের ছবিতে 'কাট'-এর সাহায্যে পরপর এমন দুটি শটকে যোগ করা হয় যারা পরস্পরের সঙ্গে বিষয়গত ও দৃশ্যগতভাবে সংঘাতপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। তাঁর ছবিতে 'কাট' এমন ধরনের দুটি দৃশ্যাংশকে পর পর জুড়ে দেয় যা তৃতীয় একধরনের বিমূর্ত অর্থ সৃষ্টি করে থাকে। আইজেনস্টাইনের সমসাময়িক জিগা ভের্তভের মন্তাজ অনেক সময় তৈরি অত্যন্ত স্বল্প সময়ের ছোট ছোট শটের মাধ্যমে। ভের্তভ এভাবে 'কাট' করে একধরনের ছন্দবদ্ধ মন্তাজ তৈরি করতেন।

সাধারণ ক্ষেত্রে অনেকসময়ই মন্তাজ ব্যবহার করা হয় কম সময়ে দৃশ্যগত তথ্য (information) সরবরাহ করতে। অনেক সময় আবার তাড়া করার দৃশ্য (chose sequence) বা অন্যক্ষেত্রে সাসপেন্স (Suspense) তৈরি করতে দ্রুত 'কাট' ব্যবহার করা হয়।

৯.৫ ডিসলভ, ফেডইন ফেড আউট ও ওয়াইপ

'কাট' (cut) ছাড়াও এক দৃশ্যাংশ থেকে অন্য দৃশ্যাংশে যাওয়া (transition)-র অনেক ধরনের উপায় চলচ্চিত্রে বর্তমান। তার মধ্যে অন্যতম হল 'ডিস্‌লভ' (dissolve)। ডিস্‌লভ-এর ক্ষেত্রে পূর্ববর্তি দৃশ্যপ্রতিমা (image) পর্দায় ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হতে থাকে এবং একই সঙ্গে পর্দায় পরবর্তি দৃশ্যপ্রতিমা ফুটে উঠতে থাকে। দৃশ্যান্তরে যাবার বা ভিস্যুয়াল ট্রানসিশন (visiual transition)-এর ক্ষেত্রে ডিস্‌লভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ্ধতি।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে 'কাট' যেমন অপেক্ষাকৃত 'রুক্ষ্ম দৃশ্যান্তর' (hard transition), তেমনি 'ডিসলভ' হল তুলনায় 'কোমল দৃশ্যান্তর' (soft transition)। 'ডিস্‌লভ' সাধারণত স্থান ও কালের খুব বেশি নয় আবার খুব কমও নয় এরকম ব্যবধানকে বোঝায়। অর্থাৎ একটি 'কাট' যদি পূর্ণচ্ছেদের ভূমিকা পালন করে। তবে একটি 'ডিস্‌লভ' একটি অনুচ্ছেদ (paragraph)-এর সমাপ্তি ও নতুন অনুচ্ছেদ শুরুর সূচক। অর্থাৎ দৃশ্যাংশ (shot) থেকে অন্য দৃশ্যাংশে যাবার পদ্ধতি যদি হয় 'কাট', তবে সাধারণত দৃশ্য (scene) থেকে দৃশ্যান্তরে যাবার পদ্ধতি হল 'ডিস্‌লভ'। কিন্তু চলচ্চিত্রের ভাষায় যেহেতু কোন ব্যকরণের বাঁধাধরা নিয়ম নেই, তাই পরিচালক ডিস্‌লভের প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন প্রথাগত নিয়ম মানতে বাধ্য নন।

ডিসলভের চমৎকার ও প্রথাগত প্রয়োগ দেখা যায় সত্যজিৎ রায়ের **পথের পাঁচালী** ছবিতে। এই ছবিতে পরিচালক গ্রামবাংলার টুকরো-টুকরো দৃশ্য (scene) গুলিকে পরপর সাজিয়ে আখ্যান নির্মাণ করেছেন। দৃশ্যান্তরে বা এক পর্ব থেকে অন্য পর্বে যাবার পদ্ধতি হিসাবে **পথের পাঁচালী** ছবিতে বেশ কিছু 'ডিস্‌লভ' ব্যবহার করা হয়েছে। ধরা যাক অপুর প্রথম দিন পাঠশালায় যাবার প্রস্তুতির পর্ব থেকে ডিস্‌লভ করে দেখানো হচ্ছে অপুর পাঠশালায় পড়াশুনোর পর্বের দৃশ্য। একই দৃশ্যপর্যায়ে (sequence)-এর মধ্যে দৃশ্যান্তরে বা পর্বান্তরে যাবার উপায় হিসাবে ডিস্‌লভ ব্যবহার করা হল।

নিচে ডিস্‌লভ-এর তিন ধরনের প্রয়োগের সম্ভাবনার কথা বলা হল :

(১) একই দৃশ্যপর্যায় (sequence)-এর মধ্যে স্থান ও কালের সামান্য ব্যবধান বোঝানোর ক্ষেত্রে **পথের পাঁচালী**-র ক্ষেত্রে ডিস্‌লভের এ ধরনের ব্যবহার লক্ষ্যনীয়।

(২) একটি দৃশ্যের শেষ দৃশ্যাংশ (shot)-এর সঙ্গে পরের দৃশ্য (scene)-এর প্রথম দৃশ্যাংশের বিষয়বস্তু, জ্যামিতি বা মুড (mood)-এর সাজুয্য বা বৈপরীত্য নির্দেশ করতে।

(৩) অনেক সময় কোন ফিল্মের শীর্ষদৃশ্য (opening title) তৈরি করতে বেশ-কয়েকটি দৃশ্যাংশ দ্রুত একে অন্যের সঙ্গে ডিস্‌লভ করা হয়ে থাকে।

ঋত্বিক ঘটকের **সুবর্ণরেখা** ছবির একটি দৃশ্যান্তরের উদাহরণ চিত্রনাট্য থেকে দেওয়া যায়, যেখানে ডিসলভ বা মিক্সিং-এর উপরোল্লিখিত প্রথম দুটি প্রয়োগ দেখানো যেতে পারে :

● মিড শট — ফ্যাক্টরীর ভিতর। মুখার্জি ও ঈশ্বর ফার্নেসের সামনে। মুখার্জি খবরের কাগজ পড়তে থাকে 'মানুষ চুর্নিল আজ নিজ মধ্য সীমা... মাহাকাশে প্রথম অভিযাত্রী...' ইত্যাদি cut

● ক্লোজ শট — ঈশ্বর ও মুখার্জ্জি। মুখার্জি ঈশ্বরকে বলে : 'দেখেছেন, রাশিয়ানরা গ্যাগারিন বলে একটা লোককে শূন্যে পাঠাইছে - এ্যাঁ।' cut

● ক্লোজ শট — খবরের কাগজে গ্যাগারিনের ছবি cut

● মিট শট — ঈশ্বর কাগজটা মুখার্জির হাত থেকে কেড়ে নেয় cut

● ক্লোজ শট — ঈশ্বর কাগজটা ফার্নেসের ভিতর ছুঁড়ে ফেলে — কাগজটা জ্বলতে থাকে।

● ক্লোজ শট — কাগজটা জ্বলছে।

ডিসলভ (dissolve) –

লঙ শট — সীতার বস্তি বাড়ি। মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। দূর থেকে দেখা যায় সীতা জানালার দিকে পিছন ফিরে তানপুরা হাতে রাগাশ্রয়ী গান গাইছে —'খেলন আয়ে জোরী...' ইত্যাদি।

উপরোক্ত উদাহরণে ডিসলভ-এর মাধ্যমে আখ্যানকে একটি স্থান (ছাতিমপুর, সুবর্ণরেখা নদীর তীর) থেকে অন্য স্থানে (কলকাতা, সীতার বস্তি বাড়ি) নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কেবল মাত্র স্থানান্তরই নয়। দুটি দৃশ্যের মুড ইত্যাদির বৈপরীত্যও ডিসলভের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে। ডিসলভে আগের শটের আগুন ও পরের শটের বৃষ্টি, ঈশ্বরের প্রবল ক্রোধ থেকে পরের শটে-র তার বোন সীতার গাওয়া শান্ত রাগ সঙ্গীত, জ্বলন্ত কাগজের ক্লোজ শট থেকে লঙ শট, ইত্যাদি বৈপরীত্যের মাঝে ডিসল্‌ভ-এর ভূমিকা রয়েছে।

অরসন ওয়েলস-এর **সিটিজেন কেন** ছবিতে স্থান ও কালের ব্যবধান বা স্থানান্তর ও সময়ান্তর বোঝাতে ডিসল্‌ভ-এর অসাধারণ ব্যবহার দেখা যায়। ছবির শুরুতে প্রান্তর যুক্ত একটি বিশাল বাড়ির এক্সট্রিম লং থেকে মিড ক্লোজের দিকে শট্‌গুলি পরস্পরের সঙ্গে যোগ করা হয়েছে ডিসল্‌ভ-এর সাহায্যে। অর্থাৎ ক্যামেরা ট্র্যাক ইত্যাদি না করিয়েই দর্শকের দৃষ্টিকে ক্রমে বাড়ির কাছে আনা হচ্ছে। এ ছবিরই একটি দৃশ্যে (scene-এ) প্রধান চরিত্র চার্লস ফস্টার কেন-এর ছোটবেলা থেকে বড় হওয়া দেখাতে ছোট কেনও তুলনায় বড় কেন-এর দুটি শটের মাঝে ডিসল্‌ভ ব্যবহার করে সময়ান্তর বোঝানো হয়েছে।

৯.৫.১ ফেড আউট, ফেড ইন এবং ওয়াইপ্‌

চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য-প্রতিমা (image)-র ধীরে ধীরে অন্ধকার ফ্রেমে অদৃশ্য হওয়া এবং কয়েক মুহূর্ত পরেই অন্ধকার থেকে নতুন দৃশ্য-প্রতিমা দৃশ্যমান হওয়ার পদ্ধতির প্রথম অংশটিকে ফেড-আউট ও পরের অংশটিকে ফেড-ইন বলা হয়। প্রসঙ্গত চলচ্চিত্রের দৃশ্য (visual)-এর ফেড আউট (fade out) বা ফেড-ইন (fade in)-এর মত শব্দ ও আবহসঙ্গীত ইত্যাদিরও ফেড-আউট/ইন হতে পারে।

প্রথানুসারে ফেড-আউট ও ফেড-ইন স্থান ও কালের দীর্ঘ ব্যবধান বোঝায়। ফেড আউট হওয়া দৃশ্যাংশ (shot)-এর স্থান ও কালের সঙ্গে ফেড-ইন করা দৃশ্যাংশ (shot)-এর স্থান ও কালের ব্যবধান সাধারণত কাট বা ডিসলভ-এর তুলনায় অনেক বেশি। ঋত্বিক ঘটকের **সুবর্ণরেখা** ছবির চিত্রনাট্য থেকে উদাহরণ দেওয়া যাক :

স্থান — সীতার বস্তিবাড়ি, ঘরে ঈশ্বরের বোন সীতা আত্মহত্যা করেছে, ঘরের বাইরে—

ক্লোজ শট : ঈশ্বর মাটিতে পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। (কাট)

ক্লোজ শট : (সীতার ছেলে ছোট্ট) বিনু তাকিয়ে দেখছে (কাট)

ক্লোজ শট : বিনু মুখ, বিস্ফারিত নেত্রে সে তাকিয়ে আছে, ফেড-আউট (fade out)–

ফেড-ইন (fade in) — একটি কার্ডে লেখা: 'এ রাত্রিরও শেষ আছে'। দিন কাটিয়া মাস, মাস কাটিয়া বৎসর। আবার ফেড-আউট—

ফেড-ইন — মিড শট : সংবাদপত্র অফিস। প্রেসে সংবাদপত্র ছাপা হচ্ছে (কাট) উপরের উদাহরণটিতে কেবলমাত্র সময় ও স্থানের দীর্ঘ ব্যবধানই নয় ফেড আউট ও ফেড ইন একটি দৃশ্যপর্যায় (sequence) থেকে অন্য দৃশ্যপর্যায়-এ যাবার মধ্যের সম্পাদনা পদ্ধতি হিসাবেও কাজ করে। যেমন আমরা দেখি পথের পাঁচালী ছবিতে। এ ছবিতে সত্যজিৎ রায় একটি দৃশ্যপর্যায় থেকে পরবর্তি দৃশ্য-পর্যায়ে যাবার পদ্ধতি (transition) হিসাবে বারবার ফেট-আউট ও ফেড ইন ব্যবহার করেছেন।

ফেড আউট ও ফেড ইন-এর ব্যবহার যে একমাত্র একটি দৃশ্যপর্যায় থেকে অন্য দৃশ্যপর্যায়ে যাবার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয় তাই নয়, একটি ফিল্ম শুরু হতে পারে অন্ধকার পর্দা থেকে দৃশ্য 'ফেড-ইন' করে। অথবা ফিল্মের শেষ দৃশ্য অন্ধকারে 'ফেড-আউট' করে সমাপ্তি সূচিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ অরসন ওয়েলস্-এর বিখ্যাত ছবি **সিটিজেন কেন** শুরু হয় একটি 'ফেড ইন'-এর মাধ্যমে। ঋত্বিক ঘটকের **সুবর্ণরেখা** ছবি শেষ হয় একটি 'ফেড-আউট' দিয়ে।

'ফেড-আউট/ইন' সব সময় একই গতিতে হয় না। 'ফেড-আউট' বা 'ফেড-ইন' দ্রুত ঘটতে পারে অথবা ধীরে ধীরে ঘটতে পারে। ফিল্মের ছন্দ ও মুড অনুসারে পরিচালক ও সম্পাদক 'ফেড ইন/আউটে'র গতি নির্ধারণ করেন।

লিখিত ভাষার ক্ষেত্রে যেমন পূর্ণচ্ছেদ, ফিল্মের ক্ষেত্রে তেমন 'কাট'। লিখিত ভাষার ক্ষেত্রে যেমন অনুচ্ছেদের শেষ ও পরবর্তি অনুচ্ছেদের শুরু হয়, চলচ্চিত্রের ভাষার ক্ষেত্রে ডিসল্‌ভ তেমনি এক দৃশ্য (scene) থেকে দৃশ্যান্তরে যাবার ইঙ্গিত বহন করে। চলচ্চিত্রের ভাষার ক্ষেত্রে 'ফেড আউট' ও 'ফেড ইন'-এর সঙ্গে তুলনা করা যায় লিখিত ভাষার এক পরিচ্ছদ (chapter)-এর শেষ ও নতুন পরবর্তি পরিচ্ছদ শুরু হওয়ার।

অনেক সময় ডিস্‌লভ বা ফেড আউট/ইন-এর পরিবর্তে পুরোন দৃশ্য বা দৃশ্যপর্যায়-এর সমাপ্তি ও নতুন দৃশ্য বা দৃশ্যপর্যায়ের সূচনা, অথবা স্থান ও কালের পরিবর্তন বোঝাতে 'ওয়াইপ' নামের সম্পাদনা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। একটি শটের দৃশ্যাবলীকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে অন্য একটি শটের দৃশ্যাবলী ক্রমে পর্দায় বিস্তার লাভ করলে, তাকে 'ওয়াইপ' বলা হয়। এখানে পুরোন শটের 'ওয়াইপ-আউট' (wipe out) এবং নতুন শটের 'ওয়াইপ-ইন' (wipe in) ঘটে।

তবে 'ডিসলভ' বা 'ফেড আউট/ইন'-এর ওয়াইপ বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি নয়। আজকাল 'ওয়াইপ'-এর প্রচলন সম্পাদনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কম হয়। 'ওয়াইপ' কখনো কখনো পর্দার একপাশ থেকে অন্যপাশে অর্থাৎ ডানদিক থেকে বাঁ দিকে বা বিপরীত ক্রমে হতে পারে। আবার অনেক সময় ঘড়ির কাঁটার ঘোরার মত একটি কেন্দ্র থেকে গোল করে 'ওয়াইপ' হতে পারে। 'ওয়াইপ'-এর ব্যবহার ডিসলভ বা ফেড আউট/ইন-এর মত অতি মসৃণ নয় বরং এক্ষত্রে একটু বেশি চমক সৃষ্টি হয়।

৯.৬ ম্যাচ কাট

৯.৬.১ ম্যাচ কাট : সংজ্ঞা ও প্রয়োগ

ম্যাচ কাট (match cut) হল এমন এক সম্পাদনা পদ্ধতি যেখান একটি কাট (cut)-এর সাহায্যে এমন দুটি শটকে যুক্ত করা হয়, যে শট দুটির মধ্যে দৃশ্যগত/শব্দগত মিল বর্তমান। যেমন একটি শটে দেখা গেল একটি দরজা বন্ধ হচ্ছে। এর পরের শটটি ম্যাচকাট-এর মাধ্যমে যুক্ত করলে পূর্ববর্তি শটের সঙ্গে দৃশ্যগত সাদৃশ্য পাওয়া যাবে। অর্থাৎ প্রথম শটের দরজা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ম্যাচ কাট-এর দ্বারা যুক্ত পরের শটে হয়ত দেখা যাবে ভিন্ন স্থান ও সময় (space & time)-এ কোথাও অন্য একটি দরজা খুলছে।

ম্যাট কাট-এর দ্বারা যুক্ত দুটি শটের মধ্যে যে কেবলমাত্র দৃশ্যগত সাদৃশ্য থাকতে হবে তা নয়, পরপর দুটি শটের

মধ্যে শব্দগত (aural) বা প্রতিকী (metaphorical/metonymical) সাদৃশ্য থাকলেও পূর্ববর্তি শট থেকে পরের শটে যাবার পদ্ধতিকে 'ম্যাচকাট' বলা হবে।

প্রসঙ্গত মেটাফোর (metaphore) বলতে বোঝানো হয় এমন দুটি দৃশ্য বা বস্তু যারা কোনভাবেই আকার, আকৃতিগতভাবে একে অন্যের সঙ্গে সদৃশ না হলেও প্রতিকী অর্থ তৈরি করে। যেমন, ক্রুদ্ধ এক ব্যক্তিকে দেখানোর পরের শটেই যদি দেখানো হয় আগুন, তবে এখানে আগুন হল ক্রোধের মেটাফোর। অর্থাৎ ক্রোধ ও আগুন পর পর দুটি শটে প্রতিকী ম্যাট কাট-এর মাধ্যমে দেখালে, তাকে 'মেটাফোরিক ম্যাট কাট' বলা যায়।

অন্যদিকে মেটোনিমি (metonymy) বলতে আমরা বুঝি এমন দুটি দৃশ্য বা বস্তু যারা একে অন্যের সঙ্গে আকার, আকৃতিগতভাবে সদৃশ। যেমন, ধরা যাক এক ব্যক্তি একটি উড়ন্ত পাখির দিকে তাকিয়ে ভাবছে মানুষের আকাশে উড়ার স্বপ্নের কথা। উড়ন্ত পাখির শট থেকে কাট করে পরের শটে দেখানো হল একটি এরোপ্লেন। পাখি ও প্লেনের পর পর দুটি শটের মধ্যে যে প্রতিকী ম্যাচ-কাট রয়েছে তাকে বলা যায় 'মেটোনিমিক ম্যাচ-কাট'। এ ধরনের ম্যাচ-কাট-এর অসাধারণ প্রয়োগ দেখা যায় হলিউডের বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার স্ট্যানলি কুব্রিক-এর **টু থাউজেন্ড ওয়ান পেস ওডিসি** ছবিতে, যেখানে একটি বিখ্যাত দৃশ্যে দেখা যায় এক আদিম মানুষের হাত থেকে আকাশে ছুঁড়ে দেওয়া একটি হাড় ক্রমে ঘুরতে ঘুরতে উপরে উঠে যাচ্ছে। পরের শটে ম্যাচ কাট-এ দেখানো হয় লং শটে হাড়ের জায়গায় প্রায় একইরকম দেখতে একটি স্পেসশিপ বা মহাকাশযান — প্রতিকী ম্যাচ-কাটের একটি অনবদ্য প্রয়োগ।

'ম্যাচ কাট' তা দৃশ্যগত, শব্দগত বা প্রতিকী যাই হোক না কেন, এই শৈলীর জন্ম হয়েছে হলিউডের বাস্তববাদী ছবির সম্পাদনা পদ্ধতির অংশ হিসাবে। সুতরাং একথা বলা যায় যে 'ম্যাচ-কাট' দর্শকের মধ্যে বাস্তববাদের অনুভূতি সৃষ্টি করতে সাহায্য করে থাকে। ব্যবহারিক প্রয়োগের দিক থেকে দেখলে 'ম্যাচ কাট'-এর প্রয়োগ সাধারনত নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সাধন করে ঃ-

ক) 'ম্যাচ-কাট' একধরনের বাস্তববাদী সম্পাদনার প্রথাসিদ্ধ নন্দনগুণ তৈরি করে।

খ) পর পর দুটি শটের মধ্যে 'ম্যাচ-কাট' দর্শক মনে একধরণের আরামদায়ক অনুভূতি সৃষ্টি করে।

গ) পূর্ববর্তি ও পরবর্তি দুটি শটের স্থান ও সময়ের মধ্যে যাতায়াত (transition)-কে দৃশ্যগত ও শব্দগতভাবে মসৃণ করে তোলে ও দুটি শটের মধ্যে সময় স্থানের বিচ্ছিন্নতাকে দর্শকের চোখ আপাতভাবে গোপন করতে সাহায্য করে।

ঘ) অনেক ক্ষেত্রে 'ম্যাচ-কাট' দ্বারা যুক্ত দুটি শটের মধ্যে প্রতিকী অর্থ তৈরি করা সম্ভব হয়।

ঙ) 'ম্যাচ-কাট' অনেক সময় ফ্ল্যাশ ব্যাক/ফরোয়ার্ড-এ যাবার পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৯.৬.২ বিভিন্ন ম্যাচ-কাট

ম্যাচ-কাটের সাহায্যে পর পর দুটি শটের মধ্যে যে ধরনের সাদৃশ্য তৈরি করা হয় সেগুলি নিম্নরূপ ঃ-

১) **আকৃতিগত সাদৃশ্য (graphic match)** —ম্যাচ কাট দ্বারা যুক্ত পর পর দুটি শটের মধ্যে আকার, আকৃতি বা তল-এর সাদৃশ্য থাকতে পারে। ফরাসী চলচ্চিত্রকার অ্যালা রেঁনে-এর **হিরোসিমা মন আমুর** ছবিতে একটি হাতের ক্লোজ শট থেকে ম্যাচ কাট করে অতীতের একটি ঘটনায় উপস্থিত অন্য একটি চরিত্রের হাতের ক্লোজ শট-এ যাওয়া হয়। এই ম্যাচ কাট দুটি শটের মধ্যে বস্তুর আকৃতিগত সাদৃশ্যের ফলে তৈরি হয়েছে।

আলফ্রেড হিচকক-এর একটি ছবির নাম **রোপ**। এ ছবিতে মাত্র আটটি 'কাট' আছে। কিন্তু ঐ আটটি কাটকেও ম্যাচ কাট-এর সাহায্যে এমনভাবে মেলানো হয়েছে যে মনে হচ্ছে যেন গোটা ছবিতে কোন 'কাট' নেই। ধরা যাক ছবিতে ক্যামেরা ধীরে ধীরে প্যান করছে। একসময় ক্যামেরা কোন একটি চরিত্রের নীল কোটের পিঠের দৃশ্যের উপর এলো, এখানে কাট করে পরের শটে যদি একই ক্যামেরা অবস্থান থেকে শুরু করে ক্যামেরা কোটের পিঠের একই জায়গা থেকে একই গতিতে একই দিকে প্যান করতে থাকে তাহলে মনে হবে যেন কোন কাট নেই। একটি বিশেষ তলের উপর (এখানের কোটের পিঠের অংশ) পর পর দুটি শটের মধ্যে সাদৃশ্য রেখে ম্যাচ কাট করলে লুকোন কাট (concealed

cut) তৈরি হতে পারে, যে কাট সাধারণত ছবি দেখার সময় প্রায় অদৃশ্য বলে মনে হয়।

জাপানী পরিচালক ইয়াসুজিরেপ ওজু-র ছবিতে আকৃতিগত সাদৃশ্য সৃষ্টিকারী ম্যাচ কাট-এর বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। যদিও তিনি যেসব ম্যাচকাট করেন তা হলিউড সম্পাদনার ক্ষেত্রে একটু প্রথাবিরুদ্ধ। ওজু-র **অ্যান অটাম আফটার নুন** ছবিটি থেকে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। একটি শটে দেখা যাচ্ছে এক ব্যক্তি খাওয়ার টেবিলে বসেছে, তার সামনের টেবিলে প্লেট ও একটি বিয়ারের বোতল। পরের শটে ওজু অন্য এক ব্যক্তিকে দেখান যে একইভাবে একই অবস্থায় বসে আছে। দৃশ্যগতভাবে দুটি শটের ক্যামেরার অবস্থান ও কম্পজিশন একই এমনকি বিয়ারের বোতলটি পর্যন্ত। কেবলমাত্র দৃশ্যগত পার্থক্য হল প্রথম শটের ব্যক্তিটির গায়ে সাদা জামা ও দ্বিতীয় শটের ব্যক্তিটির গায়ে কালো কোট এবং দুটি শটে এদের ব্যাকগ্রাউন্ডের দৃশ্যের মধ্যে সামান্য পার্থক্য বর্তমান। ওজু-র ছবিতে এ ধরনের ম্যাচ-কাট মাঝে মাঝেই দেখা যায়। বিভিন্ন ধরনের ম্যাচ-কাট-এর মধ্যে আকৃতিগত বা গ্রাফিক ম্যাচ-কাট-এর প্রচলন সবচেয়ে বেশি।

২) **বর্ণ সাদৃশ্য (colour match)**—পরপর দুটি শট-এর মধ্যে রঙ-এর মিল থাকলেও তা একধরনের 'ম্যাচ-কাট' হিসাবে ধরা হয়। ওজু-র **ওহায়ু** ছবিতে এধরনের বর্ণগত সাদৃশ্যের ম্যাচ কাটের উদাহরণ দেখা যায়। এ ছবিতে পরিচালক একটি লন্ড্রির শট থেকে 'কাট' করে একটি ঘরের ভিতরের দৃশ্যে চলে যান। লন্ড্রির দৃশ্যে ফ্রেমের উপরের বাঁদিকে ঝুলন্ত একটি গাঢ় লাল বর্ণের জামার সঙ্গে পরের শটের ঘরের ভিতরের দৃশ্যের ফ্রেমের উপরের বাঁদিকে অবস্থিত একটি গাঢ় লাল রঙের ল্যাম্পসেড-এর বর্ণগত ম্যাচ-কাট (colour match-cut) করা হয়।

৩) **গতিবিধির সাদৃশ্য (action match)** — কাট-এর মাধ্যমে যুক্ত পর পর দুটি দৃশ্যাংশ (shot)-এ ফ্রেমের ভিতরের চরিত্র বা বস্তুর-র নড়াচড়া ও গতিবিধির মধ্যে দৃশ্যগত সাদৃশ্য থাকলে সেক্ষেত্রে গতিবিধির সাদৃশ্যগত ম্যাচ কাট (action match cut) তৈরি হয়। এ ধরনের ম্যাচ কাট-এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হতে পারে স্ট্যানলি কুব্রিক-এর **টু থাউসেন্ড ওয়ান স্পেস ওসিডি** ছবির পূর্বোক্ত উড়ন্ত হাড় থেকে ম্যাচ কাট করে উড়ন্ত স্পেশশিপের দৃশ্যে চলে যাওয়ার দৃশ্য।

আলফ্রেড হিচকক-এর **নর্থ বাই নর্থ ওয়েস্ট** ছবির শেষের দুটি দৃশ্যাংশ (shots) যুক্ত হয়েছে একটি বিখ্যাত অ্যাকশন ম্যাচ কাট (action match cut)-এর মাধ্যমে। দেখা যাচ্ছে নায়ক ক্যারী গ্রান্ট নায়িকা ইভা মারী সেইন্ট-এর হাত ধরে একটি পাহাড়ের চূড়ায় তাকে টেনে তুলছে। ম্যাট কাট করে পরের শটে দেখানো হয়, গ্রান্ট মারী সেইন্ট-কে একটি ট্রেনের কামরার মধ্যে হাত ধরে টেনে একটি বাঙ্ক (bunk)-এ তুলছে। গ্রাফিক ম্যাচ কাট-এর মত অ্যাকশন ম্যাচ কাটও বহুল ব্যবহৃত সম্পাদনা রীতি।

৪) **ক্যামেরার গতিবিধির সাদৃশ্য (matching camera movement)** — একটি কাট (cut)-এর মাধ্যমে যুক্ত পরপর দুটি দৃশ্যাংশ (shot)-এর মধ্যে ক্যামেরার গতিবিধির সাদৃশ্য থাকলে ম্যাচ কাট সৃষ্টি হয়। ম্যাচ কাটের মাধ্যমে যুক্ত দুটি শটের প্রথমটিতে ধরা যাক ক্যামেরা বাঁদিক থেকে ডানদিক প্যান করছে, পরের শটে যদি ক্যামেরা ঐ একই দিকে প্যান করতে থাকে তবে দুটি দৃশ্যাংশ ম্যাচ কাট-এর মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে বলা যায়। একইভাবে ম্যাচ কাটের ক্ষেত্রে প্যান-এর পরিবর্তে, পর পর দুটি শটে একইরকম টিল্ট বা ট্র্যাকিং ইত্যাদিও অনেক সময় ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৫) **শব্দ সংক্রান্ত সাদৃশ্য (aural match)** — শব্দপথ (sound track) ব্যবহার করেও দুটি শটের মধ্যে ম্যাচ কাট সৃষ্টি করা যায়। কাট দ্বারা যুক্ত পর পর দুটি দৃশ্যাংশ (shot)-এর মধ্যে একইরকম ধ্বনী বা জাতির শব্দ ব্যবহার করেও ম্যাচ কাট সৃষ্টি করা যায়। তিনধরনের শব্দের ব্যবহার অর্থাৎ সংলাপ, পারিপার্শ্বিক শব্দ ও আবহসঙ্গীত চলচ্চিত্রে প্রচলিত। বলা যায় এই তিন ধরনের শব্দের সবকটি বা যেকোন দুটি বা যেকোন একটি শব্দপথের ক্ষেত্রে ম্যাচ কাট ঘটানো যেতে পারে।

'শব্দ সংক্রান্ত সাদৃশ্য পূর্ণ কাট' (aural match cut)-এর অসাধারণ উদাহরণ আমরা পাই অরসন ওয়েলস্-এর **সিটিজেন কেন্** ছবি থেকে। কখনো একটি দৃশ্যের হাততালির শব্দের থেকে ম্যাচ কাট করে পরের দৃশ্যের হাততালির শব্দে, কখনো একটি বিশেষ সঙ্গীতের সুরকে পর পর দুটি ভিন্ন সময় ও স্থানের শটে ব্যবহার করে অরাল ম্যাচ-কাট

(aural match cut) সৃষ্টি করা হয়েছে। এমন কি এ ছবিতে বেশ কয়েকবার দুটি ভিন্ন সময় ও স্থানের শটকে যুক্ত করা হয়েছে সংলাপের সাযুজ্য রেখে। **সিটিজেন কেন্** ছবিতে শব্দপথকে ব্যবহার করে ম্যাচ কাট সৃষ্টির অনবদ্য সব উদাহরণ বর্তমান।

৯.৭ চলচ্চিত্রে স্থান ও কাল-এর ধারাবাহিকতা

৯.৭.১ চলচ্চিত্রের 'স্থান ও কাল'

চলচ্চিত্রের পর্দায় উপস্থাপিত স্থান ও কাল (sapce & time)-এর সঙ্গে বাস্তবের স্থান ও কালের কিছু পার্থক্য বর্তমান। যেমন, বাস্তব জীবনের উপলব্ধি (perception)-তে কাল (time) সর্বদা রৈখিকভাবে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে বহমান। অর্থাৎ বাস্তবের সময় (time) কখনো চলচ্চিত্রের মত ফ্ল্যাশব্যাক বা ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ড-এ যেতে পারে না। আবার আমরা জানি যে ফ্ল্যাশ ব্যাক বা অতীত চারণা ও ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ড বা ভবিষ্যৎ দর্শন একধরনের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার প্রতিফলন। সুতরাং একথা বলা যায় যে চলচ্চিত্র কেবলমাত্র 'বাস্তব সময়' (real time)-কেই নয় 'মানস্তাত্ত্বিক সময়' (pshychological time)-কেও উপস্থাপন করতে পারে।

অন্যদিকে একথাও বলা যায় যে বাস্তবের সময়ের ধারণা (perception of real time)-কে চলচ্চিত্রে কখনো কখনো ছোট (squez) করা যায় অথবা সময় বিশেষ পরিবর্ধন (expand) করা সম্ভব হয়। আমরা যখন একটি ছবিতে ধারাবাহিক সম্পাদনা (continuity editing)-এর সাহয্যে সময় (time)-এর অনুভূতি দর্শকের মনে গড়ে তুলি তখন বাস্তব সময়ে ঘটনাটি যতক্ষণ ধরে ঘটেছে তারমধ্যে বাছাই কিছু কিছু অংশ পরপর জুড়ে ধারাবাহিকতার সৃষ্টি করি। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন এটা দেখাবার জন্য বাড়ি থেকে বেরোনোর দৃশ্য বাস্তব সময় (real time)-এ দু মিনিট না দেখিয়ে হয়ত কুড়ি সেকেন্ডে তিনটি দৃশ্যাংশের মাধ্যমে (যেমন, লোকটি সুসজ্জিত হয়ে জুতো পড়ছে, সে দরজার দিকে এগোচ্ছে, সে বাইরে থেকে দরজায় তালা দিচ্ছে ইত্যাদি) অপেক্ষাকৃত কম সময়ে কিন্তু ধারাবাহিকতার অনুভূতি (feeling of continuty) বজায় রেখে বোঝানো যায়।

চলচ্চিত্রের পর্দায় সময়ের পরিবর্ধন (expansion) ও সম্ভব হয়। একটি পথ দুর্ঘটনা ঘটাতে সময় লাগে দু সেকেন্ড কিন্তু দর্শকের উদ্বেগ বাড়ানোর জন্য হয়ত পর্দায় দৃশ্যটি তিনটি শটে ভেঙ্গে ছয় সেকেন্ডে দেখানো হল। এছাড়া চলচ্চিত্রের পর্দায় অনেকক্ষেত্রে একই সময়ে কিন্তু বিভিন্ন স্থানে ঘটে চলা একাধিক ঘটনা দেখানো হয় যেভাবে বাস্তবে দেখা সম্ভব নয়। কারণ বাস্তবে একজন ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময় (time)-এ একটি নির্দিষ্ট স্থানের ঘটনাই দেখতে পাবে, কিন্তু চলচ্চিত্রে 'সমান্তরাল ক্রিয়া' (parelled action) দেখানো এবং ধারাবাহিকতার অনুভূতি সৃষ্টি করা সম্ভব।

বাস্তব সময় (real time) ও চলচ্চিত্রের সময় (film time)-এর মধ্যে যেমন পার্থক্য বর্তমান তেমনি বাস্তবের স্থান (real space) ও চলচ্চিত্রের স্থান (film space)-এর মধ্যেও পার্থক বর্তমান। চলচ্চিত্রের স্থান একটি নির্দিষ্ট ফ্রেমের মধ্যে আবদ্ধ, বাস্তব স্থানের মত তা মুক্ত নয়। অবশ্য চলচ্চিত্রের ফ্রেমে উপস্থাপিত স্থান চিত্রকলার ফ্রেমের মত স্থির নয়। চিত্রকলার একটি ফ্রেম যেমন একটি মুহূর্তে ঘটনাকে তুলে ধরে, ফিল্মের চলমান ফ্রেমগুলি তেমনি অনেকগুলি মুহূর্তের ঘটনা প্রবাহকে পর পর সাজিয়ে উপস্থাপন করে। অর্থাৎ বিভিন্ন ঘটনা বা ঘটনার অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত স্থানগুলিকে (ফ্রেমগুলিকে) পর পর জোড়ার সম্পাদনা কৌশলের সাহায্যে চলচ্চিত্রের স্থানিক ধারাবাহিকতা (spatial continuity) গড়ে ওঠে।

আধুনিক সম্পাদনা পদ্ধতি অর্থাৎ হলিউড নির্দেশিত বাস্তববাদী সম্পাদনা রীতির অন্যতম অবদান হল চলচ্চিত্রের পর্দায় দৃশ্য বহির্ভূত স্থান (off-screen space)-এর অনুভূতি দর্শক মনে সঞ্চার করা। অর্থাৎ চলচ্চিত্র যেমন ফ্রেমের

সাহায্যে একটি স্থানকে আবদ্ধ করে তেমনি ফ্রেমের বাইরের স্থানের কাল্পনিক অনুভূতি সৃষ্টিরও চেষ্টা করতে পারে। অর্থাৎ বলা যায় চলচ্চিত্রে কেবলমাত্র পর্দায় উপস্থাপিত স্থানই ধারাবাহিকতার অনুভূতি তৈরি করে তাই নয়, দৃশ্যবহির্ভূত স্থান ও পর্দায় উপস্থাপিত স্থানের মধ্যেও একধরনের ধারাবাহিকতার সম্পর্ক তৈরি করা হয়। যেমন পর্দায় ধরা যাক একটি ড্রয়িং রুম দেখানো হচ্ছে, শব্দপথে শোনা গেল বাইরে একটি গাড়ি এসে দাঁড়ানোর শব্দ। এখানে পর্দায় উপস্থাপিত স্থানের সঙ্গে ঘরের বাইরের দৃশ্যবর্হিভুত স্থানের একধরণের ধারাবাহিকতা (continuity) দর্শকের মনে তৈরি হচ্ছে। চলচ্চিত্রে অবশ্য স্থানিক ধারাবাহিকতা (spatial continuity)-এর অনেকটাই তৈরি হয় পর্দায় উপস্থিত চরিত্রগুলির দৃষ্টিপথ (look) অনুসরণ করে। সে বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

বাস্তববাদী চলচ্চিত্র সম্পাদনা রীতিতে স্থান ও কাল-এর ধারাবাহিক অগ্রগতি হয় কার্য-করণ (cause-effect) সম্পর্কের নিয়মে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে পূর্ববর্তি ঘটনার 'ফল' হল পরবর্তি ঘটনা। এভাবে ঘটনা শৃঙ্খলে একটির সঙ্গে অন্য ঘটনাকে বেঁধে চলচ্চিত্রের স্থান ও কালের ধারাবাহিকতা সৃষ্টি করা হয়। যেখানে পরবর্তি ঘটনার স্থান ও কাল হল পূর্ববর্তি ঘটনা বা চরিত্রের পূর্ববর্তি অবস্থার যৌক্তিক পরিণতি।

৯.৭.২ সময় (time)-এর ধারাবাহিক উপস্থাপনা

আমরা জানি যে চলচ্চিত্রের আখ্যান রচনার ক্ষেত্রে প্রধান যুক্তি হল কার্য-কারণ পরম্পরা। আর তা ঘটে থাকে সময় (time)-কে ভিত্তি করে। যে কাহিনীকে অবলম্বন করে চলচ্চিত্রের আখ্যান গড়ে ওঠে, তার বিভিন্ন ঘটনাবলী বাস্তব সময়ে চলচ্চিত্রে উপস্থাপিত হয় না। বরং ঘটনাগুলির মধ্যে থেকে কিছু নির্বাচিত অংশ উপস্থাপিত হয় এমনভাবে যেন মনে হয় কাহিনীতে সময়ের অগ্রগতি ধারাবাহিক। তবে চলচ্চিত্রে অনেক ক্ষেত্রে সময়ের অগ্রগতি ক-খ-গ-ঘ এভাবে না হয়ে খ-ক-গ-ঘ এভাবেও হতে পারে। অর্থাৎ ঘটনা যেভাবে পর পর ঘটছে সে ভাবে উপস্থাপিত না হয়ে ফ্ল্যাশব্যাক বা ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ড-এও বর্ণনা করা হতে পারে। এসবক্ষেত্রে ঘটনাক্রম (story) এবং বর্ণনাক্রম (plot) ভিন্ন হতে পারে।

চলচ্চিত্রে সময় (time)-এর উপস্থাপনার ধারাবাহিকতা বুঝতে গেলে তিনটি বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে—এক সজ্জা (order), দুই. স্থিতি (duration) এবং তিন. পৌনোপনিকতা (frequency)।

১. সজ্জা (order)— বাস্তবের সময় রৈখিক (linear), অর্থাৎ বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে বহমান। কিন্তু চলচ্চিত্রে উপস্থাপিত সময় রৈখিক নাও হতে পারে। বাস্তবে কোন ঘটনাগুলি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত এভাবে সময়ের ক্রমানুসারে ক-খ-গ-ঘ রূপে ঘটে চলে। কিন্তু চলচ্চিত্রে পরিচালক ফ্ল্যাশব্যাক বা গ-ক-খ-ঘ এভাবে সময় (time)-কে বিন্যস্ত করতে পারেন। অথবা তিনি ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ড বা ক-খ-গ-ঘ এভাবে বর্তমানকালে দাঁড়িয়ে পর্দায় ভবিষ্যৎ সময়ের কল্পনার চিত্র দেখাতে পারেন। অর্থাৎ চলচ্চিত্র উপস্থাপনা করে, তা আখ্যানের ধারাবাহিকতা তৈরির কাঠামোটি সম্পাদনার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করে এবং শেষ পর্যন্ত দর্শকের মনে সমগ্র ঘটনাক্রমের (story-এর) ধারণাটি গড়ে তোলে।

২. **স্থিতি (duration)**—চলচ্চিত্রে কাহিনীর স্থিতি-কাল (story duration), বর্ণনার স্থিতি-কাল (plot duration) এবং ফিল্মের স্থিতি-কাল (screen duration) ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। ধরা যাক একটি দু ঘন্টার ফিল্মের আখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে একজন গোয়েন্দা চারদিন সময়ে একটি অপরাধের রহস্যের কিনারা করল এবং শেষে সে গত দুমাস আগে অপরাধটি কিভাবে পরিকল্পনা (plan) করা হয়েছিল, গত একমাস কিভাবে অপরাধ সংগঠিত হয়েছিল এবং বিগত একমাস যাবৎ কিভাবে অপরাধী গা ঢাকা দিয়েছিল তার বর্ণনা দিল। এখানে গত দুমাস সময় হল ঘটনাবলি (story duration) চারদিন সময়, যার বর্ণনা আখ্যানে রয়েছে তা হল বর্ণনাবলি (plot duration) এবং যে দুঘন্টা পর্দায় ছবিটি দেখা গেল তা হল ফিল্মের স্থিতি-কাল (screen duration)।

চলচ্চিত্র সময় (time)-এর ধারাবাহিকতার রক্ষার অন্যতম শর্ত হল প্রথমত, ঘটনাকাল বা স্টোরী ডিউরেশন

(story duration)-কে সঠিকভাবে বর্ণনাবলি বা প্লট ডিউরেশন (plot duration)-এর সাহায্যে ব্যক্ত করা। দ্বিতীয়ত, বর্ণনাকাল বা প্লট ডিউরেশন-কে ধারাবাহিকতার অনুভূতি রক্ষা করে ফিল্মের সময়কাল বা স্ক্রিন ডিউরেশনে রূপান্তরিত করা। এই দ্বিতীয় পর্যায়টি সরাসরি সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত। কাট (cut), ডিসলভ (dissolve), ফেড ইন/আউট (fade in/out) ইত্যাদি পদ্ধতি দ্বারা প্লট ডিউরেশনে দৃশ্যাংশ (shot), দৃশ্য (scene) এবং দৃশ্যপর্যায় (sequence) গুলিকে পর পর যুক্ত করে স্ক্রিন ডিউরেশন তৈরি হয়। আবার ফ্ল্যাশ ব্যাক, সরলরৈখিক বর্ণনা বা ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ড কৌশল ব্যবহার করে প্লট ডিউরেশনের সাহায্যে স্টোরি ডিউরেশনের অনুভূতি তৈরি করা হয়।

চলচ্চিত্রে সমায়ন্তর বোঝানোর জন্য কাট, ডিসলভ, ফেড ইন/আউট, ওয়াইপ ইত্যাদি দৃশ্যান্তর কৌশল (transition device) ব্যবহার করা হয়। পর পর দুটি শটের মধ্যে কাট-এর পরিবর্তে ডিসলভ ব্যবহার করলে দীর্ঘ সমায়ন্তর বোঝায় এবং দৃশ্যান্তর হিসাবে ফেড ইন/আউট ব্যবহার করা হয় অনেকটা দীর্ঘ সমায়ন্তর বোঝাবার জন্য। অর্থাৎ কাট, ডিসলভ, ফেড ইন / আউট একই সঙ্গে সমায়ন্তর ও ধারাবাহিকতা (continuity)-এর অনুভূতি সৃষ্টি করা হয়।

৩. **পৌনপোনিকতা (frequency)** — একই আখ্যানে কোন বিশেষ সময় (period)-এর বর্ণনা একাধিক রকমভাবে বা একাধিক ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপিত করা হতে পারে এবং ধারাবাহিকতা (continuity) রক্ষার জন্য প্রতিটিকে একই সংযোগ সূত্রে বাঁধা হয়। পৌনপোনিকতা হল একই আখ্যানে একটি বিশেষ সময়কে যতবার বর্ণনা করা হচ্ছে তার সংখ্যা। যেমন জাপানী পরিচালক আকিয়া কুরোসাওয়ার **রসোমন** ছবিতে একই আখ্যানে একই ঘটনার বর্ণনা চার জনের জবানীতে ভিন্ন ভিন্ন রকমভাবে পাওয়া যাচ্ছে। ঐ একইরকমভাবে অরসন ওয়েলস্-এর **সিটিজেন কেন্** ছবিতেও চার্লস ফস্টার কেন্-এর বাল্যকাল ও যৌবনকে একই সময় সম্বন্ধে একাধিক জবানী পাওয়া যায়। এ ছবিতে একই সময়ের বিভিন্ন বয়ানগুলির মধ্যে সংযোগ সূত্র হল একজন সাংবাদিক যে চার্লস কেন-এর মৃত্যুর পর মিঃ কেন-এর অতীত সম্পর্কে জানার জন্য বিভিন্ন মানুষের বয়ান সংগ্রহ করছে। 'সংযোগ সূত্র' বিভিন্ন বয়ানগুলির ভিতর সময়ের ধারাবাহিকতা (time continuity) তৈরিতে প্রধান ভূমিকা নিচ্ছে।

আড়াআড়ি দৃশ্যান্তর (cross-cutting) : চলচ্চিত্রের আদিযুগের সমাপ্তির পর হলিউডের ছবি (films) যখন আধুনিক যুগে প্রবেশ করল, তখন চলচ্চিত্রের সেই আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট হিসাবে সম্পাদনার ক্ষেত্রে উপন্যাসের মত একই সময়ে (simulteneously) ঘটে চলা একাধিক / দুটি ঘটনাকে বর্ণনা করার রীতির প্রচলন দেখা দিল। একই সময় (time)-এ বিভিন্ন স্থানে ঘটে চলা, কিন্তু আখ্যনের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত দুটি ঘটনার বিবরণ চলচ্চিত্রের পর্দায় উপস্থাপিত হয় যে সম্পাদনা কৌশলের সাহায্যে তা হল 'আড়াআড়ি দৃশ্যান্তর' বা ক্রস কাটিং (cross cutting)।

ধরা যাক 'ক' স্থানে একটি ঘটনা ঘটছে আবার ঐ একই সময়ে 'খ' স্থানেও অন্য একটি ঘটনা এগোচ্ছে এবং এই দুই ঘটনার মধ্যে কাহিনীগত সম্পর্ক বর্তমান। এবার ক্রস কার্টি-এর সাহায্যে 'ক' স্থানের ঘটনার একটি বা একাধিক দৃশ্যাংশের পরই 'খ' স্থানের ঘটনার দৃশ্যাংশে 'কাট' করে চলে যাওয়া হচ্ছে এবং আবার কাট করে 'ক'-এর দৃশ্যাংশে আসা হচ্ছে। অর্থাৎ ক-খ-ক-খ-ক... এভাবে সম্পাদনার সাহায্যে আখ্যানের সময় এগোতে থাকলে একপ্রকার ধারাবাহিক বর্ণনার জন্ম হয়। ক্রস কাটিং হল বাস্তববাদী ছবিতে সময়ের ধারাবাহিকতা (continuity of time) প্রকাশের অন্যতম কৌশল।

চলচ্চিত্রে শব্দপথের ব্যবহারের দ্বারাও 'সময়ের ধারাবারিকতা' (continity of time)-এর অনুভূতি সৃষ্টি করা যায়। সময়ের মসৃণ প্রবাহের অনুভূতি সৃষ্টি করতে পরস্পরের সঙ্গে যুক্তি শৃঙ্খলে বাঁধা সংলাপ, যার দ্বারা ধাপে ধাপে নাটকীয়তার প্রকাশ হতে থাকে, তা ব্যবহার করা হয়। এছাড়া দৃশ্যান্তের সময় আবহ সঙ্গীতের ধারাবাহিক ও মসৃণ (continuous & smooth) ব্যবহারের ফলেও আখ্যানে 'সময়ের ধারাবাহিকতা' তৈরি হয়।

৯.৭.৩ স্থান (space)-এর ধারাবারিক উপস্থাপনা

চলচ্চিত্রের আখ্যান বর্ণনা প্রকৃতপক্ষে দৃশ্যগত স্থানের ধারাবাহিক বর্ণনার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। এবং টুকরো টুকরো স্থান (space) পর পর ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সম্পাদনার সাহায্যে যুক্ত করে একটি বাস্তববাদী ছবি (film)-এর বচন (text)-টি নির্মিত হয়।

বাস্তববাদী ছবিতে 'স্থানিক ধারাবাহিকতা' (spatial continuity) তৈরির প্রধান পদ্ধতি হল ধারাবাহিক সম্পাদনা (continuity editing) রীতির প্রয়োগ। এই ধরনের সম্পাদনার রীতির উদ্দেশ্য হল একটি দৃশ্যাংশ থেকে পরবর্তি দৃশ্যাংশে বা দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরের স্থানান্তরকে মসৃণ, ধারাবাহিক করে তোলা। আখ্যানের প্রবাহের বাস্তববাদী যুক্তি পরম্পরা মেনে স্থানের ধারাবাহিক উপস্থাপনা ঘটানো হয় চলচ্চিত্রের পর্দায়। একটি দৃশ্য-সংগঠনের (composition) -এর আলো, টোনালিটি, নকশা, চরিত্র/ক্যামেরার চলাচল ইত্যাদির সঙ্গে পূর্ববর্তি ও পরবর্তি দৃশ্যাংশের দৃশ্য-সংগঠনের এমনভাবে মিল তৈরি করা হয় যাতে স্থানান্তরের বিচ্ছিন্নতা দর্শকের চোখে প্রকট হয়ে না ওঠে।

প্রখ্যাত ফরাসী চলচ্চিত্র তাত্বিক ও সমালোচক আন্দ্রে বাজাঁ-র মতে ধারাবাহিক সম্পাদনা (continuity editing)-এর দুটি প্রধান প্রতিপাদ্য হল :

ক) আখ্যানের বাস্তববাদী অগ্রগতির যুক্তি মেনে একটি স্থানের সঙ্গে পরবর্তি স্থানের এমনভাবে যুক্ত করা হবে (verisimilitude of space) যেখানে কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত চরিত্রগুলির সঙ্গে স্থানের সম্পর্ক পরিস্কার বোঝা যায়।

খ) দৃশ্যান্তর (transition i.e. cut dissolve etc)-এর প্রধান উদ্দেশ্য হবে কাহিনীর নাটকীয় অগ্রগতি বা কোন চরিত্রের/মনস্তাত্বিক অবস্থা বর্ণনা করা।

ধারাবাহিক সম্পাদনা-র সাহায্যে ধারাবাহিকতা (continuity of space) সৃষ্টির বেশ কয়েকটি প্রথাগত কৌশল বর্তমান। যেগুলির মধ্যে প্রধান হল, ১৮০° নিয়ম ও দৃশ্যাংশ-প্রতিদৃশ্যাংশ (shot-Reverse-shot), পর্দায় দিকনির্দেশ ও ৩০° নিয়ম, দৃষ্টি-বিন্দু স্থাপন (point of view) ও দৃষ্টিরেখার সামঞ্জস্য (eyeling matching) এবং সর্বোপরি একান্তর সম্পাদনা (alternative editing)। উপরোক্ত প্রথাগুলি না মানলে বাস্তববাদী ছবিতে 'স্থানের ধারাবাহিক প্রবাহ' ক্ষুন্ন হচ্ছে বলে ধরা হয়।

(১) **১৮০° নিয়ম ও দৃশ্যাংশ-প্রতি দৃশ্যাংশ (180° rule & shot-reverse shot)**—ধরা যাক দুই ব্যক্তি একটি টেবিলের দুই বিপরীত দিকে বসে কথাবার্তা বলছে। এবার ধরা যাক দুই ব্যক্তির চিবুক টেবিলের উপর দিয়ে একটি কাল্পনিক সরল-রেখা (axis of action) দ্বারা যুক্ত করা হল। যদি একটি দৃশ্যে চারটি বিভিন্ন স্থানে ক্যামেরা বসিয়ে দুই ব্যক্তির কথাবার্তার দৃশ্যটি দেখাতে হয় তবে নিয়ম হল একই দৃশ্য (scene)-এ প্রতিটি ক্যামেরা অবস্থানই যেন ঐ কাল্পনিক সরলরেখা বা ১৮০° অক্ষরেখার যেকোন একদিকে থাকে ক্যামেরার যে কোন দুটি অবস্থান অক্ষরেখার দুপাশে হয়ে গেলে দর্শকের চোখে ভ্রান্তি লাগতে পারে যে দুই ব্যক্তির মধ্যে হঠাৎ বুঝি স্থান পরিবর্তন হয়ে গেল। চরিত্রগুলির স্থানিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সাধারণত তাই ১৮০° নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটানো হয় না বাস্তববাদী ছবিতে।

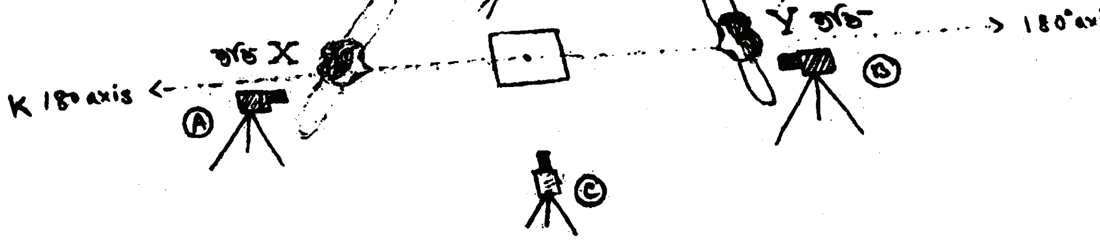

উপরোক্ত চিত্রে দুই ব্যক্তি X এবং Y-কে যোগ করেছে ১৮০° অক্ষ K, L। অর্থাৎ একটি দৃশ্যে ক্যামেরা অবস্থান (A), (B) এবং (C) থাকতে পারে কিন্তু এদের যে কোন একটির পরের শটে (M) বা (N) অবস্থান ব্যবহার করলে ১৮০° অক্ষ নিয়ম ভঙ্গ হবে। অর্থাৎ একটি দৃশ্যে সবগুলি ক্যামেরা অবস্থানই কল্পিত ১৮০° অক্ষের যে কোন একদিকে থাকতে হবে।

আবার ১৮০° নিয়মেরই অন্যতম প্রয়োগ হল শট-রিভার্স শট। দুই ব্যক্তির কথাবার্তা দেখানোর সময় একবার (B) অবস্থানে ক্যামেরা স্থাপন করে X ব্যক্তির শট এবং তারপর (A) অবস্থানে ক্যামেরা বসিয়ে Y ব্যক্তির শট দেখালে তাকে শট-রিভার্স শট বা দৃশ্যাংশ-প্রতি দৃশ্যাংশ বলা হয়। এক্ষেত্রেও ১৮০° অক্ষ পর পর দুটি সটে অতিক্রম করা চলে না, অর্থাৎ (A) ক্যামেরা অবস্থানের পর (N) অবস্থানে যাওয়া চলবে না, অক্ষ অতিক্রম করলে দুই ব্যক্তির অবস্থান পরস্পর বদলে গেল বলে দর্শকের দৃষ্টিতে ভ্রান্তি জাগতে পারে। শট-রিভার্স শট পদ্ধতিতে এক জনের কাঁধের উপর দিয়ে অন্যজনের মুখ দৃশ্যমান হলে তাকে 'ওভার দ্য সোল্ডার শট' বলা হয়।

(২) পর্দায় দিক নির্দেশ (screen directionality) ও ৩০° নিয়ম (30⁰ rule)— ধরা যাক ব্যক্তি 'ক' ব্যক্তি 'খ'-কে তাড়া করছে। ১৮০° নিয়মানুসারে ক এবং খ এই দুজনকে একটি কাল্পনিক রেখা দ্বারা যুক্ত করলে যে সরলরৈখিক অক্ষ তৈরি হয় তা হল এখানে এ্যাক্সিস অব অ্যাকশন বা ১৮০° অক্ষ। নিয়ম হল, ১৮০° অক্ষের যেকোন একদিকে ক্যামেরা রেখে পশ্চাদধাবনের দৃশ্যটি দেখালে, ধরা যাক মনে হয় যে 'খ' এর পিছনে 'ক' পর্দার বাঁদিক থেকে ডানদিকে যাচ্ছে। এবার পরের শটেই যদি ক্যামেরার অবস্থান অক্ষরেখা অতিক্রম করে অন্যদিকে চলে যায় তাহলে দর্শকের মনে হবে যে 'খ' এর পিছনে 'ক' যেন পর্দার ডানদিক থেকে বাঁদিকে অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ছুটতে শুরু করল।

সুতরাং পর্দায় বাঁদিক থেকে ডানদিকের পশ্চাদধাবনের দৃশ্যকে বিপরীতমুখী করতে গেলে মাঝে অন্তত একটি দৃশ্যাংশে দেখাতে হবে যে পশ্চাদধাবক ও পশ্চাদধাবিত দুই ব্যক্তিই হয় পর্দার মিজ-অ-সিনে ব্যাকগ্রাউণ্ড থেকে ফোরগ্রাউণ্ডের দিকে ছুটে আসছে বা ফোরগ্রাউণ্ড থেকে ব্যাকগ্রাউণ্ডের-দিকে ছুটছে। এইধরনের অন্তত একটি শটের পরে পশ্চাদধাবনের দিক উল্টে দিলেও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে না বলে ধরা হয়। পর্দায় যে কোন ধরনের গতিশীল ব্যক্তি/বস্তু/ যানবাহনের গতিবিধির দিকনির্দেশের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য হয়, এই নিয়ম স্থানের ধারাবাহিকতা রক্ষায় বাস্তববাদী ছবিতে অপরিহার্য।

১৮০° নিয়মের মতই ৩০° নিয়মও ধারাবাহিক সম্পাদনা (continuity editing) রীতির অন্যতম অলঙ্ঘ নিয়ম। একটি দৃশ্যে একজন ব্যক্তিকে পর পর দুটি শটে দু ধরনের ক্যামেরা অবস্থান থেকে দেখানো হলে, পর পর দুটি শটের ক্যামেরা অবস্থানের মধ্যে যেন ৩০° কোণের বেশি কৌণিক ব্যবধান থাকে, তা নাহলে মনে হবে যে ব্যক্তিটির শারীরিক অবস্থান পরের শটে হঠাৎ একটু পরিবর্তিত হয়ে গেলে যা দর্শকের দৃষ্টিতে ধাক্কা (jerk) সৃষ্টি করবে।

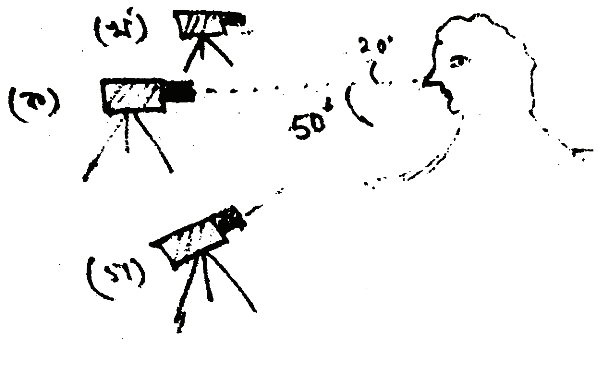

উপরোক্ত চিত্রে পর পর দুটি দৃশ্যাংশে যথাক্রমে (ক) ও (খ) ক্যামেরা অবস্থান বাস্তববাদী সম্পাদনা রীতিতে সম্পাদিত ছবিতে থাকবে না কারণ দুই ক্যামেরা অবস্থানের মধ্যে কৌণিক ব্যবধান ২০° যা ৩০°-এর কম। কিন্তু (ক) ও (গ) বা (খ) ও (গ) ক্যামেরা অবস্থান পর পর দুটি শটে থাকতে পারে কারণ উক্ত শট যুগলের মধ্যে ক্যামেরা অবস্থান দ্বয়ের কৌণিক ব্যবধান ৩০°-এর বেশি। এ সংক্রান্ত বিশদ আলোচনা জাম্প কাট (২.   ) পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

৩) **দৃষ্টিবিন্দু স্থাপন (point of view) ও দৃষ্টিরেখার সামঞ্জস্য বিধান (eyeline matching)**— দৃষ্টিবিন্দু (point of view) স্থাপন ও দৃষ্টিরেখার সামঞ্জস্য বিধান (eyeline matching) বাস্তববাদী সম্পাদনার অন্যতম প্রধান বিষয়। দৃশ্যাংশ (shot)-এ উপস্থিত চরিত্রের দৃষ্টিকে অনুসরণ করে স্থান (space)-এর ধারাবাহিকতা সৃষ্টি করা হয়। অর্থাৎ বলা যায় যে দৃষ্টিকে যোগসূত্র হিসাবে ব্যবহার করে দুই বা ততোধিক দৃশ্যাংশের মধ্যে ধারাবাহিকতা তৈরি করা হয় এই দুই পদ্ধতিতে।

বাস্তববাদী চলচ্চিত্রে দৃষ্টিবিন্দু স্থাপন করার একটি পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। এই পদ্ধতিতে দুটি বা তিনটি শটের মাধ্যমে দৃষ্টিবিন্দু স্থাপন করা যায়। আমরা সহজেই বুঝি যে দৃষ্টি বিন্দু স্থাপন অর্থাৎ একজন চরিত্রের দৃষ্টিতে অন্য কোন ব্যক্তি, বস্তু, ঘটনা বা স্থানকে দেখাতে গেলে তিনটি বিষয় মূল্যবান, প্রথমত যে ব্যক্তি দেখছে (subject) তার অবস্থান (position) সম্পর্কে ধারণা তৈরি করা, দ্বিতীয়ত, তার দৃষ্টিপথ কোন দিকে তা বোঝানো এবং তৃতীয়ত, তার দৃষ্টি পথ অনুসরণ করে সে যা দেখছে (object) তাকে প্রতিষ্ঠা করা।

ধরা যাক আমরা দৃশ্যে উপস্থাপিত করতে চাই যে একটি গ্রামের রাস্তায় দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি উপরদিকে তাকিয়ে একঝাঁক যুদ্ধবিমান দেখতে পাচ্ছে। প্রথম শটের দ্বারা ব্যক্তিটির অবস্থান বোঝাতে হবে। সুতরাং তাকে লঙ বা মিড লঙ শটে তার পারিপার্শ্বিক সমেত ধরা হল। এবার তার দৃষ্টিপথেব নিশানা বোঝানোর জন্য হয় ঐ একই শটে ট্র্যাক ইন বা জুম ইন করে ক্লোজ, মিড ক্লোজ বা মিড শটে অথবা পরের শটে ক্লোজ, মিড ক্লোজ বা মিড শটে ব্যক্তিটির মুখ ও চোখ দেখানো হল যাতে তার দৃষ্টি কোন দিকে তা বোঝা যায়। আমরা দেখলাম যে সে উপর দিকে তাকিয়ে আছে। এ ব্যাপারে শব্দকেও ব্যবহার করা যায়, এখানে হয়ত প্লেন উড়ে যাবার শব্দ ক্রমে বাড়তে থাকছে।

পরের শটে মোটামুটিভাবে ব্যক্তিটির অবস্থানে কমেরা রেখে সে যে ব্যক্তি/বস্তু/স্থান (object)-কে দেখছে তাকে দেখানো হল। এভাবে শব্দ ও দৃশ্যের ব্যবহারের দ্বারা দৃষ্টিবিন্দু (point of view) বা P.O.V. structure-এর মাধ্যমে ব্যক্তি (subject)-এর দৃষ্টিকে অনুসরণ করে স্থানিক ধারাবাহিকতা তৈরি করা যায়।

(ক)   (খ)   (গ)

আলফ্রেড হিচকক-এর বিখ্যাত **সাইকো** ছবির একটি দৃশ্যে ছবির নায়িকা মারিয়ান পালাচ্ছে। তার পিছনে একটি পুলিশের গাড়ি আসছে। পরিচালক প্রথমে মারিয়ানকে দেখান যে সে গাড়ি চালাচ্ছে, তারপর মারিয়ানের দৃষ্টি অনুসরণ করে আমরা গাড়ির পিছনের দৃশ্য দেখার আয়নার ছবি দেখতে পাই। পরের শটে আয়নায় দেখা যায় পিছনে ধাবমান পুলিশের গাড়ির অস্তিত্ব।

সত্যজিৎ রায়ের **চারুলতা** ছবির প্রথম দৃশ্যে আমরা দেখি যে নিঃসঙ্গ চারু চোখে একটি অপেরা গ্লাস লাগিয়ে

বাইরের রাস্তার দৃশ্য দেখছে। প্রথম শটে পরিচালক ঘরের জানালার পাশে চারুর অবস্থান দেখান, তারপর আমরা বুঝি চারুর দৃষ্টিপথ অপেরা গ্লাসের মাধ্যমে জানালার বাইরে। এবার পরের শটে চারু অপেরা গ্লাস দিয়ে বাইরের রাস্তায় যা দেখছে তা দেখানো হয়। এভাবে চারুর দৃষ্টিবিন্দু (P.O.V) স্থাপন করা হল উপরোক্ত দৃশ্যে।

একটি দৃশ্যে ধরা যাক দেখা যাচ্ছে লঙ শটে রাম ও শ্যাম পর্দার দুপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবার পরে রামের মিড শটে দেখানো হল যে সে পর্দার ডান দিক থেকে বাঁদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে শ্যামকে ডাকল। পরবর্তি শটে দেখলাম শ্যাম সাড়া দিল। এবার শ্যাম যে রামের ডাকে সাড়া দিল তা দেখাতে গেলে (ক্লোজ শটে বা অন্যভাবে) দেখাতে হবে যে শ্যাম পর্দার বাঁদিক থেকে ডানদিকে মুখ ঘোরালো রামের ডাক শুনে। অর্থাৎ এভাবে রাম ও শ্যামের দৃষ্টিপথের সামঞ্জস্য (cycline matching) তৈরি হল, যেখানে রাম শ্যামের দিকে ও শ্যাম রামের দিকে তাকিয়ে আছে বলে মনে হল। সুতরাং দৃষ্টিপথের সামঞ্জস্য বিধান (eyeline matching)-এর মাধ্যমে রাম ও শ্যামের মধ্যে স্থান (space)-এর অবিচ্ছিন্নতা (continuity)-এর অনুভূতি দর্শকের মনে গড়ে উঠল।

দৃষ্টিপথের সামঞ্জস্য বিধান বা আই-লাইন ম্যাচিং-এ যে কেবল দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টির মিলন হবে তা নয়, শব্দের সঙ্গে দৃষ্টিরও সংযোগ হতে পারে। ধরা যাক একটি বাড়িতে একটি চোর চুরি করতে ঢুকেছে। লঙ শটে দেখা যাচ্ছে যে সে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মিজ অ সিনের বাঁদিকে দেখা যাচ্ছে ঘরের অন্য একটি বন্ধ দরজা। পরের শটে আমরা মিড ক্লোজ শটে চোরটির কাণ্ড দেখছি, এমন সময় বন্ধ দরজা খোলার সামান্য শব্দ হল, চোরটি নিশ্চয় বাঁদিকে তাকাবে অর্থাৎ তার দৃষ্টিপথ ডানদিক থেকে বাঁদিকে এমনভাবে হবে যেন মনে হয় সে দরজা দিকে তাকালো। এর পরের শটে যথারীতি আবার ঘরে যে ব্যক্তি প্রবেশ করল তার সঙ্গে চোরের আই-লাইন ম্যাচিং-এর সম্ভাবনা থাকছে। প্রসঙ্গত মুখোমুখি দুই ব্যক্তির কথোপকথনের সময় আই-লাইন ম্যাচিং গুরুত্বপূর্ণ।

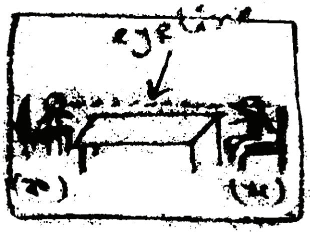

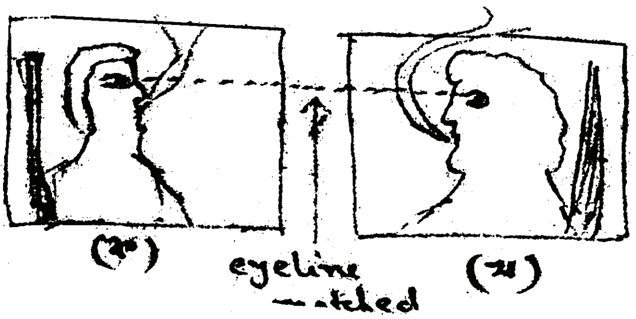

বাস্তববাদী চলচ্চিত্রগুলির সম্পাদনা রীতিতে উপরে আলোচিত বিভিন্ন পদ্ধতির দ্বারা স্থানের ধারাবাহিকতার অনুভূমি সৃষ্টি করা হয়। তবে কেবলমাত্র দৃশ্য নয় শব্দ অর্থাৎ আবহসঙ্গীত, বিশেষ শব্দ, পারিপার্শ্বিক শব্দ ও সংলাপও এক্ষেত্রে যথেষ্ট বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। স্থান ও কালের ধারাবাহিকতার অনুভূতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে শব্দের ভূমিকা পরবর্তি (৩ নং) এককে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়া আমরা যে সমান্তরাল সম্পাদনা (parallel editing)-এর কথা বলেছি তা পূর্বোক্ত ক্রস-কাটিং-এর মতই। তবে এক্ষেত্রে যে দুটি স্থানের মধ্যে বার বার (back & forth) ক-খ-ক-খ এরকম স্থানান্তর হচ্ছে যেখানে ক ও খ দুই স্থানের মধ্যে আখ্যান-অজ্ঞাত যোগাযোগ থাকে না। এভাবে হলা যায় যে ধরা যাক বড়লোকের বাড়ি খাওয়া-দাওয়া দেখানোর সময় একটি ভিখারীর খাওয়া দেখানো হল যদিও ভিখারীর আখ্যানে কোন ভূমিকা নেই—এক্ষেত্রে বড়লোকের বাড়ি ও ফুটপাতের ভিখিরীর স্থানদ্বয়ের মধ্যে সমান্তরাল সম্পাদনা ঘটছে।

৯.৮ জাম্প কাট

৯.৮.১ জাম্প কাট : সংজ্ঞা ও প্রয়োগ

জাম্প কাট হল দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাবার এমন এক রীতিবিরুদ্ধ (unconvensional) সম্পাদনা কৌশল যা সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে দুটি দৃশ্যাংশকে এমনভাবে কাট-এর মাধ্যমে যুক্ত করে যে একটি শটের পর অন্য শটটিকে মনে হয় আকস্মিক (unexpected) ও আখ্যান বর্ণনার দিক থেকে সম্পূর্ণ অসলংগ্ন (abrupt)। অর্থাৎ জাম্প কাট হল ম্যাচ-কাট-এর সম্পূর্ণ বিপরীত একটি পদ্ধতি। এবং ম্যাচ-কাটের যেখানে জন্ম হয়েছে প্রথাসিদ্ধ হলিউডের বাস্তববাদী সম্পদনা রীতি থেকে, জাম্প কাট সেখানে হলিউডের বাস্তববাদী সম্পাদনা রীতি অর্থাৎ প্রথাগত সম্পাদনা পদ্ধতির বিরোধীতা করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

ধরা যাক একটি দৃশ্যাংশে দেখা যাচ্ছে যে একটি লোক ঘরের দরজা খুলে ঘরে ঢুকে একটি টেবিলের দিকে এগোচ্ছে হঠাৎ কাট করে দৃশ্যান্তরে চলে যাওয়া হল, পরের শটে দেখা গেল লোকটি হাতে একটি রিভালবার নিয়ে দৌড়চ্ছে। এখানে কাট-এর সাহায্যে প্রথম শটে লোকটির অ্যাকশন (action) শেষ হওয়ার আগেই অকস্মাৎ পরের শটে চলে যাওয়া হল এমনভাবে যে পর পর দুটি শটের মধ্যে আখ্যানকে বোঝার ক্ষেত্রে যুক্তিপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হল না। এমনকি পরের শটটির স্থান-কাল ঘটনা ইত্যাদি দুর্বোধ্য থেকে গেল। এই ধরনের কাট-কে জাম্প কাট বলা যায়। উপরোক্ত পদ্ধতি ছাড়াও জাম্প কাট আরও অনেকভাবে সৃষ্টি করা যায়, পরে সেগুলি আলোচনা করা হবে।

আপাতত আমরা জাম্প কাটের ব্যবহারিক প্রয়োগের কথা আলোচনা করব। প্রসঙ্গত চলচ্চিত্রের ইতিহাসে জাম্প কাটের সচেতন প্রয়োগ প্রথম দেখা যায় ফরাসী চলচ্চিত্রকার জঁ লুক গোদার-এর **ব্রেথলেশ** ছবিতে। গোদার জাম্প কাট ব্যবহার করেছিলেন চলচ্চিত্র সম্পাদনায় প্রচলিত প্রথার বিরোধীতা করার জন্য।

'জাম্প কাট' ব্যবহারের প্রয়োগিক উদ্দেশ্যগুলি হল ঃ-

অ) প্রচলিত বাস্তববাদী প্রথা বিরুদ্ধ সম্পাদনা কৌশল তৈরি করা।

আ) হলিউড সম্পাদনা পদ্ধতিতে দৃশ্যান্তরে যাবার ক্ষেত্রে একধরনের মসৃণতা (seamlessness) সৃষ্টি করা হয়, বিপরীতপক্ষে জাম্প কাট ব্যবহারের অন্যতম উদ্দেশ্য হল দর্শকদের দৃষ্টিকে ধাক্কা দেওয়া।

ই) জাম্প কাট ব্যবহারের ফলে 'মসৃণ-দৃশ্যান্তর (seam less transition)-এর পরিবর্তে দুটি শটের মধ্যে যে অসংলগ্নতা তৈরি হয় তা যেন বোঝায় যে ছবি জিনিষটি মেসিনে তৈরি দৃষ্টিবিভ্রম সৃষ্টিকারী কিছু নয় বরং মানুষের হাতে তৈরি শিল্প (art)। অর্থাৎ জাম্প কাট (jump cut)-এর ব্যবহার ছবিকে আত্ম-প্রতিবর্তি (self-refexive) করে তুলতে সাহায্য করে।

ঈ) জাম্প-কাট-এর সৃষ্টি কর্তা জঁ লুক গোদারের কথায় জানা যায়, তিনি **ব্রেথলেশ** ছবিতে দৃশ্য (scene) থেকে দৃশ্যান্তরে যাবার ক্ষেত্রে এই কৌশল ব্যবহার করেছিলেন ডিসলভ ও ফেটইন/আউট ইত্যাদি খরচ-সাপেক্ষ পদ্ধতির বিকল্প হিসাবে। অর্থাৎ জাম্প কাট-এর প্রকৃত ব্যবহার ব্যয় বহুল সম্পাদনা কৌশলগুলির প্রথাবিরুদ্ধ বিকল্প হিসাবে ব্যবহার হতে পারে।

৯.৮.২ জাম্প-কাট-এর বিভিন্ন কৌশল

সম্পাদনার কৌশল (editing technique)-এর দিক থেকে দেখলে বিভিন্ন পদ্ধতিতে জাম্প-কাট করা যেতে পারে। সাধারণত জাম্প-কাট সৃষ্টির পাঁচ ধরনের সম্পাদনা পদ্ধতি দেখতে পাওয়া যায়, নিম্নে সেগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

(১) **এ্যাকশন জাম্প কাট (action jump cut)**—ফ্রেমে উপস্থিত কোন চরিত্র/বস্তু-এর একটি অ্যাকশন সম্পূর্ণ

হবার আগেই পরের শটে ঐ বস্তু/চরিত্র-এর সম্পূর্ণ অন্য অ্যাকশন (সম্পাদনার প্রচলিত রীতি ভেঙ্গে) দেখালে 'এ্যাকশন জাম্প কাট' সৃষ্টি হয়। আলোচনার শুরুতে এ ধরনের জাম্প কাট উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এছাড়া আখ্যানে পর পর ঘটে যাওয়া শটগুলির স্বাভাবিক সরলরৈখিক সজ্জা ভেঙ্গে কাট-এর সাহায্যে জুড়লেও জাম্প কাট সৃষ্টি হয়। যেমন, জঁ লুক গোদার-এর বিখ্যাত **পিয়েরো লা ফ্যু** ছবিতে একটি দৃশ্যে পর পর কয়েকটি দৃশ্যাংশ (shot)-এ দেখা যায়, মারিয়ান ও ফার্দিনান্দ ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে একটি গাড়িতে দরজা খুলে উঠছে, তারপর আবার তাদের দেখা যায় ফ্ল্যাটের মধ্যে হাতে বন্দুক নিয়ে। পরের শটে দেখি (লং শটে) তারা গাড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছে। তারপরের শটে দেখা যায় এরা দুজন হাতে বন্দুক নিয়ে ফ্ল্যাট বাড়ির ছাদে। এখানে জাম্প-কাট দ্বারা যুক্ত পর পর চারটি শটের মধ্যে স্থান ও কালের সরলরৈখিক প্রবাহ নেই, বরং রৈখিক সজ্জাকে উল্টে পাটে দেওয়া হয়েছে।

গোদার-এর **উওম্যান ইজ এ উওম্যান** ছবিতে একটি মজার জাম্প কাট রয়েছে। দেখা যায় ছবির নায়িকা অ্যানা কারিনা একটি প্যানে ডিম ভাজছে। সে ডিমটি ভাজার সময় ওল্টানোর জন্যে প্যান থেকে উপরে ছুঁড়ে দেয়। হঠাৎ কাট করে দেখানো হয় যে অ্যানা করিনা টেলিফোন ধরতে গেছে। সে ফিরে আসার পর আবার কাট করে দেখানো হয়, ঐ উপরে ছুঁড়ে দেওয়া ডিমটি তার প্যানে এসে পড়ল। এ ধরনের জাম্প-কাট-এর ব্যবহার গোদার-এর ছবিতে বিরল নয়।

(২) **১৮০° নিয়ম লঙ্ঘন-জনিত জাম্প কাট (jump cut due to the violation of 180⁰ rule)**— কোন গতিশীল বস্তু/চরিত্র অথবা দুই চরিত্রের মুখোমুখি বসে কথোপকথন দেখাবার সময় যদি ক্যামেরা পর পর দুটি শটে ১৮০° বা তার থেকে বেশি স্থান পরিবর্তন করে তাহলে মনে হয় যেন বস্তু/চরিত্রের গতিপথ বা কথোপকথনের সময় বসে থাকা চরিত্রগুলির অবস্থান হঠাৎ সম্পূর্ণ উল্টে গেল। সুতরাং উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে সম্পাদনার সময় লক্ষ্য করা হয় যাতে পর পর দুটি শট এমনভাবে যুক্ত না হয় যাতে ক্যামেরা অবস্থান ১৮০° বা তার বেশি বদলে যায়। এই বাস্তববাদী নিয়মকে বলা হয় সম্পাদনার ১৮০° নিয়ম (180⁰ rule)।

পর পর দুটি শট ১৮০° নিয়ম লঙ্ঘন করে কাট-এর সাহায্যে যুক্ত করা হলে তা একধরনের জাম্প কাট-এর জন্ম দেয়। জাপানী চলচ্চিত্রকার ইয়াসুজিরো ওজু (ozu)- ছবিতে ১৮০° নিয়মের বত্যয় প্রায়ই দেখা যায়। ওজু-র **আরলি সামার** ছবির পর পর দুটি দৃশ্যাংশ (shot)-এর কথা বলা যাক। প্রথমে দেখা যায় এক ব্যক্তি, দুই মহিলা ও একটি বালক একটি নিচু টেবিলের চারপাশে জাপানী কায়দায় জানু পেতে বসে খাওয়া-দাওয়া করছে। পানরত ব্যক্তিটির ঠিক ডানপাশ থেকে শট নেওয়া হয়েছে এবং দেখা যাচ্ছে বালকটি ক্যামেরার দিকে পিঠ করে বসে আছে। কাট করে পরবর্তি মিড শটে চলে যাওয়া হয়, এবার ক্যামেরা পূর্ববর্তি শটের তুলনায় একেবারে ১৮০° স্থান পরিবর্তন করে পানরত লোকটিকে দেখায় তার একেবার বাঁদিক থেকে। ফলে লোকটির অবস্থান হঠাৎ পরের শটে ফ্রেমের বাঁদিক থেকে ডানদিকে চলে আসে এবং তার অভিমুখ শটের সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যায়। ওজু-র ছবিতে ১৮০° নিয়মের এত বেশি ব্যতিক্রম দেখা যায় যে ওজু-র ছবিতে ব্যতিক্রমটিই নিয়ম হয়ে ওঠে।

প্রায় সব ধরনের জাম্প-কাট-এর নজির গোদার-এর **ব্রেথলেশ** ছবি থেকে পাওয়া যেতে পারে। এ ছবির একটি শটে দেখা যায় নায়িকা প্যাট্রিসিয়া খবরের কাগজ খুলে পড়তে পড়তে ফ্রেমের বাঁদিক থেকে ডানদিকে হেঁটে যাচ্ছে। ক্যামেরা তাকে তার হাতের দিক থেকে দেখায়। পরের শটে প্রায় একই পশ্চাদপট (back drop)-এর সামনে তাকে দেখা যায় যে ফ্রেমের ডানদিক থেকে বাঁ দিকে হাঁটছে, এবার ক্যামেরা প্রথম শটের ঠিক ১৮০° বিপরীতে অর্থাৎ প্যাট্রিসিয়ার বাঁ কাঁধের দিকে। ফলে একধরনের জাম্প কাট-এর সৃষ্টি হয় যাতে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যেন দ্বিতীয় শটে প্যাট্রিসিয়ার গতিপথ সম্পূর্ণ উল্টে গেছে।

(৩) **৩০° নিয়ম লঙ্ঘন-জনিত জাম্প-কাট (Jump cut due to the violation of 30⁰ rule)**— সম্পাদনার ক্ষেত্রে ৩০° নিয়ম-এর অর্থ হল যে পর পর দুটি শট কাট-এর সাহায্যে যুক্ত করার সময় দেখতে হয় যাতে একই ব্যক্তি/বস্তু-র প্রথম শট ও দ্বিতীয় শটের ক্যামেরার অবস্থানের মধ্যে ৩০° বা তার কম ব্যবধানে না থাকে। যদি এ

ধরনের ক্ষেত্রে ৩০° বা তার কম ব্যবধান থাকে তাহলে এরকম দুটি শটের মধ্যে দৃশ্যান্তর (transition)-এর সময় একধরনের দৃশ্যগত ঝাঁকুনি (jerk) অনুভূত হয়। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে প্রথম শটের তুলনায় দ্বিতীয় শটে চরিত্র/বস্তু-র অবস্থান হঠাৎ একটি ঝাঁকুনি খেয়ে খুব দ্রুত সামান্য পরিবর্তিত হয়ে যায়।

ব্রেথলেশ ছবিতে একটি দৃশ্যাংশ (shot)-এ নায়িকা প্যাট্রিসিয়াকে তার বাঁ কাঁধের দিকে রাখা ক্যামেরা থেকে ক্লোজ আপ-এ দেখা যায় গাড়ি চালিয়ে যেতে। পরের দৃশ্যাংশে ক্যামেরা প্রথম অবস্থান থেকে ৩০° কোণের মধ্যে একটু বাঁদিকে সরিয়ে শট নেওয়া হয়। দর্শকের চোখ মনে হয় প্রথম শট থেকে দ্বিতীয় শটে প্যাট্রিসিয়ার মাথা হঠাৎ ঝাকুনি (jerk) দিয়ে একটু বাঁ দিকে ঘুরে গেল। এভাবে ৩০° নিয়মের লঙ্ঘনের ফলে সৃষ্ট জাম্প কাট-এর সাহায্যে মসৃণ দৃশ্যান্তরের (smooth transition) বাস্তববাদী সম্পাদনা পদ্ধতির ব্যতিক্রম ঘটানো হয়।

(৪) **শব্দপথ (sound track)-এ সৃষ্ট জাম্প কাট**—কেবলমাত্র দৃশ্যের ক্ষেত্রেই নয় জাম্প কাট শব্দের ব্যবহারের দ্বারাও তৈরি করা যেতে পারে। উদাহরণ হিসাবে **ব্রেথলেশ** ছবির একটি দৃশ্যের কথা বলা যায় যেখানে প্যাট্রিসিয়া ও মিশেল পোইকার দুই প্রধান চরিত্র গাড়ি চালিয়ে প্যারিসের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। পর পর চারটি শটে প্যাট্রিসিয়ার যে সংলাপের অংশগুলি আমরা শুনি তা বিভিন্ন চারটি স্থান ও কালে ব্যপ্ত, অর্থাৎ সংলাপের অংশগুলির মধ্যে কোন আপাত সম্পর্ক নেই। এভাবে শব্দপথকে ব্যবহার করেও জাম্প কাটের অনুভূতি সৃষ্টি করা যায়। জঁ লুক গোদার দৃশ্যের সঙ্গে শব্দের ক্ষেত্রেও জাম্প কাট-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

(৫) **পশ্চাদপট (backdrop) পরিবর্তনে সৃষ্ট জাম্প কাট** — পর পর দুটি বা তার বেশি শট-এ যদি চরিত্র/ বস্তু-কে একই দেহভঙ্গি ও একই পোষাকে অবস্থান করতে দেখা যায়, অথচ প্রতিটি শটেই যদি এরকম হয় যে তাদের পশ্চাদপট (backdrop) পাল্টে যাচ্ছে, তাহলেও জাম্পকাট-এর অনুভূতি তৈরি হতে পারে। উপরের অংশে শব্দপথের ক্ষেত্রে **ব্রেথলেশ** ছবির যে দৃশ্যটির কথা বলা হয়েছে সেখানে দেখা যায় প্যাট্রিসিয়া ও মিশেল একইভাবে গাড়িতে বসে রয়েছে অথচ পর পর চারটি শটে তাদের পশ্চাদপট (শব্দ পথের সঙ্গে) আকস্মিকভাবে পাল্টে যাচ্ছে। এও এক প্রকার 'জাম্প কাট'।

৯.৯ প্রতিষ্ঠাকারী দৃশ্যাংশ ও কাট ইন

• প্রতিষ্ঠাকারী দৃশ্যাংশ (Establishing Shot) কী

প্রতিষ্ঠানকারী দৃশ্যাংশ হল এমন একটি (বা দুটি) শট যা আখ্যানের একটি দৃশ্য (scene), দৃশ্যপর্যায় (sequence)-এর শুরুতে ব্যবহৃত হয়ে, আখ্যানের ঐ দৃশ্য বা দৃশ্যপর্যায়ে ঘটতে চলা ঘটনার স্থান, কাল, চরিত্র, বস্তু-সংস্থান ইত্যাদির সম্পর্কে দর্শককে এক দৃষ্টিতে একটি ধারণা দিতে পারে।

সুতরাং একথা বলা যায়, প্রায় সব ছবিরই প্রথম দৃশ্যাংশ বা ছবির অন্যান্য দৃশ্য বা দৃশ্যপর্যায়ের প্রথম শটটি সাধারণত হয় একটি প্রতিষ্ঠাকারী দৃশ্যাংশ বা এস্টাবলিশিং শট (Establishing shot)। এই ধরনের দৃশ্যাংশকে অনেক সময় মাস্টার শট (master shot) বা কভারিং শট (covering shot) ও বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাকারী দৃশ্যাংশকে বলা যায় একটি দৃশ্য বা দৃশ্যপর্যায়ের মুখবন্ধ। এই শট-এর মাধ্যমেই দর্শক ঐ দৃশ্য বা দৃশ্যপর্যায়টিতে প্রবিষ্ট (introduced) হয়ে থাকে।

এইভাবে একটি বা দুটি প্রতিষ্ঠাকারী দৃশ্যাংশের মাধ্যমে দৃশ্য বা দৃশ্যপর্যায়ের শুরুতে ঘটনার প্রাথমিক স্থান ও অবস্থা সম্পর্কে দর্শককে একটি ধারণা দেওয়ার পদ্ধতিটি বাস্তববাদী (realist) চলচ্চিত্র সম্পাদনার একটি রীতি বা প্রথা (convension) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। স্বভাবতই এই পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়েছিল হলিউড-এ আধুনিক সম্পাদনা রীতি শুরু হওয়ার পর থেকে।

প্রসঙ্গত বলা যায় বাস্তববাদী নয় এরকম ছবির আখ্যান বর্ণনার ক্ষেত্রে মাস্টার শট বা এস্টাবলিশিং শটের ব্যবহার জরুরী নয়। কিন্তু বাস্তববাদী বর্ণনা শৈলীর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাকারী দৃশ্যাংশ ব্যবহার প্রায় অনিবার্য ধরা হয়।

প্রতিষ্ঠাকারী শট যেহেতু অনেকটা অঞ্চলকে দেখাতে চায় তাই সাধারণত এই শটগুলি হয় লঙ শট বা এক্সট্রিম লঙ শট। ধরা যাক ঋত্বিক ঘটক-এর **মেঘে ঢাকা তারা** ছবির প্রথম শট-টির কথা, সেখানে একটি এক্সট্রিম লঙ শট একটি বিশাল বটগাছ-কে দেখায় ও তার ঠিক তলা দিয়ে নীতা-কে হেঁটে আসতে দেখা যায়। এই প্রতিষ্ঠাকারী শটটি বোঝায় যে দৃশ্যের স্থানটি হল শহরের বাইরে কোন উদ্বাস্তু কালোনী অঞ্চল, নীতা যেখানে বাস করে।

অনেকসময়ই ক্যামেরার চলাচলের মাধ্যমে ও কখনো কখনো উঁচু থেকে নেওয়া শট (top shot)-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাকারী দৃশ্যাংশ শুরু হয়। আলফ্রেড হিচকক-এর **সাইকো** ছবির শুরুর শটটি একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠাকারী দৃশ্যাংশ। দেখা যায় ক্যামেরা যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা শহরের উপর দিয়ে ক্রেনের সাহায্যে টপ শটে ঘুরে একটি বহুতল হোটেলের জানালা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে যেখানে কাহিনী শুরু হচ্ছে। এই শটটি আখ্যানের স্থান (sapce & location)-কে দর্শকের সামনে নিপুণভাবে পরিচয় করালো।

সত্যজিৎ রায়ের **চারুলতা** ছবির শুরুর প্রতিষ্ঠাকারী দৃশ্য (scene)-এর কথা মনে করা যাক। দেখা যাচ্ছে লংশটে নিঃসঙ্গ চারু তার বাড়িতে কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কখনো অপেরা গ্লাস দিয়ে বাইরে দেখার চেষ্টা করছে। এই একটি প্রতিষ্ঠাকারী দৃশ্যে সত্যজিৎ রায় দর্শককে যেমন চারুর স্থানিক অবস্থান (sapce)-এর সঙ্গে পরিচয় করাচ্ছেন, তেমনি একই সঙ্গ তিনি বেশ কিছু তথ্য ও ডিটেল (detail) দর্শকের কাছে প্রতিষ্ঠা করছেন। যেমন এই প্রতিষ্ঠাকারী একটি বা দুটি শটের সাহায্যে দর্শক বোঝেন যে এক— চারু নিঃসঙ্গ, দুই— চারু ধনীগৃহে বাস করে এবং তিন— চারুর ধনীগৃহে বিশেষ কোন কাজ নেই।

● প্রতিষ্ঠাকারী শট-এর ব্যবহারিক প্রয়োগ

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে প্রতিষ্ঠাকারী দৃশ্যাংশ-এর ব্যবহার নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে :-

ক) প্রথাসিদ্ধ সম্পাদনা রীতি-র ক্ষেত্রে ছবি বা ছবির কোন দৃশ্য (scene) বা দৃশ্যপর্যায় (sequence)-এর শুরু প্রতিষ্ঠাকারী দৃশ্যাংশ দিয়ে করাটা প্রায় একধরনের সম্পাদনার ব্যকরণের নিয়মে পরিণত হয়েছে।

খ) নতুন দৃশ্য বা দৃশ্যপর্যায়ের-এর স্থানিক (spatial) অবস্থা সম্পর্কে দর্শককে অবগত করা হয় এই শটের ব্যবহার দ্বারা।

গ) আখ্যান বা আখ্যানের কোন অংশের প্রথাসিদ্ধ সুচনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাকারী শট উপযোগী ভূমিকা পালন করে।

ঘ) দর্শককে সমগ্র আখ্যান বা কোন বিশেষ দৃশ্য বা দৃশ্যপর্যায় সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যাদি সরবরাহ করা ও প্রাথমিক ডিটেল সৃষ্টি করার জন্য এই ধরনের দৃশ্যাংশ ব্যবহার করা হয়।

ঙ) স্থান (space)-এর মতই আখ্যানে কোন নতুন চরিত্রকে দর্শকের সঙ্গে (তার স্থানিক অবস্থান-সহ) পরিচয় করানোর জন্যও এধরনের শট ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন ধরা যাক সত্যজিৎ রায়ের **চারুলতা** ছবিতে এক ঝড়ের বিকেলে অমল-এর আগমন। লঙ শটে আমরা দেখি অমলের চেহারা, সে প্রণাম করে, চারুকে সে "বৌঠান" বলে সম্বোধন করে। এই শটের মধ্যে দিয়ে অমল চরিত্রটিকে প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা হল।

তবে সব বাস্তববাদী ছবিতেই যে প্রথমে প্রতিষ্ঠাকারী শট দিয়ে ছবি বা ছবির কোন নতুন দৃশ্য বা দৃশ্যপর্যায় শুরু করা হয় তা নয়। অনেক সময় দু-একটি ক্লোজ-শট; মিড শট বা সামান্য সংলাপের পর প্রতিষ্ঠাকারী শটটি দেখানো হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠাকারী শট যদি 'ক' হয়, তবে আমরা বলতে চাইছি যে সবক্ষেত্রে ক-খ-গ-ঘ এভাবে আখ্যান নির্মিত না হয়ে অনেকক্ষেত্রে খ-ক-গ-ঘ এভাবেও প্রতিষ্ঠাকারী শটকে ব্যবহার করা হতে পারে।

এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাকারী শট-এর ব্যবহার ব্যতিরেকেই আখ্যান এগোতে পারে। এ ধরনের পদ্ধতিকে 'কুলেশভ এফেক্ট' (kuleshov effect) বলা হয়, যেখানে বলা হয় যে আলাদাভাবে প্রতিষ্ঠাকারী দৃশ্যাংশের কোন

দরকার নেই, চরিত্রগুলির কার্যকলাপ (action)-এর মাধ্যমেই স্থান (space)-এর কল্পনা দর্শকের মাথায় এসে যায়। সোভিয়েত চলচিত্রে 'কলেশভ এফেক্টে'র ব্যবহার দেখা যায় বিশেষভাবে।

আলফ্রেড হিচকক হলিউডে নির্মিত তাঁর একটি ছবি **রিয়ার উইণ্ড**-এর বিভিন্ন দৃশ্যের শুরুতে এধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। যেমন, একটি দৃশ্যের শুরুতে দেখা যায় জেফ, ছবির প্রধান চরিত্র জানালার সামনে বসে আছে, পরের শটে তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে জানালার উল্টোদিকের একটি বাড়ির জানালা দিয়ে দূর থেকে একটি লোককে দেখা যায়। পরের শটে আবার বাইনোকুলার চোখে জেফকে দেখা যায়, কাট করে জেফের দৃষ্টি অনুসরণ করে উল্টোদিকের জানালা দিয়ে লোকটিকে মিড শটে দেখা যায়। এভাবে চলতে থাকে। এখানে দৃশ্যের শুরুতে কোন একটি প্রতিষ্ঠাকারী দৃশ্যাংশ নেই। চরিত্রগুলির কার্যকর্ম (action) ও দৃষ্টি-অনুসরণ করে পরিচালক স্থানের ধারণাটি গড়ে তুলেছেন।

যাইহোক ব্যতিক্রম থাকলেও আধুনিকালে বাস্তববাদী সম্পাদনা রীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল আখ্যানের শুরুতে বা কোন নতুন দৃশ্য (scene) বা দৃশ্যাংশ (sequence)-এর শুরুতে প্রতিষ্ঠাকারী দৃশ্যাংশ-এর ব্যবহার। প্রসঙ্গত বলা যায়, আদি চলচ্চিত্র (early cinema)-এ যেহেতু একটি শটই হতে একটি এক রিলের ছবি, সেহেতু প্রতিষ্ঠাকারী দৃশ্যাংশ বলে আলাদা করে কিছু থাকত না। ১৯১০-১৯২০ এই সময়ের মধ্যে হলিউডের সম্পাদনা পদ্ধতিতে একটি আখ্যান বা আখ্যানে নতুন কোন দৃশ্যের সঙ্গে দর্শকের পরিচয় ঘটানোর জন্য প্রতিষ্ঠাকারী দৃশ্যাংশ (establishing/master shot)-এর ব্যবহার শুরু হয়।

- **কাট-ইন (cut-in)**

সম্পাদনার সময় একটি দীর্ঘ-শট (long shot)-এর পর কাট করে অপেক্ষাকৃত কাছের দৃশ্য বা ক্লোজ শট-এ এলে, এই দৃশ্যান্তর (trasnition)-কে বলা হবে কাট-ইন (cut-in)। আমরা আগেই প্রতিষ্ঠাকারী দৃশ্যাংশ সম্পর্কে বলেছি যে ঐ ধরনের শট অর্থাৎ এস্টাবলিশিং শট (establishing shot) সাধারণত দীর্ঘ-দৃশ্যাংশ (long shot) হয়ে থাকে। সাধারণত বাস্তববাদী সম্পাদনা রীতিতে প্রতিষ্ঠাকারী দীর্ঘ দৃশ্যাংশের পরের শটটি হয়ে থাকে অপেক্ষাকৃত ক্লোজ শট (অবশ্য এর ব্যতিক্রমও ঘটতে পারে)। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বলা হবে যে 'এসটাবলিশিং লঙ শট' থেকে কাট-ইন করে ক্লোজ শটে যাওয়া হল।

চলচ্চিত্রের আদি যুগে (early cinema) যখন একটি স্থান (location)-এ একটি এক রিলের ছবি হত এক রিলের তখন সম্পাদনার কোন পদ্ধতি ছিল না। ফলে 'কাট-ইন'-এর ব্যবহার তখনকার ছবিতে ছিল না। পরবর্তিকালে অর্থাৎ গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রথমদিক থেকে ছবিতে (হলিউডের ছবিতে) লঙ শটের পর ক্লোজ শটের ব্যবহার অর্থাৎ সম্পাদনার ক্ষেত্রে 'কাট-ইন' পদ্ধতি চালু হয়ে যায়।

আরও পরে হলিউড ছবিতে একধরনের 'সাধারণ বাস্তববাদী প্রথা (standard realist practice) হিসাবে সম্পাদনা রীতিতে একটি লং শটের পর একটি অপেক্ষাকৃত ক্লোজ শট দেখানার প্রথা শুরু হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লঙ শট-মিড-শট-ক্লোজ শট এই ধারা (বা এর বিপরীত ধারা) মেনে সম্পাদনা করা হত। অর্থাৎ এই সময় থেকেই বাস্তববাদী ক্ষেত্রে 'কাট-ইন' অবিবার্য হয়ে উঠল।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে কাট-ইন (cut-in)-এর বেশ কয়েকটি উপযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে —

- দৃশ্য সম্পাদনায় বৈচিত্র্য আনা সম্ভব হয়েছে।
- লঙ শটের পর কাট-ইন করে কোন অংশকে বিশেষভাবে ক্লোজ শটে দেখিয়ে ঐ অংশের প্রতি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হয়।
- প্রতিষ্ঠাকারী দৃশ্যাংশের পর 'কাট-ইন' করার রীতির ফলে দৃশ্য যেমন গতি পেয়েছে, তেমনি আখ্যানের বর্ণনায় সাহায্য করেছে।

ঋত্বিক ঘটকের **সুবর্ণরেখা** ছবির চিত্রনাট্য থেকে 'কাট-ইন'-এর একটি উদাহরণ দেওয়া হল—

Long panning shot :- সীতা পরিত্যক্ত রানওয়েতে বসে গান গাইছে (establishing shot)। cut

mid shot : সীতা গাইছে —'দেখো ভোর জয়ী/দশ দিগ জাগে...'। cut

close shot : সীতা গাইছে.......; cut

এখানে লঙ শট থেকে শুরু করে 'কাট-ইন' করে ক্রমে সীতার ক্লোজ শটে আসা হয়েছে।

৯.১০ সন্নিবিষ্ট দৃশ্যাংশ, কাট অ্যাওয়ে

● সন্নিবিষ্ট দৃশ্যাংশ ও তার প্রয়োগ

'সন্নিবিষ্ট দৃশ্যাংশ' বা ইনসার্ট শট (insert shot) বলতে বোঝানো হয় সাধারণত সেইসব শট যেগুলি ছবি (film)-এর মূল বিষয়ের বর্ণনার অপরিহার্য অংশ না হলেও ছবির অন্তর্গত বস্তু/চরিত্রের শরীরের কোন অংশের ডিটেল বিগ ক্লোজ শটে প্রকাশ করে অথবা আখ্যানের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না হলেও প্রতীকি অর্থ বা ব্যঞ্জনা প্রকাশ করে।

সন্নিবিষ্ট দৃশ্যাংশ (insert shot)-গুলি ফিল্মের প্রায় বিচ্ছিন্ন অংশ-বিশেষ যা বিশেষভাবে অর্থবহ হয়ে ওঠে বা আখ্যানের সংযোজক ভূমিকা পালন করে থাকে। অনেক সময় বস্তু/চরিত্র-এর কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে জোর দিয়ে দর্শককে দেখাতে চাইলে ছবিরসম্পাদক ইনসার্ট ব্যবহার করে তা দেখান।

বিখ্যাত জার্মান পরিচালক ফ্রিৎস্ ল্যাং-এর **ফিউরী** ছবিতে একটি দৃশ্যে কয়েকজন মহিলাকে মিড শটে দেখা যাচ্ছে তারা একত্রিত হয়ে কথাবার্তা বলছেন। পরের শটে দেখা যায় কয়েকটি মুরগি গলা তুলে কঁক কঁক শব্দে কোলাহল করছে। তারপর আবার ক্যামেরা ফিরে আসে মহিলাদের দৃশ্যে। এখানে মাঝের শটটি হল একটি ইনসার্ট শট বা সন্নিবিষ্ট দৃশ্যাংশ। মহিলাদের কোলাহলের মাঝে মুরগিদের চিৎকারের শটটিকে সম্পাদক সনিবিষ্ট (insert) করেছেন মূল দৃশ্য (scene)-এর বর্ণনার মধ্যে।

সত্যজিৎ রায়ের **অপরাজিত** ছবির একটি সন্নিবিষ্ট দৃশ্যাংশের কথা বলা যায়। হরিহরের মৃত্যুর মুহূর্তে হঠাৎ মূল ঘটনার বাইরে কাট করে কাশীর গঙ্গার ঘাটে ঘুরে বেড়ানো একঝাঁক পায়রা উড়ে যাবার দৃশ্যাংশ দেখানো হয়। তারপর আবার ক্যামেরা ফিরে আসে পরের দৃশ্য (scene)-এ মূল ঘটনার বর্ণনায়। এখানে পায়রা উড়ে যাবার দৃশ্যের ইনসার্ট শট ব্যবহার করে ছবির সম্পাদক ও পরিচালক মৃত্যু দৃশ্যটির প্রতীকি ব্যঞ্জনা তৈরি করতে চেয়েছেন।

অনেকক্ষেত্রেই তথ্যচিত্র-এ দেখা যায়, হয়ত কোন একটি বিশেষ বস্তু, ধরা যাক একটি চিত্র (painting) সম্পর্কে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি কথা বলছেন বা সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন, বক্তার কথার মাঝেই ঐ চিত্র (painting)-টির দৃশ্য হয়ত দৃশ্যপথ (visual track)-এ এক ঝলক দেখানো হল। তারপর আবার ক্যামেরা ফিরে এলো বক্তার শটে। এখানে বক্তব্যের মাঝে চিত্রকর্মটির সন্নিবিষ্ট সম্পাদনার সাহায্যে ব্যবহার করা হল বলা যায়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা সন্নিবিষ্ট শট বা ইনসার্ট-এর বেশ কয়েকটি ব্যবহারিক গুরুত্বের কথা বুঝলাম :-

ক) কোন বস্তু/চরিত্রের শরীরের অংশ খুব বড় করে পর্দায় দেখিয়ে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ইনসার্ট ব্যবহৃত হয়।

খ) কোন বিশেষ ডিটেল বা তথ্য দর্শককে দেখাতে গেলে ইনসার্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।

গ) অনেক সময় প্রতীকি অর্থ সৃষ্টি করতে মূল ঘটনার বর্ণনার মাঝে একটি বা দুটি ইনসার্ট শট ব্যবহার করা যেতে পারে।

ঘ) ছবিতে, বিশেষত বিপ্লবোত্তর-সোভিয়েত ছবিতে 'মনতাজ সিকোয়েন্স' তৈরি করার ক্ষেত্রে ইনসার্টের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়টি আমরা পরে আলোচনা করব।

● সন্নিবিষ্ট দৃশ্যাংশ : প্রকারভেদ

ইনসার্ট শট দু প্রকারের হতে পারে। একটি হল আখ্যান-অন্তর্গত (degetic) 'সন্নিবিষ্ট দৃশ্যাংশ' (insert), অন্যটি হতে পারে আখ্যান-বহির্ভূত (extradigetic) সন্নিবিষ্ট দৃশ্যাংশ। ইনসার্ট যে দৃশ্যাংশটি দেখাচ্ছে তার বিষয় যদি কাহিনীর অংশ বিশেষ হয় তবে তাকে আখ্যান-অন্তর্গত সন্নিবিষ্ট দৃশ্যাংশ বলা হয়। যেমন ধরা যাক কাহিনীর মধ্যে কোন স্থানে গল্পের স্থান-কাল বা চরিত্র-এর সঙ্গে সম্পর্কিত কোন চিঠি, অর্থবহ প্রতীকচিহ্ন (emblem) বা স্থিরচিত্রের প্রসঙ্গ দর্শককে বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেবার জন্য যে সব ইনসার্ট ব্যবহার করা হয়, তাদের বলা যায় 'ডাইজেটিক ইনসার্ট শট'।

কাহিনীচিত্রে অনেক সময় ডাইজেটিক ইনসার্ট ব্যবহার করা হয় দর্শকের মনে প্রবল অভিঘাত সৃষ্টির জন্য। ঋত্বিক ঘটকের **সুবর্ণরেখা** ছবির একটি দৃশ্যে ছবির প্রধান নারীচরিত্র সীতা আত্মহত্যা করে। মুহূর্তটি-র ট্র্যাজিক অভিঘাতকে প্রকাশ করার জন্য পরের শটে পরিচালক ও সম্পাদক সীতার চোখের একটি বিগ-ক্লোজ-আপ শটের ইনসার্ট ব্যবহার করেছেন।

আবার আইজেনস্টাইন-এর ছবিতে অনেকক্ষেত্রেই আখ্যান-বহির্ভূত সন্নিবিষ্ট শট বা এক্সট্রা-ডাইজেটিক ইনসার্টের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ হয়ে উঠেছে। তাঁর **স্ট্রাইক** ছবিতে ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর স্বৈরাচারী সৈন্যবাহিনীর প্রবল অত্যাচার ও গণহত্যার দৃশ্যের মাঝে একটি ইনসার্ট ব্যবহার করা হয়, যাতে দেখা যায় একটি বড় গরুকে কাটা হচ্ছে। ব্যাপক গণহত্যার সঙ্গে পশুনিধনের ইনসার্ট শট পর পর অবস্থান করে যে মন্তাজ সৃষ্টি করেছে তার শোষিতের উপর শোষকের অত্যাচার দেখানোর ক্ষেত্রে বিশেষ ইঙ্গিত-বহ।

ইনসার্ট ও মন্তাজ (insert shots & montage)— 'মনতাজ সিকোয়েন্স' (montage sequence)-এর মাঝে একটি বা দুটি (সাধারণত আখ্যান-বহির্ভূত) ইনসার্ট শটের ব্যবহার মনতাজের বিমূর্ত অর্থকে দর্শকের সামনে তুলে ধরতে পারে। যেরকম আমরা দেখলাম সের্গেই আইজেনস্টাইন-এর **স্ট্রাইক** (১৯২৫) ছবির উপরোক্ত উদাহরণটির ক্ষেত্রে।

একটি মনতাজ দৃশ্যপর্যায় (sequence)-এর মধ্যে ইনসার্ট কিভাবে স্থান-কাল-এর প্রধান নির্দেশক হয়ে উঠতে পারে তা সোভিয়েত চলচ্চিত্রকার লেভ কুলেশভ-এর পরীক্ষা ('কুলেশভ এক্সপেরিমেন্ট' নামে পরিচিত) থেকে জানা যায়। কুলেশভ মনতাজ দৃশ্যাংশগুলি এভাবে পর পর দেখান যে—

১. একটি তরুণ হেঁটে যাচ্ছে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে।
২. একটি তরুণী হেঁটে আসছে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে।
৩. দুজনের দেখা হয়, ওরা করমর্দন করে। তরুণটি আঙুল তুলে দেখায়—
৪. একটি বিরাট সাদা বাড়ি, চওড়া সিঁড়ি ধাপে ধাপে উঠে গেছে।
৫. দুজনে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে।

এই শটগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থান (space)-এ তোলা হয়েছে। কিন্তু দৃশ্যপর্যায় (sequence)-টিতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম শটগুলি একটি আখ্যানের গঠন তৈরির আভাস দিচ্ছে। এদের মধ্যে চতুর্থ শটটি অর্থাৎ সাদা বিশাল বাড়ি (হোয়াইট হাউস)-র ইনসার্ট শটটি এই দৃশ্যপর্যায়ে একপ্রকার অর্থ সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ সাদা বাড়ির ইনসার্ট উপরোক্ত মনতাজের মধ্যে একথার ইঙ্গিত বহন করে যে তরুণ-তরুণী যেন সাদা বাড়ির ক্ষমতা ও বৈভবের অলিন্দে প্রবেশ করতে চান যা একধরনের বুর্জোয়াঁ ইচ্ছার প্রকাশ।

এ প্রসঙ্গ আইজানস্টাইন-এর **ব্যাটলশিপ পোটেমকিন** (১৯২৫) ছবির সিংহ-এর দৃশ্য (scene)-এর কথা বলা যায়। ছবিতে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার দৃশ্যের পরেই একটি পাথরের সিংহমূর্তির তিনটি শট এমনভাবে ইনসার্ট করা হয় যে মনে হয় সিংহ উঠে দাঁড়াচ্ছে। এই আখ্যান-বহির্ভূত ইনসার্ট পর্বটি মনতাজ দৃশ্য পর্যাকে ইঙ্গিতপূর্ণ করে তোলে। প্রসঙ্গত আইজেনস্টাইনের ছবিতে বিভিন্ন মন্তাজ দৃশ্যপর্যায়ে 'আখ্যান অন্তর্গত' ও 'আখ্যান বহির্ভূত' ইনসার্ট শটের ব্যবহারের গুরুত্ব অপরিসীম।

* **কাট-অ্যাওয়ে (cut-away)**

একটি দৃশ্যের মাঝে যদি কাট (cut) করে এমন একটি ছোট (brief) দৃশ্যাংশের ইনসার্ট চলে যাওয়া হয় সাধারণত যা ঘটছে ভিন্ন একটি স্থানে (location-এ) তাহলে প্রথম শট থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'কাট-অ্যাওয়ে' (cut-away)।

মাঝে মধ্যে টেলিভিশন বা কোন তথ্যচিত্রে আমরা দেখি, যে ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে ক্যামেরা বেশিরভাগ সময়ই তাকে দেখিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে প্রশ্নকর্তা বা তার কাছের কোন শ্রোতার মুখের ইনসার্ট দেখানো হয়, সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন যিনি তার কথার প্রতিক্রিয়া কী হচ্ছে তা দেখানোর জন্য, একে বলা হয় প্রতিক্রিয়া দৃশ্যাংশ (reaction shot)। এইভাবে সাক্ষাৎকার যিনি দিচ্ছেন তাঁর কথার মাঝে কাট করে ছোট সময় দৈর্ঘ্য (short duration)-এর প্রতিক্রিয়া শটে দৃশ্যান্তরকে কাট-অ্যাওয়ের উদাহরণ বলা যেতে পারে।

আদিযুগের চলচ্চিত্রে (carly cinema)-এ যখন একটি স্থান (location)-এ শ্রীহিত এক রিলের অবিচ্ছিন্ন দৃশ্যাংশগুলিই ছিল এক একটি ফিল্ম (film), তখন 'কাট-ইন'-এর মতই 'কাট-অ্যাওয়ে' পদ্ধতিরও ব্যবহারের কোন প্রশ্নই উঠছে না। কাট-অ্যাওয়ে (cut-away) পদ্ধতির ব্যবহারের প্রথম সম্ভাবনা তৈরি হয় এডুইন পোর্টার-এর **লোনডেল অপারেটর** (১৯০৩) ছবিটিতে। এ ছবিতে একটি স্টেশন যেখানে ডাকাতি হতে চলেছে সেই স্থান (location) থেকে অন্য একটি স্থান (location)-এর দৃশ্যের 'ইন্টারকাট' (intercut) দেখা যায়। এখান থেকেই 'কাট-অ্যাওয়ে'-র ধারণার বিকাশের শুরু হল। পরবর্তিকালে হলিউডের বাস্তববাদী চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রথম প্রবাদপুরুষ ডি. ডাব্লু. গ্রীফিথ তাঁর ছবির সম্পাদনা রীতিতে 'কাট-অ্যাওয়ে' পদ্ধতির বহু সফল প্রয়োগ ঘটান।

বাস্তববাদী চলচ্চিত্রের সম্পাদনায় 'কাট-অ্যাওয়ে' পদ্ধতির প্রায়োগিক দিকগুলি হতে পারে :—

* আখ্যানের একই সঙ্গে (simuilteniously) দুটি ঘটনা দুটি ভিন্ন স্থান (location)-এ ঘটছে তা কাট-অ্যাওয়ে পদ্ধতি দ্বারা দেখানো যায়। অর্থাৎ A নামক স্থানে যে ঘটনা ঘটছে ধরা যাক তা দেখানো হচ্ছে, এবার A ঘটনা দেখানোর মধ্যেই কাট করে অল্প সময় B স্থানের ঘটনার এক ঝলক 'ইনসার্ট' দেখানো যায়, ফলে A-B-A এভাবে আখ্যান এগোতে থাকে।

* আখ্যান বর্ণনায় টেনশন বা সাসপেন্স তৈরি করা যায় এই পদ্ধতির ব্যবহার করে।

* কোন একটি ঘটনা (ধরি A স্থানে) ঘটার সময় কোন চরিত্রের হয়ত (B স্থানে ঘটে যাওয়া) কোন ঘটনা মনে পড়ছে। এবার A স্থানের ঘটনা দেখানোর মাঝেই B স্থানের ঘটনার স্মৃতির এক ঝলক কাট-অ্যাওয়ে পদ্ধতিতে দেখানো যেতে পারে।

৯.১১ ফ্ল্যাশব্যাক ও ফ্ল্যাশফরোয়ার্ড

* **ফ্ল্যাশব্যাক (flashback) : সংজ্ঞা ও উৎস**

ফ্ল্যাশব্যাক হল এমন একধরনের আখ্যান পদ্ধতি (narrative device) যার দ্বারা গল্পে উপস্থিত কোন এক বা একাধিক চরিত্রের স্মৃতি-র সূত্র ধরে অতীতে ঘটে যাওয়া কাহিনী বর্ণনা করা হয় বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে। ফ্ল্যাশব্যাক (flash-back) স্বভাবতই বিষয়ীধর্মী (subjective) আখ্যান পদ্ধতি। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা চরিত্র, যে/যারা বিষয়ী (subject)— তার/তাদের কোন একজনের অভিজ্ঞতা, অতীত জীবনের গল্প ইত্যাদির প্রকাশ ঘটে ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতির মাধ্যমে। বলা যায় এই পদ্ধতির মাধ্যমে কাহিনীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি/চরিত্র-এর মনের ভিতরের বাস্তবতা বা 'মনস্তাত্বিক বাস্তবতা' (psychological reality)-র প্রকাশ ঘটে গল্পে।

চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতির ব্যবহারএসেছে সাহিত্য, বলা ভাল উপন্যাস থেকে। রেনেশাঁ পরবর্তি ইউরোপীও

উপন্যাসের আখ্যান নির্মাণের ক্ষেত্রে ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতির বহুল প্রচলন দেখা যেত। উপন্যাসের মত পরবর্তিকালে চলচ্চিত্রের আখ্যানেও ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতির সাহায্যে অতীতচারিতা বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

সাধারণত ফ্ল্যাশব্যাক-এর তিন ধরনের উৎস দেখা যায়। এক, আখ্যানের শুরুতে তৈরি হওয়া কোন একটি 'রহস্য উন্মোচন'-এর প্রয়োজন থেকে ফ্ল্যাশব্যাক (flashback) শুরু হয়। যেমন, ওরসন ওয়েলস-এর বিখ্যাত **সিটিজেন কেন্** ছবিতে ঘটেছিল। এ ছবির শুরুতেই প্রধান চরিত্র চার্লস কেন্-এর মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুশয্যায় বিরাট 'নিউজপেপার ব্যারণ' মিঃ কেন্ 'রোজবাড্' (Rosebud) শব্দটি উচ্চারণ করেন। কি কারণে তিনি এই শব্দটি উচ্চারাণ করলেন এ রহস্য সন্ধানে আখ্যানে ফ্ল্যাশব্যাক-এ চলে যায়।

দুই, আখ্যানের কোন এক (সাধারণত অন্যতম প্রধান) চরিত্রের 'স্বীকারোক্তি'র (confession)-এর সূত্র ধরে আখ্যানে ফ্লাশব্যাক অন্তর্ভুক্ত হতে দেখা যায় অনেকক্ষেত্রেই। উদাহরণ হিসাবে সত্যজিৎ রায়ের **নায়ক** ছবির কথা বলা যায় যেখানে কাহিনীর প্রধান চরিত্র অরিন্দম (উত্তমকুমার অভিনীত), যে কিনা রূপালী পর্দার বিরাট তারকা অভিনেতা হয়ে উঠেছে সে তার জীবনের সাফল্য, উন্নতি, নৈতিক পতন, তারকা হয়ে ওঠার ইতিহাস ইত্যাদি ঘটনার সরল ও সৎ স্বীকারোক্তি করে একজন সাংবাদিক-এর কাছে। নায়ক-অরিন্দমের চরিত্রটি এখানে গড়ে ওঠে তারই ব্যক্তিগত জীবনের খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতার বর্ণনার মাধ্যমে।

তিন, 'স্মৃতি-রোমন্থন' (nostalgia)-এর সূত্র ধরে অনেকক্ষেত্রে ছবিতে ফ্ল্যাশব্যাক দেখানো হয়। যেমন, ফরাসী নব-তরঙ্গের চলচ্চিত্রকার অ্যালা রেনেঁ-র **হিরোসীমা মন আমুর** ছবিটিতে আখ্যানের মূল চরিত্রের বর্তমান জাপানী প্রেমিকের হাতের ক্লোজ শট থেকে চলে যাওয়া হয় প্রাক্তন জার্মান প্রেমিকের সঙ্গে জড়িত স্মৃতির গল্পে। এখানে কাহিনীই প্রধান চরিত্রের স্মৃতিমেদুরতার হল ফ্ল্যাশব্যাকের উৎস। সত্যজিৎ রায়ের **চারুলতা**-র ছোটবেলার স্মৃতি কয়েকটি শটে ভেসে ওঠে চোখের সামনে। এভাবেই "স্মৃতি-রোমন্থন" ফ্ল্যাশব্যাকের উৎস হয়ে উঠতে পারে।

● ফ্ল্যাশব্যাক : বিষয় ও বর্ণনা

আখ্যানগত উপাদানের দিক থেকে ফ্ল্যাফব্যাক সাধারণত তিন ধরনের বিষয়কে বর্ণনা করে থাকে। ফ্ল্যাশব্যাক-এর বিষয় হতে পারে ইতিহাস (history), জীবনী (biography) / আত্মজীবনী (autobigraphy) বা মনস্তত্ব (psyche)।

ফ্ল্যাশব্যাক অতীতকে বর্ণনা করে। কোন চরিত্রের স্মৃতিকে ইতিহাসের বা অতীতের ঘটনাবলীর পুনরাভিনয় হলে তাকে বলা যায় ইতিহাস-বর্ণনাকারী-ফ্ল্যাশব্যাক। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় হলিউডের জনপ্রিয় ছবি **ক্যামা ব্লাঙ্কা**-এর কথা। এ ছবিতে যুদ্ধের ইতিহাস ও মার্কিন জাতীয়তাবাদ ব্যক্তিগত সম্পর্কের ফ্ল্যাশ-ব্যাকের মধ্যে অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে।

ফরাসী চলচ্চিত্রকার আবেল গঁস্ (abel Gance)-এর **নেপোলিয়ন** ছবিতে এভাবে ফ্ল্যাশব্যাক-এর মাধ্যমে ইতিহাস, নেপোলিয়নের বাল্যকাল ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া সত্যজিৎ রায়ের **মণিহারা** ছবিটিকেও এ ধরনের ফ্ল্যাশব্যাক-এর উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপিত করা যায়। এ ছবিতে একটি ভগ্নদশাপ্রাপ্ত বাড়ি ও তার পুরোন বাসিন্দাদের ইতিহাস বলে যাওয়া হয় ফ্ল্যাশব্যাক আখ্যান পদ্ধতির মাধ্যমে।

ফ্ল্যাশব্যাক সবচেয়ে বেশি দেখা যায় জীবনীমূলক (biographical) বর্ণনার ক্ষেত্রে। কাহিনীর অন্তর্গত কোন চরিত্রের স্মৃতি থেকে তার নিজের জীবনী বর্ণনা ফ্ল্যাশব্যাক আখ্যানের অন্যতম বহুল প্রচলিত বিষয়। অরসন ওয়েলস্-এর বিখ্যাত **সিটিজেন কেন্** ছবিতে এক সাংবাদিকের উদ্যোগে বিভিন্ন মানুষের ফ্লশব্যাক বর্ণনার মাধ্যমে গড়ে ওঠে শৈশব অবস্থা থেকে চার্লস ফস্টার কেন্-এর 'নিউজপেপার ব্যারণ' হয়ে ওঠার গল্প, (সঙ্গে দেখা যায় মার্কিন বৈভবের মাঝে সমাজ ও ব্যক্তির সংকট)।

ছবিটি শুরু হয় খ্যাতনামা সংবাদপত্র ব্যবসায়ী ও ধনকুবের চার্লস ফস্টারী কেন্-এর মৃত্যু দেখিয়ে। মৃত্যুর সময় সে উচ্চারণ করে 'রোজবাড' (Rosebud) শব্দটি। এরপর দেখা যায় সাংবাদিকরা আলোচনা করছে ঐ শব্দটি নিয়ে।

'রোজবাড' শব্দের উৎস সন্ধানে যায় থমসন নামের এক সাংবাদিক। সে বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেয় যারা কেন্-এর সঙ্গে কোনভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল তাদের জবানীতে ফ্ল্যাশব্যাক-এ চার্লস কেন্-এর জীবনের সাফল্য, উত্থান, পতন বর্ণিত হয়। প্রথম ফ্ল্যাশব্যাক শুরু হয় থ্যাচার-এর ডায়রী থেকে, যেখানে মূলত কেন্-এর বাল্যকাল ও পরে **ইনক্যুয়ার** নামের খবরের কাগজে চাকরী ও পরে পত্রিকাটির মালিকানা ক্রয় করা দেখানো হয়। পরের ফ্ল্যাশব্যাক হল বার্নস্টাইন-এর জবানী, যেখানে কেন্-এর সংবাদপত্র সম্পাদকের জীবন দেখানো হয়। এভাবে থমসনের প্রাণের ভিত্তিতে একের পর এক ফ্ল্যাশ ব্যাকের মাধ্যমে চার্লস ফস্টার কেন্-এর সমগ্র জীবনীর আখ্যান তৈরি হয়।

১৯৫০ ও '৬০-এর দশকে জনপ্রিয় বাংলা ছবিতে আত্মজীবনীমূলক ফ্ল্যাশব্যাক-এর বহুল প্রচলন ছিল। অজয় কর পরিচালিত বাংলা ছবি **সাত পাকে বাঁধা** আত্মজীবনীমূলক ফ্ল্যাশব্যাক-এর অন্যতম উদাহরণ। এ ছবিতে নায়িকা সুচিত্রা সেন-এর পূর্ব জীবন অর্থাৎ প্রেম, বিয়ে, বিবাহবিচ্ছেদ ইত্যাদি কাহিনী তার নিজের স্মৃতিতেই ফুটে ওঠে। এক্ষেত্রে আখ্যানের বেশিরভাগ অংশই গড়ে ওঠে প্রধান চরিত্রের নিজের পূর্বজীবনের স্মৃতিচারণের মধ্যে দিয়ে। সত্যজিৎ রায়ের **নায়ক** ছবিটিও আত্মজীবনীমূলক ফ্ল্যাশব্যাক-এর অন্যতম উদাহরণ হতে পারে।

ফ্ল্যাশব্যাক অনেকক্ষেত্রে আখ্যানের কোন চরিত্রের বিশেষ মনস্তত্ব (pshyche)-এর প্রকাশ ঘটাতে পারে। সাধারণত স্বপ্নের ফ্ল্যাশব্যাক এসব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন সত্যজিৎ রায়ের **প্রতিদ্বন্দ্বি** ছবিতে প্রধান চরিত্র সিদ্ধার্থ তার বিপ্লবী ভাই-এর মনত্বত্তের পরিবর্তন লক্ষ্য করে স্বপ্নের মধ্যে তাদের শৈশবের স্মৃতিচারণার মধ্যে, যেখানে দেখা যায় অধুনা বিপ্লবী ছেলেটি বাল্যকালে মুরগী কাটা দেখেও ভয় পেত। লুই বুনুয়েল-এর বিভিন্ন ছবিতে এভাবে স্বপ্নের মধ্যে দেখা ফ্ল্যাশব্যাক আসলে চরিত্রের গূঢ় অবচেতন মনের অবস্থাকে প্রকাশ করে থাকে।

ইঙ্গমার বার্গম্যান-এর ছবিতেও এ ধরনের মনস্তত্বধর্মী ফ্ল্যাশব্যাক দেখা যায়। উদাহরণ হতে পারে **পারসোনা** ছবিটি। এ ছবিতে অন্যতম চরিত্র 'আলমা'-র জীবনের সংকটের সূত্র ধরে ফ্ল্যাশব্যাক আখ্যানে দেখা যায় তার পূর্ব-জীবনের নৈতিক স্খলনের টুকরো অংশ। সত্যজিৎ রায়ের **চারুলতা** ছবিতে চারুর জটিল মনস্তত্ত্বে তার স্মৃতির কয়েকটি টুকরো যথা মেলা, গাজন, তার শৈশব ইত্যাদি দেখানো হয় যা থেকে সে সাহিত্য রচনার প্রেরণা পায়। এও একধরনের মনস্তত্বধর্মী ফ্ল্যাশব্যাক।

● ফ্ল্যাশব্যাক : স্থান ও কাল

চলচ্চিত্রের আখ্যান (narrative) গঠনের ক্ষেত্রে ঘটনাক্রম (story) এবং বর্ণনাক্রম (plot)-এর মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। ঘটনাগুলি ঘটার সময় অনুসারে পর পর সেগুলিকে সাজালে অর্থাৎ ক্রনোলজিক্যালী (chronologically) সজ্জিত করলে তাকে ঘটনাক্রম বা স্টোরী (story) বলা হয়। অন্যদিকে ঘটনাগুলির বর্ণনা ছবির আখ্যানে পর পর যেভাবে সজ্জিত থাকে তাকে 'বর্ণনাক্রম' বা প্লট (plot) বলে। যেমন 'ফ্ল্যাশব্যাক' আখ্যানের সময়কে পিছন থেকে বা অতীত থেকে বর্ণনা করতে থাকে বর্তমানে দাঁড়িয়ে। অর্থাৎ অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত, আখ্যানের সময় (narrartive time) এভাবে পর পর ঘটনাক্রম মেনে প্রবাহিত হয় না ফ্ল্যাশব্যাক-এর ক্ষেত্রে, যেখানে বর্তমানের সূত্র থকে কাহিনী অতীতে চলে যায়। অর্থাৎ ঘটনাক্রম বা বর্ণনাক্রম বা স্টোরী ও প্লট এক্ষেত্রে ভিন্ন হয়ে গেল।

যেহেতু ফিল্মে যে কোন ঘটনাই দর্শকের সামনে পর্দায় ঘটে চলে তাই বলা হয় চলচ্চিত্রের সময় সর্বদাই ঘটমান-বর্তমান (present continious)-কাল। বর্তমানকালে অবস্থান করা কোন চরিত্র অতীত বর্ণনার জন্য ফ্ল্যাশব্যাক শুরু করে, অর্থাৎ ফ্ল্যাশব্যাক শুরুর সময় একইসঙ্গে দর্শক বর্তমান ও অতীতের মেলবন্ধনের অনুভূতি লাভ করেন। কিন্তু যেহেতু চলচ্চিত্রের সময় সর্বদাই পর্দায় ঘটে চলা ঘটমান বর্তমান, তাই দর্শক একবার ফ্ল্যাশব্যাকের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করলে তখন তার কাছে ফ্ল্যাশব্যাকের ঘটনাই ঘটমান-বর্তমান হয়ে ওঠে। আবার ফ্ল্যাশব্যাক শেষ হলে ফ্ল্যাশব্যাকের ঘটনার অতীত-সময় দর্শকের অনুভূতিতে ফিরে আসে।

সাধারণত ফ্ল্যাশব্যাক আখ্যানের বর্ণনা সময় ও স্থানের নিরিখে চার ধরনের হয়ে থাকে। প্রথমত—সমগ্র কাহিনীই

প্রায় একটি ফ্ল্যাশব্যাক-এর দ্বারা বর্ণনা করা হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় অজয় কর-এর **সাত পাকে বাঁধা** ছবিটির কথা, যেখানে সমগ্র গল্পই মূলত প্রধান চরিত্রের একটি অবিচ্ছিন্ন ফ্ল্যাশব্যাক। দ্বিতীয়ত— আখ্যানটি একাধিক চরিত্রের একাধিক ফ্ল্যাশব্যাক সমূহের সমাহারে গড়ে উঠতে থাকে। যেমন, **সিটিজেন কেন** বা জাপানী পরিচালক আকিরা কুরোসাওয়ার বিখ্যাত **রসোমন** ছবির উদাহরণ দেওয়া যায়। ছবি দুটির ক্ষেত্রে আখ্যানের স্থান ও সময়ের ধারণা তৈরি হয় বিভিন্ন ব্যক্তির একাধিক ফ্ল্যাশব্যাকের সমাহারে। তৃতীয়ত— একই ব্যক্তি বা চরিত্রের ফ্ল্যাশব্যাক বিচ্ছিন্ন ও টুকরো টুকরোভাবে বর্ণিত হতে পারে। যেমন দেখা যায় সত্যজিৎ রায়ের **নায়ক** ছবিতে। যেখানে কাহিনীর প্রধান চরিত্রের অতীত টুকরো টুকরো অংশ বর্ণনা করা হয়, অর্থাৎ কিছুটা বর্তমান ঘটনা তারপর আবার কিছুটা ফ্ল্যাশব্যাক এভাবে চলতে থাকে ছবির সময় (time)। বর্ণনাক্রম (plot) বারবার বর্তমান থেকে অতীতে ও আবার অতীত থেকে বর্তমানে, এভাবে সামনে-পিছনে (back & forth) চলতে থাকে। চতুর্থত— ফ্ল্যাশব্যাক ছবির আখ্যানের মূল অংশ নাও হতে পারে। কেবলমাত্র অতীতের সূত্রে (anecdot) হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন, সত্যজিৎ রায়ের **প্রতিদ্বন্দ্বি** বা **চারুলতা** অথবা বার্গম্যানের **পারসোনা** ছবিতে খুব অল্প সময়ের জন্য এক টুকরো ফ্ল্যাশব্যাক বা অতীতচারিতা আখ্যানে স্থান পেয়েছে।

সাধারণত যে সব ছবিতে ঘটনাক্রম পর পর বর্ণিত হয় সেসব ক্ষেত্রে কার্য-করণ ও ফলাফল পর পর প্রকাশ হতে থাকে। কিন্তু ফ্ল্যাশ ব্যাক আখ্যানের ক্ষেত্রে ফলাফল আগে দেখা যায় তারপর স্মৃতির সূত্র ধরে ফলাফলের কার্য-কারণ সম্পর্ক 'ফ্ল্যাশব্যাক-আখ্যান-বর্ণনা-পদ্ধতি' (flasback narrative)-এর দ্বারা প্রকাশিত হতে থাকে।

● ফ্ল্যাশব্যাক কোড (flashback code)

ফ্ল্যাশব্যাক-এ প্রবেশের ঠিক পূর্ববর্তি শট-এ দর্শককে কিছু চলচ্চিত্রের ভাষাগত কিছু সূত্র দেওয়া হয়। ফ্ল্যাশব্যাক শুরুর এইসব ধরতাই সূত্রগুলির (hints) সাহায্যে দর্শক বুঝতে পারেন যে এবার আখ্যান ফ্ল্যাশব্যাকে চলে যাবে। এই সব সূত্র বা ইঙ্গিতগুলিকে বলা হয় 'ফ্ল্যাশব্যাক কোড' (flashback code)।

ফ্ল্যাশব্যাক কোড বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডিস্‌লভ বা ফেড আউট/ ইন ফ্ল্যাশ ব্যাক কোড হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যে চরিত্রের স্মৃতির ফ্ল্যাশব্যাকে যাওয়া হচ্ছে সাধারণত তার মুখের ক্লোজ আপ থেকে ডিস্‌লভ করে ফ্ল্যাশব্যাকের বিষয় দেখানো শুরু হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে ডিস্‌লভটির অর্থ হল বর্তমান থেকে অতীতে প্রত্যাবর্তন। অবশ্য ডিসলভের পরিবর্তে অনেক সময়ই সরাসরি 'কাট' (cut) শটের মাধ্যমেও ফ্ল্যাশব্যাকে যাওয়া যায়। যেমন ফরাসী চলচ্চিত্রকার অ্যালা রেনেঁ-র **হিরোসিমা-মন-আ-সুর** ছবিতে প্রধান চরিত্রটির বর্তমান জাপানী প্রেমিকের হাতের ক্লোজ শট থেকে কাট করে চলে যাওয়া হয় অতীতের জার্মান প্রেমিকের হাতের ক্লোজ-শটে। এভাবেই ফ্ল্যাশব্যাক শুরু হয়ে যায়। এছাড়াও অনেকক্ষেত্রে ফেড আউট/ইন-কে 'ফ্ল্যাশব্যাক কোড' হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত যে চরিত্র ফ্ল্যাশব্যাকের সূত্র তার বিশেষ আত্মগত মুহূর্তের শট থেকে বর্তমান ফেড আউট করে এবং তারপর অতীতের ঘটনা ধীরে ধীরে পর্দায় ফেড ইন করে এবং ফ্ল্যাশব্যাক শুরু হয়ে যায়।

'ফ্ল্যাশব্যাক কোড' হিসাবে 'কাট' শটের পরিবর্তে ডিস্‌লভ বা ফেডআউট/ইন ব্যবহার করার রেওয়াজ বেশি কারণ ডিসল্‌ভ ও ফেড আউট/ইন-কে কাট-এর তুলনায় 'সফট ট্রানসিশন' (soft trasnsition) বা কোমল দৃশ্যান্তর হিসাবে ধরা হয়ে থাকে। এবং যেহেতু ফ্ল্যাশব্যাক একধরনের স্মৃতিমেদুরতা (nostalgia) তাই এখানে ডিসল্‌ভ বা ফেড আউট/ইন-এর কোমলতা বেশি পছন্দ করা হয়। যেসব ক্ষেত্রে 'কাট' (cut) শটকে 'ফ্ল্যাশব্যাক কোড' হিসাবে ব্যবহার করা হয় সেসব সাধারণত 'ম্যাচ কাট' (match cut)-এর মাধ্যমে বর্তমান ও অতীতকে যুক্ত করা হয়। সত্যজিৎ রায়ের **নায়ক** ছবিতে এধরনের বেশ কিছু 'ম্যাচকাট'-এর মাধ্যমে আখ্যানকে বর্তমান থেকে অতীত এবং আবার অতীত থেকে বর্তমান নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

'ফ্ল্যাশব্যাক কোড' হিসাবে শব্দ (sound)-এর ব্যবহারও বহুল প্রচলিত রীতি। যে চরিত্রের মনে ফ্ল্যাশব্যাকের উৎস

রয়েছে, তার কণ্ঠে প্রথমে 'ভয়েস-ওভার ন্যারেশন' (voice-over narration)-এ শুরু হয় অতীতের গল্প, তারপর দৃশ্য (visual)-এও শুরু হয় ফ্ল্যাশব্যাক। আমরা আগে যে অজয় কর-এর **সাত পাকে বাঁধা** ছবির কথা উল্লেখ করেছি সেখানে শোনা যায় আখ্যানের প্রধান চরিত্রের স্বগতোক্তির (monologue) ভয়েস ওভার 'আজ মনে পড়ে যায় প্রথম দিনের কথা...' ইত্যাদি এবং দৃশ্যে দেখি চরিত্রের ক্লোজ আপ থেকে আখ্যান চলে যায় ফ্ল্যাশব্যাক বর্ণনায়। অনেকসময় কথোপকথন (বা স্বীকারোক্তি) থেকে আখ্যান চলে যায় ফ্ল্যাশব্যাক বর্ণনায়। যেমন সত্যজিৎ রায়ের **নায়ক** ছবিতে দেখি ছবির প্রধান চরিত্র (উত্তমকুমার) তার জীবনের ফ্ল্যাশব্যাক বর্ণনা দিচ্ছে এক সাংবাদিক (শর্মিলা ঠাকুর)-এর সঙ্গে (স্বীকারোক্তিমূলক) কথোপকথন ও সাক্ষাৎকারের সূত্র ধরে। ডায়েরী বা চিঠি-র ভয়েস-ওভার বর্ণনার সূত্র ধরে অনেকক্ষেত্রে আখ্যান ফ্ল্যাশব্যাকের মধ্যে প্রবেশ করে। উপরোক্ত **সিটিজেন কেন** ছবিতে মোট পাঁচটি ফ্ল্যাশব্যাক রয়েছে, তার মধ্যে প্রথম ফ্ল্যাশব্যাকের সূত্র হল একটি ডায়েরী।

- **ফ্ল্যাশ-ফরোয়ার্ড**

চলচ্চিত্রের সময় (film time)-এর হিসাবে ফ্ল্যাশ-ব্যাকের ঠিক বিপরীত আখ্যান-নির্মাণ পদ্ধতি হল ফ্ল্যাশ-ফরোয়ার্ড (flash-forward)। অর্থাৎ ফ্ল্যাশ-ফরোয়ার্ড এমন ঘটনাকে দেখায় যা ভবিষ্যতে ঘটবে (যা অতীতে ঘটেনি বা বর্তমানেও ঘটছে না)। ফ্ল্যাশব্যাকের মতই ফ্ল্যাশ-ফরোয়ার্ডও আখ্যানের অন্তর্গত কোন চরিত্রের মানসকি অবস্থা (psychology)-র সূত্র ধরে গড়ে ওঠে। তবে ফ্ল্যাশব্যকের উৎস যেখানে অতীতের 'স্মৃতি', ফ্ল্যাস-ফরোয়ার্ডের উৎস সেখানে ভবিষ্যতের 'কল্পনা'।

একটি আখ্যানে ধরা যাক, ক, খ, গ, ঘ— এই চারটি ঘটনা পর পর সময়ানুসারে (chronologically) সজ্জিত আছে, এক্ষেত্রে বর্ণনাক্রম হবে সরল ও রৈখিক। কিন্তু ফ্ল্যাশব্যাকের ক্ষেত্রে বর্ণনাক্রম-এর সজ্জা হতে পারে গ, ক, খ, ঘ। অর্থাৎ এক্ষেত্রে 'গ' অবস্থা থেকে ফ্ল্যাশব্যাকে ক ও খ ঘটনা দুটি দেখানো হবে। অন্যদিকে ফ্ল্যাশ-ফরোয়ার্ডের ক্ষেত্রে ঘটনাগুলি বর্ণনাক্রমকে দেখানো যেতে পারে ক, খ, ঘ, গ এভাবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে 'খ' অবস্থা থেকে 'গ' ঘটনায় না গিয়ে কাহিনী চলে যায় আরও ভবিষ্যতের 'ঘ' ঘটনায়। সুতরাং ফ্ল্যাশ-ফরোয়ার্ড হল স্বাভাবিক সময়ের আগেই ভবিষ্যৎ দর্শন।

হলিউডের স্বনামধন্য পরিচালক ফ্রান্সিস ডি কপোলা-র বিখ্যাত **দি গডফাদার** ছবিতে দেখা যায় ডন ভিটো তার দুই পুত্র টম ও সোনী-র সঙ্গে কথা বলছে মাফিয়া রাজ সোল্লিজ্জো-র সঙ্গে তাদের আসন্ন সাক্ষাৎ বা মিটিং সম্পর্কে। ডন ভিটো কথা বলা শুরু করতেই বর্তমান থেকে আখ্যান তার কথার সূত্র ধরে ভবিষ্যতে চলে যায় — দেখা যায় মাফিয়া সোল্লিজ্জো মিটিং-এ আসছে। তারপর আবার বর্তমানে ফিরে আসে আখ্যান।

শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও চলচ্চিত্রে ফ্ল্যাশ-ফরোয়ার্ড দেখা যায়। ফরাসী পরিচালক জঁ লুক গোদার-এর **কনটেম্পট** ছবিতে একটি দৃশ্যপর্যায় (sequence)-এ প্রথমে দেখা যায় স্ত্রী ও স্বামীর ঝগড়া। যেখান থেকে 'কাট' করে চলে যাওয়া হয় একটি দৃশ্যে যেখানে স্ত্রী সমুদ্রে সাঁতার কাটছে ও স্বামী তীরে একটি পাথরের উপর বসে আছে। হঠাৎ স্ত্রী অফ-ভয়েসে শুনি তার স্বামীর উদ্দেশে একটি চিঠির বয়ান, অথচ এ চিঠি তখনও লেখা হয়নি ভবিষ্যতে লেখা হবে। এভাবে গোদার সাউন্ড ফ্ল্যাশ-ফরোয়ার্ড ব্যবহার করেছেন।

প্রসঙ্গত বলা যায় ফ্ল্যাশব্যাক কোড-এর সম্পাদনা পদ্ধতি ফ্ল্যাশ-ফরোয়ার্ড-এর ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায়।

৯.১২ সারাংশ

চলচ্চিত্র নির্মাণের তিনটি প্রধান পর্যায় বর্তমান। এক, চিত্রগ্রহণ-পূর্ববর্তি (pre-production) পর্যায়। যেখানে চলচ্চিত্রের কাহিনী নির্বাচন করা হয় ও পরে তার চিত্রনাট্য তৈরি করা হয়। চলচ্চিত্র নির্মাণের দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকে

চিত্রগ্রহণ অর্থাৎ যাকে বলা হয় স্যুটিং (shooting)। চলচ্চিত্র নির্মাণের তৃতীয় বা শেষ পর্যায় হল দৃশ্য ও শব্দ সম্পাদনা (editing)।

সম্পাদনা হল স্যুটিং-এ শ্রীহিত দৃশ্যাংশ বা শটগুলিকে কাহিনী ও চিত্রনাট্যের দাবি অনুযায়ী পর পর সাজানোর কৌশল। কেবলমাত্র দৃশ্য (visual)-ই নয়, সম্পাদনার সময় শব্দ (audio)-গুলিকেও দৃশ্যের মতই নির্দিষ্টভাবে সজ্জিত করা হয় ও দৃশ্যাংশগুলির সঙ্গে যোগ করা হয়। সম্পাদনার সময় নতুন শব্দ সংযোজনও হয়ে থাকে।

অর্থাৎ সম্পাদনা-কর্মের উদ্দেশ্য হল এলোমেলো ও বিচ্ছিন্নভাবে তোলা দৃশ্য-শব্দ-গুলিকে ধারাবারিকতা বজায় রেখে সাজিয়ে সম্পূর্ণ কাহিনী বা নির্দিষ্ট রূপদান। অবাঞ্ছিত ও অমনোনিত দৃশ্যাংশ ও শব্দগুলিকে বাদ দেওয়াও চলচ্চিত্র সম্পাদকের অন্যতম প্রধান কাজ।

সম্পাদনা চলচ্চিত্রের একেবারে নিজস্ব ভাষা-কৌশল। যেখানে একটি দৃশ্যাংশ অন্য দৃশ্যাংশের সঙ্গে মেশানো অর্থাৎ ডিসলভ/মিশ্র (dissolve/mix) করা সম্ভব। আবার একটি দৃশ্যাংশ সম্পূর্ণভাবে কালো পর্দায় অন্তর্হিত (fade out) হওয়ার পর পরের দৃশ্যাংশরে আবির্ভাবও (fade in) ঘটানো যেতে পারে। অথবা দৃশ্যাংশের পর দৃশ্যাংশ সরাসরি আসতে থাকলে দৃশ্যান্তর সহজতম উপায়ে ঘটে থাকে 'কাট' (cut) বলা হয়।

কাহিনীচিত্রের আমরা যে নিরবিচ্ছিন্ন গল্পের ধারাবাহিকতা পর্দায় দেখি তা সৃষ্টি করা হয় সম্পাদনার সাহায্যে। সরল ও রৈখিক গতির অর্থাৎ যে ঘটনা যে স্থান-কালে (sapce-time) পর পর ঘটছে তার ধারাবাহিকতা (contenuity) বজায় রেখে সম্পাদক দৃশ্যাংশগুলিকে যোগ করে বাস্তববাদী কাহিনী চিত্র (realist film) নির্মাণ করলে সেই সম্পাদনা কৌশলকে বলা হয় ধারাবাহিক সম্পাদন রীতি (contenuity editing)। এই পদ্ধতি মূলত (১৯১০ সালের মধ্যে) হলিউডে বাস্তববাদী সিনেমার অবদান।

চলচ্চিত্রের কাহিনীতে স্মৃতির সূত্র ধরে ফেলে আসা সময়কে দেখা গেলে, তাকে বলা হয় 'ফ্ল্যাশ ব্যাক' (flash back) ও কল্পনার সূত্র ধরে ভবিষ্যতের ছবি আঁকলে তাকে 'ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ড (flas forward) বলা হয়। এই দুটি কৌশল বাস্তববাদী চলচ্চিত্রের হাত ধরে জনপ্রিয় হয়েছে।

বাস্তববাদী সম্পাদনা রীতির বিকল্পও রয়েছে যেখানে পর পর দুটি দৃশ্যাংশ বাস্তবাদী সামঞ্জস্য ছাড়াই যুক্ত হয়। এই কৌশলকে 'জাম্প কাট' (jump cut) বলা হয়। 'জাম্প কাট' বিখ্যাত ফরাসী চলচ্চিত্রকার জঁ লুক গোদার-এর চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৯.১৩ অনুশীলনী

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী

১। চলচ্চিত্র সম্পাদনার প্রধান উদ্দেশ্য কী?

২। স্টেইনবেক ও মুভীওলা যন্ত্র দুটি কী কাজে ব্যবহার হয়?

৩। 'ম্যারেড প্রিন্ট' কাকে বলে?

৪। 'কাট' (cut) কী? —এক কথায় উত্তর দিন।

স্বল্পদৈর্ঘ্যের উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

টীকা লিখুন—

১। 'মাস্টার শট'।

২। 'ইনসার্ট'।

৩। 'কাট ইন'-'কাট অ্যাওয়ে'।

৪। 'স্পেশাল এফেক্টে'র উপযোগিতা-এ্যানিমেশন ছবিতে।

দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। চলচ্চিত্রে কীভাবে স্থান-কালের ধারাবাহিকতা (continuity) সৃষ্টি করা হয়?— বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২। চলচ্চিত্রে কয় প্রকার দৃশ্যান্তর পদ্ধতি সম্ভব? প্রত্যেকটির উদাহরণসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন ও উপযোগিতা লিখুন।

৩। 'ম্যাচ কাট' ও 'জাম্প কাট' বলতে কী বোঝায়? বিস্তৃত ব্যাখ্যা করুন।

৪। 'ফ্ল্যাশ-ব্যাক' ও 'জাম্প ফরোয়ার্ড কাকে বলে? এদের ব্যবহার চলচ্চিত্রকে কিভাবে প্রভাবিত করতে পারে। বিস্তারিত লিখুন।

৫। 'কাট', 'মনতাজ' ও 'লঙ টেক' — আলোচনা করুন।

৯.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

১। ফিল্ম আর্ট অ্যান ইন্ট্রোডাকশান : ডেভিড বর্ডওয়েল ও ক্রিস্টিল থমসন, দি ম্যাকগ্রোহিল কম্পানীস্, নিউইয়র্ক, নিউদিল্লি, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৯৭।

২। কী কন্‌সেপট্‌স্— সিনেমা স্টাডিজ : সুসান হেওয়ার্ড, রুটলেজ, লণ্ডন, প্রথম সংস্করণ, ২০০০

৩। চলচ্চিত্রের অভিধান : ধীমান দাশগুপ্ত, বাণীশিল্প, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯

৪। ক্ল্যাসিক্যাল হলিউড সিনেমা : বর্ডওয়েল, থমসন, স্ট্যাগার, রুটলেজ, লণ্ডন, ১৯৯৮ [পার্ট ওয়ান-চ্যাপ্ট র তিন, চার ও পাঁচ]

৫। হাউ টু রিড এ ফিল্ম : জেমস মোনাকো, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড-নিউইয়র্ক, রিভাইস্‌ড এডিশন, ১৯৮১

একক ১০ ❑ চলচ্চিত্রে শব্দ

গঠন

১০.১ উদ্দেশ্য
১০.২ প্রস্তাবনা
১০.৩ চলচ্চিত্রে শব্দ
১০.৪ সংলাপ ও ভাষ্য
১০.৫ পারিপার্শ্বিক শব্দ ও বিশেষ শব্দ
১০.৬ চলচ্চিত্রে আবহসঙ্গীতের ব্যবহার
১০.৭ চলচ্চিত্রে নৈঃশব্দ-এর ব্যবহার
১০.৮ সাযুজ্যপূর্ণ ও সাযুজ্যহীন শব্দ
১০.৯ সারাংশ
১০.১০ অনুশীলনী
১০.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১০.১ উদ্দেশ্য

এই এককের আলোচনায় থাকছে —

- চলচ্চিত্রে শব্দের প্রয়োগের ইতিহাস।
- চলচ্চিত্রে শব্দের প্রয়োগ সংক্রান্ত প্রাথমিক তত্ত্বালোচনা।
- চলচ্চিত্রে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শব্দের বিবিধ প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা এবং
- চলচ্চিত্রে শব্দের নান্দনিক প্রয়োগের উদাহরণসহ আলোচনা।

১০.২ প্রস্তাবনা

যদিও চলচ্চিত্রের আদিযুগে চলচ্চিত্র ছিল শব্দহীন তবে আধুনিক চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে শব্দ ও তার ব্যবহার প্রায় অনিবার্য। চলচ্চিত্রে দৃশ্যের সঙ্গে শব্দের যোগ হওয়া, ছবিকে বাস্তবের অনুপুঙ্খ নকলের কাজে আরও সক্ষম করেছে সন্দেহ নেই। তবে আধুনিকমনস্ক চলচ্চিত্রকারদের কাছে শব্দ একই সঙ্গে বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম হিসাবেও উপযোগী হয়ে উঠেছে। একটু সনাতনপন্থি চলচ্চিত্রকাররা মনে করেন চলচ্চিত্রে ছবি যে কথা প্রকাশ করতে পারে না, শব্দ যে কথাটুকু দর্শকের কাছে পৌঁছে দেয়। অর্থাৎ শব্দের ভূমিকা এঁদের কাছে কেবলমাত্র দৃশ্যের পরিপূরক হিসাবেই গ্রাহ্য

হয়। তবে অনেক আধুনিক চলচ্চিত্রকার মনে করেন চলচ্চিত্রে দৃশ্যের মত শ্রাব্যও স্বাধীন প্রকাশ মাধ্যম, কেবলমাত্র দৃশ্যের পরিপূরক হওয়াতেই ছবিতে শব্দের ভূমিকা সীমাবদ্ধ নয়।

১০.৩ চলচ্চিত্রে শব্দ

চলচ্চিত্রে শব্দের ব্যবহার শুরু হয় ১৯২৭ সাল থেকে। প্রথম সবাক চলচ্চিত্র হল হলিউডে তৈরি **দি জ্যাজ সিঙ্গার**। এর আগে চলচ্চিত্র ছিল নির্বাক ও শব্দহীন। অবশ্য কখনো কখনো ছবি চলার সময় আখ্যানের ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রেক্ষাগৃহে যন্ত্রসঙ্গীত বাজানো হত। চলচ্চিত্রে শব্দের আবিষ্কার ইমেজ বা দৃশ্যকে আরও অর্থবহ করে তুলল। যদিও ছবিতে শব্দ ব্যবহারের মূল প্রেরণা এসেছিল কাহিনীচিত্রের আখ্যানকে আরও বাস্তববাদী করে তোলার তাগিদ থেকে। পর্দার ছবিকে বাস্তবের মত দৃশ্য ও শব্দের অভিজ্ঞতারূপে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সংলাপ ও সঙ্গীতের সংযোজন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যের মতই শব্দের ক্ষেত্রেও সৃজনশীল ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। মনে করা যেতে পারে চার্লি চ্যাপলিন পরিচালিত **দি গ্রেট ডিক্টেটর** ছবিতে এক নাপিতের ভূমিকায় ফ্যাসীবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে চ্যাপলিনের সেই দীর্ঘ ভাষণ যা ছবিতে শব্দপথ (sound track)এর আবিষ্কার ছাড়া সম্ভব হত না।

চ্যাপলিনেরও আগে চলচ্চিত্রে শব্দের ব্যবহারকে স্বাগত জানিয়েছিলেন জগৎ বিখ্যাত সোভিয়েত চলচ্চিত্রকার সের্গেই আইজেনস্টাইন। তিনি বলেন, চলচ্চিত্রে শব্দপথের ব্যবহারের ফলে ছবির রসাস্বাদের ক্ষেত্রে দৃশ্য ও শ্রাব্যের মেলবন্ধনে শিল্পমাধ্যমটিতে নতুন মাত্রা যুক্ত হল। চলচ্চিত্রে শব্দ আবিষ্কারের প্রথমদিকে একটি বা দুটি শব্দপথ ব্যবহার করা হত। তাছাড়া একাধিক শব্দপথকে সম্পাদনা কক্ষে মেশানোর প্রযুক্তিও আয়ত্তে ছিল না। ক্রমে ছবিতে সাধারণ তিন থেকে চারটি শব্দপথ ব্যবহার করা হচ্ছে এবং শব্দপথগুলির মিশ্রণের পদ্ধতিও সহজলোভ্য হয়ে উঠছে। আধুনিককালে চলচ্চিত্র তাই দৃশ্য ও শ্রাবণের যৌথ অভিজ্ঞতা।

খ্যাতনামা ফরাসী চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক ক্রিস্টিয়ান মেৎস্ (metz) চলচ্চিত্রকে মোট পাঁচটি উপাদান (channel)-এর সমাহার বলেছেন। এগুলি হল, (১) দৃশ্য (২) ভাষা অর্থাৎ সংলাপ বা ভাষ্য (৩) সঙ্গীত (৪)পারিপার্শ্বিক-শব্দ বা বিশেষ-শব্দ (ambiance sound & effect sound) এবং (৫) গ্রাফিক্স। অর্থাৎ চলচ্চিত্র যেসব মাধ্যমগত উপাদানগুলি নিয়ে গঠিত তার মধ্যে তিনটিই হল শব্দ সংক্রান্ত। সুতরাং, আধুনিককালে চলচ্চিত্র নির্মাণের দৃশ্যের থেকে শব্দের গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়।

একথা আগেই বলা হয়েছ যে শব্দ একটি ছবিতে দৃশ্যকে নতুন মাত্রা দিতে পারে। এ বিষয়ে ফরাসী নবতরঙ্গের চলচ্চিত্রকার ক্রিস মার্কার একটি পরীক্ষামূলক ছবি তৈরি করেন। মার্কার পরিচালিত **লেটার ফ্রম সাইবেরিয়া** (১৯৫৭) ছবির একটি দৃশ্যে দেখা যায় একদল সোভিয়েত শ্রমিক রাস্তা নির্মাণের শ্রমসাধ কাজ করছেন। একই দৃশ্যে পরিচালক ভিন্ন ভাষ্য যোগ করলেন, একটি ভাষ্যে বলা হল : "আনন্দময় সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের উজ্জীবিত শ্রমিক (এঁরা)...", অন্যটিতে বলা হল : "এই শ্রমিকরা কাজ করছেন, যেন ক্রীতদাস..."। একই ছবির মানে এভাবে বদলে যেতে পারে দুই বিপরীত অর্থের শব্দ বা ভাষ্য প্রয়োগের প্রভাবে।

এছাড়া দৃশ্য (mise-en-scene)-এর মধ্যে উপস্থিত একটি নির্দিষ্ট বস্তুর দিকে দর্শকের মনযোগ আকর্ষণের জন্যও শব্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। ধরা যাক মির্জঁ-অ-সিনের মধ্যে উপস্থিত বিভিন্ন বস্তু বা চরিত্রের মধ্যে রয়েছে একটি দেওয়াল ঘড়ি। হঠাৎ ঘড়িটির ঘন্টা বাজতে শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য বস্তু বা চরিত্রের থেকে দর্শকের মনযোগ সেই মুহূর্তে চলে যাবে ঘড়িটির দিকে।

শব্দের বহুবিধ ব্যবহারের মধ্যে আরেকটি হল শব্দ-সেতু (sound bridge)-র প্রয়োগ। শব্দ-সেতু-র ব্যবহারের দ্বারা দুটি দৃশ্যাংশ (shot)-এর মধ্যে স্থান ও কালের সংযুক্তি বা সেতুবন্ধন সম্ভব হতে পারে। ঋত্বিক ঘটকের **সুবর্ণরেখা**

(১৯৬৫) ছবিতে শব্দের এরকম একটি ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে: একটি দৃশ্যে শোনা যায় ছবির প্রধান নারীচরিত্র সীতা কলকাতায় তার ঘরে বসে গান গাইছে। দৃশ্যান্তরে, সুদূর সুবর্ণরেখা নদীর তীরে নিজের বাড়িতে তার দাদা ঈশ্বর যখন প্রবেশ করছে ঐ একই গান সেখানেও শোনা যাচ্ছে, যদিও সীতা সেখানে উপস্থিত নেই। এখানে দুটি ভিন্ন স্থানের মধ্যে সম্পর্কে স্থাপনের উপায় হল শব্দ-সেতু নির্মাণ। আবার প্রখ্যাত মার্কিন চলচ্চিত্রকার ও শিল্প-নির্ভর আধুনিক ছবির জনক অরসন ওয়েল্‌স-এর **সিটিজিনে কেন্‌** (১৯৪১) ছবিতে একটি দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট চার্লস কেন্‌-কে তার জন্মদিনে মেরী ক্রিসমাস সুরটি বাজাচ্ছে। ঐ একই সুরকে অপরিবর্তিত রেখে পরের দৃশাংশ (shot)-এ দেখানো হচ্ছে ছোট চার্লস কেন্‌ কৈশোর উত্তীর্ণ প্রায়। অর্থাৎ শব্দ এখানে দুটি ভিন্ন সময় বা কালের মধ্যে সেতুবন্ধন ঘটাচ্ছে। দুটি ভিন্ন দৃশ্যাংশ (shot)-এর মধ্যে যেমন দৃশ্যগত সাদৃশ্য-মিলিয়ে-কাট (match cut) করা হয়, শব্দের ক্ষেত্রেও তা সম্ভব। অরসন ওয়েলসের একই ছবিতে একটি শটে দেখা যায় চার্লস কেন্‌ হাততালি দিচ্ছে। পরিচালক কাট করে সেখান থেকে পরের শটে চলে যান যেখানে অনেক লোকের হাততালির শব্দ শোনা যায়। এখানে হাততালির শব্দ-সেতুকে ব্যবহার করা হল দুটি ভিন্ন শটকে সাদৃশ্য রেখে কাট করার ক্ষেত্রে।

তবে শব্দের উৎস যে কেবল মিজঁ-অ-সিনের মধ্যে উপস্থিত ব্যক্তি বা বস্তু হবে তা নয়, শব্দের উৎস পর্দায় দৃশ্যমান নাও থাকতে পারে। যেমন, ধরা যাক ঘরের মধ্যে উপস্থিত এক ব্যক্তির ক্লোজ-আপ পর্দায় দেখা যাচ্ছে। এমন সময় ডোরবেল বাজার শব্দ শোনা গেল। যদিও দরজা বা ডোরবেল এই বিশেষ দৃশ্যটি চলার সময় পর্দায় দেখা যাচ্ছে না, তবু দর্শকের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে দরজার বাইরে কোন আগন্তুক উপস্থিত। এই ধরনের মিজঁ-অ-সিন বা পর্দায় উপস্থাপিত দৃশ্যের বাইরে থেকে আসা শব্দকে বলা হয় 'অফস্ক্রিন সাউণ্ড' বা মিজ-অঁ-সিন বহির্ভূত শব্দ।

শব্দের তীব্রতার তারতম্য ঘটিয়ে শব্দের উৎসের দূরত্বকে বোঝানো যেতে পারে। লঙ শটে যখন দূরে একটি ট্রেন আসতে দেখা যাচ্ছে তখন ট্রেনের শব্দ ক্ষীণভাবে শোনা যাবে। আবার ট্রেনটিকে যখন ক্লোজ শটে দেখানো হবে তখন শব্দের তীব্রতা বহুগুণ বেড়ে যাবে। ধরা যাক লঙ শটে দেখা যাচ্ছে দুজন লোক কথা বলতে বলতে আসছে। ক্রমে তারা মিড-ক্লোজ হয়ে ক্লোজ শটে এসে পৌঁছাল। এক্ষেত্রে তারা যত ক্যামেরার কাছে আসবে ততই সংলাপের শব্দ স্পষ্টতর ও জোরালো হতে থাকবে।

১০.৪ সংলাপ ও ভাষ্য

তবে চলচ্চিত্রের ইতিহাসে শব্দপথে সংযোজনের ফলে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে সংলাপ বা ভাষ্য। যদিও প্রাথমিকভাবে রুডল্ফ আর্নহাইমের মত ধ্রুপদী চলচ্চিত্র তাত্ত্বিকরা আশঙ্কা করেছিলেন যে চলচ্চিত্রে ভাষা বা কথোপকথনের ব্যবহার এই শিল্প-মাধ্যমটিকে অকারণ নাটকীয় করে তুলে মাধ্যমটির শিল্পগুণে ব্যাঘাত ঘটাবে। তবু কথা বা সংলাপের ব্যবহার যে পরবর্তিকালে চলচ্চিত্র মাধ্যমটিকে সমৃদ্ধ করেছে একথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। প্রখ্যাত ফরাসী বাস্তবাদী চলচ্চিত্রকার রুবের ব্রেথঁ, যিনি **বালথাকার**, **পিকপকেট** বা **এ ম্যান এসকেপড** -এর মত অসাধারণ ছবির শ্রষ্ঠা তিনি বলেছিলেন, তাঁর ছবি সংলাপ নির্ভর। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতেও সংলাপের গুরুত্বের কথা তাত্ত্বিকরা বলে থাকেন। ভাষা যে কেবল ছবিকে বাস্তবের হুবহু অনুকরণে পরিণত করেছে তাই নয়, দৃশ্য মাধ্যমে সরাসরি বলা যায় না এমন কথা বলতেও চলচ্চিত্রকে সাহায্য করেছে। ব্রেসঁ-র **এ ম্যান একপেকড** ছবির কথাই ধরা যাক। এ ছবিতে একা জেলখানার একটি ঘরে মৃত্যুদণ্ডের জন্য দিনগোনা একজন মানুষের ভয়, উদ্বেগ এবং বাঁচার আকাঙ্খার গল্প বলা হচ্ছে। মানুষটির মনোভাব সংলাপের সাহায্যে ব্যক্ত করা যাবে কারণ সে সম্পূর্ণ একা। পরিচালক এখান ভাষ্যের সাহায্য নিয়েছেন যেমন, মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ শুনে জেলের নির্জনঘরে বসে তার মনোভাব সম্পর্কে ভাষ্য ও মন্তব্য শোনা যায়, "সেদিন আমি পাগলের মত হেসেছিলাম, এই প্রতিক্রিয়া আমাকে সাহায্য করেছিল (সুস্থির হতে)... ।" অথবা পালানোর

উপায় সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর সেই রাত্রে সে ভালোভাবে ঘুমোয়। দেখা যায় কারারক্ষী তাকে ঠেলে জাগাচ্ছে, দর্শক ভাষ্য শোনেন, "আমি এই প্রথম গভীরভাবে ঘুমোলাম, কারারক্ষী এসে সকালে আমাকে জাগালো।"

অর্থাৎ চলচ্চিত্রে কথার ব্যবহার চরিত্রগুলির মনের ভিতরের অবস্থা বা মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতাকে প্রকাশ করতে সহায়ক হয়েছে। এ বিষয়ে আর একটি উদাহরণ দেওয়া যায় হলিউডের স্বনামধন্য ইংরেজ পরিচালক ও রহস্য ছবির যাদুকর আলফ্রেড হিচকক-এর **সাইকো** (১৯৬০) ছবি থেকে। দেখা যায় ছবির নায়িকা কিছু টাকা চুরি করে একা একটি গাড়ি চালিয়ে পালাচ্ছে। মেয়েটি নিঃশব্দে গাড়ি চালাচ্ছে কিন্তু ভাষ্যে তার নিজের কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে মনের মধ্যে উঁকি দেওয়া ভয়, উদ্বেগ ও অপরাধবোধের কথা।

কথা বা ভাষ্য অনেক সময় চরিত্রের পূর্ব-স্মৃতি বা ফ্ল্যাশ-ব্যাকের বিকল্প হতে পারে। সত্যজিৎ রায়ের সীমাবদ্ধ। ছবিতে প্রধান চরিত্র শ্যামলেন্দু তার বাল্যকাল, যৌবন, পাটনা থেকে কলকাতায় বড় চাকরী নিয়ে আসার বিবরণ দিয়ে যাচ্ছে। দৃশ্যে কিন্তু আমরা কলকাতা শহরকেই দেখছি। অর্থাৎ একই স্থানে দুটি ভিন্ন কাল বা সময়কে দেখানো সম্ভব হচ্ছে— একটি দৃশ্যগত বর্তমান, অন্যটি শ্রাব্য অতীত।

ফিল্মে ব্যবহারের নিরিখে শব্দকে প্রধানত দুটি ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। প্রথম, আখ্যান-অন্তর্গত বা ডাইজেটিক শব্দ ও দ্বিতীয়, আখ্যান-বহির্ভূত বা একস্ট্রা বা নন-ডাইজেটিক শব্দ। সংলাপ সাধারণত আখ্যান-অন্তর্গত শব্দের মধ্যেই পড়ে। ধারাভাষ্য যদি গল্পের কোন চরিত্রের কণ্ঠস্বর হয় বা যদি ভাষ্যকার গল্পটির কথক হয় যে বিশাল কাহিনীর স্থান-কালের সঙ্গে যুক্ত, তাহলে এধরনের ভাষ্যকে বলা হবে আখ্যান-অন্তর্গত ভাষ্য। কিন্তু অনেক সময় ঐতিহাসিক কোন কাহিনীর ক্ষেত্রে বর্তমানে বসে অদৃশ্য ভাষ্যকার অতীত বর্ণনা করতে থাকেন, পর্দায় তিনি উপস্থিত নেই বা ইতিহাসের সময়টিতেও তিনি উপস্থিত ছিলেন না, সেক্ষেত্রে এই ভাষ্য হবে নন-ডাইজেটিক বা আখ্যান বহির্ভূত ভাষ্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক বা প্রেক্ষাপট-সঙ্গীত আখ্যান-বহির্ভূত শব্দ।

১০.৫ পারিপার্শ্বিক ও বিশেষ শব্দ

সংলাপ, ভাষ্য বা সঙ্গীত ছাড়াও পারিপার্শ্বিক শব্দ (ambience) বিশেষ-শব্দ (effect sound)-ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধরা যাক ফিল্মে একটি টেলিফোন বেজে উঠল বা শহরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলার সময় চরিত্রটিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের যানবাহন চলার যান্ত্রিক শব্দ বা কোলাহল শোনা যাচ্ছে—এই ধরনের শব্দকে বলা হয় পারিপার্শ্বিক শব্দ। পারিপার্শ্বিক শব্দের উৎস যদি দৃশ্যের মধ্যে উপস্থিত না থাকে তবে তাকে বলা হবে অফ-স্ক্রিন বা দৃশ্যের বাইরের পারিপার্শ্বিক শব্দ। যেমন, দু-জন লোক রাস্তার পাশের একটি ঘরে বসে কথা বলছে। দৃশ্যের বাইরে রাস্তা দিয়ে একটি গাড়ি চলে যাবার শব্দ শোনা গেল, এক্ষেত্রে শব্দটিকে বলা হবে দৃশ্য-বহির্ভূত বা অফস্ক্রিন পারিপার্শ্বিক শব্দ।

পারিপার্শ্বিক শব্দের ব্যবহারে কাহিনীমূলক ছবিকে আরও বিশ্বাসযোগ্য এবং বাস্তববাদী করে তুলতে সাহায্য করে। যেমন একটি দৃশ্যে হয়ত দেখা যাচ্ছে দুটি চরিত্র একটি রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। চরিত্র দুটির অবস্থানকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে গেলে তাদের কথোপকথনের সঙ্গে রাস্তার অন্যান্য পারিপার্শ্বিক শব্দও থাকতে হবে। তবে এসব ক্ষেত্রে সাধারণত অন্তত দুটি শব্দপথ (sound track)-এ শব্দ গ্রহণ করা হয়। একটিতে গ্রহণ করা হয় সংলাপ এবং অন্যটিতে থাকে পারিপার্শ্বিক শব্দ। বেশিরভাগ বাস্তববাদী ছবিতেই, বিশেষত বাণিজ্যিক হলিউড ছবিতে, সম্পাদনা কক্ষে শব্দপথ দুটিকে মিশ্রিত করার সময় সংলাপের শব্দ জোরে ও স্পষ্টভাবে এবং পারিপার্শ্বিক শব্দ ক্ষীণভাবে রাখা হয়। তবে পরীক্ষামূলক ছবির ক্ষেত্রে এর বিপরীত উদাহরণও পাওয়া যায়। ফরাসী নব-তরঙ্গ যুগের অন্যতম প্রদান পরিচালক এবং চলচ্চিত্রে আঙ্গিকগত আধুনিকতার অন্যতম প্রবক্তা জাঁ লুক গোদার-এর **মাসকুলা-ফেমিনা** ছবিতে দেখা যায় রাস্তার ধারের কফি হাউসে বসে কথা বলছে ছবির অন্যতম প্রধান দুই চরিত্র। গোদার প্রচলিত রীতি ভেঙ্গে

সংলাপকে প্রাধান্য না দিয়ে পারিপার্শ্বিক শব্দকে প্রাধান্য দিলেন, ফলে অন্যান্য শব্দের মধ্যে সংলাপ অস্পষ্ট হয়ে গেল। পারিপার্শ্বিক শব্দ নিয়ে গোদার-এর ছবিতে মাঝে মধ্যেই এধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখা যায়।

পারিপার্শ্বিক শব্দকে যথাযথভাবে গ্রহণ করার দায় কাহিনী-ছবির তুলনায় তথ্যচিত্রে অনেক বেশি। কারণ দৃশ্য যেমন বাস্তবের দলিল পারিপার্শ্বিক শব্দও তেমনি বাস্তবের প্রতিফলন। পারিপার্শ্বিক শব্দকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ তথ্যচিত্রে। বিশেষত বেসিল রাইট, আলবার্তো কাভালকান্তি, পল রোথা ও হামফ্রে জেনিংসের ছবিগুলিতে পারিপার্শ্বিক শব্দ বা অ্যামরিয়েন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। বেসিল রাইট-এর **সঙ অব সীলোনা** (১৯৩৪), **নাইটমেল** (১৯৩৬) প্রভৃতি তথ্যচিত্রগুলি দেখলে বোঝা যায় ভাষ্য ও সঙ্গীতের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক শব্দও কত যত্ন সহকারে গ্রহণ করা হয়েছে।

১৯৫০ ও '৬০-এর দশকে আমেরিকা ও ফ্রান্সে তৈরি 'সিনেমা ভেরিতে' শৈলীর তথ্যচিত্রগুলিতে দৃশ্যগ্রহণের সঙ্গেই গ্রহণ করা হত ঘটনাস্থলের পারিপার্শ্বিক শব্দ। ফরাসী সিনেমা ভেরিতে শৈলীর প্রখ্যাত তথ্যচিত্রকার জঁ রুশ-এর জাতি-বিষয়ক ছবিগুলিকে যখন বিভিন্ন জনজাতীর জীবনপ্রবাহের দৃশ্য গ্রহণ করা হত, তখন পারিপার্শ্বিক শব্দও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গ্রহণ করা হত। কারণ দৃশ্যের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক শব্দও কোন একটি গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা বিভিন্ন দিককে প্রকাশ করে থাকে।

কেবলমাত্র তাই নয়, বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত তথ্যচিত্রকার জিগা ভের্তভ-এর সবাক তথ্যচিত্র ও সেই সংক্রান্ত তত্ত্বে পারিপার্শ্বিক শব্দের ভূমিকা প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল। দৃশ্যের ক্ষেত্রে ভের্তভ যেমন জন স্রোতের ক্যাওস্ বা বিশৃঙ্খলাকে তাঁর ছবিতে স্থান দিয়েছেন, শব্দের ক্ষেত্রেও তেমনি পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন শব্দের বিশৃঙ্খলাকে তিনি **এনথুসিয়াজম** (১৯৩১) প্রভৃতি ছবিতে গুরত্ব দিয়েছেন। দৃশ্যের ক্ষেত্রে তাঁর তত্ত্বকে যেমন বলেছেন 'কিনো-আই', শব্দের ক্ষেত্রে তাঁর তত্ত্বটি ছিল 'রেডিও-আই'। সোভিয়েত চলচ্চিত্রকাররা যেমন স্বল্পদৈর্ঘ্যের বিভিন্ন শট বিশেষ পরিকল্পনামত জুড়ে মন্তাজ সৃষ্টি করেছেন, শব্দের ক্ষেত্রেও তাঁরা বিভিন্ন শব্দের ঐক্যতান সৃষ্টি করেছেন যাকে বলা হয় 'শব্দ-মন্তাজ'।

আখ্যান-অন্তর্গত পারিপার্শ্বিক শব্দ ছাড়াও বিশেষ শব্দ (বা effect sound)-এর ব্যবহারও চলচ্চিত্রে বহুল প্রচলিত। তবে বিশেষ শব্দের ক্ষেত্রে শব্দের উৎসের সঙ্গে আখ্যানের স্থানগত বা (চরিত্রগুলির) সরাসরি মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক থাকে না। কেবলমাত্র দৃশ্যের অর্থকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে বিশেষ শব্দ বাইরে থেকে আরোপ করা হয়। অর্থাৎ বিশেষ শব্দ (effect sound) সাধারণত আখ্যান-বহির্ভূত শব্দ।

ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে শব্দের এ ধরনের ব্যবহার দেখা যায়। তাঁর **মেঘে ঢাকা তারা** (১৯৫৯) ছবিতে হাসপাতালে আহত ভাইকে দেখতে গিয়ে কাহিনীর প্রধান চরিত্র নীতার মধ্যে হঠাৎ অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দেয়। শব্দপথে শোনা যায় সমবেত ঝিঁ ঝিঁ-জকের মত একধরনের বিশেষ শব্দ (effect sound) যে শব্দের উৎসর অস্তিত্ব বাস্তবে কোথাও নেই। এই এফেক্ট সাউন্ড **মেঘে ঢাকা তারা** ছবিতে বারবার ব্যবহার করা হয়েছে যা কাহিনীর পরিচায়ক (lead motif) হয়ে উঠেছে। এই ছবিতেই একটি দৃশ্যে আমরা শুনি স্বাভাবিক শব্দের প্রাবল্যকে বহুগুণ বাড়িয়ে ঋত্বিক একধরনের বিশেষ শব্দ তৈরি করেন যা একটি চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাকে নির্দেশ করেছে। একাধিক দৃশ্যে নীতার মায়ের জটিল স্বার্থান্বেষী উদ্বেগকে প্রকাশ করতে কড়াই-এ তেল ফোটার শব্দকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক সময়ই চলচ্চিত্রে এফেক্ট সাউন্ডের মাধ্যমে বৃষ্টি পড়া, ঝড় প্রভৃতির শব্দকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

আলফ্রেড হিচককের **সাইকো** (১৯৬০) ছবিতে একটি মেয়ে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালিয়ে পালাচ্ছে। শোনা যায় গাড়ির সামনের কাঁচের উপর ওয়াইপারের জল সরানোর যান্ত্রিক শব্দ। শব্দটি স্বাভাবিকের থেকে একটু বেশি তীব্র করে দেওয়া হয়েছে। একটু পরে গাড়ি থেকে নেমে সে হোটেলে প্রবেশ করে, মেয়েটি যখন বাথরুমে স্নান করছে তখন আবার ওয়াইপারের শব্দ শোনা যায়। অথচ এ ধরনের শব্দ এখানে উপস্থিত থাকার কথা নয়। কেবলমাত্র রহস্যময়তা সৃষ্টির জন্য এখানে বিশেষ শব্দটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। ঐ একই ছবিতে বেশ কয়েকবার শোনা যায় পাখির কণ্ঠের

সুতীব্র চিৎকারের মত বেহালার তীক্ষ্ণ ধ্বনি। সেখানো কোন জীবিত পাখির অস্তিত্ব নেই। এই বিশেষ-শব্দটি এ ছবিতে পরিচায়ক চিহ্ন বা lead motif হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

কেবলমাত্র কাহিনীচিত্রের ক্ষেত্রেই নয় তথ্যচিত্রের ক্ষেত্রেও কদাচিৎ এফেক্ট সাউণ্ড বা বিশেষ শব্দ ব্যবহার করা হয়। ব্রিটিশ তথ্যচিত্রকার ও স্বনামধন্য চলচ্চিত্র সম্পাদক হামফ্রে জেনিংস-এর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উপর নির্মিত **লিস্‌ন টু ব্রিটেন** (১৯৪২) ছবিতে এধরনের শব্দের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। এ ছবিতে স্কুলের বাচ্চাদের উচ্ছলতা, খনি শ্রমিকদের কর্মোদ্যম প্রভৃতি দৃশ্যের সঙ্গে সামরিক কনভয় ও ট্যাঙ্ক চলার বিশেষ শব্দ যোগ করা হয়েছে, যুদ্ধের আশঙ্কাকে প্রকাশ করতে।

১০.৬ চলচ্চিত্রে আবহ-সঙ্গীতের ব্যবহার

এফেক্ট সাউন্ডের মত চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত সঙ্গীতও সাধারণত হয় আখ্যান-বহির্ভূত বা নন-ডাইজেটিক। অবশ্য গল্পের কোন চরিত্র যদি সঙ্গীত বা গানের উৎস হয়, সেক্ষেত্রে ব্যবহৃত সঙ্গীত হবে আখ্যান-অন্তর্গত বা ডাইজেটিক। প্রাথমিকভাবে চলচ্চিত্রে আখ্যান-বহির্ভূত সঙ্গীত বা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের ব্যবহার শুরু হয়েছিল কাহিনীর গতিপ্রকৃতি বা চরিত্রের মুড বা মনোভাব বোঝাতে। এছাড়া ছবিতে শব্দ ব্যবহারের ফলে হলিউড ও ইউরোপের চলচ্চিত্রে সাঙ্গীতিক ছবি নামের একধরনের নতুন গোত্রের ছবির চল শুরু হয়। যে ছবিগুলিতে কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত গান ও ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের সাহায্যে মূল গল্পটি গড়ে ওঠে। জার্মান ধ্রুপদী সঙ্গীত স্রষ্টা মোৎজার্টের একটি অমর সৃষ্টি অবলম্বনে সুইডেনের বিখ্যাত পরিচালক ইঙ্গমার বার্গম্যান নির্মিত **দ্য ম্যাজিক ফ্লুট** (১৯৭৪) নামের বিখ্যাত সঙ্গীত-প্রধান ছবিটির কথা বলা যায়। অথবা মোৎজর্টের জীবনের অবলম্বনে হলিউডের মিলোস ফোরম্যানের **অ্যামিদিউস** (১৯৮৪) ছবিটির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

সঙ্গীত যে কাহিনীর ভাবের সঙ্গে সবক্ষেত্রে একাত্মতা সৃষ্টি করে তা নয়। সঙ্গীতের ব্যবহার দৃশ্যের ভাবের সঙ্গে বিপরীতধর্মী বা কন্ট্রাপয়েন্টাল ও হতে পারে। মৃণাল সেনের ছবি **কলকাতা ৭১** থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। এ ছবিতে একজন বিপ্লবী পুলিশের গুলিতে লুটিয়ে পড়ছে। শব্দপথে সোনা যায় আকাশবাণী বেতারে শুভকালের আনন্দময় যন্ত্রসঙ্গীত। সঙ্গীতের এই কন্ট্রাপয়েন্টাল ব্যবহার এখান একধরনের তিক্ত ব্যঙ্গের জন্ম দিয়েছে।

অনেকক্ষেত্রেই যে কথা দৃশ্যের ভাষায় বা মুখের ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, সে কথা বা ভাব সঙ্গীতের মুর্ছনায় প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সত্যজিৎ রায়ের **পথের পাঁচালী** (১৯৫৫) ছবিতে হরিহর দূরদেশে ভ্রমণ সেরে বাড়ি ফিরে যখন শোনে, কন্যা দুর্গার মৃত্যু হয়েছে, সে হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে— কথা বা কান্নার বদলে তীব্র তার সানাই-এর ঝঙ্কারে প্রকাশিত হয় পিতৃহৃদয়ের আবেগ ও যন্ত্রণা অভিঘাত।

সত্যজিৎ রায়ের ছবির মতই তাঁর সমসাময়িক ফরাসী নব-তরঙ্গের পরিচালক ফ্রাঁসোয়া ক্রুফোর ছবিতেও সঙ্গীত বড় ভূমিকা নেয়। ক্রুফোর **ফোরহান্ড্রেড ব্লো'স** (১৯৫৯) ছবিটির নায়ক একটি বালক। ছেলেটি যখন স্কুল বা বাড়ির শাসন থেকে পালিয়ে ফ্রান্সের রাস্তা মুক্তির আনন্দ খুঁজতে থাকে, তখন আমরা শব্দপথে শুনি একটি বিশেষ সঙ্গীতের সুর।

কাহিনী চিত্রের ক্ষেত্রে সঙ্গীত যতটা বেশি ব্যবহার হয় তত বেশি না হলেও তথ্যচিত্রেও ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউসিক বা নেপথ্য সঙ্গীতের ব্যবহার বহুল প্রলচিত। ১৯৩০ ও '৪০-এর দশকের ব্রিটিশ তথ্যচিত্র এবং ১৯৩০-এর দশকের নির্মিত জার্মান-নাৎসী প্রচারধর্মী তথ্যচিত্রে সঙ্গীতের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তথ্যচিত্রে সঙ্গীত ব্যবহারের প্রসঙ্গে ফরাসী নব-তরঙ্গের চলচিত্রকার অ্যালা বেনেঁর নাৎসী কারাগারের বন্দিদের স্মৃতিতে নির্মিত **নাইট এণ্ড ফগ** (১৯৫৫) ছবিটির কথা উল্লেখ করতেই হয়। এ ছবিতে জার্মান সুরকার জান্স আইসলারের সুরে ধরা পড়ে নাৎসী কারাগারে বন্দি মানুষদের যন্ত্রণার অব্যক্ত স্মৃতি। বলা যায় সঙ্গীতের এই ব্যবহার হয়ে ওঠে এ ছবিটির অপরিহার্য অঙ্গ।

১০.৭ চলচ্চিত্রে নৈঃশব্দ্যের-এর ব্যবহার

সবাক ছবির ক্ষেত্রে সংলাপ, ভাষ্য, সঙ্গীত ও অন্যান্য শব্দের ব্যবহার যেমন ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠতে পারে, নৈঃশব্দ বা সাইলেন্স (silence) ও তেমনি অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে। শব্দময় ছবিতে ব্যবহৃত নৈঃশব্দের ব্যবহারকে তুলনা করা হয় চলমান দৃশ্যের মধ্যে 'ফ্রিজ' শটের সঙ্গে।

ইতালির নব-বাস্তববাদ-উত্তরকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক মাইকেলেঞ্জেলো আন্তোনিওনির ছবিতে প্রায়ই দেখা যায় আধুনিক মানুষের জীবনবোধ থেকে বিচ্ছিন্নতা বোঝাতে নৈশব্দ ব্যবহার করা হয়। আন্তোনিওনির ছবিতে নৈশব্দ মানসিক শূন্যতার প্রতীক হয়ে উঠে।

বাস্তব জগতে শব্দ যেমন জীবনের স্পন্দনের চিহ্ন, তেমনি নৈশব্দ মৃত্যুচেতনার প্রতীক হয়ে উঠতে পারে। প্রবাদপ্রতিম জাপানী চলচ্চিত্র নির্মাতা আকিরা কুরাসাওয়ার **টুলিভ** (১৯৫২) ছবিতে এরকমই একটি দৃশ্য রয়েছে। দেখা যায় ছবির প্রধান চরিত্র অসুস্থ হয়ে চিকিৎসকের কাছে যায়। চিকিৎসক বলে যে যে দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত। চিকিৎসালয় থেকে বেরিয়ে মৃত্যুভয়ে ভীত ব্যক্তিটি শহরের রাস্তায় কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান হারায়, হঠাৎ ছবিতে সমস্ত শব্দ থেমে যায়, নৈশব্দে নেমে আসে। আবার কোলাহল, যানবাহনের শব্দ শোনা যায় যখন ব্যক্তিটি জ্ঞান ফিরে পায়। শব্দহীনতা এখানে যেন মৃত্যুর মুহূর্তকে চিহ্নিত করে।

নৈশব্দের অর্থ আবার বার্গম্যানের ছবিতে ভিন্ন। তাঁর **পারসোনা** ছবিতে দেখা যায় প্রধান নায়িকা চরিত্র এলিজাবেথ হঠাৎই বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে, কেবল বেতারে যুদ্ধের ভয়াবহতার খবর শুনে তার মুখ থেকে একধরনের চাপা তাণ্ডব আর্তনাদ বেরিয়ে আসে। সে নিজেকে নির্বাসিত করে সভ্যতা থেকে দূরে নির্জন দ্বীপে। এ ছবির নায়িকার বাকরুদ্ধতা ও নৈশব্দ যুদ্ধবিদ্ধস্ত আধুনিকতার সংকটের দ্যোতক হয়ে ওঠে।

ইঙ্গমার বার্গম্যানের অন্য একটি ছবি **সাইলেন্স** যে ছবিতে নৈশব্দই অন্তর্নিহিত বিষয়। সারা ছবিতে কয়েকটি মাত্র বাক্য শোনা যায় তার কয়েক মুহূর্ত শোনা যায় বিখ্যাত জার্মান, সুরকার সোহান সোবাস্টিয়ান বাখের রচিত সুর। দীর্ঘ ছবিতে নৈঃশব্দের দমচাপা আবহাওয়া বিরাজ করে। এ ছবিতে আধুনিক ব্যপ্তি মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ ও অসীম একাকীত্বের অনুভূতি সৃষ্টি করা হয় নৈশব্দের সাহায্যে।

১০.৮ সাযুজ্যপূর্ণ (synchronized) ও সাযুজ্যহীন (non-synehronized) শব্দ

নৈঃশব্দের আলোচনা শেষে আমরা আবার শব্দের আলোচনায় ফিরতে পারি। বাস্তবধর্মী ছবিতে ঘটনা ও তার থেকে উৎপন্ন শব্দে পরস্পরের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চলে। এ ধরনের শব্দকে বলা হয় সিক্রোনাস শব্দ। অর্থাৎ ধরা যাক ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটি গ্লাস মেঝেতে পড়ে গেল। বস্তুর পতনের সঙ্গে সঙ্গেই যদি পতনের শব্দ শোনা যায় তাহলে দৃশ্যের সঙ্গে সেই শব্দের সিক্রোনাইজেশন বা সাযুজ্য রক্ষিত হয়েছে বলা যায়। একইভাবে সংলাপ উচ্চারণের সময় ঠোঁট নড়ার ভঙ্গি ও উচ্চারিত শব্দ যদি একইসঙ্গে যথাক্রমে দর্শকের চোখে ও কানে পৌঁছয় তাহলে সেক্ষেত্রে দৃশ্য ও শব্দের মধ্যে সাযুজ্য রক্ষিত হয়েছে বলা হয়। সংলাপের ক্ষেত্রে সিঙ্ক্রোনাইজেশনকে 'লিপ্ সিঙ্ক' বলা হয়।

সাধারণত দৃশ্যগ্রহণের সময়েই সরাসরি শব্দগ্রহণ করলে সেক্ষেত্রে সিঙ্ক-সাউণ্ড-সুটিং বলা হয়ে থাকে। তথ্যচিত্র, বিশেষত 'সিনেমা ভেরিতে' শৈলীর ছবিগুলিতে সিঙ্ক-সাউন্ট সুটিং অপরিহার্য। তবে কাহিনী চিত্রের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সিঙ্ক-সাউণ্ড সুটিং-এর পরিবর্তে সম্পাদনা কক্ষে দৃশ্যের সঙ্গে মিলিয়ে শব্দ যোগ করে দৃশ্য ও শব্দের সিক্রোনাইজেশন ঘটানো হয়।

অনেক সময় দৃশ্যের ঘটনা ও তার থেকে উৎপন্ন শব্দের মধ্যে সাযুজ্য থাকে না। এক্ষেত্রে দর্শক চোখে যে ঘটনা

দেখছেন কানে তার অনুরূপ শব্দ ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাচ্ছেন না। অনেকক্ষেত্রে সঠিক সিক্রোনাইজেশন করার নৈপুণ্যের অভাবে এ ধরনের সাযুজ্যহীন বা আউট-সিঙ্ক শব্দ বা সংলাপ পাওয়া যায়। তবে অনেক সময় আঙ্গীকবাদী (formalist) ছবিতে, যেখানে আঙ্গিকে নিয়ে পরিচালক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চান, সেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে দৃশ্য ও শ্রাব্যের সাযুজ্যহীনতা সৃষ্টি করা হয়। এ ধরনের শব্দকে নন-সিঙ্‌ক্রোনার্স বা সাযুজ্য বর্জিত শব্দ বলা হয়। আধুনিককালে চলচ্চিত্রে দৃশ্য বা ইমজে নিয়ে যেমন নতুন ভাবনা চিন্তা চলে শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে না।

১০.৯ সারাংশ

আবির্ভাবের পর প্রায় তিরিশ বছর চলচ্চিত্র ছিল নির্বাক দৃশ্য মাধ্যম। এখন অবশ্য চলচ্চিত্র একটু পুরোদস্তুর দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম যেখানে দৃশ্যের তুলনায় শব্দের গুরুত্ব এমন কিছু কম নয়। আধুনিক চলচ্চিত্র যে পাঁচটি সংযোগ পথ বা চানেল (channel) দ্বারা গঠিত সেগুলির মধ্যে দৃশ্য (visual) ও গ্রাফিক্স (graphics) ছাড়া অন্য তিনটিই শব্দ মাধ্যম যথা কথা (speech), সংগীত (music) এবং পারিপার্শ্বিক শব্দ/বিশেষ শব্দ (ambience/special effect)।

কথা (speech) চলচ্চিত্রে বিভিন্নভাবে থাকতে পারে। যেমন কথোকথন সংলাপ (dialogue), স্বউক্তি (monologue) বা ধারাভাষ্যতে (commentary)। চলচ্চিত্রে কথার শুরুর অপরিসীম। সংলাপ বা স্বউক্তি ছাড়া যেমন কাহিনীচিত্রের কথা ভাবা যায় না তেমনি ভাষ্য (commentary) ছাড়া অ-কাহিনীমূলক ছবি সম্পূর্ণ হয় না। কথা চলচ্চিত্রের বর্ণনা ধর্মীতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এবং সংলাপ বা কথোপকথন কাহিনীচিত্রে যোগ করেছে বাড়তি নাটকীয়তা, কথা (speech) বাস্তববাদী চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রধান সংযোগ-মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

চলচ্চিত্রে সংগীত বিশেষত আবহসংগীতের ব্যবহার এখন প্রায় অনিবার্য হয়ে পড়েছে। কাহিনীচিত্রের বিভিন্ন স্থানে যথাযথ সংগীতের ব্যবহার একধরনের 'মুড' (mood) তৈরিতে বিশেষবাবে সাহায্য করে। চলচ্চিত্রে দৃশ্য ও শ্রাব্যে যে অন্তর্নিহিত কথা বলা যাচ্ছে না তা অনেক সময় সংগীতের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। প্রসঙ্গত বলা যায় চলচ্চিত্রে সংগীতের ব্যবহারের সূত্র ধরে একধরনের জনপ্রিয় সংগীতমূলক (musical) ও অপেরাধর্মী ছবির ধারার প্রচলন হয়েছে।

মূল ঘটনার পারিপার্শ্বিক শব্দকে চলচ্চিত্রে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যায়। নিখুঁত পারিপার্শ্বিক শব্দের ব্যবহার যেমন বাস্তবাদী 'ডিটেল' (detail) তৈরীতে সহায়তা করে তেমনি দৃশ্যকে বিভিন্নভাবে বিশেষ অর্থবহ করে তুলতে পারে। ঠিক তেমনি বিশেষ শব্দ (special-effect sound)-এর ব্যবহারের দ্বারাও চলচ্চিত্র মাধ্যম উপকৃত হয়েছে। বিশেষত, কার্টুন ছবি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ শব্দের ব্যবহার বহুল প্রচলিত।

শব্দের মতই নৈশব্দ (silence) ও চলচ্চিত্রকারের বক্তব্য প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হতে পারে। শব্দের সঙ্গে সঠিক স্থান নৈশব্দের ব্যবহার দ্বারাও দৃশ্যকে অর্থবহ করা যায়।

চলচ্চিত্রে যদি দৃশ্যের ঘটনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে শব্দ ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় সিঙ্ক সাউণ্ড (sync. sound)। আবার যদি দূরের ঘটনা বা চরিত্রে ঠোঁট নাড়ার সঙ্গে শব্দের সাযুজ্য না থাকে তাহলে (non-sync. sound) নন-সিঙ্ক সাউন্ড তৈরি হতে পারে। সাধারণত দৃশ্যগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক শব্দ ও কথাও রেকর্ড করা হলে তাকে সিঙ্ক-সাউণ্ড স্যুটিং বলা হয়।

১০.১০ অনুশীলনী

(নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী)

১। প্রথম সবাক কাহিনীচিত্রের নাম কী?

২। কত সালে প্রথম সবাক ছবি মুক্তি পায়?

৩। চলচ্চিত্রে কয় প্রকার 'সংযোগ-পথ' (channel) ব্যবহৃত হয়?
৪। 'পারিপার্শ্বিক শব্দ' কাকে বলে?

(স্বল্প দৈর্ঘ্যের উত্তরভিত্তিক প্রশ্নবলী)

তুলনা করুন—

১। 'সিক্রোনাইজড' শব্দ — 'নন-সিক্রোনাইজড' শব্দ
২। 'ডাইজেটিক' শব্দ — 'নন-ডাইজেটিক' শব্দ
৩। টীকা লিখুন — নৈশব্দ ও চলচ্চিত্রে তার ব্যবহার
৪। আধুনক চলচ্চিত্রকে দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম বলা হয় কেন? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী)

১। চলচ্চিত্রে সংলাপ ও সংগীতের ব্যবহার বিষয়ে আলোচনা করুন।
২। বিভিন্ন ধরনের শব্দের ব্যবহার কিভাবে চলচ্চিত্রকে অর্থবহ করে তুলতে পারে?
৩। চলচ্চিত্রে বিভিন্ন শব্দ-পথগুলির বিষয়ে বিস্তারিত লিখুন।
৪। চলচ্চিত্রে পারিপার্শ্বিক শব্দ ও নৈশব্দের ভূমিকা বিশদ আলোচনা করুন।

১০.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। আন্ডারস্ট্যান্ডিং মুভী : লুইস জিয়ানেত্তি, প্রেন্‌টিস জল, নিউ জার্সি, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৯৬

২। ফিল্ম অ্যাজ আর্ট : রুডল্‌ফ আর্নহাইম, রূপা, কলকাতা, প্রথম পেপারব্যাক সংস্করণ, ১৯৯২ [প্রবন্ধ ঃ এ নিউ ল্যাকুন : আর্টিন্টিক কমপোসিট্‌স এন্ড টকিং ফিল্ম — ১৯৩৮]

৩। প্রবন্ধ : 'লেট দেয়ার বি সাউন্ড' : ঋত্বিক ঘটক, চিত্রবিক্ষণ, ঋত্বিক সংখ্যা, জানু-এপ্রিল, ১৯৭৬

৪। বিষয় চলচিত্র : সত্যজিৎ রায়, আনন্দ পাবলির্শাস, কলকাতা, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৩ [প্রবন্ধ চলচ্চিত্রের সংলাপ প্রসঙ্গ ও আবহসঙ্গীত প্রসঙ্গে]

৫। কী কনসেপ্ট্‌স্ সিনেমা স্টাডিজ : সুসান হেওয়ার্ড, রুটলেজ, লণ্ডন, প্রথম সংস্করণ, ২০০০।

একক ১১ □ সাংবাদিকচিত্র সাময়িকী ও সংবাদদলিলচিত্র

গঠন —

১১.০ সংবাদচিত্র সামায়িকী ও সংবাদদলিলচিত্র
১১.১ উদ্দেশ্য
১১.২ প্রস্তাবনা
১১.৩ সংবাদচিত্র সাময়িকী (news magazine)
১১.৪ সংবাদচিত্র সাময়িকী ও টেলিভিশন
১১.৫ সংবাদচিত্র সাময়িকী ঃ বিষয় ও উদ্দেশ্য
১১.৬ সংবাদদলিলচিত্র (news reels)
১১.৭ সংবাদদলিলচিত্র, সংবাদচিত্র সাময়িকী ও তথ্যচিত্র
১১.৮ যুদ্ধবিষয়ক সংবাদদলিলচিত্র
১১.৯ সোভিয়েত সংবাদদলিলচিত্র
১১.৯.১ ইতিহাস
১১.৯.২ জিগা ভের্তভ ও সোভিয়েত সংবাদদলিলচিত্র
১১.৯.৩ বিষয় সংবাদদলিলচিত্র ঃ ভের্তভ-আইজেনস্টাইন বিতর্ক
১১.৯.৪ ইস্থার শাব
১১.৯.৫ সবাকযুগে সোভিয়েত সংবাদদলিলচিত্র
১১.১০ চলচ্চিত্রের আদিযুগ ও সংবাদদলিলচিত্রের বাণিজ্যিক উৎপাদন ও প্রচার
১১.১১ মার্কিন সংবাদদলিলচিত্র
১১.১১.১ সাধারণ ইতিহাস
১১.১১.২ মার্কিন নিউজরিল পতন
১১.১২ ভারতীয় সংবাদদলিলচিত্র
১১.১৩ সংবাদদলিলচিত্র ঃ বিষয় বৈচিত্র্য
১১.১৪ মার্কিন সংবাদচিত্র সাময়িকী
১১.১৫ সংবাদচিত্র সাময়িকী ঃ কানাডা ও ব্রিটেন
১১.১৬ টেলিভিশন, সিনেমা ভেরিতে ও সংবাদচিত্র সাময়িকী
১১.১৭ নিউজরিল / নিউজ ম্যাগাজিন ও বিশ্বাসযোগ্যতা
১১.১৮ সারাংশ
১১.১৯ অনুশীলনী
১১.২০ গ্রন্থপঞ্জী

১১.১ উদ্দেশ্য

এই একক থেকে জানতে পারবেন —

- সংবাদমূলক চলচ্চিত্রের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা।
- চলচ্চিত্রের পর্দায় সাংবাদিকতার সঙ্গে সংবাদমূলক ছবির সম্পর্ক।
- পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবাদদলিলচিত্র ও সংবাদচিত্র সাময়িকীর ইতিহাস।
- টেলিভিশনের ব্যাপক প্রসার সংবাদমূলক চলচ্চিত্রকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে।
- সংবাদমূলক চলচ্চিত্রের নৈর্ব্যক্তিকতা সম্পর্কে আলোকপাত।
- দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন চলচ্চিত্র আন্দোলনের সঙ্গে সংবাদমূলক ছবিগুলির (film) সম্পর্কে ও বিস্তারিত বিষয়ে আলোচনা এবং
- বিভিন্ন ধারার সংবাদমূলক ছবিগুলির মধ্যে মিল ও অমিল ইত্যাদি।

১১.২ প্রস্তাবনা

বিভিন্ন ধারার সংবামদমূলক ছবি অর্থাৎ সংবাদদলিলচিত্র ও সংবাদচিত্র সাময়িকী (newsreels & news magazines)-এগুলি দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে সাংবাদিকতার অন্যতম প্রধান দিক। তথ্য, ঘটনা (event), দুর্ঘটনা, সংবাদ ইত্যাদি আধুনিক জীবন যাত্রার অঙ্গ। তাই এ বিষয়ে তৈরি চলচ্চিত্রগুলি গণমাধ্যমের বিষয়ক আলোচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সংবাদদলিলচিত্র বা সংবাদচিত্র সাময়িকীর বিনোদনের ক্ষমতা খুব উল্লেখযোগ্য না হলেও জনগণকে শিক্ষিত করতে ও মানুষের কাছে তথ্য পৌঁছে দেবার কাজে এগুলি বড় হাতিয়ার হতে পারে। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে অসংখ্য সংবাদমূলক চলচ্চিত্র উৎপাদিত হয়েছে। আজকাল টেলিভিশনের ব্যাপক প্রসারের ফলে প্রেক্ষাগৃহে বসে সংবাদমূলক ছবি দেখার রেওয়াজ প্রায় নেই বললেই চলে। তবে অকাহিনীমূলক চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সংবাদমূলক ছবির গুরুত্ব অসীম।

১১.৩ সংবাদচিত্র সাময়িকী

একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর যদি একাধিক সংবাদমূলক চলচ্চিত্রের একটি 'সিরিজ' (series) নিয়মিত প্রচারিত (broadcast/exhibited) হতে থাকে তবে তাকে 'সংবাদচিত্র সাময়িকী বা নিউজ ম্যাগাজিন (news magazine) বলা হয়।

তবে সাধারণত টি.ভি.-তে প্রচারিত প্রাত্যহিক 'নির্জলা খবর' (hard news)-এর অনুষ্ঠানগুলিকে সংবাদচিত্র সাময়িকী বলা হয় না। এক্ষেত্রে তিনদিন বা সপ্তাহে একদিন বা প্রতি পনোরো দিনে একদিন কি মাসে একটি করে একটি নির্দিষ্ট ধরনের অনুষ্ঠান প্রচারিত হলে তাকে সংবাদচিত্র সাময়িকী বলা হয়। অবশ্য প্রত্যেক দিনের অনুষ্ঠানেও সংবাদচিত্র সাময়িকী প্রচারিত (broadcast) হতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে বিষয় সংবাদ নির্ভর (news based) হলেও তা 'নির্জলা খবর' (hard news) হলে চলবে না। বরং বলা যায় যে একটি সংবাদপত্রে 'নির্জলা খবর' (hard news) সঙ্গে 'ফিচার' (feature)-এর যা পার্থক্য, সংবাদচিত্র (reporting)-এর সঙ্গে সংবাদচিত্র সাময়িকীর উপস্থাপনার পার্থক্য তাই।

চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট সময় অন্তর অর্থাৎ সপ্তাহে একটি বা মাসে একটি 'সংবাদচিত্র সাময়িকী'

প্রেক্ষাগৃহগুলিতে দেখানো সম্ভব হয় কিন্তু নিউজ ম্যাগাজিন মূলত প্রসার লাভ করেছে টেলিভিশনের মাধ্যমে। অবশ্য দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে না হলেও কেবলমাত্র শ্রাব্য মাধ্যমে অর্থাৎ বেতারে (radio) 'সংবাদ-সাময়িকী' প্রথম জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সংবাদ সাময়িকী বা সংবাদচিত্র সাময়িকীর ক্ষেত্রে সংবাদটি সরাসরি পরিবেশিত হয় না কিন্তু সংবাদ ঘটনা (event) সমগ্র অনুষ্ঠানের উপাদান হিসাবে কাজ করে। এক্ষেত্রে ঘটনাটি মুখ্য নয় বরং ঘটনার সামাজিক প্রসঙ্গ (Social Context)টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

বিষয়ের শ্রেণী বিভাজনের দিক থেকে দেখলে 'সংবাদচিত্র সাময়িকী' অ-কাহিনীমূলক (non-fiction) চলচ্চিত্রের মধ্যে অন্যতম। যদিও নিউজ-ম্যাগাজিন-কে তথ্যচিত্র (documentary) বলা যায় না কারণ তথ্যচিত্র এক প্রকার অকাহিনীমূলক চিত্র, হলেও সেখানে বিষয়ের উপস্থাপনা অনেক বেশী গুরুগম্ভীর (serious), ও দীর্ঘসময়ব্যাপী হয়ে থাকে। তথ্যচিত্র উপস্থাপনার বাঁধুনী (compactness) সাধারণত সংবাদচিত্রে সাময়িকী-র তুলনায় অনেক বেশী। তাছাড়া তথ্যচিত্র মোটামুটি একটি বিষয় একটি সমুদয় কাল (time-limit)-এ উপস্থাপিত হয়। ধারাবাহিকভাবে (series) একই বিষয় (theme) প্রচারিত হয় না। তবে তথ্যচিত্রের বিভিন্ন গুণাবলী যেমন বাস্তব থেকে উপাদান নির্বাচন, তথ্যনিষ্ঠতা ইত্যাদি সংবাদচিত্র সাময়িকীর মধ্যেও বর্তমান থাকতে পারে।

১১.৪ 'সংবাদচিত্র সাময়িকী' ও টেলিভিশন

একটি নির্দিষ্ট সময় (period) অন্তর সংবাদবিষয়ক বিভিন্ন ছবি দেখানোর রীতি শুরু হয়েছিল নিয়মিত সংবাদদলিলচিত্র (newsreels) প্রেক্ষাগৃহগুলিতে দেখানো মাধ্যমে। গত শতাব্দীর কুড়ি বা তিরিশের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রীটেনে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে সরকারি উদ্যোগে বা বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র উৎপাদন সংস্থাগুলির উদ্যোগে বিভিন্ন আকর্ষণীয় ঘটনা, দেশ পুর্ণগঠন ও উন্নয়ন, যুদ্ধ রাষ্ট্র বা সরকারের প্রোপাগান্ডা ও প্রচার। চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত (অর্থাৎ সপ্তাহে একটি বা দুটি কি মাসে দুটি/তিনটি) সংবাদদলিলচিত্র ও সংবাদনির্ভর ছবি দেখানোর ব্যবস্থা ছিল। এই রীতি থেকেই 'সংবাদচিত্র সাময়িকী' বা নিউজ ম্যাগাজিন (news magazine)-এর জন্ম হল।

অর্থাৎ মোদ্দা কথা হল নিয়মিত সংবাদদলিলচিত্র ধারাবাহিকভাবে (in a series) মুক্তি পাওয়া ও প্রচার হওয়ার পদ্ধতি থেকেই প্রথম সংবাদচিত্র সাময়িকীর জন্ম হয়। টেলিভিশনের ব্যাপক প্রসারের আগে পর্যন্ত ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধারাবাহিকভাবে চলচ্চিত্র পর্দায় সংবাদদলিলচিত্র দেখানো হত এবং সেগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু টেলিভিশনের প্রসার হওয়ার পর থেকেই চলচ্চিত্র মাধ্যমে এই সব সংবাদদলিলচিত্র নির্ভর সংবাদ সাময়িকী-র প্রচার কমতে থাকে। এর পরিবর্তে বিভিন্ন বিষয়ে টেলিভিশনের পর্দায় 'সংবাদ সাময়িকী' দেখানোর রেওয়াজ বাড়তে থাকে। ১৯৬০-এর দশক থেকে বি.বি.সি. বা মার্কিন টেলিভিশন চ্যানেলগুলিতে প্রচুর সংখ্যায় 'সংবাদ সাময়িকী' দেখানো ব্যবস্থা হতে থাকে। ফলে চলচ্চিত্রের পর্দায় সংবাদ বিষয়ক ছবি দেখানো প্রায় বন্ধ হয়ে পড়ে।

অধুনা একথা বলা যায় যে টেলিভিশন ও 'সংবাদ সাময়িকী' যেন পরস্পরের জন্যই তৈরি। কারণ টি.ভি. -তে সংবাদ সাময়িকী প্রচারের বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে। প্রথমত- টি.ভি.-র প্রচার যেহেতু নিয়মিত ও ধারাবাহিক ভাবে তাই ধারাবাহিত নির্দিষ্ট সময় অন্তর বা পিরিয়ডিক্যালী (periodically) 'সংবাদ সাময়িকী' প্রচার করা সুবিধাজনক। দ্বিতীয়ত- '৬০-এর দশকে টি.ভি.-কে কেন্দ্র করে যে সিনেমা ভেরিতে ও ডাইরেক্ট সিনেমা-র জন্ম হয়, তার ফলে টি.ভি সংবাদ সাময়িকী প্রচারের প্রধান ও সবচেয়ে উপযোগী মাধ্যম হিসাবে চিহ্নিত হয়। তৃতীয়ত- টি.ভি.-এর প্রযুক্তিগত সুবিধা অর্থাৎ হালকা, বহনযোগ্য ক্যামেরা ও দ্রুত সম্পাদনার সুবিধা এবং

কম খরচের জন্য এই মাধ্যমে 'সংবাদ সাময়িকী' প্রচার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। চতুর্থত- সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র/পত্রিকার মতই টি.ভি. 'সংবাদ সাময়িকী' চিত্রগুলিকে একেবারে সাধারণ মানুষের ড্রেসিংরুমে পৌঁছে দিতে পারে। এসব বিবিধ কারণে সেলুলয়েডের পর্দা থেকে 'সংবাদ সাময়িকী' অধুনা টেলিভিশন মাধ্যমেই প্রসার লাভ করেছে।

১১.৫ সংবাদচিত্র সাময়িকী ঃ বিষয় ও উদ্দেশ্য

যেহেতু সংবাদচিত্র সাময়িকী মূলত সংবাদনির্ভর তাই সংবাদচিত্র সাময়িকীর প্রচারের অন্যতম উদ্দেশ্য নিশ্চয় তথ্য সরবরাহ করা। তবে যেহেতু 'সংবাদচিত্র সাময়িকী' নির্জলা সংবাদ নয়, তাই এই ধরনের অনুষ্ঠানে বা প্রর্দশনীতে সংবাদের বিষয়কে ব্যাখ্যা (interprete) করার প্রবণতা থাকে। 'সংবাদচিত্র সাময়িকী' যেগুলি মূলত সংবাদদলিলচিত্র-নির্ভর, সেগুলির ক্ষেত্রে অবশ্য তথ্য সরবরাহ করার সঙ্গে জনগণকে সচেতন করা (aware) করা বা শিক্ষিত (educate) করার উদ্দেশ্য থাকে।

তবে আজকাল টেলিভিশনে যে সব 'সংবাদচিত্র সাময়িকী' প্রচারিত হতে দেখা যায় সেগুলির ক্ষেত্রে একধরনের মনোরঞ্জনকারী ভূমিকা বা এন্‌টারটেইনমেন্ট ভ্যাল্যুর (entertainment value) থাকে। এ ধরনের অনুষ্ঠানগুলিকে টি.ভি-তে আকর্ষণীয় করে তোলার একটা চেষ্টা থেকেই যায়। যেখানে চলচ্চিত্রের পর্দায় যেসব 'সংবাদচিত্র সাময়িকী' দেখানো হত সেগুলি ছিল দাবিয়ে তথ্য জানানো (to inform) ও শিক্ষিত করার (to educate) প্রয়াস। অবশ্য চলচ্চিত্রের পর্দায় দেখানো সংবাদদলিলচিত্র নির্ভর সংবাদচিত্র সাময়িকীগুলির ক্ষেত্রে প্রচার বা প্রোপাগান্ডার উদ্দেশ্য বেশীরভাগ সময়েই কাজ করত। বরং বলা যায় টি.ভি. 'সংবাদচিত্র সাময়িকী' প্রচারের মাধ্যম হয়ে ওঠায় অনেকক্ষেত্রেই প্রোপাগান্ডা বা প্রচারের পরিবর্তে অনুসন্ধানকারী মনোভাব (probling attitude) প্রাধান্য পাচ্ছে।

'সংবাদচিত্র সাময়িকী'-এর বিষয় যথেষ্ট ব্যাপ্ত। বিবিধ বিষয়ে 'সংবাদচিত্র সাময়িকী' প্রচারিত হয়ে থাকে। এক সময় 'সংবাদচিত্র সাময়িকী'র অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল যুদ্ধ। এছাড়া বড় বড় আন্তর্জাতিক ঘটনা, খেলাধূলা ইত্যাদি বিষয়ে 'সংবাদচিত্র সাময়িকী' চলচ্চিত্রের পর্দায় দেখানো হত। টেলিভিশন 'সংবাদচিত্র সাময়িকী'গুলির প্রধান প্রচার মাধ্যম হয়ে ওঠায় নিউজ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানগুলি অনেক বেশি করে সংবাদিকতার বিষয় হয়ে উঠেছে। ফলে 'সংবাদচিত্র সাময়িকী' অনেক বেশি করে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান করার রীতি রপ্ত করেছে।

কেবলমাত্র রাজনৈতিক বা সামাজিক সমস্যাই নয়, খেলাধূলা, মহিলাদের বিষয়, শিল্প-সাহিত্যের খবরাখবর, স্বাস্থ্য, কৃষি, সংবাদ, আইন-আদলত, মতাদর্শের বিষয়, রাষ্ট্রের কার্যকলাপ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য ভালো 'সংবাদচিত্র সাময়িকী' প্রচারিত হচ্ছে। পরিবেশ সংক্রান্ত সংবাদ, বিজ্ঞানের খবর ইত্যাদিও সংবাদচিত্র সাময়িকীর অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে। এছাড়া টেলিভিশনের কল্যাণে 'সংবাদচিত্র সাময়িকী'-এর জনপ্রিয়তাও বহুগুণ বেড়ে গেছে।

১১.৬ সংবাদদলিল

সংবাদ মূল্য (news value) আছে এরকম কোন ঘটনা (event)-এর জীবন্ত (live) বা প্রত্যক্ষভাবে (direct) চলচ্চিত্রায়নের পর, সেই চলচ্চিত্রাংশ থেকে সম্পাদনার সাহায্যে অপ্রয়োজনীয় অংশ ও পৌণপৌণিকতা (repeatation) বাদ দিয়ে সাধারণত দশ থেকে কুড়ি মিনিট সময়কালের অর্থাৎ এক বা দুই ধরনের যে সব অকাহিনীমূলক চিত্র তৈরি করা তাকে সংবাদদলিলচিত্র বা নিউজরিল (newsreel) বলা হয়।

সাধারণত একটি সংবাদদলিলচিত্রের বিষয় একটি ঘটনার উপরেরই তৈরি হয়ে থাকে। অবশ্য একই বিষয় (topic)-এর উপর নির্ভর করে একাধিক ঘটনা (event) নিয়েও নিউজরিল হতে পারে, তবে এরকম উদাহরণ কম। সাধারণত এক একটি নিউজরিল এক একটি ঘটনা (event) নিয়ে তৈরি হয় বলে একটি নির্দিষ্ট সংবাদদলিলচিত্রের মধ্যে বিষয় বৈচিত্র্য বিশেষ থাকে না, স্বভাবতই সংবাদদলিলচিত্রগুলির সময়কালে (duration) ছোট হয়ে থাকে। অবশ্যই কখনো পূর্ণ দৈর্ঘ্যের বা ফিচার লেংথ-এর নিউজরিলও তৈরি হয়ে থাকে, তবে তার সংখ্যা বেশি নয়।

এছাড়া বিশেষভাবে সংবাদদলিলচিত্র প্রদর্শন করার জন্য প্রেক্ষাগৃহে বিশেষ প্রদর্শনী (show) আয়োজন করা সম্ভব নয়। তাই সংবাদদলিলচিত্রগুলি সাধারণত মূল চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হবার পূর্বের দশ, কুড়ি মিনিট সময়ের মধ্যে দেখাতে হয়। এক সময় ভারতের প্রেক্ষাগৃহগুলিতে কাহিনীচিত্র প্রদর্শনের পূর্বে বাধ্যতামূলকভাবে সংবাদদলিলচিত্র বা নিউজরিল ইত্যাদি দেখানোর ব্যবস্থা ছিল। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই সব নিউজরিলগুলি ভারত সরকারের ফিল্মস ডিভিশন অব ইণ্ডিয়ার তৈরি ছিল। অবশ্য বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র উৎপাদন ও প্রদর্শন হত।

সংবাদদলিলচিত্র একধরনের অকাহিনীমূলকচিত্র হলেও সংবাদচিত্র (reportage) বা তথ্যচিত্র (documentary) -এর সঙ্গে নিউজরিলের কিছু পার্থক্য বর্তমান, যেগুলি আমরা পরে আলোচনা করেছি।

সংবাদদলিলচিত্রের ক্ষেত্রে ঘটনা (event) যে স্থানে ঘটছে সেখানে ক্যামেরাচালক ক্যামেরা ও সরাসরি শব্দগ্রহণের যন্ত্রপাতি নিয়ে পৌঁছে যান। তারপর কিছুটা অপরিকল্পিতভাবেই ঘটনার যত বেশি সম্ভব চিত্রগ্রহণ করেন। পরে সম্পাদনার সাহায্যে এই র-মেটিরিয়াল থেকে সাধারণত দশ থেকে মিনিট ডিউরেশনের সংবাদদলিলচিত্র নির্মিত হয়। সংবাদদলিলচিত্র উৎপাদনের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল, সংবাদ-দৃশ্য পরিবেশন, তথ্য সরবরাহ, দেশ গঠনের কাজে, সচেতনতা তৈরি ও প্রচার বা প্রোপাগান্ডা।

১১.৭ সংবাদদলিলচিত্র, সংবাদচিত্র সাময়িকী ও তথ্যচিত্র

চলচ্চিত্রকে আমরা মূলত দু'ভাগে ভাগ করে থাকি ঃ কাহিনীমূলক ছবি ও অকাহিনীমূলক ছবি (film)। অকাহিনীমূলক চলচ্চিত্র অবশ্য বিভিন্ন রকম হতে পারে। অকাহিনীমূলক বা নন-ফিকশন (non-fiction) ছবির প্রধান তিনটি ধারা হল—সংবাদদলিলচিত্র (newsreels), সংবাদচিত্র ম্যাগাজিন (news magazine films) এবং তথ্যচিত্র দলিলচিত্র (documentaries)।

যদিও একই উৎস অর্থাৎ লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয়ের তৈরি প্রথম এ্যাকচুয়ালিটি (actuality) ছবি থেকেই ক্রমে উপরোক্ত তিন ধারার অকাহিনীমূলক ছবির জন্ম হয়েছে, তবে তথ্যচিত্রের সঙ্গে নিউজরিল বা নিউজ ম্যাগাজিন ছবিরে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

প্রথমত—ডিউরেশন (duration) বা সময়কালের দিক থেকে দেখলে বলা যায় যে তথ্যচিত্র সাধারণত কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের বা তার থেকে বেশি সময় ধরে হয়। কিন্তু নিউরিল বা নিউজ ম্যাগাজিন সাধারণত দশ থেকে কুড়ি মিনিটের হয়ে থাকে। অবশ্য আজকাল টি.ভি.-তে দীর্ঘক্ষণের নিউজ ম্যাগাজিনও হতে দেখা যায়।

দ্বিতয়ত— নিউজ-রিল বা নিউজ ম্যাগাজিন ছবিগুলি সাধারণত নিয়মিত নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রেক্ষাগৃহে পর পর দেখানো হয়ে থাকে। কিন্তু একটি তথ্যচিত্র সয়ংসম্পূর্ণ — একটি সিরিজে নিয়মিত দেখানো হয় না। একটি তথ্যচিত্রের প্রত্যেকটি প্রদর্শনেই একই ছবি দেখানো হয়। এ ছাড়া অর্থ লগ্নির কথা ভাবলে বলা যায় একটি নিউজ ম্যাগাজিন বা নিউজরিল-এর একটি সংখ্যার জন্য যা অর্থ লগ্নি করতে হয় স্বাভাবিকভাবেই তথ্যচিত্রের জন্য তার থেকে বেশি খরচ হয়ে থাকে। (অবশ্য এর ব্যাতিক্রমও ঘটতে পারে।)

তৃতীয়ত— নিউজরিলের সঙ্গে সংবাদপত্রের নির্জলা খবর (hard news)-এর তুলনা হয়, নিউজ ম্যাগাজিন

ছবিকে তুলনা করা যেতে পারে সংবাদপত্রে প্রকাশিত ধারাবাহিক সংবাদ নির্ভর ফিচারের সঙ্গে। কিন্তু তথ্যচিত্র যেন হল গভীর গবেষণা প্রসূত দীর্ঘ প্রবন্ধ। স্বভাবতই তথ্যচিত্রের ব্যক্তি ও গভীরতা নিউজরিল বা নিউজ ম্যাগাজিনের থেকে বেশি।

চতুর্থত— তথ্যচিত্র যেখানে বিষয়-নির্ভর, নিউজরিল বা নিউজ ম্যাগাজিন সেখানে ইভেন্ট বা ঘটনা নির্ভর। বলা যায় নিউজরিল নির্মাতা যদি রিপোর্টার (প্রতিবেদক) হন তবে নিউজ ম্যাগাজিন নির্মাতা হলেন কলামনিষ্ঠ এবং তথ্যচিত্র নির্মাতা সেখানে বিশেষজ্ঞ সমাজতান্ত্রিক। নিউরিল যদি হয় নৈর্ব্যক্তিক, সংবাদচিত্র সাময়িকী তাহলে নৈর্ব্যস্তিক ও ব্যস্তিক অভিজ্ঞতার মিশ্রণ এবং তথ্যচিত্র হল ব্যস্তিক অভিজ্ঞতার আলোতে দেখা নৈর্ব্যক্তিক বাস্তব।

পঞ্চমত— দর্শকের দিক থেকে দেখলে বলা যায় নিউজরিল বা নিউজ ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে দেখার আগ্রহটাই প্রবল, কিন্তু তথ্যচিত্রের ক্ষেত্রে দর্শকের কাছে দেখার সঙ্গে বৃহত্তর তাৎপর্য্য বোঝার চেষ্টাও কাজ করে।

১১.৮ যুদ্ধ বিষয়ক সংবাদদলিলচিত্র

চলচ্চিত্রের আবিষ্কারের কয়েক বছর পর থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয় বেশ কয়েকটি বড় যুদ্ধ। অনেকক্ষেত্রেই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ছবি তুলে তা নিয়মিত দেখানোর ব্যবস্থা হতে থাকে। অর্থাৎ যুদ্ধের সংবাদ ও দৃশ্য দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়া এই নতুন মাধ্যমটির অন্যতম প্রধান কাজ হয়ে ওঠে। বলা যেতে পারে অকাহিনীমূলক ছবির মধ্যে সচেতনভাবে সংবাদদলিলচিত্র তৈরির ইতিহাস এই যুদ্ধবিষয়ক নিউজরিলগুলির থেকেই শুরু হয়।

১৮৯৮ সালে কিউবাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধ। এই যুদ্ধের বেশ কিছু ফুটেজ বা সংবাদচিত্র চলচ্চিত্রের ক্যামেরাবন্দি করা হয়। সে সময় মেলা বা রাস্তার ধারের তাঁবু অস্থায়ী তাঁবুতে অত্যন্ত সাধারণ শ্রমিক/কৃষক শ্রেণীর মানুষের সামনে এই সব যুদ্ধে প্রত্যক্ষ ছবিগুলি নিয়মিত দেখানো হত যাতে যুদ্ধের সংবাদ থাকত। তবে পরে দেখা গেছে এধরনের ছবির অনেকগুলিই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তোলা হয় কৃত্রিমভাবে অভিনয়ের সাহায্যে তৈরি।

স্প্যানিশ-মার্কিন যুদ্ধের সংবাদচিত্রে দর্শক সংখ্যা ও ব্যবসার সম্ভবনায় উৎসাহিত হয়ে বেশ কয়েক জন ব্রীটিশ ও মার্কিন ক্যামেরাচালক ব্যুয়র যুদ্ধ (১৮৯৯—১৯০১)-এর ছবি তোলার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তবে এই যুদ্ধের উপর তোলা ব্রীটিশ চলচ্চিত্রের ফুটেজগুলির মান যথেষ্ট ভালো ছিল যেগুলি বেশ ভালো যুদ্ধ বিষয়ক সংবাদদলিলচিত্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। বিখ্যাত মার্কিন বিজ্ঞানী ও চলচ্চিত্র প্রযুক্তি গবেষক টমাস আলভা এডিসনের সহকারী ডব্লু. কে. এল ডিকশন ব্যুয়র যুদ্ধের উপর উল্লেখযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য বেশ কিছু সংবাদ ও দৃশ্য চলচ্চিত্রের ক্যামেরায় বন্দি করেন।

উপরোক্ত দুটি বড় যুদ্ধ ছাড়াও চাইনিজ-বক্সার যুদ্ধ (১৮৯৮—১৯০০), রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪—১৯০৫), মেক্সিকান বিপ্লব (১৯১০—১৯১১) এবং বলকান যুদ্ধ (১৯১২—১৯১৩) প্রভৃতি যুদ্ধের উপর বেশ কিছু সংবাদদলিলচিত্র তৈরি হয়েছিল। চলচ্চিত্রের ইতিহাসের সম্ভবত প্রথম মহিলা চলচ্চিত্রকার জেসিকা বর্থ্যইক (Jessica Borthwick)-এর ফিল্মে হাতে খড়ি হয় বলকান যুদ্ধের উপর সংবাদচিত্র ফুটেজ তোলা দিয়ে। তিনি বলকান যুদ্ধের সময় কেবলমাত্র যুদ্ধ ক্ষেত্রই নয়, হাসপাতাল, কারাগার, নগরী ইত্যাদির উপরেও সংবাদ চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এছাড়া ১৯১৮ সালে সোভিয়েত সংবাদদলিলচিত্রের যুগ শুরু হবার আগেই ১৯১৭ সালের রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের উপর একটি সংবাদ চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন ডোনাল্ড থমসন নামের একজন মার্কিন চলচ্চিত্রকার, তাঁর সংবাদ চলচ্চিত্রটির নাম ছিল ব্লাড-স্টেইনড্ রাশিয়া (১৯১৭)।

১৯১৪ সালে শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। গ্রেট ব্রীটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মান সরকার অনুভব করে

যে সংবাদদলিলচিত্র যুদ্ধের তথ্য সরবরাহ ও রাষ্ট্রের পক্ষে প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নিতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তোলা সংবাদদলিলচিত্রগুলির যথেষ্ট দর্শক পাওয়া যেত ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। যুদ্ধক্ষেত্রে ছবি তোলার জন্য ক্যামেরাচালককে প্রযুক্তিগত ও শৈলীর কিছু পরিবর্তন করতে হল। যেমন লং-ফোকাস লেন্স বা দুরে দেখার লেন্স, কাঁধে বহনের উপযোগী ক্যামেরা ইত্যাদি তৈরি হল।

যুদ্ধক্ষেত্রের নির্বাক সংবাদচিত্র নির্মাণের কাজে ও প্রদর্শনের বিষয়ে ব্যবস্থাপনার জন্য ব্রিটিশ সরকার 'ওয়র প্রোপাগান্ডা ব্যুরো' তৈরি করে। ব্রীটিশ ক্যামেরা চালকদের পাঠানো যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ছবিগুলিকে সম্পাদনার পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সংবাদদলিলচিত্র হিসাবে দেখানোর ব্যবস্থা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সংবাদচিত্রগুলি থেকে সংকলিত সংবাদদলিলচিত্র **ব্রীটেন প্রিপেয়ার্ড** তৈরি হয় ১৯১৫ সালে। ১৯১৭ সালে **'ওয়ার অফিস টপিক্যাল বাজেট ও পিকটোরিয়াল নিউজ'** নামে একশুদ্ধ ধরাবাহিক দশ মিনিটের সংবাদদলিলচিত্র তৈরি করা হয়। এছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রের জীবন, সৈন্যদের ট্রেনিং ইত্যাদি বিষয়ে তৈরি বেশ কয়েকটি সংবাদচিত্র যেমন **জেনারেল অ্যালেনবি'স্ হিস্টোরিক এ্যান্ট ইনটু জেরুজালেম, দি ব্রীটিশ অফেনসিভ** প্রভৃতি নিয়মিত দেখানো হত। সরকারি উদ্যোগ ছাড়াও এসময় বেসরকারি উদ্যোগে তোলা বেশ কিছু সংবাদদলিলচিত্র উৎপাদিত ও প্রদর্শিত হয়েছিল। এর মধ্যে অন্যতম হল আর্লেন্ট পামারের **ফাইটিং জার্মান এয়ার রেজার্স** ইত্যাদি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রীটেনের প্রতিপক্ষ জার্মানীও সরকারি উদ্যোগে প্রচারের উদ্দেশ্যে সংবাদদলিলচিত্র ও প্রচার চলচ্চিত্র বরং এ ব্যাপারে মার্কিন প্রচেষ্টা ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯১৭ সালে রাষ্ট্রপতি উইলসনের উদ্যোগে গঠিত হয় কমিটি অন পাবলিক ইনফর্মেশন (C.P.I.) যারা যুদ্ধ সংক্রান্ত নিউজরিল উৎপাদন ও বন্টনের ব্যাপারে উদ্যোগ নিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে দেখানোর জন্য CPI কুড়ি মিনিটের (বা দু'রিলের) বেশ কিছু নিউজরিল তৈরি করে। ১৯১৮ সালে এই সংস্থা ধারাবাহিক সংবাদদলিলচিত্র **দি অ্যালায়েড ওয়াচ রিভিয়্যু** যা আমেরিকায় প্রায় সব প্রেক্ষাগৃহেই বিরাট সংখ্যক মানুষ দেখতেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯১৯ সালে CPI-এর কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। সরকারী উদ্যোগের বাইরেও প্যারামাউন্ট চলচ্চিত্র উৎপাদক সংস্থা একটি ধারাবাহিক তৈরি করে যার নাম ছিল ঃ **আঙ্কেল স্যাম** নিউজরিল। অন্যদিকে পাথে (Pathe) সংস্থা ও বেশ কয়েকটি সংবাদদলিলচিত্র নির্মাণ ও প্রচার করে।

১১.৯ সোভিয়েত সংবাদদলিলচিত্র (১৯১৭—১৯৫০)

১১.৯.১ ইতিহাস

১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের পরে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্ম হল সেখানে নতুন বিপ্লবী সরকারের পক্ষ থেকে চলচ্চিত্রকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প মাধ্যম রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হল। নতুন সাম্যবাদী 'মতাদর্শ'-এর প্রচার ও নতুন সোভিয়েত 'দেশ' গড়ার লক্ষ্যে চলচ্চিত্রকে ব্যবহারের সম্ভাবনার কথা বলা হল। কিন্তু ১৯১৮ সাল থেকে '২১ সাল পর্যন্ত দেশের ভিতরে বিভিন্ন বিরুদ্ধ শক্তির মোকাবিলা করতে গিয়ে চলচ্চিত্র শিল্পের উপর রাষ্ট্রের উদ্যোগে নজর দেওয়া ও চলচ্চিত্র শিল্পের পুর্ণগঠন সম্ভব ছিল না।

১৯১৯ সালে সোভিয়েত চলচ্চিত্র শিল্প (industry) জাতীয়করণ করা হয়। সরকার বলশেভিক বিপ্লবের সামনের সারীর নেত্রী ও লেনিনের স্ত্রী নাদেৎজ স্রুপকায়ার নির্দেশনায় 'সিনেমা কমিটি' স্থাপন করে, যে সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সাধারণ মানুষের কাছে বিপ্লবী মতাদর্শ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া। নতুন আদর্শ ও সরকারি নীতির সঙ্গে দেশের প্রত্যন্ত প্রান্তের মানুষের যোগাযোগের উদ্দেশ্যে নিউজরিল বা সংবাদদলিলচিত্র তৈরি ও প্রচারকে গুরুত্বপূর্ণ বলে ঘোষণা করা হল। লেনিন ঘোষণা করলেন, নতুন দেশে

বাস্তব অবস্থা, নতুন মতাদর্শের প্রচার, সাম্যবাদী চিন্তার প্রসারের প্রথম ও প্রাথমিক মাধ্যম হবে সংবাদদলিলচিত্র বা নিউজরিল।

এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যন্ত প্রান্তের সাধারণ মানুষের কাছে বিপ্লবী মতাদর্শ ও নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা পৌঁছে দেবার জন্য সংবাদপত্র, হ্যান্ডবিল, প্যামফ্লেট প্রভৃতি নিয়ে ট্রেন ও পরে স্টিমার দেশে প্রান্তের দিকে রওনা দিল। এই 'এজিট-ট্রেন' ও 'এজিট-স্টিমার' পরিকল্পনায় নিউজরিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিল। একদল তরুণ ক্যামেরাচালক, পরিচালক ও সম্পাদক দায়িত্ব পেলেন কাজের। প্রসঙ্গত বলা যায় এডওয়ার্ড তিসে (Edward Tisse)-র মত পরবর্তি কালের প্রখ্যাত ক্যামেরাচালক, জিগা ভের্তভ ও ইস্থার শাব-দের মত উত্তরকালের প্রখ্যাত তথ্যচিত্রকার ও চলচ্চিত্র সম্পাদকের উত্থান শুরু হয় এই কাজের মাধ্যমে।

এ সময় 'সিনেমা কমিটি' ফিল্ম স্কুল স্থাপন করে, যেখান থেকে চলচ্চিত্রের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষিত হয়ে অনেক তরুণ ক্যামেরাচালক, পরিচালক, সম্পাদক 'এজিট-ট্রেন' পরিকল্পনাকে সফল করার জন্য দেশের বিভিন্ন দিকে রওনা দেন। 'এজিট-ট্রেন'গুলি যেমন তাদের যাত্রাপথে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাধারণ মানুষকে সংবাদদলিলচিত্র দেখাতো, তেমনি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তারা সম্পাদনার জন্য মস্কোর ও বিভিন্ন গ্রামগঞ্জেই নয় 'এজিট-ট্রেন' পরিকল্পনার সাহায্যে সীমান্তের যুদ্ধক্ষেত্রেও পৌঁছে গেল সংবাদদলিলচিত্র নির্মাতারা।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, প্রথম 'এজিট-ট্রেন' রওনা হয় কাজান সীমান্তে চেক্ সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হচ্ছে সোভিয়েত সেনাদলকে। এই প্রথম 'এজিট-ট্রেন'-এ সংবাদদলিলচিত্র বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন তরুণ ক্যামেরাচালক এডওয়ার্ড তিসে। তাঁর তোলা চিত্রগুলি পাঠানো হত 'মস্কো সিনেমা কমিটি'র সম্পাদনা কক্ষে, যেখানে আরেক তরুণ জিগা ভির্তভ সম্পাদনা করতেন সংবাদদলিলগুলি।

পরের দিকের 'এজিট-ট্রেন'গুলি ছিল আরও বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ। এইসব ট্রেনগুলিতে সম্পাদনা কক্ষ, ফিল্ম ল্যাবরেটরী সবই ছিল। 'এজিট-ট্রেন'গুলি হয়ে ওঠে সংবাদদলিলচিত্র উৎপাদন ও প্রচারের স্বয়ংসম্পূর্ণ কারখানা একটি ট্রেন রওনা হয় দেশের পশ্চিম সীমান্তে তিন মাসের সফরে। এই ট্রেনটি বহন করে নিয়ে যায় জিগা ভের্তভ সম্পাদিত প্রথম নিউজরিল তথ্যচিত্র **'দি অক্টোবর রেভলুসান'**। বিভিন্ন স্টেশনে ট্রেনটি যখন দাঁড়াত তখন হাজার হাজার চাষী, সাধারণ মানুষ, শ্রমিক স্কুলছাত্র, শিশু সংবাদদলিলচিত্র দেখতে ভীড় করত। সীমান্তে সৈন্যদের উদ্দিপনা যোগানোর পাশাপাশি 'এজিট-ট্রেন'-এর বহন করা সংবাদদলিলচিত্রগুলির উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ ও রাজনৈতিক শিক্ষাদান।

কেবলমাত্র 'এজিট-ট্রেন'-ই নয় ঐ একই উদ্দেশ্য নিয়ে কামা ও ভোলগা নদীপথ ধরে 'এজিট-স্টিমার' পরিকল্পনাও চালু হয়। যাকে 'রেড স্টার' যাত্রা বলা হত। ক্রুপস্কায়ার ব্যবস্থাপনায় লেমবার্গ, ইয়ারমেলেভ প্রভৃতি বেশ কয়েকজন নিউজরিল ক্যামেরাচালকদের নিয়ে তিনমাসের জন্য স্টিমার যাত্রা করে। এই তিনমাসের যাত্রাপথে বেশ কিছু সংবাদদলিল ক্যামেরা বন্দি করা হয়, পরবর্তিকালে যেগুলি থেকে জিগা ভের্তভ সংবাদদলিলচিত্র ও তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছিলেন।

১৯২১ সালের গৃহযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটার পর থেকে অবশ্য সোভিয়েত নিউজরিলের স্বর্ণযুগে ভাঁটা পড়ে। কিন্তু ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২১ সালে মধ্যে নির্মিত সংবাদদলিলচিত্রগুলি সোভিয়েত তথা পৃথিবীর অকাহিনীমূলক ছবির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ বলে সর্বজনস্বীকৃত। কেবলমাত্র ঐতিহাসিক মূল্যের জন্য বা আর্কাইভ্যালি ভ্যালুর জন্যই নয় নতুন শৈলী সৃষ্টিতে ও সোভিয়েত সংবাদদলিলচিত্রগুলি বিশেষ সাফল্য লাভ করে।

সংবাদদলিলচিত্রের চিত্রগ্রহণ, পরিচালনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে একেবারে অনভিজ্ঞ কিছু তরুণ ও অভিজ্ঞ কলাকুশলীদের অদ্ভুত সমন্বয় ঘটেছিল। তরুনদের ক্ষেত্রে নিউজরিল উৎপাদনের মাধ্যমে যেমন হাতেখড়ি ঘটল। অভিজ্ঞ ক্যামেরাচালক বা পরিচালক যাঁরা স্টুডিওতে কাজ করতে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁদের ক্ষেত্রেও সীমান্তে সংবাদদলিলচিত্র উৎপাদনের কাজে মানিয়ে নেবার জন্য নতুন শৈলী উদ্ভাবনের প্রয়োজন হল। যেহেতু রাষ্ট্রীয়

আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে এইসব সংবাদদলিলচিত্রগুলি তৈরি হত তাই তৎকালীন বুর্জোয়া নিউজরিলগুলির এইসব সংবাদদলিলচিত্রগুলি তৈরি হত তাই তৎকালীন বুর্জোয়া নিউজরিলগুলির মত নিরপেক্ষতা ও উত্তেজক তথ্যপূর্ণ দৃশ্যাংশ গ্রহণ সোভিয়েত সংবাদদলিলচিত্র নির্মাতাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

অন্যদিকে সম্পাদনার ক্ষেত্রেও দীর্ঘকালীন দৃশ্যাংশের মাধ্যমে দৃশ্যবিষয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টির চেষ্টার পরিবর্তে জিগা ভের্তভ ও তাঁর অনুগামী সম্পাদকতা সোভিয়েত মনতাজ রীতির সাহায্যে ছোট ছোট দৃশ্যাংশের মাধ্যমে সংবাদদলিলচিত্র নির্মাণ করতেন। বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় নির্ভরতার সঙ্গেই নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা ও জীবনযাত্রার পরিবর্তনের দলিল হয়ে রয়েছে ১৯১৮—'২১ এই সময়ের সোভিয়েত সংবাদদলিলচিত্রগুলি।

কেবলমাত্র সংবাদচলচ্চিত্র নির্মাণ নয়, এ সময়ের সোভিয়েত সংবাদদলিলচিত্রগুলির নির্মাণ ও প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল দেশ গঠন ও আদর্শের প্রচার এবং যেহেতু চলচ্চিত্রের ভাষা স্বাক্ষর নিরক্ষর নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রেই বোধগম্য তাই সোভিয়েত নির্বাক সংবাদদলিলচিত্রগুলি বৈচিত্র্যপূর্ণ সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। শুধুমাত্র সংযোগের মাধ্যম হিসাবেই নয়, একটা বিরাট সংখ্যক সংবাদদলিলচিত্র শিল্পত্তীর্ণ হয়েছিল। প্রসঙ্গত এই সময়ে নির্মিত নিউজরিলগুলি সম্পর্কে লেনিন মন্তব্য করেছিলেন 'most important of the arts'।

'এজিট-ট্রেন' ও 'এজিট-স্টিমার' অভিযানগুলি ছাড়াও গৃহযুদ্ধ (১৯১৮—২১)-এর পরে সোভিয়েত দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ইউক্রেন, কিয়েভ, মস্কো প্রভৃতি অঞ্চলে নিউজরিল উৎপাদন ও প্রদর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

১১.৯.২ জিগা ভের্তভ ও সোভিয়েত সংবাদদলিলচিত্র

ভের্তভ ঃ ১৯১৮—২৯ সোভিয়েত ইউনিয়নে নির্মিত সংবাদদলিলচিত্রগুলি নির্মাণের অন্যতম প্রধান শিল্পী ছিলেন চলচ্চিত্র সম্পাদক জিগা ভের্তভ। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাঠানো সংবাদচিত্রগুলি বা নিউজ ফুটেজগুলিকে নিজস্ব মন্‌তাজ পদ্ধতিতে সম্পাদনা করে ভেতর্ভ সংবাদদলিলচিত্র নির্মাণের জগতে নতুন যুগ সৃষ্টি করেন। নিউজরিল সম্পাদনার পাশাপাশি বিভিন্ন সংবাদচিত্র বা নিউজ ফুটেজ থেকে অংশ নিয়ে জোড়া দিয়ে বেশ কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন তথ্যচিত্রও নির্মাণ করেন তিনি।

জিগা ভের্তভ (ডেনিস কাউফম্যান)-এর চলচ্চিত্র জীবন শুরু হয় মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে ১৯১৮ সালে যখন তিনি মস্কো সিনেমা কমিটি-তে সহকারী সম্পাদক হিসাবে সংবাদদলিলচিত্র সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন। জুন ১৯১৮ থেকে ডিসেম্বর ১৯১৯, এই সময়ের মধ্যে 'ফিল্ম উইকলি' (কিনো-নেদেলিয়া) নামের ধারাবাহিক সংবাদদলিলচিত্রের প্রায় তেতাল্লিশটি সংখ্যা উৎপাদন করে মস্কো সিনেমা কমিটি। এই কর্মকান্ডে জিগা ভের্তভ প্রধান সহকারী সম্পাদক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

এর অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই 'এজিট ট্রেন' ও 'এজিট স্টিমার' পরিকল্পনার প্রধান সম্পাদক হিসাবে তিনি দায়িত্ব পান। এ সময়ে তাঁর প্রধান দুটি সংবাদদলিলচিত্র কর্ম হল, 'ইনস্ট্রাকশনাল স্টিমার' বা 'রেড স্টার', ১৯২০ 'দি এজিট ট্রেন' বা 'অন দি ব্লাজলেন মিলিটারী ফ্রন্ট' (VTSIK), ১৯২১। সরাসরি নিউজরিল সম্পদনা ছাড়াও বিভিন্ন সংবাদচিত্র ও সংবাদদলিলচিত্রের অংশ থেকে তৈরি বেশ কয়েকটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের সংকলিত সংবাদলিলচিত্র নির্মাণ করেন তিনি ১৯১৯—'২১-এই সময়ের মধ্যে। এভাবেই তৈরি হয় 'দি অ্যানিভার্সারী অব দি রেভলুশান' (১৯১৯), 'দি ব্যাটল অব জরিৎসাইনে' (১৯২০) এবং তেরোটি অংশে নির্মিত 'হিস্ট্রি অব দি সিভিল ওয়ার' (১৯২১)।

কেবলমাত্র চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসাবেই নয়, কাহিনীচিত্রের পরিবর্তে সংবাদদলিলচিত্র উৎপাদনের উপর কেন বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ সে বিতর্কে ইতিমধ্যেই ভের্তভ অন্যতম তাত্ত্বিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে বিপ্লবী চলচ্চিত্র হওয়া উচিৎ বাস্তবঘটনা (fact) নির্ভর। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত উইথ কিনোক্ এ রেভল্যুশান নামের একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেন যেখানে তিনি সংবাদদলিলচিত্র ও তথ্যচিত্র নির্মাণের মাধ্যমেই সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসাধারণের জীবনযাত্রার প্রকৃত উপস্থাপনা সম্ভব বলে মন্তব্য করেন। তাঁর মতে জীবন-যেমন-তেমনভাবেই (life-as-it-is) চলচ্চিত্রের পর্দায় প্রকাশ করার একমাত্র মাধ্যম হল তথ্যচিত্র ও সংবাদদলিলচিত্র (newsreels)।

বিখ্যাত কিনো-আই (Kino-Eye) তত্ত্বের প্রস্তাবগুলির মধ্যে তিনি বলেন 'পূর্বলিখিত চিত্রনাট্য' (pre-written script) ত্যাগ করে চলচ্চিত্রকারদের উচিৎ ক্যামেরা, প্রয়োজনে কাঁধে বহনযোগ্য ক্যামেরা নিয়ে জনগণের মাঝে নেমে আসা। জীবনের ছন্দ, গতি ও পথঘাটের দৃশ্যগত বিশৃঙ্খলার মধ্যেই রয়েছে চলচ্চিত্রের প্রকৃত উপাদান। এবং তিনি বার বার বলেন যে এধরনের চলচ্চিত্রের প্রধান উৎস হওয়া উচিৎ সে সময়ের সংবাদদলিলচিত্রগুলি যেগুলি কেবলমাত্র আশ্চর্য ও ঐতিহাসিক ঘটনা বা খ্যাতনামা ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ডের চিত্রগ্রহণের প্রবণতা ছাড়িয়ে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিত জীবনযাত্রার দিনলিপি ক্যামেরাবন্দি করত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সংবাদদলিলচিত্র সম্পাদনারক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের মন্তাজ পদ্ধতির ব্যবহার ছাড়াও ভের্তভ অ্যানিমেশন, ফটোগ্রাফির বিশেষ কায়দা (trick photography) ও একাধিকবার ফিল্মকে এক্সপোজ (expose) করা প্রভৃতি করতেন।

১৯২১ সালের পর সংবাদদলিলচিত্রে জিগা ভের্তভের উল্লেখযোগ্য কাজগুলি হল ঃ 'কিনোগ্লাজ' (১৯২৪), 'স্ট্রাইড, সোভিয়েত' (১৯২৬), 'ওয়ান সিক্সথ অব দি ওয়ার্ল্ড' (১৯২৬) এবং 'দি ইলেভনথ ইয়ার' (১৯২৮)। এই ছবিগুলির বেশীরভাগই হল সংকলিত সংবাদদলিলচিত্র (compilation newsreels)। তবে লেনিনের মৃত্যুর পর সরকারের সঙ্গে বিরোধের কারণে ১৯২৭ সালে 'সোভিকিনো' (Sovkino), বা রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র অছি সংস্থা (স্থাপিত ১৯২৪) থেকে বরখাস্ত করা হয়। জিগা ভের্তভকে এরপর 'ইউক্রাইন ফিল্ম স্টুডিও'-র সংবাদদলিলচিত্র উৎপাদনের প্রধান হিসাবে নিয়োগ করে মস্কো থেকে কিয়েভে সরিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে থাকাকালীন ও তিনি সংবাদদলিলচিত্র ও সংকলন সংবাদদলিলচিত্র নির্মাণে যথারীতি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।

১১.৯.৩ বিষয় সংবাদদলিলচিত্র ঃ ভের্তভ-আইজেনস্টাইন বিতর্ক

সংবাদদলিলচিত্র তথ্যচিত্র নাকি কাহিনীচিত্র, বিপ্লবী রাষ্ট্র আদর্শের প্রচারের কোন মাধ্যমটির ভূমিকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত—এই প্রশ্নে বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন সোভিয়েত ইউনিয়নের দুই প্রবাদপ্রতিম চলচ্চিত্রকার জিগা ভের্তভ এবং সের্শেই আইজেনস্টাইন। কাহিনীচিত্রকে বুর্জোয়া কল্পনা ও মিথ্যাচারের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে চিহ্নিত করে ভের্তভ বলেন যে সংবাদদলিলচিত্রের মাধ্যমেই প্রকৃত বিপ্লবী বাস্তবকে মানুষের মধ্যে প্রচার করা সম্ভব। তাঁর মতে বাস্তবকে গল্পের কল্পনা দিয়ে উপস্থাপনা করা অনৈতিক। বরং সংবাদদলিলচিত্র বা তথ্যচিত্রের মাধ্যমে বাস্তব জীবনকে বিপ্লবী আদর্শ প্রচারের কাজে যথাযথ মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করা উচিৎ। ভের্তভ বলতে থাকেন যে 'অভিনীত বাস্তব' (mimetic reality) জনগণকে বিভ্রান্ত করতে পারে, যেখানে প্রকৃত বাস্তব থেকে সংগৃহিত উপাদান নিয়ে তৈরি সংবাদদলিলচিত্র ও তথ্যচিত্রগুলি মন্তাজ পদ্ধতিতে সম্পাদনার ফলে দর্শককে 'দেখার নতুন চোখ' বা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি' (new ways of seeing) দিতে সাহায্য করবে।

আইজেনস্টাইনের স্ট্রাইক (১৯২৫) ছবিটি মুক্তি পাবার পর এই বিতর্ক চরমে ওঠে। কাহিনীচিত্র বিষয়ে

ভের্তভের আপত্তির বিরুদ্ধে আইজেনস্টাইন মন্তব্য করেন যে ভের্তভ তাঁর বিশেষ মন্তাজ রীতি, ট্রিক ফটোগ্রাফি প্রভৃতি ব্যবহার করে সংবাদদলিলচিত্রের বাস্তবধর্মীতা নষ্ট করে ফেলেছেন। এই বিতর্কে প্রখ্যাত বিপ্লবী কবি মায়াকোভস্কি ও তাঁর সংগঠন 'লেপ' (LEF) বা লেফটিস্ট প্রলেটারিয়েট আর্টিস্টস্ ভের্তভের মতকে সমর্থন করেন। ১৯২৮ সালে একটি সম্মেলনে তিনি ভেতর্ভের পক্ষ নিয়ে চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রীয় অর্থলগ্নীকারী সংস্থা, সোভকিনো (sovkino)-এর সমালোচনা করে বলেন ঃ "it (sovkino) refuses to understand the imporance of newsreels"।

যাই হোক জিগা ভের্তভ ও আগেই আইজেনস্টাইন বিতর্কের সূত্র ধরেই একথা বলা যায় যে বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত কাহিনীচিত্রে আইজেনস্টাইন যেমন অতুলনীয় তেমনি তথ্যচিত্র, বিশেষত সংবাদদলিলচিত্রের ইতিহাসে জিগা ভের্তভের অবদান অবিস্মরণীয়।

১১.৯.৪ ইস্থার শাব

জিগা ভের্তভের মতই ইস্থার শাব (Esther Shub) ও সোভিয়েত সংবাদদলিলচিত্র বা নিউজরিলের ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য নাম। ইনিও ভের্তভের মতই নিউজরিল উৎপাদনে সম্পাদক হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। ভের্তভের মতই নাট্যকার মায়ারহোল্ড এবং কবি মায়াকোভস্কির শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণী ইস্থার শাবকে নিউজরিল সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আইজেনস্টাইনের প্রবল অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও সংবাদদলিলচিত্রের সম্পাদিকা হিসাবে তিনি ভের্তভের অনুগামী ছিলেন। যদিও জিগা ভের্তভ-এর থেকে সংবাদদলিলচিত্রের কাজের ক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্যণীয়।

ইস্থার শাব ভের্তভের মত ছোট ছোট মন্তাজ শটের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালীন দৃশ্যাংশ ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। সংবাদদলিলচিত্রের জগতে তাঁর প্রধান অবদান হল সংকলন সংবাদদলিলচিত্র (compilation newsreels)। তাঁর বিখ্যাত সংকলন সংবাদদলিলচিত্রগুলির মধ্যে বিখ্যাত হল তিনটি ছবি, **দি ফল অব রোমানভ ডাইনেস্টি** (১৯২৭), **দি গ্রেট রোড** (১৯২৭) এবং **দি রাশিয়া অব নিকোলাস টু** এবং **লিও টলস্টয়**। এই সংকলন ত্রয়ী থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ইস্থার শাবের কাজের মধ্যে গবেষকের ধৈর্য্যের সঙ্গে আদর্শ চিন্তা ও ইতিহাসবোধের কতটা সফল সংমিশ্রন ঘটেছিল।

১১.৯.৫ সবাকযুগে সোভিয়েত সংবাদদলিলচিত্র

চলচ্চিত্রে শব্দের ব্যবহারের আবিষ্কার সোভিয়েত সংবাদদলিলচিত্রের ইতিহাস নতুন গতির সঞ্চার করল। ১৯৩১ সালে বিপ্লবের দিন সাতই নভেম্বর উপলক্ষে প্রথম সবাক সংবাদদলিলচিত্র তৈরি হল। ১৯৩২ সালের জানুয়ারীতে প্রথম নিউজরিল-সাক্ষাৎকার শ্রীহিত হয় — যেখানে ম্যাক্সিম লিটভিনভ-এর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। অন্য একটি সাংদদলিলচিত্রে ম্যাক্সিম গোর্কীর বক্তৃতা রেকর্ড করা হয়। ১৯৩৩ সালে একশুদ্ধ ধারাবাহিক সংবাদ দলিলচিত্র দেখানো শুরু হয় 'সোভিয়েত আর্ট' নামে। এই সংবাদদলিলচিত্রগুলিতে সংগীত, সাহিত্য, বক্তৃতা, থিয়েটার প্রভৃতির অংশ, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি বিষয় থাকত।

এ সময় দুটি উত্তর মেরু অভিযান, কারাকাম মরু অভিযান প্রভৃতি বিষয়ে সংবাদদলিলচিত্র তোলা হয়। অল-ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রোল পরিষেবা, রেলে মাল পরিবহন, রেলপথ নির্মাণ ইত্যাদি রেল ব্যবস্থার উন্নয়নের বিষয়ে 'সুজুৎ-কিনো নিউজরিল' নামের একটি সংবাদদলিলচিত্রের সিরিজ দেখানো শুরু করে। এই কাজের জন্য রেলের কামরাতেই চলচ্চিত্র উৎপাদনের যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করে আবার নতুন করে সোভিয়েত নিউজরিল উৎপাদন পুরোমাত্রায় শুরু হয়। বিভিন্ন সীমান্ত থেকে সোভিয়েত ক্যামেরাচালকরা সংবাদচিত্র পাঠাতে থাকেন। এ সময় সোভিয়েত সংবাদদলিলচিত্রের চিত্রগ্রাহকরা কেবল দুঃসাহসিক সব যুদ্ধের দৃশ্য তোলেন তাই নয়, রাইফেল ও বেয়নেট নিয়ে যুদ্ধে ও তাদের অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল। বেশ কয়েকজন নাৎসী-বিরোধী যুদ্ধে প্রাণ দেন। 'দি সেন্ট্রাল নিউজরিল স্টুডিও' বাইশজন VGIK স্কুলের ফ্যামেটার তরুণ ছাত্রকেও সীমান্তে পাঠান। **'নিউজরিল সেভেনটি সেভেন'** নামে নাৎসী-বিরোধী যুদ্ধের উপর তোলা সংবাদদলিলচিত্রগুলি সম্পাদনা করেন জিগা ভের্তভ।

১৯৪২ ও '৪৩ সালে সিনেমা কমিটি বেশ কয়েকজন নিউজরিল ক্যামেরাচালককে সীমান্তে বিশেষ দক্ষতা দেখানো জন্য পুরস্কার দেন। এ সময় বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক দভচেঙ্কের পূর্ণাঙ্গ সংবাদদলিলচিত্রের কাজে উৎসাহিত হয়ে য্যুলি রাইজম্যান তৈরি করেন **টুয়ার্ডস দি আরমিস্সে অব ফিনল্যান্ড** (১৯৪৪), জারখি ও শাফিজ তৈরি করেন **দি ডিফিট অব জাপান** ও **ফ্রান্স লিবারেটেড**। ১৯৪৫ সালে নাৎসীদের চূড়ান্ত পতনের উপর য্যুলি রাইজম্যান তৈরি করেন পূর্ণদৈর্ঘ্যের বিখ্যাত সংবাদদলিলচিত্র **বার্লিন**। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার কয়েক বছরের মধ্যেই সোভিয়েত সংবাদদলিলচিত্রের স্বর্ণযুগের অবসান হয়।

১১.১০ চলচ্চিত্রের আদিযুগ ও সংবাদদলিলচিত্রের বাণিজ্যিক উৎপাদন ও প্রচার

আদিযুগে চলচ্চিত্র মূলত দুটি দেশে প্রসার লাভ করেছিল। ইউরোপের ফ্রান্স ও আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই দুটি দেশে যথাক্রমে ল্যুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় ও আলভা এডিশনের সৌজন্যে চলচ্চিত্র যাত্রা শুরু করে। কিন্তু ফ্রন্টের যেমন বাস্তবতা ও বাস্তব ঘটনা-নির্ভর ছবি করার রেওয়াজ তৈরি হয়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তা হয় নি। বরং সেখানে একেবারে প্রথম থেকেই কাহিনীচিত্রের প্রতি আকর্ষণ দেখা গিয়েছিল।

অকাহিনীমূলক চিত্র এবং ল্যুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয়ের বাস্তবতানির্ভর এ্যাকচুয়ালিটি ফিল্মের সূত্র ধরে ফ্রান্সে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা (event)-এর উপর ছবি তোলা শুরু হয়। এইসব ছবিগুলিই পরে সংবাদদলিলচিত্র (newsreels) হিসাবে প্রদর্শন করা হত। বাণিজ্যিকভাবে প্রেক্ষাগৃহে নিয়মিত সংবাদদলিলচিত্র দেখানো প্রথম শুরু করে ফরাসী কম্পানী 'পাথে' (Pathe)। ১৯০৯ সালে তারা প্যারিসে 'দি পাথে জার্নাল' নামে একটি নিউজরিল ধারাবাহিতভাবে রিলিজ করতে শুরু করে। পাথে কম্পানীর সাফল্য উৎসাহিত হয়ে আরেকটি ফরাসী সংস্থা গোমো (gaumont) প্যারিসের 'সোসাইটি এক্রেয়ার' প্রেক্ষাগৃহে ঐ নামের একটি নিউজরিল চালু করে।

১৯১০ সালে পাথে কম্পানী ইংল্যান্ডেও 'দি অ্যানিমেটেড গ্যাজেট' বা 'দি পাথে গ্যাজেট' নামে একটি সংবাদদলিলচিত্র শুরু করে। এই সময় ইংল্যান্ডে 'ওয়ারউইক ক্রনিকল', 'উইলিয়ামসন নিউজ' ও এই সময় পাথে ও গোমো কম্পানীদ্বয়ের নিউজরিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেখানো হতে থাকে।

১৯১১ সালের ৮ই আগস্ট থেকে পাথে কম্পানী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'পাথে উইকলি' নামের একটি নিউজরিল প্রতি মঙ্গলবার প্রকাশ করতে থাকে। তার দু'সপ্তাহের মধ্যে মার্কিন কম্পানী ফ্রান্সের গোমো সংস্থা 'দি গোমো এ্যানিমেটেড উইকলি' নামের নিউজরিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশ করে। ক্রমে আমেরিকার প্রেক্ষাগৃহগুলিতে পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনা দেখার জন্য বিপুল দর্শক সমাগম হতে থাকে। 'কিনোগ্রাম', 'মিউচ্যুয়াল উইকলি', 'নিউইয়র্ক উইকলি' প্রভৃতি নিউজরিল দ্রুত মার্কিন বাজারে এসে গেল। এমনকি ১৯১৪ সালে বিদ্রোহী নেতা পাঞ্চো ভাইয়া (Pacho Villa)-এর নেতৃত্বে মেক্সিকান বিপ্লব শুরু হলে মার্কিন কম্পানী 'মিউচ্যুয়াল মুভিস' যুদ্ধ দেখানো জন্য বিদ্রোহীদের সঙ্গে মোটা টাকার চুক্তি করে। এই যুদ্ধের সরাসরি ছবি দেখানো নিউজরিলের ইতিহাসে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

বিকৃতি ঘটানো, অভিনয়ের সাহায্যে তৈরি সাজানো বাস্তবকে প্রকৃত ঘটনার দৃশ্য বলে চালানো (বিশেষত যুদ্ধের রিপোর্টগুলি), ঘটনার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যাখ্যা ইত্যাদি মার্কিন সংবাদদলিলচিত্রের ক্ষেত্রে হামেশাই দেখা যেত। অবশ্য এর পাশাপাশি বড় বড় কম্পানীগুলির সংবাদদলিলচিত্রগুলির তথ্যনিষ্ঠতা, দায়িত্বশীল প্রতিবেদন তৈরি ও বস্তুনিষ্ঠতার দৃষ্টান্ত ছিল প্রসংশনীয়।

বেশীরভাগ মার্কিন সংবাদদলিলচিত্রের ক্ষেত্রে দু'সপ্তাহে একটি করে নতুন সংখ্যা মুক্তি পেত। ছবিগুলির দৈর্ঘ্য সাধারণত হত এক রিল বা দশ মিনিট। জনপ্রিয় মার্কিন সংবাদদলিলচিত্রগুলিতে কেবলমাত্র রাজনৈতিক বা যুদ্ধ সংক্রান্ত খবরই দেখানো হত তা নয়, সন্দে দেখানো হত ফ্যাশন শো বা বিউটি কনটেস্ট প্রভৃতি জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন। মার্কিন সংবাদদলিলচিত্র এভাবেই সংবাদ পরিবেশনের সঙ্গে দর্শকের বিনোদনের খোরাকিও জোগাত।

১৯২৩ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে মার্কিন সংবাদদলিলচিত্র (মূলত নির্বাক) সে দেশে এবং বিদেশে ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এই সময় দেশের চলচ্চিত্র উৎপাদক সংস্থাগুলি সংবাদদলিলচিত্র উৎপাদনে প্রচুর টাকা ব্যয় করেছিল। নিউজরিল তোলার জন্য বিভিন্ন সংস্থা বহু টাকা দিয়ে বিভিন্ন ঘটনার ফুটেজ ক্রয় করত এবং নিজেরাও নামকরা ক্যামেরাচালক ও সম্পাদকের মোটা মাইনেতে নিয়োগ করেছিল। এসময়কার সংবাদদলিলচিত্রে উত্তেজক ও বিভিন্ন সংবাদ ও ঘটনা (event)-এর ফুটেজ দেখানো হত তবে সেগুলি চলচ্চিত্র হিসাবে খুব একটা উঁচু মানের ছিল না বলে সমালোচকরা দাবি করেন। ১৯২৭ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে মার্কিন সংবাদদলিলচিত্র আরোর দফায় প্রসার লাভ করে শব্দের ব্যবহারের সাহায্য নিয়ে। বিভিন্ন খ্যাতনামা ব্যক্তির সাক্ষাৎকার, সাধারণ লোকজনের সন্দে 'ইন্টার-এ্যাকান'-এর ফলে নিউজরিল একপ্রকার ব্যপ্তি ঘটে।

পরবর্তিকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে মার্কিন অর্থনীতির মন্দার জন্য নিউজরিল ব্যবসায় কিছুটা মন্দা দেখা দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উপর তোলা সংবাদদলিলচিত্র আবার জনপ্রিয়তা লাভ করলেও, পঞ্চাশের দশক থেকে মার্কিন দেশে টি.ভি.-র ব্যাপক প্রসারের পর থেকে সেদেশে সেলুলয়েডে সংবাদদলিলচিত্রের সুবর্ণ যুগ শেষ হতে থাকে।

১১.১১.২ মার্কিন নিউজরিল পতন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আগে পর্যন্ত অর্থাৎ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯১৫—১৯৪০ এই পঁচিশ বছর মার্কিন সংবাদচলচ্চিত্র দেশে এবং বিদেশে ব্যাপক ব্যবসা করে। এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিক থেকে ১৯৪০-এর দশকের শেষ দিক পর্যন্ত নিউজরিলের ব্যবসা মার্কিন দেশে যথেষ্ট আশাপ্রদ ছিল। কিন্তু পরবর্তিকালে বিভিন্ন কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেসরকারি সংস্থাগুলি তৈরি সংবাদচলচ্চিত্রে উপার্জন কমতে থাকে। বলা যায় ১৯৬০-এর দশকের শেষদিকে এসে আমেরিকান নিউজরিলের পতন সম্পূর্ণ হয়।

১৯৫০-এর দশকের শেষ থেকেই মার্কিন সংস্থাগুলি ধীরে ধীরে সংবাদচলচ্চিত্র উৎপাদন ও প্রদর্শন থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিতে থাকে। ১৯৫৬ সালে ওয়ার্নার ব্রাদার্স কম্পানীর 'পাথে নিউজ' (Pathe News) বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫৭ সালে প্যারামাউন্ট সংস্থা তাদের একটি নিউজরিল বন্ধ করে দেয়। ১৯৬৩ সালে বন্ধ হয়ে যায় টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স সংস্থার প্রযোজিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম জনপ্রিয় সংবাদদলিলচিত্র 'ফক্স-মুভীটোন নিউজ'। ১৯৬৭ সালে হার্স্ট (Hearst), সংস্থার 'হার্স্ট-মেট্রোটোন নিউজ' বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে একের পর এক ছোট-বড় নিউজরিল বন্ধ হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৮ সালে ইউনির্ভাসাল কম্পানীর 'ইউনির্ভাসাল নিউজ' বন্ধ করে দেওয়া হয়। বলা যায় এর সঙ্গেই মার্কিন সংবাদদলিলচিত্রের সমাপ্তি চূড়ান্ত হয়।

বিকৃতি ঘটানো, অভিনয়ের সাহায্যে তৈরি সাজানো বাস্তবকে প্রকৃত ঘটনার দৃশ্য বলে চালানো (বিশেষত যুদ্ধের রিপোর্টগুলি), ঘটনার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যাখ্যা ইত্যাদি মার্কিন সংবাদদলিলচিত্রের ক্ষেত্রে হামেশাই দেখা যেত। অবশ্য এর পাশাপাশি বড় বড় কম্পানীগুলির সংবাদদলিলচিত্রগুলির তথ্যনিষ্ঠতা, দায়িত্বশীল প্রতিবেদন তৈরি ও বস্তুনিষ্ঠতার দৃষ্টান্ত ছিল প্রসংশনীয়।

বেশীরভাগ মার্কিন সংবাদদলিলচিত্রের ক্ষেত্রে দু'সপ্তাহে একটি করে নতুন সংখ্যা মুক্তি পেত। ছবিগুলির দৈর্ঘ্য সাধারণত হত এক রিল বা দশ মিনিট। জনপ্রিয় মার্কিন সংবাদদলিলচিত্রগুলিতে কেবলমাত্র রাজনৈতিক বা যুদ্ধ সংক্রান্ত খবরই দেখানো হত তা নয়, সন্দে দেখানো হত ফ্যাশন শো বা বিউটি কনটেস্ট প্রভৃতি জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন। মার্কিন সংবাদদলিলচিত্র এভাবেই সংবাদ পরিবেশনের সঙ্গে দর্শকের বিনোদনের খোরাকিও জোগাত।

১৯২৩ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে মার্কিন সংবাদদলিলচিত্র (মূলত নির্বাক) সে দেশে এবং বিদেশে ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এই সময় দেশের চলচ্চিত্র উৎপাদক সংস্থাগুলি সংবাদদলিলচিত্র উৎপাদনে প্রচুর টাকা ব্যয় করেছিল। নিউজরিল তোলার জন্য বিভিন্ন সংস্থা বহু টাকা দিয়ে বিভিন্ন ঘটনার ফুটেজ ক্রয় করত এবং নিজেরাও নামকরা ক্যামেরাচালক ও সম্পাদকের মোটা মাইনেতে নিয়োগ করেছিল। এসময়কার সংবাদদলিলচিত্রে উত্তেজক ও বিভিন্ন সংবাদ ও ঘটনা (event)-এর ফুটেজ দেখানো হত তবে সেগুলি চলচ্চিত্র হিসাবে খুব একটা উঁচু মানের ছিল না বলে সমালোচকরা দাবি করেন। ১৯২৭ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে মার্কিন সংবাদদলিলচিত্র আরোর দফায় প্রসার লাভ করে শব্দের ব্যবহারের সাহায্য নিয়ে। বিভিন্ন খ্যাতনামা ব্যক্তির সাক্ষাৎকার, সাধারণ লোকজনের সন্দে 'ইন্টার-এ্যাকান'-এর ফলে নিউজরিল একপ্রকার ব্যপ্তি ঘটে।

পরবর্তিকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে মার্কিন অর্থনীতির মন্দার জন্য নিউজরিল ব্যবসায় কিছুটা মন্দা দেখা দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উপর তোলা সংবাদদলিলচিত্র আবার জনপ্রিয়তা লাভ করলেও, পঞ্চাশের দশক থেকে মার্কিন দেশে টি.ভি.-র ব্যাপক প্রসারের পর থেকে সেদেশে সেলুলয়েডে সংবাদদলিলচিত্রের সুবর্ণ যুগ শেষ হতে থাকে।

১১.১১.২ মার্কিন নিউজরিল পতন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আগে পর্যন্ত অর্থাৎ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯১৫—১৯৪০ এই পঁচিশ বছর মার্কিন সংবাদচলচ্চিত্র দেশে এবং বিদেশে ব্যাপক ব্যবসা করে। এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিক থেকে ১৯৪০-এর দশকের শেষ দিক পর্যন্ত নিউজরিলের ব্যবসা মার্কিন দেশে যথেষ্ট আশাপ্রদ ছিল। কিন্তু পরবর্তিকালে বিভিন্ন কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেসরকারি সংস্থাগুলি তৈরি সংবাদচলচ্চিত্রে উপার্জন কমতে থাকে। বলা যায় ১৯৬০-এর দশকের শেষদিকে এসে আমেরিকান নিউজরিলের পতন সম্পূর্ণ হয়।

১৯৫০-এর দশকের শেষ থেকেই মার্কিন সংস্থাগুলি ধীরে ধীরে সংবাদচলচ্চিত্র উৎপাদন ও প্রদর্শন থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিতে থাকে। ১৯৫৬ সালে ওয়ার্নার ব্রাদার্স কম্পানীর 'পাথে নিউজ' (Pathe News) বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫৭ সালে প্যারামাউন্ট সংস্থা তাদের একটি নিউজরিল বন্ধ করে দেয়। ১৯৬৩ সালে বন্ধ হয়ে যায় টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স সংস্থার প্রযোজিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম জনপ্রিয় সংবাদদলিলচিত্র 'ফক্স-মুভীটোন নিউজ'। ১৯৬৭ সালে হার্স্ট (Hearst), সংস্থার 'হার্স্ট-মেট্রোটোন নিউজ' বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে একের পর এক ছোট-বড় নিউজরিল বন্ধ হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৮ সালে ইউনির্ভাসাল কম্পানীর 'ইউনির্ভাসাল নিউজ' বন্ধ করে দেওয়া হয়। বলা যায় এর সঙ্গেই মার্কিন সংবাদদলিলচিত্রের সমাপ্তি চূড়ান্ত হয়।

মার্কিন সংবাদদলিলচিত্রের পতনের কারণগুলি নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ঃ

প্রথমত, ১৯৪৯ সাল থেকে আমেরিকায় টেলিভিশন বেশ ভালোভাবে এসে যায়। টেলিভিশনে ব্যাপকভাবে সংবাদ পরিবেশন শুরু হয়। ফলে মানুষের মধ্যে নিউজরিল দেখার উৎসাহ চলে যায়।

দ্বিতীয়ত, সমস্ত সংবাদদলিলচিত্র উৎপাদক সংস্থাগুলিই প্রায় একই ঘটনার একই ছবি দেখাতো, বৈচিত্র্যই ছিল না। কিন্তু তুলনায় টি.ভি. নিউজে বিষয় বৈচিত্র্য বেশি থাকায় তা জনপ্রিয় হতে থাকে।

তৃতীয়ত, ক্রমে বিভিন্ন নিউজরিল উৎপাদক সংস্থাগুলির মধ্যে ব্যাপক প্রতিযোগীতায় ব্যবসায়িক লাভ খুব একটা সহজ হচ্ছিল না।

চতুর্থত, বিতর্কিত বিষয় মার্কিন নিউজরিলে প্রায় থাকতই না। উপরন্তু সরকারি সেন্সরের উপদ্রব ছিল প্রবল। ফলে আকর্ষণীয় ও বিতর্কিত বিষয়ে সংবাদদলিলচিত্রগুলি আলোকপাত করতে না পারায় দর্শক সংখ্যা কমছিল।

পঞ্চমত, ১৯৫০ সালে ও তার পরে দেশ জুড়ে বহু সংবাদদলিলচিত্র প্রদর্শনের প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ হয়ে যায়।

তবে শেষ পর্যন্ত একথা বলা যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সারা পৃথিবীতেই সেলুলয়েডে তৈরি সংবাদদলিলচিত্রের উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা ফুরোয় প্রধানত টেলিভিশনের ব্যাপক প্রসারের ফলে।

১১.১২ ভারতীয় সংবাদদলিলচিত্র

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতই ভারতেও বিভিন্ন সমসাময়িক ঘটনাগুলির উপর এ্যাকচুয়োলিটি ফিল্ম বা ঘটনার হুবহু চিত্রগ্রহণের মাধ্যমে সংবাদ চলচ্চিত্রের আদি যুগের শুরু। গত বিংশ শতাব্দির প্রথম দিকে পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ রাজের মহিমা প্রচারের উদ্দেশে ইংরেজ সেনাবাহিনীর বীরত্ব-নির্ভর বিভিন্ন তথ্যচিত্র দেখানো শুরু হয়। ঔপনিবেশিক সরকারের প্রচারের উদ্দেশ্যে রাজ-অভিষেক, ব্রিটিশ রাজ পরিবারের অনুষ্ঠান, রাজকীয় বিবাহ, এদেশে ব্রিটিশ রাজপুরুষদের সফর প্রভৃতি বিষয়ে সংবাদ-চলচ্চিত্রধর্মী ছোট ছোট ছবি তোলা ও প্রদর্শন করা হত। ১৯১১ সালে লর্ড কার্জন-এর পরিকল্পনামত দিল্লির বাদশাহী সরকারের অনুকরণে জাঁকজমকপূর্ণ একটি দরবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যে সভায় রাজা পঞ্চম জর্জ ভারতের রাজা বলে অভিষিক্ত হন। বেশ কয়েকজন সেলুলয়েডে এই 'দিল্লি দরবার'-এর ছবি তোলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হীরালাল সেন।

১৯১২ সালে দাদাসাহেব ফালকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনার উপর বেশ কয়েকটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের সংবাদ চলচ্চিত্রধর্মী ছবি তোলেন। বলা বাহুল্য ছবিগুলি ছিল নির্বাক। ফালকে নির্মিত এই সব ফিল্মগুলির বিষয় ছিল কংগ্রেস-এর মিটিং, জাতীয় নেতাদের মৃত্যুতে শোকযাত্রা, ধর্মঘট, বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও আহুতি, বিদেশী বিশিষ্ট অতিথিবর্গের ভারত সফর প্রভৃতি। ছবিগুলি প্রযোজনা করতে বোম্বে টকিজ, মহারাষ্ট্র ফিল্ম কম্পানি। কহিনূর এবং অন্যান্য ভারতীয় চলচ্চিত্র-বাণিজ্য সংস্থাগুলি। এইসব সংবাদ চলচ্চিত্রধর্মী ছবিগুলি সাধারণত প্রেক্ষাগৃহে কোন বড় দৈর্ঘ্যের কাহিনী চিত্রের সঙ্গে দেখানো হত। এই সব স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবিগুলি প্রায় সবই সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে এদেশে নিয়মিত সংবাদ চলচ্চিত্র বা নিউজরিল (newsreels) ফিল্ম তৈরি ও প্রদর্শন বিশেষ গুরুত্ব পায়। যুদ্ধক্ষেত্র ও অন্যান্য বিষয়ে ব্রিটিশদের পক্ষে প্রচারের জন্য ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকার 'ফিল্মস্ এ্যাডভাইসারি বোর্ড' গঠন করে যা পরবর্তীকালে ইনফর্মেশন ফিল্মস অব ইণ্ডিয়া (IFI)-এ পরিণত হয়। এই সংস্থার উদ্যোগে সংবাদচলচ্চিত্র উৎপাদন, আমদানী ও প্রচার শুরু হয়। এইসব সংবাদ চলচ্চিত্রগুলি 'দি ইন্ডিয়ান নিউজ প্যারেড'-এর দ্বারা বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে বন্টন করা হত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর ১৯৪৬ সালে এইসব সংস্থাগুলি অস্তিত্ব হারায়। তবে ১৯৪৮ সালে ভারতের

স্বাধীনতার পর 'ইন্ডিয়ান নিউজ প্যারেড'-এর মতই একটি সংস্থা তৈরি করা হয় যার নাম 'দি ইন্ডিয়ান নিউজ রিভিউ'। এই সংস্থা স্বাধীন দেশে সংবাদ-চলচ্চিত্র প্রচারের দায়িত্ব নেয়।

স্বাধীনতার পরবর্তী এক দশক ধরে ভারতে তৈরি বেশির ভাগ সংবাদ চলচ্চিত্রের বিষয় ছিল জাতীয় নেতৃবৃন্দের কার্য-কলাপ ও উন্নয়নের ঘটনা এবং প্রতিশ্রুতিগুলি সরকারী উদ্যোগে নির্মিত এই সব সংবাদ চলচ্চিত্রগুলি তৈরি ও প্রদর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নতুন দেশের নাগরীকদের শিক্ষাদান (educating the masses)। পরে ১৯৬০-এর দশকে উন্নয়নমূলক ও শিক্ষামূলক ছবি থেকে গুরুত্বটা একটু সরে আসে পরিবার পরিকল্পনা, বিমা, সঞ্চয়, সবুজ বিপ্লব ইত্যাদি বিষয়ের উপর।

প্রথম দশকের সংবাদ-চলচ্চিত্রগুলির ক্ষেত্রে ধারাভাষ্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালের ছবিগুলোতে দেখা যায় ঘটনাস্থল থেকে সরাসরি শব্দগ্রহণ, মানুষজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ইত্যাদির বহুল ব্যবহার। তবে সরকারী উদ্যোগে তৈরি এইসব সংবাদ-চলচ্চিত্রগুলির বেশীরভাগই একঘেয়ে, ছাঁচে ঢালা কাজ হয়ে যাচ্ছিল। ১৯৭১-'৭৪ এই পাঁচ বছরে যে বাহান্নটি নিউজরিল জাতীয় ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল সেইসব ছবিগুলির বিষয়ে সংসদের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি মন্তব্য করে যে সরকারি উদ্যোগে তৈরি সংবাদ চলচ্চিত্রগুলি বিভিন্ন ঘটনাক্রম ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের আগমন ও নিষ্ক্রমনের বিরক্তিকর, একঘেয়ে বিবরণী ছাড়া কিছুই নয়। যদিও সরকারি নীতি তাতে বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নি। সরকারের যুক্তি ছিল নিউজরিল আকর্ষণীয় হবার দরকার নেই কারণ এগুলি তৈরি হয় 'টু এডুকেট এন্ড ইনফর্ম দ্য মাসেস'।

পরবর্তিকালে ভারত সরকারের ফিল্মস ডিভিশনের উদ্যোগে হিন্দি ও আঞ্চলিক ভাষায় বেশ কিছু সংখ্যক সংবাদ চলচ্চিত্র তৈরি হতে দেখা যায়। এছাড়াও অন্তত ছাব্বিশটি আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছ থেকে ফিল্ম ডিভিশন অব ইণ্ডিয়া নিউজরিল সংগ্রহ করত। ভারত সরকারের 'ডাইরেক্টরেট অব ফিল্ম পাবলিশিটি'-এর একশ পঞ্চাশটি 'ইউনিটের সাহায্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শহর ও মফস্বলের প্রেক্ষাগৃহগুলিতে নিয়মিত প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হত। এইভাবে সরকারি উদ্যোগে সংবাদ চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শনের যে প্রয়াস এদেশে গড়ে উঠেছিল তা ছিল পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বড় সংবাদ চলচ্চিত্র কর্মসূচী (newsreel network)। কিন্তু এই ব্যয়বহুল কর্মসূচী চলচ্চিত্র হিসাবে খুব সফল হয় নি।

কারণ প্রথমত, সরকারি নিয়ন্ত্রণের ফলে নিউজরিলের বিষয় সীমিত হয়ে পড়েছিল। জাতীয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠান বিরোধী ঘটনার ছবি সেন্সর করে বাদ দিয়ে দেওয়া হত। দ্বিতীয়ত, মানের দিক থেকে হাতে গোনা কয়েকটি ছবি বাদ দিলে বেশিরভাগ সংবাদ-চলচ্চিত্র ছিল অত্যন্ত সাধারণ। বিষয়ের একঘেয়েমির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আঙ্গিকগত গতানুগতিকতা। তৃতীয়ত, সোভিয়েত নিউজরিলের মত নতুন প্রকাশভঙ্গি নির্মাণ বা মার্কিন সংবাদ-চলচ্চিত্রগুলির মত স্বতন্ত্র অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি-এর কোনটার ভারতীয় নিউজরিলের ক্ষেত্রে দেখা যায় নি। চতুর্থত, স্বাধীন ভারতে সংবাদ-চলচ্চিত্রের উৎপাদন ও প্রদর্শন কখনোই আমেরিকা, ব্রিটেন ও কানাডার মত বাণিজ্যিকভাবে সফল হয় নি। প্রেক্ষাগৃহে মূল কাহিনীচিত্র শুরু করার আগে বাধ্যতামূলকভাবে সংবাদ-চলচ্চিত্র ইত্যাদি দেখানোর ব্যবস্থা ছিল যার বাণিজ্যিক সাফল্য প্রায় ছিল না বলা যায়।

পঞ্চমত, ভারতের চলচ্চিত্র পরিচালকরা কখনোই সংবাদচলচ্চিত্র নির্মাণকে কাহিনীচিত্র বা তথ্যচিত্রের মত গুরুত্ব দিয়ে ভাবেননি। সংবাদ-চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এদেশে ভাবনা-চিন্তার অভাব এই আঙ্গিকটি জনপ্রিয় না হওয়ার অন্যতম কারণ বলা যায়।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতই টেলিভিশনের ব্যাপক প্রসারের ফলে সংবাদ-চলচ্চিত্র বা নিউজরিল (newsreel)-এর গুরুত্ব এদেশেও কমেছে। স্যাটেলাইট টেলিভিশন যেখানে কয়েক ঘন্টার মধ্যে ঘটনার বিবরণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে চলচ্চিত্র মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। চিত্রগ্রহন, সম্পাদনা, বন্টন ও প্রদর্শন, টেলিভিশনের তুলনায় যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ হওয়া দর্শকদের দিক থেকে সংবাদ-চলচ্চিত্রের তেমন কোন চাহিদা নেই।

মাঝে কিছুদিন (১৯৯০-এর দশকে) সংবাদ চলচ্চিত্র উৎপাদন জাতীয় গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছিল। ভারত সরকারের ফিল্মস্ ডিভিশন ও তেমন উৎসাহ দেখায়নি সংবাদ চলচ্চিত্র উৎপাদনের বিষয়ে। অধুনা ফিল্মস ডিভিশন আবার দশ মিনিটের নিউজরিল উৎপাদন ও ক্রয়ের বিষয়ে নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

১১.১৩ সংবাদদলিল চিত্র ঃ বিষয় বৈচিত্র্য

চলচ্চিত্রের গত একশ বছরের ইতিহাসে অসংখ্য সংবাদদলিলচিত্র উৎপাদিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে বেশ কিছু যেমন তৈরি হয়েছে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে তেমনি ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক সংস্থার উদ্যোগেও তৈরি হয়েছে বহু নিউজরিল। তবে একমাত্র ১৯২০ ও '৩০-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নে তৈরি সংবাদদলিলচিত্রগুলি ছাড়া বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সংবাদদলিলচিত্র কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রের বাইরে বেরতে পারে নি। সংবাদপত্রের মত সর্বত্রগামীতা ও ব্যাপক বিষয় বৈচিত্র্য সাধারণ নিউজরিলগুলির মধ্যে বিশেষ দেখা যায় নি।

যে কয়েকটি বিষয়কে কেন্দ্র করে নিউজরিল সাধারণত তৈরি হয় সেগুলি হল ঃ

ক) **সরকারি ঘটনা ঃ** বিভিন্ন সরকারি ঘটনা যেমন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ, বড় মন্ত্রি বা আমলাদের অনুষ্ঠান ইত্যাদির উদ্বোধন, সরকারি সভা-সমিতি, প্রধানমন্ত্রি বা রাষ্ট্রপতির ভাষণ, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি।

খ) **যুদ্ধের খবর ঃ** ১৯০২ থেকে গত একশ বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন বড় ছোট যুদ্ধের উপর অজস্র সংবাদদলিলচিত্র নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলি যুযুধান কোন পক্ষের প্রচারে ব্যবহার করার উদাহরণ প্রচুর।

গ) **রাষ্ট্রের প্রোপাগান্ডা ঃ** রাষ্ট্রীয় নীতির সমর্থনে প্রচারের উদ্দেশ্য সংবাদদলিলচিত্র নির্মাণ করা হয়ে থাকে। উদাহরণ সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের সমর্থনের জন্য বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানীতে তৈরি নাৎসীবাদ সমর্থক সংবাদদলিলচিত্র।

ঘ) **রাজনৈতিক ঘটনা ঃ** যেমন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বা সাধারণ নির্বাচন দলীয় প্রচার, রাজনৈতিক পার্টির কার্যক্রমের উপর তৈরি সংবাদদলিলচিত্র বিরল নয়।

ঙ) **সামরিক বাহিনীর খবর ঃ** দেশের সামরিক বাহিনীর কাজকর্ম বা নতুন যুদ্ধাস্ত্র, মিশাইল যুদ্ধ জাহাজ বা বিমান ইত্যাদি বিষয়ে সংবাদদলিলচিত্র নির্মাণের রেওয়াজ আছে।

চ) **উন্নয়নমূলক ঘটনা ঃ** শিল্প-সাহিত্য, কৃষি ও বিভিন্ন পরিকাঠামো (বিদ্যুৎ, পানীয় জল, সেচ)-এর উন্নয়নকে চলচ্চিত্রে ধরে রাখার জন্য সংবাদদলিলচিত্র তৈরি হয়।

ছ) **বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঃ** নতুন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি ইত্যাদির আবিষ্কার বিষয়ে সংবাদদলিলচিত্র তৈরি হতে পারে।

জ) **অভিযানমূলক তথ্য ঃ** দক্ষিণ মেরু অভিযান, পর্বতাভিয়ান থেকে মহাকাশ অভিযান পর্যন্ত বিভিন্ন অভিযান সংক্রান্ত সংবাদ নিউরিলের বিষয় হয়ে থাকে।

ঝ) **বিদেশ সংক্রান্ত খবর ঃ** বিদেশের বিভিন্ন ঘটনা ইত্যাদির উপরও নিউজরিল তৈরি হয়ে থাকে।

ঞ) **জনসেবা, স্বাস্থ্য, খেলাধূলা ও শিক্ষা ঃ** শিক্ষামূলক বিষয়, স্বাস্থ্য, খেলাধূলা, রেড ক্রস, ইউনিসেফ ইত্যাদি সংস্থার জনসেবা ইত্যাদি কাজকর্ম বিষয়েও সংবাদদলিলচিত্র হয়ে থাকে।

১১.১৪ মার্কিন সংবাদ-চলচ্চিত্র সাময়িকী

১৯৩০-এর দশক ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবাদদলিলচিত্র (newsreels) এবং সংবাদ চলচ্চিত্র সাময়িকী (news magazines) উৎপাদন এবং প্রচারের স্বর্ণযুগ। সেই সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সব বড় বড় শহরগুলিতে নিয়মিত সংবাদদলিলচিত্র এবং সংবাদ সাময়িকী প্রদর্শনের জন্য প্রধান প্রেক্ষাগৃহগুলিতেও ব্যবস্থা থাকত। একটি বা দুটি কার্টুন ছবি ও ভ্রমণমূলক তথ্যচিত্রের সঙ্গে অথবা কোন ফিচার (দৈর্ঘ্যে বড়) ছবির সঙ্গে সংবাদচিত্র দেখানো হত। সে যুগের দর্শকদের মধ্যে সংবাদচিত্র যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। ফলে দর্শকদের চাহিদা মেটাতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর তৈরি সংবাদচিত্র দেখানো হত নিয়মিত।

তখনও টেলিভিশনের প্রসার ঘটেনি। সংবাদপত্র বা রেডিও-র খবরে ঘটনাবহুল এ সময়ের বিভিন্ন ঘটনার নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। একটি দৃশ্য এবং দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমের প্রয়োজন ছিল যে মাধ্যম বিভিন্ন ঘটনাকে দর্শকের চোখের সামনে তুলে ধরতে পারবে।

দি মার্চ অব টাইম ঃ ১৯৩৫ সালে এক সংবাদদলিলচিত্রের ক্যামেরাচালক ডি রোথেমঁ বিখ্যাত 'টাইম-লাইফ' পত্রিকার বার্তা বিভাগের সাহায্য নিয়ে **দি মার্চ অব টাইম** নামের একটি সংবাদসাময়িকী প্রযোজনা শুরু করেন। চলচ্চিত্রের পর্দায় এই সংবাদ সাময়িকীটি চলেছিল প্রায় সতেরো বছর অর্থাৎ ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত। প্রত্যেক মাসে **দি মার্চ অব টাইম**-এর এক একটি সংখ্যা মুক্তি পেত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সব বড় শহরের বড় প্রেক্ষাগৃহগুলিতে। একটি সংখ্যার সময়কাল হত কুড়ি মিনিট করে।

দি মার্চ অব টাইম সংবাদ সাময়িকী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ছবি করত। কেবলমাত্র বিভিন্ন ঘটনার দৃশ্যগত ইতিহাস নয়, এই সংবাদচিত্র সাময়িকী তৈরির উদ্দেশ্য ছিল ঘটনার গভীরে প্রবেশ করা। দর্শকদের সামনে 'সংবাদের পিছনের সংবাদ' বা "নিউজ বিহাইন্ড নিউজ" (News behind news)-কে তুলে ধরা ছিল এই সংবাদ সাময়িকী-র উদ্দেশ্য। 'দি মার্চ অব টাইম' সংবাদচিত্র সাময়িকী-র মাধ্যমে চেষ্টা করা হত বিভিন্ন বিষয়ে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করার।

১৯৩০-এর দশকের এই বিখ্যাত সংবাদচিত্র সাময়িকীতার উপাদান পেত মূলত তিনধরনের উৎস থেকে। সাংবাদিকতা থেকে নেওয়া হত নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক সংবাদ পরিবেশনার রীতি। সম্পাদকীয় রচনার মত বিশ্লেষণী মনোভাব থাকা সংবাদচিত্রগুলির পরিবেশনায়। এছাড়া 'দি মার্চ অব টাইম'-এ যাবত এক ধরনের নাটকীয় শৈলী যা সাংবাদচিত্রে বর্ণিত ঘটনাকে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করত। এমনকি কোন কোন ঘটনাকে কৃত্রিমভাবে অভিনয়ের সাহায্যে দেখানোরও রেওয়াজ ছিল। তবে নিরপেক্ষতা ও সত্যনিষ্ঠার প্রশ্নে এই সংবাদচিত্র সাময়িকী কোন রকম বিকৃতি ঘটাতো না। বরং প্রতিটি ঘটনার বিশ্লেষণের পিছনে থাকত যথাযথ গবেষণা ও অন্তর্দৃষ্টি। এছাড়া অনেকসময়েই বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনার ক্ষেত্রে সংবাদচলচ্চিত্রের ফুটেজের পরিবর্তে স্থির চিত্র ইত্যাদি ব্যবহার করা হত।

১৯৩৮ সালের মে মাস থেকে দি মার্চ অব টাইমের প্রতিটি সংখ্যা (issue)-র জন্য একটি করে নির্দিষ্ট বিষয় রাখা হত। কেবলমাত্র ঘটনাবলীর দৃশ্যই নয়, সঙ্গে থাকত ম্যাপ, রেখাচিত্র (diagram), পুরোন ফুটেজ বা সংবাদ চিত্র, ইন্টার টাইটেল ও গ্রাফিক্স ইত্যাদি। 'দি মার্চ অব টাইম' সংবাদ সাময়িকী-র প্রতিটি সংখ্যা তৈরির জন্য খরচ করা হত বেশ বড় অঙ্কের টাকা, প্রায় পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর হাজার ডলার। যেখানে অন্যান্য সমসাময়িক সংবাদদলিলচিত্র ধারাবাহিকের একটি সংখ্যার জন্য খরচ করা হত গড়ে দশ হাজার ডলার প্রায়।

'দি মার্চ অব টাইম' কেবলমাত্র বিভিন্ন ঘটনার উপর আলোকপাত করত তা নয়, বিভিন্ন সমসাময়িক সামাজিক বিষয়ে এই সংবাদ-চিত্র সাময়িকী বিতর্কের অবতারণা করত এবং বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়ে ছবি করত। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ের বিভিন্ন স্পর্শকাতর ব্যাপার (issue) নিয়ে ও তাদের মত প্রকাশ করতে **'দি মার্চ**

অব টাইম' পিছুপা হত না। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে এই সংবাদচিত্র সাময়িকী খুব খোলাখুলিভাবে প্রগতিবাদী মনোভাব প্রকাশ করত। 'দি মার্চ অব টাইম' অনেক বিষয়েই মৌলিকতার দাবি রাখতে পারে।

এই 'সংবাদচিত্র সাময়িকী'-এর উল্লেখযোগ্য সংবাদচিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম হল **প্রোগ্রেসিভ এডুকেশন** (১৯৩৬)। এ ছবিটি ছিল প্রয়াত, প্রখ্যাত, শিক্ষাবিদ হোরেস মান-এর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ চলচ্চিত্র যেখানে তাঁর স্থাপিত শিক্ষাদানের পদ্ধতির বর্ণনা ও ব্যাখ্যা রয়েছে। এই শিক্ষাদান পদ্ধতিতে পুরোন পদ্ধতির পরিবর্তে কিভাবে মজা ও খেলাধূলার মাধ্যমে বাচ্চাদের ভবিষ্যতের জন্য তৈরী করা হত, তা দেখানো হয়েছে এ ছবিতে।

'দি মার্চ অব টাইম' সংবাদচিত্র সাময়িকীর আরেকটি বিখ্যাত সংবাদচিত্র হল **অর দি মুভিস মার্চ অন** (১৯৩৯)। এ ছবিটি ছিল চলচ্চিত্রের ইতিহাসের উপর তৈরি একটি সিরিজ, যেখানে চলচ্চিত্রের ইতিহাস বর্ণনামূলকভাবে বলে যাওয়ার পরিবর্তে বরং জোর দেওয়া হয়েছিল মোশান পিকচার প্রোডাকশান কোড (MPPC) এবং জনগণের প্রতি হলিউডের কর্তব্যপরায়ণতার উপর। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা বিষয়েও 'দি মার্চ অব টাইম' আলোকপাত করতে। ১৯৩৬ সালে তারা তৈরী করে **অর প্রবলেমস অব ওয়ার্কিং গার্ল** (১৯৩৬) নামের একটি ধারাবাহিক। যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছোট ছোট শহরের কর্মরত মেয়েদের কিভাবে নিউইয়র্কের বড় বড় ব্যবসাদাররা শোষণ করে চলে তার ভয়াবহ ও অস্বস্তীকর চিত্র রয়েছে।

ঐ ১৯৩৬ সালেই তৈরি হয়েছিল **অর স্টোরী অব হোয়াইট হাউস**। এ ছবির শিরনাম দেখে যা মনে হয় ছবিটি তা নয় এখানে মার্কিন রাষ্ট্রপতি আবাস হোয়াইট হাউসের ইতিহাস বা গঠনশৈলী বলে যাওয়া হয় নি। এ ছবির বিষয় হল ফ্রাঙ্কলিন রুলভেল্ডের নতুন চুক্তি (New Deal)।

এই সংবাদচিত্র সাময়িকী-র অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বিভিন্ন ব্যক্তির, বিশেষত স্বনামধন্য ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার এবং বেশ কয়েকজন পৃথিবী বিখ্যাত কিন্তু বিতর্কিত ব্যক্তিত্বের উপর তৈরি ছবি। এদের মধ্যে অন্যতম হিটলার, স্ট্যালিন, মুসোলিনি এবং তোজো। 'দি মার্চ অব টাইম' সংবাদচিত্র সাময়িকী-র একেবারে নতুন শৈলী এবং মৌলিক ও নির্ভিক বক্তব্য ও মতামত প্রকাশের বিষয়টিকে প্রশংসা করে প্রখ্যাত সংবাদচলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ রেমন্ড ফিল্ডিং মন্তব্য করেছেন, "Its style was revolutionary, a curious mixture of cinematic exposition & journalistic punctuation that defied both convension & analysis"।

'দি মার্চ অব টাইম' সংবাদচিত্র সাময়িকী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এই নিউজ ম্যাগাজিন প্রথমে দেখানো হত চারশ বত্রিশটি প্রেক্ষাগৃহে, ক্রমে সারা দেশ জুড়ে প্রায় এগারো হাজার প্রেক্ষাগৃহে নিয়মিত বানিজ্যিকভাবে 'দি মার্চ অব টাইম' দেখানো হত। ১৯৩৭ সালের ৪ঠা মার্চ আমেরিকার 'দি অ্যাকাডেমি অব মোশান পিকচার আর্টস ও সায়েন্স' এই সংবাদচিত্র সাময়িকীটিকে বিশেষ অস্কার' (special OSCAR award) পুরস্কারে ভূষিত করে। ১৯৪১ সালে তৈরি মার্কিন পরিচালক বিখ্যাত অরসন ওয়েলস্-এর তৈরি কাহিনীচিত্র **সিটিজেন কেন** ছবিতে 'দি মার্চ অব টাইম'-এর শৈলী, তীর্যক মন্তব্য, সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে।

১৯৫১ সালে 'দি মার্চ অব টাইম' বন্ধ হয়ে যায়। পরে আবার ১৯৭৫ সালে শুরু হয় এই সংবাদচিত্র সাময়িকী। তবে ১৯৭৬ সালেই বন্ধ হয়ে যায় 'দি মার্চ অব টাইম'। নিউজ ম্যাগাজিনের ইতিহাসে 'দি মার্চ অব অব টাইম' অবিস্মরণীয় কীর্তি।

দিস ইজ আমেরিকা : 'দি মার্চ অব টাইম' সংবাদচিত্র সাময়িকীর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ফ্রেডরিক উলম্যান (জুনিয়র) ১৯৪২ সালে 'দিস ইজ আমেরিকা' নাম দিয়ে একটি সংবাদচিত্র সাময়িকী (News magazine) শুরু করেন। বিখ্যাত চলচ্চিত্র বিতরণ ও প্রদর্শন সংস্থা আর.কে.ও. (R.K.O.)-এর সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে দেখানো হত এই সংবাদচিত্র সাময়িকীটির বিভিন্ন সংবাদচিত্র। ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৫১ সাল, এই দশ

বছরে 'দিস ইজ আমেরিকা' নিউজ ম্যাগাজিনের একশ বারোটি সংখ্যা মুক্তি পায়। প্রতি মাসে এই সংবাদপত্র সাময়িকীর একটি করে সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেত।

'দিস ইজ আমেরিকা' সংবাদচিত্র-সাময়িকীর বিষয় ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মার্কিন দেশে বিভিন্ন ছোট শহরের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা। এই সংবাদচিত্র সাময়িকীর মূল সুর ছিল আরেরিকার মানুষের জাতীয়তাবাদী চেতনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অতীত ঐতিহ্য। ঐতিহ্য ও বর্তমানের মধ্যে সম্পর্ক, বিভিন্ন জাতীয় ঘটনায় জনগণের মতামত ইত্যাদি বিষয়গুলিকে নির্ভর করে সংবাদচিত্রগুলি তৈরি হত।

এই সংবাদচিত্র সাময়িকীটির বিভিন্ন সংবাদচিত্রের বাস্তব চরিত্রগুলি ছিল ছোট শহরের বিভিন্ন পেশার লোক যেমন, কোন ছোট সংবাদপত্রের সম্পাদক, স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক, শহরের কোন ছোট জনসভায় অংশগ্রহণকারী লোকজন ইত্যাদি। সংবাদচিত্রগুলি যেসব মানুষজনের জীবনযাত্রা, মতামত ইত্যাদি বিষয়ে নির্মিত হত তারা সাধারণত ছিলেন মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত বা শ্রমজীবী যারা ছোট শহরতলির গাছপালায় ঢাকা রাস্তার ধারে শান্ত জীবন যাপন করতেন।

বিষয় এবং শৈলীর দিক থেকে 'দিস ইজ আমেরিকা' ছিল 'দি মার্চ অব টাইম'—এর থেকে বেশ কিছুটা ভিন্ন স্বাদের। 'দি মার্চ অব টাইম'-এর মত রাজনৈতিক ও বিতর্কিত বিষয়ে ছবি করতেন না 'দিস ইজ আমেরিকার' পরিচালকরা। 'দি মার্চ অব টাইম'-এর মত বড় বড় ব্যক্তিত্বদের নিয়েও এঁরা ছবি করতেন না, বরং এঁদের ছবির বিষয় ছিল সাধারণ মানুষের প্রায় ঘটনাবর্জিত জীবনযাত্রা। যারা ছিলেন সাধারণ গৃহস্থ, ধর্মভীরু, আইনকানুন ও নীতি মেনে চলা মানুষজন।

'দিস ইজ আমেরিকা' সংবাদচিত্র সাময়িকীর সংবাদচিত্রগুলির দৈর্ঘ্য ছিল পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট। সংবাদচিত্রগুলির ভাষ্য ছিল সুলিখিত ও সুললিত। 'অফ-স্ক্রিন' ভাষ্যকার ভাষ্যপাঠ করতেন তবে ভাষ্যপাঠের স্টাইলটি ছিল যেন সাধারণ কোন নাগরিক মার্কিন মধ্যবিত্ত জীবনের বিষয়ে স্বাভাবিক ছন্দে কথাবার্তা বলে চলেছে বা বর্ণনা দিয়ে চলেছে।

'দিস ইজ আমেরিকা' সিরিজের সংবাদচিত্রগুলি ছিল সাদা-কালো ছবিতে তোলা। ছবিগুলি বিষয়ের দিক থেকে ছিল বেশ নতুন ধরনের। গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনাকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র সাধারণ মানুষের ঘটনা-বর্জিত জীবনযাত্রা থেকেই বিষয়কে খুঁজে বের করার মধ্যে সাংবাদিক সুলভ সংবাদ আবিষ্কারের মনোভাবের সঙ্গে মিশে থাকত জীবনকে দেখার শিল্পী সুলভ দৃষ্টি। তবে এই সংবাদচিত্র সাময়িকীটি সম্পর্কে রাষ্ট্র বা সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের সমালোচনার পরিবর্তে, সমর্থনের পক্ষপাতদুষ্টতার মনোভাব প্রকাশ পায় বলে অভিযোগ করা হত।

'দি মার্চ অব টাইম'-এর মত বহুল বাণিজ্যিক সফলতা বা দর্শক না পেলেও 'দিস ইজ আমেরিকা' সংবাদচিত্র সাময়িকীর ইতিহাসে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

উপরোক্ত দুটি বড় নিউজ ম্যাগাজিন ফিল্ম ছাড়াও আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংবাদচিত্র সাময়িকী হল 'দি ওয়ার্ল্ড টুডে' শিরনামের সংবাদচিত্র ধারাবাহিকটি। এই সংবাদচিত্র সাময়িকীটি তৈরি করতেন বিখ্যাত 'নিউইয়র্ক কিনো' (Nykino) দল। এই দলের সদস্য ছিলেন রাজনীতি ও সমাজ বিষয়ে সচেতন বেশ কিছু তরুণ চলচ্চিত্রকার যাদের মধ্যে ছিলেন লিও হারউইৎজ, পল স্ট্রান্ড, আরভিং লারনার প্রভৃতি বেশ কয়েকজন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী তরুণ।

'নিউইয়র্ক কিনো' (১৯৩৫—'৩৭) দলে সদস্যরা হল্যান্ডের বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার জরিস ইভান্সের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'দি ওয়ার্ল্ড টুডে' নাম দিয়ে একটি সংবাদচিত্র সাময়িকী শুরু করেন। সামাজিক ন্যায়বিচার, রাজনৈতিক চেতনা ও মতাদর্শগত বিষয়ে এঁরা সংবাদচিত্র নির্মাণ করতেন যদিও এঁদের লক্ষ্য ছিল সাধারণ মার্কিন নাগরীকবৃন্দ। 'দি ওয়ার্ল্ড টুডে' বেশীদিন চলে নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে উপরোক্ত তিনটি সংবাদচিত্র সাময়িকী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তবে এ ছাড়াও বেশ কিছু ধারাবাহিক অকাহিনীমূলক চলচ্চিত্র নিয়মিত মুক্তি পেত, যার মধ্যে বিখ্যাত মার্কিন পরিচালক ফ্রাংক কাপরা-র 'হোয়াই উই ফাইট' (১৯৪৩-'৪৫) সিরিজ অন্যতম। এই সিরিজের ছবিগুলি ছিল নাৎসী বিরোধী প্রচার মূলক ছবি। যদিও এই সংবাদ নির্ভর অকাহিনীমূলক ছবিগুলি সংবাদচিত্র সাময়িকী ছিল না, তবু 'হোয়াই উই ফাইট' সিরিজের তথ্যচিত্রগুলি ১৯৩০-এর মার্কিন সংবাদচিত্র সাময়িকীর শৈলী দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল।

'দি মার্চ অব দ্য টাইম' 'সংবাদ চলচ্চিত্র সাময়িকী' (News Magazine films)-এর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'নিউইয়র্ক কিনো' (Newyork Kino) বা সংক্ষেপে নাইকিনো (Nykino) গোষ্ঠীর চলচ্চিত্রকাররা 'দি ওয়াল্ড টুডে' নিউজ ম্যাগাজিন ফিল্ম সিরিজ শুরু করে। এই উদ্যোগ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। অল্প কয়েক মাস চলার পরই 'দি ওয়ার্ল্ড টুডে' বন্ধ হয়ে যায়।

'নাইকিনো' (Nykino) গোষ্ঠীর চলচ্চিত্রকাররা বামপন্থি আদর্শে ছবি নির্মাণ করতেন। যদিও 'দি ওয়ার্ল্ড টুডে' সিরিজের ছবিগুলি একটা বিপ্লবী আদর্শ প্রচার করত না। বরং জনপ্রিয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে ছবিগুলি তৈরি করা হত। রাষ্ট্র ও দেশ সম্পর্কে মার্কিন জনগণের বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই এই সংবাদ চলচ্চিত্র সাময়িকী তৈরি হত।

১১.১৫ সংবাদ সাময়িকী ঃ কানাডা ও ব্রিটেন

১৯৩৯ সালে প্রখ্যাত ব্রিটিশ তথ্যচিত্র নির্মাতা জন শ্রীয়ারসন 'ন্যাশান্যাল ফিল্ম বোর্ড অব কানাডা' (NFB) সংস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অন্যান্য তথ্যচিত্রের সঙ্গেই মার্কিন সংবাদচলচ্চিত্র সাময়িকী 'দি মার্চ অব দ্য টাইম'-এর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে কানাডায় দুটি সংবাদ চলচ্চিত্র সাময়িকী চালু করেন। এই দুটি নিউজ ম্যাগাজিন ধারাবাহিক হল 'কানাডা ক্যারিস অন' এবং 'দি ওয়ার্ল্ড ইন অ্যাকশন'।

'কানাডা ক্যারিস অন' ধারাবাহিকটির প্রধান পরিচালক ছিলেন ব্রিটেনের জি.পি.ও. পর্বের অন্যতম তথ্যচিত্রকার শ্রীয়ারসনের সহকর্মী ও শিষ্য স্টুয়ার্ট লেগ। 'কানাডা ক্যারিস অন'-এর বিষয় ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ক্ষুদে কানাডার রণকৌশল, কার্যক্রম, কর্মসূচী ও সাফল্য এবং দেশগঠনে বিভিন্ন কাজকর্ম যেমন পরিবহন, জনসংযোগ, শিল্প বাণিজ্য ও কৃষির উন্নয়নের কথা।

এই সংবাদচলচ্চিত্র সাময়িকীটির নির্মাণ ও প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কানাডার সাধারণ নাগরীকদের যুদ্ধে দেশে ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন ও শিক্ষিত করে তোলা। 'কানাডা ক্যারিস অন' ধারাবাহিকের মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের মানুষের কাছে রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রচার করা এবং একটি জাতীয়তাবাদী মনোভাব গড়ে তোলা। এই ধারাবাহিক সংবাদচলচ্চিত্র সাময়িকীর বিভিন্ন সংখ্যাগুলি দেখানো হত সারাদেশের প্রেক্ষাগৃহ, কমিউনিটি হল, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এবং চার্চ ও ধর্মস্থানগুলিতে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই ছবিগুলির দর্শক ছিলেন দেশের সাধারণ কৃষক, কারখানার শ্রমিক ও যুদ্ধাস্ত্র তৈরির কর্মীবৃন্দ।

১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে জন শ্রীয়ারসন ও স্টুয়ার্ট লেগ আর একটি সংবাদচলচ্চিত্র সাময়িকী শুরু করেন। এই নিউজ ম্যাগাজিনটির নাম ছিল 'দি ওয়ার্ল্ড ইন অ্যাকশন'। ধারাবাহিকটি এপ্রিল ১৯৪২ থেকে জুলাই ১৯৪৫ পর্যন্ত চলেছিল। আন্তর্জাতিক দর্শকদের দিকে লক্ষ্য রেখে 'দি ওয়ার্ল্ড ইন অ্যাকশন' প্রস্তুত করা হত। স্বভাবতই বিষয়ের দিক থেকে এই ধারাবাহিকের বিভিন্ন সংখ্যাগুলি ছিল আন্তর্জাতিক।

'দি ওয়ার্ল্ড ইন অ্যাকশন' জাতীয়তাবাদী প্রচারের পরিবর্তে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বের জন্য একধরনের বিশ্বজনীন রাজনৈতিক নীতির কথা বলত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দর্শকের কাছে বিশেযত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'দি ওয়ার্ল্ড ইন অ্যাকশন' বাণিজ্যিক সাফল্য ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এমনকি রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকেও এই ধারাবাহিকের বিভিন্ন সংখ্যা চলচ্চিত্র সমালোচক ও তরুণ প্রগতিশীল তথ্যচিত্র নির্মাতাদের কাছে শ্রীহিত হয়েছিল।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কানাডার রাজনীতিবিদদের মনে হল যে শ্রীয়ারসন ও লেগ-এর তৈরি 'দি ওয়ার্ল্ড ইন অ্যাকশন'-এর দ্বারা প্রচারিত আন্তর্জাতিকতাবাদ সেদেশের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি হয়ে যাচ্ছে। এই ঘটনার জেরেই সম্ভবত শ্রীয়ারসনকে 'ন্যাশানাল ফিল্ম বোর্ড অব কানাডা'র দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মত ব্রিটেনেও বেশ কয়েকটি সংবাদ চলচ্চিত্র সাময়িকী তৈরি হয়েছিল। তবে আমেরিকায় তৈরী 'দি মার্চ অব টাইম' বা কানাডার 'দি ওয়ার্ল্ড ইন অ্যাকশন' প্রভৃতি পৃথিবী বিখ্যাত নিউজ ম্যাগাজিন সিরিজগুলি বিশেষ জনপ্রিয় হয় নি। এছাড়া মানের দিক থেকে ও ব্রিটিশ সংবাদচলচ্চিত্র-সাময়িকীগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা কানাডার তৈরি নিউজ ম্যাগাজিন ফিল্মের মত উন্নত ছিল না।

বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনে তৈরি অন্যতম প্রধান সংবাদ চলচ্চিত্র সাময়িকী ছিল 'ওয়েলথ অব দি ওয়ার্ল্ড'। এই ধারাবাহিকটির বিষয় ছিল প্রাকৃতিক ও কারখানা থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন সম্পদ উত্তোলন বা তৈরি সম্পর্কিত। তবে 'ওয়েলথ অব দি ওয়ার্ল্ড' সিরিজের ছবিগুলিতে বিষয়ের গভীরতা ও অর্ন্তদৃষ্টির অভাব ছিল। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় এই ধারাবাহিকের অন্যতম ট্রান্সপোর্ট (১৯৫০) ছবিতে দেশের পরিবহন ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলা হয়েছে, তৎকালীন লেবার পার্টির সরকারের পরিবহন নীতির প্রশংসা করা হয়েছে, কিন্তু শ্রমিক অসন্তোষ ও শোষণের কথা বলা হয় নি।

'ওয়েলথ অব দি ওয়ার্ল্ড', ছাড়া ব্রিটেনের অন্যতম প্রধান নিউজ ম্যাগাজিন সিরিজ ছিল 'মডার্ন এজ'।

১১.১৬ টেলিভিশন, সিনেমা ভেরিতে ও সংবাদচিত্র সাময়িকী

১৯৫০-এর দশক থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেল ও টি.ভি. কোম্পানী তৈরি হয় যারা নিয়মিত সংবাদমূলক ধারাবাহিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করার চেষ্টা করতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই প্রথমদিকে সংবাদমূলক ধারাবাহিকগুলি ছিল বিভিন্ন ঘটনা, যেগুলির সংবাদমূল্য বর্তমান সেগুলি দৃশ্য-শ্রাব্য উপস্থাপনা। উল্লেখযোগ্য নাম 'সি ইট নাউ' (see It now) ধারাবাহিক অনুষ্ঠান। এই সংবাদ চলচ্চিত্র সাময়িকীটির মধ্যে 'দি মার্চ অব দ্য টাইম'-এর প্রবল প্রভাব দেখা যেত। ১৯৫১ সালে তথ্যচিত্রকার এডওয়ার্ড আর মারো-এঁর পরিচালনায় ধারাবাহিকটি শুরু হয়।

১৯৫২-'৫৩ এই দুবছর এন.বি.সি (NBC) নামের মার্কিন টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারিত হয় আরেকটি সংবাদ চলচ্চিত্র ধারাবাহিক—'ভিক্ট্রি এ্যাট সি' (Victory At Sea)। এই ধারাবাহিক অনুষ্ঠানটির প্রেরণা ছিল ফ্রাংক কাপ্রো-র 'হোয়াই উই ফাইট' সিরিজের ছবিগুলি।

১৯৬০-এর দশক ছিল মার্কিন টেলিভিশনে প্রচারিত সংবাদচলচ্চিত্র সাময়িকী-এর স্বর্ণযুগ। এ সময় টেলিভিশনকে কেন্দ্র করে সেদেশে সিনেমা ভেরিতে/ডাইরেক্ট সিনেমা আন্দোলন অকাহিনীমূলক ছবির জগতে নতুন ধারার সূচনা করে। মার্কিন সিনেমা ভেরিতে ছবির অন্যতম প্রধান পরিচালক রবার্ট ডিউ ও তার সহকর্মীদের পরিচালনায় ১৯৬১-৬২ সালে 'লিভিং ক্যামেরা' ধারাবাহিক সংবাদচলচ্চিত্র সাময়িকী বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছি। প্রসঙ্গত অকাহিনীমূলক চলচ্চিত্রে ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য **'দি চেয়ার'** এবং **'ক্রাইসিস বিহাইন্ড এ প্রেসিডেন্সিয়াল কমিটমেন্ট'** প্রভৃতি ছবিগুলি 'লিভিং ক্যামেরা' (Living Camera) ধারাবাহিকের অন্যতম ছিল। এই ধারাবাহিকের ছবিগুলি সমসাময়িক বিষয়ের উপর নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোকপাত করত।

'লিভিং ক্যামেরা' ধারাবাহিক তৈরির আগে রবার্ট ডিউ ও তার সহকর্মীবৃন্দ পেনেবকার, জর্জ শ্যুকের, লিকক—এঁরা এ.বি.সি. (A.B.C.) টি.ভি.-এর জন্য 'ক্লোজ আপ!' সংবাদ চলচ্চিত্র ধারাবাহিক নির্মাণ করেন। যদিও এই সিরিজে মাত্র চারটি ছবি তৈরি হয়েছিল, তবু এই ছবিগুলি বিষয় নির্বাচন ও শৈলীর দিক থেকে নিউজ ম্যাগাজিন ফিল্মে অন্য মাত্রা যোগ করেছিল।

১৯৬০-এর দশকের প্রথমদিকের টেলিভিশনে প্রচারিত প্রধান সংবাদচলচ্চিত্র সাময়িকীগুলির অন্যতম ছিল উইলিয়ম জার্সি নির্মিত 'ক্রিয়েটিভ প্রোডাক্টস' শীরনামের একটি নিউজ ম্যাগাজিন ধারাবাহিক। এই সিরিজের অন্যতম বিখ্যাত ছবি **'ম্যানহাটন ব্যাটল গ্রাউন্ড'** (১৯৬৩) যে ছবির বিষয় হল দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই ও সেই সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ।

মার্কিন টেলিভিশনে নিবেদিত চলচ্চিত্র সাময়িকীগুলির বিশেষ কয়েকটি ধারা ছিল। প্রথমত, বিভিন্ন সংবাদচিত্রের ফুটেজ একত্রিত করে সংকলন (compilation) ছবি তৈরি করা। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের উপর জীবনীমূলক ম্যাগাজিন প্রোগ্রাম এবং তৃতীয়ত, নাটকীয় ঘটনা-নির্ভর অনুষ্ঠান। সি.বি.এস. টি.ভি. চ্যানেলে প্রচারিত বিখ্যাত 'অমনিবাস' (Omnibus) সংবাদচলচ্চিত্র সাময়িকী সিরিজের ছবিগুলিতে উপরোক্ত তিন ধরণের শৈলীর সফল মিশ্রণ দেখা যেত। 'অমনিবাস' নিউজ ম্যাগাজিন ধারাবাহিকের পরিচালক ছিল রিচার্ড লিক্ক, যিনি মার্কিন ডাইরেক্ট সিনেমা/সিনেমা ভেরিতে চলচ্চিত্র নির্মাণের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

মার্কিন টেলিভিশনে প্রচারিত ডাইরেক্ট সিনেমা/সিনেমা ভেরিতে শৈলীতে নির্মিত নিউজ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানগুলি সংবাদচলচ্চিত্র সাময়িকী নির্মানের ধারাকে একেবারে অন্যরূপ দেয়। বিষয় বৈচিত্র্য, রাজনৈতিক চেতনা, সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, ক্যামেরা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ইন্টারএ্যাকশন। বিষয়কে দেখার ক্ষেত্রে গভীরতা, তুচ্ছ দৈনন্দিন ব্যাপার থেকে বড় ঘটনা সব বিষয়ে স্বল্প দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি ছিল ডাইরেক্ট সিনেমা/সিনেমা ভেরিতে শৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মোটামুটি ১৯৬০-এর দশক থেকেই সংবাদচলচ্চিত্র সাময়িকী প্রচারের ক্ষেত্রে প্রেক্ষাগৃহের তুলনায় টেলিভিশন অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। ক্রমে নিয়মিত দেখা ও প্রচারের সুবিধা, হাল্কা টি.ভি. ক্যামেরা নিয়ে সর্বত্র বিচরণের সুবিধা ইত্যাদি কারণে সংবাদ চলচ্চিত্র সাময়িকী প্রচারের প্রধান ও বলা যায় অদ্বিতীয় মাধ্যম হয়ে ওঠে টেলিভিশন। এবং মার্কিন টেলিভিশনের ব্যাপক প্রসার ও নতুন নতুন সংবাদমূলক ধারাবাহিক প্রচারের চাহিদার ফলে ১৯৬০-এর দশক থেকে সংবাদ চলচ্চিত্র সাময়িকী নির্মাণের সংখ্যাও অনেক বেড়ে যায়।

১৯৫০ ও '৬০ এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেশী রাষ্ট্র কানাডাতেও আমেরিকান সিনেমা ভেরিতে/ডাইরেক্ট সিনেমা আন্দোলনের প্রভাব দেখা যায়। 'ফেসেস্ অব কানাডা', 'ক্যানডিড আই'—এই দুটি সংবাদচলচ্চিত্র সাময়িকীর ছবিগুলিতে সমকালীন মার্কিন নিউজ ম্যাগাজিন ছবি ও জন গ্রীয়ারসনের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৯৬০-এর দশকে কানাডায় অন্যতম প্রধান ও জনপ্রিয় সংবাদ চলচ্চিত্র ধারাবাহিক ছিল 'চ্যালেঞ্জ ফর চেঞ্জ'। এই সিরিজটি দেশের ন্যাশনাল ফিল্ম বোর্ড (NFB) দ্বারা প্রযোজিত হত। এই সংবাদচলচ্চিত্র সাময়িকীর ছবিগুলি ছিল গ্রীয়ারসন ঘরানার সামাজিক পরিবর্তন, দারিদ্র্য ও উন্নয়ন বিষয়ক। এই সিরিজের বিভিন্ন ছবিগুলি মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল তালিয়া ব্যালেন্টাইন-এর **দ্য থিংস আই ক্যান নট চেঞ্জ**, (১৯৬৬), কালিন লো-এর **চিল্ডেন অব ফোগো আইল্যান্ড**, উইকলি ডান-এর **দ্য ব্যালাড অব ক্রো ফুট**। সরকারি উদ্যোগে নির্মিত হলেও এসব ছবিগুলিতে সরকারের প্রতি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হত প্রায়শই।

১১.১৭ নিউজরিল/নিউজ ম্যাগাজিন ও বিশ্বাসযোগ্যতা

একথা প্রায় ধরেই নেওয়া হয় যে সংবাদদলিলচিত্র / সংবাদচিত্র সাময়িকীতে যে বাস্তব দেখানো হয় তা

নৈর্ব্যক্তিক (objective)। অর্থাৎ বাস্তবে যা ঘটছে তার প্রতিরূপায়ন ঘটছে নিউজরিল বা নিউজ ম্যাগাজিন ফিল্ম। ফলে এই ধরনের ছবিগুলিতে যা দেখানো হয় তা ধ্রুব সত্য ও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য (credible) বলে দর্শক ধরে নেন। মনে করা হয়ে থাকে যে সংবাদমূলক চলচ্চিত্রে বাস্তবকে নিরীক্ষণের ধরণ নিরপেক্ষ।

কিন্তু মজার ব্যাপার হল, যে মাধ্যমটিকে সবচেয়ে নৈব্যক্তিক ও নিরপেক্ষ ভাবা হয় সেই নিউজরিল / নিউজ ম্যাগাজিনই সারা পৃথিবীতেই ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে প্রোপাগান্ডা বা প্রচারের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। আসলে ক্যামেরা সম্পূর্ণ বাস্তবকে কখনই ধরতে পারে না। বরং ক্যামেরা বাস্তবের একটি অংশকে ধারণ করে এবং প্রোপাগান্ডা বা প্রচারধর্মী সংবাদমূলক ছবির ক্ষেত্রে ক্যামেরার সামনের বাস্তবকে এমনভাবে নির্বাচন করা হয় যাতে একটি বিশেষ পক্ষের প্রচারে তা কাজে লাগে। বলা বাহুল্য সে ক্ষেত্রে অপর পক্ষের সমর্থক বাস্তবের অংশ তাকে পরিকল্পিতভাবে বাদ দেওয়া হয়ে থাকে।

কেবলমাত্র তাই নয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এমন অনেক ছবিকে নিউজরিল হিসাবে দেখানো হত যেগুলি আসলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তোলা নয়, অভিনীত ও সাজানো বাস্তব। অনেকক্ষেত্রেই এক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তোলা ছবি অন্য যুদ্ধের ছবি বলেও চালানো হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে স্থান ও কাল (space & time)-এর দিক থেকে দর্শককে ঠকানো হয়েছে। এছাড়া চলচ্চিত্রের বিভিন্ন কলাকুশল ব্যবহার করে ও দর্শককে ঠকানো সম্ভব হয়েছে। বিশেষত মার্কিন নিউজরিলগুলির ক্ষেত্রে এভাবে দর্শক ঠকানো (taking)-এর প্রচুর অভিযোগ পাওয়া যেত।

এরকমই একটি সংবাদদলিলচিত্র হল 'দি ব্যাটল অব স্যান্টিয়াগো বে' যেখানে দেখানো হয় স্প্যানিশ আমেরিকান যুদ্ধে (১৮৯৮) একটি জাহাজ বিপক্ষের গোলার আঘাতে ডুবে যাচ্ছে। এ ছবিকে সত্য ধরে নিয়ে যুদ্ধ ও কুটনীতিক বিতর্ক সৃষ্টি হয়। অনেক বছর পরে স্রষ্টা ই.এইচ আমেটের এই ছবিটিকে ভিটাগ্রাফ সংস্থা সম্পূর্ণ সাজানো বাস্তব ও কাহিনীলব্ধ ছবি বলে স্বীকার করে। ছবিটিতে একটি বাথটবে দুটি খেলনা জাহাজ ও কৃত্রিম ধোঁয়ার সাহায্যে সমুদ্রে জাহাজে গোলা বর্ষন ও জাহাজডুবির ঘটনা দেখানো হয়েছিল।

'দি ব্যাটল অব স্যান্টিয়াগো' একটি ঐতিহাসিক উদাহরণমাত্র, এ ধরনের অসততার ঘটনা সংবাদমূলক ছবিতে পরবর্তিকালেও বিরল ছিল না।

১১.১৮ সারাংশ

সাধারণ দর্শকদের কাছে চলমান দৃশ্য মাধ্যম এবং পরে দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে সংবাদ (news) পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র বিগত একশ বছর যাবৎ বড় ভূমিকা নিয়েছে। যদিও টেলিভিশনের ব্যাপক প্রসারের পর থেকে অর্থাৎ ১৯৬০, '৭০-এর দশক থেকে সংবাদ চলচ্চিত্র (news films) দেখার ও তৈরি করার রেওয়াজ যথেষ্ট কমে গেছে।

বিগত শতাব্দির প্রথম দশক থেকে চল্লিশের দশক অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত সারা পৃথিবী জুড়েই বেশ কয়েকটি যুদ্ধ চলতে থাকে। প্রধানত যুদ্ধের খবর দেখানোর জন্যই প্রথমদিকে সংবাদমূলক ছবি জনপ্রিয় হতে থাকে, বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। সে সময় থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশের প্রথম শ্রেণীর চলচ্চিত্র উৎপাদক সংস্থাগুলি যেমন, ইউনিভার্সাল, বায়োগ্রাফ, এম.জি.এম., টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স, পাথে, গোমো, সাধারণত দশ মিনিটের নিউজরিল (newsreel) তৈরি করে ব্যাপক লাভ করতে থাকে।

তবে নিউরিলের জগতে নতুন যুগের সূচনা হয় ১৯১৭ সালের পর বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নে তৈরি স্বল্পদৈর্ঘ্যের তথ্যমূলক ও সংবাদনির্ভর ছবিগুলির মাধ্যমে। সারা দেশ জুড়ে জিগা, ভের্তভ, এস্থার পাব প্রভৃতি

বড় বড় তথ্যচিত্র নির্মাতারা নিউজরিল তৈরিতে অবদান রাখেন। ১৯৩০-এর পর থেকে অবশ্য সোভিয়েত নিউজরিল তার গৌরব হারায়।

তবে ঐ সময় চলচিত্রে শব্দ সংযোজনের ফলে মার্কিন নিউজরিলের ব্যবসা বাড়তে থাকে। এই অবস্থা চলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত। ১৯৫০-এর দশক থেকে টি.ভি.-র ব্যাপক প্রসারের ফলে সংবাদমূলক ছবির স্বর্ণযুগ শেষ হয়।

দু'ধরনের সংবাদমূলক ছবি প্রধানত দেখা যায় প্রথমটি হল নিউজরিল, দ্বিতীয়টি হল নিউজ ম্যাগাজিন। নিউজরিল যেমন যেকোন ঘটনার উপর তৈরি হয় ও যেকোন সময়ে প্রদর্শিত হয়, নিউজ ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে সাধারণত তা হয় না। নিউজ ম্যাগাজিন ছবিগুলি যদিও সংবাদনির্ভরই হয়, তবে এগুলি সাধারণত নির্দিষ্ট বিষয় (topic)-এর উপর বেশ কয়েকটি ছবির সিরিজ হিসাবে মাসিক বা সাপ্তাহিকভাবে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় অন্তর ধারাবাহিকভাবে মুক্তি পায়। ১৯৩০—'৬০' এই সময়ের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চলচ্চিত্রকাররা সেলুলয়েডে 'নিউজ ম্যাগাজিন' তৈরিতে বেশ সাফল্য লাভ করেন। এগুলির মধ্যে প্রধান দুটি নিউজ ম্যাগাজিন হল 'দি মার্চ অব দ্য টাইম' ও 'দিস ইজ আমেরিকা'। এছাড়া কানাডা ও ব্রিটেনেও নিউজ ম্যাগাজিন নিয়মিত তৈরি হত ও মুক্তি পেত।

সংবাদমূলক ছবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিৎ তথ্যনিষ্ঠতা ও সাংবাদিকসুলভ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখা। অবশ্য সবক্ষেত্রে এই নীতিবোধ যথাযথভাবে মানা হয় এমন কথা সর্বত্র জোর দিয়ে বলা যায় না।

১১.১৯ অনুশীলনী

'ক' (নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী)

সঠিক মিল খুঁজুন ঃ—

১. নাইকিনো	পর্যায়ক্রমিক মুক্তি
২. ভের্তভ	জাল সংবাদদলিলচিত্র
৩. নিউজ ম্যাগাজিন	ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নিউজরিল
৪. দিল্লি দরবার	থ্রি সঙস্ এ্যাবাউট লেনিন
৫. ফিল্মস্ ডিভিশন অব ইন্ডিয়া	১৯৫২
৬. সন্টিয়াগো বে	দি ওয়ার্ল্ড টুডে

'খ' (স্বল্প দৈর্ঘ্যের উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী)

১. নিউজ ম্যাগাজিন কাকে বলে? — সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

২. ব্রিটিশ ও কানাডিয়ান নিউজ ম্যাগাজিন। — টীকা লিখুন।

৩. নিউজরিল ও প্রচার (Propagonda) এর সম্পর্কে উদাহরণসহ লিখুন।

৪. নিউজ ম্যাগাজিনের উপর সিনেমা ভেরিতের প্রভাব আলোচনা করুন।

৫. ভারতীয় নিউজরিলে ফিল্মস ডিভিশনের উদ্যোগ। —টীকা লিখুন।

'গ' (দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী)

১. সোভিয়েত নিউজরিল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২. মার্কিন নিউজ ম্যাগাজিন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করুন।

৩. মার্কিন নিউজরিলের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৪. নিউজরিলের সাধারণ বিষয়গুলি কী কী?
নিউজরিল বা নিউজ ম্যাগাজি ছবিগুলি কী সম্পূর্ণ অর্থে নৈর্ব্যক্তিক ও সত্য? — আলোচনা করুন।

১১.২০ গ্রন্থপঞ্জী

১. কিনো ঃ এ হিস্ট্রি অব রাশিয়ান এন্ড সোভিয়েত ফিল্ম, জয় লিজা, প্রিন্সটন ইউনির্ভাসিটি প্রেস, নিউজার্সি। তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৩।

২. দি আমেরিকান নিউজরিল ১৯১১—১৯৬৭ ঃ রেমন্ড ফিল্ডিং, ইউনিভার্সিটি অব ওকলাহোমা প্রেস। নর্ম্যান, ১৯৭২।

৩. মাস কমিউনিকেশন ইন ইন্ডিয়া ঃ কেবল জে. কুমার, জেইকো পাবলিকেশানস্‌, নিয়াদিল্লী, ১৯৮৯।

৪. নন-ফিকশন ফিল্ম এ ক্রিটিক্যাল হিস্ট্রি ঃ রিচার্ড বারসাম, ইন্ডিয়ানা ইউনির্ভাসিটি প্রেস, ব্লুমিংটন, রিভাইসড্‌ এডিশন, ১৯৯২।

একক ১২ ☐ তথ্যচিত্র-সিনেমা ভেরিতে ডাইরেক্ট সিনেমা

গঠন

১২.০ তথ্যচিত্র-সিনেমা ভেরিতে / ডাইরেক্ট সিনেমা
১২.১ উদ্দেশ্য
১২.২ প্রস্তাবনা
১২.৩ তথ্যচিত্র ঃ সংজ্ঞা ও দৃষ্টিভঙ্গি
১২.৪ তথ্যচিত্র ঃ একটি প্রকাশভঙ্গি
১২.৫ তথ্যচিত্র ঃ বিভিন্ন শৈলী
১২.৬ তথ্যচিত্র ঃ বিষয় বৈচিত্র
১২.৭ তথ্যচিত্র ঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
১২.৭.১ তথ্যচিত্রের সাধারণ ইতিহাস
১২.৭.২ তথ্যচিত্র ঃ ভারতে
১২.৭.৩ তথ্যচিত্র ঃ পরবর্তী যুগ
১২.৮ দি ফিল্মস ডিভিশন অব ইন্ডিয়া ও ভারতীয় তথ্যচিত্র
১২.৯ ডাইরেক্ট সিনেমা / সিনেমা ভেরিতে
১২.১০ ডাইরেক্ট সিনেমা—সিনেমা ভেরিতে ও টেলিভিশন
১২.১১ জঁ রুশ ও সিনেমা ভেরিতে
১২.১২ বাণিজ্য সংস্থা / প্রতিষ্ঠান বিষয়ক তথ্যচিত্র
১২.১৩ সারাংশ
১২.১৪ অনুশীলনী
১২.১৫ গ্রন্থপঞ্জী

১২.১ উদ্দেশ্য

এই একক থেকে জানা যাবে ঃ—

- তথ্যচিত্রের সংজ্ঞা ও চলচ্চিত্র মাধ্যমে অন্যতম প্রকাশভঙ্গি হিসাবে তথ্যচিত্রের গুরুত্ব।
- দেশ ও বিদেশের তথ্যচিত্রের ইতিহাস।
- পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র আন্দোলনে তথ্যচিত্রের ভূমিকা।
- দেশ -বিদেশের বিশিষ্ট তথ্যচিত্র নির্মাতাদের অবদান।
- চলচ্চিত্রের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে তথ্যচিত্রের সম্পর্ক।

- বিভিন্ন শৈলীর তথ্যচিত্র সম্পর্কে গঠনগত ও বৈশিষ্ট্যগত আলোচনা ও তাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব।
- তথ্যচিত্রের অন্যতম প্রধান শৈলী ও আঙ্গিক হিসাবে সিনেমা ভেরিতে বা ডাইরেক্ট সিনেমার বিশেষ অবদান ও প্রভাবের কথা ইত্যাদি।

১২.২ প্রস্তাবনা

চলচ্চিত্রের ইতিহাস শুরু হয়েছিল তথ্যচিত্র তৈরির মধ্যে দিয়ে । ক্যামেরার সামনের বাস্তবকে ধারণ করাকে তারপর থেকেই যেন চলচ্চিত্র মাধ্যমের অন্যতম প্রধান প্রয়োগ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এভাবে কাহিনী বর্জিত অর্থাৎ অকাহিনী মূলক, নৈবাক্তিক বাস্তকা নির্ভর ছবিই হয়ে ওটে তথ্যচিত্র । অনেকে যাকে তথ্যচিত্র না বলে দলিলচিত্র বলে থাকেন। তথ্যচিত্রের মধ্যে যেমন নতুন তথ্য জ্ঞাপন চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্ঘাটনের উত্তেজনা থাকে তেমনি তথ্যচিত্রের দায় থাকে সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞনি , দর্শন সম্পর্কেও । তথ্যচিত্র তাই অনেকটাই যেন গবেষণা মূলক চলচ্চিত্র ধারা। কাহিনীমূলক ছবি (film) -এর মতই তথ্যচিত্র ও চলচ্চিত্রের ইতিহাসকে সম্মৃদ্ধ করেছে। বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৯ শে বিশের দশকের বৈপ্লবিক আদর্শে অনুপ্রাণিত তথ্যচিত্র থেকে শুরু করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রসার লাভ করা সিনেমা ভেরিতে/ ডাইরেক্ট সিনেমা পর্যন্ত এক বিপুল অধ্যায়ের আলোচনা করতে হয় তথ্যচিত্র বিষয়ে কথা বলতে গেলে।

১২.৩ তথ্যচিত্র: সংজ্ঞা ও দৃষ্টিভঙ্গি

বিষয়ের নিরিখে চলচ্চিত্র সাধারণত দু-ধরনের হতে পারে। এক, বাস্তব-তথ্যের - প্রত্যক্ষ চিত্রগ্রহনের দ্বারা যে চলচ্চিত্র তৈরি হয় তাকে সাধারনত বলা হয় তথ্যচিত্র। দুই, কল্পিত- কাহিনীর থেকে যে চলচ্চিত্র নির্মান করা হয় তাকে বলা হয়ে থাকে কাহিনীচিত্র। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ তথ্যচিত্রের ক্ষেত্রে যে স্থাল- কাল ও পাত্র/ চরিত্র ছবির বিষয়ের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয় তা বা তারা প্রত্যক্ষভাবে ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকে। অন্যদিকে কল্পিত- কাহিনীমূলক ছবির ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র সাধারণত হয় অভিনয় প্রধান।

একটি কথা এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে বাস্তব-ঘটনা-নির্ভর কাহিনী হলেই কিন্তু তথ্যচিত্র হবে না। তথ্যচিত্রে ঘটনা বা বাস্তবের প্রত্যক্ষ ছবি গ্রহন করতে হবে। অর্থাৎ তথ্যচিত্র হবে বাস্তবের প্রামান্য নথি। প্রায় প্রত্যেক বছর গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বা অন্যসময় আমরা দূরদর্শনে রিচার্ড অ্যাটনবরো পরিচালিত **'গান্ধী'** দেখি। ছবিটি নির্মিত হয়েছে গান্ধিজীর জীবনের ঘটনা নির্ভর করে। কিন্তু এছবি তথ্যচিত্র নয়, কারণ এখানে সমগ্র কাহিনী অভিনীত হয়েছে কাল্পনিক সংলাপ নির্ভর করে। বেল কিংস্লে অভিনয় করেছেন গান্ধিজীর ভূমিকায়, প্রকৃত ব্যক্তিটির উপস্থিতি নেই এ ছবিতে।

অন্যদিকে যদি গান্ধিজীর উপর একটি তথ্যচিত্র তৈরি করতে হয় তবে সেইসব স্থানে যেতে হবে যেখানে তাঁর প্রামান্য স্মারক রয়েছে, সেইসব ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে হবে যারা বাস্তবে গান্ধিজীর সঙ্গে কোনভাবে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া প্রকৃত ব্যক্তিটিকে যখন আর সশরীরে পাওয়া যাবে না তখন ক্যামেরার সামনে তাঁর চেহারা ও শারীরিক উপস্থিতির পরিবর্তে ব্যবহার করতে হবে গান্ধিজীর স্থিরচিত্র ও তাঁর জীবৎকালে তোলা সংবাদ চলচ্চিত্র গুলির অংশবিশেষ।

অবশ্য তথ্যচিত্রেও কদাচিৎ অভিনয় ব্যবহার করা হয়। যেমন , সত্যজিৎ রায় পরিচালিত **'রবীন্দ্রনাথ'** তথ্যচিত্রে ছবি বিশ্বাস একটি দৃশ্যে কবিগুরুর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। অথবা তথ্যচিত্রের প্রবাদপুরুষ রবার্ট ফ্ল্যাহার্টির **' নানুক অব দ্য নর্থ'** ছবিতে নানুক নামের এসকিমো গোষ্ঠীর এক ব্যক্তিকে তার নিজের ভূমিকাতেই অভিনয় করানো হয়েছে। তবে এসব ক্ষেত্রে বাস্তবের ঘটনা হুবহু অভিনীত হয়, কল্পনার স্থান থাকে না।

তথ্যচিত্র সাধারণত আখ্যান-নির্ভর নয়। যদিও তথ্যচিত্রের মধ্যেও একটা গঠন থাকে। তবে সেটা স্বাভাবিক অর্থে

আখ্যান নয়। তথ্যচিত্র যে চিত্রপ্রদন করে তাতে বাস্তব উপস্থাপিত হয় যেমন -আছে -তেমন ভাবেই (Life-as-it-is) তবে এ ধরনের চলচ্চিত্রকে কেবল মাত্র বহির্বাস্তবের অর্থাৎ দৃশ্যমান ঘরবাড়ি, পথঘাট, উদ্ভিদ, জীবন ইত্যাদির সরল চিত্রায়ণ বলা যায় না। তথ্যচিত্রের পরিচালককে নন্দন তত্ত্ব ও বিষয়ের আবেদন অনুসারে উপাদানগুলিকে নির্বাচন ও সজ্জিত, করে নিতে হয়। উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে রবার্ট ফ্ল্যাহার্টির তথ্যচিত্র নির্মানের পদ্ধতি থেকে বেশীরভাগ তথ্যচিত্রের ক্ষেত্রে ফ্ল্যাহার্টির বিষয় ছিল প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষের জীবনযাত্রা। তথ্যচিত্র নির্মানের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তিনি দীর্ঘসময় বাস করতেন সেই সব মানুষের সঙ্গে, অংশগ্রহন করতেন তাদের জীবন যাত্রায়। নির্বাচন করতেন তথ্যচিত্র নির্মানের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি। চিত্রগ্রহনের সময় ক্যামেরা কোন, ফ্রেম ও কম্পজিশনে সৃষ্টি করতেন নন্দন তাত্ত্বিক সৌন্দর্য্য। এবং সবশেষে সম্পাদনার মাধ্যমে সজ্জিত করতেন ঘটনা বা উপাদানগুলিকে।

প্রসঙ্গত 'ডকুমেন্টারী' (বা তথ্যচিত্র) কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন প্রখ্যাত ইংরেজ তথ্যচিত্রকার জন গ্রিয়ারসন। তিনি এই শব্দটি ব্যবহার করেন সতীর্থ রবার্ট ফ্ল্যাহার্টি-র একটি তথ্যমূলক ছবি মোয়ানা (১৯২৫) সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে। গ্রিয়ারসন মনে করতেন ডকুমেন্টারী বা তথ্যচিত্র এমন এক ধরনের চলচ্চিত্র নির্মান পদ্ধতি যাকে বলা যেতে পারে" চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশনা" (Cinematic publication), যা আবার তাঁর মতে "বাস্তবের যথাযথ কিন্তু সৃজনশীল উপস্থাপনা।"

যাই হোক বেশীর ভাগ তথ্যচিত্র নির্মনতার ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় যে তাঁরা শৈলীর থেকে বিষয়ের দিকে অধিক মনযোগী। তথ্যচিত্র নির্মাতারা সহজ সরলভাবে তাদের-ছবি নির্মান করেন কারণ এখানে দর্শকের সঙ্গে তাৎক্ষনিক সংযোগ (Communication) তৈরি করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

তথ্যচিত্র নির্মাতার বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন। একটি ভালো তথ্যচিত্র নির্মানের জন্য নিম্নলিখিত বিষয় গুলি পরিচালকের মাথায় রাখা উচিৎ ঃ—

এক, তথ্য অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি— বিষয় নির্বাচন ও ছবির উপাদান গুলির যথাযথ অনুসন্ধান করা।

দুই, অনুপুঙ্খ চিত্র-নির্মান-পূর্ব গবেষণা– পরিসংখ্যানগত ও বৈজ্ঞানিক বা সমাজতাত্ত্বিক গবেষনার দ্বারা ছবি তৈরির আগেই বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত হওয়া।

তিন, ন্যূনতম বিষয়ীধর্মীতা– পরিচালকের ব্যক্তিগত আবেগ বা ব্যক্তিগত সংস্কার/মনোভাবের প্রভাব থেকে ছবিকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখা।

চার, বিষয়মুখীনতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা— তথ্যচিত্রকে হতে হবে কঠোর ভাবে তথ্য ও ঘটনা নির্ভর এবং প্রামান্য।

১২.৪ তথ্যচিত্র: একটি প্রকাশভঙ্গি

যেহেতু একটি মাধ্যম হিসাবে বাস্তবকে অনুপুঙ্খরূপে ধারন (Record) করার ক্ষমতা চলচ্চিত্রের সহজাত তাই তথ্যচিত্রকে কেবলমাত্র চলচ্চিত্রের একটি আঙ্গিক হিসাবে বিচার না করে বরং বাস্তবকে ধারণ ও উপস্থাপনের অন্যতম কৌশল হিসাবে বিবেচনা করা উচিৎ। ফরাসী চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক আন্দ্রে বাজাঁর মতে, যেহেতু চলচ্চিত্র বাস্তবের সবচেয়ে ভালো প্রতিরূপায়ন ঘটাতে সক্ষম তাই এই মাধ্যমটির উচিৎ বাস্তবের নথি হয়ে ওটা। সেদিক থেকে দেখলে তথ্যচিত্র আসলে বাস্তবের দলিল (documentation)চলচ্চিত্রের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখবো যে প্রথম চলচ্চিত্রটি আসলে একটি দলিলচিত্র, যে ছবিতে চলচ্চিত্রের প্রথম প্রদর্শক ল্যুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় কারখানা থেকে একদল শ্রমিকের বেরিয়ে আসার ঘটনাটিকে সেলুলয়েডে বন্দি করেন। চলচ্চিত্র ক্রমে তথ্যচিত্র ও কাহিনী চিত্র দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেও, বাস্তবের দলিলকে ধারন করার কাজটিতে তথ্যচিত্রের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একথা অনিস্বীকার্য।

তথ্যচিত্রের উপাদান যেখানে প্রতিদিনের জীবনযাত্রা সেখানে কহিনীচিত্রের বিষয় হল কল্পিত -আখ্যান। কিন্তু আধুনিককালে, কাহিনীচিত্র ও তথ্য/ দলিলচিত্র ছাড়াও একটি আঙ্গিকের জন্ম হয়েছে যাকে বলা যায় দলিল- কাহিনী চিত্র। যেখানে

বাস্তবের দলিল বা তথ্য সরাসরি আখ্যানের গঠনে উপাদন হিসাবে প্রবেশ করে। ফরাসী চলচ্চিত্রের ১৯৬০-এর দশকের এর -তরঙ্গের অন্যতম প্রধান চলচ্চিত্র নির্মাতা ও রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রবক্তা জঁ লুক গোদার -এর ভাষায়, বাস্তবের দলিল বা তথ্যকে চলচ্চিত্রের আখ্যানে স্থান দিতে না পারলে এমনকি কাহিনীচিত্রও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, কিউবার বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক টমাস আলেয়ার ছবি 'মেমারিজ্ অব আন্ডারডেভ-লপমেন্ট'- এর কথা বলা যেতে পারে যেখানে বারংবার কাহিনীর মাঝে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে ঢুকে পড়ে তথ্যচিত্রের অংশ (footage)। এই ধরনের প্রকাশভঙ্গিটিকে বলা হয় দলিল-বাস্তববাদ। প্রসঙ্গত কাহিনীচিত্রে উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ছিলেন ১৯৪০ ও ৫০ - এর দশকের ইটালীর নব বাস্তববাদী চলচ্চিত্রকাররা। তাঁদের ছবিগুলিতে যুদ্ধ পরবর্তি রোম ও সে শহরের বিদ্ধস্ত জীবনের প্রত্যক্ষ ছবি কাহিনীর গঠনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এছাড়া আমাদের স্মরনে থাকতে পারে যে সত্যজিৎ রায়ের প্রথম কাহিনী ছবি পথের পাঁচালী (১৯৫৫) কান চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ 'মানবিক দলিল' (human document) হিসাবে পুরস্কৃত হয়।

সুতরাং, একথা বলা যায় যে চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তথ্যচিত্র বা দলিল চিত্র কেবলমাত্র একটি আঙ্গিক নয় বরং বাস্তবকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অন্যতম শক্তিশালী এবং প্রয়োজনীয় প্রকাশভঙ্গি (mode of address)।

১২.৫ তথ্যচিত্র: বিভিন্ন শৈলী

কাহিনী চিত্রের মত তথ্যচিত্রের ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন ধরনের শৈলী দেখতে পাওয়া যায়। বিষয়ের ব্যাখ্যা, উপস্থাপনার ভঙ্গির উপর নির্ভর করে তথ্যচিত্রের ইতিহাসে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের শৈলীর প্রাধান্য দেখা গেছে। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র সমালোচক, তাত্ত্বিক ও প্রাবন্ধিক বিল নিকল্‌স্ চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তথ্যচিত্রগুলিকে নির্মান শৈলীর ভিত্তিতে প্রধান চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

প্রথমত, প্রত্যক্ষ প্রেরন শৈলী (direct address style)। এই শৈলী ধারা ভাষ্য প্রধান। দৃশ্যের থেকে এখানে বর্ণনার ভূমিকা বেশি। ভাষ্যকার বিষয়ের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেন। গ্রীয়ারসন ও ফ্ল্যাহার্টির সবাক তথ্যচিত্রগুলিতে এই শৈলীর ব্যবহার লক্ষ্যনীয়। উদাহরণ স্বরূপ ফ্ল্যাহার্টি — গ্রিয়ারসনের যৌথভাবে তৈরি 'ইনস্ট্রাষ্ট্রিয়াল ব্রিটেন' (১৯৩৩) ছবিতে আবেগময় ভাষ্য ও উজ্জ্বল সঙ্গিতের ব্যবহারে দৃশ্যের তুলনায় বর্ণনা ও দ্রাব্য প্রধান হয়ে উঠেছে। গ্রিয়ারসনের ধারার অন্যতম তথ্যচিত্রকার বেসিল রাইট ও হ্যারী ওয়াটের ' নাইটমেল' এ ধরনের ছবি। যেখানে কাব্যিক ধারাভাষ্য যেন দৃশ্যের থেকে বেশী আর্কষনীয় হয়ে উঠেছে। এ ধরনের শৈলীর প্রেরণা এসেছিল রোমান্টিক মানবতাবাদের আদর্শ থেকে।

দ্বিতীয়, পর্যবেক্ষন শৈলী (observational style)-এ ক্ষেত্রে পরিচালক বিষয়কে বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব নেন না। ক্যামেরা কেবলমাত্র বাস্তবকে নিস্পৃহভাবে পর্যবেক্ষন করে। ডাইরেক্ট সিনেমা / সিনেমা ভেরিতে শৈলীর ছবিগুলি এ ধরনের তথ্যচিত্রের উদাহরণ, যেমন মার্কিন তথ্যচিত্রকার লিক্ক ও পেনেবেকারের তৈরি ছবি ' দি চেয়ার', যেখানে একজন দন্ডাজ্ঞপ্রাপ্ত কৃষ্ণাঙ্গ বন্দি ইলেকট্রিক চেয়ারে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন। ক্যামেরা যেন তাকে কেবল লক্ষ্য করে যায়, তার কথা শোনে । পরিচালক হস্তক্ষেপ করছেন না, যেন ক্যামেরা বিষয়কে কেবল অবসার্ভ বা পর্যবেক্ষন করে চলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপ ও আমেরিকায় এ ধরনের ছবির ধারার জন্ম হয়। বাস্তবের সঙ্গে সরাসরি ও বিষয়মুখী সম্পর্ক স্থাপন এই পদ্ধতির আদর্শগত লক্ষ্য, যেখানে পরিচালকের মধ্যস্থতাকে একধরনের পক্ষপাত মনে করা হয়।

তৃতীয়, আত্ম-প্রতিবর্তি শৈলী (self-reflexive style)। এক্ষেত্রে তথ্যচিত্রের গঠনকে এমনভাবে তৈরি করা হয় যে যে ছবিটি তৈরির পদ্ধতি ও আদর্শের প্রতি সচেতন ভাবে নির্দেশ করা হয় এবং এর জন্য বিভিন্ন আঙ্গিকগত কৌশল গ্রহন করা হয়। বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত রাশিয়ার অন্যতম প্রধান তথ্যচিত্র নির্মাতা জিগা ভের্তভের ছবিতে এ ধরনের শৈলী দেখতে

পাওয়া যায় । ভের্তভের ' ম্যান উইথ দ্য মুভী ক্যামেরা '(১৯২৯) তথ্যচিত্রে দ্বিতীয় ক্যামেরায় দেখা যায় প্রধান ক্যামেরা ম্যান মিখাইল কাউফম্যান তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে বাস্তবের ছবি গ্রহন করছেন, — অথবা কোথাও দেখানো হচ্ছে যে ক্যামেরা চালনা বা ফিল্ম এডিটিং-ও একধরনের শ্রমিকবৃত্তি। এভাবে ছবির মধ্যে চলচ্চিত্রায়নের পদ্ধতি এবং চলচ্চিত্রকারের আদর্শগত অবস্থানের ইঙ্গিত করা আত্ন-প্রতিবর্তি শৈলীর নিদর্শন।

চতুর্থ, সাক্ষাৎকার মালা শৈলী (string-of-interviews)। সমগ্র তথ্যচিত্রটি গঠিত হয় সাক্ষাৎকার, মন্তব্য বা ক্যামেরার সামনে জনপ্রতিক্রিয়াগুলিকে মালার মত গেঁথে। এই শৈলীটি টেলিভিশনের ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত পন্থা। মার্কিন তথ্যচিত্র নির্মাতা এমিল ডি আন্তোনিও এই শৈলীর প্রধান প্রবক্তা । তাঁর কথায় "ইন্টারভিউ নেভার লাইস" এবং তিনি বলতেন একজনের পক্ষে সত্য দর্শন সম্ভব নয়, ঘটনা /বাস্তব আসলে কি তা অনেকের মতামতের সমাহারে প্রকাশ পেতে পারে। যেমন ভিয়েতনামের সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে মার্কিন আমলা, রাজনীতিকদের চূড়ান্ত অজ্ঞতা বিষয়ে ডি. আঞ্জেলিও-র ছবি 'ইন দ্য ইয়ার অব দ্য পিগ' (১৯৬৯)। তথ্যচিত্র বেশীরভাগই বিভিন্ন সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ সঙ্গে যোগ হয়েছে ভিয়েতনাম থেকে সংগৃহিত ফুটেজ এবং কয়েকটি স্থিরচিত্র । ১৯৬০- এর দশকের শেষদিকে এবং ১৯৭০ -এর দশকে এই শৈলীটি বিশেষত আমেরিকায় বহুল প্রচলিত হয়ে ওঠেছিল। টি.ভি.তে অনেকক্ষেত্রেই বিতর্কিত বিষয় নির্ভর সাক্ষাৎকার মূলক তথ্যচিত্রে এধরনের শৈলীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

১২.৬ তথ্যচিত্র: বিষয় বৈচিত্র্য

বিল নিকল্স কথিত উপরোক্ত বিভিন্ন ধরনের-শৈলী ছাড়াও বিষয়ের বিভিন্নতার-উপর নির্ভর করে তথ্যচিত্রগুলিকে বেশ কয়েকটি গোত্র (genre)-এ ভাগ করা যেতে পারে। একটি নির্দিষ্ট গোত্র বা জঁর (genre) বলতে একধরনের ছবিকে বোঝায় যে গুলির মধ্যে বিষয়গত মিল রয়েছে। যদিও গোত্র কথাটি আখ্যানমূলক ছবির-কথা বোঝায় যেখানে আখ্যানের বিষয় ও আখ্যান-বর্ণনার ক্ষেত্রে একটি গোত্রের সমস্ত ছবিই কিছু সাধারণ সূত্র মেনে চলে। যেমন, প্রায় প্রতিটি রহস্যমূলক ছবির ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রথমে অপরাধ সংগঠিত হয়, তারপর গোয়েন্দা তদন্ত করতে থাকে এবং শেষে অপরাধের কিনারা হয়। এই ধরনের ছবির গোত্রকে বলা হয় রহস্য-গোয়েন্দা(detective) জঁর (genre)।

যদিও তথ্যচিত্রের ক্ষেত্রে আখ্যানের নির্দিষ্ট কোন সাধারন সূত্র বা প্রচলিত ধারা (pattern) নেই , তবু বিষয়ের-উপর নির্ভর করে ডকুমেন্টারী ছবিগুলিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—

১. **সামাজিক সমস্যা:-** সমাজের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়, যেমন শিশুশ্রম, মহিলাদের সমস্যা, শ্রমিকদের সমস্যা অথবা পানীয় জল ,বাসস্থান সমস্যা উন্নয়ন ও পুর্নগঠন ইত্যাদি বিষয়কে অবলম্বন করে এধরনের ছবিগুলি হতে পারে। এছাড়া আর্থ-সামাজিক বিষয় ও এই গোত্রের অন্তভূক্ত। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ব্রিটিশ তথ্যচিত্রকার এলটন ও আনস্টি নির্মিত **হাউসিং প্রব্লেম** বা ইতালীয় পরিচালক পাওলো পাসোলিনির **লাভ মিটিং** অথবা বেসিল রাইট-এর **কার্গো ফ্রম জামাইকা** ইত্যাদি।

২. **রাজনৈতিক বিষয়:-** রাজনীতি সরাসরি তথ্যচিত্রের বিষয় হতে পারে। বিশেষত ১৯৬০ ও ৭০ -এর দশকের মার্কিন তথ্যচিত্রগুলির মধ্যে বেশ কিছু ছবি প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনৈতিক সমস্যা, ও আদর্শগত সমস্যা নিয়ে নির্মিত। যেমন , রবার্ট ডিউ -র **ইয়াংকি নো** ছবির বিষয় ছিল দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সচেতনতার চিত্র। অথবা অতি পরিচিত **ব্যাটল অব চিলি** অথবা এদেশের আনন্দ পট্টবর্ধনের ছবি **ইন দ্য নেম অব গড্** যেখানে এদেশের একটি বড় দাঙ্গার রাজনীতির ভূমিকার কথা তুলে ধরা হয়েছিল। ঋত্বক ঘটকের তথ্যচিত্র **আমার লেলিন** রাজনৈতিক তথ্যচিত্রের ভালো উদ্বাহরণ।

৩. **বৈজ্ঞানিক বিষয়:-** বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি, শল্যচিকিৎসা, প্রযুক্তি ও জ্যোর্তিবিজ্ঞান বিষয়ে

তথ্যচিত্রের সংখ্যা কম নয়। যেমন, **ব্রিটিশ** তথ্যচিত্রকার ইভেলিন স্পাইস-এর ছবি **ওয়েদার ফোরকাস্ট**, যেখানে আবহাওয়া অফিসের কর্মকান্ড দেখানো হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্টে, যেখানে চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত (clinical) বিষয়ে বেশ কিছু ছবি হয়েছে।

৪. **শিক্ষা/ জনশিক্ষা/ প্রশিক্ষন-মূলক তথ্যচিত্র**:- প্রথাগত ও অপ্রথাগত শিক্ষা , বয়স্ক শিক্ষা, কৃষি সম্পর্কে শিক্ষাদান, গনজ্ঞাপনের জন্য নির্মিত তথ্যচিত্র, গণসচেতনা তৈরির জন্য প্রচার তথ্যচিত্র বা বিভিন্ন ধরনের পেশাদারি বা সেনাবাহিনীর জন্য প্রশিক্ষণ মূলক তথ্যচিত্র এই বিষয়ের অন্তর্গত। যেমন, ভারতে জাতীয় দূরদর্শন উচ্চশিক্ষা প্রচারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রয়োজনায় নিয়মিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর শিক্ষামূলক ছবি করে থাকে। ভারতের ফিল্মস্ ডিভিশনের উদ্যোগে জনশিক্ষা ও জনসচেতনতা প্রসারের জন্য বেশ কিছু তথ্যচিত্র তৈরি হয়েছিল, যেগুলি একসময় প্রেক্ষাগৃহে মূল ছবি শুরুর আগে বাধ্যতামূলকভাবে দেখানো হত।

৫. **ভ্রমন/অভিযান বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিষয়ক তথ্যচিত্র**:- বিভিন্ন অভিযান যেমন আন্টার্কটিকা অভিযান, এভারেস্ট অভিযান, আফ্রিকা বা বিভিন্ন স্থানে ভ্রমন-ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কিছু তথ্যচিত্র নিয়মিত তৈরি হয়। যেমন জে. বি.নোয়েল -এর **দ্য এপিক অব এভারেস্ট** বা চেরী কিয়েরটনের **রুশভেল্ড ইন আফ্রিকা**, সম্প্রতি বাঙালী পরিচালক গৌতম ঘোষ ইউরোপ থেকে চিন পর্যন্ত ঐতিহাসিক পথের উপর নির্মান করেছেন **সিল্ক রুট** নামের একটি ছবি।

৬. **যুদ্ধ বিষয়ক তথ্যচিত্র** :- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বেশ কিছু যুদ্ধবিষয়ক ছবি তৈরি হয়েছিল। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি বিখ্যাত ছবি **ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার** বা ডাচ পরিচালক জরিস ইভন্সি -এর **দি ব্যাটল অব চায়না**। মার্কিন পরিচালক জন হুস্টোনের **দি ব্যাটল অব সান পিয়েত্রো** . বলিউডের কাহিনী চিত্রকার জন ফোর্ডের তথ্যচিত্র **দ্য ব্যাটল অব মিডওয়ে** যুদ্ধ বিষয়ক জনপ্রিয় ছবির উদাহরণ।

৭. **ঐতিহাসিক ও সংগ্রহমূলক (archeival) তথ্যচিত্র**:- ঐতিহাসিক স্থান, সৌধ, ধ্বংসাবশেষ, কোন স্মরনীয় ঘটনার তথ্যচিত্রায়ন এধরনের ছবির বিষয় হতে পারে– যেমন , পূর্ব ইউরোপের কুখ্যাত নাৎসী কারাগার অসভিৎস্ কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প বিষয়ে ফরাসী পরিচালক অ্যালা বেনেঁর ছবি **নাইট এন্ড ফগ**, প্রাচীন ধংসপ্রাপ্ত দক্ষিন আমেরিকার মায়া, 'ইনকা'ও 'অ্যাজান্টেক' সভ্যতা নিয়ে বেশ কয়েকটি তথ্যচিত্র নির্মিত হয়েছে। বাঙালী তথ্যচিত্র কার হরিসাধন দাশগুপ্ত এ ধরনের বিষয় নিয়ে বেশ কয়েকটি ছবি নির্মান করেন তার মধ্যে অন্যতম হল **কোর্নাক: দ্য সান টেম্পেল**।

৮. **জীবনীমূলক তথ্যচিত্র**:- বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের জীবন ও কর্মকে বিষয় করে বহু তথ্যচিত্র নির্মিত হয়েছে। যেমন, হরিসাধন দাশগুপ্ত-এর **বড়ে গোলাম আলি** তথ্যচিত্রের বিষয় বিশিষ্ট শাস্ত্রীয় সংগীতঞ্জ বড়ে গোলাম আলির জীবন ও কর্ম। সত্যজিৎ রায় তৈরি করেছেন রবীন্দ্রনাথ বা চিত্রশিল্পী বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়ের জীবন, কর্ম ও শিল্পবোধ বিষয়ে তিনি নির্মান করেন **দ্য ইনার আই**।

৯. **জাতি বিষয়ক (ethnog raphic) তথ্যচিত্র**:- বিভিন্ন জনজাতি ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষের জীবনযাত্রা, সামাজিক আচার ধর্মাচরন (rituals) প্রভৃতি বিষয়ে বিখ্যাত তথ্যচিত্রের অভাব নেই। রবার্ট ফ্লাবার্টি-র এসকিমোদের নিয়ে **নানুক অব দ্য নর্থ** ফরাসী সিনেমা ভেরিতে ছবির অন্যতম প্রধান ব্যক্তি জঁ রুশের **লিটল বাই লিটল** ঋত্বক অটকের **ওঁরতি** বা **আদিবাসী য়োঁ কা জীবন স্রোত** প্রভৃতি ছবির কথা বলা যায়।

১০. **পরিবেশ বিষয়ক তথ্যচিত্র**:- বাস্তুতন্ত্র, অরন্যজীবন, পরিবেশ দূষন ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যচিত্র নির্মানের ইতিহাস বেশ পুরোন। ভারী শিল্প তৈরির ফলে পরিবেশ দূষণ বিষয়ে জন প্রিয়ারসন প্রয়োজিত **দ্য মোক মিনেস** -এর উদাহরণ দেওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি নদীর তীরের পরিবেশ সংক্রান্ত ছবি আমেরিকার তথ্যচিত্রকার লোরেন্জ-এর **দি রিভার** বিখ্যাত হয়েছিল। প্রায় প্রতিদিনই টি. ভি-তে বিজ্ঞান-বিষয়ক চ্যানেলগুলিতে বেশ কিছু তথ্যচিত্রে বিষয় থাকে পরিবেশ।

১১. **সংবাদ-মূলক (news reel) ছবি**:- সমসাময়িক ঘটনা যার সংবাদ মূল্য (news value) আছে, এরকম বিষয়ে তথ্যচিত্র তৈরির রীতি বেশ পুরোন। বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত রাশিয়ার তথ্যচিত্রকার ইস্থার শাব এ ধরনের বেশ কিছু সংবাদ তথ্য মূলক (news reel) তথ্যচিত্র নির্মান করেছেন। ভারতের ফিল্মস্ ডিভিশনের বেশ কিছু সংবাদ তথ্য মূলক ছবি

দেখানো হত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও নিউজ রিল ডকুমেন্টারী-র চল ছিল।

১২. **প্রচার মূলক তথ্যচিত্র:-** কোন দেশের সরকার, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল বা ক্যারিসম্যাটিক ব্যক্তির হয়ে প্রচারের উদ্দেশ্যে তথ্যচিত্র নির্মানের ইতিহাস রয়েছে। বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নের বলশেভিক পার্টি ও বিপ্লবী সরকারের পক্ষে ভের্তভ, দভচেঙ্কো এঁরা ছবি করেছেন। এ বিষয়ে নাৎসী ' প্রোপাগান্ডা' ছবির উদাহরণ দেওয়া যায়। লেনী রিফেন্স্টাইলের **ট্রাম্ফ অব উইল** ছবিটি নাৎসী পার্টি ও হিটলারের প্রচারের উদ্দেশ্যে তৈরি।

১৩. **বানিজ্য সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান বিষয়ক তথ্যচিত্র:-** বিভিন্ন বানিজ্যিক সংস্থা বা সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম, উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে ছবি তৈরির রেওয়াজ নতুন নয়। রবার্ট ফ্লাহার্টি ও জন গ্রিয়ারসন-এর মত প্রবাদপ্রতীম তথ্যচিত্রকাররা এ ধরনের ছবি করেছেন। যেমন, 'স্ট্যান্ডার্ড অয়েল ' নামের একটি তেলের কোম্পানীর প্রয়োজনায় সংস্থার কাজকর্ম ইত্যাদি বিষয়ে ফ্ল্যাহার্টি **লুসিয়ানা স্টোরী** ছবিটি তৈরি করেন। গ্রীয়ারসনের নেতৃত্বে লন্ডন জি.পি. ও (ডাকবিভাগ)-এর উদ্যোগে বেসিল রাইট ও হ্যারী ওয়াটের পরিচালনায় ডাকবিভাগের কাজকর্ম ও জনসেবার ঐতিহ্য বিষয়ে বিখ্যাত **নাইটমেল** (night mail)তথ্যচিত্রটি নির্মিত হয়।

১৪. **একটি শহর/গ্রাম-কে বিষয় করে তোলা তথ্যচিত্র:-** বেশ কিছু বিখ্যাত তথ্যচিত্রের বিষয় হল একটি শহরের পথঘাট, মানুষজন বা গ্রামের পরিবেশ, জীবন ইত্যাদি। যেমন, জিগা ভের্তভের **ম্যান উইথ দ্য মুভী ক্যামেরা**, যেখানে মস্কো শহরের পথঘাট, মানুষ,যানবাহন ইত্যাদি হল বিষয়। জার্মান তথ্যচিত্রকার ওয়ালথার রাটমান -এর **বার্লিন: সিম্ফনী অব এ গ্রেট সিটি** এ ধরনের ছবি। ভারতের হরিসাধন দাশগুপ্ত- র **পাঁচটুপি: এ ভিলেজ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল**- এর কথা উদাহরন হিসাবে আনা যায়।

১৫. **শিল্পকলা** (art object) **বিষয়ক তথ্যচিত্র:-** কোন একটি বিশেষ চিত্রকলা বা অন্যান্য শিল্পকলা বিষয়ে বিভিন্ন তথ্যচিত্র নির্মিত হয়েছে। পিকাসোর বিখ্যাত **'গুয়েরনিকা'** নামের ছবির উপর ফরাসী চলচ্চিত্রকার অ্যালা রেনেঁ তৈরি করেন **গুয়েরনিকা** তথ্যচিত্রটি । মার্কিন তথ্যচিত্র পরিচালক হার্বার্ট ম্যাটার-এর **আলেক্সান্ডার ক্যালডার্ : স্কালপ্চার এন্ড কনস্ট্রাকশান** এ ধরনের একটি তথ্যচিত্র।

উপরোক্ত আলোচনাগুলিতে শৈলী ও বিষয়ের নিরিখে তথ্যচিত্রের যে বিভাজনগুলি করা হয়েছে সেগুলি বাস্তব ক্ষেত্রে সব সময় কাঠোরভাবে অনুসরন করা হয় না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এক ধরনের শৈলীর সঙ্গে অন্য ধরনের শৈলী বা এক বিষয়ের সঙ্গে অন্য ধরনের বিষয় মিশে যাকে। উদাহরন স্বরূপ, সিনেমা ভেরিতে ছবিগুলির মধ্যে হামেশাই পর্যবেক্ষন শৈলীর সঙ্গে মিশে যায়'আত্ম-প্রতিবর্তি শৈলী ', আবার রবার্ট ফ্ল্যাহার্টির **নানুক অব দ্য নর্থ** বা **ম্যান অব অ্যারান** ছবিগুলি সামাজিক, জাতিবিষয়ক এবং অভিমানমূলক বিষয়ের চমকপ্রদ মিশ্রন।

১২.৭ তথ্যচিত্র : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১২.৭.১ তথ্যচিত্রের সাধারণ ইতিহাস

তথ্যচিত্রের ইতিহাসের বয়স চলচ্চিত্রের ইতিহাসের সমান। প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাতা ও প্রদর্শক ল্যুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয়ের তৈরি ছবিগুলি ছিল দৈনন্দিন বাস্তবের হুবহু ও যথাযথ ধারন (recording) যাকে পরে 'actuality film' বলা হয়েছে। চলচ্চিত্রের প্রথম প্রদর্শনীতে দুটি ছবি দেখানো হয়েছিল-- **ওয়ার্কার্স কামিং আউট অব লুমিয়েরস্ ফ্যাক্টরী (১৯৯৫)** এবং **এ ট্রেন এ্যারাইভিং এট লিঅন (১৯৯৫)**। ছবি দুটির নাম থেকেই বিষয়গুলি বোঝা যাচ্ছে। পরে এঁরা আরও কয়েকটি এ ধরনের ছবি করেন যেমন, **এ বোট লিভিং দ্যা হার্বার, ফটোগ্রাফি কনফারেন্স** ইত্যাদি। ল্যুমিয়েরদের ছবির বৈশিষ্ট্য ছিল ডিপ ফোকাস এবং লঙ শট। ছবিগুলি তোলা হত দিনের আলোয়। এডিটিং তখনও আবিষ্কার হয়নি। ফলে একেকটি ছবি ছিল একেকটি শট। পরবর্তিকালের বহু তথ্যচিত্র শিল্পী ল্যুমিয়ের ভাইদের নন্দনতত্ত্ব থেকে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

কয়েক বছরের মধ্যেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এমনকি চীন, ভারত ও ফিলিপাইনেও সিনেমাটোগ্রাফ পৌঁছে যায়। সর্বত্রই দৈনন্দিন বাস্তবের চলচ্চিত্রায়ন ঘটে ল্যুমিয়েরদের স্টাইলে । ওদিকে সারা পৃথিবী জুড়েই বিশ শতকের প্রথম থেকেই শুরু হয় যুদ্ধ। সরকারি বা ব্যক্তিগত উদ্যোগ এই সময় যুদ্ধক্ষেত্রের ছবি তোলা শুরু হয় ১৮৯৮– ১৯১৮ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তোলা যুদ্ধের তথ্য সম্বলিত চলচ্চিত্রগুলি ছিল তথ্যচিত্রের অন্যতম উৎস। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ল্যুমিয়েরদের সিনেমাটোগ্রাফের সমতুল্য ফাইনেটোগ্রাফ যন্ত্রের আবিষ্কর্তা মার্কিন বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসনের সহকারী কে ডিক্‌শনের তোলা বোয়ার যুদ্ধ (১৮৯৯-০১) এর ফুটেজ। এসময় রুশ জাপান যুদ্ধের ছবিও তোলা হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) -এর সময় যুদ্ধের উপর তথ্যচিত্রগুলি সরকারি প্রচারের মাধ্যম হয়ে ওঠে । ব্রিটিশ সরকার 'যুদ্ধ প্রচার ব্যুরো' তৈরি করে। এই সংস্থার প্রয়োজনায় একটি আমেরিকান কোম্পানীর তোলা **ব্রীটেন প্রিপেয়ার্ড** (১৯১৫) তথ্যচিত্রটির মধ্যে আধুনিক চলচ্চির্রে গঠন ও শৈলী লক্ষ্য করা যায়। ব্রিটেনের পাশাপাশি জার্মান ও মার্কিন সরকারও যুদ্ধ-তথ্যচিত্র নির্মান শুরু করে। এমনকি আমেরিকায় যুদ্ধ বিষয়ক তথ্যচিত্রের-বানিজ্যিক প্রদর্শনী ও শুরু হয়। এ সময় বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তোলা ফুটেজ নিয়ে পরবর্তিকালে আমেরিকায় প্রস্তুত হয়েছিল **ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার**(১৯৩৪), **দি ডেড মার্চ** (১৯৩৭) প্রভৃতি তথ্যচিত্র যেগুলি বানিজ্যিক ভাবে প্রদর্শিত হয়েছিল।

যুদ্ধের ফুটেজ ছাড়াও বিশ শতকের প্রথম দুদশকে অন্য ধরন (genre) - এর তথ্যচিত্রায়ন চলছিল। সেগুলি হল সাধারনত অভিযান বা ভ্রমন মূলক তথ্যচিত্র এবং নৃতাত্ত্বিক ছবি। ভ্রমন বিষয়ক তথ্যচিত্রের পথ প্রদর্শক বলা যায় আমেরিকার চেরী ফিয়েরটনকে যিনি পরবর্তিকালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুশভেল্টের আফ্রিকা ভ্রমন বিষয়ে বিখ্যাত তথ্যচিত্র **রুশভেল্ট ইন আফ্রিকা** নির্মান করেছিলেন । আফ্রিকা, আলাস্কা প্রভৃতি স্থানের উপর 'ট্র্যাভেলগ' তথ্যচিত্র ছাড়াও ১৯২২-২৪ সালে এভারেস্ট অভিযান নিয়ে **ফ্লাইম্বং মাউন্ট এভারেস্ট, দি এপিক অব এভারেস্ট** প্রভৃতি বেশ কয়েকটি অভিযান মূলক ছবি করেন জে. বি. নোয়েল । প্রসঙ্গত এ রকমই একটি অভিযান মূলক ছবি মার্টিন ও ওসা জনসনের **জাক লন্ডন ইন সাউথ সি** (১৯১২) ছবিটি কার্ট ফ্ল্যাহার্টিকে তথ্যচিত্র নির্মানে অনুপ্রাণিত করেছিল।

এছাড়া আমেরিকার প্রাচীন অধিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের জীবন নিয়ে কয়েকটি ছবি হয়েছিল। এগুলির মধ্যে জন. ই. ম্যাপলের **ইন্ডিয়ান লাইফ** (১৯১৮), এডওয়ার্ড ফার্টিসের **ইন দ্য ল্যান্ড অব হেডহান্টারস** (১৯১৪) ছিল বেশ আলোচিত ছবি।

অভিযান এবং গোষ্ঠী জীবনের বিষয়ে তথ্যচিত্র নির্মানের ধারাটি রবার্ট ফ্লাহার্টিকে যথেষ্ট আকৃস্ট করেছিল।১৯১৩ সালে তিনি প্রথম এসকিমোদের দেশে যান মুভী ক্যামেরা নিয়ে। দীর্ঘদিন ধরে কয়েক দফায় সেলুলয়েড বন্দি করেন এসকিমোদের জীবন ধারা। এই তথ্যচিত্রের প্রধান চরিত্র নানুক একজন এসকিমো যুবক । ১৯২২ সালে **নানুক অব দি নর্থ** নামে মুক্তি পেল আধুনিক অথ্যচিত্রের ইতিহাসের সবচেয়ে আলোচিত ছবিটি ।

রবার্ট ফ্ল্যাহার্টি তরুন বয়সে তাঁর বাবার সঙ্গে লোহার খনি খোঁজার অভিযানে সঙ্গী হতেন। এরকমই এক অভিযানে তিনি পরিচিত হন এসকিমো গোষ্ঠীর সঙ্গে। তাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন কাটানোর ফল **নানুক অব দি নর্থ**। ফ্ল্যাহার্টির চরিত্রে অভিযাত্রীর ধৈর্য্য ও অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে যোগ হয়েছিল তথ্যচিত্রকারের বস্তুনিস্টতা। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি কখনও কখনও তাঁর ছবির বাস্তব চরিত্রগুলিকে তাদের নিজেদের ভূমিকাতে অভিনয় করাতেন এবং তথ্যচিত্রকে নাটকীয় করে তুলতেন। যেমন **নানুক অব দ্য নর্থ** ছবিতে নানুক আসলে তার নিজের ভূমিকায় ক্যামেরার সামনে অভিনয় করেছে। তবে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক সিগফ্রিড ক্রাকোয়ারের মতে ফ্ল্যাহার্টি এভাবে বাস্তবকে বিকৃত করেন নি বরং জীবন প্রবাহকে সঠিক ভাবে ধরার চেষ্টা করেছেন। ১৯৩২ সালে ফ্ল্যাহার্টি আইরিশ দ্বীপ আরানমোরের জেলেদের জীবন সংগ্রাম বিষয়ে তৈরি করেছেন **ম্যান অব অ্যারান** । যেখানে তাঁর ক্যামেরায় ধরা পড়েছে অশান্ত সমুদ্র ও কঠোর পাথুরে মাটির প্রকৃতির সঙ্গে অ্যারানমোরের মানুষদের জীবন সংগ্রাম।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম ছিল ফ্ল্যাহার্টির অতিপ্রিয় বিষয়। ছবির বিষয় ও চরিত্রগুলির সম্পর্কে তিনি ছিলেন বড় বেশি আবেগপ্রবণ। প্রান্তিক জীবনের প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল এই আবেগের উৎস। এরকমই একটি ছবি হল **মোয়ানা**

(১৯২৫) যেখানে পলিনে সিয়ান 'যামোয়া' জনগোষ্ঠীর জীবনপ্রবাহ দেখানো হয়েছে। ফ্ল্যাহার্টি আমেরিকার কৃষকদের জীবন নিয়ে ১৯৪২ সালে তৈরি করেন **দি ল্যান্ড**। ১৯৪৮ সালে মুক্তি প্রাপ্ত **লুসিয়ানা স্টোরী** ফ্ল্যাহার্টির একটু অন্যরকম ছবি যেখানে এই প্রথম তিনি আধুনিকতা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য থেকে বিরত থাকলেন। একটি নামী তেল কম্পানীর প্রয়োজনায় তৈরি ছবিটির বিষয় হল আমেরিকার লুসিয়ানা উপনদী অঞ্চলের মানুষের উপর আধুনিকতা ও ভারী শিল্পের প্রভাব।

১৯৩৩ সালে ফ্ল্যাহার্টি **ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্রিটেন** নামের একটি তথ্যচিত্র নির্মান করেন ব্রিটিশ তথ্যচিত্রকার গ্রিয়ারসনের সঙ্গে। জন গ্রিয়ারসন (১৮৯৮–১৯৭২) ছিলেন ফ্ল্যাহার্টির ছবির অনুরাগী। ফ্ল্যাহার্টির মত তিনিও ছিলেন রোমান্টিক - মানবতাবাদে বিশ্বাসী। আইজনস্টাইন ও বিপ্লব পরবর্তি সোভিয়েত চলচ্চিত্রের প্রতিও তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। ১৯২৯ সালে তৈরি **ড্রিফটার** ছবিটিতে শ্রমের মূল্য ও শ্রমের ছন্দ প্রধান বিষয়। এ ছবিতে দেখানো হয়েছে জাহাজ বা ট্রলারে নাবিক ও মৎসজীবীরা কিভাবে গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরছেন। ছবিটিতে আইজনস্টাইনের **ব্যাটলসিপ পোটেমকিন**(১৯২৫) ছবির প্রভাব খুব পরিস্কার। সাদা কালো-র উজ্জ্বল্যের বৈপরীত্য এই ছবির অর্থাৎ **ড্রিফটার**-এর কম্পজিশন বা দৃশ্য-সংগঠনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১৯৩৩ সালে ফ্ল্যাহার্টির সঙ্গে তৈরি **ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্রিটেন**-এর প্রভাবে তিনি তৈরি করেন **দি স্মোক মিনেস্** (১৯৩৭), যেখানে গ্রিয়ারসন শিল্পায়নের ফলে পরিবেশ দূষনের সম্ভাবনার কথা বলেছেন। ১৯৩৩'-৩৭ সাল পর্যন্ত লন্ডন জি. পি. ও-র উদ্যেগে বেশ কিছু ছবি করেন তিনি। তাঁর শেষের দিকের সবাক ছবিগুলিতে থাকত আবেগপ্রবণ বর্ণনা, সোভিয়েত মন্তাজের প্রভাব ও ছন্দবদ্ধ সম্পাদনা রীতি।

জন গ্রিয়ারসন ছিলেন ব্রিটিশ তথ্যচিত্রের প্রাণপুরুষ। তাঁর হাত ধরেই ১৯৩০-এর দশকের উঠে আসেন বেসিল রাইট ও হ্যারী ওয়টের মত বেশ কয়েকজন তথ্যচিত্রকার। এই দুজন জি.পি. ও পর্বের ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান **দি নাইটমেল (১৯৩৫)** পরিচালনা করেন। এ ছবির বিষয় হল কিভাবে ডাক বিভাগ ও রেলের কর্মীরা শারীরিক ও কৌশলগত দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে রাত্রের ট্রেনে ডাকের থলি পৌছে দিচ্ছেন একস্থান থেকে অন্যস্থানে। এ ছবির ভাষ্যে গদ্যের পরিবর্তে রয়েছে কাব্য সেগুলির রচয়িতা প্রখ্যাত ইংরেজ আধুনিক কবি ডাবলিউ. এইচ. অডেন।

১৯৩৪ সালে বেসিল রাইট তৈরি করেন **দি সঙ অব সিলোন**। সিংহলে চায়ের উৎপাদন ও রফতানী বিষয়ে ছবিটি নির্মান করা হয়। কিন্তু চারটি অংশে বিভক্ত এছবিতে সিংহল বা শ্রীলঙ্কার মানুষের জীবনযাত্রা, ধর্ম, খাদ্যাভ্যাস, পোষাক ও উৎসব এসবই প্রধান হয়ে ওঠে। বেসিল রাইটের অন্য একটি ছবি **কার্গো ফ্রম জামাইকা** (১৯৩৩)- এর বিষয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের জামাইকা দ্বীপের কলা চাষ ও তা সংগ্রহের পদ্ধতি। ১৯৩২-এ নির্মিত তাঁর **ওভার হিল এন্ড জলে** ছবিতে দেখা যায় স্কটল্যান্ড অঞ্চলের পশুপালন ও পশুপালকদের জীবন যাত্রা।

এ সময়ে ব্রিটেনে গ্রিয়ারসনের সঙ্গে রাইট ও ওয়াট ছাড়া ও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন আর্থার এলটন, পল রোথা, এডগার আনস্টি, আলবার্তো কাভালকান্তি ও মার্গারেট টেলরের মত তথ্যচিত্র পরিচালক।

ফ্ল্যাহার্টি গ্রিয়ারসনের রোমান্টিক ধারার মার্কিন-ব্রিটিশ ধারার পাশাপাশি, সম্পূর্ন ভিন্ন ধরনের তথ্যচিত্র নির্মান শুরু হয় বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায়। ছবিগুলি ছিল মূলত সংবাদচিত্রমূলক। 'এ্যাজিট ট্রেন' (Agit-train) নামের একটি কর্মসূচীর মাধ্যমে রেলপথে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে 'নিউজরিল' ফুটেজ আসত সম্পাদনা কেন্দ্রগুলিতে। আবার সম্পাদনার পর সম্পূর্ণ হওয়া তথ্যচিত্র গুলি ঐ রেলপথেই পৌছে যেত দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রদর্শনের জন্য। এই পর্বের প্রধান তথ্যচিত্রকার জিগা ভের্তভ। তিনি চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে কাহিনীচিত্রকে প্রবলভাবে অপছন্দ করতেন। তাঁর মতে তথ্যচিত্রেই গ্রীহিত হয় বাস্তবের প্রকৃতরূপ। একটি বিশেষ পদ্ধতিতে বাস্তবের ছবি তোলা ও সম্পাদনার রীতিতে তিনি ছবি করতেন। যাকে বলা হত 'কিনো-প্রাভর্দা বা 'চলচ্চিত্র -সত্য'। তিনি মনে করতেন যে ক্যামেরা কেবলমাত্র মানুষের চোখের পরিবর্তিত রূপ নয়, বরং বাস্তবকে ধারন (record) করার ক্ষেত্রে ক্যামেরার কিছু বিশেষ যান্ত্রিক সুবিধা আছে, যাকে ভের্তভ বলতেন ' কিনো-আই' বা ' চলচ্চিত্র'-দৃষ্টি। বাস্তবের ঘর-বাড়ি, পথ- ঘাট, প্রভৃতি দৃশ্যমান বস্তু সমূহের জ্যামিতিক আকৃতি, মানুষ,

যানবাহন প্রভৃতির গতি ও ছন্দ এসব ছিল তাঁর তথ্যচিত্রের প্রধান বিষয়। তিনি তথ্যচিত্রের জন্য ঘটনা খুঁজতেন না। তাঁর মতে দৈনন্দিন বাস্তব স্বয়ং যথেষ্ট ঘটনাপূর্ণ। তাঁর ছবির ক্যামেরাম্যান মিখাইল কাউফম্যানের ক্যামেরায় ধরা পড়া সাধারন বাস্তবের চিত্রগুলিকে ভের্তভ নিজস্ব পদ্ধতিতে সম্পাদনা করতেন। ভের্তভের বিখ্যাত তথ্যচিত্র **ম্যান ওইথ দ্যা মুভি ক্যামেরা** (১৯২৯)। এ ছবিতে মিখাইল কাউফম্যানকে দেখা যায় ক্যামেরা হাতে। দেখা যায় সম্পাদনা কক্ষে যে ছবির সম্পাদনা কাজ হচ্ছে, সেখান থেকে দৃশ্যান্তরে দেখা যায় একজন শ্রমিক কারখানায় কাজ করছেন। অর্থাৎ ভের্তভের মতে শিল্প-সৃষ্টি ও শ্রম-সৃষ্টি দুই-ই উৎপাদনের বিভিন্ন রূপমাত্র। চলচ্চিত্র নির্মাতা ও কারখানার কর্মী উভয়েই শ্রমজীবী।

জিগা ভের্তভের ছবিতে দৃশ্যের অর্থের থেকে ছন্দ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ছন্দ তাঁর ছবিতে অনেক সময়েই পথঘাটের বিশৃঙ্খলা । বিশৃঙ্খলার মধ্যে তাঁর ক্যামেরা ও সম্পাদনা রীতি ছন্দ আবিষ্কার করত। সিনেমায় শব্দ আসার পর তাঁর ছবি **এনথ্যুসিয়াজম্** (১৯৩১) যেখানে কাজটিক (chaotic) বা বিশৃঙ্খলা শব্দের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৪ সালে তৈরি **থ্রি সঙস্ অ্যাবাউট লেনিন** আন্তর্জাতিকভাবে ভের্তভের সবচেয়ে সফল ছবি। তাঁর অন্যান্য ছবিগুলির মধ্যে বিখ্যাত হল **এ্যানিভার্সারী অব্ রেভোলউশন** (১৯১৯), **ওয়ান সিক্সথ অব দ্য ওয়ার্ল্ড** (১৯২৬), **দি ইলেভেনথ ইয়ার** (১৯২৮) ইত্যাদি। প্রসঙ্গত ভের্তভের ছবির গুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল খুব ছোট ছোট সময় দৈর্ঘ্যের শটের মনতাজের ব্যবহার।

ভের্তভের অন্যতম সহকর্মী ইস্‌থার শাব দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে আসা নিউজরিল বা সংবাদচিত্রের ফুটেজগুলিকে সম্পাদনার সাহায্যে 'কম্পাইলেশন' করে বা মিশিয়ে ও যোগ করে বেশ কিছু তথ্যচিত্র নির্মান করেন। তাঁর তৈরি ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম তথ্যচিত্র হল, **ফল অব দ্য রোমানভ ডাইনেস্টি** (১৯২৭), **দি গ্রেট রোড** (১৯২৭) এবং **রাশিয়া অব নিকোলাস টু এন্ড লিও টলস্টয়** (১৯২৮)।

বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত চলচ্চিত্র আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কর্মী আলেকজান্দার দভশেঙ্কোর শৈলী ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। তাঁর ছবি ধ্রুপদী অর্থে কাব্যিক ও সৌন্দর্য্যপূর্ণ। আঙ্গিকের পরীক্ষা- নিরীক্ষার তুলনায় রোমান্টিক কবিত্ব ও লোকসংস্কৃতির প্রভাব তাঁর তথ্যচিত্রে অনেক বেশি। দভশেঙ্কোর উল্লেখযোগ্য তথ্যচিত্রগুলির মধ্যে রয়েছে **ফ্রান্টিয়ার** (১৯৩৫), **বুকোভিনা-ইউক্রেন ল্যান্ড** (১৯৪০), **নেটিভ ল্যান্ড** (১৯৪৬), **ব্যাটল অব আওয়ার সোভিয়েত ইউক্রেন** (১৯৪৩)।

এ সময়ের অন্যান্য রাশিয়ার তথ্যচিত্রকারদের মধ্যে মিখাইল কাউফম্যান, ইলিয়া কপালন, মিখাইল কালাটোজভ, ইয়াকভ ব্লাইয়াখ্ ও ভিকটর তুরীন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। কাউফম্যান ও কপালন নির্মিত মস্কো শহরের উপর তথ্যচিত্র **মস্কোভা** (১৯২৭), তুরীনের সাইবেরিয়া-তুর্কিস্থান রেলপথ তৈরির ঘটনার উপর তোলা ছবি **টার্কসিব্** (১৯২৯) পরবর্তীকালে হল্যান্ড ও ব্রিটেনের তথ্যচিত্রকারদের যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল।

হল্যান্ড বা নেদারল্যান্ডের তথ্যচিত্রকার জরিস ইভান্স বিপ্লবোত্তর রাশিয়ান তথ্যচিত্রের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর ছবিতে সোভিয়েত চলচ্চিত্রকারদের মতই দৈনন্দিন তুচ্ছ বিষয়ের উপর তথ্যচিত্র নির্মানের প্রবণতা দেখা যায়। জরিস ইভান্সের বিখ্যাত ছবি **রেইন** (১৯২৯), যে ছবিতে শহরের রাস্তায় বৃষ্টি পড়ার দৃশ্যাবলী দেখা যায়। ইভান্সের একটি ছবি **ব্রীজ** (১৯২৮), যে ছবির বিষয় একটি রেলব্রীজ। ডাচ স্থাপত্য বিষয়ে ইভান্স নির্মান করেন **জুইডারজি** (১৯৩০)। প্রসঙ্গত জরিস ইভান্স ১৯২৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে যান। সোভিয়েত বিপ্লবী জনগণের উদ্দেশে তিনি নির্মান করেন **সঙ অব হিরোস্** (১৯৩২)। তাঁর অন্যতম বিখ্যাত তথ্যচিত্র **বোরিনেজ** (১৯৩৩) বেলজিয়ান খান শ্রমিকদের জীবনযাত্রা, পেশা, প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের বিষয়কে অবলম্বন করে তৈরি হয়। এ ছবিতে জরিস ইভান্সের সঙ্গে যৌথ পরিচালক ছিলেন বেলজিয়ামের তথ্যচিত্রকার হেনরি স্টর্ক । প্রসঙ্গত ইভান্স ও আইজেনস্টাইনের প্রভাবে স্টর্ক তৈরি করেন **দি হিস্ট্রি অব আননোন সোলজার** (১৯৩১) । বেলজিয়ামের বস্তি নিয়ে স্টর্ক নির্মান করেন তাঁর বিখ্যাত ছবি **হাউসেস্ অব মিসারী** (১৯৩৭)।

জরিস ইভান্সের স্বদেশীয় সহকারি ও সহকর্মী জন ফার্নো ইভান্সের শৈলীতে ছবি করতেন। **ইস্থার আইল্যান্ড** (১৯৩৪),

দি লাস্ট শট (১৯৪৬) প্রভৃতি ফার্নোর উল্লেখযোগ্য কাজ।

১৯২০ ও ১৯৩০ দশকের নগর ও সাধারণ নাগরিক জীবনকে বিষয় করে বেশ কয়েকটি ভালো তথ্যচিত্র নির্মিত হয়েছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আলবার্তো কাভালক্যান্তি-র **নাথিং বাট টাইম** (১৯২৬), ফরাসী চলচ্চিত্রকার ও কবি জঁ ভিগো-র **অন দি সাবডোকট অব নাইস্** (১৯৩০) এবং জার্মান তথ্যচিত্রকার ওয়ালথার রাট্‌মান-এর **বার্লিন:সিম্ফনী অব এ গ্রেট সিটি**(১৯২৭)।

১৯২৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্যে উজ্জীবিত রাশিয়ার প্রভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব-ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল বিপ্লবী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আর্দশ এই সময়েই একেবারে অন্যধরনের এক প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত ও অপমানিত জার্মানীর রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে। রাশিয়ানদের মতই হিটলারের নাৎসী জার্মানী ও (প্রচারমন্ত্রি গোয়েবলস্ -এর উদ্যোগে) প্রচারমূলক তথ্যচিত্র করতে শুরু করে। তবে এদের আদর্শ ছিল রাশিয়ানদের সম্পূর্ণ বিপরীত। ভের্তভ, শাব, তুরীনরা ছিলেন বস্তুবাদী, সাধারণ মানুষ কেন্দ্রিক ও তথ্যনিস্ট । অন্যদিকে নাৎসী প্রচার ছবির নির্মাতারা ছিলেন আতন্দ্রীয়বাদী, সাধারণ মানুষের পরিবর্তে তারা খুঁজতেন 'সুপারম্যান' বা জাতীয় অতিমানব। ভৌতিক আলো-ছায়া, সুন্দর দৃশ্যবলী ও আবেগ-প্রবণতা ছিল তাদের ছবির বৈশিষ্ট্য। প্রামাণ্য তথ্যনিষ্ঠতার অভাব ছিল নাৎসী প্রচারমূলক তথ্যচিত্রগুলিতে। ১৯৩২-১৯৩৮ এই সময়ের মধ্যে জার্মানীতে বেশ কয়েকটি প্রচারমূলক ছবি নির্মিত হয়। এগুলির মদ্যে জোহানেস্ হেসলার-এর **ব্লিডিং জার্মানী** (১৯৩২), ফ্রানজ ভেন্‌ৎলার-এর **হানস্ ওয়েস্টমার** (১৯৩১), উইলী জাইল্‌কে-এর **দি স্টিল বিস্ট** (১৯৩৫), মার্টিন রিল্‌কে-র **কনকার দ্য সোল** (১৯৩৬) এবং লেনী রিফেন্‌স্টাহ্‌ল-এর **ট্রাম্ফ অব উইল** (১৯৩৫), **ফর আওয়ার সেলভ্‌স্** (১৯৩৬), এবং **অলিম্পিয়া** (১৯৩৮) উল্লেখযোগ্য।

এদের মধ্যে চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাম লেনী রিফেন্‌স্টাইল। নাৎসী আদর্শে বিশ্বাসী এই জার্মান মহিলা ছিলেন নাৎসী প্রচার মূলক তথ্যচিত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী পরিচালক । তাঁর বিখ্যাত ছবি **ট্রাম্ফ অব উইল**-এর বিষয় হল হিটলারের নাৎসী দলের ১৯৩৩ সালের ন্যুরেমবার্গ সম্মেলন ও দলনেতা হিটলারের ভাষন। এছবিতে হিটলারকে সুপারম্যান বা জাতীয় অতিমানব বলে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে। ছবিটির দৃশ্যাবলী অত্যন্ত প্রভাবশালী ও চিত্তাকর্ষক। সামরিক আচার-আচরনের প্রদর্শনী ও আলো-ছায়ার যাদু ছবিটিকে স্বপ্নময় করে তোলে।

রিফেনস্টাইলের অন্যতম বিখ্যাত **অলিম্পিয়া** ছবিটি নির্মিত হয় ১৯৩৬-এর বার্লিন অলিম্পিক গেমস্ অবলম্বনে। এ ছবিতে খেলাধূলার দৃশ্যাবলী, পুরস্কার বিতরন, বিজয়ের আনন্দ এ সবের মধ্যে পুরুষ -শরীর ও আর্য-গরিমাকে মহিমান্বিত করার স্পষ্ট চেষ্টা রয়েছে।

১৯৩৯ সাল থেকে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এসময় বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন ব্রিটিশ তথ্যচিত্রকাররা। বেশিরভাগ ছবিই ছিল ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধকালীন প্রচার সংক্রান্ত ছবি এবং নাৎসী -বিরোধী তথ্যচিত্র । হ্যারী ওয়াট ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা বিষয়ে তৈরি করেন **স্কোয়াড্রন ৯৯২** (১৯৩৯) এবং **টর্গেট ফর টু-নাইট** (১৯৪১)। ঐ একই বিষয়ে খ্যাতনামা চলচ্চিত্র সম্পাদক হামফ্রে জেনিংস পরিচালনা করেন **স্পেয়ার টাইম** (১৯৩৯)। প্রসঙ্গত: হামফ্রে জেনিংস প্রিয়ারসনের সঙ্গে জি. পি. ও ফিল্ম -ইউনিটের হয়ে **লোকামোটিভ** (১৯৩৫), **পেনী জার্নি** (১৯৩৮) প্রভৃতি ছবি পরিচালনা করেছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনের ভূমিকা বিষয়ে হ্যারী ওয়াটের সঙ্গে জেনিংস্ তৈরী করেন **লন্ডন ক্যান টেক ইট** (১৯৪০)। ১৯৪৩ সালে জেনিংস্ নির্মান করেন **ফায়ারস্ অয়্যার স্টার্টেড**। যুদ্ধের শেষে তিনি তৈরি করেন **ডায়েরী অব টিমোথি** (১৯৪৫), এ ছবিতে যুদ্ধ পরবর্তী ব্রিটেনে নতুন করে আশাবাদের জন্মের কথা রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং তারপর বেশ কয়েকটি নাৎসী-বিরোধী প্রচার ছবি তৈরি হয়। ফ্যাসিস্ট ইটালিয়ন নেতা বেনিটো মুসোলিনিকে ব্যাঙ্গ করে আলবার্তো কাভালকান্তি নির্মান করেন **ইয়েলো সিজার** (১৯৪০)। নাৎসী বাহিনীর কুচকাওয়াজকে ব্যঙ্গ করে কাভালকান্তি তৈরি করেন **জার্মানী কলিং** (১৯৪১)। তিনি ১৯৪৩ সালে নির্মান করেন **থ্রি সঙ্স্ অব রেসিট্যান্স**। হামফ্রে জেনিংস্ নির্মান করেন তাঁর বিখ্যাত নাৎসী-ফ্যাসীবাদ বিরোধী ছবি **দি সাইলেন্ট ভিলেজ** (১৯৪৩)।

যুদ্ধ পরবর্তীকালে ব্রিটেনের পুর্নগঠন ও নাগরিক সমস্যা বিষয়ে পল রোথার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছবি হল- **ওয়ার্ল্ড**

অব পেনাল্টি (১৯৪৬), **ল্যান্ড অব প্রমিস্** (১৯৪৫), **দি সিটি স্পিকস্** (১৯৪৬) এবং **দি ওর্য়াল্ড ইস রিচ্** (১৯৪৭)।

নাৎসী ও ফ্যাসীবাদ বিরোধী ছবিগুলির মধ্যে স্পেনের গৃহযুদ্ধ বিষয়ে ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসীবাদ বিরোধী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রচারে তৈরি জরিস ইভান্সে **দি স্পেনীশ আর্থ** (১৯৩৭) বিখ্যাত ছবি । পরে ইভান্স আমেরিকায় হলিউডের পরিচালক ফ্রাঙ্ক কাপরার সঙ্গে একত্রে 'কেন যুদ্ধ করছি' এই শিরোনামে বেশ কয়েকটি নাৎসী -ফ্যাসীবাদ বিরোধী ছবি তৈরি করেন। এ গুলির মধ্যে **দি ব্যাটল অব চায়না** (১৯৪৪) উল্লেখযোগ্য , যেখানে ইভান্স জাপানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে চিনের প্রতিরোধের কথা তুলে ধরেছেন। ফ্রাঙ্ক কাপ্রা-র 'হোয়াই উই ফাইট ' বা ' কেন যুদ্ধ করেছি-পর্বের তথ্যচিত্রগুলির মধ্যে রয়েছে **প্রিলিউড অব ওয়ার** (১৯৪৩), **দি নাৎসীস্ স্ট্রাইক** (১৯৪৩) এবং **ওয়ার কামন্ টু আমেরিকা**(১৯৪৫)। এ সময়েই জরিস ইভান্স হিটলারের বাহিনীর বিরুদ্ধে সোভিয়েত প্রতিরোধের সমর্থনে তৈরি করেন **দি ব্যাটল অব রাশিয়া** (১৯৪৩)।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তোলা ফুটেজ নিয়ে তৈরি দুটি আমেরিকান ' মহড়া'(Combat) তথ্যচিত্রের কথা বলতেই হয়। একটি হল হলিউডের প্রখ্যাত কাহিনীচিত্রকার জন ফোর্ড -এর **দি ব্যাটল অব মিডওয়ে** (১৯৪২), যেখানে যুদ্ধক্ষেত্রে-র ঘটনার হুবহু (বা authentic) চিত্র পাওয়া যায়। অন্য ছবিটি মার্কিন তথ্যচিত্রকার জন হু স্টোন (Huston) -এর **দি ব্যাটল অব সান পিয়েত্রো** (১৯৪৫)। এ ছবিটি যুদ্ধ সম্পর্কে তিক্ত মন্তব্যে পূর্ণ। ছবিটি এতটাই যুদ্ধ বিরোধী যে মার্কিন সরকার ছবিটিকে মুক্তি দেয় একবছর পরে। যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক ফলা ফল বিষয়ে তীর্যক মন্তব্যে পূর্ণ হুস্টোনের **লেট দেয়ার বি লাইট** (১৯৪৬) তথ্যচিত্রটিকে মার্কিন সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর গণহত্যা বিষয়ে তথ্যচিত্রকার ও তথ্যচিত্রসমালোচক এরিক বার্নোউ এবং পল রন্ডারের **হিরোসীমা-নাগাসাকি: আগস্ট, ১৯৪৫** (১৯৭০) ছবিটি তৈরি হয় মার্কিন পরমাণু বোমায় বিধস্ত দুটি জাপানী শহর হিরোসীমা ও নাগাসাকির ভয়াবহ ধ্বংসের ফুটেজ নির্ভর করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আর এক ভয়াবহ স্মৃতি নাৎসী কারাগার বিষয়ে বেশ কয়েকটি ছবি তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন ফুটেজ থেকে মার্কিন যুদ্ধ বিভাগ তৈরি করে **ডেথ মিল** (১৯৪৬)। ফ্রান্সের তথ্যচিত্রকার ও আলোকচিত্রী হেনরী কার্তিয়ার ব্রেসঁ নাৎসী কনসেনট্রোন ক্যাম্প থেকে ফরাসী বন্দিদের মুক্তি বিষয়ে তৈরি করেন **লে রিট্যোর** (১৯৪৬)।

পোল্যান্ডের অস্‌ভিৎজ বন্দিশিবিরে বন্দি ইহুদিদের উপর অমানুষিক নাৎসী অত্যাচারের স্মৃতি নিয়ে ফরাসী চলচ্চিত্রের নব-তরঙ্গের অন্যতম পরিচালক অ্যালা রেনেঁ নির্মান করেন **নাইট এন্ড ফগ** (১৯৫৫) । বিভিন্ন ফুটেজ ও স্থিরচিত্র থেকে তৎকালীন অবস্থার বিবরণ পাওয়া যায়। এ ছবিতে সুর দিয়েছেন জার্মান নাট্যকার ব্রেখট- এর অন্যতম সহকর্মী হানস্ আইসলার। ছবির মর্মস্পর্শী ধারাভাষ্য রচনা করেছেন ফরাসী ঔপন্যাসিক ও কবি জঁ ক্যারল যিনি নিজে নাৎসী বন্দিশিবিরে বন্দি জীবন যাপন করেছেন।

১৯৪০- এর দশকের শেষে ও ৫০-এর দশকে ফরাসী নব-তরঙ্গের প্রভাবে যে কজন তথ্যচিত্রকার উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন তাদের মধ্যে আলা রেনেঁ ও ক্রিস মার্কার উল্লেখযোগ্য। **নাইট এন্ড ফগ** ছাড়া ও আলা রেনেঁর কয়েকটি বিশিষ্ট তথ্যচিত্র হল **ভ্যানগগ** (১৯৪৮), **পল গঁগ্যা** (১৯৫০), ছবি দুটি তৈরি হয়েছে বিখ্যাত ডাচ চিত্রশিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যানগগ ও পল গগ্যাঁ-র জীবনী নির্ভর করে। পিকাসোর-আঁকা বিখ্যাত ফ্যাসীবাদ বিরোধী ছবি 'গুয়েরনিকা' নিয়ে একটি তথ্যচিত্র করেন আলা রেনেঁ তথ্যচিত্রটি হল **গুয়েনিকা** (১৯৫০)। নাৎসী বন্দি-শিবির নিয়ে এই পরিচালকের অন্যতম ছবি **দি মেমারী অব দি ওয়ার্ল্ড** তৈরি হয় ১৯৫৬ সালে।

ক্রিস মার্কার-এর ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে **সানডে ইন পিকিং** (১৯৫৫), **লেটার ফ্রম সাইবেরিয়া** (১৯৫৭), **দি লাভলি মে** (১৯৬৩)।

১২.৭.২ তথ্যচিত্র: ভারতে

১৯৫০ ও ৬০-এর দশকে ভারতেও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্যচিত্র নির্মিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রচারের জন্য ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার ১৯৪০ সালে ফিল্ম এ্যাডভাইসারী বোর্ড তৈরি করে। যে সংস্থাটি বেশ কিছু যুদ্ধ-প্রচারের জন্য

ফুটেজ বা সংবাদচিত্র তৈরি করেছিল। ভারত স্বাধীন হবার পর ১৯৪৮ সালে সরকারি উদ্যোগে 'ফিল্মস্ ডিভিশন' তৈরি হয় তথ্যচিত্র ও নিউজরিল তৈরিকে উৎসাহিত করার জন্য। ফিল্মস্ ডিভিশনের পাশাপাশি ব্যক্তিগত মালিকানায় তথ্যচিত্রে অর্থ লগ্নিকে ও উৎসাহিত করা হতে থাকে। তৎকালীন 'বার্মা-সেল' কোম্পানী-র উদ্যোগে তৈরি হয় পল জিলস্-এর **টেক্সটাইল** (১৯৫৬), ফিলি বিলমোরিয়ার **এ ভিলেজ ইন ত্রিভাঙ্কুর** (১৯৫৭)।

মোটামুটিভাবে পল জিলস্‌কেই আধুনিক ভারতীয় তথ্যচিত্রের জনক বলা যেতে পারে। ইনি ১৯৩৩-৩৭ সাল পর্যন্ত জর্মানীতে নাৎসী প্রচার ছবি তৈরি করতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ধরা পড়ে বিহারে ব্রিটিশ জেলে বন্দি ছিলেন। পরে ইনি ভারত সরকারের বিভিন্ন তথ্যচিত্রনির্মানের ক্ষেত্রে অবতীর্ন হন। পরবর্তী ভারতীয় তথ্যচিত্রকাররা অনেকেই পল জিলস্-এর সহকারী হিসাবে কাজ শিখেছেন। তাঁর বিখ্যাত তথ্যচিত্রগুলির মধ্যে রয়েছে **বোম্বে : দি স্টোরী অব দি সেভেন আইল্যান্ডস্** (১৯৪৫), **ভ্যানিশিং ট্রাইব্‌স্: ওরাঁও অব বিহার** (১৯৫৮) ইত্যাদি।

পল্ জিলস্ ছাড়া আর একজনকে ভারতীয় তথ্যচিত্রের অন্যতম প্রাণপুরুষ বলা যায়, তিনি হরিসাধন দাশগুপ্ত। ইনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিখ্যাত ফরাসী চলচ্চিত্রকার জঁ রেনোয়ার, কাছে শিক্ষা নেন। ১৯৪৭ সালে 'ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইট' তৈরির ক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায় ও চিদানন্দ দাশগুপ্তের-সঙ্গে তিনিও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। বার্মা-সেল কোম্পানীর উদ্যোগে তাঁর বিখ্যাত তথ্যচিত্র **পাঁচটুপী: এ ভিলেজ ইনওয়েস্ট বেঙ্গল** ছবিটি এডিনবার্গ চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়।

হরিসাধন দাশগুপ্তের অন্যান্য ছবিগুলের মধ্যে জঁ রেনোয়র ভাই ক্লদে রেনোঁয়ার সঙ্গে যৌথভাবে পরিচালিত **কোর্নাক: দি সান টেম্পল** (১৯৪৯), টাটা স্টিল কোম্পানীর উদ্যোগে **দি স্টোরী অব স্টিল** (১৯৫৬) উল্লেখযোগ্য। এছাড়া '৬০, '৭০, ও ৮০-র দশকে তিনি বেশ কয়েকটি তথ্যচিত্র নির্মান করেন। এগুলির মধ্যে রয়েছে **প্যানোরামা অব ওয়েস্ট বেঙ্গল: এ. পি. সি. রয়** (১৯৬১) **বড়ে গোলাম আলি** (১৯৬৪), **দি টেল অব টু লিভস্ এন্ড এ বার্ড**(১৯৭১) **মিজোরাম** (১৯৮২) এবং **আচার্য নন্দলাল** (১৯৮৪)।

গত পাঁচ দশকে ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধিনে ফিল্মস্ ডিভিশন প্রায় ১৮টি ভাষায় তথ্যচিত্র, নিউজরিল, জন সচেতনতা বিষয়ক, শিক্ষামূলক ও সংস্কৃতিক ছবি নির্মান করে চলেছে। ১৯৮০ সালের হিসাবে দেখা যাচ্ছে সে বছর ফিল্মক্ ডিভিশনের ১২০টি তথ্যচিত্র ও ৫২টি নিউজরিল বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। ফিল্মস্ ডিভিশনের উল্লেখযোগ্য তথ্যচিত্রগুলির মধ্যে রয়েছে- **জয়পুর** (১৯৫১), **সিম্ফোনী অব লাইফ** (১৯৫৬), **ভাক্রা-নাঙ্গাল জাম** (১৯৫৮) ইত্যাদি। ফিল্মস্ ডিভিশনের উদ্যোগে শ্যাম বেনেগাল সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে নির্মান করেন তথ্যচিত্র **সত্যজিৎ রায়** (১৯৮৪)।

ফিল্মস্ ডিভিশনের ছবিগুলির মধ্যে ফিলি বিলমোরিয়রের একটি বিহারী কৃষক পরিবারকে নিয়ে করা **দি হাউস দ্যাট আনন্দ বিল্ট**। কে. জাভারির সাড়ে পাঁচ ঘন্টার তথ্যচিত্রের **মহাত্মা: লাইফ অব গান্ধি** (১৯৬৮) এবং জি অরবিন্দনের **সার্কাস টেন্ট** (১৯৭৮) বিখ্যাত হয়েছিল।

পল জিলস্ ও হরিসাধন দাশগুপ্তের পাশাপাশি ভারতীয় তথ্যচিত্রের ক্ষেত্রে খাজা আহ্‌মেদ আব্বাস ও সুখদেব সিংহ-এর নাম আলাদা করে উল্লেখ করা দরকার। খাজা আব্বাস ছিলেন ভারতীয় গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। তিনি **গির অভয়ারন্য** (১৯৬১), **কবীর** (১৯৭৬), **ভারতদর্শন** (১৯৭২) এবং **ইকবাল** (১৯৭৮) প্রভৃতি তথ্যচিত্র নির্মান করেন। পল্ জিলস্-এর অন্যতম সহযোগী সুখদেব তৈরি করেন **হোমেজ টু লাল বাহাদুর শাস্ত্রী** (১৯৬৭), **নাইন মান্থস্ টু ফ্রিডম: দি স্টোরী অব বাংলাদেশ** (১৯৭২) এবং **বিহাইন্ড দি ব্রেড লাইন** (১৯৭৮)।

সত্যজিৎ রায় এবং ঋত্বিক ঘটক বেশ কয়েকটি তথ্যচিত্র নির্মান করেছেন। সত্যজিতেরে জীবনীমূলক তথ্যচিত্র **রবীন্দ্রনাথ** (১৯৬১), **সুকুমার রায়** প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ঋত্বিক ঘটক পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্যের বিষয়ে নির্মান করেন **ছৌ**। **দুর্বার গতি পদ্মা** (১৯৭১) তৈরি করা হয় বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের বিষয় অবলম্বনে। এছাড়া তাঁর রাজনৈতিক তথ্যচিত্র **আমার লেনিন** উল্লেখযোগ্য কাজ।

এগুলি ছাড়াও বেশ কয়েকটি ভালো তথ্যচিত্র তৈরি হয়েছে এদেশে। মান কাউল-এর **এ্যারাইভ্যাল**(১৯৬৮) মুম্বাই

শহরের জীবন যাত্রার প্রতিছবি। কুমার সাজনীর **ফায়ার ইন দ্য বেলী**(১৯৭৫) ছবির বিষয় ছিল ক্ষুধা ও খরাজলিত খাদ্যাভাব। পথশিশুদের সমস্যা নিয়ে শ্যাম বেনেগালের **এ চাইল্ড অব দ্য স্ট্রীট**(১৯৬৭), এম. এম. স্যাথু-র **গ্যালব** (১৯৬৯) যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছবি।

১২.৭.৩ তথ্যচিত্র: পরবর্তী যুগ

১৯৫০-এর দশকের বিশ্ব তথ্যচিত্রের বেশির ভাগ অংশ জুড়েই ছিল নাৎসী-বিরোধী, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিরোধী ছবি এবং বিশ্বযুদ্ধোত্তোর ইউরোপীয় সমাজের প্রতিফলন। এই ৫০-এর দশকেই হল্যান্ডের তথ্যচিত্রকারে বার্ট হান্স্ত্রা একটু অন্য ধরনের ছবি করতেন। তিনি স্বদেশীয় তথ্যচিত্রকার জরিস ইভান্স এবং সোভিয়েত চলচ্চিত্রকার আইজেনস্টাইন ও ভের্তভ-এর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। হান্স্ত্রার বিখ্যাত **গ্লাস** (১৯৫৮) ছবিটি-র বিষয় হল একটি কাঁচের জিনিষপত্র তৈরির কারখানায় শ্রমিকদের কাজকর্ম। এ ছবিতে বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত চলচ্চিত্রের মত বস্তুর জ্যামিতিক আকার, শ্রমিকদের শরীরের ছন্দময় গতি, কর্মরত হাতের দক্ষতা এ সব দেখতে পাওয়া যায়। হান্স্রার অন্য ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে **মিরর অব হল্যান্ড** (১৯৫০) এবং **রেমব্রান্ট** (১৯৫৭)।

১৯৬০- এর দশকে তথ্যচিত্রের ইতিহাসে 'ডাইরেক্ট সিনেমা'-'সিনেমা ভেরিতে' শৈলীর ছবি তৈরি হতে থাকে। বিষয়গত ভাবে '৬০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে সারা পৃথিবী জুড়ে বিপ্লবী আদর্শের সমর্থনে তথ্যচিত্র নির্মিত হতে থাকে। বিশেষত ভিয়েতনামে আমেরিকার আগ্রাসন (১৯৫৪- ১৯৭৩)-এর বিরুদ্ধে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই বেশ কিছু ছবি তৈরি হয়। বেরিল ফক্স-এর **সায়গন**(১৯৬৭), ডেভিড শোয়েন বার্নের **ফেসেস অব ইম্পিরিয়ালিজম**(১৯৬৭), জরিস্ ইভান্স-এর **দি সেভেন্টিনথ প্যারালাল**(১৯৬৭) এবং **পিপল এন্ড দেয়ার গান্স** (১৯৭০) ছবিগুলি মার্কিন আগ্রাসনের তীব্র সমালোচনা। অ্যালা বেঁনে, জঁ লুক গোদার, আগনেস ভার্দা, ক্রিস মার্কার, ক্লদে লিলোউস্ এবং উইলিয়াম ক্লেইনের তৈরি **ফার ফ্রম ভিয়েতনাম**(১৯৬৭) ছিল মার্কিন -ফরাসী চলচ্চিত্রকারদের যৌথ নির্মান। মার্কিন তথ্যচিত্রকার এমিল. ডি. আন্তোনিও নির্মান করেন **ইন দ্যা ইয়ার অব পিগ**(১৯৬৯) যে ছবিতে ভিয়েতনামের ইতিহাস ও সেদেশের মানুষের স্বাধীনতার জন্য লড়াই সম্পর্কে মার্কিন আমলা, সমর নায়ক ও জনগণের অজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

এমিল. ডি. আন্তোনিও সিনেমা ভেরিতে শৈলীর বিরোধীতা করতেন। তাঁর পদ্ধতি ছিল সাক্ষাৎকার ও বিভিন্ন মানুষের মন্তব্য বা প্রশ্নত্তোরকে জুড়ে তথ্যচিত্র নির্মান করা। তাঁর এই সাক্ষাৎকার মালা (String-of-interview) শৈলী '৭০-এর দশকে বিশেষত টি. ভি. তে বহুল প্রচলিত আঙ্গিক হয়ে উঠে। আন্তোনিও-র ছবিতে মার্কিন ধনতন্ত্র ও আমলাতন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণুতা ধরা পড়ত।

তাঁর **পয়েন্ট অব অর্ডার**(১৯৬৩) ছবিটি মার্কিন সমরনায়ক ও আমলা ম্যাক্কার্থির অন্ধ ও স্বৈরাচারী ধাঁচের কমিউনিস্ট বিদ্বেষ সম্পর্কে তির্যক মন্তব্যে পূর্ণ। ১৯৭২ সালে তৈরি **মিলহাউস: এ হোয়াইট কমেডি** ছবিটি মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন সম্পর্কে একধরনের ক্ষুরধার ব্যঙ্গ।

১৯৬০, '৭০ এবং ৮০-র দশকের লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে সমাজ-বিপ্লব ও মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু অবিস্মরনীয় তথ্যচিত্র তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে পেট্রিসিও গুজম্যানের **দি ব্যাটল অব চিলি** (১৯৭৩) ছবিটির কথা উল্লেখ করতেই হয়। এ ছবিতে চিলির আলেয়ান্দে-র গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক উত্থান দেখানো হয়েছে। ছবির শেষে দেখা যায় স্বৈরাচারী সামরিক বাহিনীর গুলিতে ছবির ক্যামেরাম্যানের মৃত্যু ঘটছে। এ ছাড়া আর্জেন্টিনার 'লিবারেশন' চলচ্চিত্রের প্রবক্তা ফার্নান্দো সোলানাসের সাড়ে চার ঘন্টার ছবি **আওয়ার অব দ্য ফার্নেসেস**(১৯৬৮) অ-কাহিনীমূলক (non-fiction) ছবির ক্ষেত্রে একটি অবিস্মরনীয় কীর্তি। ৬০, ৭০ ও ৮০ এই তিন দশকে আর্জেন্টিনা, চিলি, গুয়াটেমালা, মেক্সিকো, ব্রাজিল ও কিউবায় বেশ কিছু 'বিপ্লবী' তথ্যচিত্র তৈরি হয়েছে।

১২.৮ দি ফিল্মস্ ডিভিশন অব ইন্ডিয়া ও ভারতীয় তথ্যচিত্র

১৯৪৮ সালে বোম্বে বা অধুনা মুম্বই শহরে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের 'মিডিয়া ইউনিট' (media unit) হিসাবে ফিল্মস্ ডিভিশন অব ইন্ডিয়া স্থাপিত হয়। শুরু থেকে এই সংস্থার উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। ফিল্মস্ ডিভিশনের উদ্দেশ্য বলা হল- ' দেশের জনগণের কাছে বিভিন্ন তথ্য এবং বার্তা পৌঁছে দেবার জন্য ভারত সরকার এই সংস্থার মাধ্যমে নিউজরিল তথ্যচিত্র এবং স্বল্প -দৈর্ঘ্যের ছবি উৎপাদন ও বিতরণ (distribution)-এর ব্যবস্থা করবে । যে সব ছবিগুলি মানুষের শিক্ষা, পরিকাঠামো এবং সংস্কৃতির উজ্জিবন ও বিকাশে সহায়তা করবে।'

প্রথম বছর ফিল্মস্ ডিভিশন (এফ. ডি) ২৮টি নিউজরিল উৎপাদনের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে। পরের বছর নজর দেওয়া হয় মূলত তথ্যচিত্র উৎপাদনের দিকে এবং ৩১টি তথ্যচিত্র (একটি রঙিন ছবি সহ) ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। এভাবেই প্রথম দু দশকে এফ. ডি ২,৭০০-এর কিছু বেশী সংখ্যাক ছবি তৈরি করে সেগুলির মধ্যে বেশ কিছু তথ্যচিত্র ছিল। এই তথ্যচিত্রগুলির মধ্যে অনেকগুলি ছিল এদেশের ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরম্পরা (Cultural heritage) বিষয়ক। যেমন-'তাজমহল', 'মহাবলীপুরম', 'জৈনমন্দির', 'ভারতের গুহামন্দির', ইত্যাদি।

এ ছাড়া প্রথম দু দশকে ফিল্মস্ ডিভিশন অব ইন্ডিয়া (Films Division of India) বেশ কিছু তথ্যচিত্র প্রয়োজনা করে শাস্ত্রীয় এবং লোকনৃত্য বিষয়ে। এগুলির মধ্যে উল্লেখ্য 'ভারত নাট্যম', 'কথক', 'আসামের-লোকনৃত্য' এই সব ছবি। বিশিষ্ট জাতীয় ব্যক্তিত্বদের উপর জীবনীমূলক কয়েকটি ছবি তৈরি হয়- যেমন গান্ধি, নেহ্রু, টেগোর, তিলক ইত্যাদি।

পরবর্তী কালে ফিল্মস্ ডিভিশনের কার্যক্রম আরও ব্যাপক হয়ে ওঠে। প্রতিবছর ফিল্মস্ ডিভিশন একসময় ১৬০-এর মত ছবি তৈরি করত। সম্ভবত ফিল্মস্ ডিভিশন অব ইন্ডিয়া হল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ অকাহিনীমূলক ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র উৎপাদনের সরকারি সংস্থা। কলকাতা, মুম্বই ও মাদ্রাজে এফ. ডি-র সব সময়ের স্থায়ী অফিস চলে। ১৯৮০-এর দশকে প্রতি সপ্তাহে একটি তথ্যচিত্র বা নিউজরিলের ৭০০টি প্রিন্ট বা কপি তৈরি করা হত। ১৯৮২ সালের হিসাবে দেখা যায় সারাদেশের ১১ হাজার ৮০০ প্রেক্ষাগৃহে এফ. ডি-এর ৩৮,০০০ কপি বা প্রিন্ট দেখানো হচ্ছে।

ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্য যেমন গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উত্তর-প্রদেশ, বিহার, অন্ধপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে ফিল্মস্ ডিভিশনের আঞ্চলিক ফিল্ম তৈরির জন্য ইউনিট কাজ করে। একসময় ১৯৮০-এর দশকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় ৮০ মিলিয়ন (৮ কোটি) মানুষ ছিল এফ. ডি-এর তৈরি ছবিগুলির দর্শক।

কেবলমাত্র প্রেক্ষাগৃহ ছাড়াও দেশের দুরতম প্রান্তের গ্রামাঞ্চলের দর্শকদের দেখানোর জন্য এফ. ডি-এর ভ্রাম্যমান ইউনিটের ব্যবস্থা আছে।

একসময় ফিল্মস্ ডিভিশন অব ইন্ডিয়া নিজেদের খরচ নিজেদের তথ্যচিত্র ও নিউজরিল দেখিয়েই উৎপাদন করত। কারণ ১৯৫২ সালের সিনেমাটো গ্রাফিক এ্যাক্ট (১৯৫২) অনুসারে দেশের সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ মূল ছবি শুরুর আগে ১০ থেকে ২০ মিনিট পর্যন্ত এফ. ডি-এর নিউজরিল, তথ্যচিত্র দেখানো বাধ্যমূলক ছিল। প্রেক্ষাগৃহের আকার অবস্থান ইত্যাদির উপর নির্ভর করে প্রত্যেক ছবির জন্য প্রতি সপ্তাহে এফ. ডি-র উপার্জন ছিল দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা থেকে চারশ টাকা পর্যন্ত।

কিন্তু পরবর্তীকালে সিনেমা হাউসের মালিকরা আদালতে অভিযোগ করে যে এফ. ডি-র বাধ্যতামূলক ছবি দেখাতে গিয়ে তাদের ক্ষতি হচ্ছে বছরে প্রায় ৩ কোটি টাকা। ফলে বাধ্যতামূলক সিনেমাটোগ্র্যাফিক অ্যাক্ট শিথিল করা হয়। এখন ছবি দেখিয়ে এফ. ডি-র আয়ের সংস্থান ফলত অনেক কমে গেছে।

ফিল্মস ডিভিশনের প্রযোজনা পদ্ধতি ঃ- প্রতি বছর নির্মিত সবমিলিয়ে প্রায় ১৬০ টি ছবির মধ্যে বেশির ভাগই তৈরি করেন এফ. ডি-এর নিজস্ব বেতনভুক পরিচালকবৃন্দ। কেবলমাত্র ১০-১২ টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্র তৈরির বরাত পান এফ. ডি-র বাইরের স্বাধীন চলচ্চিত্র পরিচালকরা। সেক্ষেত্রেও একটি ছবির বরাত পাবার জন্য জটিল পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এবং ছবি তৈরির পরেও বিবিধ বিধিনিষেধ বা সেন্সরশিপের বাধা অতিক্রম করতে হয়। ফলে অনেকেই মনে করেন যে এই কারনে এফ. ডি-র প্রযোজনায় ভালো ও প্রতিষ্ঠান বিরোধী কাহিনীচিত্র ও তথ্যচিত্র করা শক্ত।

যদিও ফিল্মস্ ডিভিশনের উদ্যোগে যথেষ্ট প্রতিবাদীও অন্য ধরনের দু-একটি ছবি বিশেষত তথ্যচিত্র যে হয়নি তা নয়। এক্ষেত্রে ক্যামেরাম্যান-পরিচালক রঞ্জন পালিতের বিখ্যাত তথ্যচিত্র 'ভয়েসেস্ ফ্রম বালিয়াপাল'-এর কথা বা তপন বসু, সুহাসিনী মূল ও সালিম শেখের তৈরি 'ভূপাল: বিয়ণ্ড জেনোসাইড' ডকুমেন্টারী ছবির কথা বলা যেতে পারে।

এফ. ডি তৈরির সময় অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয় দেশের গ্রামগুলের মানুষের কথা মাথায় রাখা হবে ছবির বিষয় নির্বাচনের সময়। কিন্তু ১৯৭৫-৭৮ সালে ইন্ডিয়ান ইন্সটিউট অব মাস কমিউনিকেশন (IIMC) পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে এফ.ডি-র মোট ছবি ও তথ্যচিত্র ও নিউজরিলের মাত্র ১০ শতাংশ গ্রাম বা গ্রামের মানুষের জন্য, যেখানে দেশের প্রায় ৭৬ শতাংশ মানুষ গ্রামবাসী। তবে ১৯৭৬ সালে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে প্রেক্ষাগৃহগুলির মোট দর্শকের ৬২ শতাংশ বলেন যে তারা এফ. ডি-র অকাহনী মূলক ছবি যথেষ্ট মনে দিয়ে দেখেন ও যেগুলি জনশিক্ষার সহায়ক।

১২.৯ ডাইরেক্ট সিনেমা-সিনেমা ভেরিতে

● বৈশিষ্ট সমূহ

তথ্যচিত্রের ইতিহাসে ১৯৬০ এবং ৭০-এর দশকের প্রথম দিকে 'ডাইরেক্ট সিনেমা ' ও 'সিনেমা ভেরিতে নতুন যুগের সূচনা করে। সমসাময়িক তথ্যচিত্র সমূহের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব দেখা যায় 'ডাইরেক্ট সিনেমা'-'সিনেমা ভেরিতে' শৈলীর। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক বিল নিক্‌লস্ এই শৈলীকে বলেন পর্যবেক্ষণ মূলক শৈলী (observational style)। ডাইরেক্ট সিনেমা (প্রত্যক্ষ বাস্তবচিত্র) এবং সিনেমা ভেরিতে (তথ্যচিত্র-সত্য) ছবিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, ক্যামেরা বাস্তবকে নিরাসক্তভাবে পর্যবেক্ষণ করে চলে, পরিচালক তাঁর ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব ছবির মধ্যে আরোপ করেন না।

যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ডাইরেক্ট সিনেমা ও সিনেমা ভেরিতে প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয় তবে এ দুই-এর মধ্য সামান্য পার্থক্য বর্তমান। 'ডাইরেক্ট সিনেমা' বা 'প্রত্যক্ষ বাস্তবচিত্র' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ফরাসী তথ্যচিত্রকার মারিও রস্‌পলি, ৬০-এর দশকে। ' প্রত্যক্ষ বাস্তবচিত্র' বলতে তিনি বুঝিয়ে ছিলেন সেই ধরনের তথ্যচিত্র যেখানে ক্যামেরা বাস্তবকে যেমন-আছে-তেমন-ভাবে (Life-as-it-is) ধারন (record) করবে এবং পরিচালক বিষয়কে নিজের মত ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবেন না।

বিষয় নির্বাচন, আঙ্গিক সৃষ্টি, ক্যামেরা ভূমিকা, শব্দগ্রহন, ছবির গঠন এবং নীতিগত দিক থেকে 'প্রত্যক্ষ বাস্তবছিত্র' তার নিজস্ব রীতি অবলম্বন করে।

প্রথমত: সাধারণ বাস্তব জীবন থেকে বিষয় নির্বাচন করা হয় এ ধরনের ছবিতে। সেই প্রাত্যহিক বাস্তবকে ক্যামেরা পর্যবেক্ষন করে এবং পরিচালক, ক্যামেরাম্যান ও সম্পাদক বাস্তব ও বাস্তবচিত্রের মধ্যে যতটা সম্ভব কম হস্তক্ষেপ করেন।

দ্বিতীয়ত: ডাইরেক্ট সিনেমা আঙ্গিগতভাবে দর্শকের সঙ্গে এমন একপ্রকার সংযোগ (communication) তৈরি করে যা সরাসরি ধারাভাষ্যের প্রয়োগে বা বাস্তবকে অন্যভাবে বিকৃত করে অর্থবহ করে তুলতে চেষ্টা করে না। বাস্তবের চলচ্চিত্রায়ন থেকে দর্শক যা বুঝবেন তাই সত্য, পরিচালকের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

তৃতীয়ত ঃ বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ বাস্তবচিত্রের ক্ষেত্রে ক্যামেরা লুকোন স্থান থেকে ছবি তোলে, যাতে যে সব চরিত্র ইত্যাদির ছবি তোলা হচ্ছে তারা ক্যামেরার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন না (Life unaware) থাকে। কারন ক্যামেরার অস্তিত্ব বুঝতে পারলে অনেক সময় আচরনের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়। বিশুদ্ধ ডাইরেক্ট সিনেমায় ক্যামেরা খুব হিসাব করে মিজঁ-অ-সিন নির্বাচন করে না। ক্যামেরার সামনে যা ঘটছে তার সব কিছুই হুবহু রেকর্ড করে চলে।

চতুর্থত ঃ প্রত্যক্ষ বাস্তবচিত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'সিঙ্ক-সাউন্ড' বা ঘটনা স্থলের শব্দ সরাসরি গ্রহন করা। এ ধরনের ছবিতে সাধারনত ধারাভাষ্যের ভূমিকা যতটা সম্ভব কম রাখা হয়। গৃহিত বাস্তবের দৃশ্য ও শব্দের ভাবের সঙ্গে

মিলিয়ে কখনো কখনো সঙ্গীত যোগ করা হয়।

পঞ্চমত ঃ ঘটনাগুলিকে বিশেষভাবে সম্পাদনার সাহায্যে সজ্জিত করে একধরনের আখ্যানের রূপ দেওয়ার চেষ্টা থেকে পরিচালক বিরত থাকেন। এধরনের ছবিতে মন্তাজ্ বর্জন করা হয় এবং দৈর্ঘ্য-সময় ধরে দৃশ্যাংশ (Shot) গ্রহন করা হয় । আগে থেকে প্রস্তুত করা স্ক্রিপ্ট ডাইরেক্ট সিনেমার ক্ষেত্রে বর্জনীয়।

ষষ্ঠত: বাস্তবকে ছবিতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্মাতা একধরনের 'সাংবাদিক সুলভ নৈর্ব্যক্তিবতা' (journalistic objectivity) বজায় রাখেন। পরিচালকের ব্যক্তিগত আবেগের স্থান নেই এ ধরনের ছবিতে। কারণ বাস্তব ও বাস্তবচিত্রের মাঝে পরিচালকের মধ্যস্থতা এ ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে বর্জনীয়।

● উত্থান ও প্রসার

১৯৬০-এর দশকে যে মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডাইরেক্ট সিনেমা এবং প্রধানত ফ্রান্স সিনেমা ভেরিতে একেবারে নতুন আন্দিকে অবতীর্ন হয়েছে, তার কয়েকটি ঐতিহাসিক কারন ছিল, সেগুলি হল—

১. **প্রযুক্তিগত কারণ ঃ** ১৯৫০-এর দশকের শেষদিকে এবং ১৯৬০-এর দশকের শুরু থেকে চলচ্চিত্রের জগতে এসে যায়, হালকা, কাঁধে বহনযোগ্য ক্যামেরা, সিঙ্ক-সাউন্ডের প্রযুক্তি ইত্যাদি। সঙ্গে টেলিভিশনের ব্যাপক প্রসার ঘটে আমেরিকা ও ইউরোপে ফলে তথ্যচিত্রে একধরনের সাংবাদিকতার ধরনে প্রবেশ করতে থাকে।

২. **আদর্শগত কারণ ঃ** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ও তার পরবর্তি একদশকে ক্রমাগত পক্ষপাত দুষ্ট প্রচারমূলক ছবি তৈরি হচ্ছিল তথ্যচিত্রের জগতে। ফলে তথ্যচিত্রের নিরপেক্ষতার আর্দশ ও বাস্তবকে যথাযথ ভাবে ধারনের কাজটি সঠিকভাবে হচ্ছিল না। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের যথাযথ ও পক্ষপাত বিহীন বিশুদ্ধ তথ্যচিত্রায়নের শৈলীকে ফিরিয়ে আনে ডাইরেক্ট সিনেমা ভেরিতে।

৩. **নান্দনিক কারণ ঃ** তথ্যচিত্রকে সুন্দর ও আকর্ষনীয় করার চেষ্টার ফলে ১৯৪০ ও ৫০-এর দশকের তথ্যচিত্রগুলি বাস্তবের প্রকৃত প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হচ্ছিল । প্রত্যক্ষ বাস্তব ও বাস্তবের সত্যতার প্রতিফলন ঘটানো-কে ডাইরেক্ট সিনেমা এবং সিনেমা ভেরিতে সৌন্দর্য্য সৃষ্টির উপরে স্থান দিল।

প্রখ্যাত মার্কিন ডাইরেক্ট সিনেমা শৈলীর তথ্যচিত্রকার রিচার্ড লিক্ক বলতেন, বাস্তবকে নিজের মধ্যেই সৌন্দর্য্যের উপাদান রয়েছে, বাস্তবকে সুন্দর করে তোলার চেষ্টা করা তাই উচিৎ নয়। তাঁর মতে ডাইরেক্ট সিনেমা হল, 'ক্যামেরার স্বাভাবিক ভাষা, যার প্রকাশ ঘটে দৈনন্দিন জীবন-প্রবাহ-কে পর্যবেক্ষন ও রেকর্ড করার মাধ্যমে।" অন্যতম ' প্রত্যক্ষ বাস্তবচিত্র' নির্মাতা, আমেরিকার আলবার্ট মেইসেল্‌স বলতেন, ডাইরেক্ট সিনেমা বা সিনেমা ভেরিতের বিষয় হল "বৃহত্তর সাধারন জীবন(macro life)-এর প্রাত্যহিক ঘটনা প্রবাহ।"

১৯৬০-এর দশকে তৈরি ব্রিটিশ পরিচালক জন শ্লেসিনগার-এর **টার্মিনাস** ছবিটিকে বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ বাস্তবচিত্র (direct cinema) -এর উদাহরন হিসাবে ধরা যেতে পারে। এ ছবিতে ইংল্যান্ডের ওয়াটার্লু স্টেশনের ২৪ ঘন্টার জীবন যাত্রার বেশ কয়েকটি মূহুর্তকে ধরা হয়েছে। বেশির ভাগ শট হল লঙ শট বা মিড শট, ক্যামেরা লুকোন অবস্থায় ছবি তুলেছে এবং বেশির ভাগ দীর্ঘসময় ধরে চলছে। ছবি তোলা হয়েছে স্বাভাবিক দিবালোকে।

ছবিতে স্টেশনে বিভিন্ন মানুষের দেখা পাওয়া যাচ্ছে। কেউ এসেছেন তাঁর প্রিয় জনকে বিদায় জানাতে। কেউ ট্রেন থেকে নেমে দীর্ঘদিন পর মিলিত হচ্ছেন পরিবার, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে। একজনের চোখে হয়ত জল, অন্যজনের মুখে আবার হাসি। দেখা যায় একদল কৃষ্ণাঙ্গ যুবক-যুবতী ট্রেন থেকে নামছে গান গাইতে গাইতে। বিভিন্ন মানুষ-জন, তাদের বহুমুখী গতিবিধি ইত্যাদির ছবিতে আমরা দৈনন্দিন বাস্তবের অন্তর্গত 'জটিলতা' (ambiguity)-র প্রতিফলন পাই। আবার হাসি কান্না, উদ্বেগ-আনন্দের মাঝে ধরা পড়েছে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার 'আবেগের মানচিত্র' (emotional geography of space)। হঠাৎ দেখা যায় একটি শিশু হারিয়ে যায়। তার মা তাকে উদভ্রান্তের মত খুঁজতে থাকেন। এই ঘটনার মধ্যে 'সঙ্কট'(crisis)খুঁজে পায় ক্যামেরা।

অর্থাৎ ডাইরেক্ট সিনেমার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হল সাধারন জনজীবনের 'জটিলতা', 'আবেগ' ও 'সঙ্কট'- কে প্রকাশ করা। সে বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে রাজনীতি, সমাজ বা সংস্কৃতির জগতেও। যেমন, রবার্ট ডিউ, রিচার্ড লিকক, পেনেবেকার ও সুকার-এই চার মার্কিন তথ্যচিত্রকারের তৈরি প্রত্যক্ষ বাস্তবচিত্র **দি চেয়ার**(১৯৬২) একটি বিখ্যাত ছবি। এখানে ইলেকট্রিক চেয়ারে মৃত্যুদন্ডের অপেক্ষায় থাকা এক কৃষ্ণাঙ্গ বন্দি পল ক্রাম্প-এর জীবনের শেষ কয়েকদিনের কয়েক ঘন্টার কিছু মুহূর্তকে ক্যামেরা পর্যবেক্ষন করে চলেছে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার পক্ষের আইনজীবী সুর ও নাইজার-এর মৃত্যুদন্ডের বিরুদ্ধে আবেদন ও যুক্তি এ ছবির অত্যন্ত মর্মস্পর্শী একটি দিক তুলে ধরেছে।

অথবা ডিউ, পেনেবেকার, লিকক, ফিলগেট ও আলবার্ট মেইয়েলস-এর তৈরি **প্রাইমারী** (১৯৬০) ছবিটির উল্লেখ করা যায়। এ ছবিতে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এইচ. হামফ্রি ও জন কেনেডির নির্বাচনী প্রচার পর্বকে ক্যামেরায় সাংবাদিক সুলভ নৈর্ব্যক্তিক ভাবে ধারন (record)করা হয়েছে। এখানে পরিচালকের হস্তক্ষেপ ব্যাতিত কেবলমাত্র ক্যামেরায় ধরা পড়া দৃশ্য ও শব্দের সাহায্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার প্রতিফলন ঘটছে।

আমেরিকায় যেমন টি. ভি-র মাধ্যমে ডাইরেক্ট সিনেমা অন্যতম প্রধান আঙ্গিক হিসাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, ফ্রান্সে তেমন শরু হয় 'সিনেমা ভেরিতে' বা 'তথ্যচিত্র-সত্য'। শব্দটি জিগা ভের্তভের 'ফিনো-প্রাভদা' বা 'সিনেমা-ট্রুথ থেকে নেওয়া হয়েছে। কারণ ভের্তভ-এর **'ম্যান ওইথ দ্যা মুভি ক্যামেরা'** ছবির মতই সিনেমা-ভেরিতে ও চায় চলচ্চিত্রের নিজস্ব পদ্ধতিতে বাস্তবকে ধারন করতে যার ফলে বাস্তবের জটিলতা, গতি, ছন্দ, ইত্যাদির প্রত্যক্ষভাবে তথ্যচিত্রে প্রতিফলন ঘটে।

বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে যেমন, হালকা বহন যোগ্য ক্যামেরা ব্যবহার, সিঙ্ক সাউন্ড ব্যবহার , স্বাভাবিক আলোয় ছবি তোলা, ছবিকে পরিচালকে সঙ্গে পক্ষপাত থেকে মুক্ত রাখা ইত্যাদি বিষয়ে ডাইরেক্ট সিনেমার সঙ্গে সিঁনেমা ভেরিতের সম্পূর্ণ মিল আছে। তবে তথ্যচিত্রকার ও তথ্যচিত্র সমালোচক এরিক বারনাউ (Barnouw) -এর মতে 'ডাইরেক্ট সিনেমা' যেখানে 'ঘটনা ঘটার জন্য অপেক্ষা করে' (Waits for a crisis) সিনেমা ভেরিতে যেখানে ঘটনাটির সত্যকে বার করে আনার জন্য অবস্থাকে 'প্রলুব্ধ' করে (provokes the subject)| বিশুদ্ধ ডাইরেক্ট সিনেমার মত ভেরিতে ছবিতে ক্যামেরা লুকনো থাকে না বরং ক্যামেরা ঘটনার মধ্যে অংশগ্রহন করে। ডাইরেক্ট সিনেমার পরিচালক বাস্তবকে কোনভাবেই 'প্রভাবিত করেন না', কিন্তু সিনেমা ভেরিতের পরিচালক বাস্তবকে অত্যন্ত 'বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রভাবিত' করেন (faithful manipulation of event)। সিনেমা ভেরিতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বাঁকা ফ্রেম (canded frame) ক্যামেরার খুব কাছে আসার জন্য ক্লোজ আপে সামান্য বিকৃতি। কারণ 'ভেরিতে' মনে করে তথ্যচিত্রের বড় শত্রু সৌন্দর্য্যায়নের চেষ্টা। তাই 'ভেরিতে'' তথ্যচিত্রের ছবি বা ইমেজগুলি বাস্তবের অত্যন্ত সৎ প্রতিফলন হলেও ইচ্ছকৃত ভাবে কখনো কখনো অসুন্দর করে তোলা।

ক্রমে 'ডাইরেক্ট সিনেমা' 'সিনেমা ভেরিতে' শৈলীর মধ্যে মিশে যায়। আমেরিকায় ডাইরেক্ট সিনেমার অন্যতম প্রবক্তা ডন পেনেবেকার বা আলবার্টও ডেভিড সেইসেল্‌স-রা ভেরিতে শৈলীতে ছবি করতে থাকেন। জনপ্রিয় সংস্কৃতি চর্চা অর্থাৎ পপ্ সংগীতের সম্মেলনকে বিষয় করে পেনেবেকার তৈরি করেন **মন্টেরী পপ** (১৯৬৮) এবং বিখ্যাত জনপ্রিয় সংগীতকার বব ডিলানের ইংল্যান্ড সফর নিয়ে তৈরি করেন **ডোন্ট লুক ব্যাক** (১৯৬৬)। আলবার্ট ও ডেভিড মেইসেলস্ ভ্রাতৃদ্বয় 'রোলিং স্টোন' সংগীত দলের আমেরিকা ভ্রমন বিষয়ে তৈরি করেন **গ্রিম সেল্টার** (১৯৭০) নামের একটি 'ভেরিতে' ছবি।

এসময় আমেরিকার আর এক তথ্যচিত্রকার ফ্রেডরিক ওয়াইসম্যান বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভেরিতে শৈলীর তথ্যচিত্র নির্মান করেন। এগুলি হল, **হাই স্কুল** (১৯৬৮), **বেসিক ট্রেনিং** (১৯৭১) এবং **মডেল** (১৯৮০)। আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ার একটি স্কুলের বাচ্চা ও কর্তাব্যক্তি স্কুলের নিয়ম কানুন বিষয়ে তৈরি **হাই স্কুল**। ছবিটি দেখায় কিভাবে শিক্ষাদান ও শৃঙ্খলাপরায়ন করার নামে প্রতিষ্ঠান ছাত্রছাত্রীদের মনের উপর চাপ সৃষ্টি করে চলে।

আলবার্ট ও ডেভিড মেইসেল্‌স-দের আর একটি ছবি **সেলস্‌ম্যান** (১৯৬৯)-এর বিষয় হল একটি প্রকাশনা সংস্থার বাইবেল বিক্রিয় চেষ্টা। এ ছবিতে দেখা যায় কিভাবে 'বাজার', 'পন্য' ও 'ধর্মের' মিশ্রন ঘটেছে আধুনিক জীবনে।

১২.১০ ডাইরেক্ট সিনেমা-সিনেমা ভেরিতে ও টেলিভিশন

ডাইরেক্ট সিনেমা ও সিনেমা ভেরিতে আন্দোলনের অন্যতম প্রধান উৎস ছিল টি. ভি সাংবাদিকতা। আমেরিকায় ১৯৬০-এর দশকে টি. ভি-র ব্যাপক প্রসার বিশেষত ডাইরেক্ট সিনেমাকে উৎসাহিত করেছিল। ডাইরেক্ট সিনেমা ছবিগুলির প্রধান প্রচারক ছিল মার্কিন টি. ভি চ্যানেলগুলি। তাই ডাইরেক্ট সিনেমা এবং কিছুটা সিনেমা ভেরিতে তথ্যচিত্রগুলির ক্ষেত্রে নতুন দৃশ্য—শ্রাব্য মাধ্যমে সাংবাদিকতা (audio-visual journalism)-এর ঢং লক্ষ্য করা যায়। এইসব ছবিগুলির বিষয় ছিল দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, রাজনীতি, সংস্কৃতি, যার কিছুটা সংবাদমূল্য (news value) বর্তমান। নির্মানের ক্ষেত্রে সাংবাদিক সুলভ নৈর্ব্যক্তিকতা-র সঙ্গে মিশে ছিল সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গি। পরিচালক ব্যাখ্যাকারের ভূমিকা এড়িয়ে চললেও বিষয়ের গভীরতা এই ধরনের তথ্যচিত্রগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডাইরেক্ট সিনেমা ও সিনেমা ভেরিতে ছবির জনক রবার্ট ডিউ ১৯৬০-এর দশকে এ. বি.সি (ABC-TV), সি. বি. এস টি.ভি (CBS-TV) এবং এন. বি. সি (NBC-TV) প্রভৃতি মার্কিন টি. ভি চ্যানেলগুলিতে এধরনের তথ্যচিত্রের সম্প্রচার শুরু করেন। এই পর্যায়ে ডিউ-র সঙ্গে ছিলেন রিচার্ড লিক্‌ক, ডন পেনেবেকার, আলবার্ট মেইসেল্‌স, হোপ রাইডেন, জেমস্ লিপস্‌কম্ব ও গ্রেগরী সুকের। এই সময় এঁরা প্রায় ১৯টি তথ্যচিত্র তৈরি করেন। তার মধ্যে **প্রাইমারী** (১৯৬০), **দি চেয়ার** (১৯৬২) ছাড়াও **অন দি পোল** ('৬০) **এক্স-পাইলট** ('৬০), **কেনিয়া, আফ্রিকা** ('৬১), **ক্রাইসিস বিহাইন্ড এ প্রেসিডেনসিয়াল ইলেকসন** ('৬২) বহুল পরিচিত।

পরে এঁরা ব্যক্তিগত বা যৌথ উদ্যোগে ডিউ-র-দল থেকে বেরিয়ে বেশ কিছু তথ্যচিত্র নির্মান করেন । রবার্ট লিক্‌ক জয়েস চোপড়া-র সঙ্গে যৌথভাবে তৈরি করেন **হ্যাপী মাদার্স ডে** ('৬৩), লিবারমান-এর-সঙ্গে যৌথভাবে নির্মান করেন **এ স্ট্রাভিনস্কি পোর্টেট** ('৬৪)। লিক্‌ক -এর ক্যামেরায় ধরা পড়ত জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় (details) যা কখনো হত ব্যঙ্গাত্বক, কখনো হত তথ্যনির্ভর। লিক্‌ক-এর পরের দিকের ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল **কুইন অব অ্যাপেলো** ('৭০), **পোটেট অব মাউদ মরগেন** ('৮০) এবং **কমিউনিটি অব প্রেইস** ('৮২) ইত্যাদি।

ডন অ্যালান পেনেবেকার-এর উৎসাহ ছিল পপ আর্ট, সঙ্গীত ও মানুষের ' আত্মিক শক্তি'-র অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে। **ডোন্ট লুক ব্যাক** ও **মন্টোরী পপ** ছাড়াও তিনি নির্মান করেন, **ডেভিড** ('৬১), **জেন** (৬২), **ইউ আর নো বডি আনটিল সামবডি লাভস্ ইউ** ('৬৪)। প্যেনেবেকার-রে শেষ দিকের ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম হল **চিল্ড্রেন্‌স থিয়েটার অব জন ডোনেহিউ** ('৭১), **ব্ল্যাক ডান্স আমেরিকা** ('৮৩) ও **টাউন ব্লাডি হল** ('৭১)। শেষোক্ত ছবিটির বিষয় ছিল মানবী মুক্তি (women liberation) বিষয়ে কথাবর্তা ও আলোচনা।

১২.১১ জঁ রুশ ও সিনেমা ভেরিতে

'সিনেমা ভেরিতে' বা 'তথ্যচিত্র-সত্য' শৈলীর অন্যতম প্রধান শিল্পী ফরাসী তথ্যচিত্রকার জঁ রুশ। তিনি জাতিবিষয়ক (ethnographic) তথ্যচিত্র নির্মান করতেন। নির্মান কৌশল এবং বিষয়গত দিক থেকে তাঁর ছবিতে একটি আর্দশগত অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। বেশীরভাগ ইউরোপীয় নৃতাত্ত্বিকবৃন্দ জনজাতি বা প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলিকে 'সভ্যতাবিহীন বন্য' ভাবতে অভ্যস্থ ছিলেন। জঁ রুশের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি বলতেন জনজাতি গোষ্ঠীগুলিকে অসভ্য বলার কোন কারন নেই। তাদের জীবনযাপনও একধরনের সভ্যতা। তাঁর মতে 'জনজাতি গোষ্ঠীগুলির সামাজিক নিয়মকানুন তথাকথিত আধুনিক সমাজের মতই জটীল', তাদের ধর্ম আধুনিক ধর্মগুলির.থেকে কোন অংশে কম নয়, তাদের ব্যবহারিক জীবনও সভ্য সমাজের মতই যুক্তিপূর্ণ।

তাঁর জাতি বিষয়ক ভাবনার প্রতিফলন তাঁর ছবির আঙ্গিক ও কৌশলে পাত্তয়া যায়। প্রথমত জঁ রুশ মনে করতেন

কোন জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন, ধর্মাচরন এসব লিখে প্রকাশ করা সঠিকভাবে সম্ভব নয়, চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দৃশ্যগত উপস্থাপনা এক্ষেত্রে একমাত্র উপায়। দ্বিতীয়ত: জঁ রুশের মতে তথ্যচিত্রে নন্দনতাত্ত্বিক সৌন্দর্য্য প্রকাশের চেষ্টা সবচেয়ে বড় ভুল কারন সৌন্দর্য্য সৃষ্টির মাধ্যমে বাস্তবের উপর পরিচালকের মনোভাবকে চাপিয়ে দেওয়া হয়।

তৃতীয়ত: জঁ রুশের ছবিতে ক্যামেরার ব্যবহার ও ছবির আঙ্গিক গঠনে কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, দীর্ঘ সময়ের শট, হাতে বা কাঁধে বহন করা ক্যামেরা, ঘটনাস্থলে গৃহিত সিঙ্ক-সাউন্ড ও বিশেষ ধারাভাষ্যের ব্যবহার ইত্যাদি।

চতুর্থত: তাঁর মতে সাধারন মানুষ বা জাতি বিষয়ক ছবির প্রথম দর্শক হওয়া উচিৎ যাদের বিষয়ে ছবি তোলা হয়েছে সেইসব মানুষেরা।

উদাহরন হিসাবে বলা যায় যে জঁ রুশ তাঁর বিখ্যাত ছবি **ক্রনিকল অব দ্যা সামার** (১৯৬১) ছবির অসম্পাদিত ফুটেজ সেইসব লোকজনের সামনে প্রদর্শন করেন যারা নিজেরাই এ ছবির বিষয়। এই ফুটেজ দেখে তাদের মন্তব্য, মনোভাব ও প্রতিক্রিয়াও ক্যামেরায় ধারন (record) করা হয় এবং সম্পদানার সময় এ ছবির শেষ ভাগে জঁ রুশ এই নতুন রেকর্ড করা অংশটিও যোগ করে দেন। আফ্রিকান দুটি জনজাতিকে নি **মি, এ ব্ল্যাক** (১৯৫৮) ও **জাগুয়ার** ছবি দুটিতে ধারাভাষ্যে এক ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শোনা যায় যে নিজেই বিষয় বা টেক্সট-এর অন্তর্গত। তাঁর অন্যতম বিখ্যাত **লিটল বাই লিটল** ছবিতে প্যারিস শহরে উপস্থিত আফ্রিকান জনজাতির কয়েকজন মানুষের দৃষ্টিতে আধুনিক সভ্যতাকে দেখানো হয়েছে। সভ্য, আধুনিক মানুষ কেবল তাদের চোখ দিয়ে জনজাতি গোষ্ঠীগুলিকে দেখবে, নৃতত্ত্বের এই নিয়মকে তিনি বিপরীত ক্রমে দেখতে চেয়েছেন এ ছবিতে।

ফিউনারলি ইন বোঙ্গো (১৯৭৯), **দি ম্যানিক প্রিস্ট** (১৯৫৫) এবং **পানিশমেন্ট** (১৯৬৩) জঁ রুশের অন্যতম সৃষ্টি।

১৯৬১ সালে নির্মিত ক্রনিকল অব দ্য সামার ছবিটি সিনেমা ভেরিতে আন্দোলনের পক্ষে অন্যতম প্রধান ছবি বলে বিবেচনা করা হয়। এ ছবিতে প্যারিস শহরের রাস্তায় মূলত শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে কথাবর্তা বলা হয়েছে। যাদের ক্যামেরায় গ্রহন (record) করা হয়েছে, তাদের একটি প্রশ্ন করা হত 'তুমি কি সুখী' ("Are you happy?")| এ প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন মানুষের মুখ থেকে শোনা যেত বিভিন্ন ঘটনা, মনোভাব, ভাবনা ও আবেগের কথা। এ ছবির শব্দ সরাসরি গ্রহন (Sync. Sound) করা হয়েছিল ঘটনাবহুল থেকে। ছবির শেষ অংশে পরিচালক জঁ রুশ-কে দেখা যায় ক্যামেরার সামনে প্যারিসের পথে।

এ ছবির আগে ১৯৫৮ সালে জঁ রুশ নির্মান করেছিলেন **মি, এ ব্ল্যাক**। ছবিটিতে প্যারিসে তিনজন আফ্রিকান তরুনকে দেখা যায়। পরিচালক তাদের প্রত্যেককে আলাদভাবে প্রশ্ন করেন, "তুমি কি হতে চাও'। একজন উত্তর দেয় সে একজন বক্সার হতে চায়, অন্যজন চায় এক জনপ্রিয় অভিনেতা হতে। **মি, এ ব্ল্যাক** ছবিটি-র মূল বিষয় হল দুই ভিন্ন কৃষ্টি অর্থাৎ আধুনিক প্যারিস ও ধ্রুপদী আফ্রিকা-র সংস্কৃতিক আদান-প্রদানের অভিজ্ঞতা। জঁ রুশের অন্যান্য জাতিবিষয়ক ছবিগুলিতেও সংস্কৃতির মেলবন্ধন ও বিনিময় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠে।

জঁ রুশের ছবিতে ধারাভাষ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যদিও রুশ দৃশ্যকেই প্রাধান্য দিতেন অনেক বেশি করে, তবু তাঁর ছবির ধারাভাষ্যে বিশেষত্ব থাকত। আবেগ প্রবণ বর্ণনার পরিবর্তে জঁ রুশের ছবির ধারাভাষ্যের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পুঙ্খানুপুঙ্খ সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান যা বিবৃত হত কাব্যিক শব্দ চয়নের মাধ্যমে। চলচ্চিত্র তাত্ত্বিকদের মতে কেবলমাত্র সিনেমা ভেরিতে তথ্যচিত্রকারদেরই নয়, জঁ রুশের শৈলী কাহিনী-চিত্রের ক্ষেত্রেও জঁ লুক গোদারের ছবিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

১৯৫০-এর শেষ ও ১৯৬০-এর দশকের ফরাসী নব-তরঙ্গের চলচ্চিত্র জঁ রুশের ছবিগুলির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল। বিশেষ করে জঁ লুক গোদারের বিভিন্ন ছবির ধারাভাষ্যে জঁ রুশের সরাসরি প্রভাব পাওয়া যায়।

অন্যান্য মানব/ জনজাতি (ethnographic) বিষয়ক ছবিগুলিতে চেষ্টা করা হত বিশুদ্ধ জনজাতির সংস্কৃতিকে ধরতে। রুশ বলতেন বিশুদ্ধ এথনোগ্রাফিক ছবি সম্ভব নয় কারন ক্যামেরার সামনে মানুষের আচরন বাস্তবের মত স্বাভাবিক থাকে না। জঁ রুশের কাছে তাই ক্যামেরার সামনে মানুষের আচরনই ছিল প্রকৃত 'চলচ্চিত্র সত্য' বা 'সিনেমা ভেরিতে'।

১২.১২ বানিজ্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠান বিষয়ক তথ্যচিত্র

তথ্যচিত্র নির্মানের পেশায় যে সব পরিচালক নিয়োজিত আছেন তাদের কাছে 'বানিজ্য সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বিষয়ক তথ্যচিত্র' বা 'করপোরেট ডকুমেন্টারী' (corporate documentary) যথেষ্ট অর্থকরী ও ভালো কাজ বলে স্বীকৃত। আজকাল যেহেতু বানিজ্য ও বিভিন্ন বানিজ্য প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সমাজে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তাই করপোরেট তথ্যচিত্র সম্পর্কে তথ্যচিত্র নির্মাতাদের আরও বেশি ওয়াকিবহাল হওয়া উচিৎ কারন আমাদের দেশে 'বানিজ্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠান বিষয়ক' (corporate) তথ্যচিত্রের মান ইদানিং যথেষ্ট ভাল হচ্ছে না।

বিষয়গতভাবে 'বানিজ্য সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান' বিষয়ক ছবিগুলি তথ্যচিত্রের একটি স্বতন্ত্র জঁর (genre) বা স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করেছে। এ ধরনের তথ্যচিত্রের ইতিহাস যথেষ্ট পুরোন এবং তথ্যচিত্রের ইতিহাসের বেশ কয়েকটি ধ্রুপদী তথ্যচিত্র হল 'করপোরেট ডকুমেন্টারী'। তথ্যচিত্রের প্রবাদ পুরুষ রবার্ট ফ্ল্যাহার্টি-র বেশ কয়েকটি অন্যতম প্রধান ছবি হল করপোরেট ডকুমেন্টারী। ১৯৩৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ফ্ল্যাহার্টিং **ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্রিটেন** ছবির প্রযোজক ছিল 'মার্কেটিং বোর্ড। ১৯৪২ সালে নির্মিত **দি ল্যান্ড** তথ্যচিত্রটির প্রযোজক ছিল 'মার্কিন কৃষি বিভাগ'। ফ্ল্যাহার্টি-র শেষ তথ্যচিত্র **লুসিয়ানা স্টোরী** ছবিটি তৈরি হয়েছিল আমেরিকায় নিউ জার্সি প্রদেশের 'স্ট্যান্ডার্ড অয়েল' নামের একটি খনিজ তেলের কোম্পানীর উদ্যোগে ও অর্থে।

ব্রিটিশ তথ্যচিত্রকার জন গ্রিয়ারসনও এ ধরনের তথ্যচিত্রে আগ্রহী ছিলেন। লন্ডন জি. পি. ও-র উদ্যোগে ও অর্থে গ্রিয়ারসন প্রযোজনা করেন বিখ্যাত **নাইটমেল** (১৯৩৫) ছবিটি। এছাড়া জি. পি.ও-র উদ্যোগে গ্রিয়ারসনের প্রযোজনায় বেসিল রাইট, হ্যারী ওয়াট, কাভালকান্ড অর্থার এলটন এঁরা বেশ কয়েকটি বিখ্যাত ছবি পরিচালনা করেন।

প্রধানত জন গ্রিয়ারসন-এর উৎসাহে শেল (Shell) কোম্পানী সারা পৃথিবী জুড়েই বিভিন্ন ভাষায় এ ধরনের তথ্যচিত্র নির্মানের উদ্যোগ নেয়। শেল কোম্পানীর প্রযোজনায় বিখ্যাত ছবিগুলি হল **এয়ারপোর্ট** ('৩৫), **গ্রাঁ প্রি** ('৪৯), **হিলিট্র অব হেলিকপ্টার** ('৫১) প্রভৃতি। শেল ফিল্ম ইউনিট স্থাপিত হয় সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তথ্যচিত্র নির্মানের উদ্দেশ্য নিয়ে। এই ফিল্ম ইউনিটের প্রধান হয়েছিলেন গ্রিয়ারসনের অন্যতম শিষ্য ও প্রখ্যাত ব্রিটিশ তথ্যচিত্রকার আর্থার এলটন। তাঁর নেতৃত্বে শেল কোম্পানী ইংল্যান্ড, আমেরিকা এমনকি এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষার ছবি তৈরি করতে থাকে।

ভারতেও 'বানিজ্য সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান' বিষয়ক তথ্যচিত্রে নির্মানের রেওয়জি দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে। বিশেষ করে স্বাধীনতার পরবর্তি সময়ে অর্থাৎ ১৯৫০-এর দশকে পল জিলস্, ফিলি বিলমোরিয়া, এজরা মির ও হরিসাধন দাশগুপ্ত-এর মত তথ্যচিত্রকার করপোরেট ডকুমেন্টারীর ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। 'বার্মা শেল কোম্পানী', 'টাটা স্টিল কোম্পানী' ও 'টেকনিক্যাল কো-অপারেশন মিশনের '-উদ্যোগে বেশ কয়েকটি ভালো তথ্যচিত্র নির্মান করা সম্ভব হয়েছিল। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পল জিলস্-এর বার্মা শেল-এর প্রযোজনায় নির্মিত তথ্যচিত্র **মার্শাল গন্সার অব মালাবার** ('৫৭) এবং হরিসাধন দাশগুপ্ত পরিচালিত টাটা স্টিল কোম্পানীর উদ্যোগে নির্মিত তথ্যচিত্র **দি স্টোরী অব স্টিল** ('৫৬)।

এখনকার ভারতের বেশ কজন বড় কাহিনীচিত্র ও তথ্যচিত্র পরিচালক করপোরেট তথ্যচিত্র তৈরিতে বিশেষ অবদান রেখেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হল শ্যাম বেনেগাল, গোবিন্দ নিহালনী, গৌতম ঘোষ, কেতন মেহতা, উৎপলেন্দু চক্রবর্ত্তি, জাব্বার প্যাটেল। এদের মধ্যে দু-একজনের চলচ্চিত্র পরিচালনায় হাতেখড়ি হয়েছে 'বানিজ্য সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান' বিষয়ক তথ্যচিত্র তৈরির মাধ্যমে।

পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে করপোরেট ডকুমেন্টারীগুলিকে নিয়ে চলচ্চিত্র উৎসব হয়। ১৯৯১ সালে 'পাবলিক রিলেশনস্ সোসাইটি অব ইন্ডিয়া'-র কলকাতা পর্যায়ের উদ্যোগে এ দেশের প্রথম করপোরেট তথ্যচিত্রের উৎসব আয়োজিত হয়েছিল কলকাতা শহরে।

আজকাল পৃথিবীর সবদেশেই 'বানিজ্য সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান'বিষয়ক তথ্যচিত্র বা করপোরেট ডকুমেন্টারী তৈরির চল অনেক বেড়ে গেছে। এদেশে ও ভিডিও, টি.ভি ও চলচ্চিত্র মাধ্যমে অনেক বেশি সংখ্যায় এ ধরনের তথ্যচিত্র নির্মান করা

হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন 'বানিজ্য সংস্থাও প্রতিষ্ঠান' তাদের কর্মধারা, ভাবমূর্তি ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বব্যাপী বানিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে করপোরেট তথ্যচিত্র তৈরির প্রবনতা আরও বাড়বে এতে কোন সন্দেহ নেই।

গত দু-আড়াই দশকে ভারতে নির্মিত করপোরেট ছবিগুলির বেশির ভাগই আশাপ্রদ মানের হয় নি। এর অন্যতম প্রধান কারন হল পরিচালকের মনোভাব (attitude) এদেশে করপোরেট ছবিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর তথ্যচিত্র এবং কেবল অর্থ উপার্জনের পথ হিসাবে মনে করা হয়। তাই বেশীরভাগ করপোরেট ছবি তৈরির ক্ষেত্রে পরিচালকদের কাজ হয় দায়সারা। ফলে ছবিগুলি শিল্পত্তীর্ন হয় না। তাছাড়া এ ধরনের ছবিতে আঙ্গিক ও শৈলী বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এদেশে এত কম হয় যে করপোরেট ছবি মাত্রই বর্ণনামূলক একঘেয়ে প্রচার (monotonous publicity) বলে মনে হয়।

অথচ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তথ্যচিত্রের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে বেশ কয়েকটি ধ্রুপদী তথ্যচিত্র আসলে করপোরেট ডকুমেন্টারী । সুতরাং করপোরেট ছবি শিল্পত্তীর্ণ হবে না এরকম ধরে নেওয়ার কোন কারন নেই।

দ্বিতীয় আর একটি সাধারন সমস্যা থাকে করপোরেট ছবি ক্ষেত্রে। বেশীরভাগ সময় পরিচালক বিজ্ঞাপন চিত্রের মনোভাব (attitude)-এর সঙ্গে করপোরেট তথ্যচিত্রের পার্থক্য করতে ব্যর্থ হন। যেহেতু দুই ক্ষেত্রেই একটি বানিজ্য সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ জড়িত। একথা মনে রাখা দরকার যে প্রথমত: বিজ্ঞাপন ছবি একটি বা একাধিক পন্যের বাজার সৃষ্টি করতে চায় কিন্তু করপোরেট তথ্যচিত্র সমগ্র বানিজ্য সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্ত্তি ও কর্মকান্ডের সঙ্গে দর্শকের পরিচয় করে দিতে চায়। সুতরাং বিজ্ঞাপন চিত্রের খুব সামান্যই সামাজিক বেশীরভাগটাই বানিজ্যিক। কিন্তু করপোরেট তথ্যচিত্র বহুলাংশে সামাজিক।

দ্বিতীয়ত ঃ বিজ্ঞাপন চিত্রের-ক্ষেত্রে দর্শকের মনে তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির মনোভঙ্গি পরিচালকের মনে কাজ করে, পক্ষান্তরে করপোরেট তথ্যচিত্রের দর্শকের কাছে গ্রহণ (reception) দীর্ঘমেয়াদী । অর্থাৎ বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ (public relations)-এর মধ্যে যে পার্থক্য বিজ্ঞাপনচিত্র ও করপোরেট তথ্যচিত্রের মধ্যে সেই পার্থক্য বর্তমান।

এছাড়া অনেক সময়ে করপোরেট তথ্যচিত্র এবং প্রোপাগান্ডা বা প্রচার ছবির উদ্দেশ্য এক করে ফেলা হয়, এই মনোভাব ভুল। প্রচার মূলক (propaganda) তথ্যচিত্রে অর্ধসত্য, অতিরঞ্জিত তথ্য পরিবেশন করা হয় কোন সংস্থা বা ব্যক্তিকে অতিমানবিক করে তোলার জন্য। করপোরেট ছবির ক্ষেত্রে বরং মানুষ, কর্মী, শ্রমিক ও সর্বোপরী সমাজের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে কোন সংস্থার সম্পর্ক ব্যক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে সংস্থার ভাবমূর্তিও কর্ম পদ্ধতির চলচ্চিত্রায়ন হয়। করপোরেট ছবির ক্ষেত্রে প্রচার মূলক ছবির একেবারে বিপরীত মনোভাব নিতে হয়, অর্থাৎ পরিচালককে অনেক বেশী বিনয়ের সঙ্গে বিষয়কে তুলে ধরতে হয় (humble approach) এবং সত্য ও তথ্য নিষ্ঠ হতে হয়।

করপোরেট ছবির ক্ষেত্রে, বিশেষত ভারতীয় তথ্যচিত্রগুলির ক্ষেত্রে যে সব সীমাবদ্ধতাগুলি সাধারনত লক্ষ্য করা যায় যেগুলি হল:

১. বিষয়কে পরিচ্ছন্ন ভাবে ও সরলভাবে তথ্যচিত্রে তুলে ধরার ক্ষেত্রে পরিচালকরা যথেষ্ট যত্নবান হন না। করপোরেট তথ্যচিত্রগুলি বেশীরভাগ সময়ই সংস্থার উদ্দেশ্য ও কর্মকান্ডের অপরিকল্পিত ও খন্ড খন্ড বর্ণনার স্তুপ হয়ে ওঠে, একটি সরল, স্বাচ্ছন্দ্য সামগ্রিক গঠন পাবার পরিবর্তে।

২. যে সব দর্শক দেখবেন এ ছবি, তাদের আকর্ষন করার মত উপাদান থাকে না করপোরেট ছবিগুলিতে, অথচ আমরা যদি ফ্ল্যাহার্টি বা প্রিয়ারসন নির্মিত করপোরেট তথ্যচিত্রগুলির কথা ভাবি তাহলে দেখবো যেগুলির তথ্যচিত্র হিসাবে যথেষ্ট আকর্ষনীয়।

৩. এ ধরনের ছবিতে সাধারনত সংস্থার কোন মুখপাত্র বা বড়মুখ্য কর্তাব্যক্তিকে দিয়ে দীর্ঘ বক্তব্য বলানো হয়। বেশি কথা, দীর্ঘ একঘেয়ে সাক্ষাৎকার থাকলে তথ্যচিত্রের মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৪. সাধারনত করপোরেট তথ্যচিত্রগুলির ক্ষেত্রে স্বভাবিক প্রবনতা হল সম্পাদনার সময় অকারন বিভিন্ন কৌশল, গিমিক ও বিশেষ কৌশল (special effect) ব্যবহার করা। উদ্দেশ্যহীন চমকের পরিবর্তে তথ্যচিত্রকে সুপরিকল্পিত ভাবে প্রাণবন্ত করে তোলার উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ।

করপোরেট ছবি তৈরি আগে ছবির উদ্দেশ্য ও দর্শকদের রুচি, চাহিদা সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিৎ। একথা **ঠিক** যে সংস্থার ভাবমূর্ত্তি (corporate image) তৈরির জন্য এধরনের তথ্যচিত্র তৈরি করা হয়। তবে 'সংস্থার ভাবমূর্ত্তি' গড়ে তোলার কাজটি যাতে স্থূল প্রচার হয়ে না ওঠে সে দিকে নজর রাখতে হবে। স্থূল প্রচারের পরিবর্তে সংস্থার কর্মকান্ডের সামাজিক ও জনসেবামূলক দিকটি তথ্যচিত্রে তুলে ধরতে পারলে তবেই 'করপোরেট ইমেজ' তৈরির কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় এবং ছবি তৈরির উদ্দেশ্য সফল হয়। উদাহরণ হিসাবে 'স্ট্যান্ডার্ড অয়েল' নামের তেল উৎপাদক সংস্থার জন্য তৈরি ফ্ল্যাহার্টি-র করপোরেট তথ্যচিত্র **ল্যুসিয়ানা স্টোরী**-র কথা বলা যায়। এ ছবিতে সংস্থার তেল খোঁজার সঙ্গে সঙ্গে ই ফ্ল্যাহার্টি তুলে ধরেছেন প্রকৃতির রহস্যময়তা, লোককথা, মানুষদের সঙ্গে প্রকৃতির লড়াই-এর বিবরণ।

বেসিল রাইট-হ্যারী ওয়াট পরিচালিত **নাইটমেল** ('৩৫) ছবির কথাও বলা যায়। এ ছবি লন্ডন জি. পি. ও সংস্থার উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল। ছবিতে রাত্রে ডাক নিয়ে যাওয়ার কর্মকান্ড দেখানোর সঙ্গে মিশে গিয়েছিল কর্মীও শ্রমিকদের অনবদ্য কর্ম তৎপরতা ও সংস্থার জনসেবার ঐতিহ্য-এর ইতিহাস। ফলে **ল্যুসিয়ানা স্টোরী** ও **নাইট মেল**-এর মত বানিজ্য সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বিষয়ক ছবিগুলি সাধারন দর্শকের কাছেও ধ্রুপদী তথ্যচিত্র রূপে স্বীকৃত হয়েছে।

সফল করপোরেট তথ্যচিত্র নির্মানের ক্ষেত্রে তাই নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রেখে কাজে নামা উচিৎ প্রথমত: যে সংস্থার বিষয়ে ছবি হবে। সেই সংস্থার লক্ষ্য (objective),সংস্থার উৎপাদিত দ্রব্য / সেবার বৈশিষ্ট্য সমূহ সঠিকভাবে বুঝতে হবে। এর সঙ্গে যুক্ত হবে তথ্যচিত্র কিভাবে গড়ে উঠবে যে সম্পর্কে সঠিক ধারনা (concept) ও তথ্যচিত্র তৈরির উদ্দেশ্য (purpose) সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা অর্জন ।

দ্বিতীয়ত ঃ কোন ধরনের দর্শকের কাছে ছবিটি দেখানো হবে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া উচিৎ। দর্শকের সামাজিক অবস্থান ও রুচি অনুসারে ছবিটিকে প্রানবন্ত করে তোলার জন্য যা করনীয় তাই করতে হবে। এছাড়া ঐ বিশেষ শ্রেণীর দর্শকের কাছে ছবিটিকে সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে গেলে যে ধরনের ফরমেট (format)-এ অর্থাৎ ভিডিও বা টি. ভি. বা ফিল্ম (১৬ মি.মি না কি ৩৫ মি. মি.) ছবি করা দরকার তা ঠিক করে নিতে হবে।

তৃতীয়ত ঃ চিত্রগ্রহন শুরুর আগেই চিত্রগ্রহনের স্থান (Location), চিত্রনাট্য, ইত্যাদি ভালোভাবে দেখে নিলে সময় ও শ্রম নষ্ট হয় না। তাছাড়া তথ্যচিত্রে অকারন বেশি কথা বা অপ্রয়োজনীয় সাক্ষাৎকারের পরিবর্তে কর্মরত মানুষ ও শ্রমিকের হাত, মুখ, কর্মরত মানুষের শরীরের ছন্দ ইত্যাদি বেশি করে দেখানো উচিৎ।

চতুর্থত ঃ ধারভাষ্যে অতিরিক্ত কথা বর্জন করতে হবে। কথার পরিবর্তে দৃশ্যের দিকে গুরুত্ব দিলে ছবি অনেক বেশি আকর্ষন হয়। ধারাভাষ্যের ভাষা যেমন দুর্বল ও একঘেয়ে হওয়াও উচিৎ নয়। তেমনি অকারন কাব্যিক ও আলঙ্কারিক হওয়া উচিৎ নয়। বেশি কথার পরিবর্তে আবহ সঙ্গীত ব্যবহারের দিকে নজর দিলে ভালো হয়।

পঞ্চমত: করপোরেট তথ্যচিত্রের ক্ষেত্রেও শৈলী ও আঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ। শৈলী ও আঙ্গিক গতানুগতির (convensional) হলে, দর্শকের কাছে তথ্যচিত্র একঘেয়ে হয়ে বোধ হয়। তথ্যচিত্র-কে প্রাণবন্ত ও শিল্পত্তীর্ন হতে গেলে শৈলী ও আন্দিকে বৈচিত্র্য আনতে হবে।

১২.১৩ সারাংশ

কাহিনী চিত্রের মতই তথ্যচিত্রও চলচ্চিত্র মাধ্যমের অন্যতম প্রধান বিষয়। প্রসঙ্গত ল্যুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয়ের রেকর্ড করা প্রথম ছবি থেকেই বলা যায় তথ্যচিত্রের ইতিহাস শুরু হয়। তথ্যচিত্রের ইতিহাস তাই প্রাচীন। অবশ্যই চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তথ্যচিত্র নির্মানের বিভিন্ন শৈলী গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন বিষয়ে তথ্যচিত্র নির্মিত হয়েছে। রাজকীয় প্রচারের বিষয় থেকে রাজনৈতিক হত্যার গোপন নথি-সর্বত্র তথ্যচিত্র তার অবদান রেখেছে।

তথ্যচিত্রের ইতিহাসে যিনি প্রথম বিপ্লব ঘটান তিনি রবার্ট ফ্ল্যাহার্টি। ১৯২২ সালে তাঁর **'নানুক অফ দ্য নর্থ'** তথ্যচিত্রের

ইতিহাসে অন্যতম মাইলস্টোন। ফ্ল্যাহার্টির প্রায় সমসাময়িক হলেন ইংরেজ তথ্যচিত্রকার জন গ্রীয়ারসন, যিনি প্রথম 'ডাকুমেন্টারী' (তথ্যচিত্র) কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। লন্ডন জি. পি. ও-র প্রয়োজনায় এক ঝাঁক তরুনকে নিয়ে প্রিয়ারসন তথ্যচিত্রের একটি নতুন অধ্যায়ের শুরু করেন।

বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত তথ্যচিত্রকাররা (নির্বাক) তথ্যচিত্রকে একেবারে অন্যরূপ দান করেন। টেকনিক, ফর্ম ও বিষয়ের দিক থেকে বিপ্লব ঘটায় জিগা ভের্তভের **ম্যান উইথ দ্যা মুভী ক্যামেরা** তথ্যচিত্রটি। ভের্তভ ঘোযনা করেন, কাহিনীচিত্র নয় তথ্যচিত্রেই চলচ্চিত্রের সফলতম প্রয়োগ সম্ভব হয়। সোভিয়েত তথ্যচিত্রের বিশাল প্রভাব দেখা যায় পরবর্তিকালের (বিশেষত পূর্ব-ইউরোপের) তথ্যচিত্র নির্মাতাদের মধ্যে।

বিদেশের সঙ্গে ভারতেও তথ্যচিত্র নির্মান চলতে থাকে। স্বাধীনতার পর 'ফিল্মস্ ডিভিশন অব ইন্ডিয়া' তৈরি হয়, যে সংস্থা বিগত পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে তথ্যচিত্র প্রযোজনা করে চলেছে। হরিসাধন দাশগুপ্ত বা শুকদেবের মত তথ্যচিত্রেরদের পাশাপাশী সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মান কাউল, শ্যাম বেনেগালদের মত মূলত কাহিনীচিত্র পরিচালকরাও উন্নত মানের তথ্যচিত্র নির্মান করেছেন।

তথ্যচিত্র ইতিহাসে নতুন ধারার সংযোজন হয় 'সিনেমা ভেরিতে' ও 'ডাইরেক্ট সিনেমা'র যুগ থেকে। ১৯৬০-এর দশকে হালকা ক্যামেরা, তুচ্ছ বিষয় কিন্তু গভীর বিশ্লেষন ও সিঙ্ক সাউন্ড-কে সঙ্গে নিয়ে 'সিনেমা ভেরিতে' আন্দোলন আমেরিকা ও ফ্রান্সে বিপুলভাবে গ্রীহিত হয়। 'সিনেমা ভেরিতে' আন্দোলন উপহার দেয় জঁ রুশের মত বেশ কয়েকজন বিখ্যাত তথ্যচিত্র পরিচালক।

তথ্যচিত্র কেবলমাত্র তথ্য সরবারহ বা শিক্ষাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। তথ্যচিত্র বার বার প্রতিবাদের হাতিয়ারও হয়ে উঠেছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে মার্কিন তথ্যচিত্রকারদের ছবিগুলি অথবা **ব্যাটল অফ চিলি**-র মত তথ্যচিত্রের উদাহরণ দেওয়া যায়।

আজকাল টেলিভিশনের বিপুল প্রসার ও হাল্কা ক্যামেরা এবং সঙ্গে শব্দ রেকর্ড করার উন্নততর ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হওয়ায় তথ্যচিত্রের পরিচালকদের গতিবিধি অনেক অবাধ হয়েছে। ফলে তথ্যচিত্রের সম্ভাবনা বহুগুন বেড়ে গেছে। আধুনিক চলচ্চিত্রে কেবলমাত্র অকাহিনীমূলক চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেই নয় তথ্যচিত্রের শৈলী ও বিষয়ের বহু মুন্সীনতা কাহিনী চিত্র কেত প্রভাবিত করেছে।

১২.১৪ অনুশীলনী

(নৈর্বক্তিক প্রশ্নাবলী)

নিম্নলিখিত তথ্যচিত্রগুলির পরিচালকদের নাম বলুন-

১। বার্লিন: সিম্ফোনী অব দ্য সিটি

২। দ্য রিভার

৩। ম্যান অব অ্যারান

৪। ট্রেন অ্যারাইভিং স্টেশন

৫। ম্যান উইথ দ্য মুভী ক্যামেরা

৬। পাঁচটুপী: এ ভিলেজ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল

৭। সঙ অব সীলোন ও দ্য নাইটমেল

৮। নাইট এন্ড ফগ

(স্বল্প দৈর্ঘ্যের উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী)

১। তথ্যচিত্র ও কাহিনীচিত্রের পার্থক্য সংক্ষেপে বলুন।

টীকা লিখুন-

২। জঁ রুশ

৩। ফ্ল্যাহার্টি, রবার্ট

৪। জন গ্রীয়ারসন

৫। জরিস ইভান্স

৬। এস্থার শাব

৭। লেনী রিফেন স্টাহ্‌ল

(দীর্ঘ উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী)

১। জিগা ভের্তভ ও বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত তথ্যচিত্র-বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২। ভারতীয় তথ্যচিত্রের প্রসারে ফিল্মস্ ডিভিশন অব ইন্ডিয়ার ভূমিকা আলোচনা করুন।

৩। সিনেমা ভেরিতে ও ডাইরেক্ট সিনেমা বলতে কী বোঝোন? ইতিহাসে এ দুটির গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৪। বিল নিকল্‌স শৈলীর নিরিখে তথ্যচিত্রকে কয়ভাগে ভাগ করেছেন? প্রতিটি ভাগ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৫। তথ্যচিত্রের বিষয় বৈচিত্র্য সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

১২.১৫ গ্রন্থপঞ্জী

১। নন-ফিকশন ফিল্ম-এ ক্রিটিক্যাল হিস্টি: রিচার্ড এম বারসাম, ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ব্লুমিংটন, রিভাইস্‌ড এডিশন, ১৯৯২

২। কিনো: এ হিস্ট্রি অব রাশিয়ান এন্ড সোভিয়েত ফিল্ম, জয় লিডা, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ জার্সি, তৃতীয় সংস্করন, ১৯৮৩

৩। ডকুমেন্টারী: এরিক বার্নাউ, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউইয়র্ক, রিভাইস এডিশন,১৯৮৩

৪। মাস কমিউনিকেশন ইন ইন্ডিয়া: কেবল জে .কুমার, জেইকো পাবলিকেশনস, নিউদিল্লি,১৯৮৯

৫। তথ্যচিত্র কথকথা: (সংকলন), ঋত্বিক সনে সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৯৫

৬। মুভীস এন্ড মেযডস (ভল্যম ২), বিল নিকল্‌স (সম্পা.), সীগাল বুকেস্, কলকাতা, ১৯৯৩ [প্রবন্ধ: বিয়ণ্ড ভেরিতে: যমাস ওয়া এবং বিয়ন্ড অবসার ভেশনাল সিনেমা: ডি. ম্যাগডুগাল]

একক ১৩ ☐ বিজ্ঞাপন চিত্র

গঠন

১৩.১ উদ্দেশ্য

১৩.২ প্রস্তাবনা

১৩.৩ বিজ্ঞাপন ও গনমাধ্যম

১৩.৪ বিজ্ঞাপনচিত্র: মাধ্যমগত চারিত্র্য

১৩.৫ বিজ্ঞাপন চিত্র: প্রকারভেদ

১৩.৬ বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্র নির্মাণ ও গুণগতমান

১৩.৬.১ বিজ্ঞাপন চিত্র নির্মাণ

১৩.৬.২ বিজ্ঞাপন চিত্র গুণগতমান

১৩.৭ বিজ্ঞাপনচিত্র: শিল্পগুণ

১৩.৮ বিজ্ঞাপনচিত্রের বানিজ্যিক সাফল্য

১৩.৯ বিজ্ঞাপনচিত্র ও নৈতিকতা

১৩.৯.১ বিজ্ঞাপন চিত্র : আদর্শগত অবস্থান

১৩.৯.২ বিজ্ঞাপন চিত্র ও টাইপ

১৩.৯.৩ বিজ্ঞাপন চিত্রে মেয়েদের আদর্শগত অবস্থান

১৩.১০ বিজ্ঞাপনচিত্র: আচরন বিধি

১৩.১১ বিজ্ঞাপন চিত্রের চিত্রনাট্য

১৩.১২ সারাংশ

১৩.১৩ অনুশীলনী

১৩.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

১৩.১ উদ্দেশ্য

এই একক থেকে জানতে পারবেন—

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় পন্য উৎপাদন, বাণিজ্য ও গনমাধ্যম এই তিনটি বিষয় অন্যতম স্তম্ভ। আবার বাণিজ্যিক সংস্থায়-দ্বারা উৎপাদিত পন্য/ পরিষেবা সংক্রান্ত খবরের সঙ্গে জনগণের সংযোগ স্থাপন করে গণমাধ্যমে প্রচারিত বিজ্ঞাপন, চলচ্চিত্র (cinema) ও অন্যতম গণমাধ্যম হিসাবে বিজ্ঞাপন প্রস্তুত ও প্রচারের মাধ্যমে বানিজ্য দুনিয়া ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে। আবার এ কথা ভুললে চলবে না যে টিলিভিশনের পরেই এ দেশের সর্ববৃহৎ গনমাধ্যম চলচ্চিত্র। সুতরাং চলচ্চিত্র বিজ্ঞানের অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। এই এককে আমরা তাই 'চলচ্চিত্র মাধ্যমে বিজ্ঞাপন' এবং বিজ্ঞাপনচিত্র (advt. films) এর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি।

১৩.২ প্রস্তাবনা

বিজ্ঞাপনচিত্র (advertise films) চলচ্চিত্র শিল্প (film industry)-এর অন্যতম প্রধান আয়ের উৎস। কেবলমাত্র আয়ের উৎসই নয় নতুন পরিচালক, ক্যামেরাম্যান ও কলাকুশলীদের আপন শিল্প প্রতিভার প্রমাণের সোপনি হিসাবে কাজ করে থাকে বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মান, যদিও বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মানের বিষয়টি সাধারন চলচ্চিত্র নির্মানের থেকে একটু আলাদা। বিভিন্ন কারণে ভারতবর্ষে বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মান শিল্প (industry)-এর প্রসার প্রভূত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আশানুরূপ নয়। যাই হোক যদিও বিজ্ঞাপনচিত্র এখন চলচ্চিত্র শিল্প (industry)-এর এবং সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে তবু বিজ্ঞাপনচিত্রের সাধারনত কিছু আদর্শগত (ideological) বিশেষত্ব বা বলা ভাল আদর্শগত সমস্যা থেকেই যায়। বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মানের বিভিন্ন কৌশল জানার সঙ্গেই এর আদর্শগত অবস্থান সম্পর্কেও বিশ্লেষনী দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার।

১৩.৩ বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্র

বিজ্ঞাপন ও গনমাধ্যম

আধুনিক যুগে আমরা যে সমাজ ব্যবস্থায় বাস করি তা আর্থ সামাজিকভাবে বানিজ্য প্রধান। পন্যের উৎপাদন, বানিজ্য ও বন্টন এই সমাজ ব্যবহার প্রধান স্তম্ভ। উৎপাদকের দিক থেকে পন্য উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল পন্য/পরিষেবা বিক্রয়, অন্যদিকে জনসাধারনের কাছে উৎপাদিত পন্যের ক্রয় বা ভোগ (consumption) হল প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং, বিক্রয় ও ক্রয়-এর এই ব্যবস্থায় বিক্রেতার সঙ্গে ক্রেতার- সংযোগ (communication) ঘটায়।

'বিজ্ঞাপন' কথার অর্থ হল বিশেষ রূপে 'জ্ঞাপন' (communication) সাধারনত উৎপাদিত পন্য, উৎপাদক সংস্থা ইত্যাদির সম্পর্কে জনসাধারনকে অবহিত করার জন্য যে বার্তা (message) প্রস্তুত করা হয় তার প্রচার হল সেই সংযোগ ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান উপায় যা বিক্রেতার সঙ্গে প্রচার মাধ্যমের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক।

বিভিন্ন ধরনের গনমাধ্যম (mass media)-এ বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়ে থাকে। আধুনিক যুগে বিজ্ঞাপন প্রচারের প্রধান দুটি মাধ্যম হল 'ছাপার-মাধ্যম'(print media) অর্থাৎ দৈনিক খবরের কাগজ, সাময়িক পত্রিকা, লিফলেট, ইত্যাদি। ছাপার মাধ্যম ছাড়াও রয়েছে দৃশ্য-শ্রাব্য'-(audio-visual) মাধ্যম। দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমগুলির মধ্যে রয়েছে টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র, এছাড়া রয়েছে সর্বাধুনিক প্রচার মাধ্যম 'ইন্টারনেট' (internet)।

বিজ্ঞাপনের প্রচার মাধ্যম (advertisement mediam) হিসাবে চলচ্চিত্র (film) অন্যান্য প্রচার মাধ্যমগুলি থেকে একটু পৃথক। প্রথমত, 'ছাপার মাধ্যম' (print media)-গুলির সঙ্গে তুলনা করলে বলা যায় যে খবরের কাগজ বা পত্র-

পত্রিকায় বড় জোর স্থির চিত্র ও লিখিত ভাষার সাহায্য নেওয়া যায় বিজ্ঞাপনের বার্তা প্রচারের জন্য সেখানে চলচ্চিত্রে চলমান ছবি এবং সঙ্গে শ্রাব্য (sound) মাধ্যমের সুবিধা পাওয়া যায়। অবশ্য টেলিভিশন মাধ্যমেও সুবিধাগুলি বর্তমান।

তবে দর্শকের দিক থেকে দেখলে টেলিভিশন মাধ্যম অনেক বেশি নমনীয় (flexible) কারণ একটি চলচ্চিত্রের মধ্যে বিজ্ঞাপনের দর্শক হয় একটি নির্দিষ্ট ছবির প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত দর্শকবৃন্দ। যেখানে টেলিভিশন-এর দর্শকরা বাড়িতে বসেই অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে বিজ্ঞাপন দেখতে পান। এছাড়া অনুষ্ঠানের বিরতিতে বার বার বিজ্ঞাপনটি দেখানোর সুযোগ টেলিভিশনে রয়েছে, কিন্তু চলচ্চিত্র মাধ্যমে নেই।

প্রেক্ষাগৃহে একটি ছবি (film)-এর মধ্যে যখন বিজ্ঞাপন দেখাতে হয় তখন কেবলমাত্র দুটি জায়গা সাধারনত পাওয়া যায়। প্রথমত ঃ ছবি শুরুর ঠিক আগে, দ্বিতীয়তঃ ছবি চলাকালীন মাঝের বিরতি (interval)-তে বিজ্ঞাপন-চিত্র প্রদর্শন করা সম্ভব। উপরন্তু বিজ্ঞাপন ছবি (advt. film) তৈরির খরচ টি. ভি বিজ্ঞাপন, অর্থাৎ ভি.ডি.ও ফর্ম্যাটে তোলা ছবির তুলনায় বা খববের কাগজ/ পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচারের খরচের চেয়ে বহুগুন বেশি।

উল্লিখিত বিভিন্ন কারনগুলির জন্য বিজ্ঞাপন চিত্রের মাধ্যমের তুলনায় এখন যথেষ্ট কমে গেছে। বিজ্ঞাপন চিত্রের বেশিরভাগটাই এখন তাই ভিডিও চিত্র, সেলুলয়েডে বা ফিল্ম মাধ্যমে তোলা চিত্র নয়। টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন প্রচারের সুযোগ সময়ের হিসাবে ছবি (film) -এর তুলনায় অনেক বেশি। এর অন্যতম কারন হল টি. ভি সংস্থাগুলির অর্থ - সংস্থানের প্রধান উৎস হল বিজ্ঞাপন। কিন্তু চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন আয়ের প্রধান উৎস নয়। স্বভাবতই একটি ছবি (film)দেখতে গিয়ে দর্শক খুব কম সময়ই বিজ্ঞাপন দেখেন।

১৩.৪ বিজ্ঞাপন চিত্র (advt. films) : মাধ্যমগত চারিত্র্য

বিজ্ঞাপন-চিত্র বা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ফিল্মের বেশ কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই সব বৈশিষ্ট্যগুলি বিজ্ঞাপন-চিত্রের বিশেষ আঙ্গিক গড়ে তুলেছে।

- **বৈশিষ্ট্য**

ক) বিজ্ঞাপন-চিত্রের বিষয় হয় একেবারে নির্দিষ্ট। অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের বিষয়ের বাইরে যাবার সুযোগ বিজ্ঞাপন-চিত্রের ক্ষেত্রে একেবারে নেই।

খ) বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপনচিত্র হয়ে থাকে 'অভিনীত' অর্থাৎ ফিকশনাল (fictional) । অবশ্য ব্যতিক্রমী কয়েকটি ক্ষেত্রে বাস্তবের ঘটনা সরাসরি বিজ্ঞাপনচিত্রে জায়গা পেতে পারে।

গ) বিজ্ঞাপনচিত্র সাধারনত সময়ের দিক থেকে খুব ছোট দৈর্ঘ্যের হয়ে থাকে। মাত্র কয়েক সেকেন্ড থেকে আরম্ভ করে বড় জোর এক মিনিট হতে পারে সাধারন বিজ্ঞাপনচিত্রের দৈর্ঘ্য।

ঘ) বিজ্ঞাপনচিত্রে ছবির ভাষা ও সংলাপ সাধারনত সহজ বোধ্য হয় কারন দর্শকের সঙ্গে সংযোগ (communication) তৈরি করাই বিজ্ঞাপনের প্রধান উদ্দেশ্য।

ঙ) বিজ্ঞাপনচিত্রে বিষয়ের প্রকাশে গুরুগম্ভীর (serious) 'মুড' তৈরি করা হয় না। বড়জোর একটি ছদ্ম-গাম্ভীর্য (mock seriousness)থাকতে পারে।

চ) বিজ্ঞাপন চিত্রের সম্পাদনায় সাধারনত বাস্তববাদী সম্পাদনা রীতি অর্থাৎ ১৮০ নিয়ম ম্যাচ কাট ইত্যাদি মেনে চলার দরকার হয় না। বরং বিজ্ঞাপনচিত্রের সম্পাদনায় বিভিন্ন ধরনের সম্পাদনা-কৌশল (editing effect)-এর প্রয়োগ।

ছ) সাধারনত বিজ্ঞাপনচিত্রের ক্ষেত্রে দৃশ্যপথ (Visual)-এর মতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে শব্দপথ, (বিশেষ সংলাপ ও আবহ-সঙ্গীত) ও গ্রাফিক্স। কারন বিজ্ঞাপনের বার্তাটিকে নিশ্চিতভাবে দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে সংলাপ ও গ্রাফিক্স - এর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

জ) সাধারনত বিজ্ঞাপনচিত্র হয় ঝকঝকে। বিজ্ঞাপনচিত্রের দৃশ্যাংশ (shot)-এ অন্ধকারময় স্থান প্রায় রাখা হয় না। বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত মডেল, পণ্য ইত্যাদিকে দৃশ্যগ্রহনের সময় যথেষ্ট ভালোভাবে আলোকিত করা হয়।

ঝ) বেশিরভাগ বিজ্ঞাপন-চিত্রের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ধীরগতির ক্যামেরা মুভমেন্ট ও দীর্ঘকালীন দৃশ্যাংশ (long take)-এর তুলনায় দ্রুত ক্যামেরা মুভমেন্ট ও ছোট ছোট (সময় দৈর্ঘ্যের) দৃশ্যাংশের সমাবেশ।

ঞ) এছাড়া বিজ্ঞাপন-চিত্রের ক্ষেত্রে সাধারনত লং বা এক্সট্রিম লং শট-এর তুলনায় মিড শট ও ক্লোজ শট বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কারন এক্ষেত্রে মডেলের মুখটি দেখানো বা যে পণ্যের বিজ্ঞাপন সেই পণ্যদ্রব্যটিকে কাছ থেকে দেখানোর দরকার হয়ে থাকে।

ট) আজকাল কম্পিউটার ও মাল্টি-মিডিয়া ব্যবস্থাকে বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মানের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে একটি শট-এর মধ্যে অন্য শটকে প্রতি স্থাপন করা (matting), একটি দৃশ্যর উপর অন্য দৃশ্যাংশ -এর অংশ সুপার ইমপোজ করা ও বিভিন্ন কৌশল (effect) প্রয়োগের সুবিধা হয়েছে।

- **চলচ্চিত্র মাধ্যম ও বিজ্ঞাপনচিত্র**

চলচ্চিত্র মাধ্যমটিকে বিজ্ঞাপনের বাহক হিসাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সুবিধা / অসুবিধা লক্ষ্য করা যায়। মাধ্যমটির বিশেষত্ব (Specificity of the medium),দর্শকের কাছে বার্তা পৌছে দেবার ক্ষমতা (access to the audience) ইত্যাদি বিষয়গুলির বিচারে এই সুবিধা/অসুবিধাগুলিকে চিহ্নিত করা হল:-

সুবিধা:- ১) চলচ্চিত্র মাধ্যমটি সমাজের উঁচুস্তর-থেকে নিচুস্তর পর্যন্ত প্রায় সব ধরনের দর্শকের কাছে পৌছে দিতে পারে বিজ্ঞাপনের বার্তাকে।

২) চলচ্চিত্র মাধ্যমে অর্থাৎ সেলুলয়েড নির্মিত বিজ্ঞাপন সাধারনত দীর্ঘস্থায়ী (Long Lasting) হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ছবির সঙ্গে এগুলির প্রদর্শন হতে পারে।

৩) চলচ্চিত্রের ক্ষমতা আছে দর্শককে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করার। সেক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের বার্তা বিজ্ঞাপন-চিত্র (advt. film) -এর মাধ্যমে দর্শকের সফলভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

৪) অন্যান্য দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে বিশেষ করে টেলিভিশনে অনেক বিজ্ঞাপনের মাঝে একটি বিশেষ বিজ্ঞাপনের বার্তা হারিয়ে যেতেই পারে। কিন্তু চলচ্চিত্র মাধ্যমের প্রদর্শিত বিজ্ঞাপন যেহেতু একসঙ্গে সংখ্যায় খুব বেশি দেখানো হয় না, তাই একটি বিশেষ বিজ্ঞাপনকে যেখানে চিহ্নিত করা ও মনে রাখা দর্শকের পক্ষে সহজ হয়।

৫) যে সব ছবির আন্তর্জাতিক বাজার রয়েছে (যেমন হলিউডের ছবি) যে সব ছবির সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজারের খোঁজ করা পণ্য যেমন বহুজাতিক সংস্থা উৎপাদিত ঠান্ডা পানীয়। বিজ্ঞাপন-চিত্র পৌছে যেতে পারে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের দর্শকের মাঝে

৬) অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে, বিশাল পর্দা জুড়ে দেখানো হয় বলে বিজ্ঞাপন -চিত্র বা 'এ্যাডভার্টিজমেন্ট-ফিল্ম' দর্শককে অন্য মাধ্যমে প্রচারিত বিজ্ঞাপনের তুলনায় অনেক বেশি প্রভাবিত করতে পারে।

অসুবিধা:- ১) টেলিভিশনের মত কম সময়ের মধ্যে বারবার বিজ্ঞাপনটি দেখিয়ে দর্শককে মনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা থাকে। গনজ্ঞাপনের ভাষায় বলা হয় 'হ্যামার' করার তা চলচ্চিত্রে করা যায় না। সাধারনত ছবির শুরুতে এবং বিরতির সময়েই কেবল বিজ্ঞাপন-চিত্র দেখা যায়।

২) যদি ধরে নেওয়া যায় একজন দর্শক একটি ছবি একবারই দেখবেন, তাহলে তিনি একটি নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপন একবারই দেখছেন। কিন্তু টেলিভিশনে বা সংবাদপত্রে প্রায় প্রতিদিনই দর্শক বা পাঠকের সামনে বিজ্ঞাপনটি পৌছে দেওয়া সম্ভব হতে পারে।

৩) বিজ্ঞাপন-চিত্র নির্মান, প্রচারের অনুমতি পাওয়া এবং শেষ পর্যন্ত প্রদর্শনের জন্য পাটানো এসবের জন্য বেশ কয়েক মাস সময় চলে যায়। একটি নতুন বিজ্ঞাপন দর্শকের সামনে নিয়ে যেতে গেলে তা যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ হয়ে পড়ে চলচ্চিত্র

মাধ্যমে বিজ্ঞাপনটি প্রচারের ক্ষেত্রে।

৪) এ ছাড়া বিজ্ঞাপন-চিত্রটি বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শনের জন্য পাঠাতে গেলে ডিস্ট্রিবিউটার বা (ছবির) বন্টনকারী সংস্থার কাছে অন্তত ছয়মাস পূর্বে আগাম বুকিং করতে হয়। এক্ষেত্রেও পদ্ধতিটি যথেষ্ট সময়-সাপেক্ষ।

৫) সেলুলয়েডে বা ফিল্ম-ফরম্যাটে তৈরি বিজ্ঞাপনগুলি রিল (reel) হিসাবে বেশ বড় ক্যান-এর ভিতর রাখা হয়। এগুলির সংরক্ষন করা সহজ নয়। এছাড়া প্রেক্ষাগৃহগুলিতে প্রদর্শনের সময় যত্নের অভাবে কখনো কখনো ফিল্মটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৬) বিজ্ঞাপন-চিত্র (advertisement film) তৈরির খরচ 'ছাপার মাধ্যম' (print medium)-এ একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ বা টেলিভিশনের জন্য ভি. ডি.ও ফর্ম্যাটে তৈরি দৃশ্য-শ্রাব্য বিজ্ঞাপন নির্মানের খরচের তুলনায় বেশ কয়েক গুন বেশি।

৭) চলচ্চিত্র মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারের অন্যতম বাধা হল, সংশ্লিষ্ট সংস্থার অনুমোদন লাভের সময় সাপেক্ষ ও জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।

৮) সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল, যে ছবি (film)-টির সঙ্গে বিজ্ঞাপনটি প্রদর্শিত হচ্ছে সেই ছবি 'ফ্লপ' হলে বা দর্শককে আকর্ষন করতে ব্যর্থ হলে, বিজ্ঞাপন-চিত্রটির 'ভিউয়ারশিপ' বা দর্শক-সংখ্যাও কমে যায়।

পূর্বোক্ত সুবিধাগুলির জন্য ১৯৫০ থেকে ৭০-এর দশক পর্যন্ত বিজ্ঞাপন-প্রচারের মাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্রের সাফল্যের সুযোগ ছিল। সে সময় চলচ্চিত্রই ছিল একমাত্র দৃশ্য-শ্রাব্য প্রচার মাধ্যমে। এছাড়া আন্তর্জাতিক দর্শকের কাছে পৌঁছানোর জন্যও চলচ্চিত্র মাধ্যমে বিজ্ঞাপন তৈরি ও প্রচার করার চল ছিল। কিন্তু ১৯৮০ এর দশক এবং তারপর থেকে গ্লোবাল স্যাটেলাইট টেলিভিশনের ব্যাপক প্রসারের ফলে এই নতুন মাধ্যমটি বিজ্ঞাপন-চিত্র-এর অনেকখানি অংশ দখল করে নিয়েছে। এখন তাই ফিল্ম মাধ্যমের তুলনায় টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রবণতা বেশি চোখে পড়ছে।

১৩.৫ বিজ্ঞাপন-চিত্র : প্রকারভেদ

বিষয়-বস্তু ও দর্শকের সঙ্গে সংযোগের উদ্দেশ্যের দিক থেকে বিচার করলে আমরা বিভিন্ন প্রকারের বিজ্ঞাপনচিত্র দেখে থাকি। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন প্রকারের বিজ্ঞাপনের লক্ষ্য-দর্শক (target audience)-ও বিভিন্ন হতে পারে। বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য ও টার্গেট অডিয়েন্স'-এর বিচারে বিজ্ঞাপনচিত্রগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে করা যায়।

অ) **জন-সচেতনতা প্রচারসংক্রান্ত বিজ্ঞাপনচিত্র (Public Service Advt.)** :- পরিবার পরিকল্পনা (family Planniny), পরিবেশ, জন-সংখ্যা, মাদক ও ধূমপানের বিরুদ্ধে প্রচার ইত্যাদির জন্য বেশ বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মিত হয়। এই ধরনের বিজ্ঞাপনচিত্রগুলি সাধারনত সরকারি উদ্যোগে নির্মিত হয়ে থাকে। এই সব বিজ্ঞাপনচিত্রগুলির দর্শক হল যুবক থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত প্রায় সব শ্রেণীর নাগরিক। জন-সচেতনতা প্রচারের উদ্দেশ্য হল বিশেষ বার্তাটি দেশের জনগণের কাছে প্রেরণ করা।

আ) **বিক্রয়/পরিষেবা (service) সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনচিত্র (corporate Advt.)** :- কোন বানিজ্যিক সংস্থার দ্বারা নির্মিত পন্য/পরিষেবার প্রচার ও বিক্রয়-এর উদ্দেশ্যে এই ধরনের বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মান ও প্রচার করা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রেক্ষাগৃহে ছবি দেখতে উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে থেকে ঐ পন্য/ পরিষেবার সম্ভাব্য ক্রেতা/ভোক্তা (consumer) পাওয়া যাবে আশা করা হয়। বিক্রয়/ পরিষেবা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন চিত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হল পন্য/ পরিষেবাটির সঙ্গে দর্শকের পরিচয় ঘটানো ও সম্ভাব্য ক্রেতাকে পন্য/পরিষেবা ক্রয় / ভোগ করার জন্য আহ্বান জানানো।

ই) **প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত (institutional) বিজ্ঞাপন চিত্র (institutional Advt.)** :- বিভিন্ন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জনগণের কাছে তাদের প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি গড়ে তোলার জন্য বা অর্জিত অনুকূল ভাবমূর্তিকে আরও উজ্জ্বল করার জন্য বিজ্ঞাপনচিত্র তৈরি ও প্রচার করে থাকে। এই ধরনের বিজ্ঞাপনচিত্রের বেশির ভাগই তৈরি হয় সরকারের

কাজকর্ম, লক্ষ্যসাধন, দূরসংযোগ, বিজ্ঞান ও জনশিক্ষা রেলওয়ে প্রভৃতি দপ্তরের পরিষেবা ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের কৃতিত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যে। অনেক সময় বেসরকারি সংস্থাগুলিও তাদের সামাজিক কাজকর্ম ইত্যাদির বিষয় জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে এধরনের বিজ্ঞাপন-চিত্র নির্মান ও প্রচার করে থাকে। স্বাভাবিক কারনেই এইসব বিজ্ঞাপনচিত্রগুলির সময় একটু (duration) দীর্ঘ হয়।

ঈ) **অন্যান্য ধরনের বিজ্ঞাপন-চিত্র (other types of Advt.)** :- উপরোক্ত তিন ধরনের বিজ্ঞাপনচিত্র ছাড়াও সরকার প্রেরিত জনগণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বিষয়ে অনেক সময় 'স্পট' (spot) বিজ্ঞাপন বা স্লাইড দেখানো হয় প্রেক্ষাগৃহে। এছাড়া আছে ভ্রমন সংস্থা (travel agency), বিমান পরিষেবা সংস্থা (airlines), সরকারি উদ্যোগে ভ্রমনকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন বিজ্ঞাপনচিত্র ।

বিজ্ঞাপন যে বার্তা বহন করছে সেই বার্তার বিষয় অনুসারে উপরোক্তি চার ধরনের বিজ্ঞাপন চিত্র তৈরি হয়ে থাকে। আবার বিজ্ঞাপনের বার্তার গঠন বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিজ্ঞাপনচিত্রে সাধারনত চার ধরনের আঙ্গিক (formal) লক্ষ্য করা যায়। বার্তা ও দর্শকের মধ্যে 'অর্থ পূর্ণ সম্পর্ক' গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিশেষ আঙ্গিক (formal)-টি নির্বাচন করা হয়। এই চার ধরনের আঙ্গিক বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হল—

ক) **পণ্য, পরিষেবা বা ধারনা (idea) সম্পর্কে তথ্য পূর্ণ আঙ্গিক (the product-Information format)**:- এই ধরনের বিজ্ঞাপন চিত্রে বার্তাটি গঠিত হয় যতটা সম্ভব বেশি ও প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে। বিজ্ঞাপনের বিষয় কোন পণ্যের বা পরিষেবার প্রচার হলে পণ্যদ্রব্যটির বা পরিষেবাটির উপযোগীতা (utility) ও ব্যবহার (use) সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করা হয় বিজ্ঞাপনচিত্রটিতে। জনসচেতনতা বিষয়ক বিজ্ঞাপনচিত্রগুলি সাধারনত এই ধরনের আঙ্গিক নির্মিত হয়। এই ধরনের বিজ্ঞাপনচিত্রের ক্ষেত্রে সংলাপ ও চিত্রনাট্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে কারন দর্শকের কাছে তথ্য সরবারহের ক্ষেত্রে সংলাপ খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনেক-ক্ষেত্রে বিশেষ সম্পাদনা কৌশল (editing effects) গ্রাফিক্স-এর প্রয়োগের মাধ্যমে 'ইলাস্ট্রেশন' ও বিভিন্ন নকশা (design)-এর ব্যবহার এই ধরনের বিজ্ঞাপন-চিত্রে প্রাধান্য পেতে পারে। পন্য পরিষেবা বা ধারনা (idea) ইত্যাদি উপযোগীতা (utility) ও ব্যবহার (usefulness)দৃশ্যগত ভাবে 'লাইভ-এ্যাকশন' (live-action)-এর মাধ্যমে যথাযথ ভাবে প্রদর্শন (demonstration) করা হতে পারে এই আঙ্গিকের বিজ্ঞাপন চিত্রের ক্ষেত্রে। তথ্য পূর্ণ আঙ্গিক-এ তৈরি বিজ্ঞাপন চিত্রগুলির চিত্রনাট্য বা দৃশ্যগ্রহনের ক্ষেত্রে বিমূর্ত্ততা বর্জন করা হয় এবং বাস্তব প্রয়োজন ও উপযোগীতার সঙ্গে পণ্য / পরিষেবা/ ধারনার সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। কারন এই বিজ্ঞাপনচিত্রের উদ্দেশ্য হল পণ্য/পরিষেবা সংক্রান্ত তথ্যসমূহ সহজে ও সোজাসুজিভাবে (directly) দর্শকের সামনে উপস্থাপন করা ।

খ) **পণ্য/ পরিষেবা/ ব্র্যান্ড-এর ভাবমূর্ত্তি বিষয়ক আঙ্গিক (the product- image format)**:- এই আঙ্গিকের বিজ্ঞাপনচিত্রে পন্য/পরিষেবার সঙ্গে বিজ্ঞাপনের বার্তার একটি বিমূর্ত্ত সম্পর্ক তৈরি করা হয়। বাস্তব উপযোগীতার থেকে 'প্রতীকি-সম্পর্ক' (symbolic relationship) তৈরি করার দিকে এই প্রকার বিজ্ঞাপনচিত্রের লক্ষ্য বেশি। এ ক্ষেত্রে সাধারনত দেখা যায় পণ্য/ পরিষেবাটি এমন একটি অবস্থায় (context)-এ স্থাপিত (embeded) যেখানে পণ্য/পরিষেবা-র সঙ্গে অবস্থার প্রতীকি (symbolic) সম্পর্কের ফলে বার্তা (message) টি নির্মিত হয়। এক্ষেত্রে যে অবস্থা (context) -য় পণ্য/পরিষেবাটি স্থাপিত, সেই অবস্থা দু ধরনের হতে পারে 'প্রাকৃতিক অবস্থা' ও 'সামাজিক অবস্থা'।

একটি সিগারেট-এর বিজ্ঞাপনের কথা ধরা যাক। বিজ্ঞাপনচিত্রের দৃশ্যপথে আমরা দেখছি একটি সবুজ গাছপালায় ঢাকা ছবির মত পাহাড়ি অঞ্চল থেকে টপ শটে একটি শান্ত ঝরনা প্রবাহী জলধারা রূপে নেমে আসছে। এই নিসর্গ দৃশ্য (প্রাকৃতিক অবস্থা)-র উপর সিগারেটের প্যাকেটটি সুপার-ইমপোজ করা হচ্ছে, সঙ্গে 'ভয়েস-ওভার' শোনা যাচ্ছে 'ওয়াজ এ্যাভরি সিগারেট ইউ স্মোকড টুডে স্মুথ?- কাম আপ টু 'বার্মা কিংস্'। এখানে পণ্য এর গুনাগুন ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান তথ্য দেওয়া হচ্ছে না, কেবলমাত্র 'বার্মা কিংস' এই মার্কা নাম (brand name)-এর সিগারেটের মসৃণতা বা স্মুথনেসের সঙ্গে 'প্রতীকি যোগসূত্র' (association) তৈরি করা হয়েছে মসৃণ প্রাকৃতিক অবস্থা (natural context)।

ঐ একইভাবে এই ধরনের বিজ্ঞাপনচিত্রে অনেক সময়ই বিভিন্ন সামাজিক অবস্থা (social context) অর্থাৎ ঝকমকে

কর্মক্ষেত্র , সাজানো গোছানো ঘরবাড়ি, কিংবদন্তি (mythic context) ইত্যাদির সঙ্গে পণ্য/ পরিষেবার প্রতীকি-যোগসূত্র (association) তৈরি করা হয়। অর্থাৎ পণ্য/ পরিষেবাটিকে ঐ ধরনের অবস্থা কাঠামো (setting)-এর মধ্যে স্থাপন (situate) করা হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে পণ্য/পরিষেবার ভাবমূর্তি বিষয়ক আঙ্গিক-এর বিজ্ঞাপনচিত্রে দু ধরনের 'চিহ্ন' (signs) নিয়ে কাজ করতে হয়- একটি হল' পণ্য/পরিষেবা সংক্রান্ত চিহ্ন (product signs) এবং অন্যটি হল অবস্থা কাঠামো সংক্রান্ত চিহ্ন (setting signs) । এক্ষেত্রে এই দু ধরনের চিহ্নের প্রতীকি সংযোজন ঘটে।

এই আঙ্গিকের বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মানের ক্ষেত্রে এমন দৃশ্যগ্রহন করতে হবে যার দৃশ্যগত সৌন্দর্য্য বা আকর্ষন ইত্যাদি বর্তমান। ছবির মত সুন্দর প্রকৃতি। বিলাস-বাহুল বা সাজানো-গোছানো গৃহাভ্যন্তর ইত্যাদি সেটিং বা দৃশ্যের মধ্যে পণ্য/ পরিষেবাটিকে স্থাপন করতে হবে। এই ধরনের বিজ্ঞাপন চিত্রের জন্য চিত্রনাট্য রচনার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে ভাষা যেন আকর্ষনীয় হয়। ক্যাপশন যেন সাদামাঠা না হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে উচ্চারিত ভাষা বা ক্যাপশন ইত্যাদি যেন অবস্থা (প্রাকৃতিক বা সামাজিক)-এর সঙ্গে পন্য/পরিষেবার সরাসরি সম্পর্কের কথা না বলে, কেবলমাত্র প্রতীকি সর্ম্পকের ইঙ্গিত বহন করে।

গ) ব্যক্তিত্ব ব্যবহারকারী আঙ্গিক (the personalizecl format) :- এই ধরনের আঙ্গিকের বিজ্ঞাপনচিত্রে সাধারনত কোন মডেলকে দিয়ে প্রয়োজনীয় অভিনয় করিয়ে নেওয়া হয়ে থাকে। মডেল হিসাবে বিজ্ঞাপন জগতের পেশাদার অভিনেতা/অভিনেত্রীদের ব্যবহার করা যেতে পারে, অথবা খ্যাতনামা ও জনপ্রিয় ব্যক্তি (celebraty) -দের ও বিজ্ঞাপনচিত্রে মডেল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ধরনের বিজ্ঞাপনচিত্রে মডেল ব্যক্তিটি মাধ্যম হিসাবে পণ্য/পরিষেবাটি সঙ্গে গ্ল্যামার সামাজিক প্রতিপত্তি, মালিকানার গর্ব, ঐ পণ্য/পরিষেবাটি না পাওয়ার জন্য অপ্রাপ্তিবোধ, পণ্য/পরিষেবাটি ভোগ (consume) করার জন্য সন্তুষ্টি ইত্যাদির সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করেন।

এই ধরনের বিজ্ঞাপনচিত্রে চিত্রনাট্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারন মডেল কি বলছেন তার উপর বার্তা (message)গঠন অনেক খানি নির্ভর করে। এছাড়া পরিচালককে দেখতে হবে মডেলকে দিয়ে যেন প্রয়োজনীয় অভিনয় অংশটি সঠিকভাবে করিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়। সাধারনত: এই আঙ্গিকের বিজ্ঞাপনচিত্রে মডেল সরাসরি দর্শককে পণ্য/পরিষেবা সম্পর্কে মতামত (comment) দেন।

এক্ষেত্রে মডেলরা যে সব বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে থাকেন সেগুলি হতে পারে—

১) পণ্য/পরিষেবার সম্ভাব্য ভোক্তা কোন গৃহস্থ পুরুষ/মহিলা

২) পণ্য/পরিষেবাটির ভোগ (consumption)-এর সঙ্গে যুক্ত কোন বিশেষ পেশার ব্যক্তি (যেমন রিক্সার টায়ারের বিজ্ঞাপনে মডেল রিক্সাচালকের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারেন)।

৩) কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব (যেমন ধরা যাক একটি টিনের শিশু খাদ্যের বিজ্ঞাপনে কোন খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পণ্যটির প্রশংসা করে মতামত দিতে পারেন।)

৪) সেলিব্রেটিরা মডেল হয়ে পন্য/পরিষেবা-র ভোক্তা (consumer)-এর ভূমিকায় অভিনয় করতে বা জনগণের কাছে ঐ পন্য/পরিষেবাটি ক্রয়/ ভোগ করার জন্য আবেদন করতে পারেন। এই আঙ্গিকের বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মানের উদ্দেশ্য হল পণ্য/পরিষেবাটি ক্রয়/ভোগ করার সঙ্গে সম্ভাব্য ক্রেতা/ভোক্তার সামাজিক 'আত্মপরিচয়' (identity) নির্মানের সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করা। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাতাকে এই মনস্তাত্ত্বিক উদ্দেশ্যটির কথা মাথায় রাখতে হবে।

ঘ) **জীবন-যাত্রা সংক্রান্ত আঙ্গিক (The Life Style format)** :- এই আঙ্গিকের বিজ্ঞাপনচিত্রে একটি বিশেষ ধরনের জীবনযাত্রায় দর্শককে আকৃষ্ট করা হয়, যে জীবনযাত্রা প্রবেশের মাধ্যম হল ঐ বিজ্ঞাপনের পণ্য/পরিষেবাটির ক্রেতা /ভোক্তা হওয়া, এই কথাটি দর্শকের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা হয়।

সুতরাং এই ধরনের বিজ্ঞাপনচিত্রের একটি বিশেষ ধরনের মোহময় জীবনযাত্রার ছবি দৃশ্যগতভাবে দর্শকের সামনে তুলে ধরা হয়। এর সঙ্গে থাকে এমন একটি ক্যাপশন (caption) যা দর্শককে ছবিতে দেখানো জীবনযাত্রায় অংশ নেবার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আহ্বান করে। এ ধরণের বিজ্ঞাপনেও মডেল অভিনেতা/অভিনেত্রী থাকতে পারে, তবে তারা

দৃশ্যের অংশ হিসাবে উপস্থিত থাকে পূর্বোক্ত 'ব্যক্তিত্ব-ব্যবহারকারী' আঙ্গিকের মত সরাসরি বার্তাবহ হিসাবে নয়।

এই আঙ্গিকের বিজ্ঞাপনচিত্রে পরিচালককে একটি বিশেষ পৌরোষ-প্রধান, মাচো, বৈভবপূর্ণ এ্যাডভেঞ্চার প্রিয় জীবনযাত্রার চিত্র দৃশ্যপথে তৈরি করতে হয়। সঙ্গে শব্দপথে ছোট কিন্তু আকর্ষণীয় (catchy) 'ক্যাপশান' দিতে হয়।

জীবনযাত্রা সংক্রান্ত আঙ্গিক বা লাইফস্টাইল ফরম্যাট (life-style format)-এর ক্ষেত্রে 'প্রোটোটাইপ' (ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য) যথা, বন্ধুত্ব, আচরণের উষ্ণতা, বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার)-এর পরিবর্তে 'স্টিরিওটাইপ' (সামাজিক বৈশিষ্ট্য) যথা শ্রেণী, পদ-মর্যাদা জাতি, বর্ণ ইত্যাদি)-এর ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ পণ্য/পরিষেবা ক্রয়/ভোগ করার একটি বিশেষ জীবনযাত্রায় বৈশিষ্ট্য যা ক্রেতা/ভোক্তার সামাজিক শ্রেণী (class), পদমর্যাদা (designation), বর্ণ (skin complexion) ইত্যাদির পরিচায়ক হয়ে উঠতে পারে।

১৩.৬ বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্র নির্মাণ ও গুনগত মান

১৩.৬.১ বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ

বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণের কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ ঠিক প্রথাগত 'চলচ্চিত্র উৎপাদন শিল্প' (film industry)-এর অংশ নয়, বরং স্বতন্ত্র একটি শিল্প (industry) এবং বার্তাপ্রধান বিজ্ঞাপনচিত্রের সঙ্গে সাধারণ আখ্যাননির্ভর এবং অকাহিনীমূলক চলচ্চিত্রের পার্থক্য বর্তমান। তাই বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণের নির্দিষ্ট কিছু পর্যায় রয়েছে যা সাধারণ চলচ্চিত্র নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ের থেকে একটু ভিন্ন। একটি বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সাধারণত নিম্নলিখিত পর্যায়গুলির মধ্যে দিয়ে যেতে হয় ঃ

- একটি সাধারণ-ধারণা (concept) কল্পনা করা (conceive) হয় যার দ্বারা বিজ্ঞাপনচিত্রের মূল বচন (text)-টি নির্মাণ করা হবে।
- বিজ্ঞাপনচিত্রটি কতটা সময়-দৈর্ঘ্য (duration)-এর হতে তা স্থির করা প্রয়োজন।
- মাধ্যম নির্বাচন, যদি সেই নির্বাচিত মাধ্যম দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম হয় তাহলে 'ফর্ম্যাট' স্থির করতে হবে। অর্থাৎ, ছবিটি কোন ফর্ম্যাটে তোলা (shoot) হবে এবং কোন ফর্ম্যাটে প্রচারিত হবে তা স্থির করতে হবে। দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম (audio-visual media)-এর ফর্ম্যাটগুলি হল ১৬ মিমি., ৩৫ মিমি বা ৭০ মিমি ফিল্ম অথবা ভিডিও (অর্থাৎ টেলি-ফর্ম্যাট)
- বিজ্ঞাপনের বার্তা (message)-টি এবার অনুপুঙ্খভাবে (in details) তৈরি করা প্রয়োজন।
- বার্তাটিকে মাথায় রেখে বিজ্ঞানপচিত্রের প্রকাশভঙ্গি (style of presentetion) নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। বিজ্ঞাপনচিত্র কি ধরনের হবে—'তথ্যপ্রধান' (product-information), 'ব্যক্তিত্বকেন্দ্রিক' (personalized), 'ভাবমূর্তি সংক্রান্ত' (product image) নাকি 'জীবনযাত্রা বিষয়ক' (life-style) তাও ভেবে নিতে হবে।
- এর পরের পর্যায় হল চিত্রনাট্য (screenplay) ও চিত্রগ্রহণ-চিত্রনাট্য (shooting script) প্রস্তুত করা।
- চিত্রগ্রহণের উপযুক্ত স্থান (location) খোঁজা অথবা যদি 'স্টুডিও/ঘর-এর ভিতর চিত্রগ্রহণ' (indoor shooting) হয় সেক্ষেত্রে উপযুক্ত সেট (set), পোষাক (costume) ইত্যাদি নির্বাচন করা। বিজ্ঞাপনচিত্রের ক্ষেত্রে নিসর্গ-দৃশ্য বা সেট, মডেলদের পোষাক, দৃশ্যে অর্থপূর্ণ বা প্রয়োজনীয় রঙের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় বিজ্ঞাপনচিত্রের বর্তাটিকে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- বিজ্ঞাপনের চিত্রগ্রহণ (shoot)-এর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে চিত্রনাট্য ও বার্তা নির্মাণের বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া যেন দৃশ্য-সংগঠন (composition)-এ কোন অন্ধকারময় স্থান না থাকে। এছাড়া মডেলদের মুখ বা শরীরের বিশেষ অংশ যাতে উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত থাতে তা লক্ষ্য রাখতে হবে। বিজ্ঞাপনচিত্রের ক্ষেত্রে সাধারণ

অভিনয়ের একটি বেশি মাত্রায় প্রকাশ (যাকে বলা যায় expressive acting) হওয়া দরকার।

- বিজ্ঞাপনচিত্রের সম্পাদনা যেন কৌশলগতভাবে ঝকঝকে (technically smart) হয় তা দেখতে হবে। বিজ্ঞাপনচিত্রের ক্ষেত্রে সাধারণত গ্রাফিক্স, বিশেষ-কৌশল (effects) ইত্যাদির ব্যবহার একটু বেশি হয়ে থাকে। বিজ্ঞাপনচিত্রে সম্পাদনার সময় শব্দগ্রহণ (dubbing) নিখুঁত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। শব্দপথ (audio-level) অর্থাৎ কথা বা সংলাপ সাধারণ ক্ষেত্রের থেকে একটু উচ্চগ্রাসে থাকে এবং শব্দে বিশেষত সংলাপ/কথায় কোথাও যেন অস্পষ্টতা না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে।
- সবশেষে সঠিক 'প্যাকেজিং' (packaging) দরকার। অর্থাৎ বিভিন্ন ভাষায় বা বিভিন্ন সময়-দৈর্ঘ্য (duration)-এর জন্য একাধিক 'ভার্সান' (version) তৈরি করতে হতে পারে। অনেক সময় যে ফর্ম্যাট-এ চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনা হল (ধরা যাক ১৬ মিমি ফর্ম্যাট) সেখান থেকে প্রচারের জন্য নির্দিষ্ট অন্য ফর্ম্যাট (ধরা যাক ৩৫ মিমি ফর্ম্যাট বা ভিডিও ফর্ম্যাট)-এ কপি (copy) করার দরকার হতে পারে। শেষপর্যন্ত প্রচারের জন্য উপযোগী 'পজিটিভ প্রিন্ট' (positive prints) বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থার হাতে তুলে দিতে হবে।

১৩.৬.২ বিজ্ঞাপনচিত্র গুণগত মান

একটি বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে নির্মাণ-কৌশল (techniques) ছাড়াও গুণগত মানের উপরেও নজর রাখতে হবে। বিজ্ঞাপনচিত্রের গুণগতমান নিয়ে আমাদের দেশে চিন্তা-ভাবনার ইতিহাস খুব পুরোন নয়। বিশেষত আজকাল টেলিভিশনের কল্যাণে বিজ্ঞাপনচিত্র এত বেশি সংখ্যায় তৈরি হচ্ছে যে বহু নিম্নমানের কাজও তারমধ্যে স্থান পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটি সফল বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণের জন্য গুণগতমান অত্যন্ত জরুরী একটি বিষয়। এ দেশে সাধারণত বিজ্ঞাপনচিত্রের ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ (common) ত্রুটির প্রবণতা দেখা যায় যা বিজ্ঞাপনচিত্রের গুণগতমানের ক্ষতি করে। যেমন—

ক) **অশ্লীল দৃশ্য (visiual) ব্যবহারের প্রবণতা** — একটি জনপ্রিয় ধারণা আছে যে বিজ্ঞাপনকে আকর্ষণীয় করার জন্য অশ্লীল দৃশ্য ব্যবহার করে ফল পাওয়া যায়। এসব ক্ষেত্রে মেয়েদের শরীরকে 'পণ্য'-এর মত ব্যবহারের চেষ্টা থাকে। কিন্তু একথা মাথায় রাখা উচিৎ যে এতে বিজ্ঞাপনচিত্রটির শিল্পগুণ নষ্ট হয়। তাছাড়া অকারণ অশ্লীল দৃশ্যের ব্যবহার জনচিত্তকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আকর্ষণ করে না বরং বিজ্ঞাপনটির সম্পর্কে ও বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থাটির সম্পর্কে দর্শক মনে খারাপ ধারণার জন্ম হতে পারে। আমাদের দেশে বিজ্ঞাপন চিত্রের শিশুস্তনের অন্যতম বড় শত্রু অকারণ অশ্লীলতার ব্যবহার।

খ) **সমাজ তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব** — সামাজিক বিধি (code), আচরণ (behaviour) ইত্যাদির বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার বিজ্ঞাপনচিত্রের সফলতার অন্যতম শর্ত। কিন্তু আমাদের দেশে বেশিরভাগ বিজ্ঞাপনচিত্রের ক্ষেত্রেই সামাজিক বিধি (code) এবং আচরণ (behaviour)-এর চতুর কিন্তু ইতিবাচক (positive) ব্যবহার খুব বেশি লক্ষ্য করা যায় না। অনেকক্ষেত্রেই আবার সামাজিক বিধি/আচরণ-এর নেতিবাক (negative) ও স্থূল (blunt) দিকগুলিকে ব্যবহার করার চেষ্টা দেখা যায়। প্রকৃত সমাজ-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অভাব বিজ্ঞাপনচিত্রের মানের অবনমনের অন্যতম কারণ হতে পারে।

গ) **রুচিহীনতা** — বার্তারচনা ও তার উপস্থাপনা (representation)-এর ক্ষেত্রে প্রকৃত রুচির অভাব বিজ্ঞাপনচিত্রে অনেক সময়ই দেখা যায়। অনেক বিজ্ঞাপনচিত্রেই বার্তাটি খুব বেশি সরাসরি (direct) ও স্থূল (loud)-ভাবে প্রচার করার চেষ্টা দেখা যায়। সূক্ষ্ম রসবোধ (wit) বা পরিশীলন (sophistication)-এর অভাব বিজ্ঞাপনচিত্রের অন্যতম প্রধান ব্যাধি হয়ে দাঁড়াতে পারে। অনেক বিজ্ঞাপনচিত্রই বিশেষ-কৌশল (special effect) ইত্যাদির অতিরিক্ত প্রয়োগে অপরিচ্ছন্ন ও অকারণ জটিল (cumbrus) রূপে পায়।

ঘ) **উদ্ভাবনী শক্তির অভাব** — কেবলমাত্র বার্তা বা ধারণা (concept)-ই নয়, বিজ্ঞাপনচিত্র যে আঙ্গিক (form) ও শৈলী (style) নির্ভর করে তৈরি হয় তাতে উদ্ভাবনী শক্তি (innovation)-র পরিচয় থাকা দরকার। আমাদের দেশে এসব ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সংখ্যা বেশ সীমিত। কতকগুলি নির্দিষ্ট ছক বা ধারা (genre)-এর বাইরে বিজ্ঞাপনচিত্র বিশেষ

তৈরি হয় না। বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী শৈলীর অভাব বিজ্ঞাপনটিকে আকর্ষণীয় (catchy) হয়ে ওটা থেকে বঞ্চিত করতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে একটি ভালো বিজ্ঞাপনচিত্রের বেশ কিছু গুণ থাকা দরকার। বিজ্ঞাপনচিত্রের মান যথাযথ এবং বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণের কাজটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর পরিচালকের নজর দেওয়া উচিত :

- ❒ **চুক্তি (agreement)** — বিজ্ঞাপনচিত্র শুরুর পূর্বে বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে বিজ্ঞাপনচিত্র পরিচালকের আর্থিক ও অন্যান্য বিষয় পরিচ্ছন্ন চুক্তি হওয়া দরকার যাতে পরবর্তিকালে চুক্তির শর্তগুলি নিয়ে বিজ্ঞাপনদাতা ও বিজ্ঞাপন নির্মাতা পরিচালকের মধ্যে কোন ভুল বোঝাবুঝি না হয়।
- ❒ **বাজেট (budget)** — বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণের খরচ, কিভাবে মোট খরচ বিভিন্ন খাতে ব্যয় করা হবে তার একটা প্রাথমিক ও আগাম খস্ড়া পরিচালক বিজ্ঞাপনদাতাকে দেবেন। যদি পরিচালক কেবলমাত্র বেতনভুক হন সেক্ষেত্রে তিনি নিজের পরিশ্রমিক ইত্যাদি বিষয়ে কাজ শুরুর আগেই পরিস্কার কথা বলে নেবেন।
- ❒ **ধারণা (concept)** — বিজ্ঞাপনচিত্রটি কিভাবে নির্মিত হবে এবং কি বার্তা প্রচার করবে তা একটি খসড়া বা সারমর্ম (concept) বিজ্ঞাপনচিত্র পরিচালক বিজ্ঞাপনদাতাকে দেবেন। অবশ্য ধারণা বা concept-এর সারমর্ম রচিত হবে বিজ্ঞাপনদাতা কি চাইছেন তা অনুমান করে বা জেনে নিয়ে।
- ❒ **ফর্ম্যাট (format)** — বিজ্ঞাপনচিত্রটি কোন ফর্ম্যাট (format)-এ নির্মাণ করা হবে, তা সঠিকভাবে জানতে হবে। চলচ্চিত্র মাধ্যমে সাধারণত ১৬ মিমি, ৩৫ মিমি ও ৭০ মিমি এই তিনটি পেশাদার কাজের ফর্ম্যাট রয়েছে। এরমধ্যে কোনটিতে চিত্রগ্রহণ হবে তা ঠিক করে নিতে হবে।
- ❒ **লক্ষ্য-দর্শক (target audience)** — বিজ্ঞাপনচিত্রটি কোন বয়সের, সমাজের কোন স্তরের, কোন ভাষার /রাজ্যের বা কোন পেশার মানুষকে লক্ষ্য করে নির্মাণ করা হবে তা সঠিকভাবে জানতে হবে এবং লক্ষ্য-দর্শক-এর সামাজিক বিধি, আচরণ, বাস্তব-চাহিদা ইত্যাদির সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখতে হবে বিজ্ঞাপনচিত্রটির পরিচালককে।
- ❒ **চিত্রনাট্য (screenplay)** —চিত্রগ্রহণের আগে যথাযথ চিত্রনাট্য (screenplay) ও সংলাপ ও পরে চিত্রগ্রহণ-চিত্রনাট্য (shooting script) সঠিকভাবে তৈরি করে চিত্রগ্রহণ শুরু করা উচিৎ। ভালো ও ডিটেলড চিত্রনাট্য বিজ্ঞাপনচিত্রের বচন (text) টি সঠিকভাবে তৈরি করতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।
- ❒ **সংযোগ (communication)** — বিজ্ঞাপনচিত্রের বার্তাটি এমনভাবে প্রস্তুত ও উপস্থাপন করতে হবে যাতে লক্ষ্য-দর্শক (target audience) সঠিকভাবে বার্তাটিকে অনুধাবন করতে পারে। দর্শকের সঙ্গে সফল সংযোগ স্থাপন বিজ্ঞাপনচিত্রের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ সফল-সংযোগ না ঘটলে বিজ্ঞাপনচিত্রটি নির্মাণের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়।
- ❒ **ক্যাপশান (caption)** — বিজ্ঞাপনচিত্রে যে ক্যাপশান, স্লোগান বা সংলাপ থাকবে তা যেন আকর্ষণীয় (catchy) হয় সে দিকে নজর রাখতে হবে। কারণ ক্যাপশান বা শ্লোগান জনপ্রিয় হলে অনেক সময় বিজ্ঞাপনটির উদ্দেশ্য সফল হয়। বিজ্ঞাপনচিত্রে ক্যাপশন/স্লোগান বলার জন্য উপযুক্ত কণ্ঠস্বরের ব্যক্তিকে দিয়ে উচ্চারণ করাতে হয়। ক্যাপশান/শ্লোগান এক্ষেত্রে হওয়া উচিত আকষর্ণয় কিন্তু ছোট ছন্দময়।
- ❒ **আঙ্গিক (style)** — বিজ্ঞাপনচিত্রে বার্তাটি কিভাবে প্রকাশ করা হবে তার জন্য উপযুক্ত স্টাইল গ্রহণ করতে হয়। বিজ্ঞাপন তথ্যকেন্দ্রিক হবে, নাকি ভাবমূর্তি নির্ভর বা জীবনযাত্রা সংক্রান্ত হবে তা স্থির করে নিতে হবে। বিজ্ঞাপন চিত্রে কোন মডেল থাকলে তার অভিনয়ের ঢং বা স্টাইল কেমন হবে তার ধারণা পরিস্কার ভাবে পরিচালকের মাথায় থাকা উচিত।
- ❒ **দৃশ্যায়ন (visualization)** — বিজ্ঞাপনচিত্রে দৃশ্যায়ন বা ভিসুয়ালাইজেসন যথাযথ হওয়া উচিত। কোন নিসর্গ-দৃশ্য বা আউটডোর দৃশ্য ব্যবহার করা হলে, তা বিজ্ঞাপনের 'মুড' অনুসারে পছন্দ করা উচিত। ইনডোর চিত্রগ্রহণ

হলে সেক্ষেত্রে 'সেট', 'ডেকর', 'কস্টিউম' ইত্যাদি যথাযথভাবে বিজ্ঞাপনের বার্তাটিকে দর্শকের কাছে পৌঁছতে সাহায্য করবে কিনা তা ভেবে নিতে হবে।

- ❐ **বিমূর্ত্ততা (abstraction)** — বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া বিজ্ঞাপনচিত্রের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে বিজ্ঞাপনের বার্তাটি এমনভাবে উপস্থাপিত না হয় যার ফলে বিজ্ঞাপনের অর্থ একেবারে বিমূর্ত্ত হয়ে যায়। বিমূর্ত্ততা ও প্রতীকি সংযোগ অনেকক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় ঠিকই তবে বিজ্ঞাপনচিত্র কখনোই এমন বিমূর্ত্ত হবে না যাতে তার লক্ষ্য দর্শক (target audience) বিজ্ঞাপনের বার্তাটি ধরতে ব্যর্থ হয়।
- ❐ **সম্পাদনা (editing)** — বিজ্ঞাপনচিত্রের সম্পাদনার ক্ষেত্রে সম্পাদক নিশ্চয় প্রথাগত (convensional) সম্পাদনা রীতি থেকে সরে আসার স্বাধীনতা গ্রহণ করতে পারেন। এবং একথাও ঠিক যে বিজ্ঞাপনচিত্রের সম্পাদনার ক্ষেত্রে সম্পাদককে বেশ কিছুটা উদ্ভাবনী চিন্তার পরিচয় রাখতে হয়। তবে দেখতে হবে যে অতিরিক্ত উৎসাহের বশে যেন বেশি 'এফেক্ট' ইত্যাদি ব্যবহার করা না হয়, যার ফলে মূল বার্তাটি হারিয়ে যায় ও বচন (text)-টি 'জটিল ও অর্থহীন' (cumbrus) হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থেকে যায়। সুতরাং বিজ্ঞাপনচিত্রের সম্পাদনা হবে যথাযথ (precise) এবং সপ্রতিভ (smart), অকারণ অতিরিন্দ্রয়তা (excess) বর্জন করা দরকার।
- ❐ **সময়-সচেতনা (time-limitation)** — বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ করা হয় নির্দিষ্ট সময়-দৈর্ঘ্যের (duration)-এর জন্য। সুতরাং বিজ্ঞাপনচিত্রের চিত্রগ্রহণ ও তারপর সম্পাদনার সময় মাথায় রাখতে হবে বিজ্ঞাপনচিত্রের সময়-দৈর্ঘ্য বা ডিউরেশন (duration) কত হবে। এছাড়া অনেক সময় একই চিত্রগ্রহণ থেকে বিভিন্ন দৈর্ঘ্য (duration)-এর একাধিক ভার্সান (version) তৈরি করতে হতে পারে। অর্থাৎ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা হয় যে মূল বিজ্ঞাপনচিত্রটির সঙ্গে একটি ছোট 'ভার্সান' তৈরি করতে হয়।
- ❐ **সেন্সরশিপ (censorship)** — বিজ্ঞাপনচিত্রে এমন কিছু থাকা উচিৎ নয় যার ফলে রাষ্ট্র বিজ্ঞাপনটি দেখানোর ক্ষেত্রে কোনভাবে বাধানিষেধ (censor) আরোপ করতে পারে। এ বিষয়ে সরকারি নীতি ঠিক কী—তা জেনে নিয়ে বিজ্ঞাপনচিত্রকে 'সেন্সরে'র নিয়ম বাঁচিয়ে তৈরি করতে হবে। তবে সবক্ষেত্রে যে আইনের 'সেন্সর' কাজ করে তাই নয়, ভারতের মত সমাজে অনেকক্ষেত্রে বেশ কিছু নৈতিক বা মরাল (moral) সেন্সরও কাজ করে। বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাতাকে সে বিষয়েও সচেতন থাকতে হবে, না হলে জনমানসে বিজ্ঞাপনটির নেতিবাচক (negative) প্রতিক্রিয়া হতে পারে।
- ❐ **চূড়ান্ত প্রতিলিপি (final print)** — শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞাপনদাতার হাতে প্রচারের উপযুক্ত চূড়ান্ত-প্রতিলিপি প্রত্যার্পন করে বিজ্ঞাপনচিত্র পরিচালকের কাজ শেষ হয়। মনে রাখতে হবে যে সমস্ত কাজ ও পরিশ্রমের ফসল হল এই চূড়ান্ত-প্রতিলিপি, তাই চূড়ান্ত-প্রতিলিপি যতটা সম্ভব নিখুঁত হওয়া দরকার।

একটি ভালো বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ করার জন্য উপরোক্ত বিষয়গুলি মনে রাখা দরকার। সফল কাজ করতে গেলে বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণের বিষয়টি সম্পূর্ণ পেশাদারী মনোভাবের সঙ্গে দেখতে হবে।

১৩.৭ বিজ্ঞাপনচিত্র : শিল্পগুণ

● বিজ্ঞাপনচিত্র কি শিল্প

বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ 'শিল্প নাকি শিল্প নয়' এই বিতর্ক দীর্ঘদিনের। অনেকেই বলে থাকেন যে বিজ্ঞাপনচিত্রের ক্ষেত্রেবার্তাটি এতই সুনির্দিষ্টভাবে বলে দেওয়া থাকে যে এটি একটি 'ফরমায়েশী' কাজের বেশি কিছু নয় উঠতে পারে না। শিল্পের প্রচলিত সংজ্ঞা থেকে একটু সরে এসে আমরা অবশ্য এই বিতর্কে অংশ নিতে পারি।

প্রথমতঃ বিজ্ঞাপনচিত্র (advt. films)-এর একটি প্রকাশ-মাধ্যম (medium of expression) রয়েছে যা হল 'চলচ্চিত্র'।

আবার মাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্র একটি স্বতন্ত্র্য ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি। চলচ্চিত্র যখন একটি শিল্প-মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে তখন বিজ্ঞাপনচিত্র, যেহেতু তা চলচ্চিত্রের ভাষাকেই ব্যবহার করে, শিল্প বলে স্বীকৃতি হতেই পারে। একটি বিশেষ বিজ্ঞাপনচিত্রের মান নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে, তা ভালো বা খারাপ হতে পারে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞাপনচিত্রের মধ্যেও যে সম্ভবনা নিহিত আছে, একথা অস্বীকার করা যায় না কারণ তা একটি বিশেষ মাধ্যম ও ভাষা-র সাহায্যে নিজেকে প্রকাশ করছে। আর মাধ্যম ও ভাষা থাকলেই শিল্পের সম্ভাবনা থেকে যায়।

দ্বিতীয়ত ঃ যে কোন শিল্প-মাধ্যমেই নিয়োজিত থাকে ব্যক্তি/গোষ্ঠী মানুষ। ব্যক্তিগত/গোষ্ঠীগত দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে শিল্প সৃষ্টি হয়। অবশ্য শিল্প (art)-এর ক্ষেত্রে 'দক্ষতা'-এর সঙ্গে উদ্ভাবনী শক্তি ও জড়িত থাকতে পারে। আমরা জানি যে বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণের মধ্যে পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, মডেল, ক্যামেরাচালক ও সম্পাদকের ব্যক্তিগত বা যৌথ দক্ষতার প্রকাশ ঘটে এবং অবশ্যই সঙ্গে থাকে বেশ কিছুটায় উদ্ভাবনীশক্তির ভূমিকা। আমরা জানি, মানুষের ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত ভাবনার প্রতিফলন ঘটে থাকে একটি শিল্প-মাধ্যমে। সুতরাং সেই অর্থে বিজ্ঞাপনচিত্র একটি শিল্প-মাধ্যম।

তৃতীয়ত ঃ শিল্পদ্রব্য (art object) উৎপাদন একই ছাঁচে প্রচুর গণ-উৎপাদন (mass production)-এর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। শিল্পদ্রব্য উৎপাদন সাধারণত ব্যক্তিগত/গোষ্ঠীগত সৃষ্টি। যেখানে উৎপাদিত প্রতিটি দ্রব্যই একে অন্যের থেকে পৃথক। অর্থাৎ বলা যায় কারখানায় ছাঁচে ঢেলে তৈরি জিনিষ যার লক্ষ লক্ষ 'কপি' (copy) সম্পূর্ণ একই ধরনের তার শিল্পদ্রব্য নয়। কিন্তু একজন পুতুল প্রস্তুতকারকের উৎপাদন হল শিল্প (art) কারণ যেখানে সব পুতুলই হুবহু এক হতে পারে না। ঐ একই যুক্তিকে বলা যায় বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ নিশ্চয় শিল্প-সৃষ্টি (art creation)। কারণ প্রতিটি বিজ্ঞাপনচিত্রই গঠন ও বার্তায় ভিন্ন।

অধুনা বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ একধরনের শিল্প সৃষ্টি বলে স্বীকৃত হয়েছে। বিজ্ঞাপনচিত্র শিল্প-বিপ্লবোত্তর আধুনিকতার অন্যতম ফসল। তাই এক ধ্রুপদী-শিল্প (যথা, সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রকলা) বা লোক-শিল্প (লোক-সঙ্গীত, লোক-নৃত্য ইত্যাদি) এই দুয়ের কোন দলেই রাখা যাবে না। বিজ্ঞাপনচিত্রকে তাই অন্যতম 'জনপ্রিয়-শিল্প' বা 'পপুলার-আর্ট' (popular art) বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায়।

দেশে ও বিদেশে বিজ্ঞাপনচিত্রের বিশেষ প্রদশর্নী আয়োজন করা হয় বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে। এমনকি ফ্রান্সর কান (cannes) শহরে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পাশাপাশি 'কান' আন্তর্জাতিক বিজ্ঞাপন-চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজিত হচ্ছে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে। নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেও শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপনচিত্রকে পুরস্কৃত করা হয়। আজাকল বেশ কিছু নামী উৎসবে বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্রের জন্য আলাদা বিভাগ থাকে। এছাড়াও বিজ্ঞাপনচিত্রের জন্য বিশেষ উৎসব ও দেশ-বিদেশে আয়োজন করা হয়। প্রসঙ্গত বলা যায় এইসব চলচ্চিত্র উৎসবগুলিকে ব্রাজিলের বিজ্ঞাপনচিত্রের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। 'কান' বিজ্ঞাপন-চিত্র উৎসবে ব্রাজিল প্রায় সব বছরই প্রথম পাঁচ পুরস্কার বিজয়ীর তালিকায় অন্যতম স্থান অধিকার করে ও পুরস্কৃত হয়।

সুতরাং একথা বলাই যায় যে একসময় বিজ্ঞাপনচিত্র-কে ব্রাত্য ধরা হলেও এখন তা শিল্প (art) বলে স্বীকৃত হয়েছে। এক বিখ্যাত মার্কিন বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাতার ভাষায় : "যখন আমি প্রথম শহরে পৌঁছেছিলাম তারা বলল : 'আপনি বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাতা, তবে তো এখানে আপনার স্থান হবে না...'। কিন্তু এখন পরিস্থিতিটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে।"

যদিও বিজ্ঞাপনচিত্রের জগতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রাজিল-এই দুই দেশের অগ্রগতি সবচেয়ে ভালো, ফ্রান্সেও বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ শিল্পের মর্যাদা পেয়েছে। বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ শিল্পের মর্যাদা পেয়েছে। বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাতা এতিয়েঁ সাতিল্লেজ (Etienne Chatillez) যিনি চলচ্চিত্রের মূল স্রোতে আসার আগে প্রায় পনেরো বছর ধরে বিজ্ঞাপনচিত্র পরিচালনা করেছেন, তিনি বলেন : "বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ অন্যতম সৃজনশীল কাজ কারণ একটি পূর্ণ-দৈর্ঘের ছবি (film)-তে আপনি আগে বা পরে অনেক সময় নিয়ে অনেক কিছু বলতে পারেন, কিন্তু বিজ্ঞাপন-চিত্রে আপনাকে তিন সেকেণ্ডে সব কথা প্রকাশ করতে হতে পারে।... বিজ্ঞাপনচিত্র কল্পনার অন্যতম উত্তেজক ও সংঘাতময় প্রকাশ। শিল্প (art)-এর এক বিশেষ অবস্থা।.."

● **বিজ্ঞাপনচিত্রে চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট শিল্পীদের অবদান**

ফরাসী চলচ্চিত্র পরিচালক জঁ লুক গোদার একবার রসিকতা করে মন্তব্য করেছিলেন যে, "ইটালীর চলচ্চিত্রে শ্রেষ্ঠ অবদান হল 'কারোসেল্লো'।" আসলে 'কারোসেল্লো' হল দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের একধরনের শৈলী (style) যা ১৯৫০-এর পর থেকে ইটালীতে উদ্ভুত হয়। 'কারোসেল্লো' (carosello) শৈলী হল একটি বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণের আঙ্গিক যেখানে দুই তৃতীয়াংশ থাকত বিশুদ্ধ চলচ্চিত্রের দৃশ্য এবং শেষ এক তৃতীয়াংশে থাকত বিজ্ঞাপনের বার্তাটি। ফলে 'কারোসেল্লো' শৈলীর বিজ্ঞাপনচিত্রগুলি প্রথমত হত শিল্পকর্ম (art work) এবং পরে হত বিজ্ঞাপনের মাধ্যম।

মাইকেলেঞ্জেলো অন্তিনিওনি-র মত বিখ্যাত ইটালিয়ান চলচ্চিত্রকারও বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ করেছেন। সত্যি কথা বলতে কি চলচ্চিত্র জগতে প্রায় সব বড় শিল্পীই তাদের শিল্পী জীবনের প্রথমদিকে বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণের কাজ করেছেন। এদেশে অর্থাৎ ভারতেও নতুন চলচ্চিত্র পরিচালক ক্যামেরাম্যান বা সম্পাদকরা বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ দিয়ে তাদের পেশাদার জীবন শুরু করেন।

পৃথিবীর সর্বত্রই বিজ্ঞাপন সংস্থা (advertising agencies) গুলি নাম করা পরিচালকদের দিয়ে বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ করান। যেমন, আমেরিকার বিখ্যাত 'ম্যাডিশন অ্যাভোনিউ' নামের বিজ্ঞাপন সংস্থার নির্মিত ছবিগুলির পরিচালক হন রবার্ট অল্ট্ম্যান, জন গ্লেশিংজার এবং অধুনা নেষ্টর আলমেনড্রম-এর মত খ্যাতনামা চলচ্চিত্র পরিচালকবৃন্দ। এমনকি স্টিফেন স্পিলবার্গের মত বাণিজ্য-সফল চলচ্চিত্রকারও বিজ্ঞাপনচিত্র পরিচালনা করেন।

ফ্রান্সে রোমান পোলানস্কি তৈরি করেছেন ফ্রোনেনবার্গ বিয়ার-এর বিখ্যাত বিজ্ঞাপনচিত্রটি। ইটালীতে মাইকেল এঞ্জেলো আন্তনিওনি ছাড়াও সার্জিও লিওনে এবং তাভিয়ানি ভ্রাতৃবৃন্দ ইত্যাদি স্বনামধন্য পরিচালকরা বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ করেছেন। ফরাসী নব-তরঙ্গের অন্যতম প্রধান চলচ্চিত্রতার ক্লদে শ্যাব্রল বেশ কিছু বিখ্যাত বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ করেছেন। এমনকি শ্যাব্রল তাঁর নির্মিত ফিল্মের তালিকা (filmography) তৈরির সময় তাঁর করা কয়েকটি জনপ্রিয় বিজ্ঞাপন চিত্রেরও উল্লেখ করে থাকেন।

এমনকি ব্রাজিল, স্পেন ও চিলির মত দেশে অনেকক্ষেত্রেই বহু চলচ্চিত্রকার বিজ্ঞাপনচিত্রের উপর জীবিকা নির্মাণ করতে হয়। যেমন, ১৯৯০-এর পূর্বে যখন চিলিতে স্বৈরাচারী শাসক রাজনৈতিক চলচ্চিত্রকে নিষিদ্ধ করেন, তখন রাজনীতি সচেনত ও বিপ্লবী চলচ্চিত্রকাররাও বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ব্রাজিলের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যেতে পারে।

এছাড়াও অ্যালান পার্কার, টনি স্কট বা রিডলে স্কট যাদের আমরা সফল চলচ্চিত্র পরিচালক হিসাবে চিনি, তারা বিজ্ঞাপনচিত্র দিয়ে পেশাদার চলচ্চিত্র জীবন শুরু করেন। রিডলে স্কট ১৯৭৬ সালে 'কান' বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্র উৎসবে একটি বিখ্যাত ফরাসী পত্রিকার বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণের জন্য শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপন চিত্রে নির্মাতার পুরস্কার পান। এমনকি এ্যান্ডি ওয়ারহল-এর মত তথাকথিত প্রতিষ্ঠান বিরোধী চলচ্চিত্রকারও বিজ্ঞাপনচিত্রের জগতে কাজ করেছেন।

গত ১৯৮৮ সাল থেকে ফ্রান্সের অন্যতম তথাকথিত অভিজাত (elit) একটি মিউসিয়াম চিত্রকলা, চলচ্চিত্রের সঙ্গে বিজ্ঞাপনচিত্রকেও অন্যতম 'প্ল্যাস্টিক আর্ট' (plastic art) বা 'বাস্তববাদী-রূপ-কলা'-এর মর্যাদা দিয়েছেন এবং মিউজিয়ামের সংগ্রহে শিল্পোত্তীর্ণ বিজ্ঞাপনচিত্রগুলিরও স্থান হয়েছে মহৎসব শিল্পকর্মের পাশাপাশি।

১৩.৮ বিজ্ঞাপনচিত্রের বাণিজ্যের সাফল্য

বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ গত কয়েক দশক ধরেই চলচ্চিত্র শিল্প (film industry)-এ বেশ লাভজনক বাণিজ্য। হিসাবে দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণে চলচ্চিত্র শিল্প (industry)-এর কোন আর্থিক ঝুঁকি থাকে না। কারণ বিজ্ঞাপনচিত্রের ক্ষেত্রে ব্যয়ভার বহন করে বিজ্ঞাপনদাতা স্বয়ং।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ থেকে চলচ্চিত্র শিল্প (film industry)-এর সঙ্গে যুক্ত পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, কলাকুশলী (technicians)-দের আর্থিক সংস্থান হয়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ চলচ্চিত্র শিল্প (film industry)-এর মোট বাণিজ্যিক লাভের বেশিরভাগ জুড়ে থাকছে। ইটালী, ব্রাজিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে প্রতিবছর বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণের কাজে বহু কোটি টাকা লেনদেন হয়ে থাকে। কেবলমাত্র প্রথম বিশ্বের দেশগুলির ক্ষেত্রেই নয়, লাতিন আমেরিকা ও এশিয়ার অনেক দরিদ্র দেশের চলচ্চিত্র শিল্প (film industry)-এর টাকার অন্যতম উৎস হল বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্র।

১৯৮৬ সালের হিসাবে দেখা যাচ্ছে সে ইটালিতে বিজ্ঞাপনচিত্রের মাধ্যমে চলচ্চিত্র শিল্প (industry)-এ আয় হয়েছে দুশ আশি বিলিয়ন ইটালীয় মুদ্রা, যেখানে সে বছরে উৎপাদিত কাহিনীচিত্র নির্মাণের মোট ব্যয় ছিল দুশত বিলিয়িন ইটালীয় মুদ্রা। ইটালীন মত ব্রাজিলর চলচ্চিত্র শিল্প (industry)-এরও মূল আর্থিক ভিত্তি বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ। সেখানে বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণে ১৯৮৮ সালের হিসাবে আয় যা তার তুলনায় কাহিনীচিত্র নির্মাণে খরচ আয়ের সাতভাগের এক ভাগ মাত্র। এমনকি সেদেশে 'ম্যাকডোনাল্ড' বহুজাতিক কোম্পানির একটি তিরিশ সেকেণ্ডের বিজ্ঞাপনচিত্রের ব্যয় একটি কাহিনীচিত্র (fiction film) তৈরির খরচের সমান—প্রায় চার লক্ষ ডলার।

ইউরোপ ও আমেরিকার বহু দেশেই প্রচুর সংখ্যায় প্রতিবছর বিজ্ঞাপন চিত্র নির্মাণ করা হয়ে থাকে। ১৯৮৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি বিজ্ঞাপনের সংখ্যা পয়ত্রিশ হাজার। সেখানে ইংল্যাণ্ডে তৈরি হয়েছে সাত হাজার বিজ্ঞাপনচিত্র, ইটালীতে তৈরি হয়েছে দু হাজার, পশ্চিম জার্মানীতে তৈরি হয়েছে দু হাজার, স্পেনে এক হাজার তিনশ এবং ফ্রান্সে এক হাজার একশটি। সাধারণত ফ্রান্সে মোট কাহিনীচিত্রের পঞ্চাশ থেকে ষাট শতাংশ হল বিজ্ঞাপনচিত্র। ইংল্যান্ডে মোট ফিচার দৈর্ঘ্যে কাহিনীচিত্রের দুগুন বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মিত হয়।

১৯৮৭ সালে ইটালীর একটি জনপ্রিয় সাময়িকপত্র একটি সমীক্ষায় দেখিয়েছিল যে বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণের বিপুল আয়ের ফলে কিভাবে ৮০ দশকের প্রথমার্ধে ধ্বংসের মুখে দাঁড়ানো ইটালীয় চলচ্চিত্রশিল্প (film industry) আবার সজীব হয়ে উঠেছিল। ঐ পত্রিকার হিসাব মত ১৯৮৩-'৮৬ এই তিন বছরে বিজ্ঞাপনচিত্রের আয় দশ শতাংশ থেকে বেড়ে হয় তিরিশ শতাংশ যা সে দেশের চলচ্চিত্র শিল্প (industry) সিনে সিত্তা (cine citta)-র আর্থিক মন্দা কাটাতে সাহায্য করে। ক্রমে বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ এখন ইটালীতে চলচ্চিত্র শিল্প কর্ম (film art)-এর অন্যতম অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সে দেশের একটি পত্রিকার মতে, হলিউডে ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে বড় কোম্পানির তৈরি মূল ফিচার দৈর্ঘ্যের ফিল্মের সঙ্গে ছোট কোম্পানির তৈরি অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট ছবি (যে গুলিকে বলা হত হলিউড 'বি-মুভি')-গুলি যে ভূমিকা পালন করত, ইটালীতে 'বি-মুভী' (B-movie)-র ভূমিকা নেয় বিজ্ঞাপনচিত্রগুলি। এছাড়াও পত্রিকাটির মতে ইটালীর বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ শিল্প (industry) সংখ্যার (quantity) থেকেও অনেক বেশি নির্ভরশীল শিল্পগুণ (quality)-এর উপর। হলিউট 'বি-মুভী'-র মতই ইটালীর 'সিনেসিত্তা' নির্মিত বিজ্ঞাপনচিত্রগুলির গুণগতমান মূল চলচ্চিত্রের থেকে কোন অংশে কম নয় বরং অনেকক্ষেত্রে বেশি।

ইটালীর মতই ফ্রান্সেও চলচ্চিত্রের পরিচালক, কলাকুশলীদের অন্যতম প্রধান আয়ের উৎস বিজ্ঞাপনচিত্র। ফ্রান্সে একজন খ্যাতনামা চলচ্চিত্র পরিচালক একটি তিরিশ সেকেন্ডের বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণের জন্য আয় করেন পঞ্চাশ হাজার ডলার যা কাহিনীচিত্রে তাঁর একমাসের রোজগারের সমান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজন পরিচালক বিজ্ঞাপনচিত্রে একদিন কাজের জন্য রোজগার করেন সাত হাজার থেকে কুড়ি হাজাল ডলার পর্যন্ত। ইংল্যান্ডে একজন অভিজ্ঞ ক্যামেরাম্যান (ডিরেকটর অব ফটোগ্রাফি) ঐ কাজের জন্য প্রতিদিন পান এক হাজার পাউণ্ড। কেবলমাত্র চলচ্চিত্র পরিচালক, ক্যামেরাচালক বা সম্পাদক নয়, বিভিন্ন ধরনের কলাকুশলী যেমন ডিসাইনরা, স্টান্ট-ম্যান, মেক-আপ ম্যন, মডেল ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পেশাগত দক্ষতার লোকজনের আয়ের মূল উৎস (ফ্রান্স, ইটালী, আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও ব্রাজিলের মত দেশে) বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ শিল্প (industry)।

যদিও ভারতের বিজ্ঞাপনচিত্রের বাজার উপরোক্ত দেশগুলির মত এত ভালো নয়, তবু যেহেতু এদেশে প্রতি এক বছরে

সবচেয়ে বেশি ফিচার দৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র উৎপাদন হয় এবং সবচেয়ে বেশি দর্শক চলচ্চিত্র দেখেন, তাই এদেশে বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্রের বিকাশের ভালো সুযোগ রয়েছে। যদিও প্রতি বছরই বিজ্ঞাপনচিত্র থেকে আয় বেড়েই চলেছে তবু বিজ্ঞাপনের খাতে এদেশে মোট ব্যয়ের তুলনায় তা দুই থেকে আড়াই শতাংশের বেশি নয়। স্যাটেলাইট টেলিভিশনের ব্যাপক প্রসারের ফলে চলচ্চিত্র মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের সংখ্যা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এছাড়াও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে (যথা, ভেনিজুয়েলা, মেক্সিকো, ব্রাজিল) ইউরোপ আমেরিকান সংস্থাগুলি ভালো নিসর্গচিত্র ও উজ্জ্বল আলোর জন্য চিত্রগ্রহণ ও অন্যান কাজ করে থাকে, এতে ঐসব দেশের চলচ্চিত্র শিল্প (industry)-এর লাভ হয়। কিন্তু ভারতে এধরনের বিদেশী সংস্থাগুলির পক্ষে কাজ করার অনুমতি পাওয়া আমলাতান্ত্রিক কারণে ও আইনগত বাধানিষেধের জন্য বেশ কঠিন। কোন বিদেশী বিজ্ঞাপন সংস্থা (advt. agency) এদেশে এককভাবেও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। হয় তাদের কোন ভারতীয় সংস্থার সঙ্গে যৌথ-ভাবে কাজ করতে হবে অথবা লাল ফিতের ফাঁস কোনক্রমে এড়াতে পারলেও বিদেশী সংস্থাগুলি একক উদ্যোগে কাজ করতে গেলে চিত্রগ্রহণের সময় ঐ স্থান (location)-এ একজন সরকার নিযুক্ত আমলা পরিদর্শক হিসাবে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন বাধানিষেধ সঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে কিনা তা দেখবেন। ফলে ভারতের চলচ্চিত্র শিল্প (film industry)-এ বিজ্ঞাপনচিত্রের কাজের মাধ্যমে বিদেশী অর্থের আগমন ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

অথচ বহুজাতিক ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলি (advertising agencies)-কে ব্রাজিল, মেক্সিকো বা ভেনেজুয়েলার মত এদেশেও আকৃষ্ট করার মত সবরকম সুবিধাই ভারতে রয়েছে — যেমন :

- # ভারতের প্রায় সব প্রধান শহরেই ভালো স্টুডিও 'ইন্ডাসট্রিয়াল সেট আপ' বলতে যা বোঝায় তা রয়েছে। মুম্বাই, দিল্লি, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ ও কলকাতা শহরে চালু স্টুডিও ব্যবস্থা রয়েছে।
- # এদেশে চলচ্চিত্র শিল্প (industry)-এ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি উৎপাদন হয় বলে উন্নত ও অভিজ্ঞ কলাকুশলী (technicians)-র অভাব নেই ভারতে।
- # বিদেশীদের কাছে আকর্ষণীয় নিসর্গ দৃশ্য-এর অভাব নেই ভারতে। নীল আকাশ, সবুজ প্রকৃতি পিকাচ পোস্টকার্ডের জন্য দৃশ্যাবলী ইত্যাদির অভাব নেই এখানে যা বিজ্ঞাপনচিত্রে 'ল্যাণ্ডস্কেপ' হিসাবে ব্যবহার হতে পারে।
- # এদেশে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের অভাব নেই। বরফের ঢাকা পাহাড়, নীল সমুদ্র, সমতল ভূমি, নদী, ঝর্ণা, মরুভূমি বিভিন্ন ধরণের যেমন চিরসবুজ, ম্যানগ্রোভ, তরাই প্রভৃতি বনভূমি ইত্যাদির সহাবস্থানের সঙ্গেই রয়েছে ঐতিহাসিক স্থান, সৌধ, গুহাচিত্র প্রভৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার যা বিজ্ঞাপনচিত্রের দৃশ্যাবলীতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- # এদেশে প্রায় সব ঋতুতেই প্রচুর সূর্যের আলো ও উষ্ণ আবহাওয়া পাওয়া যায় যা চিত্রগ্রহণে সুবিধা করে দেবে।
- # ভারত থেকে অধুনা বিভিন্ন সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতায় স্থান পাচ্ছে মেয়ে ও ছেলে মডেলরা। বিদেশী বিজ্ঞাপনচিত্রের এদের বাদামী চামড়ার মডেল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- # এর সঙ্গে রয়েছ ভারতে অপেক্ষাকৃত কম খরচে বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণের সুবিধা। কারণ এদেশে কলাকুশলী ও পরিচালকদের পারিশ্রমিক তুলনামূলকভাবে কম।

১৩.৯ বিজ্ঞাপনচিত্র ও নৈতিকতা

১৩.৯.১ বিজ্ঞাপনচিত্র : আদর্শগত অবস্থান

বিজ্ঞাপনের বার্তা যে কেবলমাত্র দর্শকের ইন্দ্রিয় (চোখ, কান ইত্যাদি)-কে প্রভাবিত করে তাই নয়। বিজ্ঞাপনের বার্তা দর্শকের মনের গভীর অংশকে প্রভাবিত করে থাকে। একটি বিজ্ঞাপনের বার্তা দর্শকের অবচেতন (unconscious) মনের বাসনা (desive)-এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য হল এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া যে উদ্দিষ্ট

পণ্য/পরিষেবার ক্রেতা/ভোক্তা হলে মনের সুপ্ত বাসনা (desive)-এর সন্তুষ্টি ঘটবে।

এ কথা বলা যায় যে বিজ্ঞাপনের অর্থ (meaning) একেবারে নির্দোষ বা সরল নয়, বরং জটিল ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আর এই জটিল অর্থই জটিলতর হয় দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে বিজ্ঞাপনটি প্রচারিত হলে অর্থাৎ বলা যায় বিজ্ঞাপনচিত্র (advertisement film)-এর প্রতিটি ইমেজ (image) এক একটি জটিল অর্থের আকার। কারণ ইমেজ বা দৃশ্য দর্শককে যত সরাসরি ও যত গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে অন্য কোন মাধ্যমে ততটা সম্ভব নয়।

বিজ্ঞাপনের বার্তা সংযোগ (communication) ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞদের মতামত হল, 'বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় বার্তা ও দর্শকের মধ্যে 'সামাজিক সম্পর্কের' মাধ্যমে, বার্তাটির বিষয়বস্তু (content) আসলে কী তা শেষ পর্যন্ত গৌণ হয়ে যায়।' এই 'সামাজিক সম্পর্ক' (social relationship) নির্ভর করে দর্শকের শ্রেণী (class), পদমর্যাদা, ইত্যাদি সামাজিক অবস্থান ও সেই সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর। যেহেতু দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে পোষাক, অঙ্গভঙ্গি, শ্রেণী, সামাজিক অবস্থান প্রভৃতির পরিস্কার ছাপ পাওয়া যায় তাই বিজ্ঞাপনচিত্রের ইমেজগুলি অনেক বেশি করে এই সামাজিক সম্পর্কের নির্দেশক হয়ে দাঁড়ায়।

আসলে বিজ্ঞাপনের ইমেজ (image) সাধারণত দর্শকের কাছে সরাসরি পণ্য/পরিষেবা বিক্রি করে না, তারা প্রথমে স্বপ্ন ও বাসনা বিক্রি করে। বিজ্ঞাপনের দৃশ্যগুলি দর্শকের মনকে প্রলুব্ধ করে এবং একধরনের ব্যক্তিগত ইচ্ছাপূরণ (wishfullfilmeant)-এর সঙ্গে পণ্য/পরিষেবাটির সম্পর্ক স্থাপন করে। সুতরাং একথা বলা যায় যে বিজ্ঞাপনের বার্তাটি তৈরি হয় দর্শকের ইচ্ছাপূরণের উপকরণ দিয়ে আবার তা কাজে লাগানো হয় দর্শকের ইচ্ছাপূরণের উপায় হিসাবে!

আমরা একথা জানি যে বিজ্ঞাপনচিত্রের ইমেজ দর্শককে মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রভাবিত করে থাকে। সাধারণত সামাজিক মানুষের মনের তিনটি অবস্থার উপর নির্ভর করে বিজ্ঞাপনচিত্রের বার্তা ও আঙ্গিক গঠিত হয়—বদ্ধমূল বিশ্বাস (predisposition), আশা ও বাসনা (hopes & desires) এবং উদ্বেগ ও আশঙ্কা (anxiety & concerns)। বদ্ধমূল বিশ্বাস হতে পারে বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি ভক্তি, প্রতিষ্ঠানকে দেবতা জ্ঞান করা, বস (boss)-এর প্রতি বিশ্বস্ততা, ঐতিহ্যের প্রতি মোহ ইত্যাদি। আগে ও বাসনা হল বিভিন্ন ধরনের ইচ্ছার উৎস যেমন একটি বাড়ি, একটি মোটরবাইক মোবাইল ফোনের মালিক হবার প্রতি বাসনা ইত্যাদি। উদ্বেগ ও আশঙ্কার উৎস হল একটি বিশেষ সামাজিক অবস্থা, পদ স্টেটাস (status) ইত্যাদির কাছে পৌঁছতে পারব কিনা বা একটি বিশেষ কোন ইচ্ছাপূরণের উপকরণ পাব কিনা এই অনিশ্চয়তা।

বিজ্ঞাপনের ইমেজ (image) যা করে তা হল উপরোক্ত বদ্ধমূল বিশ্বাসের ভিত্তি দর্শকের মনে আরও সুদৃঢ় করে, বাসনা পূরণের উপায় হিসাবে পণ্য/পরিষেবাটিকে উপস্থাপিত করে অথবা উদ্বেগ ও আশঙ্কার দূর করার পথ হিসাবে পণ্য/পরিষেবার ক্রেতা/ভোক্তা হতে আহ্বান করে।

সাধারণত বিজ্ঞাপনের ইমেজ, তা স্থির চিত্র হোক বা চলমান ছবি, দুটি স্তরে অর্থ সৃষ্টি করে থাকে। প্রথমটি হলে 'সাধারণ অর্থ বা ডিনোটেশন (denotation) এবং দ্বিতীয়টি হল 'গূঢ় অর্থ' বা কনোটেশন (connotation)। প্রাথমিকভাবে একটি বিজ্ঞাপনচিত্র দেখাল তার ইমেজগুলির যে অর্থ আমরা সচেতনভাবে বুঝি তা হল 'সাধারণ অর্থ'। 'সাধারণ অর্থ' অনুধাবন করার পরমুহূর্তে মনের মধ্যে ইমেজ-এর সঙ্গে মুল্যবোধ, বিশ্বাস, জীবনদর্শন ইত্যাদির মধ্যে সম্পর্ক (relationship)-এর ভিত্তিতে যে অর্থ সৃষ্টি হয় তা হল 'গূঢ় অর্থ'।

যেমন ধরা যাক একটি বিজ্ঞাপনচিত্রের ইমেজে দেখানো হচ্ছে শচীন তেণ্ডুলকর একটি বিশেষ কোম্পানির তৈরি মোটরবাইকে চড়ছেন। এখনে 'সাধারণ অর্থ' বা ডিনোটেশন হল শচীরে মত একজন বড় ক্রিকেটার মোটরবাইকটি কেনার জন্য দর্শকের কাছে আহ্বান করছেন। অন্যদিকে এই বিজ্ঞাপনের ইমেজগুলির গূঢ় অর্থ হল : শচীনের শৌর্যে পৌরুষ, শক্তি, গ্ল্যামার, ক্ষমতা, স্ট্যাটাস ইত্যাদির অংশ হওয়া যাবে যদি ঐ মোটরবাইকটি দর্শক ক্রয় করেন। সামাজিক ব্যবস্থার ফলে জন্ম হওয়া মোহ, যা অবস্থান করে দর্শকের মনে, তার সঙ্গে পণ্যের সম্পর্ক-স্থাপনের মাধ্যম হল শচীন তেণ্ডুকরের বিশেষ ব্যক্তিত্ব। অর্থাৎ এখানে শক্তি, গ্ল্যামার, ক্ষমতা, শৌর্য্য ইত্যাদি বিমূর্ত ধারণার সঙ্গে একটি পণ্যের প্রতীকয় সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তৈরি হয় 'গূঢ় অর্থ' (connotation)।

১৩.৯.২ বিজ্ঞাপনচিত্র ও 'টাইপ'

বিজ্ঞাপনের বার্তা সাধারণত গঠিত হয় কতকগুলি 'আদর্শ ভাবনা' বা আইডিয়াল টাইপ (ideal type)-এর উপর ভিত্তি করে। এই আদর্শ ভাবনা (ideal type) গুলি সৌন্দর্য্য, ব্যক্তিত্ব, পৌরুষ ইত্যারি জনপ্রিয় সামাজিক সংজ্ঞার প্রতিফলন। একটু ব্যাখ্যা করে বলা যায়, সাধারণ ভারতীয় সমাজে 'আদর্শ ভাবনা' বা আইডিয়াল টাইপ হিসাবে মেয়েদের সৌন্দর্য্যের সংজ্ঞা হল ফর্সা, উন্নত নাসা, স্বাস্থ্যবতী ইত্যাদি। তেমনি আদর্শ ব্যক্তিত্ব ধরা হয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, অধ্যাপক, এক্সিকিউটিভ, ব্যবসায়ী অথবা সেলিব্রেটি বা খ্যাতনামা ব্যক্তিদের। এখানে 'সেলিব্রেটি' বলতে জনপ্রিয় খেলোয়াড়, অভিনেতা/অভিনেত্রী এদের বোঝানো হয়েছে।

সাধারণত দেখা যায় বিজ্ঞাপনচিত্রের অন্তত দশটি 'আদর্শ ভাবনা' (ideal type) সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে বার্তা গঠনের ক্ষেত্রে।

১) **সৌন্দর্য (beauty)** — সৌন্দর্যের একটি নির্দিষ্ট জনপ্রিয় ধারণা সমাজে বর্তমান। সাধারণত প্রকৃতি (nature) এবং নারী (woman)—বিজ্ঞাপনে এই দুয়ের উপর নির্ভর করে সৌন্দর্য্যের দৃশ্যগত উপস্থাপনা। শারীরিক লাবণ্য ছাড়াও সামাজিকভাবে তথাকথিত সংস্কৃতিমনস্ক, পরিশীলিত, আকর্ষণীয় ও সপ্রতিভ ব্যক্তিত্ব সৌন্দর্য্যের অন্যতম উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

২) **ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র (individuality)** — ব্যক্তিগত স্টাইল, সকলের থেকে একটু অন্যরকম জীবনযাত্রা, একধরনের, 'ডোন্টা কেয়ার'ভাব ইত্যাদি উপাদান দ্বারা বিজ্ঞাপনের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের 'আদর্শ ভাবনা' গড়ে ওঠ।

৩) **পৌরুষ (ruggedness)** — 'মাচো', শক্তিমান, এ্যাডভেঞ্চারিস্ট, কঠোর (tough), জীবনে অভ্যস্ত পুরুষের চিত্রায়ন সাধারণত পৌরুষ প্রকাশের 'আইডিয়াল টাইপ' হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পৌরুষের এই ধরনের 'আদর্শ ভাবনা' গঠনের ক্ষেত্রে একটি জনপ্রিয় ধারণা কাজ করে যে জন্মগতভাবে মেয়েরা কোমল, গৃহস্থ এবং পুরুষরা কাটার, মাচো ও বর্হির্মুখী ইত্যাদি।

৪) **পরিবার (family)** — পরিবার হল সমাজের একক। পরিবারের প্রতি ভালবাসা ও পারিবারিক মূল্যবোধ-এর প্রতি বিশ্বস্ততা বিজ্ঞাপনচিত্রে 'আদর্শ' আচরণ হিসাবে জনপ্রিয় হয়ে থাকে। বিশেষ করে ভারতের মত 'ট্র্যাডিশনাল' সমাজে পরিবার ও পারিবারিক মূল্যবোধ বিজ্ঞাপন্নে রীতিমত 'পবিত্র' বিষয় বলে স্বীকৃত হয়।

৫) **রোমান্টিক প্রেম (romantic love)** —এক্ষেত্রে রোমান্টিক প্রেমের সঙ্গে একধরনের জীবনযাত্রার সম্পর্ক তৈরি করা হয়ে থাকে। যেমন, মচো বা অভিযানপ্রিয় পুরুষ চরিত্র যার জীবনযাত্রা আধুনিক গ্ল্যামারের প্রতীক, তার সঙ্গে আকর্ষনীয় মেয়ের সম্পর্কের মাঝে বিজ্ঞাপনের পণ্য/পরিষেবার ভূমিকা দেখানো হয়। অনেক সময় বিজ্ঞাপনে গৃহস্থ প্রেমের 'বন্ধন' তৈরির ক্ষেত্রে পণ্য/পরিষেবার ভূমিকা ইত্যাদি দেখানো হয়ে থাকে।

৬। **মহিলাদের পরস্পর বন্ধুত্ব (sorority)**—সমাজের একই শ্রেণী (class)-তে অবস্থানকারী কয়েকজন মহিলা তাহা হতে পারে মধ্যবিত্ত গৃহবধু বা উচ্চবিত্ত ছাত্রী ইত্যাদি— এদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সংলাপের মধ্যে পণ্য/পরিষেবাটির ভূমিকাকে প্রধান করে দেখানো হয়। এসব ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত গৃহবধু, উচ্চবিত্ত ছাত্রী এদের আড্ডা, ক্লাব বা পার্টিতে আচরণ, কথাবার্তা কেমন হবে সে সম্পর্কে একটি 'আইডিয়াল টাইপ' বিজ্ঞাপনে উপস্থাপিত করা হয়।

৭) **সৌভ্রাতৃত্ব (fraternity)** — মেয়েদের মধ্যে দল (group), ক্লাব বা গোষ্ঠীর মতই পুরুষদের মধ্যেও গোষ্ঠী, দল, ক্লাব বা অফিস-এ কর্মরত বা অবসর আপনরত পুরুষদের মধ্যে বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত পণ্য/পরিষেবাটির ব্যবহার স্ট্যাটাস (status) বা সামাজিক অবস্থান নির্ণয় করে বলে দেখানো হয়।

৮) **বন্ধুত্ব (friendship)** — পুরুষ-পুরুষ বা পুরুষ ও মহিলা বন্ধুত্বের সম্পর্কটি তৈরি হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট পণ্য/পরিষেবার ক্রয়/ভোগের মাধ্যমে এরকম বিজ্ঞাপন হামেশাই দেখা যায়। যেমন, একটি বিজ্ঞাপনে ধরা যাক দেখা যাচ্ছে যে একটি বিশেষ চুয়িংগাম বা বাব্‌লগাম ব্যবহারকারী ছেলে মেয়েদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরি হচ্ছে।

৯) **যৌনতা (sexuality)** — যৌন আকর্ষণ কি কি ভাবে তৈরি হয়, তার একটি 'আদর্শ ধারণা' জনপ্রিয় মনস্তত্বে বর্তমান যা বিজ্ঞাপনচিত্রে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত এসব-ক্ষেত্রে দর্শকের কাছে আবেদন করা হয় যে ঐ বিশেষ পণ্য/পরিষেবা ব্যবহার করলে তার ব্যক্তিত্বেও যৌন আকর্ষণ তৈরি হবে।

১০) **জাতীয়তা (nationality)** — আধুনিক সমাজের জনপ্রিয় মনস্তত্বে জাতীয়তা-র ধারণায় একধরণের 'আদর্শ ভাবনা' কাজ করে। এই পণ্য/পরিষেবাটি ব্যবহার করলে 'আমি ভারতীয়' বা 'আমি ফরাসী' কি 'আমি ইংরেজ' হিসাবে নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করতে পারব—এই ধারণার দ্বারা বিজ্ঞাপনচিত্র অনেক সময় বার্তা নির্মাণ করে থাকে।

১৩.৯.৩ বিজ্ঞাপনচিত্রে মেয়েদের আদর্শগত অবস্থান

তবে এদেশে বা বিদেশে বিশেষত দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমের বিজ্ঞাপনে আদর্শগত ক্ষেত্রে সবচেয়ে সমালোচনারস্থান হল মেয়েদের শরীরের ব্যবহার। সাধারণত বিজ্ঞাপনচিত্রে মেয়েদের শরীরকে পণ্য (commodity)-এর মত দেখানো হয়ে থাকে। বিজ্ঞাপনের নারীদেহ উপস্থাপিত হয় 'বাসনা পূরণের বস্তু' বা 'অবজেক্ট অব ডিসায়ার' (object of desire) হিসাবে। সারা পৃথিবী জুড়েই আধুনিক সভ্য সমাজ যেহেতু পুরুষতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাই বিজ্ঞাপনে মেয়েদের উপস্থাপনা এভাবে হবে এটা অস্বাভাবিক নয়।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মেয়েরা যে কেবল 'বাসনা পূরণের বস্তু' (object of desire) হিসাবে বিজ্ঞাপনচিত্র উপস্থাপিত হয় তাই নয়, সাধারণত সমাজে তাদের কতকগুলি নির্দিষ্ট ভূমিকার বাইরে দেখানো হয় না। বিজ্ঞাপনচিত্রে মেয়েদের গুটিকয়েক 'আদর্শ (ideal) ভূমিকা চিহ্নিত করা হয়। যেগুলি সাধারণত হয় :

ক) 'গৃহবধূ ও মা (housewife & mother)।

খ) বয়স্ক গৃহকর্ত্রী (old hostess, i.e., mother-in-law etc)।

গ) সুন্দরী মডেল, অভিনেত্রী (beautiful model or actress)।

ঘ) প্রতিষ্ঠিত মহিলা, গায়িকা, নর্তকী (celebraty, singer, dancer)।

ঙ) প্রেমিকা, বান্ধবী (girl-friend, friend)।

চ) রান্নার বা কাজের মহিলা (cook, maid, servant)।

ছ) সেক্রেটারী, কম্পিউটার-গার্লস, বিমানসেবিকা (secretary, computer operator, air-hostess)।

জ) শিক্ষিকা, শিশুচিকিৎস, স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ (teacher, child doctor & gyneocologist)।

ঝ) ছাত্রী, কিশোর, (student, teenager etc.)।

ঞ) 'করপোরেট' চাকুরিজীবী (corporate executive)।

মোটামুটি উপরোক্ত ভূমিকাগুলিতে বিজ্ঞাপনচিত্রে মেয়েদের উপস্থাপিত করা হয়। বিজ্ঞাপনচিত্র এমনভাবে গৃহস্থ বা কর্মরত মেয়েদের দেখায় যেন সহনশীলতা, কোমলস্বভাব, নরম শরীর, সেবাপরায়ণতা, লাস্যময়তা, নমনীয়তা ইত্যাদি ব্যতিরেকে নারীত্বের আর কোন সংজ্ঞা হয় না। বিজ্ঞাপনচিত্রের পর্দায় সাধারণত একধরনের মনোরঞ্জনকারী বা গৃহস্থ ভূমিকার বাইরে মেয়েদের কদাচিৎ দেখা যায়। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে লিঙ্গ বিভাজন (gender bias & gender identification) বিজ্ঞাপনচিত্রের বার্তাকে অনেকক্ষেত্রেই আদর্শগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

১৩.১০ বিজ্ঞাপনচিত্র : আচরণবিধি

১৯৭৮ সালে বিচারপতি বি.জি. ভার্গিস-এর নেতৃত্বে যে 'ভার্গিস কমিটি রিপোর্ট, ১৯৭৯' (Verghese Committee Report, 1978) পেশ করা হয় যেখানে বিজ্ঞাপনের জন্য বিশেষত দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমের বিজ্ঞাপনের জন্য একটি আদর্শ আচরণবিধি মেনে চলার সুপারিশ করা হয়। 'ভার্গিস কমিটি' দূরদর্শন ও জনমানসে তার প্রভাব সম্পর্কে এদেশে একটি

বিশেষ সমীক্ষার ভিত্তিতে 'জেনারেল রুলস্ অব কনডাক্ট ইন এডভার্টাইজিং' (General Rules of conduct-in Advertising)-এর প্রস্তাব করেন। প্রস্তবগুলির অধিকাংশই দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের কথা ভেবে করা হয়েছিল :

১) বিজ্ঞাপনের ভাষ্য, দৃশ্য বা বার্তা যেন দেশের সংবিধান ও আইন মেনে করা হয় তা দেখতে হবে। সামাজিক মূল্যবোধ, শালীনতা এবং ধর্মীয় সহনশীলতার জাতীয় আদর্শ সম্পর্কে বিজ্ঞাপনে সচেতন থাকতে হবে।

২) সেই সব বিজ্ঞাপন প্রকাশের বা প্রচারের অনুমতি পাবে না যেগুলি—

ক) জাতি (race), ধর্ম (religion), বর্গ (caste), বর্ণ (colour), প্রাদেশিকতা ও জাতীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে কোন 'বিশেষ' ধারণাকে প্রশ্রয় দেয় যা পক্ষপাতদুষ্ট বা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক বা অসত্য।

খ) সংবিধানের উদ্দেশ্য (objectives), নীতি (principles) অথবা নিয়ম (provision)-এর সঙ্গে একমত হয় না।

গ) দর্শককে অপরাধপ্রবণ করে তুলতে পারে, মানুষের মধ্যে অস্থিরতা ছড়াতে পারে অথবা আইনভঙ্গে উৎসাহ দেয় বা হিংসাত্মক কাজে ইন্ধন জোগাতে পারে।

ঘ) অপরাধ বা সিংস্রতার দৃশ্যকে অনুপুঙ্খভাবে (detail) দেখায় বা উপস্থাপিত করে।

ঙ) প্রতিবেশী রাষ্ট্র-এর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক হতে পারে বা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করতে মদত দেয়।

চ) রাষ্ট্রের উচ্চপদে আসীন কোন ব্যক্তিকে বিজ্ঞাপনের মধ্যে দৃশ্য বা শ্রাব্যে ব্যবহার করে বা জাতীয় চিহ্ন/পতাকার ব্যবহার করে।

ছ) সিগারেট, তামাকের প্রচার করে।

জ) কোন বিজ্ঞাপন (চিত্র) সম্পূর্ণভাবে বা প্রধানত ধর্ম বা রাজনৈতিক দল ইত্যাদি সম্পর্কে হওয়া উচিৎ নয়। বা যেসব বিজ্ঞাপনচিত্র শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক বা শিল্প-বিরোধের কারণ হতে পারে সেগুলি প্রচার করা যাবে না।

জ) নিম্নলিখিত বিষয়গুলির পক্ষে বিজ্ঞাপনচিত্রে প্রচার করা যাবে না।

(অ) সুদে টাকা ধার দেবার চক্র (আ) চিট ফাণ্ড বা অনুমোদিত অর্থ লেন-দেন ব্যবসা (ই) বিবাহ-সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন (ঈ) লাইসেন্সবিহীন কর্মসংস্থানকারী সংস্থার বিজ্ঞাপন (ঋ) ভাগ্য-গণনা, হাত-দেখা, সম্মোহন ইত্যাদির পক্ষে বিজ্ঞাপন।

ঝ) বেটিং সংক্রান্ত উপদেশ (tips) ও গাইড বই বা ঘোড়দৌড় বা অন্যান্য খেলার 'জুয়া'-এর সঙ্গে যুক্ত—এরকম বিজ্ঞাপন প্রচারিত হবে না।

ঞ) এমন কোন পণ্য সম্পর্কে বিজ্ঞাপনচিত্র প্রচার করা চলবে না যার ফলে জনগণকে কোন অলীক বিষয়ে ফল লাভের প্রলোভন দেওয়া হয়— যেমন টাকে চুল গজানো বা কেন দুরারোগ্য ব্যধির ঔষুধের বিজ্ঞাপন।

ট) বিজ্ঞাপনে বৈজ্ঞানিক বা পরিসংখ্যানগত তথ্য ব্যবহার করলে তা যেন সঠিক সময় এই ধরনের তথ্য দিয়ে পণ্য/পরিষেবা-কে 'বিজ্ঞাপনসম্মত' বলে চালানোর চেষ্টা হয় যা অনেক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ হয়ে থাকে।

ট) বিজ্ঞাপনে পণ্য/পরিষেবার গুণ বা বিশেষত্ব সম্পর্কে কোন বিশেষ দাবী করা হলে বিজ্ঞাপনদাতা ও বিজ্ঞাপন প্রচারক উভয়কেই তার যথাৎত প্রমাণ সম্পর্কে প্রস্তুত-থাকতে হবে।

দ) একটি বিজ্ঞাপনচিত্রে অন্য কোন সংস্থার পণ্য/পরিষেবা সম্পর্কে কটূক্তি করা চলবে না।

ধ) একটি বিজ্ঞাপনের নকল করে তৈরি অন্য কোন বিজ্ঞাপন (এমনকি তা যদি কপিরাইট এ্যাক্ট বা অন্যান্য 'নকল' সংক্রান্ত আইনভঙ্গ না করে তবুও) যদি দর্শককে বিভ্রান্ত করে তাহলে বিজ্ঞাপনটি প্রচার করা যাবে না।

ন) দৃশ্যগতভাবে বা শব্দগতভাবে (visual & verbal representation) প্রচারিত অন্যান্য সংস্থার পণ্য/পরিষেবার সঙ্গে বিজ্ঞাপনে প্রচারিত পণ্য বা পরিষেবাটির মূল্য ইত্যাদির তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরলে তা যেন একেবারে সঠিক (acurate) হয় তা দেখতে হবে। এক্ষেত্রে বিকৃত তথ্য পরিবেশন করলে দর্শকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে, যা অবাঞ্ছিত।

ত) পণ্য/পরিষেবার গুণাগুণ সম্পর্কে যে সমস্ত প্রশংসাপত্র (testimonials) বিজ্ঞাপনে উপস্থাপন করা হচ্ছে তার সপক্ষে যেন যথেষ্ট প্রমাণ থাকে এবং তা যাতে দর্শকের কাছে বিভ্রান্তির কারণ না হয় তা দেখা বিজ্ঞাপনদাতা ও বিজ্ঞাপন প্রচারকের কর্তব্য।

৩) এছাড়া আকাশবাণী/দূরদর্শনের প্রধানদের উচিৎ কোন বিজ্ঞাপনচিত্র প্রচারের আগে তা 'ভারতীয় বিজ্ঞাপন সংসদ' (Advertising Council of India) নির্দেশিত 'ভারতে প্রচারিত বিজ্ঞাপনের জন্য নৈতিক সংহিতা' (Code of Ethics for Advertising in India) মেনে তৈরি হয়েছে কিনা তা দেখা।

৪) উপরোক্ত নিয়মাবলী পরিবর্তন/পরিবর্ধন করা অথবা সেগুলি মেনে চলা বাধ্যতামুলক করা হবে কিনা তা নির্দিষ্ট হবে ভারত সরকার (Government of India) দ্বারা।

এখানে ভার্গিস্ কমিটির-র তৈরি যে নিয়মাবলীর প্রস্তাবনা রয়েছে তার সবগুলি সবক্ষেত্রে মেনে চলা হয় না তা আমরা কখন কখন দেখতে পাই। তবে ভার্গিস কমিটি যেহেতু দীর্ঘ সমীক্ষা, সাধারণ মানুষ ও বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে এই নিয়মাবলী তৈরি করেন, তাই এটিকে মোটামুটিভাবে আদর্শ নৈতিক আচরণের ভিত্তি হিসাবে ধরে নেওয়া যায়।

এছাড়া ভার্গিস্ কমিটি-র রিপোর্ট মূলত তৈরি হয়েছিল দূরদর্শনে দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করার জন্য। সুতরাং, বিজ্ঞাপনচিত্র, যেহেতু তা দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে প্রচারিত হয়, তারক্ষেত্রে ভার্গিস্ কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে তৈরি 'বিজ্ঞাপনের সাধারণ আচরণবিধি' (General Rules of Conduct in Advertising) উপযুক্ত কাঠামো বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বিজ্ঞাপনচিত্র কী দেখানো যাব বা কী দেখানো যাবে না, সে বিষয়ে নৈতিক বিতর্ক সারা পৃথিবী জুড়েই দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। নৈতিকতা যেহেতু কেবলমাত্র আইনদ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, বরং রুচি ও বুদ্ধি-র প্রয়োগের উপর অনেকাংশ নির্ভরশীল। তাই বিজ্ঞাপনদাতা বা বিজ্ঞাপন নির্মাতার সদিচ্ছা এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া একথাও মাথায় রাখতে হবে যে নৈতিকতার সীমারেখা অতিক্রম করলে বিজ্ঞাপন চিত্রের গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

১৩.১১ বিজ্ঞাপনের চিত্রনাট্য

বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত চিত্রনাট্য করার পূর্বে ঐ বিশেষ বিজ্ঞাপনটি নির্মাণের কন্‌সেপ্ট (concept) ধারণার তৈরি করা প্রয়োজন। এই কন্‌সেপ্ট বা ধারণা-এর মধ্যেই ইঙ্গিত থাকে বিজ্ঞাপনটির গঠন, আঙ্গিক, বার্তা ইত্যাদির।

বিজ্ঞাপনের 'কন্‌সেপ্ট'-এর উপর নির্ভর করেই বিজ্ঞাপনচিত্রের চিত্রনাট্য ভাবা হয়। এই 'কন্‌সেপ্ট'-এর মধ্যে বোঝানো থাকে বিজ্ঞাপনটি একটি 'ছোট্ট কাহিনী'র আদজলে হবে নাকি কতকগুলি 'ইমেজ-এর মন্‌তাজে'র দ্বারা সৃষ্টি করা হবে। বিজ্ঞাপনে চিত্রনাট্য লেখার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

- **জিংগেল বা শীর্ষ সঙ্গীত** : সাধারণত বিজ্ঞাপনচিত্রের শুরুতে উৎপাদিত দ্রব্য ও উৎপাদনকারী সংস্থার পরিচয় সম্বলিত একটি চার/ছয় লাইনের গান থাকে। এই শীর্ষসঙ্গীত বা 'জিংগেল' রচনা বিজ্ঞাপনের চিত্রনাট্য লেখার ক্ষেত্রে জরুরি বিষয়। কারণ 'জিংগেল' একটি বিজ্ঞাপন চিত্রকে দ্রুত জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে।
- **সংলাপ** : বিজ্ঞাপনের মাঝের অংশ বা বৃত্তি (body) তৈরি হতে পারে সংলাপ বা কথোপোকথনের নাটকীয় পদ্ধতিতে। এক্ষেত্রে সংলাপের বাক্যগুলি সাধারণত হবে সংক্ষিপ্ত, আকর্ষণীয়/মজার ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। উদাহরণ হিসাবে একটি ঠাণ্ডা পানীয়ের বিজ্ঞাপনচিত্রে এক প্রাক্তন ভারতীয় বিখ্যাত ওপেনিং ব্যাটস্‌ম্যানের সঙ্গে বর্তমান এক ক্রিকেটারের সংলাপের নাটকীয়তার কথা মনে করতে পারা যায়।
- **শ্লোগান/ক্যাপশন** : সাধারণত বিজ্ঞাপনচিত্রের শেষ অংশে একটি শ্লোগান/ক্যাপশন উচ্চারিত বা অক্ষরে পর্দায় লিখে দেওয়া হতে পারে। একটি জুতসই ক্যাপশন বা শ্লোগান বিজ্ঞাপনের বার্তাটিকে যথার্থ ও সপ্রতিভ হতে বহুল পরিমাণে সাহায্য করে থাকে। যেমন, একটি পোষাক উৎপাদক সংস্থার শ্লোগান '....দ্যা কমপ্লিট ম্যান' ইত্যাদি।

- **শীর্ষমন্‌তাজ** : সাধারণত বিজ্ঞাপনের শুরুতে যখন জিংগেলটি গাওয়া হয় তখন পর্দায় বেশ কয়েকটি শটের দ্রুত (বা অন্যধরণের) মন্‌তাজ সৃষ্টি করা হয়। এই মন্‌তাজ বিজ্ঞাপন চিত্রের দৃশ্যগত গুণ বা ভিস্যুয়াল কোয়ালিটির পরিচায়ক হয়ে উঠতে পারে।
- **স্টোরী বোর্ড** : সমগ্র বিজ্ঞাপনের সংলাপ ও দৃশ্যভাবনা অর্থাৎ পরিকল্পিত শটগুলি পর পর এঁকে অর্থাৎ ইলাসট্রেট করে স্টোরী বোর্ড তৈরি করা হয়। প্রত্যেকটি শটের ইলাসট্রেশনের সঙ্গে ফ্রেমটির নিচে ঐ শটে সে সংলাপ বা সংলাপের অংশ থাকবে তা লিখতে হয়।
- **গ্রাফিক্স ও স্পেশাল এফেক্ট** : বিজ্ঞাপনচিত্রে সবচেয়ে বেশি স্পেশাল এফেক্টও (কমপিউটার) গ্রাফিক্স ব্যবহার করা হয়। সাধারণত সংস্থার নোগোটি পর্দায় তৈরি করার ক্ষেত্রে ও তা বিশেষ ও অভিনবভাবে পর্দায় উপস্থাপনের জন্য গ্রাফিক্স ও স্পেশাল এফেক্ট ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হয়। অনেকক্ষেত্রে চিত্রনাট্যের বাস্তবতা বহির্ভূত দৃশ্যগুলিকেও গ্র্যাফিক্সে নির্মাণ করা হয়।

১৩.১২ সারাংশ

সংবাদ, তথ্য ও গল্পকে যেমন চলচ্চিত্র পৌঁছে দেয় দর্শকদের কাছে ঠিক তেমনি বিজ্ঞাপনের বার্তাকে জনতার কাছে পৌঁছে দেবার কাজেও চলচ্চিত্রকে ব্যবহার করা হয় অধুনা বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্র (advertisement film) চলচ্চিত্রের অন্যমত প্রয়োগ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত বলা যায়, বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্রে নির্মাণ নবীন চলচ্চিত্রকারদের কাছে পেশা হিসাবে যথেষ্ট অর্থকরী। তাই প্রায়শই দেখা যায় তরুণ চলচ্চিত্রকাররা, এমনকি প্রতিষ্ঠিত চলচ্চিত্র নির্মাতারাও বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্র নির্মাণ করে থাকেন।

বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য হয় ছোট, কয়েক সেকেন্ড থেকে বড় জোর দু-তিন মিনিট। বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্র নির্মাতাকে এই অল্প সময়ের মধ্যে বিজ্ঞাপনের বার্তাটিকে পৌঁছে দিতে হয় দর্শকের কাছে। বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্র নির্মাণে তাই বিশেষ কৌশলগত উৎকর্ষ্য (skill) প্রয়োজন হয়। একই রকমভাবে বলা যায় বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য রচনার পদ্ধতিও একটু ভিন্ন। সাধারণত দৃশ্যগতভাবে বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্র একটু বেশি ঝকমকে হয়ে থাকে।

বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্র বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। কোন বিজ্ঞাপনে বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বার্তাবাহক হিসাবে ব্যবহার করা হয়, কোথাও আবার পেশাদার মডেল ব্যবহার করা হয়, আবার কোথাও কেবলমাত্র সংস্থার লোগো ব্যবহার করা হয় বা স্পেশাল এফেক্টের সাহায্য নেওয়া হয়। বিজ্ঞাপনচিত্রের স্যুটিং-এর জন্য সাধারণত আকর্ষণীয় নিসর্গ-দৃশ্য ও বৈচিত্র্যময় ব্যবহার করা হয়। জায়গা (location) স্যুটিং স্পট হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রাজিল, ইটালী প্রভৃতি দেশে বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্র নির্মাণের মাধ্যমে চলচ্চিত্র-শিল্প (film industry)-এ বেশ বড় পরিমাণ অর্থ আয় হয়। ভারতও বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সম্ভাবনাময় দেশ।

তবে আজাকাল টেলিভিশনের ব্যাপক প্রসারের ফলে সেলুলয়েডে বিজ্ঞাপনচিত্র তৈরির রেওয়াজ যথেষ্ট কমে গেছে। কারণ টি.ভি. অনেক বেশি সংখ্যক দর্শকের কাছে কম খরচে বিজ্ঞাপনটিকে বার বার পৌঁছে দিতে পারে যা চলচ্চিত্রে সম্ভব নয়।

বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্র বিষয়ে পড়াশুনার অন্যতম প্রধান দিক হল দৃশ্য-শ্রাব্য বিজ্ঞাপনগুলির নৈতিকতার দিক নিয়ে আলোচনা করা। বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্রে মেয়েদের যেভাবে দেখানো হয় তা নৈতিকভাবে যথেষ্ট আপত্তিজনক। বিজ্ঞাপন মানুষের মনে একধরনের ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন দেখায় এবং বিজ্ঞাপনচিত্রের 'দর্শককে 'ত্রেতায়' পরিণত করতে চায়। সামাজিকভাবে অনেক সময় শিশু মনস্তত্বে বিজ্ঞাপন ক্ষতি করে বলে মনোবিজ্ঞানীদের মত।

তথাপি বানিজ্যপ্রধান সমাজে বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে বার্তা বিনিময়ে বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্র সবচেয়ে বড় মাধ্যম।

১৩.১৩ অনুশীলনা

(নৈব্যক্তিক প্রশ্নাবলী)

১। 'জিংগেল' কী?

২। 'স্টোরী বোর্ড' কাকে বলে?

৩। পৃথিবীতে কোন্ দেশে সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্র তৈরি হয়?

৪। বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্রের 'কনসেপ্ট' কাকে বলে?

(স্বল্প দৈর্ঘ্যের উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী)

১। বিজ্ঞাপনচিত্রে ভারতে সম্ভাবনা — টীকা লিখুন।

২। বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য বিষয়ে সংক্ষেপে লিখুন।

৩। বিজ্ঞাপনচিত্রে নারীদের অবস্থান — টীকা লিখুন।

৪। বিজ্ঞাপনচিত্র : সিনেমা হল বনাম টি.ভি — আলোচনা করুন।

(দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী)

১। বিস্তৃত আলোচনা করুন — 'বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্র ও মতাদর্শগত অবস্থান'।

২। শৈলী ও আঙ্গিকের দিক থেকে বিজ্ঞাপন চিত্রের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

৩। 'বিজ্ঞাপনচিত্র ও আচরণবিধি'— আলোচনা করুন।

৪। ভালো বিজ্ঞাপন চিত্রের কী গুণাবলী থাকা দরকার — এ বিষয়ে নিজস্ব মতামত বিস্তারিতভাবে লিখুন।

১৩.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

১। এ্যাডভার্টাইজিং ইন্টারন্যাশনাল :

২। মাস কমিউনিকেশন ইন ইন্ডিয়া : কেবল জে. কুমার, গেইকো পাবলিকোনস্, নিউ দিল্লি, ১৯৮৯।